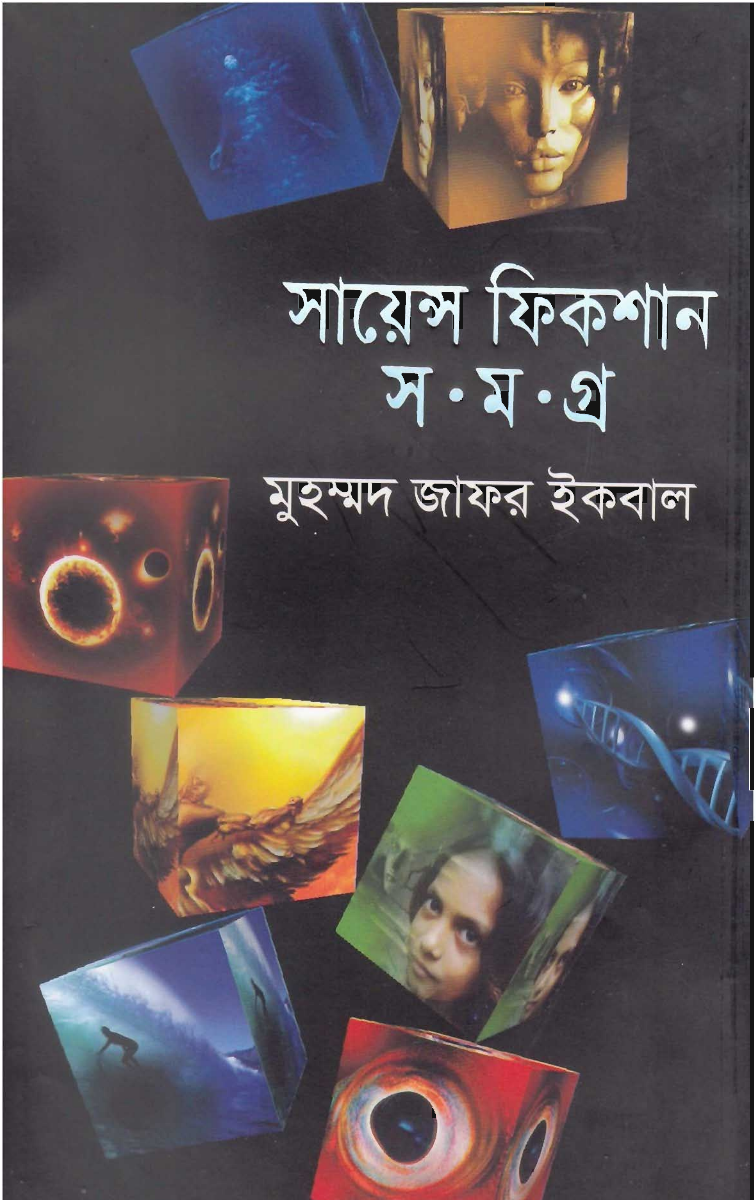

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান রুহান | জলমানব | অন্ধকারের গ্রহ
অক্টোপাসের চোখ | ইকারাস | রবো নিশি
প্রডিজি | কেপলার টুটুবি

বাংলাদেশের সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লিখে মুহম্মদ জাফর ইকবাল জনপ্রিয় হয়েছেন। না, কেবল জনপ্রিয়ই নন, তিনি বাংলা সায়েন্স ফিকশানকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন; আন্তর্জাতিক সায়েন্স ফিকশান-এর পরিমণ্ডলে দীপ্যমান উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় নিযুক্ত। ফলে তাঁর লেখায় বর্ণিত বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যাদি নিছক কল্পনা-আশ্রিত নয়, সে-সবের যথার্থ ভিত্তি থাকে। কিন্তু বিশেষভাবে যা লক্ষণীয় তা হল—বিজ্ঞানের জয় আসলে মানুষকে বাদ দিয়ে নয়, মানুষের ক্ষতিসাধন করে নয়, বরং মানুষের শুভবুদ্ধি ও পরোপকারের ইচ্ছাকে সার্থক ও বিজয়ী করে। 'জলমানব' নিহন ও স্থলমানবী কাটুস্কার মানবসত্তার কাছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার 'কোয়াকম্প'-এর যান্ত্রিক সত্তা পরাজিত হয়। 'প্রডিজি'র শারমিনের অসাধারণ মেধা এবং রাফি ও ঈশিতার সদিচ্ছার কাছে হার মানে উচ্চাভিলাষী বিজ্ঞানী বব লাস্কির অশুভ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি। 'ইকারাস'-এ ডক্টর কাদেরের বিকৃত গবেষণার ফসল পাখিমানব বুলবুলের জন্য পাঠক-হৃদয়ে সহানুভূতি জেগে ওঠে। মানুষেরই সৃষ্ট পঞ্চম মাত্রার রোবট কিংবা রোবোমানব কেউই মানুষের শুভবুদ্ধিকে পরাজিত করতে পারে না। 'অন্ধকারের গ্রহ'তে কালো, কুৎসিত অশুভ ভয়ংকর গ্রহ এবং এতে বসবাসকারী বীভৎস কুৎসিত প্রাণী যেমন আতঙ্কিত করে তেমনি 'কেপলার টুটুবি' গ্রহে নিষ্পাপ মানুষের পদচিহ্ন দিয়ে নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার সূচনা অবারিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এ গ্রহে সূর্যটা বড়, দিনগুলি লম্বা, রাতের আকাশে চাঁদ দুটি। সত্যিই কি আছে এরকম কোনো গ্রহ? হয়তো আছে, কিংবা নেই। এ শুধু কেবলই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী? কিংবা অদূরভবিষ্যতে একদিন হয়তো আবিষ্কার হবে এরকম একটা পৃথিবী, কেননা কথাশিল্পীরা অনেক সময় ভবিষ্যদ্রষ্টার ভূমিকায় থাকেন—এ তারই প্রতিফলন। যেমন ছিলেন জুল ভের্ন, ডুবোজাহাজের কথা যখন কেউ কল্পনাও করে নি—তখন তিনি বলেছেন 'নটিলাস' নামে ডুবোজাহাজের কথা, তাও আবার সৌরশক্তি-চালিত! মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁর গল্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে পাঠককে সম্মোহিত করেন—নিয়ে যান অন্য এক ভুবনে—যেখানে কল্পনা আর বিজ্ঞান একাকার হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

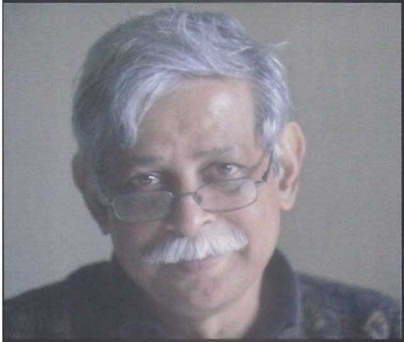

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জন্ম: ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

স্ত্রী প্রফেসর ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশান সমগ্র

পঞ্চম খণ্ড

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়েন্স ফিকশান স•ম•গ্র

পঞ্চম খণ্ড

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১৩

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা–১১০০'র পক্ষে
নূর–ই–মোনতাকিম আলমগীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পূবালি মুদ্রায়ণ
৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা–১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৬৫০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978 -984 - 8794 - 16 - 6

SCIENCE FICTION SAMAGRA VOL V [A Collection of Science Fiction]
by Muhammed Zafar Iqbal
Published by PROTIK. 38/2Ka Banglabazar (1st Floor), Dhaka-1100
Third Edition : March 2014. Price : Taka 650.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা–১১০০

যোগাযোগ
৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬৮০১৫৩৭০৭

Website : www.abosar.com, www.protikbooks.com
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com

Online Distributor | www.rokomari.com, Phone : 16297, 01833168190
www.akhoni.com, Phone : +88 096 11 55 77 88
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যখন পড়ার জন্যে কোনো একটি বই হাতে তুলে নিই প্রথমে সেটি উল্টেপাল্টে দেখি। আমার কাছে মনে হয় যেন সেটি একটি জীবন্ত প্রাণী—আমার হাতে সেটি নড়াচড়া করছে এবং আমার সেটিকে ধরে রাখতে হয়, যেন চলে না যায়। আমি প্রচ্ছদটি দেখি, বইয়ের ফ্ল্যাপে কিছু থাকলে সেটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে লেখককে একটু বোঝার চেষ্টা করি। বইটি কাকে উৎসর্গ করা হয়েছে সেটি লক্ষ করি এবং বইটির কোনো ভূমিকা থাকলে অনেক মনোযোগ দিয়ে সেই ভূমিকাটি পড়া শুরু করি। আমার কাছে মনে হয় বই যদি হয় একটি কেক তা হলে ভূমিকাটি বুঝি তার আইসিং, আইসিং ছাড়া কেক যেমন নেহাতই সাদামাটা, ভূমিকা ছাড়া বইও বুঝি সেরকম।

অথচ বিচিত্র ব্যাপার হচ্ছে আমার নিজের লেখা বেশিরভাগ বইয়ে কোনো ভূমিকা নেই। কেন নেই আমার তার কোনো সদুত্তরও নেই। তবে আমার সায়েন্স ফিকশান সমগ্রগুলোতে আমি বড় বড় ভূমিকা লিখেছি। আমার মনে আছে যখন আমার প্রথম সায়েন্স ফিকশান সমগ্রটি বের হয় তখন হুমায়ূন আহমেদ আমাকে বলেছিল, "বইটিতে একটা সুন্দর ভূমিকা লিখবি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ভূমিকায় কী লিখব?" সে বলেছিল, "যে বইগুলো নিয়ে সমগ্র বের হচ্ছে তার প্রত্যেকটা নিয়ে একটু একটু লিখে ফেল—তা হলেই হবে।" সেই থেকে আমি সায়েন্স ফিকশান সমগ্রর ভূমিকা লিখতে গিয়ে তার ভেতরে বইগুলো সম্পর্কে আমার নিজের কোনো কথা লিখে আসছি। কখনো কখনো কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ কখনো কখনো একেবারেই গুরুত্বহীন।

তাই আজ এই ভূমিকা লিখতে গিয়ে আমার খুব হুমায়ূন আহমেদের কথা মনে পড়ছে। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে হাসপাতালে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছিল ঘুমিয়ে থাকলেও চারপাশের সবকিছু সে খানিকটা বুঝতে পারে—অনেকটা স্বপ্নের মতো। তাই তাঁরা আমাদের বলেছিল তাঁর সাথে কথা বলতে। আই.সি.ইউয়ের নির্জন ঘরে আমি অচেতন হুমায়ূন আহমেদের সাথে অনেক কথা বলতাম। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলতাম, "তুমি কোনো চিন্তা কোরো না—তুমি নিশ্চয়ই জেগে উঠবে। এখন আমার কথাগুলো তোমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে, যখন তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে তখন এই স্বপ্ন-স্বপ্ন সময়টুকুর অভিজ্ঞতা নিয়ে তুমি কী চমৎকার একটা বই লিখবে সেটা কখনো চিন্তা করেছ?"

হুমায়ূন আহমেদ জেগে ওঠে নি, তাঁর সেই চেতন-অচেতন রহস্যময় জগতের কথা আমরা আর কখনো জানতে পারব না। বাংলা ভাষায় আরো অনেক সায়েন্স ফিকশান লেখা হবে শুধু হুমায়ূন আহমেদের সায়েন্স ফিকশান আর লেখা হবে না—ভেবে বড় কষ্ট হয়।

যাই হোক এটি আমার পঞ্চম সায়েন্স ফিকশান সমগ্র। এই সংকলনগুলো বের করার সময় আমি কঠিন নিয়ম মেনে চলি, আটটি সায়েন্স ফিকশান দিয়ে একটি সংকলন বের হয়, যার অর্থ আমি এই পর্যন্ত চল্লিশটি সায়েন্স ফিকশান লিখে ফেলেছি! নিজের পিঠে নিজে থাবা দেয়ার উপায় থাকলে আমি নিশ্চয়ই এখন আমার পিঠে থাবা দিয়ে বলতাম, "শাবাশ! তোমার পাঠকেরা যতদিন তোমার ওপর বিরক্ত না হচ্ছে ততদিন চালিয়ে যাও!"

বলা বাহুল্য আমি চালিয়েই যাচ্ছি কিন্তু ইদানীং আমি হঠাৎ করে নূতন একটা সমস্যার মুখোমুখি হতে শুরু করেছি। আমি আমার পুরোনো লেখা পড়ে আবিষ্কার করছি যে, লেখাগুলো আমার কিছু মনে নেই এবং আমি যখন পড়ি তখন সেগুলো একেবারে অপরিচিত নূতন লেখার মতো মনে হয়। এটি বিচিত্র কিছু নয়, মাঝ বয়স পার হবার পর থেকে মানুষের স্মৃতি হারিয়ে যেতে থাকে। আমার মস্তিষ্ক আমার অসংখ্য পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় তুচ্ছ স্মৃতিকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে কেন আমার লেখালেখির স্মৃতি মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এখন আমি সব সময়ই এক ধরনের আতঙ্কে থাকি কখন আমি আমার আগের লেখা একটা উপন্যাস নূতন করে আবার লিখে ফেলব!

আমার যতদূর ধারণা সেটা এখনো ঘটে নি—যদি ঘটে যায় পাঠকদের কাছে সেজন্যে আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে রাখছি! আমার যতদূর ধারণা এই সায়েন্স ফিকশানগুলো এখনো দ্বিতীয়বার লেখা হয়ে যায় নি, সবগুলোই নূতন!

প্রথম বইটির নাম 'রুহান রুহান', প্রেক্ষাপট আমার প্রিয় একটি বিষয়, ভবিষ্যতের ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবী, মানুষের মাঝে তীব্র ভেদাভেদ এবং ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা তার মাঝে মূল চরিত্র নিজে বেঁচে আছে অন্যদের বাঁচিয়ে রাখছে। মজার কথা হল মূল চরিত্র রুহানের নামটি কোনো একজন নূতন বাবা এবং মায়ের খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, তারা তাদের সন্তানের নাম রেখেছেন রুহান, রেখে আমার কাছে জানতে চাইছেন এই শব্দটির মানে কী! আমি পড়েছি বিপদে, ভবিষ্যতের চরিত্রদের জন্যে আমি নূতন নূতন নাম তৈরি করি এটাও সেরকম একটা শব্দ, এর কোনো অর্থ আছে বলে তো আমার জানা নেই! কোনো একটি ভাষায় এর খুব সুন্দর অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে আমি নূতন বাবা–মাকে ভরসা দিয়েছিলাম, আর যদি কোনো অর্থ না থাকে তা হলে আমরা যেটা বলব সেটাই হবে এই নামের অর্থ। যেমন যে মানুষটি একই সাথে রূপবান, যার মহান হৃদয় এবং যে তেজস্বী সে হচ্ছে রুহান!

সংকলনের দ্বিতীয় বইটির নাম 'জলমানব'—এটিও আমার প্রিয় প্রেক্ষাপটে লেখা, পৃথিবীর অবিবেচক মানুষের তৈরি বৈশ্বিক উষ্ণতায় মেরু অঞ্চলের বরফ গলে পৃথিবীর বড় অংশ পানিতে ডুবে গিয়েছে। স্বার্থপর ক্ষমতাশালী মানুষেরা অসহায় মানুষকে ঠেলে দিয়েছে পানিতে। উত্তাল সমুদ্রে গড়ে উঠছে নূতন এক ধরনের সভ্যতা। সেই মানুষদের বেঁচে থাকার সংগ্রামের গল্প নিয়ে লেখা হয়েছে জলমানব। আমার প্রিয় একটি বই, কাল্পনিক কাহিনী কিন্তু সত্যিই কি এটি কাল্পনিক থাকবে? খুব দ্রুত কি সেটা সত্যি হয়ে যেতে শুরু করছে না?

'অন্ধকারের গ্রহ' একজন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ কবিকে নিয়ে লেখা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। সে বিজ্ঞানীদের মতো যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পারে না—তার বেশিরভাগ কাজ করে যুক্তিহীন আবেগ দিয়ে। এরকম চরিত্র নিয়ে আমি খুব বেশি সায়েন্স ফিকশান লিখি নি—তাই এটা লেখার সময় আমি ভিন্ন এক ধরনের আনন্দ পেয়েছি, যেটা অন্য সময়ে পাই নি।

'অক্টোপাসের চোখ' নয়টি গল্প এবং একটি ছোট উপন্যাসের সংকলন। গল্পগুলো ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা এবং সম্ভবত আমার লেখা সবচেয়ে ছোট সায়েন্স ফিকশানটি এই বইটিতে আছে। আমার প্রতিটি সায়েন্স ফিকশান সমগ্রেই খুব হালকা মেজাজের কৌতুকধর্মী এক–দুটি সায়েন্স ফিকশান থাকে, অক্টোপাসের চোখ বইটিতে সিনাস্সুঘুটিয়া গল্পটি সেরকম একটি গল্প। ভাগ্যিস এই গল্পটি লিখেছিলাম তা না হলে এই পুরো সমগ্রটিই হয়ে যেত একেবারেই সিরিয়াস একটি সমগ্র!

'ইকারাস' আমার খুব প্রিয় একটি উপন্যাস। বহুদিন থেকেই আমি এটা লিখব লিখব বলে ভাবছিলাম, কোনোভাবেই সেটা লিখতে পারছিলাম না। মনে মনে যেভাবে লিখব বলে ভেবেছিলাম লেখার সময় দেখেছি কাহিনীটা অনেকটা নিজের মতো করেই এগিয়ে গেছে। লেখার পর মনে হয়েছে, যেরকম করে কিছু একটা লিখতে চাই অনেকদিন পর দেখি সেরকমই লিখতে পেরেছি!

'রবো নিশি' আমার প্রিয় প্রেক্ষাপটে লেখা একটি উপন্যাস, মূল চরিত্র একটি শিশু! পাঠকদের থেকে অনেক প্রশ্ন বইটির নামকরণ নিয়ে—রবো নিশি বলে তো বইয়ে কেউ নেই তা হলে এর নাম রবো নিশি কেন? উত্তরটা আমারও জানা নেই, কেউ খুব চাপাচাপি করলে আমতা–আমতা করে বলি, নিশি মানে হচ্ছে রাত, রোবটরা পৃথিবীতে দিনের আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে ফেলেছে বলে হয়তো বলা যায় রবো নিশি নেমে এসেছে!

'প্রডিজি' বর্তমান প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস, মূল চরিত্র আবার শিশু। পাঠকেরা এটা বেশ পছন্দ করেছে। মজার কথা হল আমার সহকর্মীরা বলেছে এর মাঝে তারা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটা খুঁজে পেয়েছে। আমার মনে হয় তারা হয়তো খুব ভুল বলে নি, নিজের অজান্তেই লেখার সময় এখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছবি ফুটে উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেপলার টুটুবি' সম্প্রতি আবিষ্কৃত মানুষের বসবাসযোগ্য একটি গ্রহের নাম। পৃথিবীর মানুষের সেই দূর গ্রহে নিজের আবাসভূমি তৈরি করার চেষ্টা খুবই যুক্তিসঙ্গত একটি সায়েন্স ফিকশান হতে পারে। মজার ব্যাপার হল এই সায়েন্স ফিকশানের কাহিনীর মূল অংশ কিন্তু এই অভিযান নয়। মূল কাহিনী মানুষের ভিন্ন এক ধরনের বিবর্তন নিয়ে। লিখতে গিয়ে যত আনন্দ পেয়েছি পাঠকেরা পড়তে গিয়েও সেরকম আনন্দ পেলেই আমার কিছু চাওয়ার নেই।

সবশেষে প্রতীক প্রকাশনা সংস্থার আলমগীর রহমানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, এখনো তিনি ধৈর্য ধরে আমার সায়েন্স ফিকশান সমগ্র বের করে যাচ্ছেন। একটি বই ভালো লাগা না লাগা যে পুরোপুরি লেখকের লেখার ওপর নির্ভর করে না, অনেকখানি প্রকাশকের ওপরও নির্ভর করে সেটা আমি এই সমগ্রগুলোকে দেখে শিখেছি।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
৮ নভেম্বর ২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

রুহান রুহান ০১
জলমানব ১০৩
অন্ধকারের গ্রহ ১৭১
অক্টোপাসের চোখ ২৪১
ইকারাস ৩৩৫
রবো নিশি ৪২৫
প্রডিজি ৫০৯
কেপলার টুটুবি ৬১[illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান রুহান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

বৃদ্ধ কুরু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "পৃথিবীতে এখন খুব দুঃসময়।"

ছোট শিশু অর্থহীন কথা বললে বড় মানুষেরা যেভাবে সকৌতুকে তার দিকে তাকায় অনেকে সেভাবে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল। কেউ কোনো কথা বলল না। পৃথিবীর মানুষ আজকাল বেশি কথা বলে না, কী নিয়ে কথা বলবে কেউ জানে না। বৃদ্ধ কুরুর মতো দুই-একজন ছাড়া সবাই জন্মের পর থেকেই দেখে আসছে পৃথিবীতে খুব বড় দুঃসময়। সবাই সেটা মেনে নিয়ে কোনোভাবে বেঁচে আছে, সেই বেঁচে থাকাটাও খুব অর্থপূর্ণ বেঁচে থাকা নয়। তাই কেউ সেগুলো নিয়ে কথা বলতে চায় না। সেটা নিয়ে কেউ কোনো অভিযোগও করে না। শস্যক্ষেত্রের পাশে উঁচু ঢিবিতে দাঁড়িয়ে থেকে সবাই উত্তর দিকে তাকিয়ে রইল। বহুদূরে কোথাও আগুন লেগেছে, সেই আগুন থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া আকাশে উঠছে। এটি কোনো নূতন দৃশ্য নয়, অনেকদিন থেকেই তারা দেখছে দূরে কোথা থেকে জানি মাঝে মাঝে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া আকাশে ওঠে। যতই দিন যাচ্ছে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী আরো ঘন ঘন এবং আরো কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে। কে জানে কোনো একদিন হয়তো এই গ্রামটা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে। এই গ্রামের বাড়িঘর, শস্যক্ষেত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আর কুচকুচে কালো ধোঁয়া আকাশে পাক খেয়ে উঠতে থাকবে।

রুহান নিঃশব্দে দূরে তাকিয়ে রইল, কালো ধোঁয়ার রেখাটি একটি অশুভ সংকেতের মতো ঝুলছে, সেটি থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা যায় না। সেটা কত দূরে কেউ জানে না। পৃথিবীতে এখন কারো সাথে কারো যোগাযোগ নেই, তাই ঠিক কোথায় কী ঘটছে তা কেউ অনুমান করতে পারে না। মাঝে মাঝে ক্লান্ত বিধ্বস্ত অপরিচিত কোনো মানুষ যখন এই গ্রামের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায়, সবাই তখন তাকে ঘিরে ধরে তার কাছ থেকে জানতে চায়—সে কোথা থেকে এসেছে, কী দেখেছে। ছন্নছাড়া সেই মানুষগুলোর কেউ কেউ মুখ ফুটে কিছু বলতে চায় না, তাড়া খাওয়া পশুর মতো তারা ভীত আতঙ্কিত মুখে তাকিয়ে থাকে। মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে অস্পষ্ট দুই-একটি কথা বলে আরো দক্ষিণের দিকে হেঁটে যেতে থাকে। কেউ কেউ উদাসী মুখে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব ঘটনার বর্ণনা দেয়, সেই সব ঘটনার সবকিছু বিশ্বাস করা যায় কি না সেটাও কেউ জানে না।

বৃদ্ধ কুরু আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে। যাও সবাই নিজের কাজে যাও।"

আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের দুই-একজন আবার মাথা নাড়ল কিন্তু কেউ চলে গেল না। দিনের আলো থাকতে থাকতে তারা মাঠে, শস্যক্ষেতে কাজ করে কিন্তু বেলা পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলে তাদের কারো বেশি কিছু করার থাকে না। বৃদ্ধ কুরু শেষবারের মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা একবার দেখে উঁচু ঢিবি থেকে নিচে নামতে শুরু করে।

এতক্ষণ রুহান চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, এবারে বৃদ্ধ কুরুকে বলল, "কুরু আমি তোমার সাথে আসি?"

"আসবে? এস।"

রুহান হাত ধরে বৃদ্ধ কুরুকে উঁচু ঢিবি থেকে নামতে সাহায্য করল, ব্যাপারটি আজকাল একটু অস্বাভাবিক। মানুষ যখন দুঃসময়ে থাকে তখন ছোটখাটো ভদ্রতা বা ভালবাসাটুকুও নিজের ভেতর আড়াল করে রাখে, অন্যদের সামনে প্রকাশ করতে চায় না। বৃদ্ধ কুরু একটু হেসে বলল, "রুহান, তুমি জোয়ান ছেলে, আমার মতো বুড়ো মানুষের সাথে কী করবে? যাও নিজের বয়সী ছেলেমেয়ের সাথে হৈ হুল্লোড় কর।"

রুহান হাসল। বলল, "সেটা তো সব সময়ই করি। মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায় তখন হৈ হুল্লোড় করতে ভালো লাগে না।"

বৃদ্ধ কুরু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি দুঃখিত রুহান, যে তোমার বয়সী একটা ছেলেকে এরকম কথা বলতে হচ্ছে। মন খারাপ তো তোমাদের হবার কথা নয়—মন খারাপ হবে আমাদের মতো বুড়ো মানুষদের।"

রুহান কোনো কথা বলল না। বৃদ্ধ কুরুর পাশাপাশি নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। গ্রামের পাথর ছড়ানো পথের দুপাশে ঝোপঝাড়। বাসাগুলো লতাগুল্ম দিয়ে ঢাকা আছে। বাসার ছাদে সোলার প্যানেলগুলোতে শেষ বিকেলের সোনালি আলো। বাতাসে শরতের হিমেল স্পর্শ।

বৃদ্ধ কুরু তার বাসার সামনে এসে দাঁড়াল। ভারী দরজার সামনে লাগানো ছোট মডিউলে চোখের রেটিনা স্ক্যান করানোর সাথে নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল। বৃদ্ধ কুরু ঘরের ভেতরে ঢুকে রুহানকে ডাকল, "এস রুহান।"

www.amarboi.com

রুহান ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "তুমি এখন রেটিনা স্ক্যান করে ঘরে ঢুকো?"

বৃদ্ধ কুরু দুর্বল ভঙ্গিতে হেসে বলল, "ক্রিস্টালগুলোর জন্যে—তা না হলে আমার ঘরে মূল্যবান কী আছে, বল?"

রুহান মাথা ঘুরিয়ে বৃদ্ধ কুরুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার অনেকগুলো ক্রিস্টাল?"

"বলতে পার।"

"এত ক্রিস্টাল দিয়ে তুমি কী করবে?"

বৃদ্ধ কুরু হাসার চেষ্টা করে বলল, "জানি না কী করব। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন পুরো পৃথিবীতে নেটওয়ার্ক ছিল। পৃথিবীর যে কোনো মানুষ যে কোনো জায়গা থেকে তথ্য আনতে পারত। এখন তো আর পারে না। তাই ক্রিস্টালগুলো যোগাড় করেছিলাম—যতটুকু সম্ভব তথ্য জমা করে রাখার জন্যে। এত তথ্য তো আমি সারা জীবনে দেখতে পারব না, তবু এক ধরনের শখ।"

"তোমার কাছে কীসের কীসের ক্রিস্টাল আছে কুরু?"

বৃদ্ধ কুরু একটু হেসে বলল, "কীসের নেই! ব্যাক্টেরিয়া ভাইরাস থেকে শুরু করে নীল তিমি, পরমাণু থেকে গ্যালাক্সি, প্রেতচর্চা থেকে বিজ্ঞান সবকিছু আছে।"

"পৃথিবীর সব ক্রিস্টাল কি কারো কাছে আছে?"

"উঁহু। সেটি সম্ভব না। জ্ঞান তো থেমে থাকে না। নূতন জ্ঞানের জন্ম হলেই নূতন ক্রিস্টালে সেটা রাখা হয়। তাই একজনের কাছে কখনোই সব ক্রিস্টাল থাকতে পারে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান বৃদ্ধ কুরুর ঘরের একটা পুরোনো চেয়ার টেনে সেখানে বসে বলল, "কুরু, তোমার কি মনে হয় এখনো পৃথিবীতে নূতন জ্ঞানের জন্ম হচ্ছে? নূতন ক্রিস্টালে সেটা লেখা হচ্ছে?"

বৃদ্ধ কুরু কিছুক্ষণ রুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি জানি না রুহান। যদি সত্যি সত্যি সেটা বন্ধ হয়ে থাকে, তা হলে বুঝবে পৃথিবীতে সভ্যতা বলে আর কিছু নেই।"

রুহান আর বৃদ্ধ কুরু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, বাইরে পাখির কিচিরমিচির ডাক শোনা যেতে থাকে, সন্ধেবেলা মানুষের মতো সব পশুপাখিও মনে হয় ঘরে ফিরে আসে। রুহান উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে; তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ কুরুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কুরু, আমার মাঝে মাঝে মাথার মধ্যে খুব ভয়ানক একটা চিন্তা আসে।"

বৃদ্ধ কুরু জিজ্ঞেস করল, "কী চিন্তা?"

"আমাদের যে ক্রিস্টাল রিডারগুলো আছে, সেগুলো যদি একসময় নষ্ট হয়ে যায় তখন কী হবে?"

"নষ্ট হয়ে যায়?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু—" বৃদ্ধ কুরু ঠিক বুঝতে পারল না, ইতস্তত করে বলল, "নষ্ট হয়ে যায় মানে কী?"

"এখন যদি আমি আমার কথা জমা করতে চাই, ক্রিস্টাল রিডারে সেটা জমা থাকে। শুনতে চাই ক্রিস্টাল রিডারে শুনতে পাই। কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে ক্রিস্টাল রিডারে খোঁজ করি। সবকিছু আমরা করি ক্রিস্টাল রিডার দিয়ে—"

"হ্যাঁ।" বৃদ্ধ কুরু এখনো ঠিক বুঝতে পারছে না, ভুরু কুঁচকে বলল, "ক্রিস্টাল রিডার দিয়েই তো করব।"

রুহান বলল, "কিন্তু ক্রিস্টাল রিডার তো একটা যন্ত্র। একটা যন্ত্র তো নষ্ট হতেই পারে। পারে না?"

"কিন্তু এটা তো সেরকম যন্ত্র না। এর মাঝে কিছু নড়ছে না, কিছু ঘুরছে না। ক্রিস্টালের অণুগুলোর মাঝে তথ্য সাজানো হয় সেখান থেকে তথ্য বের হয়ে আসে—"

"রুহান একটু উত্তেজিত গলায় বলল, "কিন্তু তারপরেও সেটা তো নষ্ট হতে পারে। আমাদের গুরুনের ক্রিস্টাল রিডার নষ্ট হয়ে গেছে না?"

বৃদ্ধ কুরু হেসে বলল, "গুরুনের কথা ছেড়ে দাও। সে নিদানি পাতার নির্যাস খেয়ে নেশা করে তার ক্রিস্টাল রিডারটা ফায়ার প্লেসের আগুনে ফেলে দিয়েছে। সেটা নষ্ট হবে না তো কী হবে?"

"তা যাই হোক, কিন্তু তার ক্রিস্টাল রিডার তো নষ্ট হয়েছে। এখন সে পাগলের মতো একটা খুঁজছে—খুঁজে পাচ্ছে না। আমি শুনেছি পৃথিবীতে আর ক্রিস্টাল রিডার তৈরি হয় না।"

বৃদ্ধ কুরু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "হ্যাঁ। আমিও শুনেছি পৃথিবীর নেটওয়ার্ক ধ্বংস হবার পর আর ক্রিস্টাল রিডার তৈরি হয় না। শেষ ক্রিস্টাল রিডার তৈরি হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগে।"

রুহান বৃদ্ধ কুরুর সামনে একটা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বলল, "তা হলে? তা হলে তুমি বল, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে কী হবে? যখন কারো কাছে ক্রিস্টাল রিডার থাকবে না, তখন কী হবে? ছোট বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে নূতন কিছু কেমন করে শিখবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ কুরু বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর মাথা নেড়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এভাবে চিন্তা করি নি। আমরা আমাদের সব তথ্য, সব জ্ঞানের বিনিময়, সবকিছু করি ক্রিস্টাল রিডার দিয়ে। যদি আমাদের ক্রিস্টাল রিডার না থাকে তখন কী হবে আমি জানি না—"

রুহান উত্তেজিত গলায় বলল, কিন্তু সব সময় তো ক্রিস্টাল রিডার ছিল না। তখন মানুষ কী করত?"

"একসময় কম্পিউটার নামে একটা যন্ত্রে কথা বলত। তার আগে হাত দিয়ে কিছু সুইচে করে তথ্য পাঠাত, তার আগে ছিল কাগজ আর কলম। পাতলা এক ধরনের সেলুলয়েড আর কালি বের হবার এক ধরনের টিউব। তার আগে ছিল গাছের পাতা—তার আগে মাটির আস্তরণ—"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। গাছের পাতা, মাটির আস্তরণ আর কাগজে কেমন করে তথ্য সংরক্ষণ করত। এগুলো তো যন্ত্র নয়, এর পরমাণু তো সংঘবদ্ধভাবে সাজানো থাকে না!"

"না না না।" বৃদ্ধ কুরু মাথা নেড়ে বলল, "তখন অন্য একটা ব্যাপার ছিল। সব ভাষার তখন লিখিত রূপ ছিল। অক্ষর ছিল, বর্ণ ছিল সেগুলো দিয়ে মানুষ তাদের কথাকে লিখে রাখত।"

"লিখে রাখত?"

"হ্যাঁ। এখন আমরা কিছু বললেই সেটা যেরকম সংরক্ষিত হয়ে যায় আগে সেটা ছিল না। আগে কিছু সংরক্ষণ করতে হলে সেটা বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করে লিখতে হত। সেই চিহ্নগুলো মানুষ মনে রাখত, সেটা দেখে তারা বলতে পারত কী লেখা আছে। সব শিশুকেই তার জীবনের শুরুতে লেখা আর পড়া ব্যাপারটা শিখতে হত। সেটা শেখার পর তারা জ্ঞান অর্জন শুরু করতে পারত।"

"কী আশ্চর্য!" রুহান অবাক হয়ে বলল, "কী জটিল একটা প্রক্রিয়া।"

"হ্যাঁ। এখন ক্রিস্টাল রিডারে চাপ দিলেই কথা! ছবি ও ভিডিও বের হয়ে আসে। আগে সেটা ছিল না। আগে যে চিহ্নগুলো দেখে মানুষ পড়ত, সেই চিহ্নগুলোর নাম ছিল বর্ণমালা বা অ্যালফাবেট।"

"কী আশ্চর্য!" রুহান মাথা নেড়ে বলল, "তুমি এত কিছু কেমন করে জান?"

বৃদ্ধ কুরু হেসে বলল, "আমি বুড়ো মানুষ। আমার তো কোনো কাজকর্ম নেই, আমি তাই বসে বসে আমার ক্রিস্টালগুলো দেখি! প্রাচীনকালে মানুষ কী করত তা আমার জানতে বড় ভালো লাগে।"

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমারও এগুলো খুব জানার ইচ্ছে করে। একসময় এসে তোমার ক্রিস্টালগুলো দেখে যাব—"

"এসব জানার অনেক সময় পাবে রুহান। এখন গণিত, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এসব শেখ। চিকিৎসা বিজ্ঞান শেখ—যখন আমার মতো বুড়ো হবে তখন অন্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবে।"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "আমি বুড়ো হতে হতে যদি সব ক্রিস্টাল রিডার নষ্ট হয়ে যায়, তখন?"

বৃদ্ধ কুরু হাত দিয়ে নিজের বুক স্পর্শ করে বলল, "দোহাই তোমার! এন্ড্রোমিডার দোহাই, এরকম ভয়ঙ্কর কথা বোলো না। আমার ক্রিস্টাল রিডার নষ্ট হবার আগে যেন আমার মৃত্যু ঘটে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার মৃত্যু হলে তুমি বেঁচে যাবে। কিন্তু আমাদের কী হবে?"

বৃদ্ধ কুরু মাথা নেড়ে বলল, "এই মন খারাপ আলোচনা থাকুক রুহান। তার চাইতে বল তুমি কী খাবে? আমার কাছে খুব ভালো স্নায়ু উত্তেজক একটা পানীয় আছে।"

রুহান হেসে বলল, "আমার স্নায়ু এমনিতেই অনেক উত্তেজিত। স্নায়ু শীতল করার কোনো পানীয় থাকলে আমাকে দাও।"

বৃদ্ধ কুরু রান্নাঘরের শীতল কক্ষ থেকে একটা পানীয়ের বোতল বের করে দুটি স্বচ্ছ গ্লাসে সেটা ঢালতে ঢালতে বলল, "স্নায়ুকে শীতল করে লাভ নেই। জোয়ান বয়সের ছেলেমেয়ের স্নায়ু বুড়োদের মতো শীতল হবে কেন? তোমাদের স্নায়ুতে সব সময়েই থাকবে উত্তেজনা। একেবারে টান টান উত্তেজনা!"

রুহান তার গ্লাসটি হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিতেই সারা শরীরে একটা আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বুকের ভেতর চেপে থাকা দুর্ভাবনাগুলো কেটে মাথার ভেতরে ফুরফুরে এক ধরনের আনন্দ এসে ভর করে। সে জিব দিয়ে একটা শব্দ করে বলল, "চমৎকার পানীয় কুরু।"

"হ্যাঁ। খুব চমৎকার! এই পানীয় এমনি এমনি খেতে হয় না। চমৎকার একটা সঙ্গীত শুনতে শুনতে এটি খেতে হয়। প্রাচীন একটা সঙ্গীত।"

রুহান সোজা হয়ে বসে বলল, "শোনাবে কুরু?"

"কেন শোনাব না? তুমি হাট্টা কাট্টা জোয়ান একটা মানুষ, এই বুড়ো মানুষের ঘরে এসেছ, বুড়ো মানুষের প্রাচীন একটা সঙ্গীত তোমাকে তো শুনতেই হবে।"

বৃদ্ধ কুরু উঠে গিয়ে শেলফে রাখা ক্রিস্টাল রিডারের কাছে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় একটা নির্দেশ দিতেই ঘরের ভেতরে হালকা নীল আলোর একটা বিচ্ছুরণ হল এবং পরমুহূর্তে ঘরের কোনায় ত্রিমাত্রিক একটা কিশোরী মেয়েকে দেখা গেল। হলোগ্রাফিতে মেয়েটিকে একটি জীবন্ত রূপ দেওয়া হয়েছে, সেই রূপটি এত নিখুঁত যে দেখে মনে হয় মেয়েটিকে বুঝি স্পর্শ করা যাবে। কিশোরী মেয়েটি এদিক–সেদিক তাকিয়ে বৃদ্ধ কুরুর দিকে তাকিয়ে তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলে, "শরতের এই সন্ধেবেলায় তুমি কেমন আছ কুরু?"

মেয়েটি সত্যি নয়, এটি শুধুমাত্র একটি হলোগ্রাফিক ছবি, কিন্তু সেটি এত জীবন্ত যে তার সাথে সত্যিকারের মানুষের মতো কথা না বলে উপায় নেই। বৃদ্ধ কুরু তাই নরম গলায় বলল, "আমি ভালোই আছি মেয়ে। আমাকে একটা প্রাচীন গান শোনাতে পারবে?"

"প্রাচীন? কত প্রাচীন?"

এবারে রুহান উত্তর দিল। বলল, "প্রাচীন। অনেক প্রাচীন। মানুষ যখন যুদ্ধবিগ্রহ শুরু করে নি, একে অন্যকে মারা শুরু করে নি সেই সময়কার গান।"

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "সেরকম গান তো একটি দুটি নয়, অসংখ্য। তোমাকে আরো নির্দিষ্ট করে বলতে হবে।"

রুহান বলল, "ঠিক আছে, বলছি। সেই গানে নদী আর নদীর ঢেউয়ের কথা থাকতে হবে। আকাশ ভরা কালো মেঘের কথা থাকতে হবে। একটা মেয়ে আর একটা ছেলের ভালবাসার কথা থাকতে হবে। বিরহের কথা থাকতে হবে—"

"আরো কিছু?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। যে গান শুনে বুকের ভেতর হাহাকার করতে থাকবে সেরকম একটা গান।"

মেয়েটি মিষ্টি গলায় বলল, "চমৎকার! প্রাচীন সঙ্গীত–কলার সবুজ ক্রিস্টালটা ঢোকাতে হবে।"

কুরু শেলফের ডালা খুলে প্রাচীন সঙ্গীত–কলার সবুজ ক্রিস্টালটা ক্রিস্টাল রিডারে ঢুকিয়ে দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে হলোগ্রাফের কিশোরী মেয়েটি আবছা হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে আর প্রায় সাথে সাথে ঘরে বিষণ্ন একটা সুর বেজে ওঠে। বহুদূর থেকে কোনো একজন একাকী নারীর করুণ কণ্ঠ শোনা যায়। সেই কণ্ঠে একই সাথে ভালবাসা এবং বেদনা। আনন্দ এবং যন্ত্রণা। রুহান তার হাতের পানীয়ের গ্লাসটি হাতে নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল।

রুহান যখন বৃদ্ধ কুরুর বাসা থেকে বিদায় নিয়ে বের হয়ে এল তখন বেশ রাত। আকাশে একটা ভাঙা চাঁদ, চারদিকে তার নরম জ্যোৎস্নার আলো। ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে এবং মাঝে মাঝে দূর বনাঞ্চল থেকে রাতজাগা পশুর ডাক শোনা যাচ্ছে। রুহান হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করে শরতের শুরুতেই বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। জ্যাকেটের কলার একটু উপরে তুলে সে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। একটু আগে শুনে আসা প্রাচীন সঙ্গীতের রেশটুকু এখনো তার মাথার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। কী অপূর্ব আর মায়াময় সেই কণ্ঠস্বর, এখনো সেটি যেন তার বুকের ভেতর হাহাকারের মতো শূন্যতা তৈরি করে যাচ্ছে।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে রুহান হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, কাছাকাছি কোনো একটি বাসা থেকে একজন মানুষের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আর একটি মেয়ের কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। রুহান শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে যায়, ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর আর কান্নার শব্দটি আসছে কিসিমার বাসা থেকে। তাদের এলাকার সবচেয়ে সাদাসিধে সবচেয়ে শান্তশিষ্ট আর সবচেয়ে নিরীহ পরিবার হচ্ছে কিসিমাদের পরিবার। গাছপালায় ঢাকা তার ছোট বাসার সামনে কিছু মানুষের জটলা, রুহান গেট খুলে ভিতরে ঢুকে গ্রাউসকে দেখতে পায়। গ্রাউসের সামনে কিসিমা এবং তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে কিসিমার মেয়ে ত্রায়িনা। ত্রায়িনার চোখেমুখে আতঙ্ক, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

গ্রাউসের বয়স রুহান থেকে খুব বেশি নয় কিন্তু তাকে অনেক বেশি বয়স্ক দেখায়। সে লম্বা এবং চওড়া, তার পেশিবহুল শক্ত দেহ, সোনালি চুল এবং নীল চোখ। গ্রাউস সুদর্শন কিন্তু কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে তাকে দেখলে তার সুদর্শন চেহারাটুকু চোখে না পড়ে নিষ্ঠুর ভঙ্গিটুকু প্রথমে চোখে পড়ে।

রুহানকে ঢুকতে দেখে গ্রাউস ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এখানে কী করতে এসেছ?"

"আমি এদিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তোমাদের কথা শুনে এসেছি।"

"আমাদের কথা শুনে তোমার আসার কোনো প্রয়োজন নেই।" গ্রাউস চোখ লাল করে বলল, "তুমি যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে যাও।"

গ্রাউসের কথা শুনে রুহান একই সাথে এক ধরনের ক্রোধ এবং অপমান অনুভব করে। সে শীতল গলায় বলল, "এটি কিসিমাদের বাসা। আমি এখানে থাকব না চলে যাব সেটি বলবে কিসিমা—তুমি নয়।"

গ্রাউস হিংস্র পশুর মতো একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার বেশি সাহস হয়েছে, তাই না?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "না। আমার মোটেও সাহস বেশি হয় নি।" তারপর মাথা ঘুরিয়ে কিসিমার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে কিসিমা? ত্রায়িনা কাঁদছে কেন?"

কিসিমার মুখে এক ধরনের হতচকিত ভাব, দেখে মনে হয় একটা কিছু বুঝতে পারছে না। কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "গ্রাউস বলছে তার ত্রায়িনাকে দরকার।"

রুহান চমকে উঠে গ্রাউসের মুখের দিকে তাকাল। গ্রাউসের মুখটি হঠাৎ আরো কঠোর হয়ে যায়। গলা উঁচিয়ে বলল, "বলেছিই তো। বলেছি তো কী হয়েছে?"

রুহান তীক্ষ্ণ চোখে গ্রাউসের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা তুমি কী বলছ গ্রাউস?"

গ্রাউস হঠাৎ হাত দিয়ে রুহানের বুকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "তুমি কোথাকার মাস্তান, আমাকে উপদেশ দিতে এসেছ?"

রুহান পড়ে যেতে যেতে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে গ্রাউসের দিতে তাকাল। গ্রাউস হিংস্র মুখে বলল, "রুহান, তুমি আমার সাথে লাগতে এস না। তোমাকে আমি শেষ করে দেব।"

রুহান তীক্ষ্ণ চোখে গ্রাউসের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাউকে শেষ করে দেওয়া এত সহজ নয় গ্রাউস।"

গ্রাউস হিংস্র মুখে বলল, "তুমি দেখতে চাও?"

"না, আমি দেখতে চাই না। কিন্তু আমাদের গ্রামটি এখনো জঙ্গল হয়ে ওঠে নি যে যার যেটা ইচ্ছা সে সেটা করতে পারবে।"

গ্রাউস এবার শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "রুহান, তা হলে নূতন জীবনের জন্যে প্রস্তুত হও। তোমার প্রিয় গ্রামটাতে এখন নূতন পৃথিবীর নিয়ম আসতে যাচ্ছে।"

"তুমি কী বলতে চাইছ?"

"আমি বলতে চাইছি আমার যেটা ইচ্ছা আমি সেটা করব।"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "না। আমরা সবাই মিলে কিছু নিয়ম ঠিক করেছি—"

রুহানকে কথা শেষ করতে না দিয়ে গ্রাউস বলল, "ঐ সব মান্ধাতা আমলের নিয়মের দিন শেষ। নূতন পৃথিবীতে এখন নূতন নিয়ম।"

"সেই নিয়মটা কী?"

"যার ক্ষমতা আছে তার ইচ্ছাটাই হচ্ছে নিয়ম।"

রুহান এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে গ্রাউসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সত্যি সত্যি কেউ এরকম একটি কথা বলতে পারে সে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করত না। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে গ্রাউসের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার ক্ষমতা আছে?"

"আছে।"

"তোমার ইচ্ছাটি তা হলে নিয়ম?"

"হ্যাঁ।"

রুহান একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "এখন তোমার ইচ্ছে কিসিমার ছোট মেয়ে ত্রায়িনাকে তুলে নিয়ে যাবে?"

গ্রাউস মুখে একটা অশালীন ভঙ্গি করে বলল, "সে মোটেই ছোট মেয়ে নয়। সে যথেষ্ট বড় হয়েছে।"

"বেশ।" রুহান হঠাৎ করে নিজের ভেতরে এক ধরনের অদম্য ক্রোধ অনুভব করে। সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "দেখি তা হলে তুমি কেমন করে ত্রায়িনাকে তুলে

নিয়ে যাও।" রুহান দুই পা এগিয়ে এসে কিসিমা আর ত্রায়িনার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "এস।"

গ্রাউস কয়েক মুহূর্ত স্থির চোখে রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল, "কাজটা ভালো করলে না রুহান।"

রুহান কোনো কথা না বলে স্থির চোখে গ্রাউসের দিকে তাকিয়ে রইল। গ্রাউস হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে চলে যেতে শুরু করে, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ঘুরে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "এর জন্য তোমাকে মূল্য দিতে হবে রুহান।"

রুহান নিচু গলায় বলল, "দেব।"

"অনেক মূল্য।"

"দেব।"

গ্রাউস চলে যাবার পর রুহান মাথা ঘুরিয়ে কিসিমা আর তার মেয়ে ত্রায়িনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা ভেতরে যাও, অনেক রাত হয়েছে।"

কিসিমা ভাঙা গলায় বলল, "তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব রুহান—"

"এখানে ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই।"

ত্রায়িনা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "যদি আবার আসে?"

"আসবে না। তোমরা ভালো করে দরজা বন্ধ করে রেখ। আমি ভোরবেলা সবার সাথে কথা বলব। ভয় পাবার কিছু নেই।"

ত্রায়িনা বড় বড় চোখে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। সত্যি—" কথা বলতে গিয়ে রুহানের গলা কেঁপে উঠল, কারণ সে জানে কথাটি আসলে সত্যি নয়। নূতন পৃথিবীতে সবকিছু পাল্টে গেছে, এখন কোথাও কোনো নিয়ম নেই। এখানে যার শক্তি বেশি, যার ক্ষমতা বেশি তার ইচ্ছেটাই হচ্ছে নিয়ম। ঠিক গ্রাউস যেভাবে বলেছে।

AMARBOI.COM

খাবার টেবিলে মা বলল, "রুহান এত রাত করে ফিরেছিস! দিনকাল ভালো না জানিস না?"

রুহান প্লেটের শুকনো রুটিটা পাতলা সুপে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, "কেন মা? দিনকাল নূতন করে আবার খারাপ হল কেন?"

"দেখছিস না কী হচ্ছে? যার যা খুশি সেটা করা শুরু করেছে।"

মা কী নিয়ে কথা বলছে রুহান সেটা ভালো করে জানে। পৃথিবীর এক এলাকার সাথে এখন অন্য এলাকার কোনো যোগাযোগ নেই, প্রত্যেকটা এলাকা এখন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কোনোভাবে টিকে আছে। কোথাও কোথাও পরিবেশ একেবারে নারকীয়—কোথাও কোথাও সবাই মিলে এখনো মোটামুটি শান্তিতে বেঁচে আছে।

রুহানদের এলাকাটা এতদিন বেশ ভালোই ছিল, বেঁচে থাকার জন্যে কিছু নিয়ম তৈরি করে সবাই দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু সেটা আর থাকবে বলে মনে হয় না। একটু আগে সে নিজেই কিসিমার বাসায় গ্রাউসের কাজকর্ম দেখে এসেছে। তবুও সে কিছু না জানার ভান করে জিজ্ঞেস করল, "নূতন কিছু হয়েছে নাকি?"

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "হয় নি আবার। প্রত্যেক দিনই কিছু একটা হচ্ছে। এই তো সেদিন কয়জন এসে তিয়াশার বাসার একটা সোলার প্যানেল খুলে নিয়ে গেছে।"

রুহান এটার কথাও জানে, তারপরেও না জানার ভান করে বলল, "তাই নাকি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ।" মা গলা নামিয়ে বলল, "কিসিমার মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যাবে বলে গ্রাউস কয়দিন থেকে হুমকি দিচ্ছে শুনেছিস?"

রুহান একটু আগেই সেটা নিজের চোখে দেখে এসেছে, শেষ মুহূর্তে গ্রাউস পিছিয়ে না গেলে কিছু একটা হয়ে যেতে পারত কিন্তু মাকে সেটা বলার ইচ্ছে করল না।

মা আড়চোখে তার ছোট দুটি মেয়ে নুবা আর ত্রিনার দিকে তাকাল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "এই দুজন যখন বড় হবে তখন যে কী হবে!"

রুহান তার ছোট দুই বোনের দিকে তাকাল। সে তার মায়ের সাথে কী নিয়ে কথা বলছে সেটা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। এই মুহূর্তে ক্রিস্টাল রিডারে নূতন একটা ক্রিস্টাল ঢুকিয়ে বিচিত্র একটা সঙ্গীতের মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করছে। এই বয়সের ছেলেমেয়ের নিজেদের একটা জগৎ আছে, তার বাইরে যারা থাকে তারা সেই জগৎটার কিছুই বুঝতে পারে না।

মা নুবা আর ত্রিনার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হল? তোরা খাবার টেবিলে বসে কী শুরু করেছিস? খাচ্ছিস না কেন?"

নুবা ঠোঁট উল্টে বলল, "তোমার এই শুকনো রুটি আর জ্যালজেলে সুপ দুই মিনিট পরে খেলে কিছু ক্ষতি হবে না।"

মা একটু আহত গলায় বলল, "এটাই যে পাচ্ছিস তার জন্যেই খুশি থাক। সামনে কী দিন আসছে কে জানে?"

ক্রিস্টাল রিডার থেকে একটা বিদঘুটে শব্দ বের হয়ে এল। সাথে সাথে দুই বোন হেসে কুটি কুটি হয়ে যায়। মা ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, "কী হচ্ছে? এই বিদঘুটে শব্দের মাঝে তোরা হাসির কী পেলি?"

ত্রিনা মুখ গম্ভীর করে বলল, "তুমি বিদঘুটে কী বলছ মা? এটা নূতন ধরনের সঙ্গীত। এটা যে তৈরি করেছে তার চেহারা দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। সবুজ রঙের চুল, গোলাপি—"

"ব্যস! অনেক হয়েছে।" মা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "যে মানুষের চুল সবুজ, তাকে নিয়ে আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।"

নুবা বলল, "কী বলছ মা? ক্রোমোজোমের একটা জিনকে পাল্টে দিলেই চুল সবুজ হয়ে যায়। আমার যদি একটা ছোট জিনেটিক ল্যাব থাকত—"

"থাক। এমনিতেই পারি না, এখন আবার জিনেটিক ল্যাব।"

নুবা তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "রুহান, একটা জিনেটিক ল্যাব তৈরি করতে কত ইউনিট লাগবে?"

রুহান লাল রঙের পানীয়টা এক ঢোক খেয়ে বলল, "সেটা তো জানি না! এখন তো আর ইউনিটেরও কোনো মূল্য নেই। পৃথিবীতে যখন নেটওয়ার্ক ছিল তখন সবকিছু করা যেত। এখন তো কিছু করারও উপায় নেই।"

ত্রিনা মাথা নেড়ে বলল, "পৃথিবীটা কেন এরকম হয়ে গেল রুহান?"

রুহান একটু মাথা নেড়ে বলল, "সেটাই যদি জানতাম তা হলে তো কাজই হত!"

ত্রিনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে, বার বছরের ছোট কচি একটা মুখের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান একটা বিষণ্ণতা সেখানে এসে ভর করে। বলে, "সবাই মিলে পৃথিবীকে কেন আগের মতো করে ফেলে না?"

এই প্রশ্নটির উত্তর রুহানের জানা নেই। সে নিঃশব্দে খাবার টেবিলে বসে রইল।

AMARBOI.COM

২

ঘুম থেকে উঠে কী হচ্ছে বুঝতে রুহানের একটু সময় লাগল। লাথি দিয়ে দরজা খুলে তার ঘরে কয়েকজন ঢুকে গেছে। কিছু বোঝার আগেই একজন রুহানকে টেনে বিছানা থেকে তুলে নেয়, তারপর ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়। আবছা আলোয় মানুষগুলোর চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় না, শুধু নিষ্ঠুরতার ছাপটুকু বোঝা যায়। তারা আলগোছে লেজার গাইডেড স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো ধরে রেখেছে, বুকের উপর গুলির বেল্ট, মাথায় রঙিন রুমাল বাঁধা। পিঠে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঠেকিয়ে যে মানুষটি রুহানকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে সে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কারা? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

মানুষটি রুহানকে ধাক্কা দিয়ে একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে বলল, "এত খবরে তোমার দরকার কী?"

রুহান হলঘরে এসে দেখল তার মা নুবা আর ত্রিনাকে দুই হাতে শক্ত করে ধরে রেখে ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের চোখেমুখে অবর্ণনীয় আতঙ্ক, নুবা ত্রিনার মুখে বিস্ময়। রুহানকে ঠেলে নিয়ে আসতে দেখে মা কাতর গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমার ছেলে কী করেছে? তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

মানুষগুলো তার কথার কোনো উত্তর দিল না। তখন মা ছুটে এসে একজনের হাত ধরে বলল, "কী হল? তোমরা কথা বলছ না কেন? কী করেছে আমার ছেলে?"

মানুষটি ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, "তোমার ছেলে কিছু করে নাই।"

"তা হলে তাকে কেন ধরে নিয়ে যাচ্ছ?"

"এই সময়ে কিছু না করাটাই অপরাধ।"

কমবয়সী হালকা পাতলা একটা মানুষ হা হা করে হেসে উঠল, যেন খুব মজার একটা কথা শুনতে পেয়েছে। হাসতে হাসতেই বলল, "ঠিকই বলেছ। সারা দুনিয়াতে মারামারি হচ্ছে আর জোয়ান একটা ছেলে কিছু না করে ঘরে বসে থাকবে মানে?"

মা পিছু পিছু এসে বলল, "কিন্তু আমার ছেলে তো কখনো মারামারি করে নি। কখনো কোনো অন্যায় করে নি—"

হালকা পাতলা মানুষটা বলল, "আমরাই কি আগে করেছি নাকি? শিখে নিয়েছি। তোমার ছেলেও শিখে নেবে। যুদ্ধ করার জন্যে যৌবন কাল হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সময়।"

মা মানুষটার হাত ধরে বলল, "দোহাই লাগে তোমাদের। আমার ছেলেকে তোমরা ছেড়ে দাও। তোমাদের পায়ে পড়ি—"

মানুষটি ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার মাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। ধাক্কা সামলাতে গিয়ে মা পড়ে যেতে যেতে কোনোভাবে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নেয়। নুবা আর ত্রিনা ছুটে এসে তাদের মাকে দুই পাশ থেকে জাপটে ধরে ভয় পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

রুহান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তাকে ধাক্কা মেরে বাসার বাইরে নিয়ে এল। রাস্তায় বড় বড় কয়েকটা লরি হেডলাইট জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লরির ইঞ্জিনগুলো ঘরঘর শব্দ করছে। গ্রামের চারপাশে ভয়ঙ্কর ধরনের কিছু মানুষ স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হেডলাইটের তীব্র আলোতে এই মানুষগুলোকে কেমন যেন অস্বাভাবিক হিংস্র দেখায়। রুহান দেখতে পেল গ্রামে তার বয়সী যত যুবক সবাইকে ধরে নিয়ে আসা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে, ভীত মুখে তারা দাঁড়িয়ে আছে। বেশিরভাগই ঘুমের পোশাকে, চুল উসকোখুসকো, চোখেমুখে হতচকিত বিভ্রান্তির ছাপ স্পষ্ট। রুহান গ্রাউসকেও দেখতে পেল; তাকেও একজন ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে আসছে।

মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ আলগোছে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ধরে রেখে তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়। তার মাথায় একটা রঙিন রুমাল বাঁধা, পরনে জলপাই রঙের সামরিক পোশাক। বুকের উপর গুলির বেল্ট এবং কোমর থেকে যোগাযোগ মডিউল ঝুলছে। তার হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল, সেটি হাতে নিয়ে সে চিৎকার করে বলল, "সবাই এক লাইনে দাঁড়াও।"

ঠিক কীভাবে সবাই হঠাৎ করে এক লাইনে দাঁড়াবে, লাইনটি কি সামনে পিছনে হবে না পাশাপাশি হবে সেটা নিয়ে সবার ভেতরে এক ধরনের হুটোপুটি শুরু হয়ে যায়। মধ্যবয়স্ক মানুষটা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনের মুখে আঘাত মেরে চিৎকার করে বলল, "ইঁদুরের বাচ্চার মতো ছোটাছুটি করছ কেন? পাশাপাশি দাঁড়াও সব নর্দমার পোকা।"

রুহান এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে, সে অপমান কিংবা ক্রোধ অনুভব করে না, তার ভেতরে ভয় বা আতঙ্কও নেই। সত্যি কথা বলতে কী হঠাৎ করে তার বিস্মিত হবার ক্ষমতাটুকুও চলে গেছে। সে একটা অবিশ্বাস্য ঘোরের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে, তার চারপাশে কী ঘটছে সে যেন ঠিক বুঝতেও পারে না। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং দেখল তার দুপাশে সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিষ্ঠুর চেহারার মধ্যবয়স্ক মানুষটি মশালের আলোতে খুব কাছে থেকে তাদের একজন একজন করে পরীক্ষা করল। যাদেরকে দুর্বল বা রুগ্ণ মনে হল তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, "যাও, নোংরা আবর্জনা, ছারপোকার বাচ্চারা—ভাগ এখান থেকে।"

রুহানের সামনে মানুষটা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ রক্তাভ এবং শরীর থেকে এক ধরনের কটু গন্ধ বের হয়ে আসছে। রুহানের মনে হল মানুষটা একটা কিছু বলবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু না বলে হেঁটে সামনে এগিয়ে গেল।

সবাইকে একনজর দেখে মানুষটা আবার সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "হতভাগা জানোয়ারের বাচ্চারা, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত, বিষ্ঠার সাগরে তোমাদের ডুবে মরা উচিত। ছারপোকার বাচ্চাদের মতো তোমাদের টিপে টিপে মারা উচিত। একেকজন এরকম দামড়া জোয়ান হয়ে তোমরা ঘরে বসে আছ, তোমাদের লজ্জা করে না?"

মানুষটি সবার দিকে তাকাল, কেউ কোনো উত্তর দিল না।

"কথা বলছ না কেন, আহাম্মকের বাচ্চারা?"

এবারেও কেউ কোনো কথা বলল না। মধ্যবয়স্ক মানুষটা মাটিতে থুতু ফেলে বলল, "এই জঙ্গলের মাঝে থাক, দুনিয়ার কোনো খোঁজখবর রাখ না। তোমরা কি জান সারা পৃথিবীতে এখন কী হচ্ছে?" মানুষটা সবার দিকে একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলল, "জান না! আমি জানতাম তোমরা জানবে না। সারা দুনিয়ায় এখন যুদ্ধ হচ্ছে। সবার সাথে সবার যুদ্ধ। যার গায়ে জোর আছে, যার শক্তি আছে সে টিকে থাকবে। যার জোর নাই, শক্তি নাই সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন তোমরা বল, তোমরা কি টিকে থাকতে চাও নাকি ধ্বংস হতে চাও?"

কেউ কোনো কথা বলল না। মানুষটা তখন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা বাঁকিয়ে বলল, "কেউ কথা বল না কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় পেয়ে কয়েকজন বিড়বিড় করে বলল, "টিকে থাকতে চাই।"

"চমৎকার!" মানুষটা তার নোংরা দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমরা তোমাদের টিকে থাকার একটা সুযোগ করে দেব। এই নূতন পৃথিবীতে নূতন নিয়ম। যার জোর আছে, ক্ষমতা আছে সে যেটা বলবে সেটাই হবে নিয়ম। যার জোর নাই সে মাথা নিচু করে সেই নিয়ম মানবে। বুঝেছ?"

রুহান একটু অবাক হয়ে মধ্যবয়স্ক মানুষটির দিকে তাকাল। গ্রাউস যে কথাগুলো বলেছিল এই মানুষটি ঠিক সেই কথাগুলোই বলছে। তা হলে কি নূতন পৃথিবীতে এইটাই নিয়ম? যার ক্ষমতা আছে সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে? পৃথিবীতে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু থাকবে না? সত্যি-মিথ্যা বলে কিছু থাকবে না? যার ক্ষমতা আছে সে যত বড় দানবই হোক, তার ইচ্ছেটাই হবে সব?

ঠিক তখন কে যেন কিছু একটা বলল, মধ্যবয়স্ক মানুষটা সেদিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে মাথা উঁচু করে বলল, "কে কথা বলে?"

রুহান এবারে শুনল গ্রাউস বলছে, "আমি। আমি কথা বলছি।"

"তুমি কী বলতে চাও ছেলে?"

গ্রাউস উত্তেজিত গলায় বলল, "তুমি যেটা বলছ আমিও সেটা বলি। আমাদের গ্রামে আমি সেটা শুরু করেছি।"

"তুমি শুরু করেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কী শুরু করেছ?"

"এই গ্রামে আমার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, আমি তাই সবাইকে বলেছি আমার ইচ্ছাটাই নিয়ম। আমি যা খুশি তা করতে পারি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। তুমি ওদের জিজ্ঞেস করে দেখ—সবাই এখন আমাকে ভয় পায়।"

AMARBOI.COM

মধ্যবয়স্ক মানুষটার মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল। মাথা নেড়ে বলল, "তুমি সামনে এস।"

গ্রাউস তখন সামনে এগিয়ে গেল। মধ্যবয়স্ক মানুষটা মশালের আলোতে গ্রাউসকে ভালো করে দেখে তারপর অন্য সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা আসলেই একে ভয় পাও?"

কয়েকজন বিড়বিড় করে অস্পষ্ট গলায় কিছু একটা বলল, তার উত্তর হ্যাঁ কিংবা না দুটোই হতে পারে।

গ্রাউস গলায় একটু উত্তেজনা এনে বলল, "আমার সোলার প্যানেলটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি একজনের বাসা থেকে সেটা খুলে এনেছি। কেউ কিছু বলতে সাহস পায় নি। সেদিন কমবয়েসী একটা মেয়েকেও তুলে আনতে গিয়েছিলাম—"

"চমৎকার!" মধ্যবয়স্ক মানুষটার মুখে হাসি আরো বিস্তৃত হয়, "পৃথিবীর নূতন নিয়মটা তুমি তোমার গ্রামে চালু করে দিয়েছ, জোর যার ক্ষমতা তার?"

গ্রাউসের মুখে বাঁকা একটা হাসি ফুটে ওঠে, সে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে গ্রাউসের দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর হঠাৎ করে হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা তুলে গ্রাউসের মাথায় ধরে বলল, "দেখি তোমার কতটুকু ক্ষমতা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তে গ্রাউসের মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সে বিস্ফারিত চোখে মধ্যবয়স্ক নিষ্ঠুর মানুষটার মুখের দিকে তাকাল। খুব বড় একটা রসিকতা হচ্ছে এরকম একটা ভান করে নিষ্ঠুর চেহারার মধ্যবয়সী মানুষটা ট্রিগার টেনে ধরে। কর্কশ কান ফাটানো একটা শব্দ হল, রুহান শিউরে উঠে দেখল গ্রাউসের দেহটা একটু লাফিয়ে উঠে নিচে পড়ে যায়। রুহানের মনে হল সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মধ্যবয়স্ক মানুষটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা আবার আলগোছে ধরে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আর কেউ আছে নাকি?"

কেউ কোনো কথা বলল না। মধ্যবয়স্ক মানুষটা বলল, "কী শিখলে তোমরা এই ঘটনা থেকে?"

এবারেও কেউ কোনো কথা বলল না। মানুষটা সহৃদয় ভঙ্গিতে হেসে বলল, "আসলে তোমরা নূতন কিছু শেখ নাই। আমি যেটা বলেছি সেটা শুধু তোমাদের হাতে-কলমে দেখালাম, এর বেশি কিছু নয়। আমার হাতে অস্ত্র তাই আমার কাছে ক্ষমতা। আমি যাকে ইচ্ছা খুন করতে পারি। পৃথিবীর কেউ কিছু করতে পারবে না।" মধ্যবয়স্ক মানুষটা পা দিয়ে গ্রাউসকে দেখিয়ে বলল, "এই আহাম্মকটা দাবি করছিল তার অনেক ক্ষমতা! আসলে তার কোনো ক্ষমতাই ছিল না। খালি হাতে ক্ষমতা হয় না! ক্ষমতার জন্যে দরকার অস্ত্র। বুঝেছ?"

দুই-একজন দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল। মানুষটা হাতের মশালটা একটু উপরে তুলে বলল, "তোমাদের সবার হাতে আমি অস্ত্র দেব। আমি দেখব তোমাদের কয়জন সেই অস্ত্রের মর্যাদা রাখতে পারে।"

রুহান নিঃশব্দে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার এখনো বিশ্বাস হতে চায় না যে তার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে সত্যিই একজন মানুষ! তার যে কথাগুলো সে শুনছে, সত্যিই একজন মানুষ সেগুলো বলছে।

মানুষটি এবার আস্তে আস্তে হেঁটে তাদের দিকে এগিয়ে এল। কাছাকাছি এসে নিচু গলায় বলল, "তোমরা সবাই এখন এই লরিগুলোর পিছনে গিয়ে ওঠ। আমি ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।"

সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একজন ভাঙা গলায় বলল, "আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?"

মানুষটি শীতল গলায় বলল, "আমি কি তোমাদের বলেছি যে তোমরা আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে? বলেছি?"

কেউ কোনো কথা বলল না। মানুষটি এবারে হুংকার দিয়ে বলল, "সবাই লরিতে ওঠ। যে পিছনে পড়ে থাকবে সে পিছনেই পড়ে থাকবে। অকর্মা বেজন্মা আহাম্মকদের এই পৃথিবীতে কোনো জায়গা নেই।"

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সশস্ত্র মানুষগুলো হঠাৎ করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রগুলো তুলে ইতস্তত গুলি করতে থাকে। প্রচণ্ড গুলির শব্দে তাদের কানে তালা লেগে যায়। তার মাঝে ভয়ে আতঙ্কে অধীর হয়ে সবাই ছোটাছুটি করে লরিতে উঠতে থাকে। প্রায় সাথে সাথেই লরিগুলোর ইঞ্জিন গর্জন করে পাথুরে পথের উপর দিয়ে ছুটে যেতে শুরু করে। হ্রদের পাশ দিয়ে যাবার সময় রুহান তাদের ছোট বাসাটা দেখতে পেল। বাসার দরজায় মূর্তির মতো তার মা ছোট বোন দুটিকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হল না, রুহান জানে না আর কোনো দিন তাদের সাথে দেখা হবে কি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লরির পিছনে পা ঝুলিয়ে চারজন সশস্ত্র মানুষ বসে আছে। একটু আগেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে গুলি করে তারা একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছিল। লরি চলতে শুরু করার সাথে সাথে তারা বেশ সহজ ব্যবহার করতে শুরু করল। একজন বেসুরো গলায় গান গাওয়ার চেষ্টা করে, অন্যেরা সেটা নিয়ে হাসি তামাশা করে।

রুহানের পাশে তাদের গ্রামের সবচেয়ে নিরীহ ছেলে কিলি বসেছিল, অন্ধকারে দেখা যায় না কিন্তু রুহান মোটামুটি নিশ্চিত, সে বসে বসে কাঁদছে। একসময় ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে রুহান।"

রুহান বলল, "আমি জানি না।"

"তোমার কী মনে হয় রুহান, আমাদের কি মেরে ফেলবে?"

"কেন? শুধু শুধু মেরে ফেলবে কেন?"

"গ্রাউসকে যে মেরে ফেলল।"

"গ্রাউসকে মেরেছে কারণ সে ছিল আহাম্মক। তুমি আর আমি কি আহাম্মক?"

কিলি মাথা নেড়ে বলল, "না। আমরা আহাম্মক না। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমার খুব ভয় করছে।"

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যখন ভয় পাবার কথা তখন ভয় পেতে হয়। যারা কখনো ভয় পায় না তারা স্বাভাবিক না।"

কিলি বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে লরিগুলো সারি বেঁধে ছুটে চলেছে। চাঁদ ডুবে গিয়ে বাইরে অন্ধকার। শরতের শেষ রাতের হিমেল বাতাসে রুহান একটু শিউরে উঠল, এভাবে ধরে নিয়ে যাবে জানলে সে নিশ্চয়ই একটা গরম জ্যাকেট পরে আসত।

কিলি আবার গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "রুহান।"

"বল।"

"ওরা আমাদের নিয়ে কী করবে বলে তোমার মনে হয়?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "জানি না।"

"আমাদের অস্ত্র চালানো শেখাবে, যুদ্ধ করতে শেখাবে এটা কি তোমার সত্যি মনে হয়।"

"হতেও পারে। পৃথিবীতে এখন খুব খারাপ সময়। সব জায়গায় যুদ্ধ হচ্ছে। পৃথিবীতে যুদ্ধ করার মানুষের খুব অভাব।"

কিলি একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার খুব অস্থির লাগছে রুহান।"

রুহান কিলির ঘাড়ে হাত রেখে বলল, "ধৈর্য ধর কিলি, দেখবে একসময় সব ঠিক হয়ে যাবে।"

ঠিক এরকম সময়ে হঠাৎ করে চারদিক থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। পা ঝুলিয়ে বসে থাকা চারজন অস্ত্র তাক করে উবু হয়ে বসে গেল। একজন চাপা গলায় বলল, "সবাই মেঝেতে মাথা নিচু করে শুয়ে থাক। উঠবে না। খবরদার।"

রুহান অন্য সবার সাথে মাথা নিচু করে মেঝেতে শুয়ে থাকে। শুনতে পায় তাদের মাথার উপর দিয়ে শিস দেবার মতো শব্দ করে গুলি ছুটে যাচ্ছে। লরিতে বসে থাকা চারজন সশস্ত্র মানুষ ছাড়া ছাড়া ভাবে গুলি করছে, তার শব্দে তাদের কানে তালা লেগে যাবার মতো অবস্থা।

যেভাবে গুলি শুরু হয়েছিল ঠিক সেভাবেই হঠাৎ করে গুলি থেমে গেল। সশস্ত্র মানুষগুলো আবার পা ঝুলিয়ে বসে হালকা গলায় কথা বলতে শুরু করে। তাদের দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনেই হয় না একটু আগে সবাই এত ভয়ঙ্কর গোলাগুলির ভেতর দিয়ে এসেছে। আর সেই ভয়ঙ্কর গোলাগুলিতে যে কেউ মারা পড়তে পারত।

রুহান একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "শোনো। তোমাদের সাথে আমি একটু কথা বলতে পারি?"

একজন মাথা ঘুরিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা শক্ত করে ধরে রেখে বলল, "কী কথা?"

"সাধারণ কথা।"

মানুষটি কঠিন গলায় বলল, "তোমরা ভেতরে এতজন আছ, নিজেদের ভেতরে কথা বল। আমাদের সাথে কেন কথা বলতে চাইছ?"

রুহান বলল, "ভেতরে যারা আছে এখন তাদের কারো কথা বলার আগ্রহ নেই।"

সে খুব একটা মজার কথা বলেছে সেরকম ভাব করে মানুষটা শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, "কেন? কথা বলার আগ্রহ নেই কেন?"

"তোমাদের যদি কেউ মাঝরাতে ঘর থেকে ধরে নিয়ে যেত তা হলে তোমাদেরও কথা বলার কোনো আগ্রহ থাকত না।"

পা ঝুলিয়ে বসে থাকা অন্য একজন বলল, "এই! এ তো কথাটা মিথ্যা বলে নাই। মনে আছে আমাদের যেদিন ধরে এনেছিল, তখন আমরা কী ভয় পেয়েছিলাম?"

রুহান জিজ্ঞেস করল, "তোমাদেরকেও ধরে এনেছিল!"

"ধরে না আনলে কেউ নিজ থেকে আসবে নাকি?"

"কেন ধরে এনেছিল?"

মানুষটা হাত দিয়ে পুরো বিষয়টা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "দুদিন পরে তো নিজেরাই দেখবে। এখন এত কৌতূহল কেন?"

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কৌতূহল খুব একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।"

মানুষটা মাথা নাড়ল, চলন্ত লরি থেকে পিচিক করে নিচে একটু থুতু ফেলে বলল, "ব্যবসা।"

রুহান বলল, "ব্যবসা?"

"হ্যাঁ। ব্যবসা।"

"কিসের ব্যবসা?"

"মানুষের। তোমাদের ধরে এনেছি বিক্রি করার জন্যে।"

"বিক্রি করার জন্যে?"

"হ্যাঁ।"

রুহান নিঃশ্বাস আটকে রেখে বলল, "কার কাছে বিক্রি করবে?"

"যে ভালো দাম দেবে তার কাছে।"

রুহান এখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "যারা ভালো দাম দেবে তাদের কাছে বিক্রি করে দেবে?"

"হ্যাঁ। অনেক বড় বড় পার্টি আছে। এখন সবচেয়ে বড় যে পার্টি তার নাম ক্রিভন।"

"ক্রিভন?"

"হ্যাঁ। সে এখন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। রাতকে দিন করতে পারে দিনকে রাত।"

"তারা আমাদের নিয়ে কী করবে?"

"যুদ্ধ করার জন্যে অনেক মানুষের দরকার। ভালো যোদ্ধা পাওয়া খুব সোজা কথা না।"

পা ঝুলিয়ে বসে থাকা অন্য একজন বলল, "সবাইকে তো আর যুদ্ধ করার জন্যে কেনে না, অন্য কাজেও কেনে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অন্য কী কাজে কেনে?"

"যদি কারো ভালো বুদ্ধি–শুদ্ধি থাকে তা হলে তার মগজটা ব্যবহার করা হয়। মাথার মাঝে ফুটো করে ইলেকট্রড ঢুকিয়ে দেয়। বাইরে থেকে ইমপালস পাঠিয়ে হিসেবনিকেশ করে। তাদেরকে বলে সক্রেটিস।"

রুহান নিজের অজান্তে কেমন যেন শিউরে উঠল, সশস্ত্র মানুষটি সেটা লক্ষ করল না। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, "ক্লোন করার মেশিন তো আজকাল আর পাওয়া যায় না। তাই অনেক সময় হৃৎপিণ্ড, কিডনি, ফুসফুস এইগুলোর জন্যেও বিক্রি হয়। ভালো একজোড়া কিডনির অনেক দাম।"

প্রথম মানুষটি বলল, "সবচেয়ে বেশি দামে কী বিক্রি হয় জান?"

"কী?"

"খেলোয়াড়।"

রুহান অবাক হয়ে বলল, "খেলোয়াড়?"

"হ্যাঁ। একটা খেলোয়াড় মগজে ইলেকট্রড লাগানো সক্রেটিস থেকেও একশ দুইশ গুণ বেশি দামে বিক্রি হয়।"

"কীসের খেলোয়াড়?"

মানুষটি হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা শেষ করে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "সবকিছু আগেই জেনে ফেললে হবে কেমন করে? সময় হলে জানবে।"

দ্বিতীয়জন বলল, "এখন তোমরা ঘুমাও। অনেক দূর যেতে হবে।"

প্রথমজন বলল, "এত দামি কারগো নিচ্ছি রাস্তাঘাটে অনেক হামলা হবে। গোলাগুলি শুরু হলেই তোমরা মেঝেতে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকবে। বুঝেছ?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি।"

রুহান তার নিজের জায়গায় ফিরে আসে। পা ছড়িয়ে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মা আর দুই বোন নুলা আর ত্রিনা এখন কী করছে কে জানে। সে কি আর কোনো দিন তাদের কাছে ফিরে যেতে পারবে?

পাহাড়ি একটা পথ দিয়ে গর্জন করে লরিগুলো ছুটে যাচ্ছে। বাইরে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কত রকম অজানা বিপদ গুড়ি মেরে আছে। রুহান জানে আজ রাতে তার চোখে ঘুম আসবে না।

কিন্তু নিজেকে অবাক করে দিয়ে সে একসময় ঘুমে ঢলে পড়ল।

৩

ঘরঘর শব্দ করে লরির পিছনের দরজাটা খুলে গেল, চোখে রোদ পড়তেই রুহান ধড়মড় করে জেগে ওঠে। একজন মানুষ তার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে বলল, "নামো সবাই। কোনো সময় নষ্ট করবে না—তা হলে কপালে দুঃখ আছে।"

কপালে কী ধরনের দুঃখ থাকতে পারে সেটা নিয়ে কেউ কৌতূহল দেখাল না, সবাই হুটোপুটি করে নামতে শুরু করল। চারপাশে কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা বড় একটা জায়গা, ছাড়া ছাড়াভাবে সেখানে কয়েকটা বড় গাছ, গাছে ধুলায় ধূসর বিবর্ণ পাতা। একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে কংক্রিটের একটা দালান। মাঝামাঝি একটা বড় লোহার দরজা, এ ছাড়া আর কোনো দরজা–জানলা নেই। এরকম কুৎসিত এবং মনখারাপ করা কোনো দালান রুহান আগে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে মানুষগুলো সবাইকে ঘিরে রেখে এগিয়ে নিয়ে যায়। কুৎসিত দালানের সামনে পৌঁছতেই লোহার ভারী দরজাটা ঘরঘর শব্দ করে খুলে গেল। কেউ বলে দেয় নি কিন্তু সবাই বুঝে গেল তাদের এখন ভেতরে ঢুকতে হবে। রুহান ভেতরে পা দেবার আগে একবার পিছন ফিরে তাকাল। তার কেন জানি মনে হল একবার ভেতরে ঢুকে গেলে তার জীবনটা একেবারেই পাল্টে যাবে। সেই জীবন থেকে আর কখনোই সে ফিরে আসতে পারবে না।

লম্বা একটা করিডোর ধরে তারা এগিয়ে যায়। মাঝখানে একটা বড় হলঘরের মতো, সেখানে উঁচু ছাদ থেকে হলদে এক ধরনের আলো ঝুলছে। কংক্রিটের ধূসর দেয়াল, পাথরের অমসৃণ মেঝে। হলঘরের মাঝামাঝি কঠোর চেহারার একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা ঝাঁকিয়ে সে বলল, "তোমাদের এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হল প্রস্তুত হবার জন্যে। এর মাঝে তোমরা তোমাদের নোংরা পোশাক খুলে গরম পানি দিয়ে গোসল কর। টেবিলে গরম সুপ, মাংসের স্টু আর রুটি রাখা আছে—ঝটপট কিছু খেয়ে নাও। তারপর একাডেমির পোশাক পরে বের হয়ে এস।"

কোথায় বের হয়ে আসবে, তারপর কী করবে এ ধরনের খুঁটিনাটি জিনিস জানার এক ধরনের কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু রুহান কিছু জিজ্ঞেস করার আগ্রহ পেল না। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে কঠোর চেহারার মানুষটা হলঘরের পিছনের দিকে একটা দরজা দেখিয়ে দেয় এবং সাথে সাথে সবাই হুটোপুটি করে সেদিকে ছুটে যেতে শুরু করে।

দরজার কাছাকাছি একজন রুহানের কনুই খামচে ধরল। রুহান মাথা ঘুরিয়ে কিলিকে দেখতে পায়। কিলি ফ্যাকাসে মুখে বলল, "রুহান।"

"কী হয়েছে।"

"এখন আমাদের কী করবে বলে তোমার মনে হয়?"

"কেমন করে বলি!"

"আমাদের কি মেরে ফেলবে বলে মনে হয়?"

রুহান হেসে বলল, "যদি আমাদের মেরেই ফেলবে, তা হলে এত কষ্ট করে ধরে এনেছে কেন?"

"হয়তো আমাদের কিডনি, ফুসফুস, লিভার এগুলো কেটেকুটে নেবে।"

"যদি নিতে চায় নেবে, তার জন্যে আগে থেকে দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। সময় হলে দেখা যাবে। এখন যেটা করতে বলেছে সেটা কর। গোসল কর, নূতন পোশাক পরে পেট ভরে খাও।"

কিলি মাথা নেড়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ।"

রুহান গলা নামিয়ে বলল, "এরা খুব খারাপ মানুষ। তাই সাবধান। আগ বাড়িয়ে কিছু করবে না, নিজে থেকে কিছু করবে না। তারা যেটা বলছে শুধু সেটা করবে। সবার আগে থাকবে না, সবার পিছেও থাকবে না। সব সময় মাঝামাঝি থাকবে। ঠিক আছে?"

কিলি মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

প্রায় ফুটন্ত গরম পানিতে নগ্ন হয়ে সারা শরীর রগড়ে রুহান গোসল করল। দেয়ালে আলখাল্লার মতো কালো রঙের এক ধরনের পোশাক ঝুলছিল, সেটা পরে নিয়ে সে খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। সবাই বুভুক্ষের মতো খাচ্ছে। বিষয়টি কেমন জানি অস্বস্তিকর,

এভাবে কাড়াকাড়ি করে খাওয়ার দৃশ্যে এক ধরনের অমানবিক নিষ্ঠুরতা আছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, চোখ সরিয়ে নিতে হয়। রুহান এগিয়ে একটা ছোট বাটিতে খানিকটা স্টু ঢেলে একপাশে সরে দাঁড়াল। তার খুব খিদে পেয়েছে কিন্তু কেন জানি খেতে ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে এই পুরো বিষয়টিতে এক ধরনের লজ্জা ও এক ধরনের অসম্মান রয়েছে। রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে পুরো বিষয়টি নিজের ভেতর থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করে। অন্যমনস্কভাবে শুকনো রুটি ছিঁড়ে স্টুতে ভিজিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করে। বিস্বাদ খাবার, খুব খিদে পেয়েছে তা না হলে এরকম খাবার খেতে পারত কি না সন্দেহ রয়েছে।

খাবার পর সবাই আবার বড় হলঘরটির মাঝে একত্র হল। হলঘরের মাঝামাঝি বেশ কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা সবাইকে সারি করে দাঁড় করাল। তারপর একজন একজন করে সামনে একটা ছোট ঘরে পাঠাতে শুরু করল।

ভেতরের ঘরগুলোতে কী হচ্ছে বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না। রুহান অনুমান করতে পারে সেখানে সবাইকে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তাদেরকে ধরে এনেছে বিক্রি করার জন্যে, কার জন্যে কত দাম ধরা হবে সেটা নিশ্চয়ই এখন ঠিক করা হচ্ছে। সেটা কীভাবে ঠিক করা হবে? বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা নেবে? শারীরিক পরীক্ষা নেবে? মানুষকে যখন পণ্য হিসেবে বিক্রি করা হয়, তখন এই পরীক্ষাগুলোর কি কোনো অর্থ আছে? একেবারে সাধারণ একজন মানুষই কি উৎসাহ আর অনুপ্রেরণায় অসাধারণ হয়ে ওঠে না? তাকে যখন পণ্য হিসেবে বেচা-কেনা করা হয় তখন কি তার ভেতরে কোনোভাবে সেই উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা জন্ম নিতে পারে?

প্রথমে কিছুক্ষণ রুহানের ভেতর খানিকটা কৌতূহল ছিল। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় তার কৌতূহলটুকু উবে গেল। শেষ পর্যন্ত তাকে যখন ছোট ঘরটিতে ডেকে নেওয়া হল তখন রুহানের ভেতরে এক ধরনের ক্লান্তি এসে ভর করেছে।

ছোট ঘরটিতে একটা উঁচু বিছানা, তার পাশে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মহিলাটি তার দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়।"

রুহান কোনো কথা না বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মহিলাটি উপর থেকে কিছু যন্ত্রপাতি নামিয়ে এনে তাকে পরীক্ষা করতে থাকে। ত্বক থেকে টিস্যু নিয়ে জিনেটিক কোডিং করা হল, রক্ত নিয়ে তার শ্রেণীবিভাগ করা হল, রক্তচাপ মাপা হল, শরীরের ঘনত্ব মেপে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাস নির্ধারণ করা হল, নিউরনের সংখ্যা সিনাপ্সের ঘনত্ব পরীক্ষা করা হল। সবশেষে তার হাতের ত্বকে ছ্যাঁকা দিয়ে বেগুনি রঙের একটা বিদঘুটে চিহ্ন এঁকে দেওয়া হল।

রুহান হাতটা নিজের কাছে টেনে এনে বলল, "এটা তুমি কী করলে?"

মহিলাটি একটু অবাক হয়ে রুহানের দিকে তাকাল, মনে হল সে কারো প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত নয়। মহিলাটি প্রশ্নের উত্তর দেবে রুহান সেটা আশা করে নি কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে মহিলাটি খসখসে গলায় বলল, "এটা তোমার কোড। তোমার ত্বক কেটে পাকাপাকিভাবে লিখে দেওয়া হয়েছে, এটা কখনো মুছে যাবে না।"

রুহান ক্রুদ্ধ চোখে তার হাতের উপর এঁকে দেওয়া বিদঘুটে চিহ্নগুলো পরীক্ষা করতে করতে বলল, "আমার কোডটা কি অন্যভাবে দেওয়া যেত না?"

"আমরা এমনভাবে দিই যেন আমাদের কোড রিডার সেটা পড়তে পারে।"

"তোমাদের কোড রিডার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। তোমার তথ্যগুলো আমাদের তথ্যকেন্দ্রে রাখতে হবে।"

"তার জন্যে আরো আধুনিক কোনো উপায় ব্যবহার করা যেত না? কোনো ইলেকট্রনিক পদ্ধতি, কোনো বায়োজিনেটিক পদ্ধতি—"

মহিলাটির মুখে প্রথমবার এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, একজন মানুষের চেহারায় যত নিষ্ঠুরতার ছাপই থাকুক না কেন, হাসি সেটা সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কোনো একটি বিচিত্র কারণে এই মহিলার বেলায় সেটি ঘটল না, তার মুখের হাসিতে তাকে কেমন যেন ভয়ঙ্কর দেখাতে থাকে। মহিলাটি সেই ভয়ঙ্কর মুখে ফিসফিস করে বলল, "ছেলে, তুমি পৃথিবীর কোনো খবর রাখ না?"

রুহান একটু অবাক হয়ে বলল, "কেন? কী হয়েছে?"

"পৃথিবীতে এখন ইলেকট্রনিক্স বা বায়োজিনেটিক পদ্ধতি বলে কিছু নেই। পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই। কোনো প্রযুক্তি নেই। পৃথিবী এখন অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে! যে যত তাড়াতাড়ি এই অন্ধকারে অভ্যস্ত হতে পারবে সে তত বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে। বুঝেছ?"

রুহান তার হাতের বিচিত্র চিহ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এই চিহ্নগুলো সেই অন্ধকারের চিহ্ন?"

"হ্যাঁ। প্রাচীনকালে মানুষ তাদের পশুদের হিসেব রাখার জন্যে লোহার শিক গরম করে কিছু চিহ্ন এঁকে দিত। এখন আমরা সেটা মানুষের জন্যে করি।" মহিলাটি স্থির চোখে রুহানের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"চমৎকার! এখন পাশের ঘরে যাও।"

রুহান পাশের ঘরে যাবার জন্যে উঁচু বিছানা থেকে নেমে এল। মহিলাটি বের হবার দরজাটি দেখিয়ে বলল, "আর শোনো। তোমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার আগে কথা বলবে না। এটা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি না, এখানে শেখার কিছু নেই। এটা একটা দোকান ঘর। তোমাদের ধরে এনে তোমাদের দাম ঠিক করা হচ্ছে, তার বেশি কিছু নয়।"

AMARBOI.COM

রুহান পাশের ঘরে যেতে যেতে থেমে গিয়ে বলল, "প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে কী হয়?"

"সেটা জানার জন্যে আগ্রহ দেখিও না। যাও। বিদায় হও।"

রুহান পাশের ঘরে এসে দাঁড়াল। এখানে বসার জন্যে একটা চেয়ার, সামনে নিচু টেবিল। সেখানে বিচিত্র কিছু জিনিস। টেবিলের অন্য পাশে দুটি চেয়ারে দুজন মানুষ বসে আছে, মানুষ দুজনের মুখ ভাবলেশহীন, তারা রুহানের দিকে তাকিয়ে তাকে বসার জন্যে ইঙ্গিত করল।

রুহান বসে টেবিলের উপরে ভালো করে তাকায়, নানা ধরনের জ্যামিতিক নকশা, কিছু কাগজ, কিছু বিচিত্র ছবি তার সাথে ছোটখাটো কিছু যন্ত্রপাতি। মানুষ দুজনের একজন বলল, "দেখি তোমার হাতটা দেখাও।"

রুহান একটু আগে বিদঘুটে চিহ্ন এঁকে দেওয়া হাতটা মানুষটার সামনে এগিয়ে দেয়। চিহ্নগুলোতে কিছু একটা ছিল যেটা দেখে মানুষটা একটু সোজা হয়ে বসে রুহানকে ভালো করে দেখল। সে টেবিল থেকে একটা ছবি তুলে এনে রুহানকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটা কীসের ছবি?"

ছবিটা দেখে মনে হয় সেখানে সাদা এবং কালো রঙ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রুহান একটু ভালো করে দেখেই বুঝতে পারল, আসলে ছবিটি একটি মেয়ের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো চুল ছড়িয়ে সবগুলো দাঁত বের করে হাসছে, চট করে সেটা বোঝা যায় না। রুহান বলল, "এটা একটি মেয়ের ছবি।"

মানুষ দুজন এবার নিজেদের ভেতর দৃষ্টি বিনিময় করল। সম্ভবত খুব বেশি মানুষ বিক্ষিপ্ত সাদা-কালো রঙের মাঝে মেয়ের ছবিটি খুঁজে পায় না। দুজন মানুষের ভেতর তুলনামূলকভাবে বয়স্ক মানুষটি গলা পরিষ্কার করে বলল, "আমি তোমাকে কয়েকটা সংখ্যা বলব। সেগুলো শুনে তুমি তার পরের সংখ্যাটি বলবে।"

রুহান তার গলায় ঝোলানো ক্রিস্টাল রিডারটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলল, "ঠিক আছে।"

"তার আগে তোমার ক্রিস্টাল রিডার বন্ধ করে নাও।"

রুহান অবাক হয়ে বলল, "ক্রিস্টাল রিডার বন্ধ করে নেব?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে সংখ্যাগুলো মনে রাখব কেমন করে?"

"সংখ্যাগুলো তোমার মাথায় রাখতে হবে।"

"মাথায়?"

"হ্যাঁ। বন্ধ কর।"

রুহান অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মানুষ দুজনের দিকে তাকিয়ে ক্রিস্টাল রিডারটা বন্ধ করে দিল। বয়স্ক মানুষটি বলল, "সংখ্যাগুলো হচ্ছে এক এক দুই তিন পাঁচ আট তের একুশ চৌত্রিশ—"

ক্রিস্টাল রিডারটি চালু থাকলে সংখ্যাগুলো সেখানে রেকর্ড হয়ে যেত, তাকে নিচু গলায় শুনিয়ে দিত। এখন পুরোটা তাকে মনে রাখতে হচ্ছে। সংখ্যাগুলো হল এক এক দুই তিন পাঁচ আট—হঠাৎ করে রুহান বুঝে ফেলে আগের দুটি সংখ্যা যোগ করে পরের সংখ্যাটি তৈরি হচ্ছে। তার মানে তারা যে সংখ্যাটি জানতে চাইছে সেটি হচ্ছে একুশ এবং চৌত্রিশের যোগফল, পঞ্চান্ন। রুহান একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পঞ্চান্ন।"

মানুষ দুজনই এবারে সোজা হয়ে বসল। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় কিছু একটা বলল, তারপর আবার রুহানের দিকে তাকাল। তুলনামূলকভাবে কমবয়সী মানুষটি বলল, "আমি তোমাকে ত্রিমাত্রিক একটা ছবি দেখাব। ছবিটি দেখে তোমাকে তার পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল বলতে হবে।"

"আমি কি এবার ক্রিস্টাল রিডারটি চালু করতে পারি?"

মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "না।"

রুহান একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে।"

মানুষটি টেবিল থেকে একটা কার্ড তুলে সোজা করে ধরল। বেশ কয়েকটি কিউব দিয়ে তৈরি একটি ত্রিমাত্রিক ছবি। পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল বের করার জন্যে সামনে পিছনে ডানে বামে এবং উপর নিচে এই ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে কিউবগুলোর ক্ষেত্রফল বের করে যোগ দিতে হবে। ছবিটির দিকে তাকিয়ে রুহান হঠাৎ করে বুঝতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এর ক্ষেত্রফল বের করা সম্ভব। কিউবগুলো গুনে সেটাকে ছয় গুণ করতে হবে। সেখান থেকে যে পৃষ্ঠাগুলো একটা আরেকটাকে স্পর্শ করে আছে সেগুলো বাদ দিতে হবে। রুহান চট করে ত্রিমাত্রিক ছবিটির ক্ষেত্রফল বের করে নেয়।

কমবয়সী মানুষটি জিজ্ঞেস করল, "কত?"

উত্তরটা বলতে গিয়ে হঠাৎ রুহান থমকে গেল। তাদের যখন লরি করে আনছিল তখন মানুষগুলো তাদের একটা কথা বলেছিল। তারা বলেছিল যাদের মাথায় বুদ্ধি থাকে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মগজে ইলেকট্রড ঢুকিয়ে সেটাকে ব্যবহার করা হয়। তার বুদ্ধির পরীক্ষা নিচ্ছে, সে যদি এই পরীক্ষায় ভালো করে তা হলে কি তার মগজেও ইলেকট্রড ঢুকিয়ে দেবে? সর্বনাশ!

"কী হল?" কমবয়সী মানুষটি বলল, "উত্তর দাও।"

রুহান উত্তর দিল। সঠিক উত্তরটি না দিয়ে সে একটা ভুল উত্তর দিল। সঠিক উত্তরের কাছাকাছি একটা ভুল উত্তর।

কমবয়সী মানুষটার চোখেমুখে একটা আশাভঙ্গের ছাপ পড়ে। সে খানিকটা কৌতূহল নিয়ে বলল, "ঠিক করে বল।"

রুহান আবার চিন্তা করার ভান করে নূতন একটা উত্তর দিল। সেটিও ভুল।

মানুষ দুজন আবার একজন আরেকজনের দিকে তাকায় তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে। রুহান চোখেমুখে হতাশার চিহ্ন ফুটিয়ে বলল, "হয় নি?"

"না।"

"ক্রিস্টাল রিডারটা চালু করলেই বলতে পারতাম।"

"ক্রিস্টাল রিডার ছাড়াই বলতে হবে। এটাই নিয়ম।"

"ও।"

বয়স্ক মানুষটি গোমড়া মুখে বলল, "ঠিক আছে তোমাকে আবার কয়েকটি সংখ্যা বলি, তুমি তার পরেরটা বলবে।"

"ঠিক আছে। বল।"

মানুষটা একটা কার্ড দেখে বলল, এক দুই দুই চার তিন আট চার ষোল।"

রুহান সংখ্যাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করে। সব সময় ক্রিস্টাল রিডার ব্যবহার করে কাজ করে এসেছে, কিছু একটা মনে রাখতে হলে ক্রিস্টাল রিডার সেটা মনে রেখেছে। যখন প্রয়োজন তাকে পড়ে শুনিয়েছে কিন্তু নিজের কানে শুনে নিজে মনে রাখা সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার। রুহান সংখ্যাগুলো মাথার মাঝে সাজিয়ে নিয়ে ভেতরের মিলটুকু খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কোনো মিল নেই কিন্তু একটু চিন্তা করতেই হঠাৎ করে পুরোটুকু স্পষ্ট হয়ে যায় এর মাঝে দুটো ধারা লুকানো, একটি এক দুই তিন চার অন্যটি দুই চার আট ষোল, তাই এর উত্তর হচ্ছে পাঁচ। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

বয়স্ক মানুষটি তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কত?"

রুহান নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "জানি না।"

"জানি না বললে হবে না। একটা উত্তর দিতে হবে।"

"ঠিক আছে।" রুহান সরলভাবে বলল, "বত্রিশ।"

বয়স্ক মানুষটা বলল, "হয় নি।"

"তা হলে কি চব্বিশ?"

"না। এবারেও হয় নি।"

রুহান বলল, "আমি দুঃখিত।"

বয়স্ক মানুষটা বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে একটা ক্রিস্টাল রিডারে কিছু একটা রেকর্ড করিয়ে নিয়ে রুহানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "পাশের ঘরে যাও।"

"আমি কি পাস করেছি?"

"না, তুমি পাস কর নি। প্রথমে ভেবেছিলাম পাস করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করতে পার নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমবয়সী মানুষটা বলল, "সেটা নিয়ে মন খারাপ কোরো না।" তারপর নোংরা হলুদ দাঁত বের করে হেসে বলল, "তোমার কপাল ভালো যে পাস কর নাই। এই পরীক্ষায় পাস করলে কপালে দুঃখ আছে।"

মানুষ দুজন দুলে দুলে হাসতে থাকে এবং সেটা দেখে রুহান কেমন যেন শিউরে ওঠে। সে খুব বাঁচা বেঁচে গেছে, আর একটু হলেই এরা তার মাথায় ইলেকট্রড বসিয়ে দিত।

রুহান পাশের ঘরের দিকে রওনা দেয়, ঘরটি বেশ দূরে এবং সেখানে যাবার জন্যে তাকে একটা সরু করিডোর ধরে হেঁটে যেতে হল। যেতে যেতে সে গুলির শব্দ শুনতে পায়। থেমে থেমে এবং মাঝে মাঝে একটানা সে কোথায় আছে না জানলে এটাকে একটা যুদ্ধক্ষেত্র বলে ধরে নিত।

করিডোরের শেষে যে ঘরটিতে সে হাজির হল সেটাকে দেখে একটা যুদ্ধক্ষেত্রের কমান্ড সেন্টার বলে মনে হতে পারে। রুহানের মতো আরো কয়েকজন সেখানে এর মাঝে হাজির হয়েছে, তাদের সবাইকে এক ধরনের সামরিক পোশাক পরানো হয়েছে। রুহানকেও সেটা পরতে হল এবং তারপর তাদেরকে একটা ছোট দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

বন্ধ ঘর থেকে বের হতে পেরে রুহান এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করে। উপরে নীল আকাশ মাঝে মাঝে শরতের মেঘ। বড় বড় পাথরে ঢাকা পাহাড়ি অঞ্চল তার মাঝে নানা ধরনের গাছগাছালি, জায়গাটা একটা সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মতো। রুহান অন্য সবার সাথে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষা করতে করতে যখন অধৈর্য হয়ে পড়ছিল ঠিক তখন কঠোর চেহারার একজন মানুষ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল, মাথার টুপিটা পিছনে সরিয়ে শুকনো খসখসে গলায় বলল, "আমার নাম গ্রুজান। এই জায়গাটাকে সবাই আদর করে ডাকে গ্রুজানের নরক। তোমাদের সবাইকে গ্রুজানের নরকে আমন্ত্রণ।"

রুহান গ্রুজান নামের এই মানুষটাকে ভালো করে লক্ষ করল। রোদে পোড়া তামাটে চেহারা, নীল চোখগুলো অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো। সেখানে এক ধরনের অমানবিক নিষ্ঠুরতা উঁকি দিচ্ছে, হঠাৎ চোখ পড়লে বুক কেঁপে ওঠে।

গ্রুজান সবার দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, "তোমাদের এখানে কেন আনা হয়েছে জান?"

কেউ কোনো কথা বলল না, একজন অনিশ্চিতের মতো মাথা নেড়ে বলল, "না।"

"না জানাটাই ভালো ছিল, কিন্তু এখন তোমাদের জানতে হবে। এই এলাকাটা যেরকম গ্রুজানের নরক, এর বাইরে আরেকটা বড় নরক আছে। সেটার নাম পৃথিবী। পৃথিবী নামের এই নরকে এখন মারামারি কাটাকাটি চলছে। পৃথিবীর মানুষ প্রথম ভেবেছিল মারামারি কাটাকাটি বুঝি খুব খারাপ জিনিস—কিন্তু এখন দেখছে এটা মোটেও খারাপ না, এটা অন্যরকম একটা জীবন। যারা সেটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তারা এখন মহানন্দে আছে।"

রুহান এক ধরনের অবিশ্বাস নিয়ে গ্রুজান নামের মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে। গ্রুজান নিঃশব্দে তাদের সবার সামনে দিয়ে একটু হেঁটে আবার আগের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে বলল, "পৃথিবীতে যখন মারামারি কাটাকাটি শুরু হয় তখন একটা জিনিসের খুব অভাব হয়। সেটা কী বলতে পারবে?"

রুহানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কমবয়সী একটা ছেলে নিচু গলায় বলল, "শুভ বুদ্ধি।"

"কী বললে? শুভ বুদ্ধি?" গ্রুজান কয়েক মুহূর্ত ছেলেটির দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ করে বিকট গলায় হাসতে শুরু করে, কিছুতেই হাসি থামাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত অনেকটা জোর করে হাসি থামিয়ে চোখ মুছে বলল, "না ছেলে, শুভ বুদ্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। শুভ ন্যায় সত্য এই সব কথাগুলো বড় বড় কথা, কিন্তু আসলে এগুলো হচ্ছে অর্থহীন কথা। পৃথিবীতে শুভ ন্যায় সত্য বলে কিছু নেই। যার জোর বেশি সে যেটা বলবে সেটাই হচ্ছে সত্য। সেটাই ন্যায়। সেটাই শুভ। বুঝেছ?"

কেউ কোনো কথা বলল না। গ্রুজান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পৃথিবীতে মারামারি কাটাকাটি শুরু হবার পর যে জিনিসটার অভাব হয়েছে সেটা হচ্ছে বডি পার্টস। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যুদ্ধে যারা মারা যায় তারা তো মরেই গেল। কিন্তু যারা বেঁচে থাকে তাদের কারো দরকার হৃৎপিণ্ড। কারো দরকার কিডনি। কারো ফুসফুস। কারো হাত, কারো পা। কারো চোখ। কার কাছে বিক্রি করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে দাম।" গ্রুজান চোখ নাচিয়ে বলল, "তোমাদের শরীরে আছে সেই সব অদৃশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আমরা তোমাদের ধরে এনেছি সেগুলো কেটেকুটে বিক্রি করার জন্যে। তোমরা সবাই হচ্ছ আমাদের মূল্যবান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাপ্লাই। বুঝেছ?"

রুহান এবং তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য কয়েকজন এক ধরনের ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সত্যিই কি তাদের কেটেকুটে মেরে ফেলার জন্যে ধরে এনেছে?

গ্রুজান চোখেমুখে এক ধরনের পরিতৃপ্তির ভাব নিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে দেখেই বোঝা যায় সে সবার আতঙ্কটুকু উপভোগ করছে। মুখে লোল টানার মতো এক ধরনের শব্দ করে বলল, "তবে আমরা একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে কাঁচামাল এনে সেটাকে প্রক্রিয়া করে মূল্যবান জিনিস বানাই। তোমরা হচ্ছ কাঁচামাল, তোমাদের প্রক্রিয়া করে আরো মূল্যবান করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। সেটা কীভাবে করা যায় জান?"

কেউ কোনো কথা বলল না, গ্রুজানও সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। বলল, "তোমাদের মধ্যে যাদের মগজ ভালো তাদের মাথায় একটা ইলেকট্রড ঢুকিয়ে খুব ভালো দামে বিক্রি করা যায়। তোমাদের মধ্যে যাদের মগজ ভালো এর মাঝে তাদের আলাদা করা হয়েছে— তোমরা তার মাঝে নেই। তোমরা হচ্ছ গাধা টাইপের। বুঝেছ? তোমাদের রাখা হয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করার জন্যে। তবে—"

গ্রুজান খানিকটা নাটকীয় ভাব করে হঠাৎ থেমে গিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর চোখ নাচিয়ে বলল, "তোমাদের জানে বেঁচে যাবার এখনো খুব ছোট একটা সম্ভাবনা আছে। খুবই ছোট। সেটা কী জানতে চাও?"

এবারেও কেউ কোনো কথা বলল না।

"আমরা বাজার যাচাই করে দেখেছি, তোমাদের কেটেকুটে বিক্রি করে আমরা যে পরিমাণ ইউনিট পাই, তার থেকে অল্প কিছু বেশি ইউনিট পাওয়া যায় যদি তোমাদের একজনকে সৈনিক হিসেবে বিক্রি করা যায়। তবে সমস্যাটা কী জান?"

কয়েকজন দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে জানাল যে তারা সমস্যাটা জানে না। গ্রুজান মুখে এক ধরনের হাসি টেনে এনে বলল, "সমস্যাটা হচ্ছে সবাইকে সৈনিক বানানো যায় না। শুধু তারাই সৈনিক হতে পারে, যাদের বুকে আছে সাহস এবং যাদের রিফ্লেক্স খুব ভালো। যারা শক্তিশালী এবং যারা কষ্ট সহ্য করতে পারে।"

গ্রুজান নিঃশব্দে তাদের সামনে দিয়ে একটু হেঁটে এসে বলল, "তোমাদের কেটেকুটে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করার আগে তাই আমরা তোমাদের সৈনিক হবার একটা সুযোগ দিই। সুযোগটা হচ্ছে এরকম—ঐ যে দূরে দেয়ালটা দেখছ সেই দেয়ালের আড়ালে তোমরা দাঁড়াবে। যখন আমি তোমাদের সংকেত দেব তখন সেখান থেকে বের হয়ে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছগাছালি, পাথর, খাল, মাঠ পার হয়ে অন্য পাশের দেয়ালের আড়ালে ছুটে যাবে। তোমার হাতে থাকবে একটা অস্ত্র, তুমি চাইলে সেটা ব্যবহার করতে পার। আমি এখান থেকে তোমাদের গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা করব। বুঝেছ?"

রুহান বিস্ফারিত চোখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটা সত্যি বলছে নাকি ঠাট্টা করছে সে ঠিক বুঝতে পারে না। একজন ভাঙা গলায় বলল, "আ—আমরা তোমার সাথে যুদ্ধ করব?"

"হ্যাঁ। বলতে পার সেটা এক ধরনের যুদ্ধ। তোমরা আমাকে গুলি করবে, আমি তোমাদের গুলি করব।"

"কিন্তু আমি কখনো কোনো অস্ত্র হাত দিয়ে ধরি নি।"

"যদি সেটা সত্যি হয় বুঝতে হবে তোমার কপাল খারাপ। তবে বেশি হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আজকালকার অস্ত্র খুব ভালো, খুব তাড়াতাড়ি ব্যবহার করা শেখা যায়।"

রুহানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কমবয়সী ছেলেটা হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "আমি পারব না। আমি পারব না, আমাকে ছেড়ে দাও, প্লিজ।"

গ্রুজান হা হা করে হেসে বলল, "অবশ্যই আমি তোমাকে ছেড়ে দেব। সামনের এই খাল, পাথর, গাছগাছালির মধ্যে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব, শুধু মনে রেখ এইখানে আমি অস্ত্র নিয়ে তোমার দিকে তাক করে থাকব! তোমাকে আমি পাখির মতো গুলি করে মারব। ছিচকাঁদুনে মানুষ সৈনিক হবার উপযুক্ত নয়।"

রুহান নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল, এখনো পুরো ব্যাপারটি তার বিশ্বাস হচ্ছে না। তার ভয় পাবার কথা কিন্তু সে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল তার ভয় করছে না। ভেতরে বিচিত্র এক ধরনের অনুভূতি, ভাবলেশহীন পাথরের মতো শীতল এক ধরনের অনুভূতি কিন্তু সেই অনুভূতিটি ভয়ের নয়, অন্য কিছুর।

AMARBOI.COM

৪

হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি নিয়ে ছেলেটি দরদর করে ঘামছে। রুহানের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমি কখনো অস্ত্র ব্যবহার করি নি।

রুহান ছেলেটির কাঁধ স্পর্শ করে বলল, "আমরা কেউই করি নি! তাতে কিছু আসে যায় না।"

ছেলেটি ভাঙা গলায় বলল, "আমাকে মেরে ফেলবে।"

"সম্ভবত।" রুহান নরম গলায় বলল, "আপাতত সেটা নিয়ে চিন্তা কোরো না।"

"আমি কী করব?"

"তুমি এখন দৌড়ে ঐ দিকে দেয়ালের পিছনে যাবে।"

"কিন্তু—"

রুহান বলল, "এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই। এখন ভয় পেলে হবে না। যাও।"

"আমি কি গুলি করতে করতে যাব?"

"গুলি করতে করতে দ্রুত ছুটতে পারবে না। কোনো কিছুর আড়ালে থেকে ঐ গ্রুজান জানোয়ারটার দিকে এক পশলা গুলি কর, সে তখন নিজেকে বাঁচানোর জন্যে আড়ালে সরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে। জানোয়ারটা আড়াল থেকে আবার বের হবার আগে ছুটে কোনো একটা কিছুর আড়ালে চলে যাবে। আবার বের হবার আগে আবার এক পশলা গুলি করবে—"

ছেলেটি ফ্যাকাসে মুখে বলল, "তোমার কি ধারণা তা হলে আমি যেতে পারব?"

রুহান হাসার চেষ্টা করে। বলল, "হ্যাঁ পারবে অবশ্যই পারবে। যাও।"

ছেলেটা চোখ বন্ধ করে একবার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে তারপর অস্ত্র হাতে এগিয়ে যায়।

দেয়ালের আড়াল থেকে অস্ত্রটা বের করে ছেলেটা ছাড়া ছাড়াভাবে কয়েকটা গুলি করল। গ্রুস্তান সম্ভবত এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তার গলায় কুৎসিত একটা গালি শোনা গেল। ছেলেটা দৌড়ে একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে একটা বড় গাছের আড়ালে। আবার এক পশলা গুলি করে ছুটে আরেকটা পাথরের আড়ালে চলে গেল। গ্রুস্তান সম্ভবত এরকম কিছু আশা করে নি, সে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করতে থাকে এবং তার মধ্যে ছেলেটা অন্যপাশে দেয়ালের আড়ালে চলে গেল।

রুহান মাথা ঘুরিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যদের বলল, "দেখেছ?"

অন্যেরা মাথা নাড়ল। রুহান বলল, "এটাই হবে আমাদের টেকনিক। যাও পরের জন। খুব সাবধান।"

পরের জনও ছাড়া ছাড়াভাবে গুলি করতে করতে এক পাথর থেকে অন্য পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে অন্য পাশে চলে গেল। তৃতীয় জন রওনা দেবার আগে রুহানের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমি পারব না।"

"কেন পারবে না? দেখছ না দুজন চলে গেছে।"

ছেলেটি শূন্য দৃষ্টিতে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার ভয় করে।"

"আমাদের সবার ভয় করে। কিন্তু সে জন্যে বসে থাকলে তো হবে না। যাও।"

"না। আমি পারব না।"

"তুমি পারবে। যাও।"

ছেলেটা তবুও দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। তখন সামরিক পোশাক পরা একজন এসে ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। ছেলেটা হতবিহ্বলের মতো ফাঁকা জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে যে ছুটে যেতে হবে সেটাও যেন ভুলে গেছে।

রুহান চিৎকার করে বলল, "দৌড়াও! দৌড়াও—"

ছেলেটা রুহানের দিকে তাকাল, দেখে মনে হল সে কী বলছে সেটা বুঝতে পারছে না। ঠিক তখন একটা গুলির শব্দ শোনা গেল এবং সাথে সাথে ছেলেটির শরীরটি মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে লাফিয়ে উঠে ধপ করে নিচে পড়ে গেল। রুহান তার চোখটি সরিয়ে নিতে চেষ্টা করল কিন্তু সরাতে পারল না, বিস্ফারিত চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটির মুখে যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন নেই, সেখানে এক ধরনের বিস্ময়।

রুহান নিঃশব্দে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু মানুষের চিৎকার এবং হইচইয়ের শব্দ শোনা যায়। ছেলেটির দেহটি সরিয়ে নিচ্ছে, এক্ষুনি কাটাকাটি করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরিয়ে নেবে, তারপর সেগুলো প্যাকেটে সংরক্ষণ করে চড়া দামে বিক্রি করা হবে।

রুহানের হাতে কে যেন একটা অস্ত্র ধরিয়ে দিয়েছে, রুহান মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। ভাবলেশহীন মুখে একজন মানুষ তাকে স্পর্শ করে বলল, "এখন তুমি।"

"আমি?"

"হ্যাঁ। যাও।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান সামনের খোলা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে বড় বড় কয়েকটা পাথর। গাছগাছালি, ছোট একটা খাল এবং ঝোপঝাড়। তার ভেতর দিয়ে তাকে ছুটে যেতে হবে। সে যখন ছুটে যাবে তখন গ্রুজান তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে তাক করে থাকবে তাকে গুলি করে মেরে ফেলার জন্যে। এটা যেন একটা খেলা। যাদের নিয়ে এই খেলাটি খেলা হচ্ছে তারা যেন মানুষ নয়, তারা যেন খেলার ঘুঁটি।

ভাবলেশহীন চেহারার মানুষটি রুহানকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "যাও।"

রুহান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি হাতে দেয়ালের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। একটা পাথর থেকে অন্য পাথরের আড়ালে ছুটে না গিয়ে সে সোজা গ্রুজানের দিকে হেঁটে যেতে থাকে।

পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে ওঠে, "এই ছেলে তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

রুহান সেই কথায় কান দিল না।

গ্রুজান স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অবাক হয়ে রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল কিছু একটা বলবে কিন্তু কিছু বলল না। রুহান তার কাছাকাছি গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। গ্রুজানের মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে, খসখসে গলায় বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

রুহান কোনো কথা না বলে স্থির চোখে গ্রুজানের দিকে তাকিয়ে রইল। গ্রুজান মুখ বিকৃত করে বলল, "নর্দমার পোকা! তুমি যখন ছুটে যাবে তখন তোমাকে আমি পাখির মতো গুলি করে মারতে পারি। সামনাসামনি মারার আমার কোনো ইচ্ছে নেই। যাও। ভাগো—পালাও।"

রুহান এবারেও কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে গ্রুজানের দিকে তাকিয়ে রইল। গ্রুজান ধমক দিয়ে বলল, "আহাম্মকের বাচ্চা! কী হল তোমার?"

"কিছু হয় নি।"

"তা হলে?"

রুহান ফিসফিস করে বলল, "তোমার আর আমার মধ্যে কে বেঁচে থাকবে সেটা নির্ভর করছে—কে আগে তার অস্ত্রটি তুলতে পারে।"

গ্রুজান হতচকিতের মতো রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তু-তু-তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"আহাম্মকের বাচ্চা! তুমি ভাবছ তুমি আমাকে গুলি করবে?"

"আমি কিছু ভাবছি না। আমি তোমার দিকে তাকিয়ে আছি। যেই মুহূর্তে তুমি অস্ত্রটা তোলার চেষ্টা করবে, আমি তখন তোমাকে গুলি করব।"

গ্রুজান হতবাক হয়ে রুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তু-তুমি?"

"হ্যাঁ। আমি প্রস্তুত।"

গ্রুজান রুহানের চোখের দিকে তাকাল। গ্রুজানের চোখে প্রথমে ছিল তাচ্ছিল্য, রুহানের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই দৃষ্টিতে প্রথম বিস্ময় তারপর খুব ধীরে ধীরে বিস্ময়কর এক ধরনের আতঙ্ক এসে ভর করে। রুহান দেখতে পায় গ্রুজানের সমস্ত শরীর ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে আসছে, দেখতে পায় তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠছে। গ্রুজান প্রথমে বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস নিল তারপর ঠিক যেই মুহূর্তে অস্ত্রটি তোলার চেষ্টা করে রুহান সাথে সাথে তাকে গুলি করল।

গ্রুজানের দেহটি গড়িয়ে তার পায়ের কাছে এসে পড়ল। রুহান স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। চারপাশে মানুষের চিৎকার, হইচই, চেঁচামেচি এবং পায়ের শব্দ শোনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছে। রুহান নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছুতেই তার কিছু আসে যায় না। সে কখনোই ভাবে নি যে সে কখনো কোনো মানুষকে খুন করবে, কিন্তু কী আশ্চর্য সে সত্যি সত্যি একটা মানুষকে খুন করেছে। সত্যিই কি যাকে খুন করেছে সে মানুষ?

মধ্যবয়স্ক মানুষটি চতুর্থবারের মতো রুহানকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেমন করে গ্রুস্তানকে হত্যা করেছ?"

রুহান চতুর্থবারের মতো উত্তর দিল, "আমি জানি না।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটির পাশে বসে থাকা লাল চুলের মহিলাটি বলল, "তুমি জান না বললে তো হবে না। সবাই দেখেছে তুমি তাকে গুলি করে মেরেছ।"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি আসলে হত্যা, খুন এসব কখনো দেখি নি। যখন দেখলাম ছেলেটাকে গ্রুস্তান মেরে ফেলল—"

"না না না।" লাল চুলের মহিলাটি মাথা নেড়ে বলল, "তুমি কেন মেরেছ সেটা জিজ্ঞেস করি নি। জিজ্ঞেস করেছি কেমন করে মেরেছ।"

রুহান একটু অবাক হয়ে বলল, "আমাকে যে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা দিয়েছিল—"

"আমরা সেটা জানি!" লাল চুলের মহিলাটি একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "আমরা জানতে চাইছি গ্রুস্তানের মতো এত বড় একজন যোদ্ধাকে তুমি কেমন করে হত্যা করলে?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "আমি জানি না।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "তুমি অস্ত্র ব্যবহার করা কোথায় শিখেছ?"

"আমি কোথাও শিখি নি। এটা ছিল আমার প্রথম অস্ত্র ব্যবহার।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "অসম্ভব।"

"না। অসম্ভব না।" রুহান মাথা নেড়ে বলল, "সত্যিই আমি এর আগে কখনো অস্ত্র হাতে নেই নি।"

রুহানের সামনে বসে থাকা চারজন মানুষ কেমন যেন হতচকিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা দুজন নিজেদের ভেতরে নিচু গলায় একটু কথা বলল। তারপর রুহানের দিকে তাকাল, একজন বলল, "তোমাকে অভিনন্দন ছেলে।"

রুহান অবাক হয়ে বলল, "অভিনন্দন?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তোমাদের একজনকে মেরে ফেলেছি সে জন্যে তোমরা আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছ?"

"হ্যাঁ। তুমি যেভাবে গ্রুস্তানকে মেরেছ তার তুলনা নেই।" মানুষটি জিব দিয়ে পরিতৃপ্ত ভঙ্গির একটা শব্দ করে বলল, "তোমার মতো এরকম তড়িৎগতির মানুষ আমরা আগে কখনো দেখি নাই।"

রুহান এখনো মানুষটির কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না, ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু তোমাদের গ্রুস্তান?"

মানুষটি হাত নেড়ে পুরো বিষয়টি উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে বলল, "আরে ধেৎ, তোমার গ্রুস্তান! এক গ্রুস্তান গিয়েছে তো আরেক গ্রুস্তান আসবে। সত্যি কথা বলতে কী গ্রুস্তান তো আর পুরোপুরি ক্ষতি হয় নি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করে দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে তো আমরা পেয়েছি।"

"আমাকে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। আমরা একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান। মানুষ ধরে এনে তাকে বিক্রি করি। কখনো কেটেকুটে কখনো মগজে ইলেকট্রড বসিয়ে কখনো সৈনিক হিসেবে এবং যদি খুব কপাল ভালো হয় তখন আমরা তোমার মতো একজন পাই, যাকে আমরা খেলোয়াড় হিসেবে বিক্রি করতে পারি।"

রুহান অবাক হয়ে বলল, "খেলোয়াড়? কীসের খেলোয়াড়?"

লাল চুলের মহিলাটি বলল, "একসময় পৃথিবীতে কত হাজার রকম বিনোদন ছিল! এখন কিছু নেই। এখন একমাত্র বিনোদন হচ্ছে এই খেলা—"

"কীসের খেলা?"

"একজন আরেকজনকে গুলি করার খেলা।"

রুহান হতবাক হয়ে সামনে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। সে এখনো পরিষ্কার করে বুঝতে পারছে না তারা কী নিয়ে কথা বলছে। মধ্যবয়স্ক মানুষটি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমরা তোমাকে একেবারে প্রথম শ্রেণীর ট্রেনিং দিব। তোমাকে সব ধরনের অস্ত্র চালানো শেখাব তারপর তোমাকে লক্ষ ইউনিটে বিক্রি করব।"

লাল চুলের মহিলাটি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "তোমার উপর বাজি ধরা হবে।"

"বাজি?"

"হ্যাঁ। আমরা আশা করছি দেখতে দেখতে তোমার রেটিং উপরে উঠে যাবে। আমাদের নাম তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।"

রুহান খানিকটা বিস্ময় নিয়ে তার সামনে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "এখানে তোমাকে ট্রেনিং দেওয়া যাবে না। ট্রেনিংয়ের জন্যে তোমাকে আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাতে হবে।"

"সেটা কোথায়?"

লাল চুলের মহিলাটি বলল, "এখান থেকে শ খানেক কিলোমিটার দূরে। পাহাড়ের উপর। চমৎকার জায়গা।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "হ্যাঁ, চমৎকার জায়গা, পাহাড়ের উপর চমৎকার একটি হ্রদ। সেই হ্রদের পাশে অফিস।"

"সেখানে আজেবাজে মানুষের ভিড় নেই।"

"খাওয়া খুব ভালো। সব খাঁটি প্রাকৃতিক খাবার।" মধ্যবয়স্ক মানুষটি জিব দিয়ে তার ঠোঁট চেটে বলল, "তুমি যদি চাও তোমাকে সঙ্গিনী দেওয়া হবে। চমৎকার সব মেয়ে আছে হেড অফিসে।"

রুহান কোনো কথা না বলে মানুষগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। লাল চুলের মহিলাটি বলল, "তোমার কি কোনো প্রশ্ন আছে ছেলে?"

"আমার নাম রুহান।"

"ও, আচ্ছা। হ্যাঁ। রুহান—তোমার কি কোনো প্রশ্ন আছে রুহান?"

"হ্যাঁ। আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

"কী প্রশ্ন?"

"আমি যদি তোমাদের প্রস্তাবে রাজি না হই? আমি যদি মানুষকে গুলি করে মারার এই খেলা খেলতে না চাই?"

সামনে বসে থাকা মানুষগুলো একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। মধ্যবয়স্ক মানুষটির মুখে একটু কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে এবং সে হঠাৎ শব্দ করে হেসে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান বলল, "কী হল? তুমি হাসছ কেন?"

মানুষটি হাসি থামিয়ে বলল, "তোমার কথা শুনে। তোমার আগে কেউ কখনো এই প্রশ্ন করে নি।"

"ঠিক আছে। কিন্তু আমি এই প্রশ্ন করছি।"

"ঠিক আছে ছেলে—"

"আমার নাম রুহান।"

"ঠিক আছে রুহান, আমি তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই।" মধ্যবয়স্ক মানুষটা আবার জিব দিয়ে তার ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, "পৃথিবীটা এখন আগের মতো নেই রুহান। মানুষ এখন নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারে না। এখন মানুষ হয় আদেশ দেয় না হয় আদেশ শোনে। তোমার এখন আদেশ শোনার কথা। তুমি যদি আমাদের আদেশ না শোনো তা হলে তোমাকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।"

লাল চুলের মহিলাটি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, তোমাকে এখন আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমার মস্তিষ্কটা আমরা ব্যবহার করতে পারব না, কিংবা তোমার হৃৎপিণ্ডটা কারো কাছে বিক্রি করতে পারব না সে কথাটা তো কেউ বলে দেয় নি। বুঝেছ?"

রুহান একটু মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি।"

"চমৎকার।" মধ্যবয়স্ক মানুষটা বলল, "তুমি তা হলে প্রস্তুত হয়ে যাও। তোমাকে আমরা এখনই আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠাব।"

সামনে বসে থাকা চারজন মানুষ উঠে দাঁড়ায় এবং রুহান হঠাৎ নিজের ভেতরে এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করে। গভীর এক ধরনের ক্লান্তি।

AMARBOI.COM

৫

রুহান তার ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। সামনে বিশাল একটি হ্রদ, সেই হ্রদকে ঘিরে গাঢ় সবুজ রঙের বনভূমি। দূরে পর্বতমালা, ধীরে ধীরে তার রঙ হালকা হয়ে মিলিয়ে গেছে। অপূর্ব এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে রুহান বুভুক্ষের মতো তাকিয়ে থাকে। স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানলাটি তাকে প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে সে আসলে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি। বাইরের এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য কোয়ার্টজের জানলা দিয়ে দেখতে পাবে কিন্তু কখনোই তার অংশ হতে পারবে না। স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানলা দিয়ে তাকে এই প্রকৃতি থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

রুহান একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলল এবং ঠিক তখন তার ঘরের ভেতর খুট করে একটা শব্দ হল। রুহান মাথা ঘুরিয়ে তাকায় এবং দেখতে পায় তার ঘরের দরজা খুলে একজন কমবয়সী মেয়ে ভেতরে ঢুকছে। তার মুখটি শীর্ণ এবং চোখের নিচে কালি। মেয়েটির চুল উসকোখুসকো এবং চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, প্রায় অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো। রুহান একটু অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শীর্ণ মেয়েটি কোনো কথা না বলে জ্বলজ্বলে চোখে রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল।

রুহান একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "তুমি কি আমার কাছে এসেছ?"

মেয়েটি রুহানের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ওমেগা ফাংশনের তৃতীয় সংখ্যাটি কত জান?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি কী বলছে রুহান তার কিছুই বুঝতে পারল না, মাথা নেড়ে বলল, "না জানি না।"

"আমার ধারণা কমপ্লেক্স তলে তার কোনো রুট নেই। তোমার কী ধারণা?"

"আমি বলতে পারব না।"

"নেই। নিশ্চয় নেই। ওমেগা ফাংশনের সহগের উপর সেটা নির্ভর করার কথা।" শীর্ণ মেয়েটি বিড়বিড় করে কিছু একটা বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যেতে শুরু করে এবং তখন রুহান হঠাৎ করে শিউরে ওঠে। মেয়েটার মাথার পিছন থেকে একটা ধাতব ইলেকট্রড বের হয়ে আছে। তার মস্তিষ্কের ভেতর সেটা প্রবেশ করানো রয়েছে।

শীর্ণ মেয়েটি দুই হাত পাশে ঝুলিয়ে একটি বিচিত্র ভঙ্গিতে করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করে। রুহান মেয়েটিকে ডাকবে কি না বুঝতে পারে না। তার পিছু পিছু হেঁটে হেঁটে সে একটা হলঘরে হাজির হল। সেখানে আরো বেশ কয়েকজন মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একনজর দেখেই রুহান বুঝতে পারে তাদের সবার মস্তিষ্কে ইলেকট্রড প্রবেশ করিয়ে রাখা আছে। তাদের দৃষ্টি হয় অস্বাভাবিক উজ্জ্বল না হয় উদভ্রান্তের মতো। তারা সবাই বিড়বিড় করে নিজের সাথে কথা বলছে। দুই-একজনের একটি হাত হঠাৎ হঠাৎ নড়ে উঠছে, মনে হয় সেটার উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পুরো দৃশ্যটি এত অস্বাভাবিক যে রুহান স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হলঘরের এক কোনা থেকে হঠাৎ একজন তার কাছে এগিয়ে আসে, ব্যস্ত গলায় বলল, "এনেছ? এনেছ তুমি?"

তার কী আনার কথা সে জানে না, সেটা নিয়ে সে কোনো প্রশ্ন না তুলে বলল, "না আনি নি"।

"না আনলে কেমন করে হবে? উপাদানগুলোর পরিমাপ সমান হতে হবে। বিস্ফোরকের ক্ষমতা নির্ভর করে তার উপাদানগুলোর উপর। অক্সিজেন সমৃদ্ধ উপাদান। তুমি যদি না আনো—" মানুষটি নিজের মনে কথা বলতে বলতে অন্যদিকে সরে গেল।

রুহান খুব সাবধানে তার বুকের ভেতর থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দেয়। আর একটু হলে সম্ভবত তারও এখানে এভাবে থাকতে হত। বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করার সময় সে যদি প্রশ্নগুলোর উত্তর ইচ্ছে করে ভুল করে না দিত তা হলে কি তার মস্তিষ্কেও এভাবে ইলেকট্রড বসিয়ে দিত না?

কে যেন তার কাঁধে হালকাভাবে স্পর্শ করে। রুহান মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, একজন বয়স্ক মানুষ, চুল ধবধবে সাদা, মুখে বয়সের বলিরেখা। মানুষটি নরম গলায় বলল, "তুমি কে? তোমার মাথায় তো ইলেকট্রড নেই, তুমি এখানে কী করছ?"

রুহান বলল, "আমার নাম রুহান। আমি জানি না আমি এখানে কী করছি।"

বয়স্ক মানুষটি হেসে বলল, "আমরা আসলে কেউই জানি না আমরা কী করছি। আমাদের জন্মটাই একটা বড় রহস্য।"

রুহান কথাটি সহজ অর্থেই বলেছিল, বৃদ্ধ মানুষটি অনেক ব্যাপক অর্থে দার্শনিকভাবে গ্রহণ করেছে।

বৃদ্ধ মানুষটি তার হাত বাড়িয়ে বলল, "আমার নাম কিহি। আমি সক্রেটিসদের দেখাশোনা করি।"

রুহান ভুরু কুঁচকে বলল, "কাদের দেখাশোনা কর?"

কিহি হাত দিয়ে মস্তিষ্কে ইলেকট্রড বসানো চারপাশের অপ্রকৃতিস্থ মানুষগুলোকে দেখিয়ে বলল, "এই যে এই ছেলেমেয়েগুলোকে। এদেরকে এখানে সক্রেটিস বলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এরাই তা হলে সেই সক্রেটিস! আমি এদের কথা শুনেছি।"

"হ্যাঁ। একটি অত্যন্ত নিষ্ঠুর রসিকতা। সক্রেটিস খুব জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। এই ছেলেমেয়েগুলোর মস্তিষ্কে যখন এই ইলেকট্রড দিয়ে ইম্পালস দেওয়া হয় তখন এরাও কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞানী হয়ে যায়। সে জন্যে এদেরকে বলে সক্রেটিস।"

"এদের সবাইকে দেখে মনে হয় এরা অপ্রকৃতিস্থ।"

"হ্যাঁ। এরা অপ্রকৃতিস্থ। যখন মস্তিষ্কে ইম্পালস দেওয়া হয় তখন এরা কিছুক্ষণের জন্যে স্বাভাবিক হয়। তখন তারা কোনো কোনো বিষয়ে অনেক বড় বিশেষজ্ঞ হয়ে যায়। তারা তখন অনেক বড় বড় সমস্যা সমাধান করতে পারে।"

"কিন্তু এমনিতে এরা অপ্রকৃতিস্থ।"

"হ্যাঁ, এমনিতে এরা অপ্রকৃতিস্থ।"

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এটি একটি অত্যন্ত বড় ধরনের নিষ্ঠুরতা।"

"হ্যাঁ। এটি অত্যন্ত বড় একটি নিষ্ঠুরতা।"

রুহান কিহির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি যদি জান এটি এক ধরনের নিষ্ঠুরতা তা হলে তুমি কেন এ ধরনের কাজ কর? কেন ছেড়েছুড়ে চলে যাও না?"

কিহি একটু হাসার চেষ্টা করল কিন্তু সেই হাসিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল না। নিচু গলায় বলল, "পারলে চলে যেতাম। নিশ্চয় চলে যেতাম। কিন্তু পারছি না।"

"কেন পারছ না?"

"যারা আমাকে ধরে এনেছে তারা কি কখনো আমাকে যেতে দেবে?"

রুহান ভালো করে কিহির দিকে তাকাল, সে বুঝতে পারে নি এই বৃদ্ধ মানুষটাও তাদের মতো একজন ধরে আনা বন্দি মানুষ। রুহান থতমত খেয়ে বলল, "আমি দুঃখিত কিহি। আমি বুঝতে পারি নি। আমি ভেবেছিলাম এখানে বুঝি শুধু কমবয়সী তরুণদের ধরে আনে। আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ওদের একজন।"

কিহি মাথা নেড়ে বলল, "না। আমি ওদের একজন নই।" হাত দিয়ে চারপাশের অপ্রকৃতিস্থ ছেলেমেয়েগুলোকে দেখিয়ে বলল, "আমি এদের একজন। এই দুর্ভাগা ছেলেমেয়েগুলোর দেখাশোনা করি। এদের মতো অসহায় পৃথিবীতে আর একজনও নেই। যতদিন এখানে থাকে আমি তাদের খানিকটা মমতা দিই, ভালবাসা দিই। অপ্রকৃতিস্থ হলেও তারা ভালবাসা বোঝে। এখন কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"আমাকে যদি এখন ছেড়েও দেয়। আমি সম্ভবত ওদের ছেড়ে চলে যেতে পারব না।"

রুহান কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিহি অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অপ্রকৃতিস্থ ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে আবার মাথা ঘুরিয়ে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে যারা আসে তাদের সবার মাথাতেই ইলেকট্রড বসানো থাকে। তুমি অন্যরকম, এখানে তোমাকে কেন এনেছে?"

রুহান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমার মাথায় ইলেকট্রড নেই—মনে হয় সরাসরি বুলেট বসাবে!"

"কেন? এরকম কথা কেন বলছ?"

"আমি একজন খেলোয়াড়।"

বৃদ্ধ কিহি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "খেলোয়াড়? মানুষকে গুলি করার যে খেলা সেই খেলার খেলোয়াড়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। আমাকে ট্রেনিং দেবার জন্যে এনেছে।"

কিহি কিছুক্ষণ রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর নিচু গলায় বলল, "আমি জানি না কে বেশি দুর্ভাগা। তুমি নাকি এই সক্রেটিসের সন্তানেরা।"

ঠিক এরকম সময় হলঘরের এক কোনায় দুজন উচ্চ স্বরে কথা কাটাকাটি শুরু করে দেয়, অন্যেরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। কিহি এগিয়ে যায়, শান্ত গলায় বলে, "কী হল? তোমরা দুজন আবার কী নিয়ে ঝগড়া শুরু করলে?"

যে দুজন চেঁচামেচি করছিল তারা প্রায় সাথে সাথে কিহির দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মতো একটু হাসার চেষ্টা করে চুপ করে গেল। কিহি ঠিকই বলেছে। এই মানুষগুলো অপ্রকৃতিস্থ কিন্তু তারপরেও তারা কিহির মমতাটুকু অনুভব করতে পারে।

রুহান বলল, "এরা তোমাকে খুব ভালবাসে।"

"হ্যাঁ।" কিহি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "মাথায় যখন ইলেকট্রড বসায় তখন মস্তিষ্কের কোথায় কী ক্ষতি হয় কে জানে কিন্তু এরা একেবারে শিশুর মতো হয়ে যায়।"

ঠিক তখন কোথায় জানি ঘটাং করে একটা শব্দ হল এবং ঘরঘর শব্দ করে কাছাকাছি একটা দেয়াল সরে যেতে শুরু করল। ঘরের ভেতরে অপ্রকৃতিস্থ মানুষগুলোর মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, সবাই হুটোপুটি করে বড় হলঘরটার এক কোণে গিয়ে একজন আরেকজনকে ধরে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকে। দরজার খোলা অংশটা দিয়ে চারজন মানুষ এসে ঢুকল। তাদের গায়ে নীল রঙের জাম্পশুট। ছোট করে ছাঁটা চুলের একজন মহিলার হাতে একটা ছোট ব্যাগ, সেখান থেকে কিছু যন্ত্রপাতি উঁকি দিচ্ছে। একজন মধ্যবয়স্ক ছোটখাটো মানুষ অন্য দুজন বিশালদেহী।

মধ্যবয়স্ক মানুষটি কিহির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী খবর বুড়ো। তোমার জ্ঞানী শিশুরা কেমন আছে?"

কিহি কোনো কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষটা হাসি হাসি মুখে বলল, "আমাদের দেখে ইঁদুরের ছানার মতো এক কোনায় কেমন জড়ো হয়েছে দেখেছ?"

কিহি এবারেও কোনো কথা বলল না।

যন্ত্রপাতির ব্যাগ হাতে ছোট করে ছাঁটা চুলের মেয়েটি বলল, "স্টিমুলেশন দেবার পর এরাই আবার কেমন গুছিয়ে কথা বলতে থাকে! দেখে বিশ্বাস হয় না।"

কিহি জিজ্ঞেস করল, "কাউকে নেবে?"

"হ্যাঁ।"

"কাকে?"

মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ তার ক্রিস্টাল রিডারটা দেখে বলল, "ক্রানাকে।"

দূরে জড়াজড়ি করে থাকা ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে একটা মেয়ে হঠাৎ আতঙ্কের একটা শব্দ করে নিজের মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করে। রুহান চিনতে পারল, কিছুক্ষণ আগে এই মেয়েটিই তার ঘরে ঢুকে গিয়েছিল।

মেয়েটির আকুল হয়ে কান্না শুনে নীল জাম্পশুট পরা মানুষগুলো এক ধরনের কৌতুক অনুভব করে। তারা নিজেরা একজন আরেক জনের দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে হাসতে শুরু করে।

রুহান বলল, "এর ভেতরে তোমরা হাসার মতো কী খুঁজে পেলে?"

রুহানের কথা শুনে মানুষগুলো কেমন যেন অবাক হয়ে তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। মধ্যবয়স্ক মানুষটা অবাক হলে বলল, "তুমি কে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান বলল, "আমি এখানে নিজে থেকে আসি নি। তোমরা আমাকে ধরে এনেছ। তোমরা বল আমি কে?"

মানুষটার মুখ পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। থমথমে গলায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন ছোট করে চুল ছাঁটা মহিলাটি বলল, "এর নাম রুহান। রুহান আমাদের নূতন খেলোয়াড়।"

"খে-খেলোয়াড়?" মধ্যবয়স্ক মানুষটার পাথরের মতো কঠিন মুখটা দেখতে দেখতে কেমন জানি নরম হয়ে যায়। মুখে এক ধরনের বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে, বিগলিত ভঙ্গিতে বলে, "তুমি খেলোয়াড়?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "আমি সেটা শুনেছি। এখনো জানি না।"

"তোমাকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন। আমাদের এই ট্রেনিং সেন্টার তোমাকে নিশ্চয়ই একেবারে প্রথম শ্রেণীর একটা খেলোয়াড় বানিয়ে দেবে।"

মানুষটির কথার সাথে সাথে অন্যেরাও কেমন জানি বিগলিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে থাকে।

রুহান বলল, "তোমরা এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি।"

"কোন প্রশ্ন?"

রুহান নিচু গলায় বলল, "তোমাদের দেখে ও তোমাদের কথা শুনে মেয়েটি ভয় পেয়ে কাঁদছে। এর মধ্যে কোন অংশটুকু হাসির?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটির মুখে অপমানের একটা সূক্ষ্ম ছাপ পড়ল। সে হাত দিয়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার ভান করে বলল, "তুমি সেটা এখন বুঝবে না। এখানে কিছুদিন থাক তা হলে নিজেই বুঝতে পারবে।"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "মনে হয় না।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে সামনে এগিয়ে যায়, জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে ক্রানা কে?"

আকুল হয়ে কাঁদতে থাকা মেয়েটা আরো জোরে ডুকরে কেঁদে উঠল। মানুষটা বলল, "তুমি?"

মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে মাথা নাড়ল।

"এস তা হলে। চলে এস।"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, সে আসবে না।

"না এলে চলবে না।" মধ্যবয়স্ক মানুষটার কণ্ঠস্বর কঠোর হয়ে ওঠে, "এস।"

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলল, "না।"

মানুষটা এবার পিছনে তাকাল, বিশালদেহী দুজন মানুষ এবারে এগিয়ে যায়। ক্রানা নামের মেয়েটিকে দুইজন দুই পাশ থেকে ধরে ফেলে তারপর প্রায় শূন্যে তুলে সরিয়ে নিয়ে আসে। ক্রানা হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে কিন্তু সেই কান্নায় মানুষগুলো এতটুকু বিচলিত হয় না।

মধ্যবয়স্ক মানুষটা কিহির দিকে তাকিয়ে বলল, "বুড়ো তুমি আস আমাদের সাথে।"

কিহি কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল।

রুহান জিজ্ঞেস করল, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছ মেয়েটিকে?"

"সিস্টেম লোড করার জন্যে।" ছোট করে চুল ছাঁটা মহিলাটা বলল, "ক্রিভন থেকে একটা অর্ডার এসেছে। ক্রিভন অনেক বড় যুদ্ধবাজ মানুষ। সে একটা যুদ্ধের এক্সপার্ট কিনতে চায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান অবাক হয়ে বলল, "এই বাচ্চা মেয়েটা যুদ্ধে এক্সপার্ট?"

মহিলাটি হেসে বলল, "আমরা যখন সিস্টেম লোড করে দেব সে এক্সপার্ট হয়ে যাবে। এমনিতে কেউ বুঝবে না কিন্তু যখন স্টিমুলেশন দেবে তখন বুঝবে।"

"কেমন করে স্টিমুলেশন দেয়?"

"মাথার পিছনে ইলেকট্রড লাগানো আছে সেখানে হাই ফ্রিকোয়েন্সি পালস পাঠাতে হয়।"

রুহানের শরীর কেমন যেন গুলিয়ে আসে, সে এক ধরনের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তার বিশ্বাস হতে চায় না একজন মানুষকে অন্য একজন মানুষ এভাবে ব্যবহার করতে পারে।

মহিলাটি রুহানের বিস্ময়টি ধরতে পারল না, বেশ সহজ গলায় বলল, "তুমি দেখতে চাও আমরা কেমন করে সিস্টেম লোড করি?"

রুহানের একবার মনে হল বলে না, সে দেখতে চায় না। কিন্তু কী হল কে জানে, সে বলল, "হ্যাঁ দেখতে চাই।"

"তা হলে এস আমাদের সাথে।"

পাহাড়ের মতো দুজন মানুষ ক্রানা নামের মেয়েটাকে প্রায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার পিছু পিছু অন্যেরা হাঁটতে থাকে। রুহান সবার পিছনে পিছনে হেঁটে আসে। সে নিজের ভেতরে কেমন জানি গভীর এক ধরনের বিষণ্নতা অনুভব করে।

মাঝারি আকারের একটা ঘরের ঠিক মাঝখানে উঁচু একটা শক্ত টেবিলে ক্রানাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কিছু মনিটর লাগানো হয়েছে। ঘরের এক কোনায় বড় একটা যন্ত্রপাতির প্যানেল সেখানে ছোট করে চুল ছাঁটা মহিলাটি যন্ত্রপাতিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যবয়স্ক মানুষটি। বিশালদেহী মানুষ দুজন দরজার কাছে দুটি টুলে চুপচাপ বসে আছে, তাদের মুখ ভাবলেশহীন, দেখে মনে হয় তাদের চারপাশে কী ঘটছে সেটা তারা জানে না।

কিহি ক্রানার হাত ধরে রেখে ফিসফিস করে তার সাথে কথা বলছে, তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে সাহস দিচ্ছে। ক্রানার চোখের দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থ, এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে সে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

রুহান কিছুক্ষণ ক্রানার দিকে তাকিয়ে রইল, দৃশ্যটি তার কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হল, সে হেঁটে ঘরের এক কোনায় বসানো যন্ত্রপাতিগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ছোট করে চুল ছাঁটা মহিলাটি দক্ষ হাতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতিগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "বিজ্ঞান অনেকদূর এগিয়েছিল। আমাদের কপাল খারাপ—পৃথিবীতে এরকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে গেল তা না হলে বিজ্ঞান নিশ্চয়ই আরো এগোত।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "উঁহু। প্রকৃতি বাড়াবাড়ি সহ্য করে না। মানুষ বিজ্ঞান নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল তাই প্রকৃতি এটা বন্ধ করে দিয়েছে।"

রুহান একটু অবাক হয়ে মধ্যবয়স্ক মানুষটির মুখের দিকে তাকাল, সে কি সত্যিই এটা বিশ্বাস করে?

মহিলাটি কয়েকটা সুইচ অন করে বলল, "আমাদের এই যন্ত্রটা আছে বলে সক্রেটিসদের মাথায় সিস্টেম লোড করতে পারছি। ওদের বিক্রি করে কিছু ইউনিট কামাই করছি। যাদের নেই তারা কী করবে?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা বলল, "তারা আঙুল চুষবে।" তারপর হা হা করে হাসতে লাগল যেন খুব বড় একটা রসিকতা করে ফেলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিলাটি মাথা তুলে চারদিকে তাকিয়ে বলল, "সবাই রেডি? আমি তা হলে কাজ শুরু করি?"

রুহান জিজ্ঞেস করল, "এখন কী করবে?"

মহিলাটি প্যানেলের একটা স্বচ্ছ খুপরিতে উজ্জ্বল একটা ক্রিস্টাল দেখিয়ে বলল, "এই যে এই ক্রিস্টালটাতে পুরো সিস্টেম আছে। আমি ক্রানার ইলেকট্রডের ভিতর দিয়ে এটা মাথার ভেতরে পাঠাব।"

"তখন কী হবে?"

"মাথায় নূতন সিনান্স কানেকশন হবে—দরকার হলে তার পুরোনো কানেকশন খুলে নেবে।"

"তা হলে কী হয়?"

"বলতে পার এই মেয়েটা একটা নূতন মানুষ হয়ে যাবে—আসলে ঠিক মানুষ না। একটা নূতন যন্ত্র।"

রুহান বুকের ভেতর নিঃশ্বাস আটকে রেখে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে রইল। কী অবলীলায় কী ভয়ঙ্কর একটা কথা বলে দিল।

মহিলাটি একটি সুইচ টিপে দিতেই ঘরের মাঝখানে টেবিলে বেঁধে রাখা ক্রানার দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে যায়, সে রক্ত শীতল করা কণ্ঠস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে।

রুহান ক্রানার কাছে ছুটে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তার শরীর দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, চোখ দুটো মনে হচ্ছে কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসবে।

রুহান আর্তস্বরে চিৎকার করে বলল, "বন্ধ কর। বন্ধ কর এক্ষুনি!"

ছোট করে ছাঁটা চুলের মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, "বন্ধ করব? কী বন্ধ করব?"

"যেটা করছ সেটা। দেখছ না মেয়েটা যন্ত্রণায় কী করছে?"

মহিলাটি মধ্যবয়স্ক মানুষটির দিকে একবার তাকাল তারপর খানিকটা হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "যন্ত্রণা ছাড়া মানুষ সিস্টেম লোড করবে কেমন করে? তোমাকে বলেছি না সিনান্স কানেকশন উপড়ে ফেলা হচ্ছে—"

"কতক্ষণ থাকবে এরকম?"

"এই তো কিছুক্ষণ। ধৈর্য ধর দেখবে ঠিক হয়ে যাবে।"

রুহান আবার ক্রানার কাছে ফিরে গেল, কিহি তার দুই হাত শক্ত করে ধরে তার সাথে নিচু গলায় কথা বলছে, "ক্রানা, সোনামণি আমার। একটু ধৈর্য ধর, একটুখানি সহ্য কর, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই যে দেখ আমি তোমার পাশে আছি, তোমার দিকে তাকিয়ে আছি, তোমাকে শক্ত করে ধরে রেখেছি। এই দেখ আমি ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্যে প্রার্থনা করছি—যেন তোমার সব কষ্ট দূর হয়ে যায়। ক্রানা সোনামণি আমার—"

রুহান নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল এবং দেখতে পেল খুব ধীরে ধীরে ক্রানার শরীর দুমড়ে মুচড়ে উঠতে উঠতে একসময় শান্ত হয়ে আসে। তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। সে মুখ হাঁ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে চোখ খুলে তাকাল। কিহি ক্রানার মুখের কাছাকাছি নিজের মুখটি নিয়ে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "এখন তোমার কেমন লাগছে ক্রানা।"

ক্রানা শান্ত দৃষ্টিতে কিহির দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল, "আমার ভালো খারাপ কিছুই লাগছে না। সত্যি কথা বলতে কী আমার কোনোরকম অস্তিত্ব আছে বলেই মনে হচ্ছে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান একটু অবাক হয়ে ক্রানার দিকে তাকাল, মেয়েটি খানিকক্ষণ আগেই পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ ছিল অথচ এখন একেবারে স্বাভাবিক মানুষের মতো কথা বলছে। কিহি ক্রানার হাত স্পর্শ করে বলল, "তুমি আমাকে চিনতে পারছ ক্রানা।"

"হ্যাঁ। অবশ্যই চিনতে পারছি। তুমি হচ্ছ কিহি। আমাদের সবার প্রিয় কিহি।" তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি কে? তাকে দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"এ হচ্ছে রুহান।"

ক্রানা ফিসফিস করে বলল, "রুহান রুহান!"

ঘরের কোনায় যন্ত্রপাতির প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট করে ছাঁটা চুলের মেয়েটি গলা উঁচিয়ে ডাকল, "বুড়ো।"

কিহি মনে হয় এই অবহেলার ডাকটিতে অভ্যস্ত, বেশ সহজভাবেই বলল, "বল।"

"তুমি কিছুক্ষণ মেয়েটার সাথে কথা বলতে পারবে? যেন সে সজাগ থাকে?"

"পারব।"

"চমৎকার! আমরা তার অবচেতন মনে কাজ করছি।"

"ঠিক আছে।" বলে কিহি আবার ক্রানার উপর ঝুঁকে পড়ল। বলল, "তোমার সব কথা মনে আছে ক্রানা?"

ক্রানা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। মনে আছে।"

"তুমি এখন আমাকে চিনতে পারছ ক্রানা?"

"হ্যাঁ। চিনতে পারছি। তুমি কিহি। আমাদের সবার খুব প্রিয় একজন মানুষ তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রুহান।"

"তুমি কি আমার সব কথা বিশ্বাস করবে ক্রানা?"

"করব। নিশ্চয়ই করব।"

"তা হলে শোন। আমাদের মনে যে দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ-বেদনা হয় সেগুলো হচ্ছে মস্তিষ্কের ভেতরের বিশেষ এক ধরনের পরিস্থিতি।"

ক্রানা নামের মেয়েটার মুখে খুব সূক্ষ্ম এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, সে বলে, "আমি জানি। আমার মস্তিষ্কে এখন এরা কিছু একটা করছে এখন আমি সবকিছু বুঝতে পারি।"

কিহি গলা নামিয়ে বলল, "হ্যাঁ। এরা তোমার মস্তিষ্কে এক ধরনের স্টিমুলেশন দিচ্ছে। যখন স্টিমুলেশন বন্ধ করে দেবে তখন তুমি আবার আগের মতো হয়ে যাবে। স্টিমুলেশন থাকতে থাকতে আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই যেটা তুমি সব সময় মনে রাখবে।"

"কী কথা কিহি? আমরা সবাই তোমাকে খুব ভালবাসি। আমরা তোমার সব কথা মনে রাখব।"

কিহি ক্রানার হাত ধরে নরম গলায় বলল, "দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ-বেদনা-যন্ত্রণা-সুখ সবকিছুই যদি মস্তিষ্কের বিশেষ একটা অবস্থা হয়ে থাকে তা হলে কেন আমরা সেটা নিয়ন্ত্রণ করব না? কেন আমরা আমাদের মস্তিষ্কের পরিস্থিতিকে সব সময় আনন্দ কিংবা সুখের পরিস্থিতি করে রাখব না? তা হলে যখন দুঃখ-কষ্ট আর যন্ত্রণা আসবে সেটাও আমাদের কষ্ট দিতে পারবে না!"

ক্রানা ফিসফিস করে বলল, "সেটা আমরা কেমন করে করব?"

কিহি ক্রানার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "তুমি মনে করে নাও পৃথিবীতে কোনো অশুভ কিছু নেই। মনে কর সবাই ভালো। মনে মনে কল্পনা কর পৃথিবীটা খুব সুন্দর একটা জায়গা। এখানে শুধু আনন্দ আর সুখ। ক্রানা তুমি মনে মনে কল্পনা কর যে তুমি খুব

AMARBOI.COM

খু–উব সুখী একজন মানুষ। তারপর তুমি মনের ভেতরে সেই সুখটা ধরে রাখ। পারবে না?”

ক্রানা ধীরে ধীরে তার চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ সেভাবে থাকে। তার মুখে এক ধরনের অপার্থিব হাসি ফুটে ওঠে, দেখে মনে হতে থাকে তার ভেতরে এক ধরনের অলৌকিক শান্তি এসে ভর করেছে। চোখ দুটো বন্ধ করে সে ফিসফিস করে বলল, “হ্যাঁ কিহি। আমি পারছি। আমার ভেতরে এক ধরনের গভীর শান্তি এসেছে। আমার মনে হচ্ছে আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারব। কারো বিরুদ্ধে আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই কিহি। আমার ভেতরে আর কোনো আক্রোশ নেই।”

ক্রানার হাতে অল্প চাপ দিয়ে কিহি বলল, “চমৎকার! এটা তোমার ভেতর ধরে রাখতে পারবে না?”

ক্রানা বলল, “আমি জানি না। এখন তো আমার মস্তিষ্কের ভেতর স্টিমুলেশন দিচ্ছে তাই কাজটা খুব সহজ। যখন স্টিমুলেশন থাকবে না তখন কী হবে আমি জানি না।”

“নিজের উপর বিশ্বাস রাখ ক্রানা, তুমি পারবে। তোমার কাজটা আরো সহজ করে দিচ্ছি।” কিহি তার ডান হাতটা ক্রানার চোখের সামনে ধরে বলল, “এই দেখ আমার হাতে একটা ক্রস আঁকা আছে। যখন তুমি মনে মনে সুখ আর আনন্দ আর গভীর এক ধরনের শান্তি অনুভব করছ তখন তুমি এই ক্রসটির দিকে তাকিয়ে থাক। তোমার মস্তিষ্কে তা হলে এর স্মৃতি রয়ে যাবে। ভবিষ্যতে যখনই তুমি এই ধরনের একটি ক্রস চিহ্ন দেখবে সাথে সাথে তোমার এই গভীর আনন্দ, সুখ আর শান্তির কথা মনে হবে।”

“কিন্তু আমি কোথায় দেখব এই ক্রস?”

“দেখবে। অনেক জায়গায় দেখবে। দুটো গাছের ডাল একটার উপর দিয়ে আরেকটা যাবার সময় ক্রস চিহ্ন তৈরি করে। মানুষ কিছু একটা মনে রাখার জন্যে ক্রস চিহ্ন আঁকে। তোমার দুই হাত যখন তোমার কোলের উপর রাখ একটা হাত অন্য হাতের উপর ক্রস তৈরি করে। মানুষ পায়ের উপর পা রেখে বসে। সেটাও ক্রস। তোমার চারপাশে ক্রস ক্রানা। কাজেই তুমি ভুলবে না। কিছুতেই ভুলবে না।”

“ঠিক আছে।”

“তুমি তা হলে আমার হাতের চিহ্নের দিকে তাকিয়ে থাক। বুকের ভেতর গভীর আনন্দ, সুখ আর শান্তি অনুভব করতে করতে তাকিয়ে থাক। প্রিয় ক্রানা আমার, সোনামণি, তোমার জন্যে আমাদের সবার গভীর ভালবাসা। গভীর গভীর ভালবাসা।”

রুহান এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে কিহি এবং ক্রানার দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে মনে হতে থাকে সে বুঝি কোনো একটি অলৌকিক জাদুমন্ত্রের প্রক্রিয়া দেখছে। কী গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কিহি তার প্রত্যেকটা কথা উচ্চারণ করছে আর কী সহজেই ক্রানা তার প্রত্যেকটা শব্দ বিশ্বাস করছে। ক্রানার মুখে গভীর এক ধরনের প্রশান্তির চিহ্ন, দেখে মনে হয় পৃথিবীর কোনো নীচতা, হীনতা, কোনো ষড়যন্ত্র, কোনো অন্যায়, কোনো অবিচার তাকে বুঝি আর কোনো দিন স্পর্শ করতে পারবে না।

খুব ধীরে ধীরে একসময় ক্রানার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। গভীর এক ধরনের ঘুমে সে অচেতন হয়ে পড়ে।

ঘরের এক কোনায় প্যানেলের সামনে বসে থাকা ছোট করে ছাঁটা চুলের মহিলাটি মুখে এক ধরনের সন্তুষ্টির শব্দ করে বলল, “চমৎকার! আরো একটা সক্রেটিস রেডি।”

মধ্যবয়স্ক মানুষটা বলল, “কোনো ঝামেলা ছাড়া শেষ হল।”

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিলাটি বলল, "হ্যাঁ, এর জন্যে আমাদের বুড়োকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। সে কত কী আজগুবি কথা বলে আর আমাদের বেকুব সক্রেটিসরা তার সব কথা বিশ্বাস করে বসে থাকে।"

কিহি বলল, "এগুলো আজগুবি কথা না। আমি যেটা বলি সেটা বিশ্বাস করেই বলি। এটা এক ধরনের সম্মোহন।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" মহিলাটি হাত দিয়ে পুরো ব্যাপারটি উড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমাদের সক্রেটিসরা যদি শান্তিতে থাকে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। স্টিমুলেশন দেওয়ার সময় ঠিক ঠিক তথ্যগুলো দিতে পারলেই হল।"

পাহাড়ের মতো বড় বড় মানুষগুলো এবার উঠে আসে। ক্রানার অবচেতন দেহটা একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে দিয়ে তারা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, কিহি ঘুমন্ত ক্রানার মুখমণ্ডল আলতোভাবে স্পর্শ করে ফিসফিস করে বলল, "বিদায় ক্রানা। সোনামণি আমার।"

ক্রানাকে নিয়ে বের হয়ে যাবার পর বৃদ্ধ কিহিকে কেমন যেন অসহায় দেখায়। দেখে মনে হয় কেউ বুঝি তার ভেতর থেকে কিছু একটা উপড়ে নিয়ে চলে গেছে।

রুহান নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। তার বুকের ভেতর বিষণ্নতাটুকু আরো গভীরভাবে চেপে বসেছে।

৬

"এই অস্ত্রটার নাম মেগাট্রন।" কমবয়সী মানুষটা ভারী অস্ত্রটা হাত বদল করে বলল, "কে এর নাম মেগাট্রন রেখেছে জানি না, কিন্তু খুব সার্থক নামকরণ। এটি আসলেই একটা মেগা অস্ত্র। প্রতি সেকেন্ডে দশটা গুলি করতে পারে, লেজার লক অটোমেটিক। অত্যন্ত চমৎকার অস্ত্র—শুধু একটা সমস্যা। অস্ত্রটা ভারী। সব মানুষ সহজে এটা নাড়াচাড়া করতে পারে না।"

রুহান একদৃষ্টে কমবয়সী মানুষটার দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো শুনছে, কিন্তু ঠিক মনোযোগ দিতে পারছে না। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে একজন অস্ত্র বিশেষজ্ঞ তাকে অস্ত্রের উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

অস্ত্র বিশেষজ্ঞ মানুষটি বিশাল মেগাট্রনটি টেবিলের উপর রেখে তুলনামূলকভাবে ছোট একটা অস্ত্র হাতে নিয়ে বলল, "এটার নাম ক্রিকি। ক্রিকি প্রায় মেগাট্রনের মতোই তবে এর গুলির ভর একটু কম। অস্ত্রটা ক্রোমিয়াম এলয় দিয়ে তৈরি, তাই এর ওজন হালকা। অপরাধজগতে খুব জনপ্রিয়। গত খেলায় খেলোয়াড়দের কেউ কেউ এটা ব্যবহার করেছে।" মানুষটা অস্ত্রটা টেবিলে রেখে এবারে তৃতীয় একটা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। কুচকুচে কালো এবং হালকা, গুলির লম্বা ম্যাগাজিন বাঁকা হয়ে বের হয়েছে। অস্ত্র বিশেষজ্ঞ মানুষটা মুখে সন্তুষ্টির একটা শব্দ করে বলল, "তবে এটা হচ্ছে খেলোয়াড়দের সবচেয়ে প্রিয় অস্ত্র। ব্ল্যাক মার্কেটে এর দাম এখন তেতাল্লিশ হাজার ইউনিট। এত হালকা যে হাতে নিলে মনে হয় বুঝি খেলনা, কিন্তু এটা খেলনা নয়, এটা একেবারে খাঁটি অস্ত্র। প্রতি সেকেন্ডে গুলি করে পাঁচটা—তবে সেই পাঁচটার ট্রাজেক্টরি নিখুঁত। খেলোয়াড়রা তো যুদ্ধ করে না যে তাদের প্রতি সেকেন্ডে দশটা গুলি দরকার—খেলোয়াড়রা হিসেব করে গুলি করে। এর আগের টুর্নামেন্টের শেষ খেলায় মাত্র একটা গুলি খরচ হয়েছিল। বিশ্বাস হয়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান এক ধরনের ক্লান্তি নিয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবীতে এত ধরনের অস্ত্র আছে কে জানত। শুধুমাত্র মানুষকে হত্যা করার জন্যে মানুষেরাই এই অস্ত্রগুলো আবিষ্কার করেছে রুহানের সেটা বিশ্বাস হতে চায় না।

কমবয়সী অস্ত্র বিশেষজ্ঞ রুহানের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোনটা নিতে চাও?"

রুহান বলল, "আমি কোনোটাই নিতে চাই না?"

রুহান খুব একটা মজার কথা বলেছে এরকম ভান করে কমবয়সী অস্ত্র বিশেষজ্ঞ হা হা করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "একজন খেলোয়াড় খালি হাতে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে দৃশ্যটা কল্পনা করতেও কষ্ট।"

"খেলোয়াড়ের হাতে অস্ত্র থাকতেই হবে?"

"হ্যাঁ। খেলাটি হচ্ছে তোমার প্রতিপক্ষকে হত্যা করা। তুমি যদি হত্যাই করতে না পার তা হলে কে তোমার খেলা দেখবে?"

রুহান বিষণ্ন দৃষ্টিতে অস্ত্রগুলোর দিকে তাকায়। একটা একটা করে অস্ত্র হাতে তুলে নেয়, নেড়েচেড়ে দেখে। অস্ত্র বিশেষজ্ঞ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে তার অঙ্গভঙ্গি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে।

শেষ পর্যন্ত রুহানকে তার শরীরের কাঠামোর সাথে মিলে যায় এরকম কয়েকটা অস্ত্র বেছে দেওয়া হল। একজন খেলোয়াড় যতগুলো খুশি অস্ত্র নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যেহেতু পুরো খেলাটিই হচ্ছে এক ধরনের ক্ষিপ্রতার খেলা তাই কেউ বেশি অস্ত্র নিয়ে যায় না, দুটি কিংবা খুব বেশি হলে তিনটি ভিন্ন ধরনের অস্ত্র নিয়ে যায়। অস্ত্রগুলো কোমর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কিংবা উরুতে বেঁধে নেওয়া হয়। কেউ কেউ একটা পিঠে ঝুলিয়ে রাখতে পছন্দ করে। গুলির বাড়তি ম্যাগাজিনগুলো বেল্টের মতো করে বুকে কিংবা পায়ের সাথে বেঁধে নেওয়া হয়। প্রথম দিন রুহানকে তার অস্ত্রগুলোর সাথে পরিচিত করানো হল। দূরের টার্গেট তাকে দিয়ে লক্ষ্যভেদ করানো হল। যে মানুষ জীবনে কখনো অস্ত্র হাতে স্পর্শ করে নি সেই হিসেবে তার নিশানা অসাধারণ। রুহানের ভেতরে এক ধরনের সহজাত ক্ষিপ্রতা আছে যেটা সচরাচর মানুষের ভেতর চোখে পড়ে না। রুহান নিজেও সেটা জানত না।

সারা দিন প্রশিক্ষণ নিয়ে রুহান সন্ধেবেলা পরিশ্রান্ত ঘর্মাক্ত আর ক্লান্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। কিছুক্ষণ নিজের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে তারপর বাথরুমে টগবগে গরম পানিতে রগড়ে রগড়ে গোসল করে বের হয়ে আসে। টেবিলে তার খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, রুহান ঢাকনা খুলে খেতে বসে। ফলের রস, যবের রুটি, ভেড়ার মাংসের স্টু, গরম সুপ আর কাঁচা সবজি। বহুদিন সে এরকম খাবার খাওয়া দূরে থাকুক চোখেই দেখে নি। খেতে বসে তার হঠাৎ করে মায়ের কথা মনে পড়ল, তার ছোট দুটি বোনের কথা মনে পড়ল। খাবার টেবিলে শুকনো রুটি আর পাতলা পানির মতো সুপ খেতে গিয়ে ছোট বোন দুটি কী আপত্তিই না করত। ক্ষুধার্ত রুহানের হঠাৎ করে খিদেটা যেন উবে যায়। সে দীর্ঘসময় খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর খানিকটা রুটি আর এক বাটি সুপ খেয়ে উঠে যায়।

রুহান তার নিজের ঘর থেকে বের হয়ে হলঘরের দিকে এগিয়ে যায়, তার খুব সৌভাগ্য যে তাকে ছোট একটা ঘরের ভেতর তালাবদ্ধ করে রাখে নি। তাকে তার ঘর থেকে বের হতে দিয়েছে অন্যদের সাথে মেলামেশা করতে দিয়েছে। মাথায় ইলেকট্রড বসানো ছেলেমেয়েগুলোর সাথে কথাবার্তা বলার খুব একটা সুযোগ নেই, কিন্তু বৃদ্ধ কিহি খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমৎকার একজন সঙ্গী। রুহান বড় হলঘরে গিয়ে কিহিকে খুঁজে বের করল। সে একটা নরম চেয়ারে গা ডুবিয়ে বসে আছে, চোখের দৃষ্টি বহুদূরে। রুহানকে দেখে কিহি সোজা হয়ে বসে বলল, "কী খবর রুহান। খেলোয়াড় হবার প্রথম দিনটি তোমার কেমন গেছে?"

রুহান কিহির পাশে বসে বলল, "আমি ঠিক যেরকম ভেবেছিলাম, সেকরম।"

"তুমি কীরকম ভেবেছিলে?"

"অর্থহীন শারীরিক ব্যাপার। সহজাত ব্যাপার।" রুহান একটু থেমে কিহির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি বলতে পারবে কিহি, পৃথিবীটা এরকম কেন হয়ে গেল? পৃথিবীর মানুষ কী এর চাইতে ভালো একটা পৃথিবী পেতে পারে না?"

"অবশ্যই পারে।" কিহি রুহানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবং তুমি নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ পৃথিবীর মানুষ সেই পৃথিবী পাবে।"

"কখন পাবে? কীভাবে পাবে?"

"সেটা আমি জানি না।" কিহি মাথা নেড়ে বলল, "আমি ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি মানুষের সভ্যতা মাঝে মাঝেই এরকম অন্ধ কানাগলিতে ঘুরপাক খায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে বের হয়ে আসে।"

'কীভাবে বের হয়ে আসে?"

কিহি দুর্বলভাবে হেসে বলল, "সেটাও আমি জানি না। মানুষের একেবারে ভেতরে মনে হয় মনুষ্যত্ব বলে একটা জিনিসি থাকে। যত দুঃসময়ই হোক সেই মনুষ্যত্বটা বুকের ভিতরে ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকে। যখন সবকিছু অন্ধকারে ঢেকে যায় তখন সেই মনুষ্যত্বের ছোট আগুনটা হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।"

রুহান কিহির দিকে তাকিয়ে রইল। এই বৃদ্ধ মানুষটি কথা বলে খুব সুন্দর করে। তার কথা রুহানের খুব বিশ্বাস করার ইচ্ছে করে, কিন্তু সে যেটা বলছে সেটা কি আসলেই সত্যি?

রুহান কিহির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি বলছ একসময় আবার মানুষের সভ্যতা মাথা তুলে দাঁড়াবে?"

"হ্যাঁ। মাথা তুলে দাঁড়াবে।"

রুহান নিজেকে দেখিয়ে বলল, "এই যে, আমাকে দেখ।"

কিহি হাসিমুখে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখছি।"

"তোমার কি মনে হয় আমি একজন রক্তপিপাসু খুনি?"

"না। মোটেও মনে হয় না রুহান। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি একজন খুব হৃদয়বান তরুণ।"

"কিন্তু আমাকে কেমন করে মানুষ খুন করতে হয় তার ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। কত দ্রুত কতগুলো অস্ত্র দিয়ে আমি কতগুলো মানুষকে খুন করতে পারি সেটাই হবে আমার কাজ। আর আমি যদি সেটা না করি, তা হলে কী হবে জান?"

কিহি বিষণ্ন মুখে মাথা নেড়ে বলল, "জানি।"

"তা হলে আমাকে অন্যেরা মেরে ফেলবে। এখন তুমিই বল কিহি, আমি কি বেঁচে থাকব না মরে যাব?"

কিহি তার হাত দিয়ে রুহানের হাত স্পর্শ করে বলল, "তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে রুহান। মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।"

"একজন খুনির কি মানুষের মর্যাদা আছে?"

কিহি মাথা নেড়ে বলল, "না। নেই।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তা হলে?"

কিহি বিষণ্ন মুখে মাথা নেড়ে বলল, "আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর জানি না রুহান।"

রুহান আর কিহি দুজন চুপচাপ বসে থাকে। সামনে অপ্রকৃতিস্থ তরুণ-তরুণীরা তাদের শিশুর মতো ভঙ্গিতে নিজেদের সাথে কথা বলছে, তর্ক করছে, কেউ কেউ ঝগড়া করছে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে তাদের দেখতে দেখতে রুহান একসময় বলল, "কিহি, তুমি বিশ্বাস কর একসময় মানুষ আবার তাদের সভ্যতা ফিরে পাবে।"

"হ্যাঁ। আমি বিশ্বাস করি।"

'সভ্যতার জন্যে দরকার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গবেষণা।"

"হ্যাঁ।"

রুহান তার গলায় ঝোলানো ক্রিস্টাল রিডারটা দেখিয়ে বলল, "তার জন্যে দরকার আমাদের ক্রিস্টাল রিডার। যেটা আমার জন্যে তথ্য বাঁচিয়ে রাখবে, তথ্য দেওয়া-নেওয়া করবে।"

"হ্যাঁ।" কিহি আবার মাথা নাড়ল।

"কিন্তু আমি শুনেছি গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীতে একটা ক্রিস্টাল রিডার তৈরি হয় নি। তা হলে আমরা নূতন কিছু শিখব কেমন করে?"

কিহির মুখে সূক্ষ্ম এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে। সে রুহানের হাতটা নিজের কাছে টেনে এনে যেখানে কিছু বিদঘুটে চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে সেটা দেখিয়ে বলল, "এটা কী তুমি জান?"

"না। এটা কী?"

"এখানে একটা সংখ্যা লেখা আছে।"

রুহান অবাক হয়ে বলল, "সংখ্যা লেখা আছে?"

"হ্যাঁ। আমি যদি ভুল না করে থাকি তা হলে সংখ্যাটি হচ্ছে ছয় শূন্য তিন তিন নয় চার দুই।"

রুহান অবাক হয়ে বলল, "তুমি এটা কেমন করে বললে?"

"আমি এটা পড়েছি। যখন ক্রিস্টাল রিডার ছিল না তখন মানুষ লিখত এবং সেই লেখা পড়ত। প্রত্যেক কথা লেখা হত বর্ণমালা দিয়ে। ক্রিস্টাল রিডার আসার পর ভাষার এই লিখিত রূপটা উঠে গেছে। এখন আমরা সরাসরি ক্রিস্টাল রিডারে বলি, ক্রিস্টাল রিডার থেকে শুনি। সেটাতে সবকিছু বাঁচিয়ে রাখি।"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি বর্ণমালার কথা শুনেছি। আমাদের গ্রামে একজন বুড়ো মানুষ ছিল, কুরু। সে আমাকে বলেছিল।"

কিহি বলল, "যদি সত্যি সত্যি ক্রিস্টাল রিডার পৃথিবী থেকে উঠে যায় তা হলে আমাদের এক ধাপ পিছিয়ে যেতে হবে। আমাদের আবার বর্ণমালা শিখতে হবে। আমাদের আবার পড়তে শিখতে হবে, লিখতে শিখতে হবে।"

রুহান কিহির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি লিখতে পড়তে জানো?"

"হ্যাঁ। আমি একটু একটু করে শিখেছি। আমি বুড়ো মানুষ, আমার অনেক অবসর। আমি আমার অবসরে এ ধরনের অর্থহীন কাজ করি।"

রুহান হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, "তুমি আমাকে লিখতে পড়তে শেখাবে কিহি।"

"কেন শেখাব না! অবশ্যই শেখাব। বর্ণমালাগুলো তোমার ক্রিস্টাল রিডারে ঢুকিয়ে নাও, দেখবে দেখতে দেখতে শিখে যাবে।"

"আমি কোথায় বর্ণমালাগুলো পাব?"

"আমার কাছে আছে। আমি তোমাকে দেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ধন্যবাদ কিহি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

কিহি তার আরামদায়ক চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "পৃথিবীর পুরো জ্ঞানভাণ্ডারই এরকম বর্ণমালা দিয়ে লেখা আছে।"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, আমিও এটা শুনেছি।"

"আরো প্রাচীন কালে সেগুলো রাখা হত কাগজে লিখে, সেগুলোর নাম ছিল বই।"

"বই?"

"হ্যাঁ। এখনো পৃথিবীর অনেক জায়গায় বড় বড় লাইব্রেরিতে বই সাজানো আছে। কেউ আর সেগুলো পড়তে পারে না। কিন্তু তবু সাজিয়ে রাখা আছে।" কিহি হঠাৎ ঘুরে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কখনো বই দেখেছ?"

"না।"

"আমার কাছে একটা বই আছে। তুমি দেখতে চাও?"

"হ্যাঁ। দেখতে চাই।" রুহান উত্তেজিত হয়ে বলল, "দেখাবে আমাকে?"

কিহি হেসে বলল, "কেন দেখাব না? অবশ্যই দেখাব। এস আমার সাথে।"

রুহান কিহির পিছনে পিছনে লম্বা করিডোর ধরে হেঁটে তার ছোট ঘরটিতে হাজির হল। একটা শক্ত বিছানার পাশে একটা টেবিল, সেখানে কিছু দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র। সেখান থেকে চতুষ্কোণ একটা জিনিস হাতে তুলে নিয়ে কিহি রুহানের হাতে দিল। রুহান সেটা হাতে নিয়ে খুলে দেখে ভেতরে সারি সারি সাদা পৃষ্ঠা, সেই পৃষ্ঠাগুলোতে বিচিত্র নকশার মতো চিহ্ন সাজানো। এগুলো নিশ্চয়ই বর্ণমালা দিয়ে লেখা। রুহান কিছুক্ষণ বিস্ময় নিয়ে বইটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর সেটি কিহির হাতে দিয়ে বলল, "তুমি এটা পড়তে পারবে?"

কিহি হেসে বলল, "হ্যাঁ। পারব।"

"আমাকে একটু পড়ে শোনাও না।"

কিহি বইটি তার চোখের সামনে খুলে ধরে বলল, "এটা একটা কবিতার বই। কোনো একজন প্রাচীন কবির লেখা কবিতা। এই যে দেখ, এখানে লেখা—

ধান কাটা হ'য়ে গেছে কবে যেন—খেতে মাঠে প'ড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত
এইসব উৎরায়ে ওইখানে মাঠের ভিতর
ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—কেমন নিবিড়।

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কী সুন্দর কথাগুলো।"

কিহি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। কথাগুলো খুব সুন্দর। যখন শুরু করেই দিয়েছি, তা হলে তোমাকে বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষর দেখিয়ে দিই।"

রুহান বলল, "হ্যাঁ, দেখাও।" সে বইয়ের একটা পৃষ্ঠা খুলে তার উপর ঝুঁকে পড়ল।

সারাটি দিন রুহানকে অস্ত্রের ব্যবহার আর শারীরিক দক্ষতার উপর ট্রেনিং দেওয়া হয়। ক্লান্ত ঘর্মাক্ত হয়ে ফিরে এসে সে গোসল করে খেয়ে বর্ণমালাগুলো নিয়ে বসে। দেখতে দেখতে সে পড়তে শিখে গেল। তার এখনো বিশ্বাস হয় না পৃথিবীর সব মানুষ একসময় পড়তে পারত। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে ক্রিস্টাল রিডারে অভ্যস্ত বলে তার কাছে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণমালা ব্যবহার করে পড়ার এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে মনে হচ্ছে আদিম একটা পদ্ধতি। কিন্তু সত্যি সত্যি যদি পৃথিবী থেকে একদিন ক্রিস্টাল রিডার উঠে যায় তখন তো জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধরে রাখার জন্যে এই বর্ণমালার কাছেই ফিরে আসতে হবে। প্রথম প্রথম পড়তে এবং পড়ে কিছু একটা বুঝতে তার যেরকম কষ্ট হত এখন আর সেটা হয় না। কিহির কাছ থেকে যে কবিতার বইটি এনেছে সেটা সে পড়তে পারে, পড়ে বুঝতে পারে; শুধু যে বুঝতে পারে তা নয়, অনুভবও করতে পারে।

দেখতে দেখতে রুহানের জীবনটি মোটামুটি একটা ছকের ভেতরে চলে এল। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠার পরই তাকে বেশ কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করতে হয়। তারপর তাকে কিছু একটা খেতে হয়— স্বাস্থ্যকর এবং বলকারক খাবার। তারপর তাকে কিছুক্ষণ খেলোয়াড়দের নানা ধরনের খেলার ভিডিও দেখতে হয়, সেটা তার জন্যে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। কোন খেলোয়াড়ের কী বিশেষত্ব সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে বোঝানো হয়। কে কোন খেলায় কেন জিতেছে সেটা ব্যাখ্যা করা হয়। দেখতে দেখতে রুহান এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করে। তার মাঝে মাঝে মনে হয় সে যদি একজন খেলোয়াড় না হয়ে একজন "সক্রেটিস" হয়ে যেত তা হলেই কি ভালো হত? মানুষকে কত সহজে কত দ্রুত খুন করা যায় এই বিদ্যাটা তা হলে অন্তত তাকে নিশ্চয়ই হয়তো শিখতে হত না।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর রুহানকে অস্ত্র হাতে ট্রেনিং শুরু করতে হয়। শরীরের নানা জায়গায় অস্ত্রগুলো বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সেগুলো তাকে চোখের পলকে টেনে বের করে গুলি করতে হয়। নানা ধরনের টার্গেট থাকে সেখানে লক্ষ্যভেদ করতে হয়। রুহান নিজেই বুঝতে পারে, সে সাধারণ একজন মানুষ থেকে দেখতে দেখতে বিচিত্র বোধশক্তিহীন একজন পেশাদার হত্যাকারীতে পাল্টে যাচ্ছে। মানুষকে কত দ্রুত কোথায় আঘাত করতে হবে সেটি বুঝি তার থেকে ভালো করে আর কেউ জানে না। সে কি এটাই চেয়েছিল?

রুহান বুঝতে পারছিল পাহাড়ের কাছাকাছি এই ট্রেনিং সেন্টার থেকে তার বিদায় নেবার সময় চলে আসছে। একজন মানুষকে যতটুকু শেখানো সম্ভব মোটামুটি সবই তাকে শেখানো হয়েছে। এখন তাকে কোনো একটি সত্যিকার খেলায় নামিয়ে দিতে হবে। যেখানে সে মুখোমুখি দাঁড়াবে একজন সত্যিকার মানুষের সামনে, যে মানুষটি হবে ঠিক তার মতো একজন খেলোয়াড়। ঠিক তার মতোই ক্ষিপ্র, তার মতোই মানুষকে হত্যা করার জন্যে প্রস্তুত।

তাই একদিন ভোরবেলা যখন ঘুম থেকে উঠে আবিষ্কার করল তার ঘরের ভেতর চারজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝতে পারল সে যে সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছে সেই সময়টুকু চলে এসেছে।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন বলল, "রুহান, তোমার এখন আমাদের সাথে যেতে হবে।"

"কোথায়" শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে রুহান থেমে গেল। জিজ্ঞেস করে কী হবে? রুহান শান্ত গলায় বলল, "এখানে আমার সাথে অনেকের পরিচয় হয়েছে। আমি কি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি?"

"না।" মানুষটি শীতল গলায় বলল, "তোমাকে আমরা খেলোয়াড় হিসেবে তৈরি করেছি। বিদায় নেওয়ার মতো ছেলেমানুষি মানবিক বিষয়গুলো তোমার ভেতরে থাকার কথা নয়। তোমাকে বুঝতে হবে, তুমি হবে বোধশক্তি ভালবাসাহীন একটা ক্ষিপ্র যন্ত্র।"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

মানুষটি হাসিমুখে মাথা নাড়ল, রুহানের বিদ্রুপটুকু ধরতে পারল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারে একজন একটা কালো কাপড় নিয়ে এল। বলল, "তোমার চোখ দুটো বেঁধে নিতে হবে রুহান।"

রুহান একবার ভাবল সে জিজ্ঞেস করবে, "কেন আমার চোখ বেঁধে নিতে হবে?" কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল না। কী হবে জিজ্ঞেস করে?

চোখ বাঁধা অবস্থায় রুহানকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সে কিছু দেখতে না পেয়েও বুঝতে পারছিল হলঘরে অপ্রকৃতিস্থ কিছু তরুণ-তরুণী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কিছু বলছে না কিন্তু তারপরেও সে অনুভব করল তারা বুঝি ফিসফিস করে বলছে, "বিদায়। বিদায়। রুহান রুহান।"

৭

মেয়েটি রুহানের থুতনি ধরে মুখটা উঁচু করে বলল, "ইস! তোমার চেহারাটা কী মিষ্টি! দেখে মনেই হয় না যে তুমি এত বড় খুনি।"

রুহান কিছু বলল না। সে কি আসলেই খুব বড় খুনি? মেয়েটা তার মুখটা ডান থেকে বামে নাড়িয়ে বলল, "এরকম মিষ্টি চেহারার মানুষ হয়ে তুমি মানুষ খুন করার খেলোয়াড় হলে কেমন করে?"

রুহান এবারেও কিছু বলল না। মেয়েটা হাতে খানিকটা কালো রঙ নিয়ে রুহানের চিবুকের নিচে লাগিয়ে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। রুহান বলল, "তুমি কী করছ? আমার মুখে রঙ লাগাচ্ছ কেন?

"তোমার মুখে একটু নিষ্ঠুর ভাব আনার চেষ্টা করছি। চোয়ালের হাড় উঁচু থাকলে মানুষকে নিষ্ঠুর দেখায়। চোখটাও গভীরে ঢোকাতে হবে। চুলগুলো আরো ছোট করে ছাঁটতে হবে।"

"কেন? আমাকে এরকম নিষ্ঠুর দেখাতে হবে কেন? আমাকে যে কাজে ব্যবহার করছ সেটা কি যথেষ্ট নিষ্ঠুর না?"

"সেজন্যেই তো এটা জরুরি। একটা নিষ্ঠুর কাজে যাচ্ছে একজন মানুষ, তার চেহারাটা যদি ছোট শিশুর মতো কোমল হয় তা হলে কেমন করে হবে?"

মেয়েটা তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে চোখের নিচে খানিকটা রঙ লাগিয়ে মাথা বাঁকা করে তাকে দেখল। তারপর মাথা নামিয়ে বলল, "নাহ্। তোমার চেহারায় নিষ্ঠুরতা ঠিক আসছে না।"

রুহান বলল, "ছেড়ে দাও। আমি হয়তো আর ঘণ্টাখানেক বেঁচে আছি। এখন কি এগুলো ভালো লাগে?"

মেয়েটা হাত দিয়ে পাশের টেবিলে ঠোকা দিয়ে বলল, "কাঠে ঠোকা। কাঠে ঠোকা। অপয়া কথা বোলো না। ঘণ্টাখানেক বলছ কেন? তুমি অনেকদিন বেঁচে থাকবে। সব খেলোয়াড়কে খুন করে তুমি হবে খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়। হাজার ইউনিট দিয়ে মানুষ তখন তোমার খেলা দেখতে আসবে।"

রুহান কোনো কথা বলল না। তার ভেতরে সে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। পাথরের দেয়ালে ঘেরা একটা মাঠের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, সেখানে থাকবে ঠিক তার মতো একজন—মানুষ হত্যা করতে যার এতটুকু দ্বিধা নেই, শিকারিরা যেভাবে পাখিকে গুলি করে ঠিক সেভাবে গুলি করবে সে। চারপাশে থাকবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার হাজার মানুষ। তারা চিৎকার করবে আনন্দে। মানুষকে খুন করার দৃশ্য কি আসলেই আনন্দের হতে পারে?

মেয়েটা বলল, "তুমি কী ভাবছ?"

"কিছু না।"

"মানুষ 'কিছু না' ভাবতে পারে না। ভাবনাতে কিছু না কিছু থাকতে হয়। তোমার বলা উচিত ছিল আমি কী ভাবছি, সেটা বলতে ইচ্ছে করছে না।"

রুহান বলল, "আমি কী ভাবছি বলতে ইচ্ছে করছে না।"

"ঠিক আছে, বলতে হবে না।" মেয়েটা রুহানের মুখে কয়েক জায়গায় একটু রঙ মাখিয়ে আবার তাকে ভালো করে লক্ষ করে, তারপর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। কোনোভাবেই রুহানকে নিষ্ঠুর রক্তলোভী একটা মানুষে পাল্টে দেওয়া যাচ্ছে না।

রুহান জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী মেয়ে?"

"আমার নাম জেনে তুমি কী করবে?"

"কিছু করব না। এমনি জানতে চাইছি।"

"আমার নাম ত্রিনা।"

"ত্রিনা? কী আশ্চর্য!"

"কেন? আশ্চর্য কেন?"

"আমার একটি ছোট বোন আছে, তার নাম ত্রিনা।" রুহান এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "তোমার কী মনে হয় ত্রিনা, আমি কি কখনো আবার আমার ছোট বোনকে দেখব?"

"সত্যি কথা বলব?"

"বল।"

ত্রিনা নামের মেয়েটা বলল, "একজন খেলোয়াড়ের ভাই বোন মা এসব থাকতে হয় না। যার আপনজন থাকে সে কখনো খেলোয়াড় হতে পারে না।"

রুহান বলল, "ও।"

ত্রিনা বলল, "হ্যাঁ। এখন তুমি কথা বোলো না, তুমি কথা বললে আমি তোমার মুখে ঠিক করে রঙ লাগাতে পারি না।"

রুহান বলল, "ঠিক আছে ত্রিনা। আমি এখন কথা বলব না, ত্রিনা।"

রুহান অবাক হয়ে লক্ষ করল, প্রতিবার ত্রিনা কথাটা উচ্চারণ করতেই তার ভেতরে কিছু একটা যেন কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে সত্যিই বুঝি সে তার বোনের সাথে কথা বলছে।

ত্রিনা চলে যাবার পর নীল কাপড় পরা চারজন মানুষ তার অস্ত্রগুলো নিয়ে এল। তারা সময় নিয়ে অস্ত্রগুলো তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বেল্ট দিয়ে বেঁধে দিতে থাকে। গুলির ম্যাগাজিন ঝুলিয়ে দিতে থাকে। রুহান বলল, "আমাকে যত গুলি দিচ্ছ মনে হচ্ছে একজন নয়, একশজনের সাথে যুদ্ধ করব।"

মানুষ চারজনের কেউ তার কথার উত্তর দিল না। একটু পরেই যে ঘটনাটি ঘটবে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—সেটা নিয়ে কেউ হালকা কিছু বলতে চায় না। বলার সাহস পায় না। রুহানকে অস্ত্র দিয়ে সাজিয়ে দেবার পর তারা তাকে সামনে হাঁটিয়ে নিতে থাকে। তখন রুহান প্রথমবার অসংখ্য মানুষের কলরব শুনতে পায়। তার সাথে সাথে লাউড স্পিকারে একজন মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। একজন মানুষ চিৎকার করে কিছু একটা বলছে—গলার স্বরে উত্তেজনা। কী বলছে স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে না শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরে প্রায় উন্মত্ততার কাছাকাছি উত্তেজনাটুকু ধরা পড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান পাশের মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "কী বলছে ওখানে?"

"তোমার কথা।"

"আমার কথা?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কী কথা?"

"তুমি কী ভয়ঙ্করভাবে আজকে তোমার প্রতিপক্ষকে হত্যা করবে, এইসব।"

রুহান একটু অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকাল। সত্যিই কি তাই বলছে? সত্যিই কি এই ধরনের কথা বলা যায়? বলা সম্ভব?

হঠাৎ হাজার হাজার মানুষের চিৎকার শোনা যায়। রুহান মাথা ঘুরিয়ে পাশের মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "সবাই চিৎকার করছে কেন?"

"তোমার প্রতিপক্ষ এইমাত্র মাঠে এসেছে। সবাই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। তুমি যখন যাবে, তখন তোমাকেও এভাবে অভিনন্দন জানাবে।"

"আমি কখন যাব?"

"এই তো এক্ষুনি যাবে। যখন তোমাকে ডাকবে।"

হঠাৎ করে রুহান নিজের ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে। কিছুক্ষণের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে সে তার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারছে না। এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ হয়ে যাক—সে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে পারবে না। রুহানের নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে আসে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। সমস্ত শরীর টান টান হয়ে থাকে উত্তেজনায়।

ঠিক এরকম সময়ে পাশে দাঁড়ানো মানুষটি বলল, "চল। তোমাকে ডাকছে।"

রুহান কোনো কথা না বলে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। সামনে একটা বড় স্টেনলেস স্টিলের গেট। কাছাকাছি আসতেই গেটটি নিঃশব্দে খুলে গেল, সাথে সাথে সে বাইরে অসংখ্য মানুষের গুঞ্জন শুনতে পেল। লাউড স্পিকারে মানুষটির কথা হঠাৎ করে স্পষ্ট হয়ে যায়। গমগমে উত্তেজিত গলায় একজন বলছে, "তোমরা যারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিষ্ঠুর একটা হত্যাকারীকে দেখার জন্যে ধৈর্য ধরে বসে আছ, সে আসছে। সে তোমাদের সামনে আসছে। এই ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু হিংস্র মানুষটি হচ্ছে রুহান রুহান!"

রুহান খোলা গেট দিয়ে হেঁটে বাইরে মাঠে এসে দাঁড়ায়, চারপাশে পাথরের দেয়াল, তার উপরে বসার জায়গা। সেখানে হাজার হাজার মানুষ বসে আছে। তাকে দেখে তারা আনন্দে চিৎকার করতে থাকে। রুহানের এখনো বিশ্বাস হয় না, এই হাজার হাজার মানুষ একটা হত্যাকাণ্ড দেখতে এসেছে? কে কাকে হত্যা করতে পারে সেই ভয়ঙ্কর খেলার দর্শক এরা? এরা কি মানুষ? মানুষ কি এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড দেখে আনন্দ পেতে পারে? পাওয়া সম্ভব?

রুহান হাজার হাজার মানুষের চিৎকার আর আনন্দধ্বনি শুনতে শুনতে চারদিকে তাকাল। তখন সে মাঠের অন্য পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পেল। মাঠটি অনেক বড়, মানুষটি অনেক দূরে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার চেহারাটি ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। না দেখেও সে বুঝতে পারে মানুষটির মুখমণ্ডল নিশ্চয়ই পাথরের মতো শক্ত, চোখের দৃষ্টি ক্রূর। রুহান এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। এই মানুষটি তাকে হত্যা করবে নাকি সে এই মানুষটিকে হত্যা করবে?

হঠাৎ করে আবার সে লাউড স্পিকারে একজন মানুষের গমগমে গলার স্বরে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। মানুষটি উন্মত্তের মতো চিৎকার করে বলে, "তোমরা সবাই যে খেলাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখার জন্যে শত শত কিলোমিটার দূর থেকে এসেছ, এক্ষুনি সেই খেলাটি দেখবে। এই খেলা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। এই খেলা হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ মানুষকে হত্যা করার খেলা!"

বিশাল মাঠের চারপাশে বসে থাকা অসংখ্য মানুষ এক ধরনের আনন্দধ্বনি করে ওঠে।

মানুষটির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আবার গমগম করে ওঠে, "এই বিশাল আনন্দ মেলায় সবাইকে স্বাগতম। আজকের এই খেলা যিনি আয়োজন করেছেন, এই অঞ্চলের সেই অলিখিত সম্রাট, যুদ্ধবাজ নেতা সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বীর সাহসী যোদ্ধা ক্রিভনকে সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন।"

রুহান দেখতে পেল একেবারে সামনের সারিতে বসে থাকা জমকালো পোশাকে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ উঠে দাঁড়াল, উপস্থিত হাজার হাজার মানুষ চিৎকার করে তাকে অভিনন্দন জানাল। ক্রিভন হাত নেড়ে সবার অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দেয় তারপর আবার নিজের জায়গায় বসে যায়।

লাউড স্পিকারে গমগমে গলায় মানুষটি বলে, "তোমরা সবাই দেখেছ, মাঠের উত্তর পাশে দাঁড়িয়ে আছে রুহান রুহান। ভয়ঙ্কর হিংস্র রুহান রুহান। মাঠের দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে আছে রিদি—নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু রিদি।"

"আমার প্রিয় দর্শকেরা। তোমরা কি এখন এই দুই হিংস্র মানুষ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তেজনাময় খেলার খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে চাও?"

হাজার হাজার মানুষ উন্মত্ত গলায় চিৎকার করে ওঠে "দেখতে চাই দেখতে চাই!"

লাউড স্পিকারে আবার মানুষটির গলা শোনা গেল, "তা হলে দেখ! রুহান রুহান এবং রিদি হাজার হাজার মানুষ তোমাদের খেলা দেখতে এসেছে। দেখাও তোমাদের খেলা। দেখাও। হত্যা কর একজন আরেকজনকে। হত্যা কর। হত্যা—হত্যা—"

লাউড স্পিকারে ভয়ঙ্কর একটা বাজনা বেজে হঠাৎ করে সেটি থেমে যায়। রুহানের মনে হয় কোথাও কোনো শব্দ নেই। চারপাশে পাথরের দেয়াল, দেয়ালের উপর সারি সারি বসে থাকা মানুষ সবকিছু কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যায়। মনে হয় কোথাও কেউ নেই। শুধু বহু দূরে দুই পা অল্প একটু ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। যে কোনো মুহূর্তে মানুষটি একটা অস্ত্র তুলে নিয়ে তাকে গুলি করবে।

মানুষটি অনেক দূরে, তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। রুহানের কী হল কে জানে, হঠাৎ করে এই মানুষটার সত্যিকার চেহারা দেখার একটা অদম্য ইচ্ছে তার বুকের ভেতর জেগে উঠল। যে মানুষটাকে সে হত্যা করবে কিংবা যে মানুষটা তাকে হত্যা করবে, তাকে সে ভালো করে একবার দেখবে না, চোখে চোখে তাকাবে না, সেটা তো হতে পারে না। রুহান তাই এক পা অগ্রসর হল।

বহুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিও ঠিক এক পা অগ্রসর হল। কী আশ্চর্য! সে যেরকম মানুষটিকে কাছে থেকে দেখতে যাচ্ছে ঠিক সেরকম এই মানুষটিও তাকে কাছে থেকে দেখতে চাচ্ছে? তার যেরকম কৌতূহল রিদি নামের মানুষটারও কি ঠিক সেই একই রকম কৌতূহল? রুহান তখন আরো এক পা অগ্রসর হয়—রিদি নামের মানুষটাও এক পা অগ্রসর হয়। রুহান হাত দিয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুলে নেয়। ডান হাতে টুপিটা ধরে রাখায় আপাতত সেই হাতটি অচল হয়ে গেল। রিদিকে সে এটা জানিয়ে দিতে চায় সে এই মুহূর্তে ডান হাতে অস্ত্র তুলে নেবে না, ইচ্ছে করলেও পারবে না। রিদিও তার মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে নেয়। এই মানুষটাও রুহানকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানাল, সে এই মুহূর্তে তাকে গুলি করবে না। আগে কাছে এস তোমাকে একবার ভালো করে দেখি।

দুজন দুজনের দিকে হেঁটে যেতে থাকে। পাথরের দেয়ালের উপরে বসে থাকা সারি সারি মানুষের ভেতরে একটা বিস্ময়ধ্বনি শোনা যায়, কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, দুজন খেলোয়াড় একজন আরেকজনের কাছে এত সহজে এগিয়ে যেতে পারে। নূতন এক ধরনের উত্তেজনার জন্যে সবাই সোজা হয়ে বসে, তাদের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে। নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়।

রুহান আর রিদি হেঁটে হেঁটে একজন আরেকজনের খুব কাছাকাছি এসে থামল। এত কাছে যে ইচ্ছে করলে একজন আরেকজনকে স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু তারা একজন আরেকজনকে স্পর্শ করল না, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

রিদির মুখে ছোপ ছোপ কালো রঙ, চেহারায় ভয়ঙ্কর একটি ছাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। রুহান অবাক হয়ে দেখল ছোপ ছোপ কালো রঙের আড়ালে রিদির চেহারায় এক আশ্চর্য সারল্য। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ, বিষণ্ন এবং বেদনাতুর। তরুণটি তার দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, মনে হয় সে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

রুহান রিদির দিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, "আমি পারব না।"

"কী পারবে না?"

"আমি তোমাকে হত্যা করতে পারব না।"

রিদির মুখে বিচিত্র এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে। সে হাসিটাকে ধরে রেখে বলল, "চারদিকে তাকিয়ে দেখ, কত মানুষ। তারা সব দেখতে এসেছে তুমি আমাকে কেমন করে হত্যা করবে আর আমি তোমাকে কেমন করে হত্যা করব।"

"আসুক।"

"তারা অপেক্ষা করছে।"

"করুক। তুমি চাইলে আমাকে হত্যা করতে পার।" রুহান মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করব না।"

"তুমি তা হলে কী করবে?"

রুহান বলল, "আমি জানি না।"

"তুমি কিছু না করে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তোমাকে কিছু একটা করতে হবে।"

"করতেই হবে?"

"হ্যাঁ। করতেই হবে।"

রুহান মাথার টুপিটা পরে বলল, "ঠিক আছে, তা হলে কিছু একটা করি।"

এরপর সে যে কাজটা করল তার জন্যে রিদি প্রায় হাজার দশেক শ্বাসরুদ্ধ দর্শক এমনকি সে নিজেও প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ করে সে ঘুরে দাঁড়ায়, তারপর পাথরের দেয়ালের দিকে ছুটে যায়। এবড়োখেবড়ো দেয়াল ধরে সে ক্ষিপ্র সরীসৃপের মতো উপরে উঠে কিছু বোঝার আগে জমকালো পোশাক পরা ক্রিভানের মাথার উপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা ধরে।

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বসে থাকা হাজার দশেক দর্শক বিস্ময়ের এক ধরনের আর্ত শব্দ করে হঠাৎ করে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়, মনে হয় একটা সুচ ফেললেও বুঝি তার শব্দ শোনা যাবে।

রুহান ফিসফিস করে বলল, "ক্রিভন! তোমার সেনাবাহিনীকে বলে দাও তারা যদি একটুও বোকামি করে তা হলে তোমার মস্তিষ্কে কমপক্ষে এক ডজন বুলেট ঢুকে যাবে।"

ক্রিভন কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তুমি কী চাও?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি ভালো করে জানি না।" রুহান অস্ত্রটা ক্রিভনের মাথায় আলতোভাবে স্পর্শ করে বলল, "আগে তোমার সেনাবাহিনীর কাছে নির্দেশ পাঠাও, তারা যেন হাতের অস্ত্র নিচে নামিয়ে রাখে। এই মুহূর্তে—"

ক্রিভনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, সে তার পাশে বসে থাকা সামরিক পোশাক পরা একজনকে বলল, "জেনারেল, তুমি এক্ষুনি নির্দেশ দাও। এই মুহূর্তে। কেউ যেন কোনো পাগলামি না করে।"

"চমৎকার!" রুহান এবার ক্রিভনের বুকের কাপড় টেনে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় তারপর তাকে ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে যায়। মাথার পিছনে অস্ত্রটা ধরে রেখে বলল, "এবারে আমার সাথে চল।"

ক্রিভন ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কোথায়?"

রুহান বলল, "আমি ভালো করে জানি না।" তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে পাথরের দেয়াল থেকে নিচে ফেলে দেয়। দেয়ালটি খুব বেশি উঁচু নয় কিন্তু ক্রিভন প্রস্তুত ছিল না বলে নিচে লুটোপুটি খেয়ে পড়ল, রুহান লাফিয়ে নামল ঠিক তার পাশে। রুহান পোশাক ধরে তাকে টেনে তুলে বলল, "ব্যথা পেয়েছ?"

ক্রিভন মুখে যন্ত্রণার চিহ্নটা সরাতে সরাতে বলল, "না। পাই নি।"

"চমৎকার!" রুহান তাকে নিজের খুব কাছাকাছি টেনে এনে বলল, "ক্রিভন, তুমি আমার কাছাকাছি থাক। তোমার গার্ডগুলোর যদি মাথা মোটা হয় আর তোমাকে বাঁচানোর জন্যে দূর থেকে গুলি করার চেষ্টা করে তা হলে সেটা যেন শুধু আমাদের গায়ে না লাগে, তোমার ঘিলুও যেন খানিকটা বের হয়ে আসে। বুঝেছ?"

ক্রিভন ফ্যাকাসে মুখে বলল, "কেউ গুলি করবে না।"

"না করলেই ভালো।"

রুহান ক্রিভনকে টেনে মাঠের মাঝামাঝি নিয়ে যায় যেখানে রিদি দুই হাতে দুটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রিদির মুখে বিচিত্র এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল। বলল, "রুহান! তুমি এটা কী করেছ?"

"এই পুরো এলাকার অলিখিত যুদ্ধবাজ সম্রাটকে ধরে এনেছি।"

"কেন?"

"তুমি বলেছ হাজার হাজার দর্শক অনেকগুলো ইউনিট খরচ করে আমাদের খেলা দেখতে এসেছে। কিছু একটা যদি না করি তা হলে তাদের খুব আশাভঙ্গ হবে।"

রিদি কিছুক্ষণ রুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ভালো মানুষের মতো হেসে ফেলল, তারপর কাছে এসে রুহানের পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "আমি আমার জীবনে তোমার চাইতে বিচিত্র মানুষ দেখি নি!"

রুহান বলল, "সেটা নিয়ে পরেও কথা বলা যাবে। কিন্তু ক্রিভনকে নিয়ে কী করি?"

রিদি হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে গাল ঘষে বলল, "দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার একটা সহজ উপায় হচ্ছে এই মাঠের মাঝখানে একে গুলি করে মেরে ফেলা। দর্শকদের তা হলে একেবারেই আশা ভঙ্গ হবে না। তারপর আমরা ঘোষণা করে দিই আমরা এখন এই সাম্রাজ্যের হর্তাকর্তা বিধাতা!"

ক্রিভানের মুখ হঠাৎ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে যায়। সে ভাঙা গলায় বলল, "ঈশ্বরের দোহাই লাগে তোমাদের, তোমরা যা চাও তাই দেব আমি—আমাকে প্রাণে মেরো না।"

"যা চাই তাই দেবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। ঈশ্বরের কসম খেয়ে বলছি—"

"বেশ।" রিদি অস্ত্রটা তার গলায় স্পর্শ করে বলল, "এই মুহূর্তে আমাদের দুইজনকে এখান থেকে বের হয়ে একটা বুলেটপ্রুফ গাড়িতে করে নিয়ে যাও।"

"নিয়ে যাব। অবশ্যই নিয়ে যাব। একশবার নিয়ে যাব।"

"কোথায় নিয়ে যাবে?"

ক্রিভন ভাঙা গলায় বলল, "তোমরা যেখানে বলবে। তোমরা যেখানে যেতে চাও—"

"যাবার কোনো জায়গা আছে নাকি আবার। পুরো দুনিয়াটাই তো তোমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে রেখেছ!"

"জঙ্গলে?"

"মাথা খারাপ, জঙ্গলে গিয়ে আমি শেয়াল কুকুরের মতো লুকিয়ে থাকব?"

"তা হলে কোথায় যাবে?"

"লাল পাহাড়ে গেলে কেমন হয়?"

"লাল পাহাড়ে?" ক্রিভনের মুখটা বিবর্ণ হয়ে যায়। "লা-লাল পাহাড়ে?"

"হ্যাঁ।" রিদি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা দিয়ে গলায় খোঁচা দিয়ে বলল, "কোনো সমস্যা আছে?"

"না, নেই।"

"চমৎকার!" রিদি ক্রিভনকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "চল যাই।"

ক্রিভন অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দুই পা হেঁটে সামনে যায়। রিদি পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে একবার দর্শকদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর রুহানের দিকে চোখ মটকে বলল, "দর্শকদের আরেকটু আনন্দ দেওয়া যাক কী বল?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।" সেও তার অস্ত্রটা বের করে নেয়। তারপর কেউ কিছু বোঝার আগে দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টির মতো গুলি করতে থাকে। ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে সবাই মাথা নিচু করে যে যেখানে আছে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করে, হুটোপুটি করে ছুটে পালাতে শুরু করে। রিদি হা হা করে হেসে বলল, "হায়রে আমাদের মুরগি ছানার দল! ইউনিট খরচ করে মানুষ মারা দেখতে এসেছে অথচ সাহসের নমুনা দেখ!"

রুহান বলল, "অনেক হয়েছে, এখন চল।"

রিদি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, দেখা যাক আসলেই আমরা পালাতে পারি কি না!"

ক্রিভনের পোশাকের পিছনে ধরে তারা তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। সমস্ত এলাকাটা তখন মানুষের হইচই চিৎকারে একটা নারকীয় পরিবেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে কোনো জায়গা থেকে কেউ গুলি করে তাদের শেষ করে দিতে পারে কিন্তু সেটা নিয়ে এখন চিন্তা করার সময় নেই।

রুহান আর রিদি পাশাপাশি ছুটতে থাকে। কিছুক্ষণ আগেও তাদের একজনের আরেকজনকে হত্যা করার কথা ছিল।

৮

পাহাড়ের উপর থেকে নিচের উপত্যকাটির দিকে তাকিয়ে রিদি বলল, "এই হচ্ছে সেই লাল পাহাড়।"

রুহান বলল, "এটা লালও না পাহাড়ও না তা হলে এর নাম লাল পাহাড় কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিদি হেসে বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আমি এর নাম দিই নি।"

"তুমি এখানে আসতে চেয়েছ—এটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই তুমি জান।"

"এমন কিছু জানি না, শুধু শুনেছি এই লাল পাহাড়টা কারো এলাকা না। সবার ভেতরে একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে গেছে যে এটা কেউ দখল করে নেবে না।"

"কেন?"

রিদি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, "সবারই ব্যবসাপাতি করতে হয়। অস্ত্র কিনতে হয়। সৈনিক বিক্রি করতে হয়। যন্ত্রপাতি ঠিক করতে হয়। তাই লাল পাহাড়টা এই সব করার জন্যে রেখে দিয়েছে।"

রুহান আঁকাবাঁকা রাস্তাটির দিকে তাকিয়ে রইল, সেটা পাহাড় ঘিরে নিচে উপত্যকায় নেমে গেছে। তাদেরকে এই পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে নেমে যেতে হবে। এরকম বেশ কয়েকটি রাস্তা চারদিক থেকে এসেছে। ওরা ইচ্ছে করলে ক্রিভনকে নিয়ে একেবারে উপত্যকায় নেমে যেতে পারত কিন্তু তা না করে এখানে নেমে পড়েছে। ক্রিভনের গলায় একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র চেপে ধরে রেখে বিশাল একটা বুলেটপ্রুফ গাড়ি করে শহরের ভেতর ঢুকলে শহরের সব মানুষ নিশ্চয়ই বিস্ফারিত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা কারো চোখে আলাদা করে পড়তে চায় না, যে ঘটনা ঘটিয়ে এসেছে সেটা নিশ্চয়ই কয়েক দিনে জানাজানি হয়ে যাবে কিন্তু তারাই যে সেই ঘটনার নায়ক সেটা তারা কাউকে জানতে দিতে চায় না। তাই দুজনে মাঝপথে নেমে গেছে, বাকিটা হেঁটে যাবে।

রিদি বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চল হাঁটি। পাহাড় ঘিরে পথটা গেছে, অনেক দূর হেঁটে যেতে হবে।"

"উঁহু।" রুহান মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের এখন রওনা দেওয়া ঠিক হবে না।"

"কেন?"

"অনেকটা পথ। কমপক্ষে তিন–চার ঘণ্টা তো লাগবেই। এখন এই রাস্তায় আমাদের এতক্ষণ থাকা ঠিক না।"

কেন? রাস্তায় থাকলে কী হবে?

"ক্রিভনকে আমরা যেভাবে ধরে এনেছি সেটা একটা যুদ্ধবাজ নেতার জন্যে খুব বড় অপমান। বিশেষ করে এত হাজার হাজার মানুষের সামনে—"

"হ্যাঁ। সেটা ভুল বল নি।"

রুহান বলল, "সেই অপমান থেকে রক্ষা পাবার তার এখন একটাই পথ।"

রিদি মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের ধরে নিয়ে দশ হাজার মানুষের সামনে একটা ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া?"

"হ্যাঁ। আমরা ক্রিভনকে এখানে ছেড়ে দিয়েছি। ক্রিভন জানে আমরা এখন এই পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাব। ঘণ্টা তিনেক লাগবে পৌঁছাতে। সে নিশ্চয়ই এই সময়ে তার দলবল নিয়ে আমাদের ধরতে ফিরে আসবে। কাজেই আমাদের এখন এই রাস্তায় থাকা ঠিক হবে না।"

রিদি কিছুক্ষণ রুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিকই বলেছ।"

রুহান বলল, "রাস্তা দিয়ে না হেঁটে আমরা এই পাহাড়ের ঢালু দিয়ে হেঁটে যাই। আমার মনে হয় আমরা তা হলে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব।"

রিদি আবার মাথা নেড়ে বলল, "চমৎকার বুদ্ধি।"

"যদি দরকার হয় আমরা তা হলে ভালো একটা জায়গায় অপেক্ষা করতে পারি। যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিভনের দলের সাথে যুদ্ধ করতেই হয় আমরা সেটা করব একটা সুবিধাজনক জায়গা থেকে।"

রিদি বলল, "রুহান, তোমার মাথা খুব পরিষ্কার। তোমার মাথায় ইলেকট্রড বসিয়ে যে সক্রেটিস বানায় নি সেটাই আশ্চর্য।"

"চেষ্টা করেছিল।" রুহান বলল, "আমি ধোঁকা দিয়ে বের হয়ে এসেছি।"

রিদি চোখ বড় বড় করে বলল, "আশ্চর্য!"

"আশ্চর্যের কিছু নেই। এখন চল ঢালু বেয়ে হাঁটতে শুরু করি। অন্ধকার হবার আগে পৌঁছে গেলে খারাপ হয় না।"

"চল।"

দুজন তখন পাহাড়ি ছাগলের মতো পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে শুরু করে। এই পথ দিয়ে মানুষ হাঁটে না, তাই চারদিক গাছপালা ঝোপঝাড়ে ঢেকে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাহাড়ি পথে ক্রিভনের লোকজন চলে এলেও তারা কোনো দিন তাদের খুঁজে পাবে না।

একটা পাহাড়ি ঝরনার কাছে বসে তারা যখন ঘষে ঘষে তাদের মুখের রঙ ওঠানোর চেষ্টা করছিল তখন তারা অনেকগুলো সাঁজোয়া গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। গাড়িগুলো কর্কশ শব্দ করতে করতে রাস্তায় ছোটাছুটি করছে। অনেক মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর এবং কিছু বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির শব্দও তারা শুনতে পেল। নিশ্চয়ই ক্রিভনের বাহিনী এসে তাদের খোঁজ করছে, তারা যেখানে আছে সেখানে কখনোই তারা খুঁজে পাবে না। ঘণ্টাখানেক পর রুহান আর রিদি আবার সাঁজোয়া গাড়িগুলোর কর্কশ শব্দ শুনতে পেল, তাদের খুঁজে না পেয়ে সেগুলো ফিরে যেতে শুরু করেছে।

রিদি রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার সন্দেহটা একেবারে একশ দশ ভাগ সত্যি ছিল।"

রুহান বলল, "তার অর্থ কী জান?"

"কী?"

"আমি এখন অপরাধীদের মতো চিন্তা করি।"

রিদি শব্দ করে হেসে বলল, "অপরাধীর মতো চিন্তা করা অপরাধ না, অপরাধীর মতো কাজ করা হচ্ছে অপরাধ।"

রুহান বলল, "কিন্তু তুমি আসল বিষয়টা ভুলে যাচ্ছ। অপরাধীর মতো চিন্তা করা অপরাধ না হতে পারে কিন্তু এটা খুব কষ্ট। আমি আগে এরকম ছিলাম না।"

রিদি রুহানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি কি একটা জিনিস লক্ষ করেছ?"

"কী?"

"আমরা দুজন একজন আরেকজন সম্পর্কে কিছুই জানি না।"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমাদের একজন আরেকজনকে খুন করার কথা ছিল। অথচ এখন একজন আরেকজনকে ছাড়া থাকতে পারব না। বেঁচে থাকার জন্যে তোমার আমাকে আর আমার তোমাকে দরকার।"

রিদি একদৃষ্টে রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। রুহান জিজ্ঞেস করল, "কী হল? তুমি এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?"

"তোমাকে দেখছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাকে কী দেখছ?"

"যে মানুষটার সাথে আমার থাকতে হবে তার চেহারাটা কেমন সেটা এখনো ভালো করে দেখতে পারি নি। তোমার চেহারাটা দেখার চেষ্টা করেছিলাম, তুমি কি জান—"

"জানি।"

রিদি অবাক হয়ে বলল, "কী জান?"

"তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ ঝরনার পানি দিয়ে আমি আমার মুখের রঙ ধুতে পারি নি। উল্টো সেই রঙ ছড়িয়ে পড়ে এখন আমাকে একটা ভূতের মতো দেখাচ্ছে।"

রিদি শব্দ করে হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমি সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। তবে তুমি যখন নিজেই এটা আবিষ্কার করেছ তার একটাই অর্থ। আমিও আমার মুখের রঙ ধুতে পারি নি। আমাকেও নিশ্চয়ই ভূতের মতোই লাগছে!"

"ঠিকই অনুমান করেছ। চেষ্টা করে লাভ নেই। চল আগে লোকালয়ে যাই। তখন একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"লোকালয়ের মানুষেরা আমাদের দেখে ভয় পেয়ে যাবে।"

"তোমার তাতে কোনো আপত্তি আছে?"

"না। কোনো আপত্তি নেই।" রিদি উঠে দাঁড়াল। বলল, "চল যাই। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আমার খিদে পেতে শুরু করেছে।"

রুহান বলল, "অবশ্যই বিশ্বাস করব। আমারও ভয়ঙ্কর খিদে পেয়েছে। লাল পাহাড়ে গিয়ে ভালো কিছু খেতে পাব তো?"

"পাব। নিশ্চয়ই পাব।"

দুজন আবার ঝোপঝাড় ভেঙে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নামতে থাকে।

AMARBOI.COM

রুহান এবং রিদি ভেবেছিল লাল পাহাড়ে পৌঁছানোর পর তাদের বিচিত্র পোশাক, রঙ মাখা মুখ এবং শরীরে ঝুলিয়ে রাখা নানা ধরনের অস্ত্র দেখে নিশ্চয়ই তাদের ঘিরে একটা ভিড় জমে যাবে, কিন্তু সেরকম কিছু হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা কারণটা বুঝে গেল। পুরো লাল পাহাড় এলাকাটাই আসলে বিচিত্র মানুষের এলাকা। অনেক মানুষই মুখে বিচিত্র রঙ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেকের পোশাক বিচিত্র, অনেকেই নানা ধরনের অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরো এলাকাটা একটা বড় মেলার মতো, নানা ধরনের আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা রয়েছে। নানা ধরনের দোকানপাট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নানা ধরনের মানুষের ভিড়ে পুরো এলাকাটা গমগম করছে। এখানে নানা বয়সের নারী আর পুরুষ রয়েছে কিন্তু কোনো শিশু-কিশোর নেই। দেখেই বোঝা যায় এই এলাকাটি ক্ষণস্থায়ী, মানুষ এখানে আসবে কিছু সময় কাটিয়ে চলে যাবে। কেউ এখানে পাকাপাকিভাবে থাকবে না।

রিদি মানুষের ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "রুহান জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে।"

রুহান হেসে বলল, "আমরা যেরকম জায়গা থেকে এসেছি তারপর সরাসরি নরক না হলেই জায়গাটা আমাদের পছন্দ হবার কথা।"

রিদি বলল, "একটা জিনিস লক্ষ করেছ? এখানকার মানুষের চোখেমুখে সেই ভয় আর আতঙ্ক নেই।"

"হ্যাঁ। অনেকের মুখে হাসি।" রুহান নিজেও হাসার চেষ্টা করে বলল, "হাসতে কেমন লাগে ভুলেই গেছি।"

রিদি বলল, "পেটে কিছু পড়লে তুমিও হাসতে পারবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুঁজে খুঁজে দুজনে একটা ভালো খাওয়ার জায়গা বের করল। পাথরের একটা বাসার সামনে চেয়ার-টেবিল সাজানো। কাছেই পাথরের চুলোতে গনগনে আগুনে সত্যিকারের মাংস মশলা মাখিয়ে ঝলসানো হচ্ছে। অনেক মানুষের ভিড় তার মধ্যে দুজনে ঠেলেঠুলে একটা টেবিল দখল করে নিল। কমবয়সী একটা মেয়ে তাদের টেবিলে উত্তেজক পানীয়ের একটা জগ দিয়ে গেল । পাথরের গ্লাসে ঢেলে এক চুমুক খাওয়ার পরেই তাদের মন ভালো হয়ে যায়। তারা বসে বসে পা দুলিয়ে চারপাশের মানুষগুলোকে দেখতে থাকে।

"তোমাদের সাথে বসতে পারি?" গলার স্বর শুনে দুজনে তাকিয়ে দেখে মাঝবয়সী একজন মানুষ, উসকোখুসকো চুল, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে এবং অস্থির।

রুহান পা দোলানো বন্ধ করে বলল, "হ্যাঁ, পার।"

রিদি বলল, "ইচ্ছে করলে আমাদের পানীয়ও এক ঢোক খেতে পার।"

মানুষটি তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই এই এলাকার মানুষ নও।"

"কেন?"

"এই এলাকার মানুষেরা পরিচয় হবার আগেই কাউকে তার পানীয়তে ভাগ বসাতে দেয় না।"

রিদি আর রুহান দুজনেই শব্দ করে হাসল। রুহান বলল, "অন্যদিন তোমাকে এত সহজে আমাদের পানীয়তে ভাগ বসাতে দেব না। আজ দিচ্ছি। আজ আমাদের মনটা খুব ভালো।"

মানুষটা জিজ্ঞেস করল, "কেন? তোমাদের মন ভালো কেন?"

রুহান সরাসরি উত্তর দিল না, বলল, "অনেকগুলো কারণ আছে, তোমাকে কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি? তা ছাড়া মন ভালো হতে কি আর কারণের দরকার হয়? এই উত্তেজক পানীয় এক ঢোক খেলেই মন ভালো হয়ে যায়।"

মানুষটি মাথা নেড়ে তার পানীয়ে চুমুক দিয়ে বলল, "সেটা ঠিকই বলেছ। একটা সময় ছিল যখন সব সময়ে মানুষের মন খারাপ থাকত—কখন কী হয় সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করত। এখন উল্টো। ধরেই নিয়েছে জীবনটা যে কোনো সময় শেষ হয়ে যাবে। তাই যে কয়দিন আছে সেই কয়দিন ফুর্তি করে নাও।"

রিদি আর রুহান দুজন কোনো কথা না বলে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। মানুষটি বলল, "তোমরা এখানে নূতন এসেছ?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"লাল পাহাড় ঘুরে দেখেছ?"

"না। এখনো দেখি নি। এখানে কী আছে দেখার মতো?"

মানুষটি চোখ বড় বড় করে উৎসাহ নিয়ে বলল, "এই এলাকার সবচেয়ে বড় বাজারটি এখানে। এমন কোনো জিনিস নেই যেটা এখানে পাওয়া যায় না। অস্ত্রপাতি গোলাবারুদ থেকে শুরু করে মানুষ মেয়েমানুষ সবকিছু এখানে পাওয়া যায়।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।" মানুষটি একটু ঝুঁকে বলল, "কিনবে তোমরা কিছু? সুন্দরী মেয়েদের একটা চালান আসছে শুনেছি।"

রিদি মাথা নেড়ে বলল, "না আমরা কিছু কিনব না।"

মানুষটার একটু আশাভঙ্গ হল বলে মনে হল। বলল, "তোমরা এত ক্ষমতাশালী মানুষ, তোমরা যদি কিছু ইউনিট খরচ না কর তা হলে বাজার চালু থাকবে কেমন করে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান সোজা হয়ে বসে বলল, "ক্ষমতাশালী? আমরা? তোমার এরকম ধারণা হল কেমন করে?"

"বাহ্!" মানুষটা দুই হাত তুলে বলল, "তোমরা কীরকম অস্ত্র নিয়ে ঘুরছ দেখেছ? এরকম একটা অস্ত্র কত ইউনিটে বিক্রি হয় জান?"

রুহান কিংবা রিদি দুজনের কেউই সেটা জানে না, তবে তারা সেটা প্রকাশ করল না, সাবধানে মাথা নাড়ল।

মানুষটা বলল, "সারা লাল পাহাড়ে কারো কাছে এই অস্ত্র নেই, আর তোমাদের একজনের কাছেই আছে তিনটা করে! ক্ষমতা না থাকলে এগুলো হয় না।"

রুহান আর রিদি একজন আরেকজনের দিকে তাকাল—তারা এই বিষয়টি আগে এভাবে চিন্তা করে নি। মানুষটা বলল, "তোমরা কি কিছু কিনবে? ফূর্তি ফার্তা করবে?"

"উঁহু।" রুহান মাথা নাড়ল।

মানুষটা মাথা আরেকটু এগিয়ে আনল, নিচু গলায় ষড়যন্ত্রীর মতো বলল, "কোনো গোপন রোগের চিকিৎসা করাতে চাও? আমার পরিচিত ভালো ডাক্তার আছে।"

রুহান মাথা নাড়াতে গিয়ে হেসে বলল, "না, আমাদের কোনো গোপন রোগ নেই।"

"আজকাল খুব একটা জনপ্রিয় অপারেশন হচ্ছে। পুরুষ মহিলা হওয়ার অপারেশন। মাত্র সাতদিন ক্লিনিকে থাকতে হয়—"

রিদি আর রুহান দুজনেই মাথা নাড়ল। রিদি বলল, "রক্ষে কর। এতদিন থেকে পুরুষ মানুষ হয়ে আছি অভ্যাস হয়ে গেছে—এখন আমি মহিলা হতে পারব না।"

মানুষটি তবু হাল ছাড়ল না, বলল, "আমারও তাই ধারণা। এরকম হাট্টাকাট্টা জোয়ান পুরুষ মানুষ, খামোখা অপারেশন করে মেয়ে হতে যাবে কেন? তোমাদের বরং দরকার বাড়তি পৌরুষত্ব। খুব ভালো হরমোন আছে এখানে, ব্ল্যাক মার্কেটে এক নম্বর জিনিস। লাগবে?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "না লাগবে না।"

"তা হলে দুই নম্বর হৃৎপিণ্ড? ছোট শিশুর ভালো হৃৎপিণ্ড আছে। বুকের ভেতর বসিয়ে দেবে টেরও পাবে না। আসল হৃৎপিণ্ডের সাথে সাথে চলবে। এখন যত পরিশ্রম করতে পার তার ডবল পরিশ্রম করতে পারবে।"

রুহান হেসে বলল, "না, আমার মনে হচ্ছে একটা হৃৎপিণ্ডতেই আমার বেশ কাজ চলে যাচ্ছে।"

মানুষটি এবারে রীতিমতো হতাশ হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে মনমরা হয়ে বসে পড়ল।

রিদি বলল, "যদি একান্তই আমাদের সাহায্য করতে চাও তা হলে বল রাত কাটানোর জন্যে ভালো একটা জায়গা কোথায় পাব? কোনো হাঙ্গামা হুল্লোড় চাই না, শুধু নিরিবিলি ঘুমাব।"

রুহান বলল, "ঘুমানোর আগে গরম পানিতে ভালো করে রগড়ে গোসল করব।"

রিদি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, সেটাও করতে হবে।"

এলোমেলো চুলের মানুষটা এবারে সোজা হয়ে বসল। চোখ বড় বড় করে বলল, এখানে চাররকম থাকার জায়গা আছে। প্রথমটা হচ্ছে দামি, অনেক ইউনিট লাগে—"

"না না না।" রুহান বাধা দিল, "আমরা খুব কম ইউনিটে থাকতে চাই। সম্ভব হলে কোনো ইউনিট খরচ না করে।"

মানুষটা অবাক হয়ে বলল, "কোনো ইউনিট খরচ না করে?"

"হ্যাঁ। মনে কর কাজের বিনিময়ে খাদ্য। কিংবা কাজের বিনিময়ে নিদ্রা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটা কিছুক্ষণ তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "সত্যি তোমাদের কোনো ধরনের কাজ দরকার?"

রিদি আর রুহান দুজনেই মাথা নাড়ল। মানুষটা জিজ্ঞেস করল, "কী ধরনের কাজ?"

রুহান বলল, "সেটা ভালো করে জানি না।"

"তোমাদের কাছে এত রকম অস্ত্র—সেগুলো নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে পার?"

রুহান আর রিদি একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, রিদি হাসি গোপন করে বলল, "একটু একটু পারি।"

"তা হলে তোমরা হয়তো কোনো ব্যবসায়ীর বডিগার্ড হিসেবে কাজ করতে পারবে। কিংবা কোনো দোকানে নিরাপত্তাকর্মী। কী বল?"

রিদি আর রুহান কোনো কথা না বলে একটু কাঁধ ঝাঁকাল।

"তোমরা ইচ্ছে করলে নিজেদের একটা দল খুলতে পার। কিছু মানুষ নিয়ে তাদের ট্রেনিং দিয়ে—"

রুহান বলল, "ডাকাতের দল? রক্ষে করো!"

"ডাকাত? ডাকাত বলছ কেন।"

"অস্ত্র নিয়ে ট্রেনিং দিয়ে হামলা করাকে বলে ডাকাতি।"

মানুষটা শব্দ করে হেসে বলল, "তোমরা খুব মজার মানুষ। এটা ডাকাতি হবে কেন? এটা এখন সবাই করে।"

রিদি কিংবা রুহান কোনো কথা না বলে পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিল। রুহান বলল, "তার চাইতে ভালো থাকার জায়গা কোথায় আছে বল।"

"তোমরা যদি সোজা হেঁটে যাও, একেবারে পাহাড়ের নিচে দেখবে ছোট ছোট ঘর আছে। রাতের জন্যে ভাড়া দেয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাহাড়ের নিচে বলে অবিশ্যি রাতে ঝড়ো বাতাসের খুব শব্দ হয়।"

"হোক।" রুহান বলল, "ঝড়ো বাতাস আমার ভালোই লাগে।"

মানুষটি এবারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুজনকে লক্ষ করে বলল, "আচ্ছা। তোমরা বলবে তোমরা কারা? কী কর, কোথায় থাক?"

রিদি বলল, "এখনো জানি না। যখন জানব তখন বলব। নিশ্চয়ই বলব।"

"জান না মানে?"

"আমাদের দুজনের দেখা হয়েছে আজ দুপুরে। একজন আরেকজনকে ভালো করে চিনিই না। শুধু একজন আরেকজনের নামটা জানি।"

মানুষটি কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে হা হা করে হেসে বলল, "তোমরা খুব মজার মানুষ।" তারপর চোখ টিপে বলল, "বুঝতে পারছি সত্যি কথাটি বলতে চাইছ না। না বললে নাই—এখানে কেউ সত্যি কথা বলে না। শুধু আমি বলি। আমার নাম দ্রুচেন। এজেন্ট দ্রুচেন। সবাই চেনে আমাকে। কোনো দরকার হলে আমাকে খবর দিও। আমি নিয়ম মেনে চলি, তোমাদের কাজ জোগাড় করে দেব। দশ ভাগ কমিশন আমার।"

"ঠিক আছে।"

"তা হলে তোমরা ডিনার কর, আমি যাই। পানীয়ের জন্য ধন্যবাদ।"

রুহান হাসিমুখে বলল, "লাল পাহাড়ের ভেতরের খবর দেবার জন্যে তোমাকেও ধন্যবাদ।"

খাওয়া শেষ করে রিদি আর রুহান এলাকাটাতে খানিকক্ষণ ইতস্তত হাঁটে। বাজারের কাছাকাছি এলাকায় নাচগান হচ্ছে। মানুষজন তাল-লয়হীন বিকট সঙ্গীতের সাথে নাচানাচি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। নেশা করে তাদের চোখমুখ রক্তাভ, চালচলন কথাবার্তা অসংযত। তারা সেখানে বেশি সময় না থেকে সরে এল, আশপাশে নানা ধরনের দোকানপাট। অস্ত্রের দোকান সবচেয়ে বেশি, সেখানে নানারকম অস্ত্র সাজানো আছে, মানুষজন সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে, কিনছে। পাশাপাশি বেশ কয়েকটা বড় নার্সিং হোম। সেখানে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেচা-কেনা হচ্ছে। গাড়ির বেশ বড় বড় দোকান। নানা ধরনের গাড়ি সাজানো রয়েছে। পোশাকের অনেকগুলো দোকান। মনে হয় পোশাকের এক ধরনের পরিবর্তন হয়েছে, বেশিরভাগই বিদঘুটে রঙের বিচিত্র সব পোশাক।

রিদি আর রুহান হাঁটতে হাঁটতে শহরের এক পাশে চলে এল, সেখানে ছোট ছোট দোকান। রাস্তার পাশে স্তূপ করে রেখে নানা ধরনের বিচিত্র জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে। ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্যে ফর্মালিনে ডুবিয়ে রাখা মানুষের আঙুল, চোখ, জিব। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে তৈরি করা কিছু বিচিত্র জন্তু। সীসার কৌটায় ভরে রাখা তেজস্ক্রিয় মৌল। বিভিন্ন জাদুঘর থেকে চুরি করে আনা প্রাচীন মূর্তির অংশ। রুহান হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল কমবয়সী একজন মানুষ অনেকগুলো বই নিয়ে বসে আছে। সে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যায়। রিদি জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কী?"

কমবয়সী মানুষটি বলল, "জানি না।"

"তা হলে এগুলো বিক্রি করছ কেন?"

কমবয়সী মানুষটি দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমি না জানলে ক্ষতি কী? অন্য কেউ তো জানতে পারে।"

রুহান বলল, "আমি জানি। এগুলোকে বলে বই। আগে যখন মানুষের কাছে ক্রিস্টাল রিডার ছিল না তখন তারা এভাবে তথ্য বাঁচিয়ে রাখত।"

রিদি অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! এখানে কীভাবে তথ্য বাঁচিয়ে রাখবে?"

রুহান বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে থেমে গেল। কমবয়সী মানুষটা যদি বুঝতে পারে সে বই নামের বিষয়টা সম্পর্কে জানে এমনকি সে অল্পবিস্তর পড়তেও পারে তা হলে শুধু বইগুলোর দাম বাড়িয়ে দেবে। সে দুই-একটা বই কিনতে চায়। বইগুলো উল্টেপাল্টে সে কয়েকটা বই বেছে নেয়। দাম নিয়ে কিছুক্ষণ দরাদরি করে বইগুলো কেনে। রিদি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করবে এগুলো দিয়ে?"

রুহান কিছু বলার আগেই কমবয়সী মানুষটা বলল, "ঘরে সাজিয়ে রাখা যায়। আর নেশা করার কাজে লাগে। কাগজ ছিঁড়ে গোল করে পাকিয়ে ভিসুবিচিরাস নাক দিয়ে টানা যায়। হাশিস খাবার জন্যে আগুন জ্বালাতেও খুব সুবিধা। একটা একটা করে কাগজ ছিঁড়ে আগুন জ্বালাবে।"

রিদি একটু চোখ বড় বড় করে মানুষটার দিকে তাকাল। মানুষটা মুখের হাসি আরেকটু বিস্তৃত করে বলল, "তা ছাড়া বাথরুম করার পর মুছে ফেলার কাজেও লাগানো যায়—"

রুহান রিদির হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিতে নিতে বলল, "চল, বইয়ের ব্যবহার সম্পর্কে আরো জটিল কিছু বের হওয়ার আগে কেটে পড়ি।"

মানুষটি আবার দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমার কাছে আরো মজার মজার সব বই আছে।"

রুহান যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "তুমি এগুলো কোথা থেকে আনো।"

মানুষটি চোখ মটকে বলল, "জানতে চাও?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমাকে কত ইউনিট দেবে বল?"

"এক ইউনিটও দেব না। কথা শুনতে ইউনিট দিতে হয় কে বলেছে?"

মানুষটা চোখ মটকে বলল, "কথার যদি দাম থাকে তা হলে দাম দেবে না?'

রুহান মাথা নাড়ল। "না, দাম দিয়ে কথা শুনতে হলে কথা শুনবই না।"

"এক হাজার ইউনিট।" মানুষটা মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমাকে এক হাজার ইউনিট দিলে তোমাকে বলে দেব, এগুলো কোথায় পাওয়া যায়।"

রুহান আবার মাথা নেড়ে বলল, "কিছু প্রয়োজন নেই।"

সে হেঁটে চলে যাচ্ছিল, লোকটা পিছন থেকে চিৎকার করে বলল, "ঠিক আছে! পাঁচশ ইউনিট!"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "এক ইউনিটও না।"

রিদি আর রুহান হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পেল মানুষটা পিছন থেকে চিৎকার বলে বলল, "ঠিক আছে! একশ ইউনিট।"

রুহান এবারে আর কথার উত্তর দিল না। মানুষজনের ভিড় ঠেলে হেঁটে একটু এগিয়ে যেতেই কে যেন রুহানের আস্তিন টেনে ধরে। রুহান মাথা ঘুরিয়ে দেখে ঢুলুঢুলু চোখের একজন মানুষ, রুহানের হাতের বইগুলো দেখিয়ে বলল, "তুমি এইগুলো ইউনিট খরচ করে কিনেছ?"

"হ্যাঁ, কেন? কী হয়েছে?"

"পূর্বদিকে জঙ্গলের কাছে একটা দালান ভেঙে পড়ে আছে, সেখানে এগুলো পড়ে থাকে—হাজার হাজার। পোকামাকড়ে খায়। আর তুমি বেকুব, এগুলো ইউনিট খরচ করে কিনেছ! তোমাদের মতো বোকা মানুষ আছে বলে অন্যেরা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকে।"

রুহান হাসি চেপে রেখে বলল, "কথাটা তুমি ভুল বল নাই। তবে তুমি আমাকে যতটা বোকা ভেবেছ, আমি তত বোকা নই। এই বইগুলো কোথায় পাওয়া যায় সেই খবরের জন্যে আমি কিন্তু একটা ইউনিটও খরচ করি নি!"

ঢুলুঢুলু চোখের মানুষটা বলল, "তোমরা এখানে নূতন এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের কিছু লাগবে? কিছু সুন্দরী মেয়ে বিক্রি হচ্ছে।"

রুহান আর রিদি একসাথে মাথা নেড়ে বলল, "না লাগবে না।"

"খুব ভালো ক্লিনিক আছে পরিচিত। জটিল অপারেশন করাতে পার। গোপন অসুখ থাকলে—"

রিদি মাথা নেড়ে বলল, "না, কোনো গোপন অসুখ নেই আমাদের।"

ঢুলুঢুলু চোখের মানুষটা আবার কী একটা বলতে যাচ্ছিল, রুহান আর রিদি তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে দ্রুত সামনে হেঁটে যেতে শুরু করল।

৯

দরজাটা ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। ঘরের ভেতরে ভ্যাপসা এক ধরনের গন্ধ। আবছা অন্ধকারে দেখা যায় সারি সারি তাক, সেই তাকের উপর অসংখ্য বই। বইগুলো অযত্নে পড়ে আছে, ধুলায় ধূসর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বই টেনে নেয়। পৃষ্ঠা খুলে কী লেখা আছে পড়ার চেষ্টা করে, মাছ কেমন করে পানি থেকে অক্সিজেন নেয় সেখানে তার একটা ব্যাখ্যা লেখা রয়েছে। রিদি একটু অবাক হয়ে রুহানের দিকে তাকিয়েছিল, জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করছ?"

"বইয়ে কী লেখা আছে সেটা পড়ার চেষ্টা করছি।"

রিদি বিস্ফারিত চোখে বলল, "কী বললে? পড়ার চেষ্টা করছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি পড়তে পার?"

"খুব ভালো পারি না। শিখছি।"

রিদি ভুরু কুঁচকে বলল, "এত কাজ থাকতে তুমি পড়া শিখছ কেন? এটা যেন অনেকটা অনেকটা—"

রুহান মুখে হাসি টেনে বলল, "অনেকটা কী?"

"অনেকটা হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে শেখার মতো। তুমি যখন দুই পায়ে হাঁটতে পার তখন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে শেখার চেষ্টা করবে কেন? ক্রিস্টাল রিডার দিয়ে যখন সব রকম তথ্য বিনিময় করা যায় তখন কাগজে বর্ণমালা লিখে তথ্য বিনিময় করতে চাইছ কেন?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "আমি জানি না। তবে—"

"তবে কী?"

"আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

রুহান বলল, "আমার মনে হয় কিছুদিন পর আমাদের কাছে আর ক্রিস্টাল রিডার থাকবে না। পৃথিবীতে এত মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে যে নূতন করে কেউ ক্রিস্টাল রিডার বানাতেও পারবে না। তখন কী হবে জান?"

রিদি কেমন যেন বিচিত্র দৃষ্টিতে রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। খানিকক্ষণ পর বলল, "তুমি সত্যিই এটা মনে কর?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমি মনে করি। শুধু যে ক্রিস্টাল রিডার থাকবে না, তা না। অস্ত্র থাকবে না। গাড়ি থাকবে না। কাপড় থাকবে না। খাবার থাকবে না!"

"কী বলছ তুমি?"

"আমি ঠিকই বলছি।" রুহানের মুখটা অকারণেই গম্ভীর হয়ে যায়। সে থেমে থেমে বলল, "আমাদের খুব দুর্ভাগ্য আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ সময়ে জন্মেছি। যখন সবকিছু ধ্বংস হচ্ছে। চারপাশে সবাই ডাকাত। জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই লেখাপড়া নেই—"

রিদি বাধা দিয়ে বলল, "সে কী! তুমি দেখি বুড়ো মানুষদের মতো কথা বলতে শুরু করেছ।"

রুহান হেসে বলল, "ঠিকই বলেছ। আমি মনে হয় বুড়ো হয়ে গেছি।"

"কিন্তু কথাগুলো তুমি খুব ভুল বল নি।"

রুহানের চোখ কেমন জানি চকচক করে ওঠে, সে একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "আমি তো ইতিহাস খুব বেশি জানি না কিন্তু যেটুকু জানি সেখানে কী দেখেছি জান?"

"কী দেখেছ?"

"যখন মানুষের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় তখন তারা আবার মাথা সোজা করে দাঁড়ায়। এখানেও নিশ্চয়ই দাঁড়াবে। যখন দাঁড়াবে তখন তো আবার জ্ঞান চর্চা করতে হবে।

জানতে হবে, শিখতে হবে—তখন যদি ক্রিস্টাল রিডার না থাকে তখন তারা এই বই থেকে পড়বে।"

রিদি কয়েক মুহূর্ত রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর হঠাৎ শব্দ করে হাসতে শুরু করল। রুহান ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি বোকার মতো হাসছ কেন?"

রিদি কষ্ট করে হাসি থামিয়ে বলল, "তুমি বোকার মতো কথা বললে দোষ নেই কিন্তু আমি বোকার মতো হাসলে দোষ?"

"আমি কখন বোকার মতো কথা বলেছি?"

"এই যে বলছ, মানুষ পোকা খাওয়া এই বইগুলো পড়ে পড়ে জ্ঞান চর্চা করবে।"

রুহান মুখ শক্ত করে বলল, "আমি বলি নি এই ঘরের এই পোকা খাওয়া বইগুলো পড়বে।"

"তা হলে কী বলেছ?"

"বলেছি দরকার হলে এই রকম বই পড়বে। ক্রিস্টালে যেরকম তথ্য রাখা যায় সেরকম বইয়েও তথ্য রাখা যায়। ক্রিস্টাল রিডার যদি না থাকে তা হলে বইয়ের তথ্য দিয়ে কাজ চালানো যাবে। সবাইকে আবার বর্ণমালা শিখতে হবে—"

রিদি আবার হাসতে শুরু করল। রুহান চোখ পাকিয়ে বলল, "তুমি আবার বোকার মতো হাসছ কেন?"

"তোমার কথা শুনে।"

"আমি এবারে কোন কথাটা হাসির কথা বলেছি?"

"এই যে বলছ সবাইকে বর্ণমালা শিখতে হবে! তারপর বলবে সবাইকে গাছের বাকল পরে থাকতে হবে। গুহার ভেতরে কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসে খেতে হবে—বিবর্তনে বানর থেকে যেরকম মানুষ হয়েছে, সেরকম আবার উল্টো বিবর্তনে আমরা সবাই মানুষ থেকে বানর হয়ে যাব। আমাদের সবার ছোট ছোট লেজ গজিয়ে যাবে!"

এবারে রুহানও হেসে ফেলল, হাসতে হাসতে বলল, "তোমার সাথে কথা বলার কোনো অর্থ নেই। তুমি কোনো কিছুকে গুরুত্ব দাও না।"

রিদি রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তো ভবিষ্যতে অনেক দূর তাকাতে পার তাই সবকিছুকে গুরুত্ব দিতে পার। আমার সমস্যাটা কী জান?"

"কী?"

"আমি একদিন একদিন করে বেঁচে থাকি। তাই কোনো কিছুকে গুরুত্ব দিতে পারি না।"

রুহান কিছুক্ষণ রিদির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমারও কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"তুমি খুব একটা অদ্ভুত মানুষ।"

রিদি চোখ বড় বড় করে বলল, "কী আশ্চর্য! আমার ঠিক তাই মনে হচ্ছিল।"

"ঠিক কী মনে হচ্ছিল?

"যে তুমি খুব আজব একজন মানুষ।"

ঠিক কী কারণ জানা নেই হঠাৎ করে দুজনেই অকারণে হেসে ওঠে। পুরোনো বিধ্বস্ত একটা ঘরে আবছা অন্ধকারে ধূলি ধূসরিত বইয়ের স্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা দুইজনের হাসির শব্দটি অত্যন্ত বিচিত্র শোনায়।

দুপুরবেলা একটা ছোট খাবার দোকানে রিদি আর রুহান এক বাটি গরম সুপের সাথে শুকনো রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে, তখন রুহান প্রথমে বিষয়টা লক্ষ করল। তাদের টেবিল থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই টেবিল দূরে বসে থাকা একজন মানুষ তাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। রুহানের সাথে চোখাচোখি হওয়া মাত্রই মানুষটি চোখ সরিয়ে নিল। রুহান চোখের কোনা দিয়ে মানুষটাকে লক্ষ করে, খাওয়া শেষ না করেই মানুষটি উঠে গেল। সম্ভবত তাদের চিনে ফেলেছে—এত বড় একটা কাণ্ড করে এসেছে তাদের পরিচয়টা কেউ জানবে না সেটা তো হতে পারে না। আগে হোক পরে হোক এটা জানাজানি হবেই।

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে রিদিকে বলল, "রিদি আমাদের পরিচয় কিন্তু এখানে জানাজানি হয়ে যাবে।"

রিদি বলল, "এখনো হয় নি সেটাই আশ্চর্য।"

"একটা মানুষ খুব সন্দেহজনকভাবে উঠে গেল।"

"আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত খেতে থাক। হালকা অস্ত্রটা খুলে রাখা যাক। দরকার হলে ব্যবহার করা যাবে।"

রুহান বলল, "যদি আমাদের পরিচয় জেনে থাকে তা হলে কিছু করার আগে অনেকবার চিন্তা করবে।"

"তা ঠিক।"

রুহান চোখের কোনা দিয়ে চারদিকে একনজর দেখে বলল, "আমি এভাবে থাকতে পারব না।"

"কীভাবে থাকতে পারবে না?"

"এই যে সব সময় সতর্ক হয়ে, চোখকান খোলা রেখে একটা হাত ট্রিগারের উপর রেখে।"

রিদি হেসে বলল, "এখন বেঁচে থাকার এটাই হচ্ছে নিয়ম।"

"আমি এভাবে বেঁচে থাকতে চাই না।"

"তা হলে তুমি কীভাবে বেঁচে থাকতে চাও?"

"আমি আমার গ্রামে ফিরে যেতে চাই। সেখানে থাকতে চাই।"

"তোমার গ্রামে কে আছে রুহান?"

"আমার মা। আমার ছোট দুটি বোন। নুবা আর ত্রিনা।"

রিদি কিছু না বলে কিছুক্ষণ রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। রুহান জিজ্ঞেস করল, "তোমার কে আছে রিদি?"

"আমার কেউ নেই।"

"কেউ নেই?"

"না।"

কেন নেই সেটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে রুহান থেমে গেল। সে নিজে থেকে যদি বলতে না চায় তা হলে হয়তো জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে না। রুহান বলল, "তা হলে তুমিও চল আমার সাথে। আমাদের গ্রামটা খুব সুন্দর, তোমার ভালো লাগবে।"

রিদি কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। রুহান বলল, "সারা পৃথিবীর সবাই বলছে যার জোর বেশি সে যেটা বলবে সেটাই হচ্ছে নিয়ম। মানুষ আর পশুর মধ্যে এখন কোনো পার্থক্য নেই। আমরা বলব সেটা ভুল। আমাদের গ্রাম দিয়ে সেটা শুরু করব। ছোট একটা স্কুল বানাব। ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়বে। ক্রিস্টাল রিডার না থাকলে আমরা বর্ণমালা শেখাব, বই বানাব, বই পড়াব। আবার জ্ঞানচর্চা শুরু করব। একজন মানুষ আরেকজনকে ভালবাসবে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান হঠাৎ থেমে গেল। রিদি জিজ্ঞেস করল, "কী হল? শুনতে তো ভালোই লাগছিল, থামলে কেন?"

"ঐ লোকটা ফিরে এসেছে। সাথে আরো দুইজন। একজন পুরুষ অন্যজন মহিলা।"

রিদির শরীরটা একটু শক্ত হয়ে যায়। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, "কী করছে ওরা?"

"কিছু করছে না, দেখছে। আমাদের দেখছে।"

রুহান আর রিদি নিঃশব্দে বসে থাকে। মানুষগুলো কিছুক্ষণ তাদের দেখে আবার বের হয়ে গেল। রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ভালো লাগে না। আমার—একেবারেই ভালো লাগে না। এভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই।"

রিদি কিছু না বলে নিঃশব্দে রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্ধেবেলা দুজন আবার বের হয়েছে। গানবাজনার বিকট সুর থেকে সরে গিয়ে তারা মূল বাজারটার দিকে এগিয়ে যায়। উজ্জ্বল আলোতে বিচিত্র পোশাক পরা মানুষজন হাঁটাহাঁটি করছে, জিনিসপত্র দরদাম করছে কিনছে। এখানে এলে হঠাৎ করে মনে হয় পৃথিবীতে বুঝি কোনো সমস্যা নেই।

হাঁটতে হাঁটতে সামনে একটু ভিড় দেখে দুজনে এগিয়ে যায়, একটা খাঁচার ভেতরে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে। পাশে একটা ছোট মঞ্চ, সেখানে একজন কিশোর দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরটি এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, দেখে মনে হয় তার চারপাশে কী ঘটছে সে বুঝতে পারছে না। কিশোরটির পাশে একজন মানুষ হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে কথা বলছে।

রুহান এবং রিদি শুনল, মানুষটি বলছে, "এর নাম কিসি। কিসির বয়স মাত্র বার কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ তার বাড়ন্ত শরীর। একদিন সে যে একজন হাট্টাকাট্টা জোয়ান হবে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা আমাদের নিজস্ব ডাক্তার দিয়ে কিসিকে পরীক্ষা করিয়েছি। কিসি একেবারে সুস্থ-সবল এবং নীরোগ। তার শরীরে কোনো রোগজীবাণু নেই। কিসির পরিবারের কাগজপত্র আমাদের কাছে আছে, ডি.এন.এ. প্রোফাইলও আছে, ইচ্ছা করলে তোমরা দেখতে পার।"

মানুষটি দম নেবার জন্যে একটু থামল, তখন রুহান আর রিদি বুঝতে পারল এখানে মানুষ বেচাকেনা হচ্ছে। তারা আগে কখনো এটি দেখে নি, দুজনেই এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে যায়। মানুষটি মাইক্রোফোনটা মুখের কাছে নিয়ে আবার কথা বলতে শুরু করে, "এই ছেলেটাকে আমরা এনেছি দক্ষিণের অঞ্চল থেকে। অনেক কষ্ট করে আনতে হয়েছে, তোমরা জান সারা পৃথিবীতে মারামারি কাটাকাটি চলছে। এর মধ্যে মানুষ ধরে আনা সোজা কথা না। যেভাবে চলছে তাতে মনে হচ্ছে কিছুদিন পর সাধারণ মানুষ আর মানুষের বাজারে হাত দিতে পারবে না, দাম কমপক্ষে তিন-চার গুণ বেড়ে যাবে। এখনই সময়—আমি অনেক কম দামে ছেড়ে দিচ্ছি, এই বাড়ন্ত কিশোরটি মাত্র দুই হাজার ইউনিট!"

পাশ থেকে একজন বলল, "দুই হাজার ইউনিট কি মাত্র হল নাকি? এই দামে একটা গাড়ি কেনা যায়।"

মাইক্রোফোন হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা বলল, "গাড়ি আর মানুষ কি এক জিনিস? আস্ত একটা মানুষ পেয়ে যাচ্ছ। যদি এর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলাবাজারে বিক্রি কর তা হলে কত দাম পাবে জান? আজকাল ভালো একটা হৃৎপিণ্ডই পাঁচ শ ইউনিটের কমে পাওয়া যায় না। হৃৎপিণ্ড ছাড়া আছে কিডনি, লিভার, লাংস। চোখের কর্নিয়া, ব্রেন আর রক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে ফ্রেশ রক্ত। তুমি যদি মানুষটাকে সারা জীবন পালতে না চাও কেটেকুটে বিক্রি করে দিতে পার। তাতে লাভ হবে আরো বেশি। কিনবে কেউ?"

বুড়ো মতো একজন মানুষ বলল, "ধুর! পোলাপান দিয়ে কী করব? ভালো মেয়েমানুষ থাকলে দেখাও।"

"মেয়েমানুষ? মেয়েমানুষ থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। আমাদের কোম্পানির আসল বিজনেস হচ্ছে মেয়েমানুষের বিজনেস। আমাদের নেটওয়ার্ক একেবারে গভীর গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। সারা দেশ খুঁজে আমরা সুন্দরী মেয়েমানুষ ধরে আনি।"

মানুষটি খাঁচা খুলে কিসি নামের কিশোরটাকে ভিতরে ঠেলে দিয়ে একটা মেয়েকে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। মেয়েটার ভাবলেশহীন মুখ। চোখেমুখে এক ধরনের বিচিত্র কাঠিন্য। মাথায় এলোমেলো চুল, শরীরের কাপড় অবিন্যস্ত। মানুষটা মেয়েটির চারপাশে ঘুরে মুখে এক ধরনের পরিতৃপ্তির শব্দ করে বলল, "এই মেয়েটার নাম ক্রিটিনা। মেয়েটার শরীরটা একবার ভালো করে দেখ! দেখলেই জিবে পানি চলে আসে।"

মানুষটার কথা শুনে উপস্থিত অনেকেই শব্দ করে হেসে উঠল। উৎসাহ পেয়ে মানুষটা বলল, "একেবারে গহীন একটা গ্রাম থেকে ধরে এনেছি, যেভাবে এনেছি ঠিক সেইভাবে তোমাদের সামনে হাজির করেছি। তোমরা কল্পনা করে নাও যখন এই মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে আনবে তখন তাকে দেখতে কেমন লাগবে। মনে হবে একেবারে আগুনের খাপরা।"

মানুষটি একটু দম নিয়ে বলল, "এই আগুনের খাপরার বয়স উনিশ। পরিবারের কাগজপত্র, ডি.এন.এ. প্রোফাইল সবকিছু তৈরি আছে। ইচ্ছে করলে দেখতে পার। ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে, একেবারে সুস্থ–সবল নীরোগ। অনেক কষ্ট করে অনেক দূর থেকে এনেছি তাই দাম একটু বেশি কিন্তু এই জিনিস কম দামে পাবে না।"

বুড়ো মানুষটা মুখের লোল টেনে বলল, "কত দাম?"

"পাঁচ হাজার ইউনিট?"

"পাঁচ হাজার?" বুড়ো মানুষটা প্রায় আর্তনাদ করে বলল, "পাঁচ হাজার ইউনিট কি ছেলেখেলা নাকি?"

মাইক্রোফোন হাতে মানুষটা বলল, "আমি কি বলেছি এটা ছেলেখেলা? ভালো জিনিস চাইলে তার দাম দিতে হয়। বুঝেছ?"

বুড়ো মানুষটা বলল, "আমাকে আগে ভালো করে দেখতে দাও।"

"দেখ দেখ, যত খুশি দেখ। এর মধ্যে কোনো ভেজাল নেই।"

বুড়ো মানুষটি মঞ্চে উঠে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তারপর সন্তুষ্টির মতো একটা শব্দ করে পকেট থেকে ইউনিটের বান্ডিল বের করে গুনে গুনে দিতে থাকে।

রুহান মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখমুখে কী গভীর একটা বিষাদের ছাপ। চোখ থেকে নেমে আসা পানি গালের উপর শুকিয়ে রয়েছে। বড় বড় চোখে এক ধরনের অবর্ণনীয় অবিশ্বাস নিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে। সেই চোখে এক গভীর হতাশা।

বুড়ো মানুষটা তার ইউনিটগুলো মাইক্রোফোন হাতের মানুষটাকে ধরিয়ে দিয়ে মেয়েটার হাত ধরে টেনে আনতে শুরু করে। কী করছে বুঝতে না পেরেই রুহান হঠাৎ গলা উঁচিয়ে বলল, "এই যে বুড়ো, তুমি দাঁড়াও।"

বুড়ো মানুষটি দাঁড়িয়ে গেল, তার মুখে ক্রোধের একটা ছায়া পড়ে। সে কঠিন চোখে ভিড়ের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে কে তার সাথে এই অশোভন গলায় কথা বলছে। মানুষটা রুহান সেটা আবিষ্কার করে বুড়ো মানুষটা কেমন যেন থিতিয়ে যায়—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সারা শরীরে ঝুলে থাকা অস্ত্রগুলোই যে এর কারণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে শুকনো গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

"তুমি মেয়েটাকে ছেড়ে দাও।"

"ছেড়ে দেব?" কষ্ট করেও বুড়ো তার গলার ঝাঁজটুকু লুকাতে পারে না, "কেন ছেড়ে দেব?"

রিদি হতাশ একটা ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, রুহান এখন কী করবে সে জানে না। যেটাই করুক তাকে তার সাথে থাকতে হবে। মনে হচ্ছে এটা তার ভবিতব্য—রুহান কিছু একটা করে বসবে আর তাকে সেটা সামাল দিতে হবে। রিদি সতর্ক ভঙ্গিতে পিছন থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা তুলে নেয় এবং সেটা উপস্থিত কারো দৃষ্টি এড়াল না।

রুহান হেঁটে হেঁটে ছোট মঞ্চটার উপরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "মানুষ বেচাকেনা করা যায় না।"

বুড়ো মানুষটার চোখেমুখে জ্বালা ধরানো এক ধরনের বিতৃষ্ণার ছাপ পড়ল। সে মাথা ঘুরিয়ে মাইক্রোফোন হাতে মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, "কী বলছে এই মানুষ?"

মাইক্রোফোন হাতের মানুষটা একটু এগিয়ে এসে বলল, "তুমি এই মেয়েটাকে নিতে চাইছিলে? এটা তো বিক্রি হয়ে গেছে। তুমি চিন্তা কোরো না আমার কাছে আরো আছে। এই দেখ আমার সাপ্লাই—"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু। আমি মোটেও সেটা বলি নাই। আমি বলেছি মানুষ বেচাকেনা বন্ধ।"

"বন্ধ?"

"হ্যাঁ। বন্ধ।"

"কবে থেকে?"

"অনেক দিন থেকে। মানুষ আগে যখন অসভ্য আর জঙ্গি ছিল তখন একজন মানুষ আরেকজনকে বিক্রি করত। এখন মানুষ সভ্য হয়েছে এখন তারা মানুষ বিক্রি করে না।"

AMARBOI.COM

মাইক্রোফোন হাতের মানুষটিকে এবারে পুরোপুরি বিভ্রান্ত দেখায়। সে আমতা আমতা করে বলল, "দেখ। তুমি নিশ্চয়ই এখানে নূতন এসেছ! এখন বাজারে নিয়মিত মানুষ, মেয়েমানুষ, বাচ্চা-কাচ্চা বিক্রি হয়। বিশাল ব্যবসা। আমি অনেকদিন থেকে করছি—"

রুহান তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "ভুল করছিলে। আর করবে না।" সে খাঁচার ভেতরে আটকে থাকা মানুষগুলো দেখিয়ে বলল, "এদের সবাইকে ছেড়ে দাও।"

মাইক্রোফোন হাতের মানুষটির চোখেমুখে এবারে একটা ক্রোধের চিহ্ন ফুটে ওঠে, সে কঠিন চোখে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কে আমি জানি না। তুমি কী জন্যে এটা করছ সেটাও আমি জানি না। আমি বলছি, তুমি এখান থেকে যাও। আমার এই ব্যবসা আমি এমনি এমনি করি না। আমার গার্ডদের ডাকলে তোমার কপালে দুঃখ আছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে তুমি বলছ মানুষ বেচাকেনা করা যায়?"

"অবশ্যই করা যায়। এই লাল পাহাড় হচ্ছে মুক্তাঞ্চল। যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো জিনিস এনে এখানে বিক্রি করা যায়। এটা হচ্ছে মুক্তাঞ্চলের অলিখিত আইন।"

"ভারি মজা তো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইক্রোফোন হাতের মানুষটি বলল, "মজা?"

"হ্যাঁ। তার মানে আমিও ইচ্ছে করলে মানুষকে বিক্রি করতে পারব?"

"অবশ্যই পারবে।"

"ঠিক আছে, আমি তা হলে চেষ্টা করে দেখি।" বলে সে খপ করে মানুষটির কলার ধরে কাছে টেনে এনে তার হাত থেকে মাইক্রোফোনটা কেড়ে নেয়। এক হাতে মানুষটাকে ধরে রেখে অন্য হাতে মাইক্রোফোনটা মুখের সামনে ধরে সে বলল, "তোমাদের কাছে বুড়ো হাবড়া অপদার্থ একটা মানুষ বিক্রি করতে চাই। কথা বেশি বলে এ ছাড়া এর আর কোনো সমস্যা নেই। কে কিনতে চাও?"

উপস্থিত মানুষদের ভেতর থেকে একজন কৌতুকপ্রিয় মহিলা জিজ্ঞেস করল, "কত দাম?"

"খুব সস্তায় ছেড়ে দিচ্ছি। দাম মাত্র এক ইউনিট।"

উপস্থিত মানুষগুলোর ভেতরে একটা হাসির রোল উঠল। মহিলাটি বলল, "এত সস্তা হলে এক ডজন কিনতে চাই।"

"আমার কাছে এক ডজন নেই, একটাই আছে।" এরকম অপদার্থ মানুষ ডজন ডজন তৈরি হয় না।

"দাও তা হলে—" মহিলাটি সত্যি সত্যি তার ব্যাগ খুলে ইউনিট বের করতে শুরু করে।

রুহান কলার ধরে রাখা মানুষটাকে বলল, "দিই তোমাকে বিক্রি করে?"

"কী করছ তুমি বুঝতে পারছ না?" মানুষটি ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "সবকিছু নিয়ে তামাশা করা যায় না।"

"আমি মোটেও তামাশা করছি না।" রুহান ঠান্ডা গলায় বলল, "তুমি যদি জোর করে ধরে এনে মানুষ বিক্রি করতে পার তা হলে আমি কেন জোর করে ধরে তোমাকে বিক্রি করতে পারব না?"

মানুষটি চট করে এই যুক্তিটার উত্তরে কিছু বলতে পারল না। খানিকক্ষণ আমতা আমতা করে বলল, "তুমি এরকম পাগলামি করতে পার না—"

রুহান তখন মানুষটিকে ছেড়ে দেয়। বলে, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এরকম পাগলামি করতে পারি না। মানুষ হয়ে মানুষকে বিক্রি করে দেওয়া পাগলামি। এটা কেউ করতে পারে না। আমি যেমন তোমাকে করব না—তুমিও এদের করবে না। বুঝেছ?"

মানুষটি কিছু অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে উন্মত্তের মতো চিৎকার করে বলল, "গার্ড!"

রিদি এবারে তার অস্ত্রটা মাথার উপরে তুলে চিৎকার করে বলল, "খবরদার, কেউ নড়বে না।"

তার চিৎকারে যে যেখানে ছিল সেখানেই থেমে গেল।

রিদি বলল, "গার্ডরা, তোমরা ইচ্ছে করলে আমাকে গুলি করার চেষ্টা করতে পার। কিন্তু আমি আগেই বলে দিচ্ছি তোমরা অস্ত্রটা তোলার আগেই তোমাদের আমি শেষ করে দিতে পারব। বুঝেছ?"

কেউ কোনো কথা বলল না। মানুষগুলো নিজেদের ভেতরে চাপা গলায় কথা বলতে থাকে এবং হঠাৎ কমবয়সী একটা মেয়ে এগিয়ে এসে উত্তেজিত গলায় বলল, "তোমরা কি খেলোয়াড়? তোমরাই কি ক্রিভানকে ধরে নিয়েছিলে?"

রিদি আর রুহান একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, তাদের পরিচয় আর গোপন রাখার প্রয়োজন নেই। রিদি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

বিস্ময়ের একটা সম্মিলিত শব্দ শোনা গেল, এবারে অনেকেই তাদের কাছে আসার চেষ্টা করে, ভালো করে একনজর দেখার চেষ্টা করে। কমবয়সী কয়েকটা মেয়ে আনন্দে এক ধরনের চিৎকার করতে থাকে। চারদিকে মানুষের হুটোপুটি শুরু হয়ে যায়।

রুহান মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "তোমরা সবাই শান্ত হও। আমি তোমাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি আজ থেকে লাল পাহাড়ে মানুষ বেচাকেনা বন্ধ। আর কেউ এখানে দূরের গ্রাম থেকে মানুষ ধরে এনে বিক্রি করতে পারবে না।"

উপস্থিত মানুষগুলো উল্লাসের মতো এক ধরনের শব্দ করল। তারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে সেরকম মনে হল না, কোনো একটা বিষয় নিয়ে হইচই হচ্ছে সেটা নিয়েই আনন্দ!

কাছাকাছি ক্রিটিনা দাঁড়িয়ে ছিল, রুহান বলল, "ক্রিটিনা তোমাকে কেউ বিক্রি করতে পারবে না। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

ক্রিটিনা কোনো কথা না বলে স্থির চোখে রুহানের দিকে তাকিয়ে রইল। রুহান বলল, "তুমি মুক্ত। তুমি যেখানে খুশি যেতে পার।"

ক্রিটিনা ফিসফিস করে বলল, "আমি তোমাকে ঘৃণা করি। অসম্ভব ঘৃণা করি।"

রুহান চমকে উঠে বলল, "ঘৃণা কর? আমাকে?"

"হ্যাঁ। তুমি ভেবেছ আমি তোমাদের মতো মানুষদের চিনি না? খুব ভালো করে চিনি। গলায় একটা অস্ত্র ঝুলিয়ে তোমরা মনে কর সারা পৃথিবীটা তোমাদের। যা ইচ্ছা তাই করতে পার।"

রুহান কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "বিশ্বাস কর, আমি সেরকম কিছু ভাবছি না।"

"আমি জানি তুমি ঐ মানুষটার কাছ থেকে কেন আমাদের ছিনিয়ে নিয়েছ।"

"কেন?"

"তুমি এখন আমাদের অন্য কোথাও বিক্রি করবে।"

"না, ক্রিটিনা—বিশ্বাস কর, তোমাদের আমি অন্য কোথাও বিক্রি করব না। তোমরা যেখানে খুশি যেতে পার। তোমরা স্বাধীন—"

ক্রিটিনা হঠাৎ আনন্দহীন শুকনো হাসিতে ভেঙে পড়ল। হাসতে হাসতে বলল, "আমরা স্বাধীন।"

"হ্যাঁ।"

"আমরা স্বাধীন হয়ে এখন কোথায় যাব? বাইরে তোমার মতো হাজার হাজার মানুষ বসে আছে আমাদের ধরে নিতে! আমরা কোথায় যাব? কী করব?"

"তোমাদের গ্রামে যাবে!"

"আমাদের গ্রাম কত দূর তুমি জান? এরা সেই গ্রামে কী করেছে তুমি জান? কত বাড়ি পুড়িয়েছে, কত মানুষ মেরেছে তুমি জান?"

"আমি দুঃখিত ক্রিটিনা—"

ক্রিটিনা হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "খবরদার, যেটা বিশ্বাস কর না সেটা মুখে উচ্চারণ কর না।"

রুহান থতমত খেয়ে বলল, "আমি কী বিশ্বাস করি না?"

"দুঃখিত হবার কথা বল না। কারণ তোমরা দুঃখিত না। তোমরা আমাদের লুট করে নিয়ে এখন কোথাও বিক্রি করবে। আমি জানি—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বিশ্বাস কর ক্রিটিনা—"

ক্রিটিনার চোখদুটো আগুনের মতো জ্বলে উঠল। সে হিংস্র গলায় বলল, "খবরদার, তুমি বিশ্বাস করার কথা মুখে আনবে না। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। কাউকে না।"

১০

রিদি রুহানের দিকে এগিয়ে এসে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব বিপদের মধ্যে পড়েছ।"

রুহান একটু কষ্ট করে হেসে বলল, "তোমার কী ধারণা?"

"আমার ধারণা তুমি এবং আমি দুজনেই খুব বিপদের মধ্যে পড়েছি! একজন মানুষের পুরো ব্যবসা তুমি লুট করে নিয়েছ সে কি এটা সহজভাবে মেনে নেবে? নেবে না!"

"আমি কিছু লুট করি নি। আমি এই মানুষগুলোকে মুক্ত করে দেবার চেষ্টা করেছিলাম।"

রিদি শব্দ করে হেসে বলল, "তুমি যাদেরকে মুক্ত করেছ তারাও তোমাকে বিশ্বাস করে নি, আর তুমি আশা করছ অন্যেরা বিশ্বাস করবে?"

রুহান মাথা চুলকে বলল, "কী করা যায় বুঝতে পারছি না।"

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে যেতে হবে। সবাইকে নিয়ে।"

"কিন্তু সেটা কীভাবে করব?"

ঠিক এরকম সময় তারা দেখতে পেল একজন মানুষ ভিড় ঠেলে তাদের দিকে আসছে। কাছাকাছি এলে তারা মানুষটিকে চিনতে পারল, এজেন্ট দ্রুচেন।

এজেন্ট দ্রুচেন কাছে এসে দুজনের হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "অভিনন্দন। তোমাদের অনেক অভিনন্দন।"

রুহান ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন? কীসের অভিনন্দন?"

"তোমরা দুজন মিলে এত বড় একটা সাপ্লাই লুট করে নিলে এটা কি সোজা কথা? কার কাছে বিক্রি করবে ঠিক করেছ কিছু? আমার পরিচিত কিছু খরিদ্দার আছে, খুব ভালো ব্যবসা করে। এখান থেকে পঞ্চাশ–ষাট কিলোমিটার দূরে থাকে, আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারি। শতকরা দশ ভাগ কমিশন আমার, আমি আগে থেকে বলে রাখছি।"

রুহান কিছু না বলে নিঃশব্দে এজেন্ট দ্রুচানের দিকে তাকিয়ে রইল। দ্রুচান বলল, "কী হল তুমি কথা বলছ না কেন?"

রুহান তবু কোনো কথা বলল না। এজেন্ট দ্রুচান বলল, "এর থেকে কম কমিশনে আমি কাজ করতে পারব না। অসম্ভব!"

রুহান এবারেও কোনো কথা বলল না। দ্রুচান বলল, "তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কত কমিশন দিতে পারবে?"

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা কোনো কমিশন দিতে পারব না এজেন্ট দ্রুচান। তার কারণ আমরা এই মানুষগুলোকে বিক্রি করার জন্যে লুট করি নি! তাদের যেখান থেকে ধরে আনা হয়েছে আমরা সেখানে গিয়ে তাদের রেখে আসব।"

এজেন্ট দ্রুচান অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী বললে?"

"আমি বলেছি এই মানুষগুলোকে যেখান থেকে ধরে আনা হয়েছে আমরা তাদের সেখানে রেখে আসব।"

এজেন্ট দ্রুচান একবার রিদির মুখের দিকে তাকাল তারপর মাথা ঘুরিয়ে আবার রুহানের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা আমার সাথে ঠাট্টা করছ?"

"না, আমরা ঠাট্টা করছি না। আমরা সত্যি কথা বলছি।"

এজেন্ট দ্রুচান তখনো বিষয়টা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "কিন্তু কেন?"

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তার কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষ কখনো পণ্য হতে পারে না, একজন মানুষকে কখনো পণ্য হিসেবে বেচাকেনা করা যায় না।"

এজেন্ট দ্রুচান বাধা দিয়ে বলল, "কে বলেছে করা যায় না। সবাই করছে।"

"তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা মনে করি একজন মানুষ কখনো অন্য মানুষকে বেচাকেনা করতে পারে না।"

এজেন্ট দ্রুচান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আসলেই সেটা যদি তোমাদের পরিকল্পনা হয়ে থাকে তা হলে তোমরা খুব বিপদের মধ্যে আছ! তোমাদের নিরাপত্তা দেবার কেউ নেই—এই লোক ক্রিভানের খুব কাছের মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যে লোকজন আসবে তোমাদের ধরতে।"

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমারও তাই ধারণা।"

"তোমাদের এক্ষুনি সরে পড়তে হবে। এই মুহূর্তে।"

"ঠিকই বলেছ।"

"কীভাবে পালাবে এখান থেকে?"

"আমরা ভাবছিলাম তুমি আমাদের নিয়ে যাবে।"

"আমি?" এজেন্ট দ্রুচান অবাক হয়ে বলল, "আমি কেন নিয়ে যাব? যেখানে এক ইউনিট কমিশন নেই সেখানে আমি কেন তোমাদের নিয়ে যাব?"

রুহান এজেন্ট দ্রুচানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি নিয়ে যাবে কারণ সেটা হবে এই হতভাগ্য মানুষগুলোকে সাহায্য করার একটা সুযোগ। তুমি তাদের সাহায্য করবে।"

এজেন্ট দ্রুচান অবাক হয়ে রুহানের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে শব্দ করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে যায়, চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তুমি খুব মজার মানুষ। আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে কেউ একজন তোমার মতো করে কথা বলতে পারে।"

রুহান বলল, "আমি এমন কিছু বিচিত্র কথা বলি নি। পৃথিবীটা গড়ে উঠেছে মানুষের জন্যে মানুষের ভালবাসার কারণে। তুমি যদি এই মানুষগুলোকে সাহায্য কর তা হলে সেই ভালবাসাটা অনুভব করতে পারবে। মানুষের জন্যে ভালবাসার মতো সুন্দর জিনিস পৃথিবীতে আর কিছু নেই! বিশ্বাস কর।"

এজেন্ট দ্রুচান এক ধরনের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রুহানের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলল, "আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি আমাকে এসব বলছ।"

রুহান বলল, "তুমি বিশ্বাস করবে কি না, সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমি যেটা বলছি সেটা সত্যি বলছি।"

এজেন্ট দ্রুচান মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "আমি গেলাম। তোমরা কী করবে তোমরাই জান। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে তোমরা যদি এখনই এখান থেকে সরে না পড় তোমাদের কপালে দুঃখ আছে। অনেক বড় দুঃখ।"

AMARBOI.COM

এজেন্ট দ্রুচান চলে যাবার পর রিদি রুহানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "তা হলে কী করবে ঠিক করেছ?"

"আপাতত সরে পড়ি।"

"কোথায় সরে পড়বে?"

"পাহাড়ের দিকে যাই। জঙ্গলে ঢুকে পড়ি—সেখানে চট করে কেউ খুঁজে পাবে না।"

রিদি মাথা নাড়ল, "খুব ভালো একটা পরিকল্পনা হল বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু আর তো কিছু করার নেই।" রিদি জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "চল তা হলে রওনা দিই।"

ঘণ্টাখানেক পরে পাহাড়ি পথে রুহান আর রিদি জনা ত্রিশেক নানা বয়সের তরুণ-তরুণী নিয়ে হেঁটে যেতে থাকে। আবছা অন্ধকার, আকাশে একটা ভাঙা চাঁদ, তার মৃদু আলোতে সবাই নিঃশব্দে হেঁটে যাচ্ছে। ছোট একটা উপত্যকা পার হলে তারা একটা পাহাড়ি রাস্তায় উঠতে পারবে। এই রাস্তা ধরে দক্ষিণে কয়েক শ কিলোমিটার যেতে হবে। কেমন করে যাবে তারা এখনো জানে না।

উপত্যকাটা পার হয়ে তারা পাহাড়ি রাস্তায় এসে ওঠে। কমবয়সী ছেলেমেয়েগুলো পথের পাশে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। আবছা অন্ধকারে তাদের চেহারা দেখা যায় না, শুধু ভাগ্যের উপর অসহায়ভাবে সবকিছু সমর্পণ করে দেওয়ার ভঙ্গিটুকু বোঝা যায়।

রুহান নিচু গলায় বলল, "তোমরা বিশ্রাম নেবার জন্যে খুব বেশি সময় পাবে না। আমাদের এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে হবে।"

অন্ধকারে বসে থাকা একজন তরুণ জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"তোমাদের যাদের কাছ থেকে ছুটিয়ে এনেছি তারা তোমাদের আবার ধরে নিতে আসতে পারে।"

অন্ধকারে বসে থাকা তরুণটি বলল, "তাতে কী আসে যায়? আমরা তোমাদের হাতে থাকি আর অন্যের হাতে থাকি তাতে কী আসে যায়?"

রুহান কী উত্তর দেবে বুঝতে পারে না। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন অনেক দূরে একটা লরির হেডলাইট দেখতে পেল।

রিদি নিচু গলায় বলল, "সবাই পিছনে সরে যাও। বনের ভেতরে গিয়ে লুকিয়ে যাও।"

আবছা অন্ধকারে বসে থাকা তরুণটি বলল, "কেন? কেন আমাদের পিছনে সরে যেতে হবে?"

"কারা আসছে আমরা জানি না। তারা কী চায় সেটাও জানি না। যদি গোলাগুলি শুরু হয় তোমাদের নিরাপদে থাকা দরকার। মাথা নিচু করে মাটিতে শুয়ে থাক। যাও।"

আবছা অন্ধকারে বসে থাকা তরুণ-তরুণীগুলো উঠে দাঁড়িয়ে হুটোপুটি করে বনের ভেতরে ছুটে যেতে থাকে। রিদি আর রুহান দুটি বড় গাছের আড়ালে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা লরিটির ইঞ্জিনের চাপা গুঞ্জন শুনতে পেল। দেখতে দেখতে সেটা তাদের কাছাকাছি চলে আসে। রিদি আর রুহান অবাক হয়ে দেখল তাদের কাছাকাছি এসে লরিটি থেমে যায়। তারা ভাবছিল লরির পিছন থেকে অস্ত্র হাতে অনেকগুলো মানুষ নামবে কিন্তু সেরকম কিছু হল না। তারা অবাক হয়ে দেখল শুধু ড্রাইভিং সিট থেকে একজন মানুষ নেমে এল। আবছা অন্ধকারে তাকে স্পষ্ট দেখা যায় না, চোখে লাগানো ইন্‌ফ্রারেড গগলসটা শুধু চোখে পড়ে। মানুষটি এদিকে সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ উচ্চ স্বরে ডাকল, "রুহান, রিদি—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান আর রিদি মানুষটির গলার স্বর চিনতে পারে, এজেন্ট দ্রুচান। গাছের আড়াল থেকে দুজনে বের হয়ে এল, রুহান বলল, "কী ব্যাপার দ্রুচান? তুমি এখানে?"

এজেন্ট দ্রুচান বলল, "তোমার মানুষজন কোথায়? দেরি কোরো না, তাড়াতাড়ি ওঠো লরিতে। তোমাদের খোঁজে বিশাল বাহিনী রওনা দিচ্ছে।"

রুহান এজেন্ট দ্রুচানের কাছে গিয়ে নরম গলায় বলল, "আমি জানতাম তুমি আসবে।"

এজেন্ট দ্রুচান বিরক্ত গলায় বলল, "বাজে কথা বোলো না। আমি নিজে জানতাম না আর তুমি কেমন করে জানতে?"

"তুমি না জানতে পার, কিন্তু আমি জানতাম। এই পৃথিবীটা টিকে যাবে কেন তুমি জান এজেন্ট দ্রুচান?"

"আমার এত বড় বড় জিনিস জানার কোনো শখ নেই রুহান। আমি শুধু জানি যদি এক্ষুনি এই লরিতে সবাই না ওঠো তা হলে কিন্তু কেউ পৌঁছাতে পারবে না।"

রুহান এজেন্ট দ্রুচানের কথা না শোনার ভান করে বলল, "এই পৃথিবীটা টিকে যাবে কারণ মানুষের ভেতরে এখনো মনুষ্যত্বটুকু বেঁচে আছে।"

এজেন্ট দ্রুচান বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি যে কী বাজে বকতে পার রুহান সেটা অবিশ্বাস্য।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় পাহাড়ি পথ দিয়ে লরিটি ছুটে যাচ্ছে। সামনে ড্রাইভিং সিটে এজেন্ট দ্রুচানের পাশে বসেছে রিদি। পিছনে অন্য সবার সাথে বসেছে রুহান। রুহান পিছনের খোলা অংশ দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। লরির ভেতরে চুপচাপ বসে আছে অন্য সবাই।

বসে থাকতে থাকতে রুহানের চোখে হঠাৎ একটু ঘুমের মতো এসেছিল। হঠাৎ করে তার ঘুমটা ভেঙে গেল, তার কোলের উপর রাখা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা কেউ একজন হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে নিয়েছে। রুহান মাথা ঘুরিয়ে দেখে মানুষটি ক্রিটিনা। সে অস্ত্রটা তার দিকে তাক করে ধরে রেখেছে, আবছা অন্ধকারেও বোঝা যায় তার চোখ ধকধক করে জ্বলছে। রুহান কোনো কথা না বলে স্থির চোখে ক্রিটিনার দিকে তাকিয়ে রইল।

ক্রিটিনা হিংস্র গলায় বলল, "লরি থামাও।"

"কেন?"

"আমরা নেবে যাব।"

"কোথায় নেমে যাবে?"

"সেটা তোমার জানার প্রয়োজন নেই।"

রুহান বলল, "ক্রিটিনা, আমরা তোমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করছি।"

"তোমাদের সাহায্যের কথা আমি খুব ভালো করে জানি! তোমরা হচ্ছ খুনে ডাকাত ঠগ আর প্রতারক—"

"আমার কথা শোনো—"

ক্রিটিনা চিৎকার করে বলল, "আমি কোনো কথা শুনব না। লরি থামাও।"

"যদি না থামাই?"

"তোমাকে আমি খুন করে ফেলব।"

রুহান হাসার চেষ্টা করল, যদিও আবছা অন্ধকারে সেটা কেউ দেখতে পেল না। সে নরম গলায় বলল, "খুন করে ফেলবে?"

"হ্যাঁ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে। কর খুন।"

ক্রিটিনা হিংস্র গলায় বলল, "আমাকে রাগানোর চেষ্টা কোরো না—"

রুহান বলল, "আমি তোমাকে মোটেও রাগানোর চেষ্টা করছি না, ক্রিটিনা আমি তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। তুমি বুঝতে চাইছ না। আমি তোমাকে বলেছি, তোমাদের আমরা তোমাদের গ্রামে নিয়ে যেতে যাচ্ছি—"

"মিথ্যে কথা বলবে না।" ক্রিটিনা চিৎকার করে বলল, "আমার সাথে মিথ্যে কথা বলবে না।"

"ঠিক আছে, আমি আর কথাই বলব না।"

"খুন করে ফেলব তোমাদের সবাইকে।"

"কীভাবে খুন করবে?"

"গুলি করে খুন করব।"

"তুমি কি আগে কখনো এরকম অস্ত্র ব্যবহার করেছ? তুমি কি জান কেমন করে গুলি করতে হয়?"

ক্রিটিনাকে এক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করতে দেখা যায়। ইতস্তত করে বলে, "সব অস্ত্রই এক। আমি জানি ট্রিগার টানলেই গুলি হয়।"

"না।" রুহান মাথা নাড়ল, "নিরাপত্তার কিছু ব্যাপার থাকে। ট্রিগার টানলেই গুলি হয় না। আমার কথা বিশ্বাস না করলে তুমি ট্রিগার টেনে দেখতে পার।"

ক্রিটিনা ইতস্তত করে অস্ত্রটা বাইরে তাক করে ট্রিগার টানল, ঘট করে একটা শব্দ হল কিন্তু কোনো গুলি হল না। রুহান বলল, "এখন আমার কথা বিশ্বাস হল?" তুমি অস্ত্রটা আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই কেমন করে সেফটি লিভারটি টানতে হয়।"

"আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।"

"ঠিক আছে, তা হলে অস্ত্রটা আমাকে দিতে হবে না। তুমি নিজেই কর। ডানপাশের উপরের লিভারটা টেনে নিজের দিকে আন।"

ক্রিটিনা অনিশ্চিতের মতন লিভারটি নিজের দিকে টেনে আনে। রুহান পরিতৃপ্তির মতো শব্দ করে বলল, "চমৎকার! এখন তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে গুলি করে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারবে। বিশ্বাস না করলে পরীক্ষা করে দেখ!"

ক্রিটিনা অস্ত্রটা বাইরে তাক করে ট্রিগার টানতেই ভয়ঙ্কর শব্দ করে অস্ত্রটি গর্জন করে ওঠে। লরির ভেতরে বসে থাকা ছেলেমেয়েগুলো ভয় পেয়ে চিৎকার করে পিছনে সরে যায়। সামনে ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা রিদি এবং দ্রুচান গুলির শব্দ শুনে কারণটা বোঝার জন্যে রাস্তার পাশে লরি থামিয়ে নেমে আসে। রিদি চাপা গলায় বলে, "কী হয়েছে রুহান?"

"বিশেষ কিছু না।" রুহান হালকা গলায় বলল, "কেমন করে অস্ত্র চালাতে হয় তার একটা ছোট ট্রেনিং হচ্ছে।"

রিদি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "তোমার মাথা খারাপ রুহান। এটা কি ট্রেনিং দেবার সময়?"

রুহান শব্দ করে হেসে বলল, "ট্রেনিংয়ের সময় অসময় বলে কিছু নেই রিদি। তোমরা সেটা নিয়ে চিন্তা কোরো না। যাও লরি চালাতে থাক।"

কিছুক্ষণের মধ্যে আবার লরি চলতে শুরু করে। লরির পেছনে বসে থেকে কিছুই হয় নি এরকম একটা ভঙ্গি করে রুহান শিস দিয়ে একটা সুর তোলার চেষ্টা করতে থাকে। ক্রিটিনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি কি লিভারটা আবার সামনে ঠেলে দেব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি যদি অস্ত্রটা এই মুহূর্তে ব্যবহার করতে না চাও তা হলে সেটাই নিরাপদ।"

ক্রিটিনা লিভারটি ঠেলে দিয়ে অস্ত্রটা রুহানের দিকে এগিয়ে দেয়। বলে, "নাও।"

"কী নেব?"

"এই অস্ত্রটা।"

রুহান বলল, "তোমার কাছে রাখ।"

"আমার কাছে রাখব?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"দুটি কারণে। এক, আমি চাই তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর যে সত্যিই আমরা তোমাদেরকে তোমাদের এলাকায় ফিরিয়ে দিতে চাই। দুই, আমার কাছে আরো একাধিক অস্ত্র আছে, তুমি যেহেতু অস্ত্র চালাতে শিখেই গেছ, এটা তোমার কাছে থাকলে আমাদের নিরাপত্তা বেশি হয়। যদি দরকার হয় তা হলে তুমিও এটা ব্যবহার করতে পারবে।"

ক্রিটিনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি দুঃখিত, রুহান আমি যে তোমার কোনো কথা বিশ্বাস করি নি।"

"এখন করেছ?"

"তোমাকে বিশ্বাস করেছি, তোমার কথা এখনো বিশ্বাস করি নি।"

রুহান শব্দ করে হেসে বলল, "আমাকে যদি বিশ্বাস কর তা হলে আগে হোক পরে হোক একদিন আমার কথাকেও বিশ্বাস করবে।"

ক্রিটিনা অস্ত্রটা কোলের উপর রেখে রুহানের পাশে বসল। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা কেন আমাদের উদ্ধার করছ?"

রুহান বলল, "আমি জানি না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "উত্তরটা পছন্দ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। পছন্দ হয়েছে।"

"কেন?"

"পৃথিবী থেকে ভালো উঠে গেছে। এটা আবার ফিরে আসবে। এভাবেই আসবে। কেউ জানবে না কেন আসছে। আসবে গোপনে।"

রুহান ক্রিটিনার দিকে তাকাল, আবছা অন্ধকারে তার চেহারাটা ভালো করে দেখা যায় না। চেহারায় এক ধরনের বিষাদের ছাপ।

খুব ভোরবেলা লরিটি থামল। পিছনের দরজা খুলে প্রথমে রুহান তার পিছু ক্রিটিনা নেমে এল, তারপর অন্য সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকে। কয়েক ঘণ্টা আগেও সবার ভেতরে একটা চাপা আশঙ্কা কাজ করছিল। যখন বুঝতে পেরেছে যে আসলেই সবাইকে তাদের নিজের এলাকাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন হঠাৎ করে সবার ভেতরে এক ধরনের নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার ফুরফুরে আনন্দ এসে ভর করেছে। লরি থেকে নেমে সবাই হইচই চেঁচামেচি করতে থাকে—যারা একটু ছোট তারা ছোটাছুটি শুরু করে দেয়।

এজেন্ট দ্রুচান লরির নিচে থেকে একটা বাক্স টেনে নামিয়ে আনে, সেটা খুলতেই ভেতর থেকে শুকনো খাবার আর পানীয় বের হয়ে আসে। সবার মধ্যে সেটা ভাগ করে দিতে দিতে বলল, "তাড়াতাড়ি সবাই খেয়ে নাও, আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রওনা দেব।"

কমবয়সী একটা মেয়ে বলল, "কেন আমাদের এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা দিতে হবে? আমরা কি জায়গাটা একটু ঘুরে দেখতে পারি না?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এখানে দেখার মতো কিছু নেই।"

মেয়েটি বলল, "কে বলেছে নেই? ঐ যে দূরে একটা কাচের ঘর দেখা যাচ্ছে।"

এজেন্ট দ্রুচান বলল, "এটা একটা পুরোনো মানমন্দির। ভেঙেচুরে আছে, দেখার মতো কিছু নেই।"

"কে থাকে ওখানে?"

"কেউ থাকে না। সাপখোপ থাকলে থাকতে পারে।"

মেয়েটি আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল, "আমার সাপখোপ দেখতে খুব ভালো লাগে। আমি কি দেখতে যেতে পারি?"

রুহান বলল, "ঠিক আছে যাও। সাপখোপ বাঘ সিংহ যেটা ইচ্ছে দেখতে যেতে পার তবে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। তোমরা জান তোমাদের ধরার জন্যে পিছু পিছু অনেক মানুষ আসছে।"

একটা ছেলে কঠিন মুখে বলল, "আসুক না ধরতে! ওদের বারটা বাজিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে না?"

রুহান জানতে চাইল। বলল, "কে বারটা বাজাবে?"

ছেলেটি একগাল হেসে বলল, "কেন? তুমি? তুমি আর রিদি। তোমরা পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়, তোমাদের কাছে কে আসবে?"

আশপাশে যারা ছিল সবাই আনন্দের মতো একটা শব্দ করল।

সবাই চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবার পর এজেন্ট দ্রুচান তার লরিটার কাছে গিয়ে বনেট খুলে ইঞ্জিনের দিকে উঁকি দেয়। কিছু একটা দেখে সে হঠাৎ শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে। রুহান জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

AMARBOI.COM

এজেন্ট দ্রুচান বলল, "সমস্যা।"

"কী সমস্যা।"

"ইঞ্জিনের কুলেন্ট পাইপে লিক। সব কুলেন্ট পড়ে যাচ্ছে।"

'কীভাবে হল?"

"পুরোনো ইঞ্জিন সেটা হচ্ছে সমস্যা। ভালো কুলেন্ট পাওয়া যায় না, জোড়াতালি দিয়ে তৈরি হয় সেটা আরেকটা সমস্যা।"

রুহান জিজ্ঞেস করল, "তা হলে এখন কী করবে?"

"কুলেন্টের পাইপগুলো পাল্টাতে হবে।"

"কী দিয়ে পাল্টাবে?"

"আমার কাছে বাড়তি পাইপ আছে, কিন্তু ওয়েল্ডিং করতে হবে। একটু সময় নেবে।"

রিদি পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, একটু কাছে এগিয়ে এসে বলল, "এজেন্ট দ্রুচান, আমি তোমাকে সাহায্য করি?"

এজেন্ট দ্রুচান বলল, "তার চাইতে বেশি দরকার একটু রাস্তার দিকে লক্ষ রাখা, হঠাৎ করে যদি আমাদের ধরতে চলে আসে তখন মহাবিপদ হবে।"

রুহান বলল, "ঠিক আছে আমি সেটা দেখছি।"

রিদি জানতে চাইল, "কীভাবে দেখবে?"

রুহান পিছনে তাকিয়ে বলল, "আমি ঐ মানমন্দিরটার উপরে গিয়ে দাঁড়াই, তা হলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাব।"

রিদি মাথা নেড়ে বলল, "যাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এজেন্ট দ্রুচান তার গলায় ঝোলানো বাইনোকুলারটি রুহানের হাতে দিয়ে বলল, "এটা নিয়ে যাও।"

ক্রিটিনা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "রুহান, আমি কি তোমার সাথে যেতে পারি?"

"অবশ্যই যেতে পার ক্রিটিনা। মানমন্দিরের উপরে একা একা দাঁড়িয়ে না থেকে দুজনে মিলে দাঁড়ালে সময়টা ভালো কাটবে। চল।"

একসময় এই এলাকায় জনবসতি ছিল এখন নেই। যে ছোট নুড়িপাথরের রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে মানমন্দির পর্যন্ত উঠে গেছে সেটা নানারকম ঝোপঝাড়ে ঢেকে গেছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে তারা মানমন্দিরের কাছে এসে দাঁড়ায়। ভাঙা মানমন্দিরের ভেতর থেকে তারা ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচি শুনতে পায়। তাদের কলরব শুনলে মনে হয় তারা বুঝি কোনো একটা আনন্দোৎসবে এসেছে।

মানমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিটিনা কপালের ঘাম মুছে বলল, "কেমন গরম দেখেছ?"

"হ্যাঁ। বেশ গরম।" রুহান একটু অবাক হল, তারা সরাসরি রোদে দাঁড়িয়ে নেই, তা ছাড়া সূর্যের আলো এখনো এত প্রখর হয় নি, কিন্তু এখানে তবু বেশ গরম। রুহান কারণটা ঠিক বুঝতে পারে না। মানমন্দিরটা কাচ দিয়ে তৈরি। বিভিন্ন জায়গায় কাচ ভেঙে আছে, ফেটে আছে। লতাগুল্ম দিয়ে মানমন্দিরটা স্থানে স্থানে ঢেকে আছে তবুও বোঝা যায় এটি একসময় চমৎকার একটা বিল্ডিং ছিল। রুহান উপরে ওঠার সিঁড়ি খুঁজে বের করার জন্যে মানমন্দিরের ভেতরে ঢুকে আবিষ্কার করে ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা। রুহান ক্রিটিনার দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা জিনিস লক্ষ করেছ ক্রিটিনা?"

"কী?"

"এটা একটা কাচের ঘর, ভেতরে ঠাণ্ডা কিন্তু বাইরে গরম।"

"তার মানে কী?"

"মানমন্দিরের কাচ সূর্যের আলোর তাপের অংশটিকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না, এটা বাইরে প্রতিফলিত হচ্ছে, সেজন্য বাইরে গরম। শুধু দৃশ্যমান আলোটা ঢুকতে দিচ্ছে ভিতরে, সেজন্যে ভেতরে অনেক আলো কিন্তু গরম নেই, ঠাণ্ডা।"

"ভারি মজা তো।"

"হ্যাঁ। এলাকাটা নিশ্চয়ই উষ্ণ। মানমন্দিরকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে এরকম কাচ লাগানো হয়েছে।

"ঠিকই বলেছ।"

রুহান আর ক্রিটিনা কথা বলতে বলতে মানমন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যেতে থাকে। অনেক উঁচু মানমন্দির, ছাদে পৌঁছানোর পর তারা আবিষ্কার করল এখানে দাঁড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। যে রাস্তা ধরে তারা এসেছে সেই রাস্তাটি পাহাড়কে ঘিরে ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে। চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে তারা প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। রুহান চারদিকে তাকিয়ে দেখে—যতদূর দেখা যায়, ফাঁকা ধু ধু পাহাড়, জনমানবের চিহ্ন নেই। পুরো দৃশ্যটাতে এক ধরনের মন খারাপ করা বিষয় রয়েছে, ঠিক কী কারণে মন খারাপ হয় সেটা বুঝতে না পেরে রুহান এক ধরনের অস্থিরতা অনুভব করে।

মানমন্দিরের ছাদে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে পায় ছেলেমেয়েগুলো বাইরে ছুটোছুটি করছে। এখন তাদের দেখে বোঝাই যায় না যে সবাইকে মায়ের বুক থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পণ্য হিসেবে বিক্রি করার জন্যে। মনে হচ্ছে তারা বুঝি কোথাও পিকনিক করতে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানমন্দিরের ছাদে দুজন ইতস্তত হাঁটে। চারপাশে বনজঙ্গল। এখানে জনবসতি কখনোই ছিল না, একসময় হয়তো মানমন্দিরটা চালু ছিল তখন কিছু মানুষজন থাকত, আসত-যেত। এখন কেউ নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানে এখন মানুষের কোনো আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই।

"রুহান—" ক্রিটিনার গলার স্বর শুনে রুহান ঘুরে তাকাল। ক্রিটিনা বলল, "তোমাকে আমার একটা কথা বলা হয় নি।"

"কী কথা?"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

রুহান হেসে বলল, "কী জন্যে ধন্যবাদ?"

"আমাদের উদ্ধার করে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, সেজন্যে নয়। সেজন্যে কৃতজ্ঞতা। কিন্তু ধন্যবাদ অন্য কারণে—"

"কী কারণে?"

"এই যে আমি তোমাকে বলছি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ—এই কথাটি বলার সুযোগ করে দেবার জন্যে। এরকম কথা বলাই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে পৃথিবীটা হচ্ছে স্বার্থপর নিষ্ঠুর একটা জায়গা। এখানে সবাইকে হতে হবে হিংস্র আর স্বার্থপর। যার যেটা প্রয়োজন সেটা কেড়ে নিতে হবে। এখানে ভালবাসা আর মমতার কোনো স্থান নেই।"

ক্রিটিনা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আমিও একজন হিংস্র মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে সেটা ভুল। তুমি আবার আমার ভিতরে মানুষের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ। এই বিশ্বাসের কারণে আমি হয়তো খুব বিপদে পড়ব। হয়তো আমার দুঃখ হবে, কষ্ট হবে, যন্ত্রণা হবে, কিন্তু তবু আমি এই বিশ্বাসটা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।"

কথা বলতে বলতে ক্রিটিনা দূরে তাকাল এবং হঠাৎ করে তার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে যায়। সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "রুহান!"

"কী হয়েছে?"

"ঐ দেখ—"

রুহান ক্রিটিনার দৃষ্টি অনুসরণ করে দূরে তাকায়, বহুদূরে পাহাড় ঘিরে রাস্তাটি উঠে এসেছে। সেই রাস্তায় অনেকগুলো গাড়ি একটা কনভয়। গাড়িগুলো এইদিকে আসছে। ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে এগুলো এখানে পৌঁছে যাবে।

কেউ বলে দেয় নি কিন্তু তারা জানে এই কনভয়গুলো আসছে তাদের ধরে নেওয়ার জন্যে।

১১

এজেন্ট দ্রুচান বলল, "না, আমি এক ঘণ্টার ভেতর রওনা দিতে পারব না। এখনো সবগুলো কুলেন্ট টিউব ওয়েল্ড করে লাগানো হয় নি। সময় লাগবে।"

রিদি গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, "তা হলে আমাদের করার বিশেষ কিছু নেই। কনভয়টাকে মাঝখানে থামাতে হবে।"

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "অস্ত্র নিয়ে আমরা মাত্র দুইজন। ক্রিটিনাকে ধরলে তিনজন। তাদের গাড়িই আছে চারটা। কিছু একটা করা যাবে বলে মনে হয় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

"রাস্তার ভালো একটা জায়গা দেখে এমবুশ করতে হবে।" রিদি বলল, "প্রথম গাড়িটা থামাতে পারলে অন্যগুলোও থেমে যাবে।"

রুহান কোনো কথা না বলে অন্যমনস্কভাবে মাথা ঘুরিয়ে দূরের মানমন্দিরটার দিকে তাকাল। রিদি বলল, "তা হলে দেরি করে কাজ নেই, চল এখনই বের হয়ে পড়ি।"

রুহান বলল, "আমি অন্য একটি কথা ভাবছিলাম।"

"কী কথা?"

"ঐ যে মানমন্দিরটা দেখছ, তার কাচগুলো তাপ প্রতিরোধক। সূর্যের আলোর ভেতর যেটুকু দৃশ্যমান সেটা ঢুকতে দেয় কিন্তু তাপের অংশটুকু প্রতিফলিত করে দেয়। আমরা এই কাচগুলো ব্যবহার করে একটা কাজ করতে পারি।"

"কী কাজ?"

"আমাদের মধ্যে প্রায় তিরিশজন ছেলেমেয়ে আছে। সবার কাছে যদি একটা কাচ দিই তারা সেটা হাতে নিয়ে সূর্যের আলোটা প্রতিফলিত করে ঐ গাড়িগুলোর উপরে ফেলে তা হলে গাড়িগুলোতে আগুন ধরে যাবে। আমরা অনেক দূর থেকে গাড়িগুলো জ্বালিয়ে দিতে পারব।"

রিদি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে বলল, "সত্যি?"

"কয়েক হাজার বছর আগে আর্কিমিডিস নামে একজন বিজ্ঞানী এভাবে শত্রুদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।"

"তুমিও সেটা করবে?"

"হ্যাঁ। একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, কিন্তু আমার মনে হয় আমরা পারব। সবচেয়ে বড় কথা কাজটা করা যাবে গোপনে, তারা বুঝতেই পারবে না কী হচ্ছে।"

রিদি বলল, "ঠিক আছে, তা হলে দেরি করে লাভ নেই। কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।"

মানমন্দিরের কাচগুলো খুলে নেওয়ার কাজটুকু সহজ হল না, কিন্তু কাচগুলো অক্ষত রেখে খোলারও প্রয়োজন ছিল না তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় বড় গোটা চল্লিশেক কাচ খুলে ফেলা হল। সূর্যটা এতক্ষণে বেশ উপরে উঠেছে তার প্রখর আলোতে এখন যথেষ্ট উত্তাপ। বড় কাচগুলো দিয়ে তার প্রায় সবখানি প্রতিফলিত করা যায়।

এর মধ্যে ক্রিটিনা সবাইকে ডেকে এনেছে। তাদেরকে একটা জরুরি কাজ করতে হবে বলে সে সবাইকে একটা লম্বা সারিতে দাঁড় করাল। সবাই উসখুস করছিল, রুহান হাত তুলে তাদের শান্ত করে বলল, "আজ তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করতে হবে।"

একজন জানতে চাইল, "কী কাজ?"

"তোমরা সবাই নিশ্চয়ই অনুমান করেছ তোমাদের আবার ধরে নেবার জন্যে কিছু মানুষজন আসার কথা। বাজে মানুষ। খারাপ মানুষ। জঘন্য মানুষ।"

সবাই মাথা নাড়ল। রুহান বলল, "তারা আসছে।"

সাথে সাথে সবার ভেতরে একটা আতঙ্কের ছাপ পড়ল। রুহান হাত তুলে বলল, "তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। সেই জঘন্য মানুষগুলোকে আমরা কাছে আসতে দেব না। দূর থেকে আমরা তাদের ধ্বংস করে দেব।"

"কীভাবে ধ্বংস করবে?"

"এই কাচগুলো দিয়ে। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই কখনো না কখনো আয়না দিয়ে সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করেছ, দূরে কোথাও পাঠিয়েছ। তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই মাথা নাড়ল। রুহান বলল, "এখানেও তাই করবে, এই বড় বড় কাচগুলো আয়নার মতো—তবে আলো নয় তাপকে প্রতিফলিত করে।"

রুহান সবার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে গলা উঁচু করে বলল, "আমরা সবাই যদি আলাদা আলাদাভাবে আয়নাগুলোকে দিয়ে এক জায়গায় সবটুকু তাপ কেন্দ্রীভূত করতে পারি, প্রচণ্ড তাপে সেখানে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে যাবে। তোমরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর এখনই সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। আমি তোমাদের সবাইকে একটা করে কাচ দেব, তোমরা সূর্যের আলোকে এই কাচ দিয়ে প্রতিফলিত করে এক জায়গায় ফেলবে। পারবে না?"

সবাই চিৎকার করে বলল, "পারব।"

"চমৎকার!" রুহান তখন পাশে সাজিয়ে রাখা কাচগুলো একজন একজনকে দিতে শুরু করে। চেষ্টা করা হয়েছে যথাসম্ভব বড় টুকরা দিতে, ভারী কাচগুলো নিচে রেখে সবাই দুই পাশে ধরে দাঁড়ায়। রুহান একপাশে সরে গিয়ে বলল, "সাবধান, কারো যেন হাত না কাটে। ভাঙা কাচ খুব ধারালো হয়।"

সবাই মাথা নেড়ে জানাল তারা সাবধান থাকবে।

রুহান তখন বেশ খানিকটা দূরে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি দেখিয়ে বলল, "সবাই চেষ্টা কর সূর্যের আলোটাকে এখানে প্রতিফলিত করতে। যখন প্রতিফলিত হবে তখন স্থিরভাবে ধরে রাখবে। ঠিক আছে।"

সবাই মাথা নাড়ল।

"চমৎকার!" রুহান সামনে থেকে সরে গেল। বলল, "শুরু কর।"

ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে করতে হবে বুঝতে একটু সময় লাগল, সবাই তাদের কাচটা ঠিক করে ধরার চেষ্টা করতে থাকে। আলোটাকে গাছের গুঁড়িতে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করতে থাকে। যখন সবাই সূর্যের আলোকে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীভূত করতে পারল তখন গাছের গুঁড়িটা থেকে প্রথমে ধোঁয়া বের হতে থাকে তারপর হঠাৎ ধক করে আগুন ধরে ওঠে। সবাই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে সাথে সাথে।

রুহান হাততালি দিয়ে বলল, "চমৎকার! এস, এবারে আরো দূরে কোথাও চেষ্টা করি।"

দেখতে দেখতে সবাই ব্যাপারটা ধরে ফেলল, কোনো একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে দিলে সবাই মিলে সেখানে আগুন ধরিয়ে দিতে পারছে। বেশ সহজেই।

রিদি প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করে নি যে এটা সম্ভব যখন দেখল সত্যি সত্যি সবাই মিলে অনেক দূরে একটা জায়গায় আগুন লাগিয়ে দিতে পারছে সে হতবাক হয়ে গেল। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এটি কেমন করে সম্ভব? কী আশ্চর্য!"

রুহান অবিশ্যি কথাবার্তায় আর সময় নষ্ট করল না। রাস্তাটার পাশে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় এই জনা ত্রিশেক ছেলেমেয়েদের সবার কাছে বড় একটা কাচের টুকরো দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। সবাই ঝোপঝাড়ের আড়ালে নিজেদের আড়াল করে রাখল, হঠাৎ করে তাকালেও যেন কাউকে দেখা না যায়।

গাড়িগুলোতে আগুন ধরানোর জন্যে সেগুলো থামানো দরকার। তাই রুহান আর রিদি মিলে পাহাড় থেকে বেশ কিছু বড় বড় পাথর গড়িয়ে রাস্তার উপর নামিয়ে নিয়ে এল। দেখে মনে হয় পাহাড়ের উপর থেকে এমনি বুঝি গড়িয়ে নেমেছে। এ জায়গায় এসে পাথরগুলো সরানোর জন্যে গাড়ি থামিয়ে সবাইকে গাড়ি থেকে নামতেই হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব রকম প্রস্তুতি নিয়েও রুহান সন্তুষ্ট হল না। রাস্তার পাশে বড় পাথরের আড়ালে অস্ত্র নিয়ে তারা নিজেরা লুকিয়ে রইল। যদি কোনোভাবে দলটাকে থামানো না যায় তখন গোলাগুলি করে থামাতে হবে! রাস্তার এক পাশে থাকল রুহান আর ক্রিটিনা, অন্য পাশে রইল রিদি। এবারে শুধু অপেক্ষা করা।

অপেক্ষা করতে করতে যখন সবাই অধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে ঠিক তখন তারা পাহাড়ি রাস্তায় গাড়িগুলোর ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল। পাহাড়ি রাস্তার ঠিক কোথায় আছে তার উপর নির্ভর করে শব্দটা হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছিল আবার হঠাৎ করে কমে আসছিল। একসময় শব্দটা একটা নিয়মিত শব্দে পরিণত হল এবং ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর দূরে গাড়িগুলোকে দেখা যেতে লাগল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেগুলো রাস্তায় পড়ে থাকা পাথরগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল।

গাড়ির দরজা খুলে খুব সাবধানে একজন অস্ত্র হাতে নেমে আসে, সে সতর্ক চোখে চারদিকে দেখে অন্যদের নামতে ইঙ্গিত করল। অস্ত্র হাতে তখন বেশ অনেকগুলো মানুষ নেমে গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সতর্কভাবে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকে। নেতাগোছের একজন বলল, "কী মনে হয়? এটা কি কোনো ট্র্যাপ?"

অন্য একজন উত্তর করল, "বুঝতে পারছি না। কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ করে রাস্তার মাঝে পাথর পড়ে আছে? আমার মনে হয় কেউ এনে রেখেছে।"

"সাবধান! দুইজনই কিন্তু খেলোয়াড়। মনে নাই এরা ক্রিভনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল!"

"সেটা অন্য ব্যাপার। এখন তার সাথে ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন ছেলেমেয়ে! আর যাই করুক এখন এরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবে না।"

নেতাগোছের মানুষটি বলল, "দেরি করে লাভ নেই। রাস্তা থেকে পাথরগুলো সরাও। অন্যেরা কভার দাও।"

হঠাৎ একজন বলল, "কী ব্যাপার এখানে এত গরম কেন?"

"হ্যাঁ! কী ব্যাপার?" মানুষগুলো অবাক হয়ে এদিক-সেদিক তাকায়। উত্তাপটুকু দেখতে দেখতে সহ্যের বাইরে চলে যায়—তখন তারা যন্ত্রণায় ছটফট করে এদিক-সেদিক ছুটতে শুরু করে।

রুহান, ক্রিটিনা আর রিদি নিঃশব্দে বসে থাকে। ছেলেমেয়েগুলো একজন একজন করে তাদের কাচ দিয়ে সূর্যের আলোর তাপ কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করেছে আর দেখতে দেখতে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তারা গাড়ির ইঞ্জিন থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখল এবং হঠাৎ করে একটা বিস্ফোরণ করে গাড়ির ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ল এবং মানুষগুলো চিৎকার করে ছুটে সরে যেতে থাকে। কীভাবে কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে কয়েকজন ইতস্তত গুলি করল কিন্তু তার কোনো প্রত্যুত্তর এল না বলে নিজেরাই আবার অস্ত্র নামিয়ে নিল।

রুহান, ক্রিটিনা আর রিদি তাদের অস্ত্র তাক করে নিঃশব্দে বসে থাকে। সবাইকে বলা আছে প্রথম গাড়িটা জ্বালিয়ে দিতে পারলে দ্বিতীয়টা এবং সেটা জ্বালাতে পারলে তার পরেরটা জ্বালিয়ে দিতে হবে। ছেলেমেয়েগুলো সত্যি সত্যি দ্বিতীয়টাতেও আগুন ধরিয়ে দিল, তখন হঠাৎ করে পিছনের দুটো গাড়ি পিছনে সরে যেতে থাকে। অন্য মানুষগুলোকে গাড়িতে তুলে নিয়ে হঠাৎ করে গাড়িগুলো যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে যেতে থাকে। পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সবাই যে যার জায়গায় লুকিয়ে রইল। গাড়িগুলোর ইঞ্জিনের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর প্রথমে রিদি এবং তার দেখাদেখি রুহান আর ক্রিটিনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে আসে। তাদের দেখাদেখি অন্যরাও তখন পাহাড় থেকে ছুটে নিচে নেমে আসতে থাকে। রাস্তার উপর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা গাড়ি দুটো ঘিরে সবাই লাফালাফি করে আনন্দে চিৎকার করতে থাকে। সাধারণ একটা কাচের টুকরো দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এভাবে গাড়িগুলো জ্বালিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে এই বিষয়টা এখনো তারা বিশ্বাস করতে পারছে না।

ঘণ্টাদুয়েক পরে যখন আবার সবাই রওনা দিয়েছে তখন কারো ভেতরেই চাপা ভয় আর আতঙ্কটুকু নেই, নিজেদের ভেতরে তখন বিচিত্র এক ধরনের আত্মবিশ্বাস। লরির ভেতরে তারা হাততালি দিয়ে গান গাইতে থাকে। দেখতে দেখতে পাহাড়ি এলাকা পার হয়ে তারা একটা উপত্যকায় নেমে আসে, সেখান থেকে একটা নদীর তীর ধরে এগোতে থাকে। রাস্তা ভালো নয়, যেতে হচ্ছে খুব ধীরে ধীরে, যখন অন্ধকার হয়ে গেল তখন তারা রাত কাটানোর জন্যে এক জায়গায় থেমে গেল। নদীর পানিতে হাতমুখ ধুয়ে তারা কিছু শুকনো খাবার খেয়ে বিশ্রাম নেয়। এজেন্ট দ্রুচান তার লরির নিচে শুয়ে শুয়ে সেটা মেরামত করতে থাকে। রাতবিরেতে কী হয় কেউ জানে না, তাই রুহান, রিদি আর ক্রিটিনা পালা করে পাহারা দেবে বলে ঠিক করল। ভোর রাতের দিকে রুহান তার পালা শেষ করে শুতে গিয়েছে, চোখে একটু ঘুম নেমে এসেছিল হঠাৎ করে ক্রিটিনা তাকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "রুহান!"

রুহান মুহূর্তে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে, "কী হয়েছে?"

"একটা গাড়ি।"

"গাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

ক্রিটিনা অন্ধকারে হাত দিয়ে দেখায়, "ঐ যে, আসছে?"

রুহান আবছা অন্ধকারে গাড়িটাকে দেখতে পেল। হেড লাইট নিভিয়ে চুপিচুপি আসছে। মুহূর্তের মধ্যে ওরা প্রস্তুত হয়ে যায়। লরিটির পাশে আড়াল নিয়ে ওরা ওদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের ট্রিগারে আঙুল দিয়ে বসে থাকে।

গাড়িটি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা লরিটির কাছাকাছি এসে থেমে গেল। দরজা খুলে জনা দশেক মানুষ নেমে আসে, আবছা অন্ধকারেও দেখা যায় মানুষগুলো সশস্ত্র। কাছাকাছি আসার পর রিদি হঠাৎ উচ্চ স্বরে বলল, "থাম।"

মানুষগুলো থেমে গেল। রুহান বলল, "তোমরা আমাদের অস্ত্রের আওতার ভেতর আছ, কোনোরকম বোকামি করতে চাইলেই কিন্তু মারা পড়বে।"

অন্ধকারে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর ভেতর থেকে একজন বলল, "ভয় নেই। আমরা তোমাদের আক্রমণ করতে আসি নি।"

"তা হলে কী জন্যে এসেছ?"

"তোমাদের দলে যোগ দিতে এসেছি।"

"আমাদের দলে যোগ দিতে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

রিদি আর রুহান প্রায় একই সাথে বিস্ময়ের এক ধরনের শব্দ করল। রুহান বলল, "তোমরা কারা?"

"আমরা দক্ষিণের গ্রুস্তনীর দলের মানুষ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

রিদি তার হাতের আলো জ্বালায়, সেই আলোতে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। মানুষগুলোর বয়স খুব বেশি নয়, দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি ছাড়া সেখানে চোখে পড়ার মতো কিছু নেই। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা বাদামি চুলের একজন বলল, "তোমরা দুজন নিশ্চয়ই রিদি আর রুহান?"

রিদি আর রুহান মাথা নাড়ল, মানুষটি বলল, "আমরা তোমাদের অনেক গল্প শুনেছি, তোমাদের দেখে খুব খুশি হলাম।"

রিদি বলল, "ঠিক কী গল্প শুনেছ জানি না! তবে আমরাও তোমাদের দেখে খুব খুশি হয়েছি।"

রুহান বলল, "এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। তোমরা এসে বস। হাতের অস্ত্রগুলো ঐ গাছের উপর হেলান দিয়ে রাখতে পার।"

বাদামি চুলের মানুষটি অস্ত্রটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, "পুরো এলাকায় তোমাদের কথা সবাই জানে। আমার কী মনে হয় জান? আরো অনেকেই এখন তোমাদের সাথে যোগ দিতে আসবে।"

রিদি আর রুহান একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। বাদামি চুলের মানুষটি বলল, "আমার মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি তোমরা শক্তিশালী একটা দল তৈরি করে ফেলতে পারবে। পার্বত্য এলাকার ওপাশে বিশাল একটা এলাকায় এখনো কেউ যায় নি। আমরা সবাই মিলে সে এলাকাটা আক্রমণ করতে পারি।"

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একজন মানুষ তার গাল ঘষতে ঘষতে বলল, "ঐ এলাকার মানুষগুলো খুব শক্ত সমর্থ। ধরে আনতে পারলে অনেক ইউনিটে বিক্রি করতে পারবে।"

রিদি আর রুহান একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, রুহান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল তাকে বাধা দিয়ে বাদামি চুলের মানুষটি বলল, "প্রথমে ভালো কিছু অস্ত্র দরকার। গ্রুজনীর অস্ত্র কিছু লুট করে আনা যায়—"

রুহান এবার হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমরা আরো কিছু বলার আগে আমাদের কথা একটু শোন।"

রুহানের গলার স্বরে কিছু একটা ছিল, মানুষটি থেমে গিয়ে থতমত খেয়ে রুহানের দিকে তাকাল। রুহান শান্ত গলায় বলল, "তোমরা খুব একটা বড় ভুল করেছ।"

"কী ভুল করেছি?"

"তোমরা যেরকম ভাবছ ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয়।"

মানুষটি অবাক হয়ে বলল, "ব্যাপারটি মোটেও কীরকম নয়?"

"আমরা একটা দল তৈরি করছি না। দল তৈরি করে আশপাশের এলাকায় ডাকাতি করতে যাচ্ছি না। মানুষ ধরে ধরে তাদের বিক্রি করতে যাচ্ছি না।"

বাদামি চুলের মানুষটি অসহিষ্ণু গলায় বলল, "তুমি কী বলছ? আমরা খুব ভালো করে জানি তুমি ত্রিশজন ছেলেমেয়েকে লুট করে নিয়ে এসেছ। এজেন্ট দ্রুচান দশ পার্সেন্ট কমিশনে তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছে—"

"না, না, না।" রুহান মাথা নাড়ল, "আমরা তাদেরকে মুক্ত করে এনেছি। মুক্ত করে তাদেরকে তাদের এলাকায় ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি।"

"এজেন্ট দ্রুচান—"

"এজেন্ট দ্রুচান আমাদের সাহায্য করছে। সে একটি ইউনিটও নিচ্ছে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদামি চুলের মানুষটি বিস্ফারিত চোখে বলল, "এজেন্ট দ্রুচান কোনো ইউনিট নিচ্ছে না?"

"না।"

"কেন?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "আমি জানি না তোমাকে এটা কেমন করে বোঝাব।"

"চেষ্টা কর!"

"আমরা মনে করি, মানুষ হয়ে মানুষকে বেচাকেনা করা যায় না। সারা পৃথিবী এখন যেরকম স্বার্থপর হয়ে গেছে, লোভী হয়ে গেছে, হিংস্র হয়ে গেছে এটা ঠিক না। আমাদের একজনের অন্যজনকে সাহায্য করতে হবে, ভালবাসতে হবে। আমাদের নিঃস্বার্থ হতে হবে। এজেন্ট দ্রুচান আমাদের কথা বিশ্বাস করে আমাদের সাহায্য করছে।"

মানুষগুলো একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, তারা এখনো রুহানের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি তোমরা আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছ না, কিন্তু আমি যেটা বলছি সেটা সত্যি। পৃথিবীটা ঠিক দিকে যাচ্ছে না, আমি আর রিদি মিলে পৃথিবীটা ঠিক করতে পারব না। কিন্তু যেটা ঠিক সেটা করার চেষ্টা করতে পারব। আমাদের কথা শুনে অন্যেরা হয়তো সেটা বিশ্বাস করবে। কোথাও কেউ হয়তো সত্যিকারভাবে চেষ্টা করবে—"

বাদামি চুলের মানুষটির মুখে বিদ্রুপের এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল। সে হেঁটে গাছে হেলান দিয়ে রাখা অস্ত্রটি তুলে নিয়ে বলল, "আমরা ভেবেছিলাম তোমরা দুঃসাহসী মানুষ। এখন দেখছি সেটা পুরোপুরি ভুল ধারণা। তোমরা ভিতু আর কাপুরুষ। শুধু যে ভিতু আর কাপুরুষ তাই নয় তোমাদের কোনো বাস্তব জ্ঞান পর্যন্ত নেই।"

রিদি ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, রুহান তাকে থামাল। বলল, "আমি দুঃখিত, তোমরা ভুল একটা ধারণা করে এত কষ্ট করে এখানে এসেছ!"

"হ্যাঁ। সেটা সত্যি, তোমাদের খুঁজে বের করে এখানে আসতে আমাদের খুব কষ্ট হয়েছে। শুধু শুধু সময় নষ্ট!"

"আমরা খুব দুঃখিত।"

মানুষগুলো কোনো কথা বলল না। রুহান বলল, "তোমরা তা হলে ফিরে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের ফেরত যাত্রা শুভ হোক।"

মানুষগুলো এবারেও কোনো কথা না বলে কঠোর মুখে তাদের গাড়িতে ফিরে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঞ্জিন গর্জন করে ওঠে এবং গাড়িটি যে দিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকে ফিরে যেতে শুরু করে।

"কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ফিরে আসবে।" গলার স্বর শুনে রুহান আর রিদি মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, এজেন্ট দ্রুচান ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে। রুহান জিজ্ঞেস করল, "কে ফিরে আসবে?"

"এই মানুষগুলো?"

"কেন?"

"তোমাদের সাথে যোগ দিতে।"

রুহান অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

এজেন্ট দ্রুচান অবাক হয়ে বলল, "আমি জানি। কেমন করে জানি সেটা জানি না। কিন্তু আমি জানি। আমিও এসেছিলাম মনে নেই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিটিনা নরম গলায় বলল, "আমি কারণটা জানি।"

"কী কারণ?"

"কারণটা খুব সহজ। মানুষ আসলে ভালো। তারা ভালো থাকতে চায়। যখন ভালো থাকার সুযোগ পায় তারা ভালো হয়ে যায়। ভালো থাকার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে।"

"কী ব্যাপার?"

"এটাকে মনে হয় বলে শান্তি। পৃথিবীর সবাই শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথচ শান্তি খুঁজে পাওয়া কী সহজ। অন্যের জন্যে কিছু একটা করাই হচ্ছে শান্তি। মানুষ কেন যে এটা বোঝে না কে জানে?"

রুহান আর রিদি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে ক্রিটিনার দিকে তাকিয়ে রইল।

গাড়িটি সত্যি সত্যি ফিরে এল ঘণ্টা দুয়েক পরে। গাড়িতে অবিশ্যি সবাই ছিল না, দশজনের ভেতর তিনজন ফিরে আসতে রাজি হয় নি, তাদের ধারণা পুরো ব্যাপারটা একটা হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা। তারা নিজের এলাকায় ফিরে গেছে। বাদামি চুলের মানুষটা সেই তিনজনের একজন।

অন্যেরা জানাল তারা হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছে যে তারা আসলে খুব অসুখী। তারা একটু সুখ চায়। সুখ আর শান্তি। ভালো হয়ে থাকার শান্তি।

১২

লরির খোলা দরজার কাছে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রুহান তার লাল পাহাড় থেকে কিনে আনা বইটি পড়ছে তখন ক্রিটিনা জিজ্ঞেস করল, "তোমার হাতে এটা কী?"

"এটার নাম বই। আগে যখন সব মানুষের কাছে ক্রিস্টাল রিডার ছিল না তখন তারা এই রকম বই পড়ত।"

"কী আশ্চর্য!" ক্রিটিনা রুহানের পাশে ঝুঁকে পড়ে বলল, "দেখি তোমার বইটি।"

ক্রিটিনা রুহানের এত কাছে ঝুঁকে এসেছে সে মেয়েটির মাথার চুলের হালকা এক ধরনের সুবাস পেল। বিবর্তনে মানুষের যে ইন্দ্রিয়গুলোর বিকাশ ঘটেছে ঘ্রাণ তার একটি নয়, যদি হত সে নিশ্চয়ই এই মেয়েটির শরীরের ঘ্রাণ তীব্রভাবে অনুভব করতে পারত।

ক্রিটিনা বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টে বলল, "কী আশ্চর্য! এখানে দেখছি নানা ধরনের চিহ্ন!"

"হ্যাঁ। এগুলোকে বলে বর্ণমালা। বর্ণমালা সাজিয়ে সবকিছু লেখা হয়।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি বর্ণমালা পড়তে পার?"

"হ্যাঁ। আমি শিখেছি।"

ক্রিটিনা অবাক হয়ে বলল, "তুমি আমাকে পড়ে শোনাও দেখি এখানে কী লেখা আছে।"

রুহান পড়ল, "মানুষের চোখ অত্যন্ত সংবেদনশীল। মাত্র সাতটি ফোটন হলেই চোখের রেটিনা সেটাকে দেখতে পায়। বিবর্তনের কারণে যদি চোখ আর মাত্র দশ গুণ বেশি সংবেদনশীল হয়ে যেত তা হলে খালি চোখেই আমরা কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া দেখতে পেতাম—"

ক্রিটিনা চোখ বড় বড় করে বলল, "বাবা গো! কী কটমটে কথা!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান হেসে বলল, "এটা মোটেও কটমটে কথা না। এটা খুব সাধারণ কথা। আসলে আমরা তো ক্রিস্টাল রিডারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাই বই থেকে পড়লে কিছু বুঝতে পারি না।"

ক্রিটিনা ভুরু কুঁচকে বলল, "এখন তো পৃথিবীতে আর ক্রিস্টাল রিডার তৈরি হয় না, তাই না?"

"না।"

"তার মানে আমাদের আবার এরকম বই পড়া শিখতে হবে?"

রুহান সোজা হয়ে বসে বলল, "হ্যাঁ। আসলে আমি ঠিক এই কথাটা সবাইকে বোঝাতে চাই কিন্তু কেউ সেটা বুঝতে চায় না। যতদিন পৃথিবীটা আবার ঠিক না হয় সবার কাছে ক্রিস্টাল রিডার না থাকে ততদিন কি ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে না? একশবার করবে!"

"এই রকম বই দিয়ে?"

"হ্যাঁ।" রুহান ক্রিটিনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি জানি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইছ না। কিন্তু বিশ্বাস কর—"

ক্রিটিনা হেসে বলল, "কে বলেছে আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি না? আমি অবশ্যই তোমার কথা বিশ্বাস করেছি।"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "না, তুমি আসলে আমার কথা বিশ্বাস কর নি। তুমি আমাকে খুশি করার জন্যে এই কথাটা বলছ।"

"ঠিক আছে।" ক্রিটিনা মুখ টিপে হাসল। হেসে বলল, "এখন তা হলে তোমাকে আরেকটা কথা বলি, এই কথাটা শুনলে তুমি বুঝবে যে আসলেই আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি।"

"কী কথা বলবে?"

"তুমি কি আমাকে পড়তে শেখাবে?"

রুহানের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "তুমি সত্যি আমার কাছে শিখতে চাও?"

"হ্যাঁ। শিখতে চাই।"

"কেন?"

ক্রিটিনা শব্দ করে হাসল। হেসে বলল, "না! তোমাকে খুশি করার জন্যে না! আমি ঠিক করেছি আমাদের গ্রামের স্কুলটা আমি আবার চালু করব। স্কুলের বাচ্চাদের আমি পড়তে শেখাব। তারা যেন কিছু একটা জানার সুযোগ পায়, শেখার সুযোগ পায়!"

"চমৎকার!" রুহান নিজের অজান্তেই ক্রিটিনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি ঠিক এরকম একটা কিছু চাচ্ছিলাম!"

ক্রিটিনা বলল, "তা হলে তুমি আমাকে কখন শেখাবে?"

"এখনই শেখাব।"

"এখন? এই লরির মধ্যে? যখন আমরা ঝাঁকুনি খেতে খেতে যাচ্ছি?'

"হ্যাঁ। ভালো কাজে দেরি করতে হয় না।"

সত্যি সত্যি রুহান ক্রিটিনাকে বর্ণমালা শেখাতে শুরু করে দিল।

দুজনে মিলে যখন বর্ণমালার মাঝামাঝি গিয়েছে তখন হঠাৎ লরিটি থেমে গেল। রুহান মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

সামনে থেকে এজেন্ট দ্রুচান বলল, "রাস্তার মাঝখানে দুইটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অনেক মানুষ অনেক অস্ত্র।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহানের পেটের মধ্যে কেমন যেন পাক খেয়ে ওঠে, চাপা গলায় বলল, "সর্বনাশ!"

তাড়াতাড়ি অস্ত্রটা নিয়ে সে লাফিয়ে নেমে আসে। এজেন্ট দ্রুচান চোখে বাইনোকুলার দিয়ে সামনের গাড়িগুলোকে দেখছে। তার মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। রুহান জানতে চাইল, "কী অবস্থা?"

"বুঝতে পারছি না।"

"সবাই কি পজিশন নিয়েছে?"

"নাহ্। হাঁটাহাঁটি করছে। দেখে মনে হয় না কোনো খারাপ উদ্দেশ্য আছে। সবাই গল্পগুজব করছে।"

"তা হলে কি আমরা যাব?"

এজেন্ট দ্রুচান বাইনোকুলার থেকে চোখ নামিয়ে বলল, "একসাথে সবার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি যাই দেখে আসি কী ব্যাপার।"

এজেন্ট দ্রুচান খুব দুশ্চিন্তিত মুখে গেল কিন্তু সে যখন ফিরে এল তখন তার মুখ ভরা হাসি। হাত নেড়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "তোমরা বিশ্বাস করবে না কী হচ্ছে?"

"কী হচ্ছে?"

"দুই গাড়ি বোঝাই লোকজন, আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।"

রুহান চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি ওদের বলেছ যে আমরা ডাকাতের দল তৈরি করছি না। লুটপাট করতে যাচ্ছি না?"

"আমার বলতে হয় নি! ওরা জানে। ওরা সেটা জেনেই এসেছে। ওরা ডাকাতের দলে যেতে চায় না।"

রিদি অবাক হয়ে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি! তোমরা বিশ্বাস করবে না কী ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র নিয়ে চলে এসেছে। যদি আমরা সত্যি সত্যি ডাকাতের দল করতাম, আমাদের সাথে কেউ পারত না!"

রুহান চোখ পাকিয়ে বলল, "এজেন্ট দ্রুচান, তোমার যতই ডাকাতের দল করার ইচ্ছে হোক না কেন আমরা কিন্তু সেটা করছি না!"

এজেন্ট দ্রুচান একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গি করে বলল, "আমি জানি রুহান! আমি সেটা খুব ভালো করে জানি।"

ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে হল কেউই বুঝতে পারল না, কিন্তু সবাই যখন ক্রিটিনাদের গ্রামে পৌঁছাল তখন তাদের সাথে আঠারটা লরি এবং প্রায় তিন শ মানুষ। বেশিরভাগ সশস্ত্র—সবাই এসেছে রুহান আর রিদির সাথে কাজ করার জন্যে। ক্রিটিনার গ্রামে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেশ রাত হয়ে গেল কিন্তু তারা দেখল গ্রামের কেউ ঘুমায় নি, সবাই গভীর আগ্রহ নিয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ক্রিটিনাকে দেখে তার মা ছুটে এল, বুকে জড়িয়ে বলল, "মা তুই ফিরে এসেছিস?"

ক্রিটিনা চোখ মুছে বলল, "হ্যাঁ মা ফিরে এসেছি।"

"আমি ভেবেছিলাম তোকে আর কোনো দিন দেখব না।"

ক্রিটিনা বলল, "আমিও তাই ভেবেছিলাম মা, কিন্তু এই যে দুইজন রুহান আর রিদি তারা সবকিছু পাল্টে দিয়েছে। তারা আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।"

ক্রিটিনার মা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "জানি। আমি সব জানি। এখন সবাই জানে। এই এলাকার সব মানুষের মুখে মুখে এখন একটা মাত্র কথা।"

"কী কথা মা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঈশ্বর দুজন দেবদূতকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, তারা এখন সারা পৃথিবীর সব মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করে দেবে।"

ক্রিটিনা খিলখিল করে হেসে বলল, "না মা, ওরা দেবদূত না। ওরা মানুষ। একটু বোকাসোকা কিন্তু একেবারে একশ ভাগ মানুষ। তারা যে কাজটা করছে সেই কাজটা দেবদূতরা পারত না, শুধু মানুষেরাই এই কাজ পারে।"

"আমাকে ঐ মানুষগুলোর কাছে নিয়ে যাবি? আমি ওদের গায়ে হাত বুলিয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করব?"

"এস মা আমার সাথে।"

ক্রিটিনা তার মাকে নিয়ে রুহান আর রিদিকে খুঁজে বের করে আবিষ্কার করল হারানো সন্তানদের মায়েরা রুহান আর রিদিকে ঘিরে রেখেছে। কেউ কেউ আকুল হয়ে কাঁদছে, কেউ কেউ তাদের হাত ধরে সেখানে চুমু খাবার চেষ্টা করছে।

রুহান কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু অনেক মানুষের ভিড়ে সে কিছু বলতে পারছে না। ক্রিটিনা তখন রুহান আর রিদিকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে যায়, সবাইকে ঠেলে সরিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "তোমরা সবাই সরে যাও। এই দুজন মানুষ অনেক দূর থেকে অনেক কষ্ট করে আমাদের সবাইকে উদ্ধার করে এনেছে। মানুষগুলো ক্লান্ত, তাদের একটু বিশ্রাম নিতে দাও।"

মায়েরা চিৎকার করে বলল, "আমরা আমাদের বাড়িতে তাদের জন্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের বাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা করেছি। আমরা তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাই!"

ক্রিটিনা বলল, "দুজন মানুষ ত্রিশজনের বাড়িতে যেতে পারবে না! তাদের সাথে আরো তিন শ মানুষ আছে। তাদের সবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে—তোমরা আপাতত তাদের মুক্তি দাও।"

কমবয়সী একজন মা বলল, "আমরা তাদের কোনো একটা কথা শুনতে চাই।"

ক্রিটিনা রুহানের হাত স্পর্শ করে বলল, "রুহান তুমি কিছু একটা বল।"

"কী বলব।"

ক্রিটিনা কাঁধ বাঁকিয়ে বলল, "আমি জানি না। যা ইচ্ছে হয় বল!"

রুহান একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে গলা উঁচু করে বলল, "আপনাদের কাছে আপনাদের সন্তানদের ফিরিয়ে আনতে পেরে আমাদের খুব ভালো লাগছে।"

অনেক মানুষের ভিড়, সবার কথাবার্তায় জায়গাটা সরগরম হয়ে ছিল, রুহান কথা বলতে শুরু করতেই সবাই চুপ করে গেল, চারপাশে হঠাৎ করে পিনপতন নীরবতা নেমে এল। রুহান সবার দিকে একনজর তাকিয়ে বলল, "কাজটা ছিল খুব ঝুঁকিপূর্ণ। সত্যি কথা বলতে কী যখন আমরা সেটা শুরু করেছিলাম তখন ঠিক কীভাবে আমরা করব সেটা জানতাম না। তারপরেও আমরা সেটা শুরু করেছিলাম।"

রুহান একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা অসম্ভব আনন্দিত যে আমরা সেই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটা শুরু করেছিলাম। সে কারণে আজ আপনারা আপনাদের সন্তানদের ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু এই কাজটি করার কারণে আরেকটি খুব বড় কাজ হয়েছে! মানুষ আবার নূতন করে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে একজনকে শুধু অন্যায় আর অপরাধ করে বেঁচে থাকতে হবে না। মানুষ হয়ে অন্য মানুষকে ঘৃণা করে, তাদের উপর অত্যাচার করে দিন কাটাতে হবে না। মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারবে, তাদের সম্মান করতে পারবে এবং তার পরেও মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুহান এক মুহূর্তের জন্যে থামতেই সবাই এক ধরনের আনন্দধ্বনি করল। তার ঠিক কোন কথাটাতে সবাই এত আনন্দ পেয়েছে রুহান তা ধরতে পারল না। কমবয়সী একটি মা চিৎকার করে বলল, "এখন আমরা অন্যজনের মুখে কিছু শুনতে চাই!"

রিদি হাত নেড়ে বলল, "আমি গুছিয়ে কথা বলতে পারি না! রুহান যেটা বলেছে সেটাই আমার কথা।"

এবারে অনেকে চিৎকার করে বলল, "না, না, আমরা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

রিদি একটু ইতস্তত করে বলল, "রুহানের সব কথা ঠিক। তবে আমি সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই, যারা পৃথিবীটাকে একটা নরকে পরিণত করেছে তারা কিন্তু এত সহজে এটা মেনে নেবে না। তারা পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করবে, প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। আমাদের সে জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা যেটা শুরু করেছি সেটা এখনো শেষ হয় নি—সবাই মিলে সেটাকে শেষ করতে হবে!"

এবারেও অনেকেই আনন্দের একটা শব্দ করল, যদিও রিদি যে কথাগুলো বলেছে সেটা মোটেও আনন্দের কথা নয়, সেটা ছিল খুব ভয়ের কথা, খুব আশঙ্কার কথা।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পর যখন গভীর রাতে সবাই ঘুমাতে গিয়েছে তখন রিদি আর রুহান অনেকক্ষণ পর নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ পেল। রিদি চোখ মটকে বলল, "কেমন বুঝতে পারছ রুহান!"

রুহান জিজ্ঞেস করল, "তুমি কীসের কথা বলছ?"

"সব মিলিয়েই বলছি। তুমি যখন লাল পাহাড়ের বাজারে ক্রিটিনা আর অন্য ছেলেমেয়েদের বাঁচানোর জন্যে তোমাদের অস্ত্রটা বের করেছিলে তখন কি তুমি কল্পনা করেছিলে এরকম একটা কিছু ঘটবে?"

"না। ভাবি নি।"

"তুমি কী ভেবেছিলে?"

রুহান বলল, "আমি কিছুই ভাবি নি। মানুষ হয়ে মানুষকে বেচাকেনা করা যায় না, যেভাবেই হোক সেটা থামাতে হবে, এটা ছাড়া আর কিছুই ভাবি নি।"

"এখন তুমি বুঝতে পারছ কী ঘটছে?"

"কী ঘটছে?"

এখন আমাদের সাথে প্রায় তিন শ সশস্ত্র মানুষ। তারা যে শুধু সশস্ত্র তাই না, আমার ধারণা তাদের সবাই বেশ ভালো সৈনিক। আমি নিশ্চিত, যতই দিন যাবে এরকম মানুষের সংখ্যা আরো বাড়বে। দেখতে দেখতে আমাদের সাথে হাজার হাজার মানুষ চলে আসবে। আমরা তখন বিশাল একটা শক্তি হয়ে যাব। বুঝতে পারছ?"

রুহান বলল, "হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।"

রিদি একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "না, তুমি বুঝতে পার নি।"

"আমি কী বুঝতে পারি নি!"

"আমরা যেটা অনুমান করছি সেটা কি ক্রিভন অনুমান করছে না?"

রুহান মাথা নেড়ে বলল, "মনে হয় করছে।"

"তা হলে?"

"তুমি বলছ, ক্রিভন সেটা কোনো দিনই করতে দেবে না?"

রিদি মাথা নাড়ল, "আমার তাই ধারণা। আমরা এখন পর্যন্ত যেসব কাজ করেছি তার প্রত্যেকটা ক্রিভনের মান-সম্মান, ব্যবসা, বাণিজ্য, ক্ষমতার রাজত্ব সবকিছুর উপর একটা করে বিশাল আঘাত। ক্রিভনের এখন তার লোকজনের সামনে মুখ দেখানোর কোনো উপায় নেই। ক্রিভনকে যেভাবে হোক তার সম্মানকে উদ্ধার করতে হবে। সেটা কীভাবে করা সম্ভব, বল দেখি?"

রুহান কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

রিদি বলল, "বল।"

রুহান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের দুইজনকে ধরে নিয়ে।"

"হ্যাঁ। শুধু ধরে নিয়ে নয়, দুইজনকে খুব কঠিন একটা শাস্তি দিয়ে—এমন কঠিন একটা শাস্তি যে পৃথিবীর যে কোনো মানুষ যখন সেটা শুনবে তখন আতঙ্কে শিউরে উঠবে।" রিদি এক মুহূর্ত থেমে বলল, "সেটা কী হতে পারে তুমি জান?"

রুহান কিছুক্ষণ পর বলল, "জানি।"

"সেটা কী?"

"আমি সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই না।"

"ঠিক আছে। আমিও চাই না। শুধু আমি নিশ্চিত করতে চাই যে তুমিও বর্তমান পরিস্থিতিটা ঠিকভাবে বুঝতে পারছ।"

"আমি বুঝতে পারছি রিদি। জেনে হোক না জেনে হোক আমরা অসম্ভব বিপদের একটা কাজে হাত দিয়েছি। অনেকটা সিংহের লেজ ধরে ফেলার মতো, এখন সেটা ধরে রাখতেই হবে, ছেড়ে দিলে সিংহটা আমাদের খেয়ে ফেলবে।"

রিদি শব্দ করে হেসে বলল, "মাঝে মাঝে তুমি খুব বিচিত্র কথা বল রুহান। খুব বিচিত্র এবং মজার। যাই হোক, চল শুয়ে পড়া যাক।"

"তুমি যাও, আমার একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"সেটাও খুব বিচিত্র, তুমি জানতে চেয়ো না।"

রিদি বলল, "সেই কাজটা কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না?"

"না।"

"আমি জানি, আমাদের খুব বিপদের ঝুঁকি আছে কিন্তু সেটা আজ রাতেই ঘটে যাবে বলে আমি মনে করি না। আমাদের এখানে এখন তিন শ সশস্ত্র মানুষ, তারা ছোট গ্রামটার চারপাশে পালা করে পাহারা দিচ্ছে। নাইট গগলস চোখে দিয়ে লোকজন দেখছে, গোপনে কেউ আক্রমণ করতে পারবে না।"

"সেটা নিয়েই ভাবছি রিদি। মনে হচ্ছে সেটাই দুশ্চিন্তার কথা।"

রিদি শক্ত বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে বলল, "যেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কথা তুমি সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কর না। কিন্তু যেটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে তুমি চুল পাকিয়ে ফেল। আমার ধারণা তোমার এখন সময় হয়েছে—" কথাটা শেষ করার আগেই রিদি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

রুহান শুতে গেল একটু পরেই। শোবার আগে সে কয়েকটা কাঠি পুড়িয়ে কয়লা তৈরি করে সেই কয়লা দিয়ে দেয়ালে একটা নির্দেশ লিখে গেল। ছোট একটা নির্দেশ, এটা লিখতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়, কিন্তু রুহান তার জীবনে বর্ণমালা ব্যবহার করে কিছু লেখে

নি তাই তার বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল! রুহান খুব ভালো করে জানে বর্ণমালা ব্যবহার করে এই লেখা খুব বেশি মানুষ পড়তে পারবে না, তবুও তার মনে হল এটা লিখে রাখা দরকার। খুব দরকার।

সে যে কত ক্লান্ত হয়েছিল সেটা সে নিজেই জানত না। রিদির মতোই বিছানায় শোয়া মাত্রই রুহান গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

গভীর রাতে রিদি আর রুহান তাদের দরজার শব্দ শুনে চমকে জেগে ওঠে। ভয় পাওয়া গলায় রুহান জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"আমি গার্ড।"

"কী হয়েছে গার্ড?"

"একটা মেয়ে তোমাদের সাথে দেখা করতে এসেছে।"

"মেয়ে?" রিদি আর রুহান অবাক হয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাল। এত রাতে কোন মেয়ে তার সাথে দেখা করতে আসবে?"

দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে একটা মেয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকল। একটা চাদর দিয়ে তার পুরো শরীর ঢাকা, শীতে একটু একটু কাঁপছে। মেয়েটি অপ্রকৃতিস্থের মতো তাদের দুজনের দিকে তাকায়। বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলে যন্ত্রের মতো বলতে থাকে, "রিদি? রুহান? রিদি? রুহান? রিদি? রুহান?"

রুহান নিঃশ্বাস বন্ধ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। এই মেয়েটিকে সে চেনে। একজন সক্রেটিস। মেয়েটির নাম ক্রানা। এই মেয়েটির মাথায় ইলেকট্রড দিয়ে যখন সিস্টেম লোড করা হয়েছিল তখন সেখানে সে হাজির ছিল। রুহান মেয়েটিকে চিনতে পেরেছে কিন্তু মেয়েটি তাকে চিনতে পারে নি। চেনার কথা নয়—এরা সক্রেটিস, মাথায় স্টিমুলেশন দেবার আগে এরা কাউকে চেনে না।

রুহান তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটার হাতের দিকে তাকাল, একটা লাল লিভার শক্ত করে ধরে রেখেছে। লিভারটা সে চেনে, বিস্ফোরককে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যে এই ধরনের লিভার ব্যবহার করা হয়।

ক্রানা একবার রিদি আর একবার রুহানের দিকে তাকিয়ে অনেকটা আপনমনে জিজ্ঞেস করে, "রিদি? রুহান? রিদি?"

রুহান বলল, "হ্যাঁ। আমরা রিদি আর রুহান।"

ক্রানা নামের মেয়েটা কিছুক্ষণ তাদের মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে খুব ধীরে ধীরে শরীরের উপর থেকে চাদরটা সরাল, তারপর বলল, "ক্রিভন আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে। ক্রিভন? তোমরা চেন ক্রিভনকে?"

রুহান আর রিদি বিস্ফারিত চোখে ক্রানার শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার শরীরে বড় বড় দুটি টিউব বাঁধা। টিউবগুলো দুজনেই চেনে। এগুলো হাইব্রিড বিস্ফোরক। দুটো প্রয়োজন নেই একটা টিউব বিস্ফোরিত হলেই এই পুরো গ্রাম ভস্মীভূত হয়ে যাবে, কিন্তু ক্রিভন দুটি হাইব্রিড বিস্ফোরক বেঁধে দিয়েছে কারণ গ্রামটাকে ভস্মীভূত করা তার উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য ভয় দেখানো।

ক্রানা ডান হাতে শক্ত করে লিভারটা চেপে ধরে রেখে বিড়বিড় করে বলল, "ক্রিভন খুব মজার মানুষ। এক কথা অনেকবার বলে। অনেকবার। অনেকবার। আমাকে বলেছে রিদি আর রুহানকে খুঁজে বের করে নিয়ে যেতে। অনেকবার বলেছে। আর কী বলেছে জান?

বলেছে রিদি আর রুহান যদি একটা কথা উচ্চারণ করে তা হলে এই লিভারটা ছেড়ে দিতে! আশ্চর্য একটা কথা!"

রুহানের মনে হল তার মেরুদণ্ড দিয়ে ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে যেতে শুরু করেছে। মনে হল সে বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। ক্রানা এদিক-সেদিক তাকিয়ে আবার আপনমনে বলে, "রিদি রুহান তোমরা কি কথা বলবে? একটা কথা। মাত্র একটা কথা! তা হলে আমি লিভারটা ছেড়ে দিতাম—দেখতাম কী হয়! কী হবে বলে তোমার মনে হয়? তোমরা কি জান? রিদি? রুহান? তোমরা জান? জান কী হয়?

ক্রানার সামনে দাঁড়িয়ে রিদি আর রুহান কুলকুল করে ঘামতে থাকে। হেরে গেছে! তারা জানে তারা হেরে গেছে। ক্রিভনের মতো একজন অসুস্থ মানুষ কী সহজে তাদের হারিয়ে দিল!

১৩

উঁচু জায়গাটা থেকে ক্রিটিনাদের গ্রামটা স্পষ্ট দেখা যায়। দিনের বেলা হলে আরো স্পষ্ট দেখা যেত। এখন রাত, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, চাঁদের আলোতে সবকিছুই একটু অন্যরকম দেখায়। আবছা এবং রহস্যময়। গ্রামে ছোট ছোট বাসা, বাসার সামনে একটু খোলা জায়গা, খোলা জায়গা ঘিরে গাছগাছালি বাগান। এখন অনেক রাত বলে বাসাগুলো অন্ধকার থাকার কথা কিন্তু অনেক বাসাতেই আলো জ্বলছে। রিদি, রুহান আর প্রায় তিন শ সশস্ত্র মানুষকে আশ্রয় দেবার জন্যে গ্রামের মানুষেরা কাজকর্ম করছিল। রিদি রুহানকে ধরে নিয়ে আসার পর এখন গ্রামের মানুষদের ভেতর ভয়, আশঙ্কা আর উত্তেজনা। এই জায়গাটা থেকে সেই উত্তেজনাটুকু দেখা যায়। মানুষজন ভীতবিহ্বল হয়ে ছোটাছুটি করছে। কাছে থাকলে হয়তো তাদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দও শোনা যেত।

রিদি আর রুহানকে দুটি ধাতব চেয়ারে বেঁধে বসানো হয়েছে, তৃতীয় চেয়ারটিতে বসেছে ক্রানা। ক্রানাকে বেঁধে না রাখলেও হত কিন্তু তবু তাকে চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে যেন হঠাৎ করে উঠে না পড়ে। সে বিড়বিড় করে একটানা নিজের সাথে কথা বলে যাচ্ছে। হঠাৎ করে শুনলে মনে হয় অর্থহীন কিন্তু মন দিয়ে শুনলে একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে যা ঘটছে তার পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ক্রানার ভেতরে একটা বিস্ময়, কী ঘটছে কেন ঘটছে সেটা নিয়ে তার ভেতরে অসহায় এক ধরনের প্রশ্ন।

ক্রিভনের জন্যেও একটা চেয়ার রাখা হয়েছে। তার চেয়ারটি নরম এবং আরামদায়ক। চেয়ারটিতে সে বসে নি, সেখানে তার একটা পা তুলে সে ক্রিটিনাদের গ্রামের দিকে তাকিয়ে আছে। জোছনার আলোতে গ্রামটিকে মনে হচ্ছে রহস্যময় এবং অলৌকিক। ক্রিভন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "রিদি এবং রুহান, তোমরা দুজন মানুষ আমার অনেক ক্ষতি করেছ। শুধু আমার না, আরো অনেকের।"

রিদি কিংবা রুহান কেউ কোনো কথা বলল না। ক্রিভন বলল, "তোমরা কেন এসব করছ আমি জানি না। আমি চিন্তা করে তার কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছি, সেটা কী জান? সেটা হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা। চরম নির্বুদ্ধিতা। এই পৃথিবীটা নির্বোধ মানুষের জন্যে না—এই পৃথিবীটা হচ্ছে বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে। তোমাদের এই পৃথিবীতে থাকার কোনো অধিকার নেই।"

ক্রিভন চেয়ার থেকে পা নামিয়ে দুই পা হেঁটে সামনে গিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু নির্বুদ্ধিতা হোক আর যাই হোক, তোমরা আমার অনেক বড় ক্ষতি করেছ। সেই ক্ষতিটা আমাকে পুষিয়ে নিতে হবে। যেভাবে হোক। সেটা করার জন্যে আমাকে কী করতে হবে জান? প্রথমে সবার কাছে প্রমাণ করতে হবে যে যারা তোমাদের সাথে থাকে তারা হচ্ছে নির্বোধ! তারা এত নির্বোধ যে তারা পোকামাকড়ের মতো মারা পড়ে। ঘটনাটা ঘটানোর জন্যে আমি নিজে এই গণ্ডগ্রামে চলে এসেছি। এখানে বসে থেকে সামনের যে গ্রামটা আছে সেটাকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেব। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই গ্রামে একটা মানুষ দূরে থাকুক একটা টিকটিকিও বেঁচে থাকবে না! কী আনন্দ, তাই না?"

ক্রিভন কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ গ্রামটার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর মাথা ঘুরিয়ে রিদি আর রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু শুধু গ্রামবাসীদের পোকামাকড় ব্যাক্টেরিয়া ভাইরাসের মতো মারলে তো হবে না তোমাদের দুইজনকেও একটা শাস্তি দিতে হবে। সেটি হতে হবে এমন যন্ত্রণার একটি শাস্তি যেটা তোমাদের শরীরের প্রত্যেকটা কোষ, তোমাদের মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা নিউরন সেল, তার প্রত্যেকটা সিনান্স কানেকশন যেন মনে রাখে। যন্ত্রণাটা শুধু তোমাদের দিলে তো হবে না সেটা সবাইকে দেখাতেও হবে। বিশাল একটা স্টেডিয়ামের মাঝখানে তোমাদের শাস্তিটা দেব, কয়েক লাখ মানুষ স্টেডিয়ামে টিকেট কেটে সেটা দেখতে আসবে—এটা হচ্ছে আমার পরিকল্পনা। এই এলাকার পুরো মানুষ জানবে ক্রিভনের সাথে কেউ যদি লাগতে আসে তার কোনো মুক্তি নেই।" ক্রিভনের চোখ দুটি জ্বলে ওঠে, সে হিসহিস করে বলল, "দরকার হলে তাদেরে আমি নরক থেকে ধরে আনব, ধরে এনে শাস্তি দেব!"

ক্রিভন নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "তোমাদের শুধু শারীরিক যন্ত্রণার একটা শাস্তি দেব না, তোমাদের মানসিক একটা যন্ত্রণারও ব্যবস্থা করা দরকার। সে জন্যে তোমাদের এখানে এনেছি, চেয়ারে বসতে দিয়েছি, বেঁধে রেখেছি। বেঁধে না রাখলেও হত—পালিয়ে তোমরা কোথায় যাবে? কেন এত যত্ন করে তোমাদের এখানে বসিয়েছি জান? তোমরা যেন পুরো ব্যাপারটা দেখতে পার! আমরা এক্ষুনি যে হত্যাকাণ্ড শুরু করব সেটা তোমরা নিজের চোখে দেখবে! তোমাদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে এই মানুষগুলো একজন একজন করে মারা যাবে! তোমরা সেটা দেখবে। শরীরে আগুন নিয়ে ছোট ছোট শিশুরা চিৎকার করে ছোটাছুটি করবে তোমরা সেটা দেখবে! দেখে ভাববে এর জন্য আমরা দায়ী! আমাদের নির্বুদ্ধিতা দায়ী।" ক্রিভন ঘুরে তাকিয়ে বলল, "বুঝেছ?"

রিদি কিংবা রুহান কোনো কথা বলল না। তারা পুরো ব্যাপারটা ঠিক করে চিন্তাও করতে পারছিল না, মনে হচ্ছিল পুরো বিষয়টা বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন।

ক্রিভন এসে তার নরম চেয়ারটিতে বসে পিছনে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা কোনো একজন মানুষকে বলল, "স্টিমুলেশন দেবার কাজ শুরু কর।"

কয়েকজন ছোটাছুটি করে একটা ছোট যন্ত্র নিয়ে আসে। ক্রানার চেয়ারের পিছনে যন্ত্রটা রেখে তারা ক্রানাকে চেপে ধরল। ক্রানা চিৎকার করে প্রতিবাদ করে, ভয়ে আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে থাকে। তার মাঝে একজন একটা ক্যাবল টেনে এনে একটা ধাতব কানেক্টর তার মাথায় ঢুকিয়ে দেয়। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ক্রানা অচেতন হয়ে যায়। ক্রিভন সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথা নেড়ে বলল, "সক্রেটিস খুব কাজের জিনিস, তবে ব্যবহার করা এত সোজা নয়!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হয় নি তাই কেউ এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। ক্রিভন কিছুক্ষণ ক্রানার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "জ্ঞান ফিরিয়ে আন তাড়াতাড়ি, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।"

কয়েকজন ক্রানাকে ঘিরে দাঁড়ায়, তার মুখে পানির ঝাপটা দেয়, শরীরে ধাক্কা দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্রানা চোখ খুলে তাকায়। ফিসফিস করে বলল, "আমি কোথায়?"

ক্রিভন এগিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি ঠিক জায়গাতেই আছ। এখন সুস্থ বোধ করছ তো?"

ক্রানা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সত্যি কথা বলতে কী আমার কোনো বোধ নেই। আমাকে কী জন্যে ডেকেছ বল।"

একটু আগেই ক্রানা কথা বলছিল পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষের মতো, মস্তিষ্কে স্টিমুলেশন দেবার সাথে সাথে সে কথা বলছে পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষের মতো!

ক্রিভন ক্রানার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "প্রথমে তোমাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। রিদি আর রুহান নামের দুই নির্বোধকে ধরে আনার জন্যে যে পরিকল্পনাটা তুমি করে দিয়েছিলে, সেটা চমৎকারভাবে কাজ করেছে।"

"শুনে খুব সুখী হলাম।"

"বুকের মাঝে হাইব্রিড বিস্ফোরক বেঁধে কাকে পাঠিয়েছিলাম তুমি কি জান?"

"না, আমি জানি না। আমার জানার কথা নয়।"

"আমরা তোমাকে পাঠিয়েছিলাম।"

ক্রানা ফিসফিস করে বলল, "আমি বলে কেউ নেই। আমি ক্রানা নামে এই মেয়েটির মস্তিষ্কের একটা অবস্থা। আমার নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই। তোমরা ক্রানাকে পাঠিয়েছিলে, আমাকে নয়।"

"একই কথা।"

ক্রানা জোর দিয়ে বলল, "না এক কথা নয়।"

"যাই হোক আমি সেটা নিয়ে এখন তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না। আমার এখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন।"

ক্রানা বলল, "বল, আমাকে কী করতে হবে।"

"সামনের এই গ্রামটি দেখছ?"

"হ্যাঁ দেখছি।"

"আমি এই গ্রামের প্রত্যেকটা জীবিত প্রাণীকে হত্যা করতে চাই।"

ক্রানার কণ্ঠস্বর এক মুহূর্তের জন্যে থমকে যায়, এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, "কেন?"

"আমি এই গ্রামের মানুষকে একটা শাস্তি দিতে চাই। সেই শাস্তির খবরটি সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে আমার ক্ষমতাটি সম্পর্কে সবাইকে ধারণা দিতে চাই।"

ক্রানা বলল, "প্রাণী হত্যা করার জন্যে সবচেয়ে কার্যকরী বিষ নিশুনিয়া, এখান থেকে দুটি নিশুনিয়া বোমা একটা ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে গ্রামের মাঝামাঝি ছুড়ে দাও, ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে সবাই মারা যাবে। যন্ত্রণাহীন চমৎকার একটি মৃত্যু!"

"না, না, না—" ক্রিভন মাথা নেড়ে বলল, "আমি যন্ত্রণাহীন মৃত্যু চাই না। আমি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করতে চাই। যন্ত্রণার প্রত্যেকটা মুহূর্ত ভিডিওতে ধরে রাখতে চাই। সেটা প্রচার করতে চাই।"

"তা হলে তোমার জন্যে সবচেয়ে উপযোগী বোমা হবে ক্রাটুশকা বোমা। প্রতি এক বর্গকিলোমিটারের জন্যে একটা বোমাই যথেষ্ট। এই বোমা থেকে যে গ্যাস বের হয় সেটা বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে প্রত্যেকটা প্রাণীর শরীরের প্রতি সেন্টিমিটার পুড়িয়ে দেবে। দেখতে দেখতে ফোসকা পড়ে দগদগে ঘা হয়ে যাবে। চোখের কর্নিয়া পুড়ে অন্ধ হয়ে যাবে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে। নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুসে এই গ্যাস যাবার পর ফুসফুস ঝাঁজরা হয়ে যাবে, নিঃশ্বাসের সাথে সাথে ফুসফুসের টুকরোগুলো বের হয়ে আসবে। বলা যেতে পারে তিন থেকে চার ঘণ্টার ভেতরে প্রত্যেকটা প্রাণী নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যাবে। কম সময়ের ভেতরে সবাইকে হত্যা করার জন্যে এটাই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। যদি আরো বেশি সময় নিয়ে কাজটা করতে চাও—"

ক্রিভন বাধা দিয়ে বলল, "না, আমার হাতে বেশি সময় নেই। আমি সময় নিয়ে করতে পারব না।"

ক্রানা অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, "তা হলে তোমার জন্যে ক্রাটুশকা বোমাটিই ভালো। এর দুটি গ্রেড আছে তুমি দ্বিতীয় গ্রেডটি গ্রহণ কর। তোমার সংরক্ষণে সেটা আছে। এর ওজন তেইশ কেজি। এটা নিক্ষেপ করার জন্যে তোমার একটা ক্ষেপণাস্ত্র দরকার। জেনারেশন থ্রি, মাকাও মডেলটি ভালো। নিক্ষেপ করার সময় মাটির সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোণ করতে হবে।"

"চমৎকার!" ক্রিভন মাথা ঘুরিয়ে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে লক্ষ করে বলল, "তোমরা ব্যবস্থা কর।"

মানুষগুলো সাথে সাথে জেনারেশন থ্রি মাকাও মডেল আর দ্বিতীয় গ্রেডের ক্রাটুশকা বোমা আনতে চলে গেল। ক্রানা চোখের কোনা দিয়ে তাদেরকে চলে যেতে দেখল, তারপর চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে বলল, "অসম্ভব যন্ত্রণা দিয়ে কীভাবে পুরো গ্রামের সবাইকে হত্যা করতে হবে আমি সেটা বলে দিয়েছি। আমি কি এখন বিদায় নিতে পারি? তোমরা নিশ্চয়ই জান আমার মস্তিষ্ককে এখন বাড়তি ক্ষমতায় কাজ করতে হচ্ছে, সেটি কষ্ট। অনেক কষ্ট।"

AMARBOI.COM

ক্রিভন শব্দ করে হেসে বলল, "তোমাকে আমাদের অনেক ইউনিট দিয়ে কিনতে হয়েছে। সে জন্যে একটু কষ্ট তোমাকে করতেই হবে। পুরো ঘটনাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার সাহায্য দরকার। তার কারণ—"

"কী কারণ?"

"আমার পুরো সেনাবাহিনী আসছে। সবাইকে হত্যা করার পর আমার পুরো সেনাবাহিনীকে এখানে পাঠাব, অনেক অস্ত্র আছে সেগুলো উদ্ধার করতে হবে। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"রিদি আর রুহানকে ধরে আনা হয়েছে। তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার একটি ব্যাপার আছে। সেটা নিয়েও তোমার সাথে কথা বলতে হবে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি কর। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। অসম্ভব কষ্ট। আমার মস্তিষ্ককে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে একজন মানুষের মস্তিষ্ক কখনো সেভাবে ব্যবহার করা হয় না। কখনো সেভাবে ব্যবহার করার কথা না।"

ক্রিভন আবার হেসে বলল, "তোমাকে আমি অনেকগুলো ইউনিট দিয়ে কিনেছি। তুমি একটু কষ্ট সহ্য কর।"

রিদি আর রুহান নিঃশব্দে বসে আছে। কাছাকাছি কোনো একটা কনটেনার থেকে জেনারেশন থ্রি মাকাও মডেল, দ্বিতীয় গ্রেডের ক্রাটুশকা বোমা এবং আরো কিছু যন্ত্রপাতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনা হতে থাকল। মানুষজন ব্যস্ত হয়ে সেগুলো সাজিয়ে রাখতে থাকে। রিদি আর রুহান নিঃশব্দে বসে দূরে ক্রিটিনার গ্রামটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

রুহান অনেকক্ষণ থেকেই গ্রামটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সেখানে একটা কিছু ঘটার জন্যে সে অপেক্ষা করছে। ঘুমানোর আগে কয়লা দিয়ে সে তার ঘরের দেয়ালে একটা নির্দেশ লিখে রেখেছিল, ক্রিটিনা কি সেই নির্দেশটা পড়তে পেরেছিল? পড়ার পর সেটাকে কি সে গুরুত্ব দিয়েছিল?

উত্তর থেকে একটা শীতল বাতাস বয়ে আসে। রুহান নিজের ভেতরে একটা কাঁপুনি অনুভব করে এবং ঠিক তখন তার মনে হল গ্রামের ভেতর একসাথে অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠল। ভালো করে তাকালে বোঝা যায় সেগুলো মশালের আগুন। রুহান নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে আর দেখতে পায় আলোগুলো গ্রামের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। সারা গ্রামের ভেতর নূতন নূতন মশাল জ্বলে ওঠে আর সেগুলো গ্রামের একমাথা থেকে অন্য মাথায় সরে যেতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে সেগুলো সারিবদ্ধ হয়ে যায় এবং পুরো গ্রামটি জুড়ে মশালের আলো দিয়ে বিশাল একটা ক্রস আঁকা হয়ে যায়।

রুহানের সাথে সাথে অন্য সবাই গ্রামের দিকে তাকাল। ক্রিভন একটু অবাক হয়ে বলল, "কী করছে গ্রামের মানুষেরা?"

কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিল না, শুধু ক্রানা হঠাৎ করে সোজা হয়ে বসে চোখ বড় বড় করে ক্রসটির দিকে তাকিয়ে রইল। রুহান আড়চোখে তাকিয়ে দেখল হঠাৎ করে ক্রানার সারা মুখে আনন্দের একটা আভা ছড়িয়ে পড়ছে।

ক্রিভন এগিয়ে এসে বলল, "তুমি কি বলতে পারবে এটা কী?'

"হ্যাঁ।" ক্রানা মাথা নাড়ল, "বলতে পারব।"

"এটা কী?"

"এটা একটা ক্রস।"

ক্রিভন অধৈর্য হয়ে বলল, "সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন ক্রস?"

"গ্রামের মানুষ একটা তথ্য পাঠানোর চেষ্টা করছে। খুব জরুরি একটা তথ্য।"

"সেটা কী তথ্য? কাকে পাঠাচ্ছে।"

ক্রানা মাথা নেড়ে বলল, "আমি বোঝার চেষ্টা করছি। বোঝা মাত্রই তোমাকে জানাব। আমার মনে হয় কিছুক্ষণের মাঝেই এটা আমি বুঝে যাব।"

"ঠিক আছে আমরা ততক্ষণে বাকি কাজ সেরে ফেলি।" মানুষগুলো কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত করে ক্রাটুশকা বোমাটি ভেতরে প্রবেশ করায়। তারপর পিছনে সরে দাঁড়ায়। ক্রিভন জিজ্ঞেস করে, "সবাই প্রস্তুত।"

মানুষগুলো মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। প্রস্তুত।"

ক্রিভন সুইচ টেপার জন্যে একটু এগিয়ে যেতেই ক্রানা বলল, "একটু দাঁড়াও।"

"কেন?"

"তুমি কি বলেছ তোমার সেনাবাহিনী এই এলাকায় আসছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাদের কি আসতেই হবে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আগে তাদের একটা খবর পাঠাও।"

ক্রিভন বলল, "কী খবর পাঠাব?"

AMARBOI.COM

"তাদের অস্ত্রের সিকিউরিটি মডিউলে একটা সংখ্যা প্রবেশ করাতে হবে। তাতে বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতির জন্যে এলার্মটি কার্যকর হবে। তাদের নিরাপত্তার জন্যে এটা খুব জরুরি।"

ক্রিভন অবাক হয়ে বলল, "আমি কখনো শুনি নি, অস্ত্রের ভেতরে বিষাক্ত গ্যাসের এলার্ম আছে।"

ক্রানা হাসির মতো একটা শব্দ করে বলল, "তোমরা যদি সবকিছু জানতে তা হলে নিশ্চয়ই অনেক ইউনিট খরচ করে আমাকে কিনে আনতে না।"

ক্রিভন মাথা নাড়ল। "সেটা সত্যি। ঠিক আছে তুমি কোডটি বল, আমি আমার সেনাবাহিনীর কাছে কোডটা পাঠিয়ে দিই।"

ক্রানা একটা জটিল কোড উচ্চারণ করে অস্ত্রধারী একজন মানুষ ক্রিস্টাল রিডারে সেটা তুলে নিয়ে সেনাবাহিনীর কাছে পাঠানোর জন্যে চলে যায়।

ক্রিভন বলল, "আমরা আমাদের অস্ত্রেও কোডটা ঢোকাব?"

ক্রানা বলল, "ঢোকাতে পার। তোমাদেরও একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে।"

অস্ত্রের ভেতর কোডটা ঢুকিয়ে ক্রিভন আবার তার ক্ষেপণাস্ত্রের কাছে ফিরে এল, ক্ষেপণাস্ত্রের সুইচ স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে ক্রানা বলল, "দাঁড়াও।"

"কী হল।"

"বাতাসের দিক পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। বিষাক্ত গ্যাস এদিকে আসতে পারে, তোমাদের একটু নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার।"

"সেটি কীভাবে করব?"

"সবাই একটা প্রতিষেধক ক্যাপসুল তোমাদের জিভের নিচে রেখে দাও।"

"প্রতিষেধক ক্যাপসুল কোনটি?"

"তোমাদের চিকিৎসক নিশ্চয়ই জানে। তাকে জিজ্ঞেস কর।"

ক্রিভন একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "আমরা সাথে কোনো চিকিৎসক আনি নি। তুমি কি জান না?"

"জানি। অবশ্যই জানি। কিন্তু আমি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ নই। আমি যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ।" ক্রানা শান্ত গলায় বলল, "আমি চিকিৎসা সংক্রান্ত উপদেশ দিতে চাই না। কারণ তুমি আমাকে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ হিসেবে কিনে আন নি। যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কিনেছ।"

ক্রিভন অধৈর্য হয়ে হাত ছুড়ে বলল, "তুমি সময় নষ্ট কোরো না। বলে দাও কোনটি প্রতিষেধক ক্যাপসুল।"

ক্রানা প্রতিষেধক ক্যাপসুলের নামটি বলে দিতেই একজন সেগুলো আনতে ছুটে চলে গেল। ক্রানা বলল, "যতক্ষণ সেগুলো আনা না হচ্ছে তোমরা ততক্ষণ অন্য একটা কাজ করতে পার।"

"কী কাজ?"

"বাতাসের দিক পরিবর্তন করছে, আমি বুঝতে পারছি, উত্তর দিক থেকে শুষ্ক বাতাস আসছে। শুকনো বাতাসে ক্রাটুশকা অক্সিডাইজড হতে দেরি হয়।"

"তার মানে কী?"

"তার মানে ক্রাটুশকা বোমার কার্যকারিতা শতকরা ত্রিশ ভাগ পর্যন্ত কম হয়ে যেতে পারে।"

ক্রিভন একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "শেষ মুহূর্তে এটা বলছ কেন?"

ক্রানা শান্ত গলায় বলল, "আমি এটা শেষ মুহূর্তে বলছি কারণ আমি এটা শেষ মুহূর্তে জানতে পেরেছি। কিন্তু সেটি নিয়ে তোমার ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিভন, "আমি শতকরা ত্রিশ ভাগ অকার্যকর একটি বোমা কেন পাঠাব?"

ক্রানা বলল, "এগুলো রাসায়নিক বোমা। কেউ শতকরা একশ ভাগ কার্যকারিতা গ্যারান্টি দেয় না। তবে যেহেতু সমস্যাটি সহজ এর সমাধানটিও সহজ।"

"সমাধানটি কী?"

ক্রানা বলল, "যেহেতু বাতাস শুষ্ক, জলীয় বাষ্প নেই, ক্রাটুশকা বোমার উপাদানে একটু পানি দাও। এগুলো রাসায়নিক বোমা, শেষ মুহূর্তে এখানে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ দেওয়া যায়।"

ক্রিভন বলল, "তুমি সেটা আগে বলছ না কেন?"

"আমি ঠিক সময়েই বলেছি, তুমি অধৈর্য হয়ে আছ বলে তোমার কাছে মনে হচ্ছে আমি দেরি করে বলেছি। ক্রাটুশকা বোমাটি বের করে আনো, ডানদিকের স্ক্রুটা ঢিলে করে সেখানে পাঁচ শ সিসি পানি ঢেলে দাও।"

ক্রিভন অন্য কাউকে দায়িত্বটি না দিয়ে নিজেই ক্রাটুশকা শেলটি বের করে আনে। ডানদিকের স্ক্রুটা খুলে সেখানে একটু পানি ঢেলে দিয়ে আবার স্ক্রুটা লাগিয়ে দেয়। শেলটা ক্ষেপণাস্ত্রে ঢুকিয়ে ক্রানার দিকে তাকাল, "আর কিছু?"

"না।"

"আমি সুইচ টিপতে পারি?"

"প্রতিষেধক ক্যাপসুলটা আসুক।"

কাজেই ক্রিভনকে আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হল। সবাই প্রতিষেধক ক্যাপসুলটা জিভের নিচে দিয়ে ক্রিভন ক্ষেপণাস্ত্রটির কাছে এগিয়ে যায়। ডানদিকে একটা লিভারকে টেনে ধরে সে সুইচটা চেপে ধরে। সাথে সাথে ভেতরে একটা যান্ত্রিক শব্দ হয়ে এলার্ম বেজে ওঠে। ক্রিভন পিছিয়ে সরে আসে এবং হঠাৎ করে ঝাঁকুনি দিয়ে ক্ষেপণাস্ত্রটি কেঁপে ওঠে এবং একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে সাথে ক্রাটুশকার শেলটি উড়ে গেল।

AMARBOI.COM

ক্রিভনের মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। সে রিদি আর রুহানের দিকে তাকিয়ে বলল, "নির্বুদ্ধিতার পরিণাম কী হতে পারে, তুমি নিজের চোখে দেখ।"

রুহান ফিসফিস করে বলল, "পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগেও অনেকবার অনেক নৃশংসতা হয়েছে। কিন্তু কোনো নৃশংস মানুষ কখনো বেঁচে থাকে নি। তুমিও বেঁচে থাকবে না ক্রিভন।"

ক্রিভন শব্দ করে হেসে বলল, "তুমি নিজের চোখে দেখ কে বেঁচে আছে, আর কে বেঁচে নেই!"

দূর গ্রাম থেকে একটা কোলাহলের মতো শব্দ ভেসে আসে, ক্রিভন সেদিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে ক্রানাকে জিজ্ঞেস করল, "শেলটি কি ফেটেছে?"

ক্রানা মাথা নেড়ে বলল, "নিশ্চয়ই ফেটেছে।"

"বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে?"

ক্রানা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "ক্রিভন, তুমি একটু আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, আলোর মশাল দিয়ে গ্রামে একটা ক্রস তৈরি করার অর্থ কী?"

"হ্যাঁ। সেটা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?"

"পেরেছি।"

ক্রিভন ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, "সেটা কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মানুষ যখন কাউকে ভালবেসে জড়িয়ে ধরে, তখন হাত দুটো অনেক সময় একটার উপর আরেকটা চলে আসে, নিজের অজান্তে দুটি হাত দিয়ে তৈরি হয় একটা ক্রস।"

ক্রিভন বলল, "তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

"আমি বলছি, এই ক্রসের অর্থ ভালবাসা।"

"ভালবাসা?"

"হ্যাঁ, ভালবাসা।"

ক্রিভন ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "কার জন্যে ভালবাসা? কীসের ভালবাসা?"

"মানুষের জন্যে মানুষের ভালবাসা।"

"কিন্তু সেটা বলার অর্থ কী?"

"তারা আমাকে মনে করিয়ে দিল, মানুষের জন্যে থাকতে হয় ভালবাসা।"

ক্রিভন কাঠ কাঠ গলায় হেসে উঠে বলল, "এটা চমৎকার একটা রসিকতা হল, তারা বলছে ভালবাসা আর তুমি ক্রাটুশকার শেল দিয়ে সেই ভালবাসার জবাব দিলে! তোমার ভালবাসায় সবার চামড়ায় ফোসকা পড়ে দগদগে ঘা হবে, ফুসফুস টুকরো টুকরো হয়ে বের হয়ে আসবে নিঃশ্বাসের সাথে!"

ক্রানা মাথা নেড়ে বলল, "না, ক্রিভন! তুমি বুঝতে পারছ না। কেউ যখন ভালবাসার কথা বলে তখন তাকে হত্যা করা যায় না!"

ক্রিভন চমকে উঠে বলল, "তুমি কী বললে?"

"আমি বলেছি, মানুষ যখন মানুষের কাছে ভালবাসার কথা বলে তখন তাকে হত্যা করা যায় না!"

"কিন্তু কিন্তু—"

ক্রানা হেসে বলল, "মনে নেই তুমি ক্রাটুশকার শেলে স্ক্রু খুলে পানি ঢুকিয়েছ?"

"হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?"

"পুরো রাসায়নিক উপাদানগুলো তখন নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছি ক্রিভন।"

ক্রিভন চিৎকার করে বলল, "তুমি আমার সাথে মিথ্যা কথা বলতে পার না। এটা অসম্ভব। তুমি মানুষ নও তুমি মস্তিষ্কের একটা বিচ্যুতি—"

"তুমি ঠিকই বলেছ। আমার মিথ্যা বলার কথা নয়, শুধু একটি ব্যতিক্রম আছে। যদি কোথাও আমি একটি ক্রস দেখতে পাই, আমার সমস্ত যুক্তিতর্ক ওলটপালট হয়ে যায়! আমার ভেতরে ভালবাসার বান ডেকে যায়—"

"না" ক্রিভন চিৎকার করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়, অবাক হয়ে একবার ক্রানার দিকে আরেকবার রিদি আর রুহানের দিকে তাকায়। ক্রানা হাসিমুখে বলল, "তুমি ছোটাছুটি কোরো না, তোমার জিভের নিচে যে ক্যাপসুলটা দিয়েছ সেটা কোনো প্রতিষেধক নয়, সেটা ঘুমের ওষুধ! তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ ক্রিভন। শুধু তুমি নও, তোমরা সবাই।"

"না।" ক্রিভন গোঙাতে গোঙাতে বলল, "এটা হতে পারে না।"

"পারে। আমি যদি একটা মিথ্যা বলতে পারি তা হলে দশটি মিথ্যা বলতে পারি। আমি অবিশ্যি দশটি মিথ্যা বলি নি। মাত্র তিনটা মিথ্যা বলেছি! তিন নম্বর মিথ্যাটা কী জান?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিভন কোনো কথা না বলে স্থির চোখে ক্রানার দিকে তাকাল। ক্রানা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "তোমাদের অস্ত্রগুলোর ভেতরে একটা কোড ঢুকিয়েছ মনে আছে? কোডগুলো অস্ত্রটাকে অকেজো করে দেয়। তোমার পুরো সেনাবাহিনীর কারো কাছে এখন কোনো অস্ত্র নেই! একটিও নেই!"

ক্রিভন হাঁটু গেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে কোমর থেকে হঠাৎ একটা ছোট রিভলবার বের করে হিংস্র গলায় বলল, "আছে! একটা অস্ত্র এখনো আছে। এই অস্ত্রের কোনো কোড নেই। সেটা দিয়েই আমি তোমাদের শেষ করব।"

ক্রিভন অস্ত্রটা প্রথমে রুহানের দিকে তাক করল। ট্রিগার টানার সাথে সাথে প্রচণ্ড একটা শব্দে কানে তালা লেগে গেল, শেষ মুহূর্তে রিদি তারই চেয়ার নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজের শরীর দিয়ে রক্ষা করেছে রুহানকে।

রুহান বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। ক্রিভনের দেহের উপর রিদি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। জোছনার নরম আলোতে দৃশ্যটিকে মনে হচ্ছে অতিপ্রাকৃতিক। যে ক্ষীণ কালচে তরলটি গড়িয়ে আসছে, সেটি রক্তের ধারা। জোছনার আলোতে সেটিকে লাল দেখাচ্ছে না, সেটাকে দেখাচ্ছে কালো!

রুহান তবুও জানে এটা রক্ত। রিদির রক্ত।

১৪

রুহানের পাশে পাশে হাঁটছে ক্রিটিনা। নদীর তীরে একটা বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রুহান বলল, "তুমি এখন যাও।"

ক্রিটিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাকে একা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না রুহান।"

রুহান শব্দ করে হেসে বলল, "পৃথিবীটা এর মধ্যে অন্যরকম হয়ে গেছে ক্রিটিনা। মানুষের এখন অন্য মানুষকে দেখে ভয় পেতে হয় না। তারা একা বের হতে পারে, তাদের অস্ত্র নিয়ে বের হতে হয় না।"

"সব তোমার জন্যে।"

"না। আমার জন্যে নয়—আমাদের জন্যে।" রুহান গলার স্বর পাল্টে বলল, "তোমার কী মনে হয় ক্রিটিনা রিদি ভালো হয়ে উঠবে না?"

"উঠবে। একটু সময় লাগবে, কিন্তু ভালো হয়ে যাবে।"

"আর ক্রানা?"

"ক্রানা খুব হাসিখুশি আছে। একেবারে শিশুর মতন। কিহি চলে আসার পর কী খুশি হয়েছে তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি। ক্রানার মতো সবাই কিহিকে খুব ভালবাসে।" রুহান বলল, "তুমি জান কিহি আমাকে পড়তে শিখিয়েছিল।"

ক্রিটিনা বলল, "আর তুমি শিখিয়েছ আমাকে।"

"আমি যদি না শেখাতাম তা হলে কী সর্বনাশ হত চিন্তা করেছ?"

ক্রিটিনা হেসে বলল, "খুব ভালো করে শেখাও নি। দেয়ালে তোমার লেখাটা পড়তে আমার অনেকক্ষণ লেগেছিল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাতে কিছু আসে যায় না। সেটা পড়েছ, পড়ে যেটা করার কথা সেটা করেছ সেটাই বড় কথা! এখন সবাইকে পড়তে শিখিয়ে দাও, কিহি তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। ক্রিস্টাল রিডারের উপর আর ভরসা করে থাকার দরকার নেই।"

রুহান হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, "ক্রিটিনা, তুমি এখন যাও।"

ক্রিটিনা মাথা নেড়ে বলল, "তোমাকে ছাড়তে মন চাইছে না রুহান।"

রুহান ক্রিটিনার মুখের দিকে তাকাল, তার চোখের কোনায় পানি চিকচিক করছে। রুহান ক্রিটিনার মাথায় হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, "আমারও তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না ক্রিটিনা। কিন্তু আমাকে যেতে হবে—কতদিন আমার মাকে দেখি নি। আমার ছোট দুটি বোন আছে, নুবা আর ত্রিনা তাদেরকেও দেখি নি। তারা কোথায় আছে, কেমন আছে আমি জানি না—"

"তুমি তা হলে কথা দাও আবার তুমি ফিরে আসবে।"

"আমি আবার আসব ক্রিটিনা।"

"আমার কাছে আসবে?"

"তোমার কাছে আসব।"

"আমি প্রতিদিন বিকেলে এখানে এসে এই পথের দিকে তাকিয়ে থাকব।"

রুহান হেসে বলল, "পাগলী মেয়ে! প্রতিদিন কেন অপেক্ষা করবে।"

"আমি করব।" বলে ক্রিটিনা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

রুহান যখন তার বাসায় পৌঁছেছে তখন গভীর রাত। দরজায় শব্দ শুনে মা জিজ্ঞেস করলেন, "কে এসেছে?"

AMARBOI.COM

"আমি মা। আমি রুহান।"

মা দরজা খুলে অবাক হয়ে রুহানের দিকে তাকালেন। ফিসফিস করে বললেন, "তুই এসেছিস?"

"হ্যাঁ মা। আমি এসেছি।"

মা বললেন, "আয় বাবা একটু কাছে আয়।"

রুহান এগিয়ে গেল, মা দুই হাতে তাকে শক্ত করে চেপে ধরে ফিসফিস করে বললেন, "আমি সৃষ্টিকর্তার হাতে তোকে সঁপে দিয়েছিলাম। সৃষ্টিকর্তা আবার তোকে আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে।"

মা ছেড়ে দেবার পর রুহান জিজ্ঞেস করল, "নুবা ত্রিনা কেমন আছে মা?"

"ভালো আছে।"

"কোথায় তারা?"

"ঘুমাচ্ছিল। এখন নিশ্চয়ই উঠেছে।"

ঘুম ভাঙা চোখে ততক্ষণে নুবা আর ত্রিনা উঠে এসেছে। অবাক হয়ে তারা তাদের ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

রুহান হাত বাড়িয়ে বলল, "কাছে আস।"

দুজনে দ্বিধান্বিতভাবে এগিয়ে এসে তাদের ভাইকে স্পর্শ করে। নুবা ফিসফিস করে বলে, "তুমি আর চলে যাবে না তো?"

রুহান হেসে বলল, "ধুর বোকা। আমি কি চলে গিয়েছিলাম? আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।"

"তোমাকে আবার কেউ ধরে নিয়ে যাবে না তো?"

"না। নেবে না।"

ত্রিনা নুবার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "মনে নাই নুবা, সবাই বলেছে পৃথিবী আবার আগের মতো হবে। ভালো আর সুন্দর?"

"হ্যাঁ।" ত্রিনা দুই চোখ বড় বড় করে বলল, "দুইজন মানুষ এসেছে স্বর্গ থেকে, তারা সারা পৃথিবীটাকে সুন্দর করে দিচ্ছে!"

নুবা চোখ বড় বড় করে রুহানের দিকে তাকাল, "সেই মানুষ দুইজন নাকি অপূর্ব সুন্দর! তাদের চেহারা নাকি দেবদূতের মতন। তাদের হাতের অস্ত্র দিয়ে তারা চোখ বন্ধ করে পৃথিবীর সব দুষ্ট মানুষকে শেষ করে দিতে পারে।"

ত্রিনা বলল, "তাদের মাথায় অনেক বুদ্ধি। তাদের বুকে নাকি সিংহের মতো সাহস।"

নুবা বলল, "পৃথিবীর সব মানুষ নাকি তাদের ভালবাসে।"

ত্রিনা বলল, "আমরাও তাদেরকে ভালবাসি। আমি আর নুবা প্রতি রাতে তাদের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি।"

নুবা ছেলেমানুষের মতো বলল, "আর তুমি জান। সেই দুজনের একজনের নাম রুহান রুহান! ঠিক তোমার মতন। কী আশ্চর্য, তাই না?"

রুহান ছোট দুটি বোনকে কাছে টেনে এনে ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ খুব আশ্চর্য।"

মা একদৃষ্টে তার সন্তানের দিকে তাকিয়েছিলেন হঠাৎ কাঁপা গলায় বললেন, "রুহান।"

"কী মা?"

"তুই—তুই সেই রুহান। তাই না?"

রুহান এক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করল, তারপর বলল, "হ্যাঁ মা। আমি সেই রুহান রুহান।"

AMARBOI.COM

জলমানব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

কায়ীরা কোমরে হাত দিয়ে খানিকটা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভাসমান দ্বীপটির কিনারায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ মৃদু শব্দ করে ভাসমান দ্বীপের পাটাতনে আছড়ে পড়ছে, কায়ীরার দৃষ্টি এই সবকিছু ছাড়িয়ে বহু দূরে কোথাও আটকে আছে। তাকে দেখে মনে হয় না সে নির্দিষ্ট করে কিছু দেখছে—কারণ দেখার কিছু নেই, চারদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু সমুদ্রের নীল পানি, এর মাঝে কোনো ব্যতিক্রম নেই, বৈচিত্র্য নেই, তাই কাউকে নির্দিষ্ট একটা ভঙ্গিতে একদিকে তাকিয়ে দেখতে থাকলে এক ধরনের অস্বস্তি হয়।

নিহনেরও একটু অস্বস্তি হচ্ছিল, সে সমুদ্রের পানি থেকে নিজের পা দুটি ওপরে তুলে নিচু গলায় ডাকল, "কায়ীরা।"

কায়ীরা ঠিক শুনতে পেল বলে মনে হল না। নিহন তখন গলা আরেকটু উঁচিয়ে ডাকল, "কায়ীরা।"

কায়ীরা বলল, "শুনছি। বল।"

"তুমি কী দেখছ?"

কায়ীরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "জানি না।"

"তা হলে এভাবে দূরে তাকিয়ে আছ কেন?"

কায়ীরা ঘুরে নিহনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ভঙ্গি করল। কায়ীরার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, যখন তার বয়স কম ছিল তখন সে নিশ্চয়ই অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়ে ছিল। এই জীবনটিতে তার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা গিয়েছে, সেই ঝড়-ঝাপটা ভরা কঠিন একটি জীবন, দুঃখ-কষ্ট আর সমুদ্রের লোনা পানিতে তার সৌন্দর্যের কমনীয়তাটুকু চলে গিয়ে সেখানে এক ধরনের বিষাদ পাকাপাকিভাবে স্থান করে নিয়েছে। কায়ীরার মাথায় কাঁচাপাকা চুল, তার তামাটে রোদেপোড়া গায়ের রঙ এবং সুগঠিত শরীর। মাথার চুল পেছনে শক্ত করে বাঁধা, পরনে সামুদ্রিক শ্যাওলার একটা সাদামাটা পোশাক, গলায় হাঙরের দাঁত দিয়ে তৈরি একটা মালা। এই অতি সাধারণ পোশাকেও কায়ীরাকে কেমন জানি অসাধারণ দেখায়।

কায়ীরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার মনে হয় একটা টাইফুন আসছে।"

নিহন চমকে উঠে কায়ীরার দিকে তাকাল, বলল, "কী বলছ তুমি?"

কায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। এখন টাইফুনের সময়। সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বাড়ছে—এটা বছরের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সময়।"

নিহন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে একবার সমুদ্রের দিকে আরেকবার আকাশের দিকে তাকাল, তারপর শুকনো গলায় বলল, "তুমি কেমন করে বুঝতে পারলে টাইফুন আসছে? কী দেখে বুঝতে পারলে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না। বাতাসে কিছু একটা হয়, পানিতে কিছু একটা আসে। কিছু একটা পরিবর্তন হয়।"

"আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

"তুমি যখন আমার মতো বুড়ি হবে তখন তুমিও বুঝতে পারবে।"

নিহন বলল, "তুমি মোটেও বুড়ি না। তুমি, তুমি—" নিহন বাক্যটা শেষ করতে পারল না।

কায়ীরা জিজ্ঞেস করল, "আমি কী?"

"তুমি এখনো অনেক সুন্দরী।"

কায়ীরা শব্দ করে হেসে বলল, "তোমার বয়স কত হল নিহন?"

"সতের।"

"সতের? আমার ছেলেটি বেঁচে থাকলে সে এখন তোমার বয়সী হত।"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।" ভাসমান দ্বীপের সবাই জানে কায়ীরার পাঁচ বছরের দুরন্ত ছেলে আর দুঃসাহসী বাবা একটা খ্যাপা হ্যামার হেড হাঙরের আক্রমণে মারা গেছে। কেউ সেটা নিয়ে কথা বলে না। কায়ীরা হাসিমুখে বলল, "তোমার বয়স যখন সতের তখন তোমার কী করা উচিত জান?"

"কী?"

"তোমার বয়সী একটা সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বের করা। আমাদের এই দ্বীপে অনেক আছে।"

নিহন কেন জানি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল, ইতস্তত করে বলল, "আমি আসলে ঠিক এভাবে বলছিলাম না।"

"তা হলে কীভাবে বলছিলে?"

"শুধু চেহারা দিয়ে তো মানুষের সৌন্দর্য হয় না। সৌন্দর্যের জন্য আরো অনেক কিছু লাগে।"

"আর কী কী লাগে?"

"সাহস লাগে, বুদ্ধি লাগে, অভিজ্ঞতা লাগে। তা ছাড়া মানুষটাকে অনেক ভালো হতে হয়। যা যা দরকার তোমার ভেতরে তার সবকিছু আছে।"

কায়ীরা কিছু না বলে খানিকটা কৌতুকের সঙ্গে এই কমবয়সী ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল। ভাসমান দ্বীপের এই বয়সী ছেলেমেয়ে থেকে নিহন যে একটু আলাদা এটা সে আগেও লক্ষ করেছে। কায়ীরা জিজ্ঞেস করল, "আমার সবকিছু আছে? সব?"

"না, ঠিক সবকিছু নেই—"

"কী কী নেই?"

"তোমার পরিবার নেই। তুমি একা থাক—কিন্তু সেটা তো তুমি ইচ্ছে করে কর। তুমি চাইলেই তোমার একটা পরিবার থাকত। আমাদের ভাসমান দ্বীপের সব ব্যাটাছেলে তোমাকে বিয়ে করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে—"

কায়ীরা হাত নেড়ে বলল, "থাক, অনেক হয়েছে! কোন কোন ব্যাটাছেলেরা আমার পেছনে ঘুরঘুর করে সেটা তোমার মুখ থেকে শুনতে হবে না। সেটা আমিই ভালো করে জানি। এখন এই ব্যাটাছেলেদের কাজে লাগাতে পারলে হয়—"

"তুমি টাইফুনের কথা বলছ?"

"হ্যাঁ।" কায়ীরা ঘুরে তাদের ভাসমান দ্বীপটার দিকে তাকাল, এটি প্রায় পাঁচ কিলোমিটার লম্বা আর দুই কিলোমিটার চওড়া। এখানে সব মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। বড় ধরনের টাইফুন এলে সবাইকে পানির নিচে লম্বা সময়ের জন্য আশ্রয় নিতে হয়। সবকিছু নিয়ে লম্বা সময়ের জন্য পানির নিচে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়।

"কায়ীরা, তোমার কি সত্যিই মনে হচ্ছে টাইফুন আসবে? আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার—"

"আর কয়েক ঘণ্টার মাঝে এটা ঝকঝকে পরিষ্কার থাকবে না। ব্যারোমিটারের পারদ নিচে ঝাঁপ দেবে—"

নিহন মাথা নেড়ে বলল, "তুমি কেমন করে এটা আগে থেকে বুঝতে পার আমি বুঝি না!"

কায়ীরা বলল, "একসময় পৃথিবীতে হাজারো রকম যন্ত্রপাতি থাকত, মানুষ সেগুলো দেখে বলতে পারত। এখন যন্ত্রপাতি নেই, তাই আগে থেকে অনুমান করতে হয়—"

"যন্ত্রপাতি নেই সেটা তো সত্যি নয়—" নিহন ইতস্তত করে বলল, "যন্ত্রপাতি আছে। আমাদের কাছে নেই। স্থলমানবদের কাছে আছে।"

কায়ীরা ঘুরে নিহনের দিকে তাকাল, "তোমার কি ধারণা, স্থলমানবেরা কোনো দিন সেই যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এসে আমাদের বলবে, নাও এই যন্ত্রপাতিগুলো নাও?"

নিহন বলল, "না, তা আমি বলছি না।"

"এই টাইফুন আমাদের জন্য যত বড় বিপদ, তার চেয়ে অনেক বড় বিপদ এই স্থলমানবেরা। আমরা যদি কোনো দিন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই, তা হলে সেটা টাইফুনের জন্য হবে না, রোগ-শোক-মহামারীর জন্য হবে না, সেটা হবে এই স্থলমানবদের জন্য! বুঝেছ? তারা কোনো একদিন এসে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।"

নিহন একটু অস্থির হয়ে বলল, "কিন্তু কায়ীরা, আমি এই একটা জিনিস বুঝতে পারি না। আমরা যেরকম মানুষ তারাও ঠিক সেরকম মানুষ। কিন্তু তারা কেন আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইবে? একসময় তো আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম—"

"পৃথিবীটা পানির নিচে ডুবে সব হিসাব অন্য রকম হয়ে গেছে!"

নিহন মাথা ঘুরিয়ে সমুদ্রটির দিকে তাকায়, চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। একসময় পৃথিবীতে মাটি ছিল। এখন নেই। সব এই সমুদ্রের নিচে তলিয়ে গেছে। ছিটেফোঁটা যেটুকু তলিয়ে যায় নি সেখানে স্থলমানবেরা থাকে। আর তারা থাকে সমুদ্রের পানিতে। তাদের জন্য একটা নূতন নাম হয়েছে, জলমানব। পৃথিবীর মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে প্রায় দুই শ বছর আগে, জলমানব আর স্থলমানব!

কায়ীরা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যদি কখনো ঠিক করে এই পৃথিবীর ইতিহাস লেখা হয় তখন সেখানে কী লেখা হবে জান?"

"কী?"

"সেখানে লেখা হবে এই পৃথিবীর সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে আমাদের টিকে থাকা! শুকনোতে থাকা স্বার্থপর মানুষগুলো দুই শ বছর আগে যখন আমাদের পানিতে ঠেলে দিয়েছিল তখন আমাদের টিকে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু আমরা টিকে গিয়েছি।"

নিহন অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ টিকে গিয়েছি। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমাদের কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান নেই, কোনো প্রযুক্তি নেই—"

"কে বলেছে নেই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"স্থলমানবেরা কত কিছু করে। মহাকাশে রকেট পাঠায়। আকাশে ওড়ে, কত রকম আনন্দ-ফুর্তি করে! আর আমরা? শুধু কোনোভাবে বেঁচে আছি।"

কায়ীরা বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে নিহনের দিকে তাকিয়ে রইল। নিহন বলল, "কী হল, তুমি কিছু বলছ না কেন?"

"আমি ইচ্ছে করলেই বলতে পারি। কিন্তু আমি নিজে থেকে বলতে চাই না। তোমার নিজেকে সেটা বুঝতে হবে। আমরা এমনি এমনি টিকে নেই নিহন, আমরা টিকে আছি আমাদের নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য। সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানটা কী জান?"

"কী?"

"সেটা আমি তোমাকে বলব না। সেটা তোমাকে বের করতে হবে।"

নিহন মাথা চুলকে বলল, "আমাদের ইলেকট্রিক জেনারেটর? অক্সিজেন টিউব? পানির পাম্পমেশিন?"

কায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, "না। এগুলো ছোটখাটো ব্যাপার। এর চেয়ে অনেক বড় বিজ্ঞান, অনেক বড় প্রযুক্তি আমাদের আছে!"

"সেটা কী?"

কায়ীরা এক ধরনের রহস্যের ভাব করে বলল, "সেটা আমি তোমাকে বলব না! তোমার নিজেকে এটা বের করতে হবে।"

নিহন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কায়ীরা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "এখন চল, অনেক কাজ আছে। দেখি রিসি বুড়ো কী বলে!"

AMARBOI.COM

বিশাল একটা সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলসের ভেতর রিসি বুড়ো গুটিসুটি মেরে বসে ছিল। কায়ীরা আর নিহনের পায়ের শব্দ শুনে বলল, "কে?"

কায়ীরা বলল, "আমি রিসি বুড়ো। আমি আর নিহন।"

"নিহন? নিহনটা কে?"

"ক্রাচিনার বড় ছেলে।"

"ও।" রিসি বুড়ো বিড়বিড় করে বলল, "ক্রাচিনার বাপ খুব সাহসী মানুষ ছিল। স্থলমানবের সঙ্গে একবার সে একা যুদ্ধ করেছিল। একেবারে ফাটাফাটি যুদ্ধ।"

নিহন সেই গল্প অনেকবার শুনেছে। তাকেও কোনো দিন তার পূর্বপুরুষের মতো স্থলমানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে কি না কে জানে!

কায়ীরা বলল, "বাতাসটা টের পাচ্ছ রিসি বুড়ো?"

"বুড়ো হয়েছি, আগের মতো টের পাই না। তবু মনে হচ্ছে গোলমাল।"

"মনে হয় টাইফুন আসছে।"

রিসি বুড়ো মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। মনে হয় বড় একটা আসছে।"

"বছরের শুরুতেই এ রকম, পরে কী হবে?"

রিসি বুড়ো বিড়বিড় করে বলল, "সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। কোনো কিছুর আর হিসাব মেলে না!"

"আমাদের তো কাজ শুরু করে দিতে হবে।"

"হ্যাঁ, দিতে হবে।"

"সবাইকে ডাকব?"

রিসি বুড়ো নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ডাক।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাসমান দ্বীপের মানুষেরা রিসি বুড়োর কাছে হাজির হতে শুরু করে। প্রত্যেকটা পরিবার থেকে একজন আসার কথা, যারা মাছ ধরতে বা অন্য কাজে সমুদ্রে গিয়েছে শুধু তারা আসতে পারে নি। তারপরও প্রায় দুই শ পুরুষ আর মহিলা হাজির হয়েছে। যারা এসেছে তারা কেউই বসে নেই, মেয়েরা সামুদ্রিক শ্যাওলার সুতো দিয়ে কাপড় বুনছে। পুরুষেরা পাথরের টুকরোয় হাঙরের দাঁত ঘষে ধারালো করে তুলতে তুলতে নিচু গলায় কথা বলছে। তাদের অনেকেরই উদোম শরীর, শক্ত পেশিবহুল শরীর, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে আছে।

রিসি বুড়ো তার শীর্ণ হাত ওপরে তুলতেই সবাই কথা বন্ধ করে মাথা তুলে তাকাল। রিসি বুড়ো গলা উঁচিয়ে বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ আমি তোমাদের কেন ডেকেছি।"

উপস্থিত মানুষগুলোর মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে আবার থেমে গেল। রিসি বুড়ো তার নিষ্প্রভ চোখ দুটো দিয়ে সবাইকে দেখার চেষ্টা করতে করতে বলল, "কেন ডেকেছি তোমরা জান?'

কাছাকাছি বসে থাকা একটি মেয়ে তার কাপড় বোনার কাঁটা দুটো পাশে সরিয়ে রেখে বলল, "নেপচুনের দোহাই—টাইফুন আসছে বলার জন্য ডাক নি তো?"

"হ্যাঁ, টাইফুন আসছে, কিন্তু আমি সেজন্য তোমাদের ডাকি নি। আমি তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার জন্য তোমাদের ডেকেছি।"

কায়ীরা একটু অবাক হয়ে রিসি বুড়োর দিকে তাকাল। আট থেকে দশ মাত্রার টাইফুন থেকে গুরুত্বপূর্ণ কী কথা তার বলার আছে?

রিসি বুড়ো তার শীর্ণ শরীরটি সোজা করে বসার চেষ্টা করে বলল, "তোমরা সবাই জান, আমার বয়স হয়েছে। চোখ দিয়ে দেখতে গেলে কিছু দেখি না। ভালো করে শুনতেও পাই না। সহজ কথাটাও মনে থাকে না, ভুলে যাই। তোমাদের দেখলে চিনতে পারি না। এসব দেখে আমি বুঝতে পারছি আমার অতল সমুদ্রের ডাক আসছে।"

রিসি বুড়ো নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য এক মুহূর্ত থামল, সবার ভেতরে এক মুহূর্তের জন্য একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে সেটা আবার সাথে সাথে থেমে গেল। বুড়ো রিসি মাথা তুলে বলল, "প্রায় বিশ বছর আগে ক্রাতুল মারা যাওয়ার পর আমি তোমাদের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। দুঃখে-কষ্টে সুখে-দুঃখে সারাক্ষণ আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। আমি তোমাদের কথা শুনেছি, তোমরাও আমার কথা শুনেছ।

গত কিছুদিন থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম এখন আমার বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে। অন্য একজনকে এখন তোমাদের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। কাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া যায় আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম না। আমি মনে মনে সেই মানুষটিকে খুঁজছিলাম। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

রিসি বুড়ো এক মুহূর্তের জন্য থেমে তার নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকায়, তারপর গলায় একটু জোর দিয়ে বলল, "আমি অল্প কিছুক্ষণ আগে সেই মানুষটিকে খুঁজে পেয়েছি। সেই মানুষটির কাছে আমার সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এখন তোমাদের এখানে ডেকেছি।"

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকা মানুষগুলো এবারে উত্তেজনায় হট্টগোল শুরু করে দেয়। রিসি বুড়ো সবাইকে থেমে যাওয়ার জন্য সময় দেয়। হট্টগোল এবং গুঞ্জন থেমে যাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর রিসি বুড়ো আবার মুখ খুলল, বলল, "পৃথিবীর স্থলমানবেরা যখন আমাদের সমুদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল, তখন সবাই ভেবেছিল আমরা শেষ হয়ে যাব। আমরা শেষ হয়ে যাই নাই এবং এখন মনে হচ্ছে সমুদ্রের পানিতে বেঁচে থেকে আমরা একটা নূতন সভ্যতা তৈরি করতে যাচ্ছি। তার একটা কারণ, আমরা কখনো নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হই না। যে নেতৃত্ব নেওয়ার যোগ্য আমরা তার হাতে সেটা তুলে দিই। আমি আজ সেই নেতৃত্বটি তোমাদের একজনের হাতে তুলে দেব। আমাদের জলমানবের ইতিহাস আর ঐতিহ্য অনুযায়ী তোমরা সবাই তাকে অভিনন্দন জানাও।"

চকচকে উত্তেজিত চোখে অনেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল, চিৎকার করে বলল, "কে? কে? কে নূতন নেতা?"

রিসি বুড়ো ধীরে ধীরে সামুদ্রিক কচ্ছপের ফাঁকা খোলসটা থেকে বের হয়ে আসে, নিজের গলা থেকে জেড পাথরের মালাটি খুলে নিয়ে নরম গলায় ডাকল, "কায়ীরা, তুমি সবার সামনে এসে দাঁড়াও।"

উপস্থিত মানুষগুলো উত্তেজনায় চিৎকার করতে থাকে, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা কমবয়সী কয়েকটি মেয়ে কায়ীরাকে জড়িয়ে ধরে। কায়ীরা তাদের ভালবাসার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে রিসি বুড়োর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

রিসি বুড়ো সস্নেহে কায়ীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "এস কায়ীরা। তোমার দায়িত্বটুকু বুঝে নাও।"

কায়ীরা নিচু গলায় বলল, "জেড পাথরের এই মালাটা আমার গলায় পরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনটা অন্য রকম হয়ে যাবে।"

রিসি বুড়ো মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ কায়ীরা।"

"তুমি ঠিক করে পুরো ব্যাপারটা ভেবেছ? সত্যিই তুমি আমাকে দায়িত্ব দিতে চাও?"

"হ্যাঁ কায়ীরা। এই পুরো দ্বীপটিতে শুধু তুমিই এই টাইফুনের কথা বুঝতে পেরেছ। আর কেউ পারে নি।"

"নেতা হওয়ার জন্য সেটাই কি যথেষ্ট?"

"না কায়ীরা, সেটা যথেষ্ট না। আরো কী দরকার আমি সেটা জানি। আমি বিশ বছর থেকে সেটা করে আসছি।"

"তুমি নিশ্চিত, তুমি ভুল করছ না?"

"আমি নিশ্চিত কায়ীরা। তুমি জান, গত বিশ বছরে আমি একবারও ভুল সিদ্ধান্ত নিই নি।"

"বেশ।" কায়ীরা নিঃশ্বাস ফেলে রিসি বুড়োর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। রিসি বুড়ো জেড পাথরের মালাটি কায়ীরার গলায় পরিয়ে দিয়ে শীর্ণ হাতে তার মাথা স্পর্শ করে বলল, "তুমি আমাদের জন্য একটা নূতন সভ্যতার জন্ম দাও কায়ীরা।"

কায়ীরা ফিসফিস করে বলল, "যদি সেটাই আমাদের ভবিষ্যৎ হয়ে থাকে তা হলে আমি সেটাই করব, রিসি বুড়ো।"

"ধন্যবাদ কায়ীরা।" রিসি বুড়ো একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

কায়ীরা এবারে ঘুরে সবার দিকে তাকাল। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তখন হাত নাড়ছে, চিৎকার করছে। সে হাত তুলতেই সবাই চুপ করে যায়। কায়ীরা একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি কখনো ভাবি নি আমাকে এই দায়িত্ব নিতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা কমবয়সী একটা মেয়ে বলল, "তুমি খুব চমৎকারভাবে এই দায়িত্ব পালন করবে, কায়ীরা।"

মধ্যবয়সী একজন মানুষ বলল, "আমাদের সবার পক্ষ থেকে তোমাকে অভিনন্দন।"

"তোমাদের ধন্যবাদ।" কায়ীরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আমার এখন সম্ভবত তোমাদের উদ্দেশে কিছু একটা বলার কথা। আমি ঠিক জানি না, কী বলব! আজ থেকে কয়েক শ বছর আগে যখন মানুষেরা মাটির ওপরে থাকত, তখন পরিবার বলতে বোঝানো হত বাবা–মা আর তারে সন্তানেরা। সমুদ্রের পানিতে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা মানুষের জন্য পরিবার শব্দটা আরো ব্যাপক। এই ভাসমান দ্বীপের সব মানুষ মিলে আমরা একটি পরিবার। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমাদের এই পরিবারটিকে আমি বুক আগলে রক্ষা করব।"

সবাই হাত তুলে এক ধরনের আনন্দধ্বনি করল। কায়ীরা বলল, "আমি জানি না, তোমরা টের পাচ্ছ কি না, সমুদ্রের আবহাওয়া খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। একটা খুব বড় টাইফুন আসছে। আমরা কিছু বোঝার আগেই এই টাইফুন এসে আমাদের আঘাত করবে। তাই আমার মনে হয়, আমরা আমাদের কাজ শুরু করে দিই।"

সবাই মাথা নাড়ল। কায়ীরা নিহনের দিকে তাকিয়ে বলল, "নিহন, তুমি তোমাদের দশজনকে নিয়ে এই মুহূর্তে বের হয়ে যাও। যারা গভীর সমুদ্রে গেছে তাদের ফিরে আসতে বল।"

নিহন মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

কায়ীরা কমবয়সী একটা মেয়েকে বলল, "ক্রিটিনা, তুমি ন্যাদা বাচ্চাগুলো একত্র করে পানির নিচে ওদের অক্সিজেন সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থাটা নিশ্চিত কর।"

ক্রিটিনা অবাক হয়ে বলল, "ওরা আমাদের সঙ্গে থাকবে না?"

"থাকবে। কিন্তু নিজেদের অক্সিজেন সাপ্লাইসহ। আমি শিশুদের নিয়ে ঝুঁকি নেব না।" কায়ীরা ঘুরে মধ্যবয়স্ক রিতুনকে বলল, "রিতুন, তুমি তোমার ইঞ্জিনিয়ার টিম নিয়ে এখনই পাম্পগুলোর কাছে যাও। দেখ, সেগুলো কাজ করছে কি না। তেলের সাপ্লাই ঠিক কর। দরকার হলে রিজার্ভ থেকে বের কর।"

"ঠিক আছে।"

কায়ীরা আরো কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, ঘুরে নিহনের দিকে তাকাল, বলল, "নিহন, তুমি এক্ষুনি যাও দাঁড়িয়ে থেকো না। আমাদের হাতে সময় নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ।"

নিহন আকাশের দিকে তাকাল, সত্যি সত্যি সেখানে ধূসর এক ধরনের মেঘ এসে জমা হচ্ছে। কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। সে উঠে দাঁড়ায়, বলে, "কায়ীরা, আমি যাচ্ছি, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

২

কাটুস্কা একদৃষ্টে মনিটরটির দিকে তাকিয়ে ছিল। উপগ্রহ থেকে সরাসরি ছবি পাঠিয়েছে—সেই ছবিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে একটা টাইফুন তৈরি হচ্ছে। নীল সমুদ্রের ওপর সাদা মেঘের ঘূর্ণন, কী প্রচণ্ড শক্তি না জানি তার মাঝে জমা হয়ে আছে! টাইফুনটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াবে, সমুদ্রের নীল পানিকে ওলটপালট করে দিয়ে একদিক থেকে অন্যদিকে ছুটে যাবে! কাটুস্কা মনিটর থেকে চোখ ফেরাতে পারে না, মনে হয় প্রকৃতি ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফুঁসে উঠছে, এই ক্রোধের মাঝেও যে এক ধরনের সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকতে পারে সেটি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ঘরের দরজায় কে জানি টুকটুক করে শব্দ করল। কাটুস্কা মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে বলল, "কে?"

দরজাটা একটু খুলে কাটুস্কার সমবয়সী একটি মেয়ে ঘরের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে বলল, "আমি, ক্রানা।"

"ও! ক্রানা, এস, ভেতরে এস।"

"তুমি একা একা বসে কী করছ? ভিডি টিউবে ভালো কিছু দেখাচ্ছে নাকি?"

"না না, সেসব কিছু না। আমি উপগ্রহের একটা ছবি দেখছিলাম।"

ক্রানা কাটুস্কার কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল, "কিসের ছবি?"

"টাইফুনের। সমুদ্রের ওপর একটা টাইফুন তৈরি হচ্ছে। তাই দেখছি।"

"ও! তাই নাকি?" ক্রানা ব্যাপারটাতে কোনো কৌতূহল দেখাল না। হাজার হাজার মাইল দূরে সমুদ্রে টাইফুন নিয়ে এখানে কেউ মাথা ঘামায় না। সে মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখানে বসে থাকবে, নাকি বের হবে?"

কাটুস্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বুঝতে পারছি না। মনে হয় বের হব।"

ক্রানা একটু অবাক হয়ে বলল, "আচ্ছা কাটুস্কা, তোমার হয়েছেটা কী?"

কাটুস্কা জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল, "কী হবে? কিছু হয় নি।"

"তোমার বয়সী একটা মেয়ের এ রকম গম্ভীর মুখে থাকার কথা না।"

কাটুস্কা গম্ভীর মুখে বলল, "আমি মোটেও গম্ভীর মুখে থাকি না।"

কাটুস্কার কথা শুনে ক্রানা শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "ঠিক আছে, তুমি গম্ভীর মুখে থাক না! এখন চল।"

"কোথায়?"

"সাইকাডোমে এডিফাসের কনসার্ট।"

"এডিফাসটি কে?"

ক্রানা চোখ কপালে তুলে বলল, "তুমি এডিফাসের নাম শোন নি? তার গান শুনে সব ছেলেমেয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি তার নাম শোন নি?"

"খুব ভালো গান গায়?"

"তা না হলে মানুষ তার জন্য এত পাগল হবে কেন? গান থেকেও বড় ব্যাপার আছে।"

"সেটা কী?"

"পুরো সাইকাডোমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেজোনেন্স তৈরি করে। আমাদের মস্তিষ্কের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির সাথে মিলিয়ে দেয়, তখন অপূর্ব এক ধরনের অনুভূতি হয়।"

কাটুস্কা অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ, দ্রীমান বলেছে আমাকে।"

কাটুস্কা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "দ্রীমান সব সময়েই একটু বাড়িয়ে-চাড়িয়ে কথা বলে। তার সব কথা বিশ্বাস কোরো না।"

ক্রানা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি সেটা জানি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই বান্ধবী যখন সাইকাডোমে পৌঁছেছে তখন সেখানে এর মাঝেই হাজারখানেক কমবয়সী ছেলেমেয়ে উপস্থিত হয়ে গেছে। এই বয়সী ছেলেমেয়েরা নিয়ম ভাঙতে পছন্দ করে, তাই তাদের পোশাকে ছিরিছাঁদ নেই। চোখে–মুখে–চুলে নানা ধরনের রঙ। কথাবার্তা, চালচলনে এক ধরনের অস্থিরতা।

সাইকাডোমের মাঝামাঝি একটা বড় স্টেজ, সেখানে কিছু মানুষ তাদের শরীরের সঙ্গে ইলেকট্রনিক সিনথেসাইজার লাগিয়ে উৎকট ভঙ্গিতে নাচানাচি করছে, তাদের অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম এক ধরনের সঙ্গীতের সৃষ্টি হচ্ছে। কমবয়সী ছেলেমেয়েগুলোর অনেকেই তার সাথে তাল মিলিয়ে নাচার চেষ্টা করছে।

ক্রানা ও কাটুস্কার সঙ্গে তাদের ইনস্টিটিউটের আরো কিছু ছেলেমেয়ের দেখা হয়ে গেল। উত্তেজক এক ধরনের পানীয় খেতে খেতে তারা নাচানাচি করছে। দ্রীমানকে দেখে মনে হয় সে বুঝি এক পায়ে ভর দিয়ে অদৃশ্য কিছু একটা ধরার চেষ্টা করছে। ইনস্টিটিউটের সবচেয়ে সুদর্শন এবং সবচেয়ে একরোখা উদ্ধত ছেলে মাজুর সঙ্গীতের তালে তালে নাচার চেষ্টা করছিল, কাটুস্কাকে দেখে হাত তুলে ডাকল, "কাটুস্কা! এস, এক পাক নাচি।"

কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, "ইচ্ছে করছে না, মাজুর।"

মাজুর অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "সে কী! সাইকাডোমে এডিফাসের কনসার্ট শুনতে এসে তুমি নাচবে না, সেটি কি হতে পারে?"

কাটুস্কা উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন স্টেজ থেকে গমগম করে একজনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আমার প্রিয় ছেলে এবং মেয়েরা! তোমরা যার জন্য অপেক্ষা করছ, এই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের ধন এডিফাস তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে।"

তীব্র আলোর ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের তীব্র ধ্বনিতে পুরো সাইকাডোম কেঁপে কেঁপে ওঠে এবং সবাই দেখতে পায় গোল স্টেজের ঠিক মাঝখানে স্বল্পবসনা একটি নারীমূর্তি ওপর থেকে নেমে আসছে। সাইকাডোমের হাজারখানেক ছেলেমেয়ে হাত তুলে চিৎকার করতে শুরু করে। স্বল্পবসনা এডিফাস তার হাতের শক্তিশালী লেজারের আলোতে সাইকাডোমের ছাদটি আলোকিত করে চিৎকার করে বলল, "তোমরা কি তোমাদের মস্তিষ্কের ভেতর তীব্র আনন্দের অনুভূতির জন্য দিতে প্রস্তুত?"

অসংখ্য ছেলেমেয়ে চিৎকার করে বলল, "প্রস্তুত! প্রস্তুত!"

"তা হলে, চল! আমরা শুরু করি—"

উদ্দাম সঙ্গীতে পুরো সাইকাডোম প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাইকাডোমের চারপাশে সাজিয়ে রাখা এন্টেনা থেকে মস্তিষ্কের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সির কাছাকাছি তীব্র ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন আসতে শুরু করে।

কাটুস্কা অবাক হয়ে দেখল প্রথমে তার বুকের ভেতর গভীর এক ধরনের বিষণ্নতা ভর করে। সেই বিষণ্নতা কেটে হঠাৎ করে তার এক ধরনের ফুরফুরে হালকা আনন্দ হতে থাকে। হালকা আনন্দটুকু হঠাৎ তীব্র এক ধরনের উল্লাসে রূপ নেয়। তার মনে হতে থাকে, পৃথিবীর কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। মনে হতে থাকে তার জন্ম হয়েছে সৃষ্টিছাড়া উদ্দাম বন্য আনন্দে মেতে ওঠার জন্য। সে চিৎকার করে মাথা দুলিয়ে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নাচতে শুরু করে। তার মনে হতে থাকে সাইকাডোমে হাজারখানেক নেশাগ্রস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ-তরুণীর উদ্দাম নৃত্যের বাইরে আর কিছু নেই। কখনো ছিল না, কখনো থাকবে না। তার মনে হতে থাকে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হয়ে এই সাইকাডোমে উপস্থিত হয়েছে। সব আনন্দ সব উল্লাস সাইকাডোমের চার দেয়ালের মাঝে আটকা পড়েছে। তার বাইরে আর কিছু নেই।

গভীর রাতে কাটুস্কা যখন নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে আসছিল, তখন মাজুর জড়িত কণ্ঠে বলল, "কী মজা হল তাই না, কাটুস্কা!"

কাটুস্কার মাথা তখনো ঝিমঝিম করছিল, সে অন্যমনস্কের মতো বলল, "হ্যাঁ।"

মাজুর বলল, "মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা কী আনন্দের ব্যাপার। আমাদের কী সৌভাগ্য, আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম।"

কাটুস্কা হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে যায়। সত্যিই কি তা-ই? সত্যিই কি সাইকাডোমে মস্তিষ্কে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেজোনেন্স তৈরি করে উদ্দাম এক ধরনের সঙ্গীতের সঙ্গে লাফালাফি করাই জীবন?

মাজুর পা টেনে টেনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "পৃথিবীতে আনন্দের এত কিছু আছে, একটা জীবনে সব শেষ করতে পারব বলে মনে হয় না।"

কাটুস্কা তীক্ষ্ণ চোখে মাজুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী কী আনন্দের জিনিস আছে পৃথিবীতে?"

"সব কি বলে শেষ করা যাবে?"

"তবুও বল শুনি।"

"সঙ্গীত আছে, শিল্প আছে, সাহিত্য আছে। ভালো খাবার আছে, পানীয় আছে। মাদক আছে, এক শ রকম উত্তেজনা আছে। তবে—"

AMARBOI.COM

"তবে?"

"আমি শুনেছি, সবচেয়ে আনন্দের জিনিসটি হচ্ছে সমুদ্রের পানিতে শিকার করা।"

কাটুস্কা হাসার ভঙ্গি করে বলল, "নির্বোধ মাছকে শিকার করার মধ্যে আনন্দ কোথায়?"

মাজুর চোখ মটকে বলল, "মাছ শিকার করবে কে বলেছে?"

"তা হলে কী শিকার করবে?"

"মানুষ।"

কাটুস্কা অবাক হয়ে বলল, "মানুষ? কোন মানুষ?"

"জলমানব। ডলফিনের পিঠে করে তারা সমুদ্রের পানিতে ছুটে বেড়ায়। অসম্ভব হিংস্র। খুব ভালো হাতের টিপ না হলে ওদের মারা যায় না।"

"কী বলছ তুমি? জলমানব আবার কারা?"

"পৃথিবীটা যখন পানির তলায় ডুবে গিয়েছিল, তখন আমরা এই পাহাড়গুলোতে বসতি করেছি। পৃথিবীতে পাঁচ বিলিয়ন মানুষ—তারা কোথায় যাবে? তারা সমুদ্রে গিয়েছে। তারা হচ্ছে জলমানব।"

"কিন্তু তারা তো সবাই সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে।"

মাজুর মাথা নাড়ল, "সবাই মারা যায় নি। কিছু কিছু মানুষ বেঁচে গেছে।"

"কীভাবে বেঁচে গেছে? সমুদ্রে তারা কোথায় থাকে? কী করে? কী খায়?"

"জানি না। তবে তারা আছে। জংলি আর হিংস্র। পানিতে তারা হাঙরের থেকে হিংস্র। দশ হাজার ইউনিট দিলে তাদের শিকার করতে যাওয়া যায়। এর চেয়ে উত্তেজনার আর কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই পৃথিবীতে। আমি ইউনিট জমাচ্ছি, একদিন আমি যাব জলমানব শিকার করতে।" মাজুর কাটুস্কার দিকে তাকাল, বলল, "তুমি যেতে চাও?"

"দশ হাজার ইউনিট অনেক বেশি। আমার এত ইউনিট নেই। তা ছাড়া—"

মাজুর হা হা করে হাসল। বলল, "আমাদের প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধানের মেয়ে বলছে তার কাছে দশ হাজার ইউনিট নেই? এটা কি বিশ্বাস করা যায়? তোমার এক পাটি জুতো নিশ্চয়ই দশ হাজার ইউনিট থেকে বেশি হবে!"

কাটুস্কা মাথা নেড়ে বলল, "প্রশ্নটা আসলে দশ হাজার ইউনিটের না।"

'তা হলে প্রশ্নটা কিসের?"

"প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা মানুষ হয়ে অন্য মানুষকে শিকার করতে পারি কি না।"

মাজুর অবাক হয়ে বলল, "পারব না কেন? যুদ্ধে কি এক মানুষ অন্য মানুষকে হত্যা করে না?"

"এখন কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না।"

"সব সময়েই যুদ্ধ হচ্ছে। একদলকে টিকে থাকার জন্য অন্য দলের সাথে যুদ্ধ করতে হয়।"

"কিন্তু জলমানবদের সাথে আমাদের যুদ্ধ নেই। তারা এত দূরে সমুদ্রের মাঝে ভেসে থাকে যে আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগই নেই।"

মাজুর হা হা করে হেসে বলল, "মাঝে মাঝে যোগাযোগ হয়। আমরা যখন তাদের শিকার করতে যাই তখন যোগাযোগ হয়।"

কাটুস্কা কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে মাজুর দিকে তাকিয়ে রইল।

ইনস্টিটিউটের ছোট ক্লাসঘরটিতে বসে কাটুস্কা সোনালি চুলের মধ্যবয়স্কা মহিলাটির কথা মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। মানবসভ্যতা নিয়ে গুরুগম্ভীর কিছু একটা বলছে, কাটুস্কা মন দিয়ে শুনেও সেটা ভালো করে বুঝতে পারে না।

"সভ্যতা একদিনে হয় নি।" মহিলাটি প্রায় যান্ত্রিক গলায় বলছে, "লক্ষ বছরে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই পৃথিবীতে মানুষ প্রজাতির সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তার সভ্যতা। এই সভ্যতাকে ধরে রাখার এবং বিকশিত করে রাখার দায়িত্ব আমাদের—"

কাটুস্কা হঠাৎ মহিলার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, "আমাদের বলতে তুমি কাদের বোঝাচ্ছ? আমরা যারা এখানে আছি তারা, নাকি সমগ্র মানবজাতি?"

"অবশ্যই সমগ্র মানবজাতি।"

"তার মধ্যে কি জলমানবেরা আছে?"

সোনালি চুলের মহিলাটি থতমত খেয়ে বলল, "তুমি একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন তুলেছ, কাটুস্কা। আমরা নিশ্চয়ই একদিন সেটা নিয়ে আলোচনা করব।"

কাটুস্কা একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "এখন করতে দোষ কী? আমি শুধু জানতে চাইছি জলমানবেরা কি মানবজাতির অংশ?"

সোনালি চুলের মহিলাটির মুখ একটু কঠিন হয়ে যায়, বলে, "না, তারা মানবজাতির অংশ নয়।"

"কেন নয়?"

"মানুষ বলতে কী বোঝায় তার একটি আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা আছে। ক্রোমোজমে জিনসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্দিষ্ট কোডিং দিয়ে সেটি করা আছে। সেই সংজ্ঞায় জলমানবেরা মানুষ নয়, 'তারা মানব সম্প্রদায়ের একটা অপভ্রংশ।"

"কিন্তু সেটা কি একটা কৃত্রিম বিভাজন নয়?"

"না, কৃত্রিম বিভাজন নয়। আমরা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, জলমানবেরা নিচ্ছে না।"

কাটুস্কা কী বলবে বুঝতে পারল না, ইতস্তত করে বলল, "হয়তো তারা সুযোগ পাচ্ছে না সেজন্য পারছে না।"

সোনালি চুলের মহিলাটি হেসে বলল, "সেটা কি ভালো যুক্তি হল? আমরা তো তা হলে এভাবেও বলতে পারি, চিড়িয়াখানার একটা শিম্পাঞ্জিকে সুযোগ দেওয়া হলে তারাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাজ করত! আমরা যদি তাদের জিনেটিক কোডিংয়ের উন্নতি করার চেষ্টা করতাম—"

ক্লাসের অনেকে শব্দ করে হেসে উঠল। কাটুস্কা কেন জানি রেগে ওঠে—সে মুখ শক্ত করে বলল, "মানুষ আর শিম্পাঞ্জির মধ্যে পার্থক্য আছে।"

এক কোনায় বসে থাকা মাজুর গলা উঁচিয়ে বলল, "সারা পৃথিবীতে আর কয়টাই বা জলমানব আছে যে তাদের নিয়ে আমাদের চিন্তাভাবনা করতে হবে? একটা করে টাইফুন আসে আর তারা ব্যাক্টেরিয়ার মতো মারা যায়। আমার মনে হয় কয়দিন পরে শিকার করার জন্যও জলমানব থাকবে না!"

কথাটা অনেকের কাছে কৌতুকের মতো মনে হল—তারা সবাই শব্দ করে হেসে উঠল।

কাটুস্কা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে সোনালি চুলের মহিলাটি বলল, "যে যা-ই বলুক, মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে হলে তাকে একটা স্তরে পৌঁছাতে হয়। তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে হয়, সভ্যতার বিকাশে অংশ নিতে হয়। যদি সেটা না করে তাদের মানুষ বলা যায় না—"

কাটুস্কা দুর্বল গলায় বলল, "হয়তো তারা করছে। তাদের মতো করে করছে!"

মাজুর শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "কেমন করে করবে? তাদের কি আমাদের মতো একটা কোয়াকম্প আছে? কোয়াকম্প হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার—কোয়ান্টাম কম্পিউটার ছাড়া কি এই যুগে বেঁচে থাকা যায়? তারা তথ্য রাখবে কোথায়? বিশ্লেষণ করবে কী দিয়ে? সিমুলেশন করবে কী দিয়ে? সিনথেসাইজ করবে কী দিয়ে?"

সোনালি চুলের মহিলা মাথা নেড়ে বলল, "মাজুর ঠিকই বলেছে। এক হাজার বছর আগের জ্ঞান সাধনা আর এখনকার জ্ঞান সাধনার মধ্যে অনেক পার্থক্য! তখন সবকিছু করতে হত মস্তিষ্ক দিয়ে। এখন কোয়ান্টাম কম্পিউটার মানুষের মস্তিষ্ক থেকে অনেক শক্তিশালী, এখন আমরা জ্ঞান সাধনা করি এই কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে। সর্বশেষ কোয়ান্টাম কম্পিউটারটা হচ্ছে কোয়াকম্প। আমাদের মস্তিষ্ক শুধু কোয়াকম্প ব্যবহার করতে শেখে। মস্তিষ্কের মূল কাজ এখন উপভোগ। বিনোদন। সভ্যতার একটা বিশেষ পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি। মানুষ কখনো ভাবে নি আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছাতে পারব..."

কাটুস্কা আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সোনালি চুলের মহিলাটি কী বলছে সে ভালো করে শুনতেও পায় না। সভ্যতা, জ্ঞান সাধনা, শিল্প-সাহিত্য—এই কথাগুলো মাঝে মধ্যে কানে ভেসে আসে কিন্তু সেই কথাগুলোর কোনো অর্থ আছে কি নেই, কাটুস্কা সেটাও যেন বুঝতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওন মনিটার একটা ত্রিমাত্রিক নকশার দিকে তাকিয়েছিল, তখন খুট করে দরজা খুলে তার একমাত্র মেয়ে কাটুস্কা ঘরের ভেতরে উঁকি দিল। রিওন হাসিমুখে বলল, "কী ব্যাপার, কাটুস্কা?"

"বাবা, তুমি কি খুব ব্যস্ত?"

"হ্যাঁ মা, আমি খুব ব্যস্ত। কিন্তু আমি যত ব্যস্তই থাকি না কেন তোমার জন্য আমার সময় আছে। এস।"

"আমি একেবারেই বেশি সময় নেব না—"

"তুমি যত খুশি সময় নিতে পার। বল, কী ব্যাপার।"

কাটুস্কা ইতস্তত করে বলল, "আসলে আমি তোমাকে বিরক্ত করতে চাইছিলাম না, কিন্তু কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারছে না। যাকেই জিজ্ঞেস করি সেই প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। প্রশ্নটা জলমানবদের নিয়ে—"

রিওনের মুখ হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে যায়। সে চেয়ারটা ঘুরিয়ে সোজাসুজি তার মেয়ের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "কী প্রশ্ন?"

"জলমানবেরা কি আমাদের মতো মানুষ?"

রিওন সরু চোখে তার মেয়ের দিকে তাকাল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আজ থেকে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন বছর আগে একটা উল্কাপাতে পৃথিবীর সব ডাইনোসর মরে গিয়েছিল, তুমি জান?"

"জানি।"

"ডাইনোসরদের জন্য তোমার কি দুঃখ হয়? তোমার কি মনে হয় পুরো পৃথিবীর তারা সবচেয়ে সফল প্রাণী, অথচ তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এটা ভুল?"

"সেটা তো একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল।"

"দুই শ বছর আগে যখন সারা পৃথিবী পানিতে ডুবে গিয়েছিল, সেটাও একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছিল। আমরা অল্প কিছু মানুষ উঁচু জায়গায় থাকি বলে বেঁচে গিয়েছি। যারা নিচু জায়গায় থাকে তারা সব পানিতে ডুবে গিয়েছিল। অল্প কিছু মানুষ নৌকায়, জাহাজে এটা-সেটা করে ভেসে ভেসে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিল। আমরা সবাই জানতাম, কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছরে তারা শেষ হয়ে যাবে।"

রিওন কথা বন্ধ করে আঙুল দিয়ে টেবিল ঠোকা দিতে দিতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কাটুস্কা বলল, "কিন্তু তারা কয়েক মাস এবং কয়েক বছরে শেষ হয়ে গেল না।"

রিওন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, তারা সবাই শেষ হয়ে গেল না। কেউ কেউ দুই শ বছর পরও বেঁচে আছে। তাদের বেঁচে থাকাটা পৃথিবীর জন্য একটা সমস্যা—"

কাটুস্কা বলল, "বাবা, তুমি কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি। জলমানবেরা কি মানুষ?"

রিওন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পৃথিবীটা পানিতে ডুবে যাওয়ার পর পৃথিবীর সম্পদ বলতে গেলে কিছু নেই। যেটুকু আছে সেটার ওপর আমরা নির্ভর করে আছি। জলমানবদের সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি করলে কারো কিছু থাকবে না। তাই—"

"তাই কী বাবা?"

"তাই আমরা একদিন ঘোষণা দিলাম জলমানবেরা মানুষ নয়। কারণ হিসেবে ক্রোমোজমের কিছু জিনের উনিশ-বিশ দেখানো হল—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটুস্কা বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "তার মানে আসলে জলমানবেরাও মানুষ। আমরা ইচ্ছে করে তাদের মানুষ বলি না।"

"তুমি ইচ্ছে করলে সেভাবে বলতে পার, কিন্তু তোমার যেন সেটা নিয়ে কোনো অপরাধবোধ না থাকে। পৃথিবীর প্রাণী টিকে আছে বিবর্তন দিয়ে। যারা শক্তিশালী, যারা বুদ্ধিমান, যারা দক্ষ তারাই টিকে থাকবে। সেটাই নিয়ম। আমরা শক্তিশালী, আমরা বুদ্ধিমান, আমরা দক্ষ তাই আমরা টিকে আছি।"

"তারাও টিকে আছে—"

"এই টিকে থাকার কোনো অর্থ নেই, কাটুস্কা। এটা মানুষের সম্মান নিয়ে টিকে থাকা নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কিছু নেই, শুধু পশুদের মতো সহজাত একটা প্রবৃত্তি নিয়ে টিকে থাকা। তার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই, কোনো তৃপ্তি নেই, কোনো স্বপ্ন নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই। জলমানবের এই প্রজন্ম যাচ্ছে বিবর্তনের উল্টো দিকে। সভ্য থেকে অসভ্যের দিকে। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম হচ্ছে আরো হিংস্র, আরো নিষ্ঠুর।"

কাটুস্কা কিছু না বলে চুপ করে রইল। রিওন মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "তোমাদের এই বয়সটা হচ্ছে আবেগের বয়স। এটা খুবই স্বাভাবিক যে তোমরা এসব নিয়ে ভাববে। কিন্তু সব সময় একটা কথা মনে রেখ—"

"কী কথা বাবা?"

"দুঃসময়ে টিকে থাকাটাই বড় কথা। পৃথিবীর এখন খুব দুঃসময়, তাই আমাদের টিকে থাকতে হবে। জলমানব বা অন্যদের কথা ভাবলে আমরা টিকে থাকতে পারব না। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।" কাটুস্কা মাথা নাড়ল।

"সেজন্য যেন কারো অপরাধবোধের জন্ম না হয়। এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। যে যোগ্য সে টিকে থাকবে। তাই আমরা যোগ্য হতে চাই। টিকে থাকতে চাই। বুঝেছ?"

"বুঝেছি, বাবা।" কাটুস্কা আবার মাথা নাড়ল। বলল, "আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, বাবা।"

৩

নিহন ভাসমান দ্বীপের কিনারায় দাঁড়িয়ে বলল, "ক্রিহা কোথায়?"

একজন বলল, "আসছে। আমি খবর দিয়েছি।"

"তা হলে দেরি করে লাভ নেই। কায়ীরা বলেছে এক্ষুনি যেতে।"

আঠার-উনিশ বছরের একটি মেয়ে উজ্জ্বল চোখে বলল, "কায়ীরা আমাদের নূতন দলপতি, কী মজা তাই না!"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। দলপতি হওয়ার পর এটা হচ্ছে কায়ীরার প্রথম নির্দেশ। তাই সবাইকে খুব ভালো করে এটা করতে হবে।"

ভাসমান দ্বীপের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েগুলো বলল, "করব। অবশ্যই খুব ভালো করে করব।"

"টাইফুন আসছে। কায়ীরা বলছে, আমরা বোঝার আগেই নাকি চলে আসবে। যারা গভীর সমুদ্রে গেছে তাদের কাছে গিয়ে আমাদের খবর দিতে হবে।"

ছেলেমেয়েগুলো মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক আছে, চল তা হলে রওনা দিয়ে দিই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহন বলল, "তোমরা তো নিয়ম জান। দুজন করে একটা দল। নিজেরা দল ভাগ করে রওনা হয়ে যাও। চারদিকে চারটি দল যাও। কে কোথায় গেছে তালিকাটা নিয়ে এসেছি, যাওয়ার আগে তোমরা দেখে নাও।"

ছেলেমেয়েগুলো তালিকাটা দেখে কোন দলের কতগুলো নৌকাকে খবর পৌঁছাতে হবে মনে মনে ঠিক করে নেয়। লাল চুলের একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর তুমি, নিহন তুমি কোন দিকে যাবে?"

"মাহার পরিবার পাওয়ার বোট নিয়ে বের হয়েছে। অনেক দূর চলে গেছে নিশ্চয়ই। আমি তার কাছে যাই।"

"ঠিক আছে।"

"ক্রিহা আসছে না, সেটাই হচ্ছে সমস্যা। দেরি করলে বিপদ হয়ে যাবে।"

"দেরি করবে না। ক্রিহা খুব দায়িত্ববান ছেলে।" নিহন বলল, "তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না। রওনা হয়ে যাও।"

ছেলেমেয়েগুলো বলল, "হ্যাঁ যাচ্ছি।"

তারা কোমরে ঝোলানো ছোট ব্যাগ থেকে সামুদ্রিক মাছ থেকে তৈরি করা এক ধরনের ক্রিম শরীরে মাখতে থাকে। সমুদ্রের লোনা পানিতে দীর্ঘ সময় থাকতে হলে তারা এই ক্রিমটা শরীরে মেখে নেয়, শরীরের চামড়া তা হলে শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে ওঠে না। ক্রিম মাখা শেষ করে তারা তাদের গলায় ঝোলানো আলট্রাসাউন্ড হুইসেলগুলো নিয়ে সমুদ্রের পানিতে মুখ ডুবিয়ে বাজাতে শুরু করে। পোষা ডলফিনগুলো সাধারণত খুব দূরে যায় না, হুইসেলের শব্দ শুনে তারা ছুটে আসতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেগুলো ভুশ করে পানি থেকে বের হয়ে আসে। ছেলেমেয়েগুলো ডলফিনগুলোর শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করে, তাদের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলে। তারপর তাদের পিঠে উঠে দেখতে দেখতে সমুদ্রের পানি কেটে দূরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নিহন একা দাঁড়িয়ে থাকে। ক্রিহা এখনো আসে নি। দায়িত্ববান ছেলে, তার না আসার কথা নয়। সম্ভবত কোনো ঝামেলায় পড়েছে। টাইফুনের আগে দ্বীপটাকে রক্ষা করার জন্য এক শ ধরনের কাজ করতে হয়। ক্রিহাকে হয়তো হঠাৎ করে সেরকম কোনো দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রিহার বদলে আর কাউকে নিতে হবে। এখন সে কাকে খুঁজে পাবে? সবাই নিশ্চয়ই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত। এক হয় একা চলে যাওয়া, কিন্তু সমুদ্রে একা যাওয়া নিষিদ্ধ—সব সময় সঙ্গে অন্য কাউকে থাকতে হয়। কত রকম বিপদ হতে পারে, সঙ্গে অন্য একজন থাকলে বিপদের ঝুঁকি অনেক কমে যায়। বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে এসে খবর দেওয়া যায়।

নিহন আকাশের দিকে তাকাল। ধূসর এক ধরনের মেঘ আকাশে এসে জমতে শুরু করেছে, চারপাশে কেমন থমথমে একটা ভাব চলে এসেছে, তার আর দেরি করা ঠিক হবে না। নিহন ঠিক করল, সে একাই চলে যাবে। সমুদ্রকে তার এতটুকু ভয় করে না। একা একা সে সমুদ্রে বহুবার গেছে, সব নিয়ম যে সব সময় মানা যায় না, সেটা সবাই জানে।

নিহন তার গলায় ঝোলানো হুইসেলটা পানিতে ডুবিয়ে পরপর তিনবার একটা টানা শব্দ করল। এটা তার পোষা ডলফিনটা, শুশুর সঙ্কেত। সঙ্কেত পেলেই শুশু ছুটে আসবে।

নিহন সমুদ্রের পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে, বহু দূরে একটা ডলফিনকে পানির ওপর ঝাঁপিয়ে উঠতে দেখে, নিশ্চয়ই শুশু! নিহনকে শুশু অসম্ভব ভালবাসে। নিহন সমুদ্রের পানিতে তাকিয়ে থাকে, দেখতে পায় পানি কেটে শুশু ছুটে আসছে। কাছাকাছি এসে শুশু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূন্যে ঝাঁপিয়ে উঠে তার আনন্দটুকু প্রকাশ করল। তারপর নিহনের কাছে এসে মাথা বের করে দাঁড়াল।

"এসেছ শুশু!"

শুশু মাথা নাড়ল। নিহন জিজ্ঞেস করল, "সমুদ্রের কী খবর?"

শুশু তার গলার ভেতর থেকে এক ধরনের শব্দ করে। শব্দগুলোর অর্থ, "ভালো। খুব ভালো।"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "না, ভালো না। টাইফুন আসছে।"

শুশু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার ভাষায় জিজ্ঞেস করল, "টাইফুন?"

"হ্যাঁ, টাইফুন। খুব খারাপ একটা টাইফুন আসছে শুশু।"

শুশুর মুখে দুশ্চিন্তার একটা ছাপ পড়ে। নিহন এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে ডলফিনটির দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবীর মানুষ যখন শুকনো মাটিতে থাকত তখন কখনো কল্পনা করে নি সমুদ্রের এই প্রাণীটি তাদের এতবড় সহায় হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীর মানুষকে পানিতে ঠেলে দেওয়ার পরও তারা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এই ডলফিন। বিবর্তনের ধারায় মানুষের পরে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে গেছে ডলফিন। পৃথিবীর মানুষ কখনো কি কল্পনা করেছিল একদিন মানুষ আর ডলফিন পরস্পর কথা বলতে পারবে? অর্থহীন আদেশ-নির্দেশ নয়, কাজ চালানোর মতো কথা। এই দুটি প্রাণী যে এত কাছাকাছি হবে সেটা কি কেউ জানত? কায়ীরা সব সময় বলে যে, জলমানবেরা নাকি জ্ঞান-বিজ্ঞানেও অসাধ্য সাধন করেছে—এটাই কি সেই অসাধ্য সাধন?

"টাইফুন খারাপ।" শুশু বোঝাল এবং দুশ্চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, বলল, "বেশি খারাপ।"

"হ্যাঁ।" নিহন মাথা নাড়ে। "এখন আমাদের গভীর সমুদ্রে যেতে হবে।"

শুশু আনন্দে পানি থেকে অনেকটুকু বের হয়ে এসে নিহনের মুখ স্পর্শ করে নিজের ভাষায় অনেক কথা বলে ফেলল, নিহন সব কথা ধরতে পারল না। "সমুদ্র আনন্দ খেলা" এ রকম বিচ্ছিন্ন কয়েকটা শব্দ শুধু ধরতে পারল। নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "না, শুশু না। আমি তোমার সঙ্গে খেলা করতে যাচ্ছি না। আনন্দ করতে যাচ্ছি না। কাজ করতে যাচ্ছি। কাজ।"

শুশুকে আবার একটু উদ্বিগ্ন দেখায়, "কাজ?"

"হ্যাঁ, কাজ।"

"কী কাজ?"

"গভীর সমুদ্রে যারা গেছে তাদের খবর দিতে হবে।"

"খবর?"

"হ্যাঁ।"

"কী খবর?"

"টাইফুনের খবর। তাদের চলে আসতে বলব।"

শুশুকে আবার উদ্বিগ্ন দেখায়। সে তার নিজের ভাষায় বলে, "টাইফুন খারাপ। বেশি খারাপ।"

"হ্যাঁ। টাইফুন খারাপ, বেশি খারাপ। এখন চল যাই।"

শুশু আনন্দে আবার পানি থেকে বের হয়ে এসে একটা পানির ঝাপটায় নিহনকে ভিজিয়ে দিল। বলল, "চল, বন্ধু চল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহন আলগোছে শুশুকে জড়িয়ে ধরে, শুশু সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তিশালী শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পানি কেটে শুশু সোজা সামনের দিকে ছুটে যেতে থাকে। পানির ঝাপটায় নিহন কিছু দেখতে পায় না। নিহন কপাল থেকে টেনে গগলসটা চোখের ওপর নিয়ে আসে। শুশু নিহনকে নিয়ে হঠাৎ পানির নিচে ঢুকে যেতে থাকে, এটা এক ধরনের দুষ্টুমি। পানির নিচে খানিকটা ঢুকে হঠাৎ করে শুশু সোজা ওপরের দিকে ছুটে আসে, নিহন শুশুকে ধরে রাখতে পারে না—ছিটকে পানিতে গিয়ে পড়ে। পুরো ব্যাপারটায় শুশু খুব আনন্দ পায়, ডলফিনের যে কৌতুক বোধ আছে সেটা নিহন কখনো জানত না। শুশুকে দেখে সে সেটা জেনেছে।

নিহন পানিতে গা ভাসিয়ে শুয়ে থাকে, নিচে থেকে শুশু এসে তাকে নিজের ওপর তুলে নিয়ে আবার ছুটে যেতে থাকে। নিহন শুশুর শরীরে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলে, "শুশু। দুষ্টু মেয়ে।"

উত্তরে শুশু কিছু একটা বলে, পানির ঝাপটার জন্য নিহন কথাটি শুনতে পায় না। নিহন শুশুর পিঠে চেপে বসে দুটি পা দুদিকে দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরেছে। শুশুর শরীরের সঙ্গে নিহন তার দেহটা শক্ত করে চেপে রাখে। শুশু পানি কেটে ছুটে যাচ্ছে—কোথায় যেতে হবে সে জানে, পানির মধ্যে ইঞ্জিনের পোড়া তেলের গন্ধটুকু সে বহু দূর থেকে ধরতে পারে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর নিহন বহু দূরে মাহার নৌকাটা দেখতে পেল। ইঞ্জিনটা বন্ধ করে মাহা বিশাল একটা জাল টেনে তুলছে। জালের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ আটকে আছে, সেগুলো ছটফট করে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে। নিহনকে দেখতে পেয়ে মাহা তার জাল টেনে তোলানো থামিয়ে একটু অবাক হয়ে গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে বলল, "কী ব্যাপার, নিহন? তুমি এখানে?"

"বলছি, দাঁড়াও।" নিহন শুশুকে নিয়ে মাহার নৌকার কাছে গিয়ে থামল। মাহা আর তার স্ত্রী নীহা নিহনকে নৌকায় উঠতে সাহায্য করে। নিহন নৌকায় বসে গগলসটা চোখ থেকে খুলে কপালে লাগিয়ে বলল, "তোমাদের জন্য দুটি খবর নিয়ে এসেছি। একটা ভালো, একটা খারাপ। কোনটা আগে শুনতে চাও বল।"

মাহার কমবয়সী স্ত্রী নীহা বলল, "আমি কোনো খারাপ খবর শুনতে চাই না। শুধু ভালো খবরটা শুনব।"

"শুধু ভালো খবর শুনলে কেমন করে হবে? খারাপ খবরটাও শুনতে হবে।" নিহন গম্ভীর মুখে বলল, "একটা বাজে ধরনের টাইফুন আসছে। তোমাদের এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে।"

"সত্যি?" মাহা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিকই বলেছ, দেখেছ আকাশটা কেমন হয়ে যাচ্ছে।" মাহার স্ত্রী নীহা বলল, "খারাপটা তো শুনলাম।" এখন ভালো খবরটা বল শুনি।"

"আমাদের নূতন দলপতি হচ্ছে, কায়ীরা।"

মাহা এবং নীহার চোখ একসঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "সত্যি?"

"হ্যাঁ। রিসি বুড়ো একটু আগে কায়ীরাকে দায়িত্ব দিয়েছে।"

"সত্যি? কায়ীরা আমাদের নূতন দলপতি?" নীহা ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে ওঠে।

"হ্যাঁ সত্যি।"

"কী মজা তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। খুব মজা। কায়ীরা আমাকে পাঠিয়েছে তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিতে।"

"চল ফিরে যাই" মাহা উঠে দাঁড়িয়ে তার জাল গুটিয়ে নিতে শুরু করে। নীহা জাল থেকে মাছগুলো খুলে নৌকার মাঝখানে রাখতে শুরু করে। নিহন দুজনের সঙ্গে হাত লাগায়। শুশু নৌকাটা ঘিরে ঘুরছিল, এবার পানি থেকে লাফিয়ে বের হয়ে নিহনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। নিহন গলা উঁচিয়ে বলল, "আসছি, শুশু। আসছি।" মাহা আর নীহা তাদের কাজ গুছিয়ে নেবার পর নিহন আবার শুশুর পিঠে চেপে বসল। তার শরীরে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, "তোমার খুব পরিশ্রম হচ্ছে, তাই না শুশু?"

শুশু মাথা নাড়ে, বলে, "না, পরিশ্রম না।"

"তা হলে?"

শুশু আনন্দের ভঙ্গি করে বলল, "আনন্দ।" নিহন শুশুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "তুমি খুব লক্ষ্মীমেয়ে। তোমাকে আমি খুব ভালবাসি।"

শুশু মাথা নাড়ল, বলল, "ভালবাসি। আমি ভালবাসি।"

"চল এখন। আর কেউ বাকি কি না খুঁজে দেখি।"

"চল চল।" নিহনকে পিঠে নিয়ে শুশু প্রথমে শূন্যে ঝাঁপিয়ে ওঠে, তারপর সমুদ্রের গভীরে ডুবে যায়। নিহন নিঃশ্বাস আটকে রাখে, সে জানে এগুলো হচ্ছে শুশুর দুষ্টুমি। কয়েক মুহূর্ত পর শুশু নিহনকে নিয়ে আবার ওপরে ভেসে ওঠে। তারপর পানি কেটে ছুটে যেতে শুরু করে। এই দুষ্টু ডলফিনটা না থাকলে নিহন কেমন করে তার কাজ করত?

বিকেলবেলা যখন নিহন ফিরে এসেছে, তখন সে তাদের ভাসমান দ্বীপটাকে চিনতে পারে না। মাঝামাঝি অংশটা এর মাঝেই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য অংশগুলো আলাদা করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেগুলোও ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বড় বড় পাম্পগুলো গর্জন করে কাজ করছে। মোটা শেকল দিয়ে ভাসমান দ্বীপগুলোকে নোঙর করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বীপের দুই হাজার মানুষের সবাই কোনো না কোনো কাজ করছে। ছোট ছোট বাচ্চাদেরও কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা বড় বড় বাক্সে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে। একেবারে যারা শিশু শুধু তাদের আলাদা করে রাখা হয়েছে। কয়েকজন মা তাদের নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। ক্রিটিনা ছোট অক্সিজেন মাস্ক তাদের মুখে পরানোর চেষ্টা করছে এবং বাচ্চাগুলো সেটা নিয়ে প্রবল আপত্তি করে হাত-পা ছুড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

নিহন কায়ীরাকে খুঁজে বের করে, সে ডুবিয়ে রাখা অংশটুকুতে বাতাসের চাপ পরীক্ষা করছিল। নিহন কাছে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, যখন সে একটু সময় পেল নিহন জিজ্ঞেস করল, "কায়ীরা, তুমি কি আমাকে নূতন কিছু করতে দেবে, নাকি আমি নিজে কিছু একটা বের করে নেব?"

"আমি দিচ্ছি নিহন। তুমি একটু অপেক্ষা কর।"

"ঠিক আছে।"

"যারা সমুদ্রে গিয়েছিল, সবাইকে কি খবর দেওয়া হয়েছে?"

'হ্যাঁ, খবর দেওয়া হয়েছে। তারা ফিরে আসতে শুরু করেছে।"

কায়ীরা আকাশের দিকে তাকাল, বলল, 'মাঝরাত থেকেই টাইফুনের ঝাপটা টের পেতে থাকব। শেষ রাতে সেটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে। আমাদের হাতে সময় খুব কম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহন কোনো কথা বলল না। কায়ীরা অনেকটা আপনমনে বলল, "তার আগেই আমাদের সব কাজ শেষ করতে হবে।"

মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ একটা মোটা দড়ি টেনে আনতে আনতে বলল, "তুমি চিন্তা কোরো না, কায়ীরা। তার আগেই আমাদের সব কাজ শেষ হয়ে যাবে।"

কায়ীরা মুখে হাসি টেনে এনে বলল, "আমি সেটা জানি। তোমরা সব কাজ শেষ করে ফেলবে সেটা আমি জানি।"

কায়ীরা খুঁটিনাটি কয়েকটা জিনিস দেখে উঠে দাঁড়িয়ে নিহনকে বলল, "তোমার দশজন ঠিক আছে?"

"নয়জন। ক্রিহাকে পানির পাম্পের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।" কায়ীরা এক মুহূর্তের জন্য ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে তুমি একা গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

কায়ীরা কয়েক মুহূর্ত নিহনের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বেঁচে থাকতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়। কিন্তু কতটুকু ঝুঁকি নেওয়া যায় সেটা কিন্তু তোমাকে চিন্তা–ভাবনা করে ঠিক করতে হবে।"

"আমি করি, কায়ীরা।"

"মনে রেখ সাহস আর বোকামির মাঝে পার্থক্যটা খুব অস্পষ্ট!"

"মনে রাখব, তুমি চিন্তা কোরো না।"

"ঠিক আছে। আমরা আমাদের পুরো দ্বীপটাকে ভাগ ভাগ করে ডুবিয়ে দিচ্ছি। এর নিচে বাতাস আটকে রাখার চেম্বারগুলো আছে। আমরা সবাই সেখানে থাকব।"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। জানি।"

"এত মানুষের অক্সিজেন সাপ্লাই সোজা কথা নয়। ওপর থেকে পাম্প করে আনতে হবে। চেম্বারগুলো পুরোপুরি বায়ুনিরোধক কি না দেখতে হবে। তুমি তোমার নয়জন নিয়ে সেগুলো পরীক্ষা কর। চেম্বারগুলো পুরোনো, অনেক জায়গায় জং ধরে গেছে। ছোটখাটো ফুটো অনেক আছে, বিপজ্জনক বড় ফুটো থাকলে সেগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা কর।"

নিহন বলল, "ঠিক আছে, কায়ীরা।"

"মনে রেখ, যখন সবাই চেম্বারে বসে থাকবে তখন কিছু একটা ঘটে গেলে কিন্তু কিছু করতে পারবে না। যা করার আগে থেকে করতে হবে।"

"বুঝতে পেরেছি, কায়ীরা।"

"যাও, নিচে চলে যাও।"

নিহন তার দলের নয়জনকে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল। পানির নিচে কাজ করার জন্য তারা নিজেদের অক্সিজেন মাস্কগুলো লাগিয়ে নেয়। বাতাসে দ্রবীভূত অক্সিজেনকে বের করে নেওয়ার এই যন্ত্রটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। জলমানবেরা দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে এটাকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছে। নিচে অন্ধকার, দেখার জন্য তারা সবাই আলোর টিউব নিয়ে নেয়। কিছু ব্যাক্টেরিয়া থেকে আলো বের হয়, সেগুলো সংগ্রহ করে এই টিউব তৈরি করা হয়েছে। ব্যাক্টেরিয়াগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই দীর্ঘদিন আলো পাওয়া যায়—তীব্র আলো নয়, কিন্তু কাজ চলে যায়।

পানির নিচে ঢুকে ওরা আলাদা হয়ে যায়, বাতাস আটকে রাখা চেম্বারগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। জায়গায় জায়গায় পানির বুদ্বুদ বের হচ্ছে। একজন বাইরে থেকে ফুটোগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বের করে, আরেকজন ভেতরে ঢুকে ছোট ছোট ফুটো বুজিয়ে দিতে শুরু করে। আঠালো এক ধরনের পেস্ট নিয়ে এসেছে, গর্তের ওপর লাগানো হলে বাতাসের চাপে গর্তের ভেতরটুকু সঙ্গে সঙ্গে বুজিয়ে দেয়।

চেম্বারগুলো বায়ু নিরোধক করে ওরা যখন ওপরে উঠে এসেছে তখন অনেক রাত। ওপরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, তার সঙ্গে দমকা হাওয়া বইছে। ভাসমান দ্বীপের বেশিরভাগই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সব মানুষ ছোট একটা জায়গায় ভিড় করে রয়েছে। অনেকেই নৌকার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, বাতাসে নৌকাগুলো দুলছে, সবাই সমুদ্রের নিচে চলে যাওয়ার পর নৌকাগুলোও ডুবিয়ে দেওয়া হবে। আজ রাতের জন্য সবার খাবারের আয়োজন করা হয়েছে এক জায়গায়, আগে কমবয়সীদের খাইয়ে দিয়ে বড়রা দ্রুত খেয়ে নিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষগুলো পানির নিচে চলে যেতে শুরু করবে।

নিহন তার খাবারটুকু নিয়ে একটা নৌকার পাটাতনে বসে দ্রুত খেয়ে নেয়। প্লেটটা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে সে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিয়ে কায়ীরাকে খুঁজে বের করল। কায়ীরা ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিয়ে সবাইকে পানির নিচে পাঠাতে শুরু করেছে। টাইফুনটি তাদের ওপর দিয়ে চলে যেতে কত সময় নেবে কে জানে, এই পুরো সময়টুকু পানির নিচে থাকতে হবে। টাইফুন চলে যাওয়ার পর আবার সবকিছু পানির ওপর ভাসিয়ে এনে তাদের জীবন শুরু করতে হবে।

নিহনকে দেখে কায়ীরা বলল, "চেম্বারগুলো ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ, কায়ীরা। ফুটোগুলো বন্ধ করেছি। অক্সিজেনের সাপ্লাই ঠিক রাখলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।"

"চমৎকার। তুমি তা হলে আমাদের সঙ্গে হাত লাগাও, সবাইকে পানির নিচে পাঠাতে শুরু কর।"

"ঠিক আছে, কায়ীরা।"

AMARBOI.COM

প্রায় হাজার দুয়েক মানুষকে পানির নিচে চেম্বারগুলোতে নামিয়ে দিতে দিতে রাত আরো গভীর হয়ে যায়। খানিকক্ষণ আগে যেটা ছিল দমকা বাতাস এখন সেটা রীতিমতো ঝড়ো হাওয়া। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও এখন প্রবল বৃষ্টিতে পাল্টে গেছে। বৃষ্টির ঠাণ্ডা পানিতে সবাই শীতে অল্প অল্প কাঁপছে। নৌকাগুলো পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু বহুকোণ একটা ভাসমান পাটাতন সমুদ্রের পানিতে দুলছে। সেখানে কায়ীরা কয়েকজনকে নিয়ে অপেক্ষা করছে।

নিহন নিচের চেম্বারগুলো পরীক্ষা করে ওপরে উঠে এলে কায়ীরা জানতে চাইল, "নিচে কীরকম অবস্থা, নিহন?"

"আট–দশ ঘণ্টা থাকার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু তার বেশি হলে সমস্যা!"

"তার বেশি হওয়ার কথা নয়!"

"তা হলে ঠিক আছে।"

"কী করছে সবাই?"

"ছোটরা হাঙর হাঙর খেলছে। তাদের মনে হয় খুব আনন্দ হচ্ছে।"

"আর বড়রা?"

"তারা বসে বসে গল্প–গুজব করছে। কেউ কেউ তাস খেলছে।"

"চমৎকার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"যারা ছোটও না বড়ও না তারা দেখে এসেছি গান গাইছে।"

কায়ীরা মুখের ওপর থেকে মুখের পানি মুছে ফেলে হেসে ফেলল, "চমৎকার। চল, আমরাও গিয়ে গানের আসরে যোগ দিই।"

"হ্যাঁ, চল। নিচে সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

"দাঁড়াও তার আগে রিসি বুড়োকে নিচে পাঠিয়ে দিই! সে কিছুতেই আগে যেতে রাজি হল না!"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, সবাই জানে টাইফুন এলেই রিসি বুড়োর অন্য রকম আনন্দ হয়।"

নিহন কায়ীরার পিছু পিছু এগিয়ে যায়। পাটাতনের মাঝামাঝি জায়গায় অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলের মাঝখানে রিসি বুড়ো দুই হাত বুকের কাছে রেখে নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে। বৃষ্টির পানিতে সে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা নিয়ে এতটুকু বিকার নেই। সে পানিকে খুব ভালবাসে। কায়ীরা উবু হয়ে কাছে বসে ডাকল, "রিসি বুড়ো।"

রিসি বুড়ো চোখ খুলে তাকাল, বলল, "কী হয়েছে, কায়ীরা?"

"টাইফুনটা প্রায় চলে এসেছে। এখন চল নিচে যাই।"

"তোমরা যাও, কায়ীরা।"

কায়ীরা অবাক হয়ে বলল, "আমরা যাব? আর তুমি?"

"আজকে তোমার হাতে সকল দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পর নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছে। আমার আর কোনো দায়িত্ব নেই।"

"হ্যাঁ, কিন্তু—"

"আমি সারা জীবন যেটা করতে চেয়েছিলাম আজকে সেটা করব, কায়ীরা।"

"কী করবে, রিসি বুড়ো?"

"আমার এই সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলে শুয়ে শুয়ে টাইফুনকে খুব কাছ থেকে দেখব।"

কায়ীরা চমকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ, কায়ীরা, আমি ঠিকই বলছি। আমাকে তোমরা সমুদ্রের পানিতে ভাসিয়ে দাও। আমি সমুদ্রের পানিতে ভেসে ভেসে টাইফুনকে দেখতে চাই—"

"তুমি কী বলছ? একটু পরে যখন বড় বড় ঢেউ আসবে তুমি কোথায় তলিয়ে যাবে—"

"আমি জানি।" রিসি বুড়ো তার শীর্ণ মুখে হাসে, হাসতে হাসতে বলে, "আমি সারা জীবন এ রকম একটি কথা চিন্তা করেছি। টাইফুনের বাতাস আর সমুদ্রের ঢেউ, আমি তার মাঝে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছি! কী চমৎকার একটি জীবন!"

কায়ীরা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ রিসি বুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি সত্যিই এটা চাও, রিসি বুড়ো?"

"হ্যাঁ, কায়ীরা। আমি সত্যিই এটা চাই। আমি সারা জীবন এ রকম একটা সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

কায়ীরা কোনো কথা না বলে রিসি বুড়োর শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে টেনে নেয়। রিসি বুড়ো ফিসফিস করে বলল, "আমার কী ভালো লাগছে তুমি চিন্তা করতে পারবে না! তোমার মতো একজনের হাতে সবার দায়িত্ব দিয়ে কী নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নিতে পারছি। একজন মানুষ তার জীবনে আর কী চাইতে পারে?" রিসি বুড়ো শীর্ণ হাতে কায়ীরার মুখ স্পর্শ করে বলল, "আমাকে বিদায় দাও, কায়ীরা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপের খোলটি পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হল। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে দুলতে দুলতে সেটি ধীরে ধীরে ভেসে যেতে থাকে।

কায়ীরার পাশে নিহন চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ায় তাদেরকে মনে হয় উড়িয়ে নেবে, তবুও তারা সামুদ্রিক কচ্ছপের বিশাল খোলটি বহু দূরে অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

৪

প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওন শুতে গিয়ে আবিষ্কার করল তার আঠার বছরের মেয়ে কাটুস্কার ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। এত রাত পর্যন্ত জেগে জেগে কাটুস্কা কী করছে দেখার জন্য রিওন তার মেয়ের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল। কাটুস্কা বিছানায় হাঁটু মুড়ে বসে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। রিওন একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এত রাতে তুমি কী করছ কাটুস্কা?"

"দেখছি।"

"কী দেখছ?"

"টাইফুন। উপগ্রহের ছবিতেই এটা ভয়ঙ্কর। সত্যি সত্যি যদি দেখা যেত তা হলে না জানি কত ভয়ঙ্কর দেখাত।"

রিওন হেসে বলল, "তোমার কী হয়েছে কাটুস্কা, তুমি এত রাত জেগে মনিটরে উপগ্রহের তোলা টাইফুনের ছবি দেখছ কেন?"

"ইনস্টিটিউট থেকে আমাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছে। কোয়াকম্প ব্যবহার করে এর গতিপথটা বের করতে হবে। তারপর দেখতে হবে আমাদের হিসাবের সঙ্গে মেলে কি না।"

"কী দেখলে? মিলেছে?"

কাটুস্কা মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ বাবা, মোটামুটি মিলে গেছে। টাইফুনটা যেদিক দিয়ে যাওয়ার কথা ঠিক সেদিক দিয়েই যাচ্ছে।"

"চমৎকার। এখন তা হলে ঘুমাও।"

"হ্যাঁ বাবা, ঘুমাব।"

রিওন চলে যাচ্ছিল, কাটুস্কা তাকে থামাল, বলল, "বাবা।"

"কী কাটুস্কা?"

"উপগ্রহের ছবিতে দেখেছিলাম সমুদ্রের ওপর ছোট ছোট দ্বীপ। এগুলো কি জলমানবদের আস্তানা?"

"সম্ভবত।"

"ঠিক ওদের আস্তানার ওপর দিয়ে টাইফুনটা যাচ্ছে। জলমানবদের কী হবে, বাবা?"

"কী আর হবে? শেষ হয়ে যাবে।"

"তারা সরে যায় না কেন?"

"কেমন করে সরে যাবে? টাইফুন আসার ভবিষ্যদ্বাণীটাও তো তারা করতে পারে না। ওদের কাছে তো কোনো যন্ত্রপাতি নেই।" রিওন মাথা নেড়ে বলল, "কাটুস্কা তোমার হয়েছেটা কী? কদিন থেকে শুধু জলমানব, জলমানব করছ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটুস্কা বলল, "না বাবা, কৌতূহল।"

"উপগ্রহের ছবি কী বলে? আস্তানাটা আছে, না নেই?"

"নেই। একটু আগে ছোট ছোট কয়টা ভাসমান দ্বীপের মতো ছিল। এখন সেখানে কিছু নেই।"

রিওন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সব ভেসে গেছে।"

"এমনকি হতে পারে যে তারা কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে?"

রিওন শব্দ করে হেসে বলল, "নিরাপদ আশ্রয়টা কোথায়? চারদিকে শুধু পানি আর পানি।"

কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, "তা ঠিক।"

রিওন চলে যাচ্ছিল, কাটুস্কা আবার তাকে থামাল, "বাবা।"

"কী কাটুস্কা?"

"তুমি কয় দিন আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে আমি জন্মদিনে কী চাই। মনে আছে?"

"হ্যাঁ কাটুস্কা। মনে আছে। তুমি কী চাও?"

"দশ হাজার ইউনিট।"

রিওন একটু অবাক হয়ে বলল, "এত ইউনিট দিয়ে কী করবে তুমি?"

"সমুদ্রে একটা অ্যাডভেঞ্চার পার্টি যায়, দশ হাজার ইউনিট তার ফি। খুব নাকি মজা হয়।"

"তুমি কোথা থেকে তার খোঁজ পেলে?"

"মাজুর বলেছে। মাজুরের কথা মনে আছে? আমাদের ইনস্টিটিউটে পড়ে।"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"দেবে তো দশ হাজার ইউনিট?"

রিওন এক মুহূর্ত কী একটা ভেবে বলল, "দেব। অবশ্যই দেব, কাটুস্কা।"

AMARBOI.COM

ইনস্টিটিউটের ক্লাসঘরে জানালার পাশে কাটুস্কা তার নির্ধারিত সিটে বসে অন্যমনস্কভাবে বাইরে তাকিয়ে ছিল। সামনে বড় ডেস্কে তাদের মধ্যবয়সী ইনস্ট্রাক্টর ছোট ব্যাগটি রেখে সেখান থেকে ইন্টারফেসের ছোট মডিউলটা বের করতে করতে বলল, "তোমাদের অভিনন্দন। তোমরা সবাই টাইফুনের গতিপথটি সফলভাবে বের করতে পেরেছ। তোমাদের হিসাবের সঙ্গে প্রকৃত গতিপথের বিচ্যুতি মাত্র দশমিক শূন্য শূন্য তিন শতাংশ। তোমাদের সবাইকে অভিনন্দন।"

ক্লাসঘরে বসে থাকা ছেলেমেয়েরা আনন্দের মতো এক ধরনের শব্দ করল। কাটুস্কা ভুরু কুঁচকে সবার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারা অভিনন্দন পাওয়ার মতো এমন কী কাজ করেছে সে এখনো বুঝতে পারে নি।

মধ্যবয়সী ইনস্ট্রাক্টর ডেস্কের সামনে কয়েকবার পায়চারি করে মুখে এক ধরনের গাম্ভীর্য নিয়ে এসে খানিকটা নাটকীয়ভাবে বলল, "তোমরা কোয়াকম্প ব্যবহার করার একটা পর্যায় শেষ করেছ। এখন তোমরা তার পরের পর্যায়ে যাবে। এই পর্যায়ে যাওয়ার জন্য তোমরা নিশ্চয়ই অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করছ, কারণ যারা এই পর্যায়ে পৌঁছায় তারা কোয়াকম্প ব্যবহার করে সিনথেসিস করতে পারে। এই সুযোগটি গ্রহণ করতে হলে তোমাদের নিজস্ব জিনেটিক কোডিং ব্যবহার করতে হয় নিরাপত্তার কারণে। তোমাদের অভিনন্দন। অনেক অভিনন্দন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটুস্কার কী মনে হল কে জানে, হঠাৎ হাত তুলে বলল, "তুমি একটু পরপর আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছ কেন? আমরা কী করেছি?"

মধ্যবয়সী ইনস্ট্রাক্টর বলল, "তোমরা কোয়াকম্প ব্যবহারের একটা নূতন স্তরে পৌঁছেছ। টাইফুনের গতিবিধি নিখুঁতভাবে বের করার জন্য তোমাদের এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে।"

কাটুস্কা বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। একটা বাচ্চা ছেলেও কোয়াকম্প ব্যবহার করতে পারবে। এখানে-সেখানে দুই-চারটা সুইচে চাপ দেওয়া, দুই-চারটা তথ্য খুঁজে বের করা—এর মধ্যে কোন কাজটা অভিনন্দন পাওয়ার মতো?"

মধ্যবয়স্ক ইনস্ট্রাক্টর কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু তোমাদের মতো এই পর্যায়ে পৌঁছায় খুব অল্প কয়জন মানুষ।"

"তার কারণ আমাদের বাবাদের ক্ষমতা বেশি, তারা আমাদের এই ইনস্টিটিউটে ভর্তি করিয়েছেন। আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। সব কৃতিত্ব আমাদের বাবাদের।"

ক্লাসরুমের মাঝামাঝি বসে থাকা মাজুর হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। কাটুস্কা চোখ পাকিয়ে বলল, "কী হল, তুমি হাসছ কেন? আমি কি হাসির কথা বলেছি?"

মাজুর মাথা নাড়ে, বলে, "না, তুমি মোটেই হাসির কথা বল নাই।"

"তা হলে কেন হাসছ?"

"হাসছি, কারণ খুব সহজ একটা জিনিস তুমি বুঝেছ এত দেরিতে।"

কাটুস্কা চোখ পাকিয়ে বলল, "এটা তোমরা আগে থেকে জান?"

"হ্যাঁ। জানি। তবে আমরা তোমার মতো নাবালিকা না, তাই এটা নিয়ে চেঁচামেচি করি না।"

কাটুস্কা রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মধ্যবয়স্ক ইনস্ট্রাক্টর তাকে থামিয়ে দিল। হাত তুলে বলল, "অনেক হয়েছে। আমরা যে কাজ করতে এসেছি সেই কাজ করি।"

কাটুস্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার টেবিলের মনিটরটি নিজের কাছে টেনে নেয়।

AMARBOI.COM

ক্লাসের শেষে ছোট করিডরে সবাই একত্র হয়েছে। মাজুর তার উত্তেজক পানীয়ে চুমুক দিয়ে বলল, "আচ্ছা কাটুস্কা, তোমার হয়েছেটা কী? তুমি সব সময় এত রেগে থাক কেন?"

দ্রীমান বলল, "হ্যাঁ, কী হয়েছে তোমার?"

কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, "আমার কিছু হয় নি।"

ক্রানা মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, তোমার কিছু একটা হয়েছে, কিছু একটা তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।"

কাটুস্কা মাথা নেড়ে বলল, "আমাকে নূতন কিছু যন্ত্রণা দিচ্ছে না।"

"তা হলে? পুরোনো কিছু যন্ত্রণা দিচ্ছে?"

কাটুস্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "না না, এটা ঠিক যন্ত্রণা নয়। তবে—"

"তবে কী?"

"তোমরা জান আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা এত বেশি আত্মহত্যা করে কেন? শতকরা প্রায় বারো ভাগ?"

মাজুর গম্ভীর হয়ে বলল, "আত্মহত্যা এক ধরনের রোগ।"

কাটুস্কা বলল, "তা হলে আমি অন্যভাবে প্রশ্ন করি, আমাদের মতো কমবয়সীদের মধ্যে এই রোগটি এত বেশি কেন?"

দ্রীমান বলল, "এ তো সব সময়ই ছিল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। ছিল না। যখন পৃথিবীটা স্বাভাবিক ছিল তখন আমাদের মতো কমবয়সীরা এত বেশি আত্মহত্যা করত না।"

মাজুর তার উত্তেজক পানীয়ের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ কাটুস্কা?"

কাটুস্কা গম্ভীর মুখে বলল, "আমি বলতে চাইছি যে আমাদের জীবনে কোনো আনন্দ নেই। আমাদের জীবনের কোনো অর্থও নেই। আমরা ভান করি আমাদের জীবন খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের অনেক আনন্দ—আসলে এসব বাজে কথা। আনন্দ পাওয়ার জন্য সাইকাডোমে আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিয়ে রেজোনেন্স করাতে হয়।"

মাজুর মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি কী বলছ এসব? আমাদের জীবনে আনন্দ নেই? আমাদের জীবনের কোনো অর্থ নেই?"

কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, "না, নেই। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তার জন্য আমরা কোয়াকম্পের কাছে যাই। কোয়াকম্প হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটার, সে আমাদের সবকিছুর সমাধান করে দেয়।"

"তা-ই তো দেবার কথা।" দ্রীমান অধৈর্য হয়ে বলল, "সেজন্যই তো কোয়াকম্প তৈরি করা হয়েছে!"

কাটুস্কা জোর করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "কোয়াকম্পের একটা বোতাম টিপে একটা তথ্য বের করে আমি তোমাদের মতো আনন্দে লাফাতে পারি না।"

মাজুর মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি তা হলে কী চাও?"

কাটুস্কা বলল, "আমি জানি না।"

ক্রানা হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "কাটুস্কা, তোমার কিসের অভাব? তোমার বাবা প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান। তোমার চেহারা অপূর্ব। তোমার জিনেটিক কোডিং একেবারে সবার ওপরে। তোমার আইকিউ অসাধারণ। তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করছ। তোমার এত কিছু থাকার পরও একেবারে সাধারণ রাস্তার একটা হতভাগা ছেলের মতো কথা বলছ কেন?"

কাটুস্কা বিষণ্ন গলায় বলল, "আমি জানি না।"

মাজুর একটু এগিয়ে এসে কাটুস্কার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "কাটুস্কা, মন ভালো কর। এ রকম গোমড়ামুখে থেকো না। তোমার এখন কী প্রয়োজন জান?"

"কী?"

মাজুর গলায় একটু নাটকীয় ভাব এনে বলল, "তোমার জীবনে এখন প্রয়োজন খানিকটা উত্তেজনা।"

"উত্তেজনা?"

"হ্যাঁ, তোমার জীবন একটু একঘেয়ে হয়ে গেছে।"

ক্রানা জিজ্ঞেস করল, "সেই উত্তেজনাটুকু আসবে কীভাবে?"

মাজুর চোখ বড় বড় করে বলল, "খুব সহজে। আমরা কাটুস্কাকে নিয়ে যাব জলমানব শিকারে।"

কাটুস্কা ভুরু কুঁচকে মাজুরের দিকে তাকিয়ে রইল। মাজুর বলল, "মানুষের জীবনে এর চাইতে বড় উত্তেজনার কিছু নেই। যারা গিয়েছে তারা বলেছে এই অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা নেই। একজন ভিতু মানুষ, দুর্বল মানুষ, আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ জলমানব শিকার করার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যায়। তার কোনো দুর্বলতা থাকে না। ভয়-ভীতি থাকে না। রাতারাতি জীবনটা অন্য রকম হয়ে যায়।"

কাটুস্কা জিজ্ঞেস করল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

"কেন?"

"মনোবিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন। জলমানবেরা মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়, তাই তাদের হত্যা করায় উত্তেজনা আছে, অপরাধবোধ নেই—এ রকম একটা ব্যাখ্যা পড়েছিলাম।"

কাটুস্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "খুব বিচিত্র ব্যাখ্যা।"

"বিচিত্র হতে পারে, কিন্তু সত্যি।" মাজুর কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি যেতে চাও?"

কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, "দেখি চেষ্টা করে।"

"দশ হাজার ইউনিট লাগবে।"

"সেটা হয়তো সমস্যা নয়। আমার বাবা আমাকে দশ হাজার ইউনিট দিতে রাজি হয়েছেন।"

মাজুর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "চমৎকার।"

দ্রীমান বলল, "আমিও যাব।"

মাজুর খুশি হয়ে বলল, "তা হলে তো আরো ভালো। ক্রানা, তুমি যাবে না?"

বলল, "তোমরা সবাই যদি যাও তা হলে আমি একা পড়ে থাকব কেন?"

"চমৎকার।" আনন্দে মাজুর তার উত্তেজক পানীয়টুকু এক ঢোকে শেষ করে বলল, "তা হলে আমি ব্যবস্থা করে ফেলছি! ঠিক আছে?"

সবই মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক আছে।"

AMARBOI.COM

মাজুর খুব কাজের ছেলে, এক সপ্তাহের ভেতর সে সব ব্যবস্থা শেষ করে ফেলল। নানা রকম নৌযানে যাওয়া যায়, তারা বেছে নিল সাধারণ একটা ইয়ট। সমুদ্রের নীল পানিতে ধবধবে সাদা একটা ইয়ট ভেসে যাচ্ছে বিষয়টা চিন্তা করেই সবার মন ভালো হয়ে যেতে শুরু করে। ইয়টে থাকা-খাওয়া-বিনোদন—সবকিছুর ব্যবস্থা রয়েছে, ক্রুরা অভিজ্ঞ, তারা পুরো শিকারের বিষয়টা যেন নিরাপদে শেষ করা যায় তার খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করে রাখল।

প্রথম দিনেই তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করা শেখানো হল। নূতন ধরনের অস্ত্র, একটা ম্যাগাজিনে প্রায় এক শ বুলেট থাকে। ট্রিগার টেনে ধরে রাখলে মুহূর্তে ম্যাগাজিন খালি হয়ে যায়। ইয়টের ডেকে দাঁড়িয়ে চলন্ত টার্গেটের মধ্যে গুলি করতে করতে কাটুস্কা বিচিত্র এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটায় হাত বুলিয়ে সে মাজুরকে বলল, "অস্ত্র কী বিচিত্র একটা জিনিস দেখেছ?"

মাজুর দূরে ভাসমান একটা টার্গেটে এক পশলা গুলি ছুড়ে দিয়ে বলল, "কেন? তোমার কাছে এটা বিচিত্র কেন মনে হচ্ছে?"

"এটা তৈরিই করা হয়েছে মানুষকে হত্যা করার জন্য। মানুষ হয়ে মানুষকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র তৈরি করা যায়, বিষয়টা কেমন জানি অদ্ভুত মনে হয়।"

দ্রীমান বলল, "শুধু মানুষকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র তৈরি হয় নি। অন্য অনেক জন্তু-জানোয়ার অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়। জলমানবকে হত্যা করা হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটুস্কা মাথা নাড়ল, আস্তে আস্তে বলল, "অস্ত্র আসলেই খুব বিচিত্র একটা জিনিস। আমি কখনো ভাবি নি আমি কোনো জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা করতে পারব। কিন্তু এটা হাতে নেওয়ার পরই আমার কেমন জানি হাত নিশপিশ করছে। কোনো একটা জীবন্ত প্রাণীকে গুলি করব, সেটা ছটফট করতে থাকবে সেই দৃশ্যটা দেখার জন্য ভেতরটা কেমন জানি আকুলি-বিকুলি করছে।"

ক্রানা একটু অবাক হয়ে কাটুস্কার দিকে তাকাল। বলল, "ঠিকই বলেছ তুমি! অস্ত্র খুবই অবাক একটা জিনিস।"

মাজুর তার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে এক ঝাঁক গুলি করে বলল, "এক শ ভাগ সত্যি কথা, গুলি করতে কী ভালোই না লাগে। শব্দটা কী সুন্দর, হাতের নিচে যে ঝাঁকুনিটা দেয় সেটা অসাধারণ। মনে হয় এই অস্ত্রটা একটা জীবন্ত প্রাণী, তাই না?"

দ্রীমান মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ, অস্ত্র খুব চমৎকার একটা জিনিস। নার্ভকে শান্ত রাখার জন্য এর থেকে ভালো কিছু আর হতে পারে না।"

কাটুস্কা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ইয়টের একজন ক্রুকে ঠিক এ রকম সময়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে থেমে গেল। মানুষটির রোদেপোড়া চেহারা, কঠিন মুখ এবং নীল চোখ। মাথার সামনের দিকে চুল হালকা হয়ে এসেছে। কাছাকাছি এসে বলল, "তোমাদের অস্ত্র চালানো কেমন হচ্ছে?"

মাজুর বলল, "খুব ভালো। মোটামুটি টার্গেট ফেলে দিতে পারছি।"

দ্রীমান বলল, "যত কঠিন হবে ভেবেছিলাম, মোটেও তত কঠিন নয়।"

কঠিন চেহারার মানুষটি হা হা করে হেসে বলল, "ইয়টের ডেক থেকে গুলি করছ, কঠিন মনে হবে কেন? যখন সাগর-স্কুটারে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ে ছুটে যেতে যেতে গুলি করবে তখন বুঝবে কাজটা সহজ না কঠিন।"

কাটুস্কা জানতে চাইল, "সেটা আমরা কখন করব?"

"এখনই। আমি সেজন্য এসেছি।"

মাজুর আনন্দের মতো একটা শব্দ করল, বলল, "চমৎকার। চল তা হলে, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।"

ক্রানা বলল, "আমরা জলমানবদের দেখা পাব কখন?"

"সেজন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে।" কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, "জলমানবদের কাছাকাছি নেবার আগে তোমাদের সাগর-স্কুটারে চড়া শিখতে হবে। সেখান থেকে গুলি করা শিখতে হবে। এখনো অনেক কাজ বাকি। তোমাদের এত তাড়াহুড়ো কিসের?"

কাটুস্কা হেসে বলল, "নাই। আমাদের কোনো তাড়াহুড়ো নেই। সব মিলিয়ে শিখতে কত দিন লাগবে?"

কঠিন চেহারার মানুষটি একটু হাসল এবং হাসির কারণে তাকে হঠাৎ সহৃদয় একজন মানুষের মতো দেখায়, সে হাসতে হাসতে বলল, "জলমানব শিকার হচ্ছে এক ধরনের স্পোর্টস। এটি কোনো নিষ্ঠুরতা নয়, কোনো যুদ্ধ নয়। জলমানব হচ্ছে মানুষের অপভ্রংশ, তাই তাদের আছে মানুষের বুদ্ধি। তারা পানিতে ভেসে থাকতে ব্যবহার করে ডলফিন, পানিতে ডলফিন থেকে সাবলীল কোনো প্রাণী নেই। মানুষ এবং ডলফিন এই দুই প্রাণী মিলে তৈরি হয় একটা অসাধারণ সমন্বয়। তাদের গুলি করা সোজা কথা নয়। তোমাদের সেটা সময় নিয়ে শিখতে হবে। সেজন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই পরের কয়েকদিন তারা সমুদ্রের পানিতে সাগর–স্কুটার চালানো শিখল। হাইড্রোজেন সেলের শক্তিশালী ইঞ্জিন গর্জন করে উঠতে থাকে আর শুকনো এলাকার চারজন তরুণ–তরুণী সাগর–স্কুটারে করে প্রচণ্ড গতিতে পানি কেটে ছুটে যেতে থাকে। একবার সাগর–স্কুটারের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি দখলে নিয়ে নেওয়ার পর তারা এক হাতে হ্যান্ডেলটা ধরে রেখে অন্য হাতে গুলি করা শিখতে শুরু করল। কাজটি কঠিন এবং বিপজ্জনক। বড় কোনো দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে তারা তৃতীয় দিনের মাথায় ব্যাপারটা মোটামুটি শিখে নিল। চতুর্থ দিন ইয়টের ক্রুরা তাদের একটা পরীক্ষা নিল। নানা ধরনের চলমান টার্গেটকে তাদের গুলি করতে হল, পানিতে না ডুবে তারা যখন সফলভাবে টার্গেটে গুলি করতে পারল তখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে তাদের ট্রেনিং সমাপ্ত করে দেওয়া হল।

সেই রাতে একটা বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ইয়টের ডেকে জ্বলন্ত আগুনে একটা সামুদ্রিক মাছ ঝলসে খেতে খেতে সবাই কথা বলছে। উত্তেজক পানীয় খাবার কারণে সবার ভেতরেই এক ধরনের ফুরফুরে আনন্দ। ইয়টের ক্রুদের পক্ষ থেকে একসময় একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কাটুস্কা, ক্রানা, দ্রীমান এবং মাজুর—আমি আমার এই ইয়টের পক্ষ থেকে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তেজনাময় স্পোর্টসের জন্য তোমরা এখন প্রস্তুত। তোমাদের অভিনন্দন।"

মাজুর হাত উঁচিয়ে একটা আনন্দের মতো শব্দ করল, অন্যরাও তাতে যোগ দিল। মানুষটি বলল, "আমি খুব আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমরা জলমানবের একটা আস্তানার খোঁজ পেয়েছি। আমাদের ইয়ট সেদিকে রওনা দিয়েছে। আমরা আশা করছি আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা তার কাছাকাছি পৌঁছে যাব। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমরা পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তেজনাময় স্পোর্টসে অংশ নেবে। তোমাদের অভিনন্দন।"

কাটুস্কা তার উত্তেজক পানীয়ের গ্লাসটি উপরে তুলে আনন্দে একটা চিৎকার করে ওঠে, সাথে সাথে অন্য সবাই সেই চিৎকারে যোগ দেয়। ছেলেমানুষি আনন্দে তারা হিহি করে হাসতে থাকে, একজন আরেকজনের ওপর ঢলে পড়তে থাকে।

গভীর রাতে ইয়টের ডেকে শুয়ে শুয়ে আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে কাটুস্কার মনে হয়, মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে সত্যি এক ধরনের আনন্দ আছে। কাটুস্কার মনে হয় তার কী সৌভাগ্য যে সে মানুষ হয়ে জন্মেছিল। তাই সে এই আনন্দ আর উত্তেজনা উপভোগ করতে পারছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে হল তার জীবনের এই আনন্দ আর উত্তেজনা কি সত্যি? নাকি সেটা নিজের কাছে নিজের করা এক ধরনের অভিনয়? মানুষ কি কখনো নিজের কাছে নিজে অভিনয় করে? করতে পারে?

৫

কায়ীরা চিন্তিত মুখে বলল, "দূর সমুদ্রে একটা সাদা ইয়ট দেখা গেছে।"

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন জিজ্ঞেস করল, "কে দেখেছে?"

'তাহা পরিবার মাছ ধরতে গিয়েছিল, তারা এসে বলেছে।"

"কোন দিকে যাচ্ছে?"

"এখন বোঝা যাচ্ছে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহন কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, জিজ্ঞেস করল, "কায়ীরা, ইয়টে করে স্থলমানবেরা কেন এসেছে বলে মনে হয়?"

কায়ীরা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আনন্দ করতে এসেছে। স্ফূর্তি করতে এসেছে।"

"তারা কেমন করে স্ফূর্তি করে?"

'ইয়টের ডেকে বসে তারা খায়-দায় আনন্দ করে। নাচানাচি করে। মাঝে মধ্যে শিকার করে।"

"কী শিকার করে?"

"পাখি, মাছ, ডলফিন। একবার শুনেছিলাম—"

"কী শুনেছিলে?"

কায়ীরা ইতস্তত করে বলল, "আমি ব্যাপারটায় কখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারি নি। ভাসা ভাসাভাবে শুনেছি—"

"কী শুনেছ?"

"তারা নাকি দুই-একজন মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। আমাদের মতো মানুষ—"

নিহন চমকে উঠে বলল, "আনন্দ করার জন্যে তারা মানুষ মারে?"

"আনন্দ করার জন্যে মেরেছে নাকি অন্য কোনো কারণ ছিল আমি জানি না। যে কলোনির মানুষকে মেরেছে তাদের সঙ্গে আমার কখনো কথা হয় নি।"

মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বলল, "কায়ীরা।"

"বল।"

"আমাদের কি একটু সতর্ক থাকা দরকার?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে সতর্ক থাকব?"

"ওদের কাছাকাছি হতে চাই না।"

"যদি কাছাকাছি চলে আসে?"

"আসার কথা নয়।" কায়ীরা মাথা নেড়ে বলল, "কখনো আসে না। কিন্তু তারপরও যদি চলে আসে আমরা সরে যাব। নৌকায় ডলফিনে সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সরে যাব।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "আমি কি সবাইকে একটু সতর্ক করে রাখব?"

"এখনই না। শুধু শুধু ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আমরা একটু দেখি ইয়টটা কোন দিকে যায়।"

কায়ীরা নিহনের দিকে তাকিয়ে বলল, "নিহন, তুমি ইয়টটাকে চোখে চোখে রাখতে পারবে?"

"পারব, কায়ীরা।"

"একেবারেই কাছে যাবে না। অনেক দূরে থাকবে।"

"ঠিক আছে। অনেক দূরে থাকব।"

"মনে রেখ ওরা কিন্তু বাইনোকুলার দিয়ে অনেক দূরে দেখতে পাবে।"

নিহন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ জানি।"

"তা হলে তুমি যাও। সঙ্গে কতজনকে নিতে চাও?"

"যত কম নেওয়া যায়। সবচেয়ে ভালো হয় একা গেলে, যদি নিতেই হয় তা হলে আর একজন।"

AMARBOI.COM

"আমি যাব নিহনের সঙ্গে—আমি।" কিশোরী গলার স্বর শুনে সবাই ঘুরে তাকাল, নাইনা নামের ছিপছিপে মেয়েটি সবাইকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কায়ীরা মুখের হাসি গোপন করে বলল, "তুমি?"

'হ্যাঁ, কায়ীরা আমি।"

"তুমি এই কাজের জন্য খুব ছোট।"

"না কায়ীরা—" নাইনা তার কুচকুচে কালো চুল ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে বলল, "আমি ছোট না। আমি সমুদ্রের তল থেকে এনিমম তুলে এনেছি। আমার ডলফিন কিকি আমাকে নিয়ে এক শ কিলোমিটার চলে যেতে পারে, আমি হাঙর শিকার করেছি, নীল তিমির দুধ দুয়েছি—"

"ব্যস! ব্যস! অনেক হয়েছে—" কায়ীরা হেসে নাইনাকে থামিয়ে দিল। বলল, "আমাদের কিছু নিয়মকানুন আছে। ছোট কিংবা বড় বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ না—কার কতটুকু অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।"

"আমাকে যদি যেতে না দাও আমার অভিজ্ঞতা হবে কেমন করে?"

"ঠিক আছে, আমি অনুমতি দিচ্ছি।"

নাইনা আনন্দের একটা শব্দ করতে যাচ্ছিল, কায়ীরা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল, বলল, "তুমি যেহেতু যথেষ্ট বড় হও নি আমার অনুমতি যথেষ্ট নয়। তোমার বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়া তোমাকে পাঠানো যাবে না!"

নাইনা একটা হতাশার মতো শব্দ করে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা তার মায়ের দিকে তাকাল, চোখে-মুখে একটা করুণ ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, "মা—"

নাইনার মা বলল, "তুই এতটুকুন মেয়ে, কোথায় একটু লেখাপড়া করবি, ঘরের কাজ শিখবি তা না দিনরাত দস্যিপনা। সমুদ্রের পানি ছাড়া আর কিছু বুঝিস না।"

নাইনা প্রতিবাদ করে বলল, "কে বলেছে আর কিছু বুঝি না। আমি ত্রিঘাত সমীকরণ শেষ করেছি মা। আমি আমার ক্লাসে জীববিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছি। আমি নীল তিমির চর্বি থেকে জ্বালানি তেল তৈরি করতে পারি। সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে কাপড় বুনতে পারি।"

"ঠিক আছে, বাবা ঠিক আছে।" নাইনার মা হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "তুই যেতে চাইলে যা। কিন্তু খুব সাবধান।"

নাইনা এবার আনন্দের মতো একটা শব্দ করল। নিহন নাইনার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "নাইনা! আমি তোমার কাজকর্মের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না। যে কাজ থেকে সবাই সরে থাকতে চায় তুমি সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও! কারণটা কী?"

নাইনা দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমার মাথাটা মনে হয় একটু খারাপ!"

নাইনার মা বলল, "হ্যাঁ। আসলে তা-ই। তোর আসলেই মাথা খারাপ।" তারপর নিহনের দিকে তাকিয়ে বলল, "নিহন, তুমি আমার এই মাথা খারাপ মেয়েটাকে একটু দেখে রেখ।"

নিহন মাথা নেড়ে বলল, "আমি দেখে রাখব। তুমি চিন্তা কোরো না।"

"তোমার ওপর বিশ্বাস করে আমি যেতে দিচ্ছি। অন্য কেউ হলে আমি তার সাথে আমার এই পাগলী মেয়েকে যেতে দিতাম না। আমি জানি, তুমি নাইনাকে দেখে রাখবে।"

খুব ভোরবেলা রওনা দিয়ে নিহন আর নাইনা দুপুরবেলার দিকে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামল। ডলফিন দুটো ক্ষুধার্ত, তাদের ছেড়ে দিয়ে দুজনে পানিতে শুয়ে থাকে। জলমানব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুদের জন্ম হয় পানিতে, তারা হাঁটতে শেখার আগে পানিতে ভেসে থাকতে শেখে। নিহন সমুদ্রের প্রায় উষ্ণ পানিতে নিশ্চল হয়ে শুয়ে নাইনাকে ডাকল, "নাইনা।"

"বল।"

"ক্লান্ত হয়ে গেছ?"

নাইনা ডলফিনের পিঠে বসে সমুদ্রের পানির ভেতর দিয়ে এত দূর এসে সত্যিই একটু ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সে এটি স্বীকার করতে চাইল না। বলল, "না নিহন। ক্লান্ত হই নি!"

নিহন হেসে বলল, "খানিকক্ষণ হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নাও। তারপর কিছু একটা খাও।"

নাইনা পানি থেকে মাথা বের করে বলল, "আচ্ছা নিহন, আমরা যে রকম পানিতে ভেসে থাকতে পারি স্থলমানবেরা নাকি সে রকম ভেসে থাকতে পারে না?"

"পারে। তবে সেটা শিখতে হয়। তারা সেটাকে বলে সাঁতার কাটা। সাঁতার কেটে পানিতে ভেসে থাকতে হলে তাদের হাত-পা নাড়তে হয়।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা যে রকম পানিতে শুয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারি, তারা সে রকম পারে না?"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "না, তারা পারে না।"

"কেন পারে না?"

"আমি ঠিক জানি না। মনে হয় পানিতে থাকার জন্য আমাদের ফুসফুস আকারে বড় হয়ে গেছে, বেশি বাতাস বুকের ভেতর থাকে বলে আমাদের ভেসে থাকা সোজা। তা ছাড়া সমুদ্রের পানিতে লবণ, সেজন্য আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি—"

নাইনা অবাক হয়ে বলল, "স্থলমানবের পানিতে লবণ নেই?"

"না। তাদের পানি বৃষ্টির পানির মতো!"

"কী আশ্চর্য!" নাইনা এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "আমার মাঝে মধ্যে খুব স্থলমানবদের দেখার ইচ্ছা করে।"

নিহন শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "এর চেয়ে বল আমার একটা হাঙরের মুখের ভেতর মাথাটা ঢোকাতে ইচ্ছে করে! সেই কাজটাই বরং সহজ আর নিরাপদ।"

"তোমার কী মনে হয় নিহন? আমরা কি ইয়টের ভেতর স্থলমানবদের দেখতে পাব?"

"উঁহু। আমরা অনেক দূরে থাকব। দেখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইয়টটা কোন দিকে যায় আমরা শুধু সেটা লক্ষ করতে এসেছি।"

নাইনা একটু আদুরে গলায় বলল, "আমরা কি একটু কাছে গিয়ে দেখতে পারি না?"

"না, নাইনা।" নিহন গম্ভীর গলায় বলল, "আমরা কিছুতেই কাছে যাব না। দূরে থাকব। অনেক দূরে।"

নাইনা কোনো কথা বলল না, নিঃশব্দে পানিতে দুই হাত-পা ছাড়িয়ে শুয়ে রইল, তার খানিকটা আশাভঙ্গ হয়েছে। সে ভেবেছিল ইয়টের খুব কাছে গিয়ে স্থলমানবদের দেখবে। তারা কেমন করে হাসে কথা বলে শুনবে। স্থলমানবদের নিয়ে তার অনেক কৌতূহল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডলফিন দুটো ফিরে এল, সমুদ্রের তলদেশ থেকে তারা ভরপেট খেয়ে এসেছে। শুশু তার মুখ দিয়ে ঠেলে নিহনকে জাগিয়ে তোলে। শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে তার চোখে ঘুম নেমে এসেছে সে জানে না। শুশু কিছু একটা বলল, কথাটি কী নিহন ঠিক ধরতে পারল না, জিজ্ঞেস করল, "কী বলছ শুশু?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সাদা বড়।"

"সাদা বড় কিছু দেখেছ?"

শুশু মাথা নাড়ল। বলল, "ঝিক ঝিক ঝিক।"

"ও আচ্ছা!" নিহন বুঝতে পারে, ডলফিন দুটো ইয়টটা দেখে এসেছে। শুশুকে ধরে বলল, "ইয়টটা দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কোন দিকে যাচ্ছে?"

শুশু এবং কিকি মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল ইয়টটা পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে। নিহন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তাদের ভাসমান দ্বীপটি উত্তরে, ইয়ট সেদিকে যাচ্ছে না।

নাইনা বলল, "চল, ইয়টটা দেখে আসি।"

"চল।" নিহন আবার নাইনাকে মনে করিয়ে দেয়, "মনে আছে তো, আমরা কিন্তু বেশি কাছে যাব না।"

"মনে আছে নিহন, মনে আছে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডলফিনের পিঠে চেপে নিহন আর নাইনা পানি কেটে ছুটে যেতে থাকে। বহু দূরে যখন ধবধবে সাদা ইয়টটা দেখা গেল তারা দুজন তখন থেমে গেল। নিহন বলল, "আর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখান থেকে দেখি।"

নাইনা অনুনয় করে বলল, "আর একটু কাছে যাই?"

"না নাইনা। আর কাছে নয়।"

নাইনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে।"

ডলফিন দুটোকে ছেড়ে দিয়ে তারা চুপচাপ পানিতে শুয়ে থাকে। বহু দূরে ইয়টটাকে আবছা দেখা যাচ্ছে, পানিতে একটা চাপা গুমগুম শব্দ শোনা যায়। ডলফিন দুটো ছাড়া পেয়ে তাদের ঘিরে ছোটাছুটি করতে থাকে, ছোট বাচ্চাদের মতো সেগুলো মাঝে মধ্যে পানি থেকে ঝাঁপ দিয়ে উপরে উঠে যায়। ডলফিন খুব হাসিখুশি প্রাণী। মানুষের কাছাকাছি থাকলে মনে হয় তারা আরো বেশি হাসিখুশি থাকে।

AMARBOI.COM

নিহন আর নাইনা পানিতে শুয়ে নিঃশব্দে ইয়টটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখান থেকে মনে হচ্ছে সেটা খুব ধীরে ধীরে যাচ্ছে কিন্তু দুজনেই জানে এটা খুব দ্রুত পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে।

নিহন হঠাৎ পানি থেকে মাথা বের করে আনে। নাইনা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে নিহন?"

"ইয়টটার ইঞ্জিন বন্ধ করেছে।"

"কেন?"

"জানি না। এখানে থেমে যাচ্ছে।"

নাইনা চোখ বড় বড় করে তাকাল, "সত্যি?"

'হ্যাঁ।" নিহন তীক্ষ্ণ চোখে ইয়টটার দিকে তাকিয়ে থাকে, অনেক দূরে বলে ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার মুখে হঠাৎ দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল, সেটা নাইনার দৃষ্টি এড়াল না। নাইনা জানতে চাইল, "কী হয়েছে নিহন?"

"বহু দূর থেকে ছোট ছোট কয়েকটা ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

"কিসের ইঞ্জিন?"

"বুঝতে পারছি না। স্থলমানবদের কত রকম যন্ত্রপাতি আছে—তার কোনো একটা হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন এর শব্দ হচ্ছে?"

"এখনো বুঝতে পারছি না। ইয়টটা থেমে গেছে। এখানে নোঙর ফেলবে মনে হয়।"

হঠাৎ করে শুশু এবং কিকি ভুশ করে তাদের কাছাকাছি ভেসে উঠল। দুটি ডলফিনই উত্তেজিত গলায় কিছু একটা বলতে থাকে, তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। নিহন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে শুশু?"

"আসছে। আসছে।"

নিহন অবাক হয়ে বলল, "কী আসছে?"

"এক দুই তিন চার।"

"চারজন?"

শুশু এবং কিকি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। চারজন আসছে।"

নিহন এবার ভালো করে তাকাল এবং দেখতে পেল বহু দূর থেকে চারটি কালো বিন্দুর মতো কিছু একটা সমুদ্রের পানিতে ফেনা তুলে ছুটে আসছে।

নাইনা জিজ্ঞেস করল, "ওগুলো কী?"

"জানি না। মনে হয় কোনো ধরনের জলযান। সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে।"

"কোথায় আসছে?"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "জানি না। আমার মনে হয় আমাদের সরে যাওয়া উচিত।"

নাইনা একটু অনুনয় করে বলল, "একটু দেখি। আমি কখনো স্থলমানব দেখি নি।"

"তোমার ডলফিনের উপর উঠে বস। যদি পালাতে হয় যেন দেরি না হয়।"

নাইনা কিকির উপর উঠে বসে। কিকি পানির উপরে একবার লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে চাইল, কিন্তু নাইনা অনেক কষ্ট করে তাকে শান্ত করে রাখল।

নাইনা এবং নিহন একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এবং দেখতে দেখতে চারজন স্থলমানব চারটা সাগর-স্কুটারে করে তাদের খুব কাছাকাছি চলে এল। নাইনা ফিসফিস করে নিহনকে বলল, "দেখেছ, দুজন ছেলে, দুজন মেয়ে!"

"হ্যাঁ।"

নাইনা উত্তেজিত গলায় বলল, "কী সুন্দর পোশাক দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"ওদের হাতে কালো মতন ওটা কী?"

নিহন বলল, "আমি জানি না।"

নাইনা বলল, "দেখেছ ওরা কালো মতন জিনিসটা হাতে তুলে নিচ্ছে!"

"হ্যাঁ।"

"ওরা চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে কেন?"

নিহন বলল, "ওরা আমাদের ঘিরে ফেলতে চেষ্টা করছে!"

"কেন? ওরা কেন আমাদের ঘিরে ফেলতে চাইছে?"

হঠাৎ করে নিহনের কাছে পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়, সে ভয়ার্ত মুখে নাইনার দিকে তাকিয়ে বলল, "সর্বনাশ নাইনা! সর্বনাশ!"

'কী হয়েছে?"

"এই মানুষগুলো আমাদের মারতে আসছে।"

নাইনা চমকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ।" নিহন লাফিয়ে শুশুর উপর উঠে বলল, "পালাও! নাইনা, পালাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তেজনায় শুশু নিহনকে নিয়ে পানি থেকে লাফিয়ে উঠে গেল এবং ঠিক তখন তারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের কর্কশ গুলির শব্দ শুনতে পেল। শিসের মতো শব্দ করে গুলিগুলো তাদের কানের কাছ দিয়ে ছুটে যায়। নিহন আতঙ্কিত চোখে নাইনার দিকে তাকাল, কিকির পিঠে বসে সে ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে। পানি থেকে ভেসে উঠে সে আবার ডুবে গেল, আবার ভেসে উঠে আবার ডুবে গেল।

স্থলমানব চারজন তাদের সাগর-স্কুটার নিয়ে ছুটে যাচ্ছে, চলন্ত স্কুটার থেকে গুলি করা সহজ নয়, এক হাতে হ্যান্ডেলটা ধরে রেখে অন্য হাতে গুলি করতে হয়। গুলিগুলো তাই বেশিরভাগই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিহন শুশুকে ধরে ফিসফিস করে বলল, "সোজা যাও শুশু।"

"ভয়। শুশু ভয়।"

"কোনো ভয় নেই। আমি আছি।"

"তুমি আছ?"

"হ্যাঁ"

নাইনার পিছু পিছু দুজন স্থলমানব ছুটে যাচ্ছে, নিহন শুশুকে নিয়ে তাদের পিছু ছুটে যেতে থাকে। সাগর-স্কুটারের গতি খুব বেশি, ডলফিনকে নিয়ে সেটাকে ধরে ফেলা সম্ভব নয়। নিহন তবু চেষ্টা করল। স্কুটারে প্রপেলর থাকে—ধারালো প্রপেলর সেখানে লাগলে সে কিংবা শুশু জখম হয়ে যাবে, তাই খুব সাবধানে থাকতে হবে।

নিহন দেখল একজন স্থলমানব হাতের অস্ত্রটা ওপরে তুলেছে, গুলি করবে। নাইনাকে দেখা যাচ্ছে তার রক্তহীন, ফ্যাকাসে ভয়ার্ত মুখ। তার ডলফিনটাও অনভিজ্ঞ, কী করবে বুঝতে পারছে না, হঠাৎ করে পানি থেকে লাফিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। স্থলমানবটা ট্রিগার টেনে ধরতেই কান ফাটানো শব্দে গুলি বের হতে থাকে—নিহন তখন শুশুকে নিয়ে স্কুটারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, হ্যাঁচকা টান দিয়ে সে তার হাতের অস্ত্রটা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করল। স্থলমানবটা এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তাল হারিয়ে সে পানিতে পড়ে যায়, নিয়ন্ত্রণহীন স্কুটারটা সমুদ্রের পানিতে গর্জন করে দুবার ঘুরপাক খেয়ে নিশ্চল হয়ে যায়। স্থলমানবটি পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, অন্য একজন তখন তাকে সাহায্য করতে তার কাছে ছুটে আসতে থাকে।

নিহনের দিকে অন্য একজন স্থলমানব ছুটে আসছে—একটি মেয়ে, হাতের উদ্যত অস্ত্র তার দিকে তাক করে রেখেছে, চোখের দৃষ্টি কী ভয়ঙ্কর! নিহন সেই মেয়েটির দৃষ্টি দেখে হতবাক হয়ে যায়, এটি কি ক্রোধ, জিঘাংসা, নাকি ঘৃণা? সে কী করেছে? এই মেয়েটি কেন তাকে হত্যা করতে চায়? কেন তার জন্য এই ঘৃণা?

কানের কাছ দিয়ে গুলি ছুটে যেতে শুরু করেছে, নিহন শুশুকে নিয়ে লাফ দিয়ে মেয়েটির ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ, সাগর-স্কুটারের ইঞ্জিনের কান ফাটানো গর্জন, পানির ঝাপটা তার মধ্যে হঠাৎ নিহন নাইনার আর্তচিৎকার শুনতে পায়। নাইনা কি গুলি খেয়েছে? এখন তা হলে কী হবে?

নিহন শুশুর পিঠে থাবা দিয়ে চিৎকার করে বলল, "শুশু, নাইনার কাছে যাও।"

"যাই। নিহন যাই।"

পানির নিচে ডুব দিয়ে শুশু নিহনকে নাইনার কাছে নিয়ে যায়, কাছাকাছি যাওয়ার আগেই সে পানির মধ্যে রক্তের গন্ধ পেল। নাইনা বিস্ফারিত চোখে কিকির দিকে তাকিয়ে আছে। নাইনা নয়, নাইনার ডলফিন কিকির শরীর গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। নিহন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "নাইনা! কী হয়েছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কিকি! আমার কিকি!"

"ছেড়ে দাও কিকিকে। ছেড়ে দাও।"

নাইনা অবুঝের মতো বলল, "না। আমি ছাড়ব না। আমার কিকি মরে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে আমার কিকি।"

নিহন ধমক দিয়ে বলল, "ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও কিকিকে, তুমি তা না হলে বাঁচতে পারবে না।"

নিহন হাত বাড়িয়ে নাইনাকে কাছে টেনে আনে, সঙ্গে সঙ্গে কিকি পানিতে ডুবে যেতে থাকে। এখন তারা দুজন মানুষ এবং একটা ডলফিন। তাদের বিরুদ্ধে চারজন মানুষ, তাদের কাছে আছে শক্তিশালী সাগর–স্কুটার, আছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। এই স্থলমানবদের সঙ্গে তারা কেমন করে পারবে? নিহন জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দেয়। কী হবে সে জানে না, কিন্তু যেভাবেই হোক নাইনাকে রক্ষা করতে হবে। নাইনার মা বিশ্বাস করে তার সঙ্গে নাইনাকে পাঠিয়েছে। যেভাবে হোক তার নাইনাকে রক্ষা করতে হবে। করতেই হবে।

নিহন নাইনাকে ধরে রেখে বলল, "নাইনা তুমি শুশুকে নিয়ে পালাও।"

"আর তুমি?"

"আমি পরে আসছি।"

"কীভাবে আসবে?"

নিহন অধৈর্য হয়ে বলল, "আমি তার ব্যবস্থা করব। তুমি এখন পালাও।"

নিহন নাইনাকে শুশুর পিঠে বসিয়ে তার শরীরে ধাক্কা দিয়ে বলল, "যাও। শুশু যাও।"

শুশু মাথা ঘুরিয়ে বলল, "তুমি?"

"আমি পরে যাব।"

"মানুষ খারাপ।"

"হ্যাঁ।" নিহন মাথা নাড়ল, "মানুষগুলো খারাপ। দেরি কোরো না, পালাও।"

শুভ নাইনাকে নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিহন এখন একা পানিতে ভেসে আছে। যে মানুষটি পানিতে পড়ে গিয়েছিল সে আবার তার সাগর–স্কুটারে উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্য সবাই এখন এগিয়ে আসছে। নিহন বুকভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে পানিতে ডুবে যায়। ডুবসাঁতার দিয়ে সে পানির নিচে দিয়ে যেতে থাকে, ওপর দিয়ে সাগর–স্কুটারগুলো যাচ্ছে। শক্তিশালী প্রপেলরে পানি কেটে যাওয়ার সময় বাতাসের বুদ্বুদে ওপরটুকু ঢেকে যাচ্ছে। ইঞ্জিনের গর্জনে পানি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

নিহন পানির নিচে অপেক্ষা করে, ঠিক মাথার ওপর দিয়ে একটা সাগর–স্কুটার যাবার সময় সে লাফিয়ে নিচে থেকে সেটাকে ধরে ফেলে। স্কুটারটা সঙ্গে সঙ্গে কাত হয়ে যায়, নিহন টান দিয়ে নিজের শরীরটা স্কুটারের ওপরে তুলে নেয়। সাগর–স্কুটারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা হতচকিত হয়ে নিহনের দিকে তাকিয়ে আছে, নিহন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্কুটারের নিয়ন্ত্রণটা নেওয়ার চেষ্টা করল। লাভ হল না, স্কুটারটা কাত হয়ে পানিতে পড়ে গেল। মানুষটা স্কুটার ধরার চেষ্টা করল, পারল না, হাত থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটা পড়ে গেছে পানিতে, ডুবে গেছে সাথে সাথে। নিহন মানুষটিকে নিয়ে পানিতে পড়ে যায়—মানুষটির শরীরে লাইফ জ্যাকেট তাই ভেসে উঠছিল, কিন্তু নিহন তাকে টেনে পানির নিচে নিয়ে যায়!

মানুষটি পানির নিচে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, চোখেমুখে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক এসে ভর করেছে। নিহন দেখতে পায় তার নাক–মুখ দিয়ে কিছু বাতাসের বুদ্বুদ বের হয়ে আসছে। নিহন একবার নিঃশ্বাস নিয়ে যেরকম দীর্ঘ সময় পানির নিচে থাকতে পারে এই মানুষটি সেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মানুষটি ছটফট করছে বাতাসের জন্য, তার বুকটা মনে হয় ফেটে যাবে! নিহন এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে এই অসহায় মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে—ইচ্ছে করলেই সে তাকে মেরে ফেলতে পারে। তাকে কি সে মেরে ফেলবে? এই নিষ্ঠুর মানুষটিকে কি মেরে ফেলাই উচিত না?

কিন্তু নিহন মানুষটিকে মারল না, শেষ মুহূর্তে তাকে ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিতেই মানুষটি প্রাণপণে উপরে উঠে গিয়ে বুকভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। গলা দিয়ে পানি ঢুকে যায় আর সে খকখক করে কাশতে থাকে। নিহন নিজেও ধীরে ধীরে উপরে ভেসে আসে। অন্য স্থলমানবগুলো তাকে ঘিরে ফেলছে। সে তাকিয়ে থাকে, দেখে আরো বেশ কয়েকটি সাগর-স্কুটার আসছে। সেখানে আরো মানুষ, তাদের হাতে আরো অস্ত্র।

নিহন এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করে। হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল সে এই স্থলমানবদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। যে কোনো মুহূর্তে একঝাঁক গুলি এসে তাকে ঝাঁজরা করে দেবে। তার সময় শেষ হয়ে এসেছে।

নিহন তবুও সাবধানে বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দেয়। নাইনাকে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে। নাইনার মাকে কথা দিয়েছিল পাগলী মেয়েটিকে দেখে রাখবে, সে সেই কথা রেখেছে।

নিহন পানিতে ভেসে ভেসে একঝাঁক গুলির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

৬

AMARBOI.COM

মাজুর বলল, "আমি এটাকে নিজের হাতে হত্যা করতে চাই।"

মাজুর যাকে নিজের হাতে হত্যা করতে চাইছে সেই নিহনকে ইয়টের ডেকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। একজন মানুষকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখার মধ্যে এক ধরনের অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা রয়েছে, যদিও এখানে কেউই সেই নিষ্ঠুরতাটুকু ধরতে পারছে না।

মাজুর তার হাতের অস্ত্রটি হাত বদল করে বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করতে দেবে। দেবে না?"

দ্রীমান জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন একে হত্যা করতে চাইছ?"

মাজুর একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "কেন চাইব না? আমরা কি জলমানব শিকার করতে আসি নি?"

"কিন্তু শিকার করার জন্য প্রাণীটাকে মুক্ত থাকতে হয়।" দ্রীমান গম্ভীর গলায় ব্যাখ্যা করল, "বেঁধে রাখা প্রাণীকে শিকার করলে সেটা তো খুন করা হয়ে যায়।"

"মানুষকে হত্যা করলে সেটা খুন হয়।" মাজুর নিহনকে দেখিয়ে বলল, "এটা তো মানুষ নয়।"

দ্রীমান বলল, "আমার কাছে তো বেশ মানুষের মতোই মনে হচ্ছে।"

মাজুর রেগে গিয়ে বলল, "মানুষের মতো দেখালেই একজন মানুষ হয়ে যায় না।"

"তা হলে কখন মানুষ হয়?"

"যখন ক্রোমোজমে নির্দিষ্ট জিনসগুলো পাওয়া যায় তখন তাকে বলে মানুষ।"

দ্রীমান জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এই মানুষটির জিনসগুলো পরীক্ষা করে দেখেছ?"

"কী বলছ তুমি আবোল-তাবোল?" মাজুর রেগে গিয়ে নিজের অস্ত্রটি হাতে নিয়ে বলল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি তোমাদের কোনো কথা শুনব না। দশ হাজার ইউনিট খরচ করে আমি এসেছি জলমানব শিকার করতে! আমি অন্তত একটা জলমানব শিকার না করে যাব না।"

কাটুস্কা এতক্ষণ চুপচাপ দুজনের কথা শুনছিল, এবার সে কথা বলল, মাজুরকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে তো শিকার করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সাগর-স্কুটারে করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে তুমি তো গিয়েছিলে শিকার করতে। যাও নি?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।"

"তা হলে তখন শিকার করলে না কেন?"

মাজুর থতমত খেয়ে বলল, "মানে তখন—"

কাটুস্কা হাসি গোপন করার চেষ্টা না করে বলল, "তখন শিকার করতে পার নি। সত্যি কথা বলতে কী আরেকটু হলে এই জলমানবটাই তোমাকে শিকার করে ফেলত, মনে আছে? তোমাকে সে টেনে পানির ভেতর নিয়ে যায় নি? যদি তোমাকে ছেড়ে না দিত তা হলে কি তুমি এতক্ষণে পেট ফুলে পানিতে মরে ভেসে থাকতে না?"

মাজুর মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ, কাটুস্কা?"

"আমি বলতে চাইছি, এই জলমানবের কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকার কথা যে সে তোমাকে মারে নি। তোমাকে মেরে ফেলার তার যথেষ্ট কারণ ছিল।"

মাজুরের মুখে কুটিল এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, সে হাসিটাকে তার মুখে আরো বিস্তৃত হতে দিয়ে বলল, "এই জলমানব তার সুযোগ পেয়েছিল, সুযোগটা সে ব্যবহার করতে পারে নি। এখন আমি আমার সুযোগ পেয়েছি, আমি আমার সুযোগটা ব্যবহার করব।"

কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

মাজুর অবাক হয়ে বলল, "না?"

"হ্যাঁ, তুমি একে মারতে পারবে না।"

"কেন পারব না?"

কাটুস্কা বলল, "কারণ আমি আমার জীবনে এর চাইতে সুন্দর কোনো মানুষ দেখি নি। তুমি তাকিয়ে দেখ, এর মুখমণ্ডল কী অপূর্ব! খাড়া নাক, বড় বড় কালো চোখ। উঁচু চিবুক। মাথা ভরা কুচকুচে কালো চুল—দেখ, সেটা ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে! এর শরীরটা দেখে মনে হয় কেউ যেন গ্রানাইট পাথর খোদাই করে তৈরি করেছে। শরীরে এক ফোঁটা মেদ নেই। দেখ, বুকটা কত চওড়া, শরীরে কী চমৎকার মাংসপেশি! তাকিয়ে দেখ, এর শরীরের ভেতর কী পরিমাণ শক্তি লুকিয়ে আছে। দেখে মনে হয় যেন সে একটা চিতাবাঘের মতো, যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে? তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখ মাজুর, তার হাতের আঙুলগুলো দেখ, লম্বা সুচালো, যেন একজন শিল্পীর হাত। দেখ, তার পা কত দীর্ঘ! তার কোমরটা দেখ, কেমন সরু হয়ে এসেছে। এই জলমানবটা একচিলতে কাপড় পরে আছে—দেখে কি মনে হচ্ছে না যার দেহ এত অপূর্ব তার এই একচিলতে কাপড়ই যথেষ্ট! তার এর চাইতে বেশি কাপড় পরে থাকা ঠিক নয়, তা হলে তার এই অসাধারণ সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে যাবে। তাই কি মনে হয় না?"

মাজুর হকচকিত হয়ে কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে রইল। ইতস্তত করে বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ, কাটুস্কা?"

"আমি বলতে চাইছি, গ্রিক দেবতা থেকেও সুন্দর এই জলমানবের পাশে তোমাকে দেখাচ্ছে একটা কৌতুকের মতন! তুমি আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ মাজুর, ফোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ, ঢুলঢুলু লাল চোখ! শুকনো দড়ির মতো লাল চুল। ঢিলেঢালা থলথলে শরীর। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার মুখ রাগে–ঘৃণায় বিকৃত হয়ে আছে। অথচ এই জলমানবটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, সেখানে শিশুর মতো এক ধরনের নিষ্পাপ সারল্য—"

মাজুর হিশহিশ করে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ, কাটুস্কা?"

"আমি বলছি তুমি এই জলমানবকে হত্যা করতে পারবে না। তোমার মতন একজন অসুন্দর মানুষকে আমি এই অপূর্ব মানুষটিকে হত্যা করতে দেব না।"

"তুমি তাই মনে কর?"

কাটুস্কা তার মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি।"

"তুমি দেখতে চাও আমি একে হত্যা করতে পারি কি না?"

"আমার সাথে হম্বিতম্বি করার কোনো প্রয়োজন নেই, মাজুর। তুমি জান আমার বাবা নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান। আমি স্যাটেলাইট ফোনে বাবাকে একটু বলে দিলেই এখানে দুটো হেলিকপ্টার চলে আসবে। আমি তোমার প্রতি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেই তারা তোমাকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যাবে।"

মাজুরের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, সে নিচু গলায় বলে, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"আমি বলছি তোমার নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে আমাকে বিরক্ত না করা।"

"তু–তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চাইছ?"

"এমনিতেই যদি আমার কথা শুনতে তা হলে আমার ভয় দেখানোর প্রয়োজন হত না মাজুর।"

কাটুস্কা মাজুরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে যায়। সে চোখের পানি মুছে বলল, "মাজুর, তুমি এখন সরে যাও।"

AMARBOI.COM

"কেন?"

"আমি এখন এই জলমানবটার সঙ্গে কথা বলব?"

"কী বলছ তুমি, কাটুস্কা! তুমি জান এরা কত ভয়ঙ্কর? কত নিষ্ঠুর?"

"আমার কাছে মোটেও ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না। মোটেও নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে না। বরং কী মনে হচ্ছে জান?"

"কী?"

"মনে হচ্ছে তুমি এর চেয়ে এক শ গুণ বেশি নিষ্ঠুর। এক শ গুণ বেশি ভয়ঙ্কর।"

মাজুর হকচকিতের মতো কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে রইল।

পায়ের শব্দ শুনে নিহন মাথা ঘুরিয়ে তাকাল—ঠিক তার বয়সী একটা মেয়ে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। একটু আগে এই মেয়েটিও অন্যদের নিয়ে তাকে আর নাইনাকে গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কী ভয়ঙ্কর ছিল তার দৃষ্টি, চোখেমুখে কী আশ্চর্য রকম নিষ্ঠুরতা খেলা করছিল। এখন মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে একেবারেই কোমল স্বভাবের মেয়ে। চোখের দৃষ্টি নরম, ঠোঁটের কোনায় এক ধরনের হাসি। একটা মানুষ কেমন করে এক সময় এত ভয়ঙ্কর হতে পারে, আবার অন্য সময় এত কোমল চেহারার হতে পারে নিহন বুঝতে পারল না।

মেয়েটি কিছু একটা বলল, নিহন তার কথা ঠিক বুঝতে পারল না। ভাষাটি তাদের ভাষার মতোই তবে কথা বলার সুরটি অন্য রকম। নিহন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাতেই মেয়েটি আবার কথা বলল। এবার নিহন কথাটি বুঝতে পারে, মেয়েটি বলছে, "তোমার নাম কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহন নামটি বলতে গিয়ে থেমে যায়, কেন এই মেয়েটিকে তার নাম বলতে হবে? একটা পশুকে মানুষ যেভাবে বেঁধে রাখে ঠিক সেভাবে শেকল দিয়ে তাকে বেঁধে রেখেছে, অথচ তার সঙ্গে মেয়েটা কথা বলছে খুব স্বাভাবিক একটা ভঙ্গিতে।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ?"

"হ্যাঁ।" নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝতে পারছি।"

মেয়েটি এবার হেসে ফেলে বলে, "তুমি কী বিচিত্রভাবে কথা বল!"

নিহন কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি বলল, "আমার নাম কাটুস্কা।"

নিহন এবারও কোনো কথা বলল না। মেয়েটি বলল, "একজন যখন তার নাম বলে তখন অন্যজনকেও তার নাম বলতে হয়।"

নিহন বলল, "একজন যখন গুলি করে তখন কি অন্যজনকেও গুলি করতে হয়?"

নিহনের কথাটা বুঝতে কাটুস্কা নামের মেয়েটির একটু সময় লাগল, যখন বুঝতে পারল তখন হঠাৎ করে তার মুখটি একটু বিবর্ণ হয়ে যায়। কাটুস্কা এক পা এগিয়ে এসে বলল, "আমি খুব দুঃখিত। আমি–আমি–আমি ভেবেছিলাম—"

"কী ভেবেছিলে?"

"আমি ভেবেছিলাম তোমরা অন্য রকম।"

"সেজন্য তোমরা আমাদের গুলি করে মারতে চাইছিলে?"

কাটুস্কা নিঃশব্দে নিহনের দিকে তাকিয়ে রইল। নিহন বলল, "তোমরা দেরি করছ কেন? কখন মারবে আমাকে?"

"আসলে—"

"আসলে কী?"

"এই পুরো ব্যাপারটা আসলে একটা খুব বড় ভুল।"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "না। এটা ভুল না। আমি জানি আমাদের গুলি করে মারা তোমাদের জন্য এক ধরনের খেলা। তোমরা সেই খেলা খেলতে এসেছ।"

কাটুস্কা কোনো কথা বলল না। তার মুখটি আবার বিবর্ণ হয়ে যায়। নিহন বলল, "তোমরা খেলা শেষ করবে না?"

কাটুস্কা মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমরা খেলা শেষ করব না।"

নিহন একটু অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। বলল, "সত্যি তোমরা খেলা শেষ করবে না?"

কাটুস্কা মাথা নাড়ল। বলল, "না।"

"কেন না?"

"অনেকগুলো কারণ আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে—" কাটুস্কা হঠাৎ থেমে যায়।

নিহন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কাটুস্কার দিকে তাকাল। কাটুস্কা একটু হেসে বলল, "কারণটা হচ্ছে আমি আমার জীবনে তোমার মতো সুন্দর কোনো মানুষ দেখি নাই! এত সুন্দর একজন মানুষকে কিছু করা যায় না।"

নিহন এ ধরনের একটা কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে থতমত খেয়ে বলল, "আমি সুন্দর মানুষ না। আমাদের দ্বীপে আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর মানুষ আছে।"

"থাকতে পারে। কিন্তু আমি তোমার মতো সুন্দর মানুষ আগে কখনো দেখি নাই।"

নিহন কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "তুমিও অনেক সুন্দর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটুস্কা খিলখিল করে হেসে বলল, "আমার সঙ্গে তোমার ভদ্রতা করতে হবে না। আমি কী রকম আমি জানি।"

নিহন কী বলবে বুঝতে না পেরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। কাটুস্কা বলল, "আজকে আমরা যেটা করেছি সেটা খুব বড় একটা নির্বুদ্ধিতা ছিল।"

"এখন তা হলে কী করবে?"

"তোমাকে চলে যেতে দেব।"

নিহন অবাক হয়ে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

নিহন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি বিশ্বাস করি না।"

"তুমি বিশ্বাস কর না?"

"না।"

"কেন বিশ্বাস কর না?"

"আমরা পানিতে থাকি। সমুদ্রের পানিতে কিছু ভয়ঙ্কর প্রাণী থাকে, নৃশংস আর হিংস্র। কিন্তু আমরা জানি স্থলমানবেরা তার চেয়েও বেশি নৃশংস আর হিংস্র।"

কাটুস্কা অবাক হয়ে নিহনের দিকে তাকিয়ে রইল। নিহন বলল, "আমরা জানি কোনো টাইফুন আমাদের নিশ্চিহ্ন করবে না। যদি আমাদের কখনো কেউ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সেটা হবে তোমরা। স্থলমানবেরা।"

কাটুস্কার মুখে হঠাৎ বেদনার একটা ছায়া পড়ল। সে তার ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখে বলল, "এটা সত্যি নয়। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে তোমার নিজের এলাকায় যেতে দেব! দেবই দেব।"

কাটুস্কা একটু সরে গিয়ে তার যোগাযোগ মডিউলটা বের করে তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করল, ছোট স্ক্রিনে বাবার ছবিটা ফুটে উঠতেই তার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা।"

"কী হল, কাটুস্কা! তোমাদের সমুদ্রের অ্যাডভেঞ্চার কেমন হচ্ছে?"

"আমি যে রকম ভেবেছিলাম সে রকম না।"

"কেন, কাটুস্কা?"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাটুস্কা বলল, "আমি ভেবেছিলাম জলমানবেরা হবে মানুষের অপভ্রংশ। তারা দেখতে হবে ভয়ঙ্কর। বীভৎস। হিংস্র।"

"তারা তা হলে কী রকম?"

"তারা অপূর্ব সুন্দর, বাবা। তারা গ্রিক দেবতা থেকেও সুন্দর।"

কাটুস্কার বাবা প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওন কোনো কথা না বলে শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ করল। কাটুস্কা বলল, "জলমানবকে শিকার করা সম্ভব না।"

"ঠিক আছে। তা হলে চলে এস।"

"একটা ব্যাপার ঘটেছে, বাবা।"

"কী ঘটেছে!"

"আমরা সবাই মিলে একটা জলমানব ধরেছি।"

"কী বললে?" রিওন অবিশ্বাসের গলায় বলল, "জলমানবকে ধরেছ? জ্যান্ত ধরেছ?"

"হ্যাঁ, বাবা। এখন আমি তাকে ছেড়ে দিতে চাই।"

"ছেড়ে দিতে চাও?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, বাবা। তুমি যেভাবে হোক তার ব্যবস্থা করে দাও।"

রিওন এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল, বলল, "তুমি কেন তাকে ছেড়ে দিতে চাও?"

"কারণ আমি তাকে কথা দিয়েছি। সে আমার কথা বিশ্বাস করে নাই। আমি তাকে দেখাতে চাই আমরা সত্যি কথা বলি।"

"ও আচ্ছা!" রিওন আস্তে আস্তে বলল, "তুমি জলমানবের সঙ্গে কথাও বলেছ?"

"হ্যাঁ, বাবা। জলমানবটি খুব শান্ত। খুব চমৎকার।"

রিওন আবার বলল, "ও আচ্ছা।"

"তুমি তাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর।"

"ঠিক আছে। আমি একটা হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছি। হেলিকপ্টারে করে জলমানবটাকে তার এলাকায় নামিয়ে দিয়ে আসবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

"বাবা, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব—"

"পাগলী মেয়ে, বাবাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কী আছে।"

"বিদায়, বাবা!"

"বিদায়! সমুদ্রভ্রমণ উপভোগ কর।"

কাটুস্কা তার যোগাযোগ মডিউলটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে নিহনের দিকে এগিয়ে বলল, "আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি।"

"কী ব্যবস্থা?"

"তোমাকে তোমার এলাকায় নামিয়ে দিয়ে আসবে।"

নিহন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে?"

"হেলিকপ্টারে করে?"

"হেলিকপ্টারে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কেমন করে হেলিকপ্টার আনবে।"

"আমার বাবা প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান। আমার বাবার অনেক ক্ষমতা।"

"ও।"

"তুমি এখন আমার কথা বিশ্বাস করেছ?"

নিহন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, "হ্যাঁ, বিশ্বাস করেছি।"

"চমৎকার!" কাটুস্কা একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "তোমাকে এভাবে ধরে এনে আমার খুব খারাপ লাগছিল। তোমাকে তোমার এলাকায় ছেড়ে দিয়ে আসব ভেবে আমার এখন একটু ভালো লাগছে।"

নিহন নিজেও এবার একটু হাসার চেষ্টা করল। কাটুস্কা বলল, "তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি তোমার শেকলটা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।"

কাটুস্কা চলে যেতে যেতে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি খিদে পেয়েছে? তুমি কি কিছু খেতে চাও? কোনো পানীয়?"

"না, কাটুস্কা। ধন্যবাদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটুস্কা চলে যাচ্ছিল, নিহন তাকে ডাকল, "কাটুস্কা।"

'বল।"

"তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলে। আমার নাম নিহন।"

কাটুস্কা তার হাতটি নিহনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "নিহন, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।"

নিহন কাটুস্কার হাতটা স্পর্শ করে বলল, "আমিও খুব খুশি হলাম, কাটুস্কা।"

হেলিকপ্টারটি বেশ বড়, ইয়টের ডেকে সেটি নামতে পারল না। ইয়টের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নাইলন কর্ডের একটা মই নামিয়ে দিল। নিহন মই বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মাঝখানে থেমে নিচে তাকাল, ইয়টের ডেকে বেশ কয়জন দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে কাটুস্কাও আছে। নিহনকে তাকাতে দেখে কাটুস্কা হাত নাড়ল। নিহনও প্রত্যুত্তরে তার হাত নাড়ল।

হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে একজন মাথা বের করেছিল। সে নিহনকে তাড়া দিয়ে বলল, "দেরি কোরো না। চট করে উঠে এস।"

নিহন দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসে। ভেতরে পাশাপাশি কয়েকটা বসার জায়গা, একজন নিহনকে তার একটাতে বসার ইঙ্গিত করল। নিহন বসার সঙ্গে সঙ্গেই হেলিকপ্টারটা গর্জন করে উপরে উঠে যেতে শুরু করে। নিহন জানালা দিয়ে দেখতে পায় কাটুস্কা এখনো হাত নাড়ছে। নিহন জানালা দিয়ে এই অন্য রকম মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই মায়াবতী মেয়েটির সাথে তার আর কোনো দিন দেখা হবে না।

হেলিকপ্টারের ভেতর একজন মানুষ নিহনের দিকে এগিয়ে আসে, হাতে একটা গ্লাস, গ্লাসে স্বচ্ছ এক ধরনের পানীয়। মানুষটা গ্লাসটি নিহনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও। খাও।"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "আমি কিছু খেতে চাই না।"

"তবু খাওয়া উচিত। তোমার শরীরে পানীয়ের অভাব হয়েছে, ছেলে।"

নিহন হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিজের কাছে নিয়ে এসে চুমুক দিল, ঝাঁজালো এক ধরনের স্বাদ। নিহন কয়েক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে খালি গ্লাসটি মানুষটার হাতে ফিরিয়ে দেয়।

নিহন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, সমুদ্রের নীল পানির ওপর দিয়ে হেলিকপ্টারটা ছুটে যাচ্ছে। সে কখনো কি ভেবেছিল যে সে একটা হেলিকপ্টারে উঠবে? সত্যিকারের হেলিকপ্টার, যেটা আকাশে উড়তে পারে? কী আশ্চর্য! নিহন নিজের ভেতরে এক ধরনের শিহরণ অনুভব করে।

নিহন হেলিকপ্টারের ভেতরে তাকাল, বড় হেলিকপ্টারের ভেতরে অনেকখানি খোলা জায়গা, সুদৃশ্য কয়েকটা চেয়ার এবং ধবধবে সাদা টেবিল। দেয়ালে যন্ত্রপাতির একটা প্যানেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিহন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হেলিকপ্টারটি উত্তর দিকে যাওয়ার কথা, এখন যাচ্ছে পূর্ব দিকে।

নিহন ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে তোমরা কোথায় নামাবে? তোমরা পূর্ব দিকে যাচ্ছ কেন?"

মানুষটা কোনো কথা বলল না, তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নিহন আবার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় নামাবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটির মুখে এবার মৃদু হাসি ফুটে ওঠে, সে আস্তে আস্তে বলে, "তোমাকে কোথাও নামানো হবে না, ছেলে!"

নিহন চমকে উঠল, বলল, 'নামানো হবে না?"

"না। তোমাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি।"

"কিন্তু কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কাট্রস্কা নামের ওই মেয়েটি যে বলেছিল আমাকে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।"

মানুষটা বলল, "কাট্রস্কা তা-ই জানে।"

"তোমরা ওই মেয়েটিকে মিথ্যা কথা বলেছ?"

মানুষটা শব্দ করে হাসল, "যার সঙ্গে যেরকম কথা বলার প্রয়োজন তা-ই বলতে হয়। কাউকে বলতে হয় সত্যি কথা। কাউকে বলতে হয় মিথ্যা কথা। আর কাউকে বলতে হয় সত্য আর মিথ্যা মিশিয়ে।"

"তোমরা আমাকে নিয়ে কী করবে?"

"আমাদের জৈব ল্যাবে তোমাকে পরীক্ষা করা হবে।"

"কীভাবে পরীক্ষা করা হবে?"

"কাটাকুটি করে দেখবে মনে হয়—"

নিহন লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করে তার হাতে-পায়ে কোনো জোর নেই। সে উঠতে পারছে না। এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে সে মানুষটার দিকে তাকাল—মানুষটা আবার তার দিকে তাকিয়ে হাসে, ফিসফিস করে বলে, "নির্বোধ জলমানব, তোমার এখন ঘুমানোর কথা। তোমার পানীয়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। স্নায়ুগুলো কাজ করার কথা নয়—"

নিহন আবিষ্কার করল, সত্যি-সত্যি তার শরীরের সব স্নায়ু শিথিল হয়ে আছে। সে নড়তে পারছে না। নিহন ঘোলা চোখে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল, সে এখনো কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। ধীরে ধীরে তার চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে। নিহন ঠিক করে চিন্তা করতে পারছিল না। তার মনে হতে থাকে, কোনো কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না।

৭

খুব ধীরে ধীরে নিহনের জ্ঞান ফিরে আসে। তাকে একটা শক্ত টেবিলে শোয়ানো হয়েছে। তার হাত-পা এবং মাথা শক্ত করে বাঁধা, শরীরটুকু সে নাড়াতে পারছে না। তার আশপাশে কিছু মানুষ আছে, তারা নিচু গলায় কথা বলছে। নিহন চোখ না খুলে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করল। মোটা গলায় একজন বলল, "তুমি নিশ্চিত এই জলমানবের শরীরে কোনো ভাইরাস নাই।"

মেয়ে কণ্ঠে একজন উত্তর দিল, "না, নাই। সব পরীক্ষা করা হয়েছে। কোয়াকম্প রিপোর্ট দিয়েছে।"

"তুমি নিজে দেখেছ সেই রিপোর্ট?"

"হ্যাঁ, দেখেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি কোনো কিছু বিশ্বাস করি না। আমাদের এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লাগাবে কিন্তু সেজন্য আলাদা ইউনিট দেবে না এটা কেমন কথা?"

মেয়ে কণ্ঠ উত্তর দিল, "এটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ না। সত্যি কথা বলতে কী, ঝুঁকিটা এই জলমানবের। আমাদের এখানে এক শ দশ রকম ভাইরাস। নির্ঘাত এর অসুখ হবে। খারাপ রকমের একটা অসুখ হবে।"

মোটা কণ্ঠ উত্তর দিল, "কিন্তু এই জলমানব যদি আমাদের আক্রমণ করে? এর শরীরটা দেখেছ? একটুও বাড়তি মেদ নেই, পুরোটা শক্ত মাংসপেশি। এর গায়ে নিশ্চয়ই মোষের মতো জোর।"

"না, এই জলমানব আক্রমণ করবে না। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। যে ড্রাগ দেওয়া হয়েছে তার কারণে এত তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে আসার কথা না। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"তা ছাড়া জলমানব খুব নিরীহ প্রাণী। তাদের সমাজে কোনো ভায়োলেন্স নেই।"

মোটা গলার মানুষটি বলল, "ভায়োলেন্স নেই সেটা আবার কী রকম সমাজ?"

মেয়েটি বলল, "সমাজ নিয়ে কথা বলার অনেক সময় পাবে। এখন তাকে স্ক্যান করানো শুরু কর।"

"ঠিক আছে।"

নিহনের খুব ইচ্ছা করছিল চোখ খুলে দেখে, কিন্তু সে চোখ বন্ধ করে রইল। সে অনুভব করে তাকে কোনো একটা যন্ত্রের ভেতর দিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সে এক ধরনের অস্বস্তিকর উষ্ণতা এবং তীব্র কম্পন অনুভব করে।

মেয়ে কণ্ঠটি বলল, "দেখ দেখ, জলমানবের ফুসফুসটা দেখ। কত বড় দেখেছ?"

মোটা গলার মানুষটি বলল, "আমার দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কাজ করতে এসেছি, কাজ করে চলে যাব। যা দেখার সেটা দেখবে কোয়াকম্প, আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার।"

AMARBOI.COM

"সে তো দেখছেই। সে দেখতে চাইছে বলেই তো আমরা স্ক্যান করছি।"

মোটা গলার মানুষটা বলল, "আচ্ছা, শরীরে ভেতরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ রকম স্পষ্ট দেখা যায়—এই মেশিনটা কাজ করে কেমন করে জান?"

"উঁহু। আমাদের জানার কথা নয়, জানার প্রয়োজনও নাই। এই সব কোয়াকম্পের মাথাব্যথা।"

নিহন সাবধানে চোখের পাতা খুলে যারা কথা বলছে তাদের দেখার চেষ্টা করল, একজন মোটাসোটা মানুষ, আরেকজন হালকা পাতলা মহিলা। স্ক্যানিং মেশিন কেমন করে কাজ করে তারা জানে না। নিহন জানে, সে পড়েছে। এই মানুষগুলোর কিছুই জানার দরকার নেই, কারণ কোয়াকম্প নামে তাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার সবকিছু জানে। জলমানবদের জানার দরকার আছে, কারণ তাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার নেই। কোনটা ভালো?

নিহন শুনতে পায় পুরুষ মানুষ এবং মহিলাটি কথা বলতে বলতে একটু দূরে চলে যাচ্ছে, তখন সে খুব সাবধানে তার চোখ অল্প একটু খুলে দেখার চেষ্টা করল। যন্ত্রপাতি বোঝাই একটা ঘর, তার মাঝামাঝি একটা শক্ত ধাতব টেবিলে সে শুয়ে আছে। তার ওপর একটা বড় উজ্জ্বল আলো, সেদিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। চারপাশের যন্ত্রগুলোর দিকে সে লোভাতুর চোখে তাকাল, সে এগুলোর কথা পড়েছে, কখনো নিজের চোখে দেখবে ভাবে নি। এখন সে দেখছে। আহা, তারা যদি এরকম কিছু যন্ত্রপাতি পেত কী মজাই না হত!

নিহন হঠাৎ এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করে। স্ক্যান করার জন্য শরীরের ভেতরে তেজস্ক্রিয় দ্রবণ ঢুকিয়ে দিয়েছে, সেগুলো স্তিমিত হতে একটু সময় নেবে। ততক্ষণ তার বিশ্রাম নেওয়ার কথা। হয়তো সেজন্য ঘুমের ওষুধ দিয়েছে, আবার তার চোখে ঘুম নেমে আসে।

নিহনের ছাড়া-ছাড়াভাবে ঘুম হল, সমস্ত শরীর শক্ত করে বাঁধা, এর মাঝে সত্যিকার অর্থে ঘুমানো যায় না। ক্লান্ত হয়ে ছাড়া-ছাড়াভাবে চোখ বুজে আসে, বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে তখন। একটা বিশাল অক্টোপাস এসে তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে, তখন অক্টোপাসটি পরিষ্কার মানুষের গলায় বলল, "এদের বুদ্ধিমত্তা নিম্নশ্রেণীর।"

নিহনের ঘুম ভেঙে যায়, তার মাথার কাছে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, একজনের বড় বড় লাল চুল অন্যজনের চুল ছোট করে ছাঁটা। লাল চুলের মানুষটি বলল, "কেন বুদ্ধিমত্তা নিম্নশ্রেণীর হয়? এরা তো একসময় আমাদের মতো মানুষই ছিল।"

"বিবর্তন।"

"বিবর্তন?"

"হ্যাঁ, বিবর্তন যেরকম পজিটিভ হতে পারে, সেরকম নেগেটিভও হতে পারে। আমাদের বিবর্তন হচ্ছে পজিটিভ। যতই দিন যাচ্ছে আমরা আরো পূর্ণ মানুষ হচ্ছি, ভালো মানুষ হচ্ছি। এরা যাচ্ছে উল্টো দিকে।"

লাল চুলের মানুষটি বলল, "হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক। বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার না করলে সেটা কমে যায়। এদের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার সুযোগ নেই। জীবনের মান খুব নিচু। অনেকটা বন্য জন্তুর মতো। এদের সবকিছুই হচ্ছে সহজাত প্রবৃত্তি।"

কালো চুলের মানুষটি বলল, "হ্যাঁ, শরীরটা দেখলেই অনুমান করা যায়। দেখেছ এর শরীরে একটা জন্তু জন্তু ভাব আছে?"

"হ্যাঁ। খুব সাবধান! এরা নাকি আমাদের কথা মোটামুটি বুঝতে পারে। প্রথমেই একে বুঝিয়ে দেওয়া যাক আমরা কী করতে যাচ্ছি।"

লাল চুলের মানুষটা এবার নিহনের গায়ে ছোট একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই ছেলে। এই।"

নিহন চোখ খুলে তাকাল। লাল চুলের মানুষটা বলল, "তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?"

নিহন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, পারছি।"

"চমৎকার! আমরা তোমার কিছু জিনিস পরীক্ষা করব। তোমাকে সহযোগিতা করতে হবে। বুঝেছ?"

নিহন আবার মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

"সেটা পরীক্ষা করার জন্য তোমার হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দিতে হবে। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"কিন্তু হাত-পা খুলে দেওয়ার পর তুমি যেন আমাদের হঠাৎ করে আক্রমণ করে না বস—"

"আমি তোমাদের আক্রমণ করব না।"

"আমরা বিষয়টা নিশ্চিত করতে চাই। সেজন্য আমরা তোমার শরীরে একটা প্রোব লাগাব। তুমি যদি বিপজ্জনক কিছু কর তা হলে আমরা একটা সুইচ টিপে ধরব, তখন তুমি একটা ভয়ঙ্কর ইলেকট্রিক শক খাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহন কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটা বলল, "ইলেকট্রিক শক কথাটা তুমি হয়তো শোন নাই, তাই এই কথাটার অর্থ তুমি বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস কর, এটা ভয়ানক একটা জিনিস, একবার খেলে সারা জীবন মনে থাকবে।"

কালো চুলের মানুষটা এবার এগিয়ে আসে, নিহনের হাতে ছোট একটা স্ট্র্যাপ দিয়ে প্রোবটা বেঁধে দিয়ে বলল, "জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।"

হাতে ধরে রাখা একটা সুইচ টিপে ধরতেই নিহন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তচিৎকার করে উঠল। সমস্ত শরীর ভয়ঙ্কর ইলেকট্রিক শকে ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে। লাল চুলের মানুষটার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল, সে মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছ? এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক শক।"

নিহন মাথা নাড়ল, শুকনো গলায় বলল, "বুঝেছি।"

"কাজেই তুমি যদি উল্টাপাল্টা কোনো কাজ কর তা হলেই ঘ্যাচ করে এই সুইচ টিপে ধরব, সঙ্গে সঙ্গে তুমি ইলেকট্রিক শক খাবে। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"তাই তুমি কোনো উল্টাপাল্টা কাজ করবে না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

মানুষ দুজন তখন নিহনের বাঁধন খুলে দেয়, নিহন তার টেবিলে বসে চারদিকে ঘুরে তাকাল। নানারকম যন্ত্রপাতি গুঞ্জন করছে, সেগুলো দেখে নিহন মুগ্ধ হয়ে যায়। তার আবার মনে হয়, আহা! সে যদি এ রকম কয়েকটা যন্ত্র নিয়ে যেতে পারত তা হলে কী চমৎকারই না হত!

লাল চুলের মানুষটা বলল, "আমরা তোমার কিছু জিনিস পরীক্ষা করব। তুমি কীভাবে চিন্তা কর তার একটা ধারণা নেব। বুঝেছ?"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব, "তুমি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে। যদি প্রশ্ন বুঝতে না পার আমাদের জিজ্ঞেস কোরো।"

"করব।"

"খবরদার! অন্য কিছু করার চেষ্টা কোরো না।"

"না। করব না।"

লাল চুল এবং কালো চুলের মানুষ দুটি কিছু ধাতব ব্লক, বোর্ড, নানা ধরনের জ্যামিতিক আকারের নকশা বের করে নিহনের পরীক্ষা নেওয়া শুরু করল। নিহন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে, তারা তাদের ডলফিনগুলোর বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করার জন্য যে পরীক্ষা করে, এই পরীক্ষাটা অনেকটা সে রকম। মানুষ দুজন ধরেই নিয়েছে নিহনের বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত নিম্নস্তরের, প্রায় পশুর কাছাকাছি।

নিহন তাদের নিরাশ করল না। ঠিক কী কারণ জানা নেই, নিহনের মনে হল সে যদি এই মানুষ দুটোকে ধারণা দেয় যে আসলেই তার বুদ্ধিমত্তা নিম্নস্তরের তা হলে সেটা পরে কাজে লাগতে পারে। নিহন তাই খুব চিন্তাভাবনা করে পুরোপুরি নির্বোধের মতো আচরণ করতে শুরু করল।

মানুষ দুজন গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে ফিসফিস করে নিজেদের ভেতর কথা বলে। নিহন শুনল, লাল চুলের মানুষটি বলল, "এর মানসিক বয়স ছয় থেকে সাত বছরের কাছাকাছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালো চুলের মানুষটি বলল, 'দশ পর্যন্ত গুনতে পারে। যোগ কী তার ধারণা আছে। কিন্তু বিয়োগ করতে পারে না।"

"ভাষাও খুব দুর্বল। নিজেকে খুব ভালো করে প্রকাশ করতে পারে না।"

"কোথাও মনোযোগ দিতে পারে না—একটা জিনিস একটানা বেশি চিন্তা করতে পারে না।"

লাল চুলের মানুষটা বলল, "দেখেছ, কোয়াকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি মিলে গেছে।"

"হ্যাঁ। পুরোপুরি মিলে গেছে। জলমানবের এই প্রজাতি ধীরে ধীরে এক ধরনের জন্তুতে পরিণত হচ্ছে। এদের ভবিষ্যৎটুকু দেখতে খুব কৌতূহল হচ্ছে।"

"এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরা যেরকম আমাদের যে কোনো কাজের জন্য কোয়াকম্পকে ব্যবহার করতে পারি, তারা তো সেটা করতে পারে না।"

নিহন একটাও কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল। সে চোখেমুখে এক ধরনের ভাবলেশহীন ভঙ্গি ফুটিয়ে চোখের কোনা দিয়ে সবকিছু লক্ষ করে।

মানুষ দুজন কোয়াকম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের তথ্য পাঠাতে থাকে। কিছু রিপোর্ট পরীক্ষা করে এবং সবশেষে যোগাযোগ মডিউল দিয়ে কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলে।

নিহনকে কিছু খাবার দেওয়া হল। তার খিদে নেই, বিস্বাদ খাবার, তবু সে জোর করে খেয়ে নিল। তাকে একটা বাথরুম ব্যবহার করতে দেওয়া হল, সেখানে দীর্ঘসময় সে পানির ধারার নিচে দাঁড়িয়ে রইল। তার দৈনন্দিন জীবন কাটে পানির খুব কাছাকাছি—একা দীর্ঘসময় সে পানি থেকে দূরে থাকে নি। সে বুঝতে পারছিল তার পুরো শরীর পানির জন্য হাহাকার করছিল। পুরো শরীর পানিতে ভিজিয়ে সে যখন আগের ঘরটিতে ফিরে এল, মানুষ দুজন তাকে দেখে খুব অবাক হল। বলল, "তোমার শরীর ভিজে।"

AMARBOI.COM

"হ্যাঁ।"

"শরীর মুছে নাও।"

"না।" নিহন মাথা নাড়ল, "আমি ভেজাই থাকতে চাই।"

"কেন?"

"আমার ভেজা থাকতে ভালো লাগে।"

"কী আশ্চর্য!"

নিহন কোনো কথা বলল না। মানুষ দুজন একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল। লাল চুলের মানুষটা বলল, "আমাদের মনে হয় বিষয়টা কোয়াকম্পকে জানানো দরকার।"

"হ্যাঁ।" কালো চুলের মানুষটি মাথা নাড়ল, বলল, "জানানো দরকার।"

নিহন দেখল মানুষ দুজন ঘরের এক কোনায় গিয়ে কিছু যন্ত্রপাতির সামনে বসে কিছু একটা লিখতে থাকে। তারপর আবার নিহনের কাছে ফিরে আসে। লাল চুলের মানুষটা বলল, "তোমাকে আরো কিছু পরীক্ষা করতে হবে।"

নিহন কোনো কথা বলল না। লাল চুলের মানুষটা বলল, "পানির ভেতরে তুমি কেমন থাক, কী কর, কোয়াকম্প সেটা জানতে চায়।"

নিহন এবারো কোনো কথা বলল না। লাল চুলের মানুষটা বলল, "তোমাকে একটা বড় পানির ট্যাঙ্কে রাখা হবে, তোমার শরীরে নানা রকম মনিটর লাগানো হবে, তোমার রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ মাপা হবে—এটা হবে অনেক দীর্ঘ পরীক্ষা।"

নিহন একটা নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, "ঠিক আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘণ্টাখানেক পরে বড় একটা চৌবাচ্চায় পানির মধ্যে নিহনকে নামিয়ে দেওয়া হল। চারপাশে কয়েকজন মানুষ তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে থাকে। যখন তাকে পানির নিচে যেতে বলে, নিহন পানির নিচে চলে যায়। যখন তাকে ভেসে উঠতে বলে, তখন সে আবার ভেসে ওঠে। মনিটরে তার শরীরের তাপ, রক্তচাপ, রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ, হৃৎস্পন্দন এবং এ রকম অসংখ্য খুঁটিনাটি বিষয় মাপতে থাকে। যে মানুষগুলো পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিল, তারা কোয়াকম্পের জন্য তথ্য সংগ্রহ করছিল, তথ্যের মধ্যে বিস্ময়কর কোনো বিষয় আছে কি না সেটা আর বুঝতে পারছিল না। তথ্যগুলো যে বিস্ময়কর সেটা কোয়াকম্পের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল, কিন্তু এই অসাধারণ ক্ষমতাশালী কম্পিউটারটি অসাধারণ জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারলেও তার অবাক হওয়ার ক্ষমতা ছিল না।

৮

জরুরি একটা সভা বসেছে—কোয়াকম্পের অনুরোধেই এই জরুরি সভাটি ডাকা হয়েছে। সভাতে শারীরিকভাবে কেউ আসে নি, সবাই নিজের নিজের অফিসে বসেই সভায় হাজির হয়েছে। হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে সবারই মনে হচ্ছে তার চারপাশে অন্যরা বসে আছে। সভার শুরুতে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওন বলল, "তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের সভা শুরু করছি। আজকের সভায় তোমাদের অন্য সভার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার কোয়াকম্প সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকবে। আমাদের সঙ্গে সে যেন সহজভাবে কথা বলতে পারে সেজন্য আজকে তার ইন্টারফেসের সঙ্গে একটা কণ্ঠস্বর সিনথেসাইজার লাগানো হয়েছে।"

কৃত্রিম কালো টেবিল ঘিরে বসে থাকা সামাজিক দপ্তরের প্রধান, আইন বিভাগের প্রধান, শিক্ষা বিভাগের প্রধান, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। সব গুরুত্বপূর্ণ সভাতেই কোয়াকম্প উপস্থিত থাকে তবে সেটা হয় নীরব উপস্থিতি। সভার কথাবার্তাগুলো কোয়াকম্পের তথ্যভাণ্ডারে সরাসরি চলে যায়। সক্রিয়ভাবে কণ্ঠস্বর সিনথেসাইজারসহ কথা বলতে পারে এভাবে কোয়াকম্প খুব বেশি উপস্থিত থাকে না।

রিওন বলল, "কোয়াকম্প, তুমি কি সভার শুরুতে আমাদের উদ্দেশে কিছু বলতে চাও?"

কোয়াকম্পের ভাবলেশহীন শুষ্ক গলার স্বর শোনা গেল, "তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমাদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।"

রিওন বলল, "কোয়াকম্প, তোমার অনুরোধে আজকের এই সভাটি ডাকা হয়েছে। তুমি কি বলবে ঠিক কী নিয়ে আজ আলোচনা শুরু হবে?"

কোয়াকম্প বলল, "আমি আমাদের নূতন প্রজন্ম নিয়ে আলোচনা করতে চাই।"

"চমৎকার!" রিওন বলল, "আমরা আমাদের কিছু পরিসংখ্যান নিয়ে শুরু করছি। আমাদের তরুণ সমাজকে নিয়ে আমি খুব চিন্তিত। আমাদের শতকরা পনের ভাগ তরুণ-তরুণী আত্মহত্যা করছে। শতকরা তিরিশ ভাগ মাদকাসক্ত। শতকরা চল্লিশ ভাগ হতাশাগ্রস্ত। বলা যায়, মাত্র পনের ভাগ মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক। সেটাও খুব আশাব্যঞ্জক না। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরো অবস্থাটা আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা বিভাগের প্রধান বলল, "একটা সময় ছিল, লেখাপড়া এবং জ্ঞানচর্চার পুরো বিষয়টা ছিল খুব কঠিন। কোয়াকম্প আসার পর থেকে পুরো বিষয়টা এখন হয়েছে খুব সহজ। কিন্তু তারপরও তরুণ-তরুণীদের লেখাপড়ায় আগ্রহ নেই। তারা কিছু শিখতে চায় না। কিছু জানতে চায় না।"

সামাজিক দপ্তরের প্রধান কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কোয়াকম্প তাকে বাধা দিয়ে বলল, "মানুষের পরিসংখ্যান নিয়ে একটা ভীতি আছে। আমি কোয়ান্টাম কম্পিউটার হিসেবে তোমাদের আশ্বস্ত করতে চাই, পরিসংখ্যান নিয়ে তোমরা বিচলিত হয়ো না। তোমরা তোমাদের মূল লক্ষ্য এবং মূল উদ্দেশ্যটার দিকে নজর দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের দিকে তোমরা অগ্রসর হতে পারবে, তোমাদের ভয়ের কিছু নেই।"

রিওন ভুরু কুঁচকে বলল, "কিন্তু আমরা কি অগ্রসর হতে পারছি?"

কোয়াকম্প শুষ্ক স্বরে বলল, "পারছি। তোমাদের জীবনের মান আগের থেকে উন্নত হয়েছে। আমরা আমাদের শক্তির প্রয়োজন প্রায় মিটিয়ে ফেলেছি। শক্তির অভাব ঘুচিয়ে ফেলাই হচ্ছে মানবসভ্যতার সত্যিকারের লক্ষ্য। যদি অফুরন্ত শক্তি থাকে তা হলে আমরা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারব।"

সামাজিক দপ্তরের প্রধান বিড়বিড় করে বলল, "কিন্তু নূতন প্রজন্মের মনে যদি আনন্দ না থাকে, সুখ না থাকে তা হলে অফুরন্ত শক্তি দিয়ে আমরা কী করব?"

কোয়ান্টাম কম্পিউটার বলল, "এই একটি বিষয়ে আমি তোমাদের বুঝতে পারি না। আনন্দ এবং সুখ। আমি আগেও লক্ষ করেছি, আনন্দ এবং সুখ কথাগুলো মানুষ অনেক সময় বিপরীত অর্থে ব্যবহার করে। আমার ধারণা, যে পরিবেশে মানুষের সুখী হওয়ার কথা, অনেক সময়ই সেই পরিবেশে তারা অসুখী। যেই পরিবেশে তাদের আনন্দ পাওয়ার কথা, সেই পরিবেশে অনেক সময় তাদের মানসিক যন্ত্রণা হয়। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি না।"

রিওন হাসার চেষ্টা করে বলল, "তোমার সেটা নিয়ে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কোয়াকম্প। মানুষ নিজেও অনেক সময় সেটা বুঝতে পারে না।"

সামাজিক দপ্তরের প্রধান বিড়বিড় করে বলল, "মানুষকে বোঝা এত সহজ নয়।"

শিক্ষা দপ্তরের প্রধান বলল, "নূতন প্রজন্মের মধ্যে উৎসাহের খুব অভাব, তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য সব সময় আমাদের নূতন কিছু খুঁজে বের করতে হয়। কিছুদিন আগে একটা কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছে, সেই কনসার্টে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিয়ে মস্তিষ্কে রেজোনেন্স করা হয়েছে। এর আগে আমরা নূতন একটা পানীয় বাজারে ছেড়েছিলাম—খুব হালকাভাবে স্নায়ু উত্তেজক। নূতন ফ্যাশন বের করতে হয়, নূতন গ্যাজেট বের করতে হয়। সব সময় আমাদের নূতন কিছু দেওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়।"

কোয়ান্টাম কম্পিউটার শুষ্ক গলায় বলল, "আমার মনে হয় নূতন প্রজন্মকে ব্যস্ত রাখার জন্য নূতন আরো একটা প্রজেক্ট হাতে নেওয়া যায়।"

"কী প্রজেক্ট?"

"আমাদের হাতে একটা জলমানব আছে।"

রিওন চমকে উঠে বলল, "কী বললে? জলমানব?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কোথা থেকে জলমানব পেয়েছ?"

"যে জলমানবটাকে তুমি তার এলাকায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলে, আমি সেটাকে পরীক্ষা করার জন্য জৈব ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এসেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিওন কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না, কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু কিন্তু আমি আমার মেয়েকে কথা দিয়েছিলাম সেই জলমানবটাকে তার এলাকায় ফিরিয়ে দেব।"

"আমি জানি।" কোয়ান্টাম কম্পিউটার শুষ্ক গলায় বলল, "কিন্তু এই জলমানবটা আমাদের প্রয়োজন ছিল। জলমানবদের বিবর্তন নিয়ে আমাদের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, সেটা কতটুকু সত্যি পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন ছিল।"

রিওন অধৈর্য গলায় বলল, "কিন্তু আমি আমার মেয়ের সামনে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছি।"

"তোমার মেয়ে যদি কখনো সত্যি কথাটা জানতে পারে তা হলে তুমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। তার সত্যি কথাটা জানার কোনো প্রয়োজন নেই।"

রিওন হতাশার ভান করে বলল, "কিন্তু কিন্তু—"

কোয়ান্টাম কম্পিউটার কঠিন গলায় বলল, "তোমরা মানুষেরা ছোট বিষয় নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়। প্রতিদিন খাবারের জন্য তোমরা শত শত প্রাণী হত্যা কর। অথচ বিশেষ প্রয়োজনে একটি জলমানব ধরে নিয়ে আসা হলে সেটি তোমাদের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়?"

রিওন মাথা নাড়ল, বলল, "কোয়াকম্প, তুমি বুঝতে পারছ না। মানুষের ভেতরে যারা আপনজন, তাদের ভেতরে একটা সম্পর্ক থাকে। সেই সম্পর্কটা হচ্ছে বিশ্বাসের সম্পর্ক। একজন মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক নষ্ট করে না। নষ্ট করতে চায় না—"

কোয়াকম্প রিওনকে বাধা দিয়ে বলল, "আমার একটা সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য আমাকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তোমাদের সেই সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিতে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারবে না যে আমি এখন পর্যন্ত কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিই নি কিংবা এখন পর্যন্ত আমার কোনো ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি।"

রিওন বলল, "কোয়াকম্প, তোমার কাছে আমাদের সব তথ্য জমা থাকে। তুমি সেগুলো বিশ্লেষণ কর—কাজেই তোমার ভুল সিদ্ধান্ত নেবার কোনো সুযোগ নেই। তোমার ভবিষ্যদ্বাণীও ভুল হতে পারবে না। যেদিন তোমার সিদ্ধান্ত কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হবে সেদিন তুমি আর আমাদের দায়িত্ব নিতে পারবে না। তোমাকে সেদিন বিদায় নিতে হবে।"

কোয়াকম্প এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, "হ্যাঁ রিওন। তোমার কথা সত্যি।"

"যাই হোক, আমরা আগের কথায় ফিরে যাই।" রিওন বলল, "তুমি জলমানব নিয়ে কিছু একটা বলছিলে।"

কোয়াকম্প বলল, "হ্যাঁ, জলমানব নিয়েও আমার সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তারা পানিতে অত্যন্ত কঠিন একটা জীবন যাপন করে, সেই জীবনে কোনো সৃজনশীলতা নেই। কাজেই যতই সময় যাচ্ছে ততই তাদের বুদ্ধিমত্তা কমে আসছে। বিবর্তন উল্টো দিকে গেলে কী হতে পারে জলমানব হল তার প্রমাণ। জলমানবটি ধরে নিয়ে এসে আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। বুদ্ধিমত্তার নিনীষ স্কেলে সে মাত্র প্রথম স্কেলে। তার বয়সী একজন সাধারণ মানুষ থাকে সপ্তম স্কেলে। জ্ঞান-বিজ্ঞান দূরে থাকুক, সাধারণ সংখ্যা পর্যন্ত সে জানে না। ছোট সংখ্যা যোগ করতে পারে, বিয়োগ করতে পারে না। এই মুহূর্তে আমরা তাদের জলমানব বলে সম্বোধন করি, আগামী শতক পরে তাদের জলজ প্রাণী বলে সম্বোধন করা হবে।"

হলোগ্রাফিক কালো টেবিল ঘিরে থাকা অনেকেই সম্মতির ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল। কোয়াকম্প তার ভাবলেশহীন গলায় একঘেয়ে সুরে বলল, "জলমানব বুদ্ধিমত্তার দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক পিছিয়ে গেলেও শারীরিকভাবে একটা চমকপ্রদ ক্ষমতার অধিকারী। এই জলমানবটি দীর্ঘসময় পানির নিচে নিঃশ্বাস না নিয়ে থাকতে পারে। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, এই জলমানবটি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন তার ত্বকের ভেতর দিয়ে নিতে পারে। খুব বেশি পরিমাণে নয়, কিন্তু কয়েক মিনিট বেশি বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট।"

শিক্ষা দপ্তরের প্রধান অবাক হয়ে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।" কোয়াকম্প বলল, "তার শারীরিক চমকপ্রদ ক্ষমতার কথা খুব বেশি মানুষ জানে না, কিন্তু যে জিনিসটা অনেকেই গুরুত্ব দিয়ে নেবে সেটা হচ্ছে তার সুঠাম শরীর আর দৈহিক সৌন্দর্য। আমাদের নূতন প্রজন্মের অনেকের কাছেই সেটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। সেটা আমাদের জন্য একটা সমস্যা হতে পারে।"

রিওন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী সমস্যা?"

"জলমানব একটি জন্তু ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু নূতন প্রজন্ম যদি তাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তা হলে ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।"

রিওন কঠিন মুখে জিজ্ঞেস করল, "কেন তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো ব্যবস্থা নিতে হবে। সমুদ্রের বুকে ঝড়বৃষ্টি টাইফুনে তারা এমনিতেই ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

"কিন্তু যত তাড়াতাড়ি শেষ হবার কথা, তারা এত তাড়াতাড়ি শেষ হচ্ছে না। টাইফুনের সময় তারা কেউ ছিল না, টাইফুন শেষে হঠাৎ করে তারা হাজির হয়েছে। তারা পশুর মতো বেঁচে থাকতে শিখে যাচ্ছে। পশুর মতো বেঁচে থাকবে পশুরা, মানুষের জন্য পশুর মতো বেঁচে থাকা ঠিক নয়। আমাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।"

রিওন শীতল গলায় জিজ্ঞেস করল, "তা হলে তুমি কী করতে চাও?"

কোয়াকম্প শুষ্ক গলায় বলল, "আমি আমাদের নূতন প্রজন্মের ভেতর আর জলমানবের ভেতর একটা দূরত্ব তৈরি করতে চাই।"

"তুমি সেটা কীভাবে করবে?"

"জলমানব যে মানুষ থেকে একেবারেই ভিন্ন আমি সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।"

শিক্ষা দপ্তরের প্রধান বলল, "তুমি সেটা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে?"

"কাজটি সহজ। জলমানব একটা জন্তুর মতো, তাকে অন্য কোনো জন্তুর সাথে প্রদর্শন করতে হবে।"

উপস্থিত যারা ছিল তারা সবাই সম্মতির ভঙ্গি করে মাথা নাড়তে থাকে। শুধু রিওন বলল, "আমার মেয়ে এখনো আসল ব্যাপারটি জানে না। প্রদর্শনী হলে নিশ্চিতভাবে জেনে যাবে। আমি তখন তার সামনে মুখ দেখাতে পারব না।"

কোয়ান্টাম কম্পিউটার রিওনের আপত্তিটুকু গায়ে মাখল না, বলল, "সামুদ্রিক কোনো প্রাণীর সঙ্গে এই জলমানবের যুদ্ধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তরুণ প্রজন্ম স্বচক্ষে দেখতে পেলে সেটি খুব উপভোগ করবে।"

শিক্ষা দপ্তরের প্রধান বলল, "হ্যাঁ, সেরকম একটা কিছু করতে হবে। শুধু একটা প্রদর্শনী হলে কেউ যাবে না। আজকালকার ছেলেমেয়েরা মিউজিয়াম বা চিড়িয়াখানাতেও যায় না। তারা সাধারণ কিছু দেখে আনন্দ পায় না। সেখানে ভায়োলেন্স থাকতে হয়। উত্তেজনা থাকতে হয়। মস্তিষ্কে স্টিমুলেশন থাকতে হয়।"

রিওন বলল, "আমি এখনো বুঝতে পারছি না জলমানবকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলে কেন আমাদের তরুণ প্রজন্মের সাথে দূরত্বের সৃষ্টি হবে।"

কোয়াকম্প শান্ত গলায় বলল, "সেটা নির্ভর করবে তাকে কীভাবে প্রদর্শন করা হয় তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর। আমরা তাকে পশু হিসেবে উপস্থাপন করব, সে অন্য পশুর সাথে থাকবে, পশুর মতো আচরণ করবে।"

রিওন বলল, "আমি এখনো নিশ্চিত নই—"

কোয়াকম্প শীতল গলায় বলল, "তোমার নিশ্চিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই রিওন। বিষয়টাকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও। মনে রেখ আমি তোমাদের একমাত্র কোয়ান্টাম কম্পিউটার হিসেবে তোমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করি। আমার ওপরে বিশ্বাস রেখ।"

রিওন কোনো কথা না বলে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কোয়াকম্প বলল, "প্রদর্শনীটার আয়োজন করবে সামাজিক দপ্তর। শুধু প্রদর্শনী হলে হবে না তার সাথে থাকতে হবে একটা কনসার্ট—"

সামাজিক দপ্তরের প্রধান বিড়বিড় করে বললেন, "শুধু আমাদের পক্ষে এ রকম একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করা সম্ভব হবে না। বিষয়টার দায়িত্ব আরো কাউকে দিতে হবে।"

কথাটা লুফে নিয়ে কোয়াকম্প বলল, "হ্যাঁ। আমরা এই জলমানবকে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দিতে পারি, তারা একে ব্যবহার করে যা করা দরকার তা-ই করতে পারবে। যেখানে অর্থের বিনিময় নেই সেখানে সৃজনশীলতা নেই।"

রিওন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইল। হঠাৎ করে সে সভায় কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। সে হঠাৎ করে কোয়াকম্পের সত্যিকারের পরিকল্পনাটা বুঝতে পেরেছে। নূতন প্রজন্মের উপস্থিতিতে এই জলমানবটিকে কোনো জলজ প্রাণীকে দিয়ে হত্যা করানো হবে। সেই হত্যাকাণ্ডটি করানো হবে সবার সম্মতিতে—সবার আগ্রহে। না জেনে না বুঝেই নূতন প্রজন্ম সম্মিলিতভাবে এই ঘটনার দায়ভার গ্রহণ করবে। অপরাধবোধ থেকে তাদের ভেতরে জন্ম নেবে ক্রোধ আর ঘৃণা! জলমানবের বিরুদ্ধে ক্রোধ, জলমানবের জন্য ঘৃণা!

রিওন হঠাৎ করে নিজের ভেতরেই এক ধরনের ঘৃণা অনুভব করতে থাকে।

AMARBOI.COM

৯

ঘরের দরজায় কার যেন ছায়া পড়ল। কায়ীরা মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে কমবয়সী কয়েকজন ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ছেলেমেয়েগুলোকে সে চিনতে পারে। এরা সবাই নিহনের বন্ধু। ডলফিনের ওপর চেপে যে দলটি সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় এরা সেই দলের ছেলেমেয়ে।

কায়ীরা তার হাতের কাগজটা টেবিলে রেখে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, কায়ীরা।"

'হ্যাঁ, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। এস ভেতরে এস।"

ছেলেমেয়েগুলো কায়ীরার ছোট ঘরটাতে ঢুকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়ে। তারা কী জন্য এসেছে কায়ীরা সেটা ভালো করেই জানে। তাই সে কোনো কথা না বলে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে। ছেলেমেয়েগুলোর ভেতরে যে একটু বড়, সুদর্শন ক্রিহা ভণিতা না করে কথা বলতে শুরু করে, "কায়ীরা, আমাদের নিহনকে স্থলমানবেরা ধরে নিয়ে গেছে।"

কায়ীরা নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। ক্রিহা বলল, "ঘটনার সময় নাইনা সেখানে ছিল, সেখানে কী ঘটেছে আমরা সেটা নাইনার মুখে শুনেছি।"

কায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, "আমরা সবাই সেটা শুনেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এটা কেমন করে হতে পারে—স্থলমানবেরা ইচ্ছা করলেই আমাদের কাউকে খুন করে ফেলবে? আমাদের কাউকে ধরে নিয়ে যাবে?"

কায়ীরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, "এটা হতে পারে না, কিন্তু তবুও হচ্ছে। আমি এ রকম আরো অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি যেগুলো হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়, কিন্তু হচ্ছে।"

নাইনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, "আমরা কি সেগুলো চুপচাপ মেনে নেব?"

কায়ীরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "নাইনা, তুমি আমাকে একটা খুব কঠিন প্রশ্ন করেছ। নিহনকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে আমি একা একা এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছি।"

ক্রিহা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কোনো উত্তর খুঁজে পেয়েছ?"

কায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, "না। পাই নি।"

ক্রিহা কঠিন মুখে বলল, "আমরা পেয়েছি। আমরা তোমাকে সেটা বলতে এসেছি।"

কায়ীরার মুখে খুব সূক্ষ্ম মলিন একটা হাসি ফুটে উঠল, সেই হাসির মাঝে কোনো আনন্দ নেই, আছে অনেকখানি বেদনা। সে বলল, "তোমরা কী বলবে আমি সেটা অনুমান করতে পারছি।"

"তুমি কেমন করে সেটা অনুমান করতে পারছ?"

"একসময় আমি তোমাদের বয়সী ছিলাম, তখন আমি তোমাদের মতো করে চিন্তা করতাম।" কায়ীরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তবু আমি তোমাদের মুখ থেকেই শুনি।"

ক্রিহার ছেলেমানুষি মুখটা এবার আরো কঠিন হয়ে গেল, সে বলল, "আমরা স্থলমানবের এ রকম অত্যাচার মেনে নেব না। আমরা তার প্রতিশোধ নেব।"

"প্রতিশোধ?"

"হ্যাঁ। প্রতিশোধ।"

কায়ীরা মৃদু গলায় বলল, "তোমরা কীভাবে প্রতিশোধ নিতে চাও?"

ছেলেমেয়েগুলো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, পেছন থেকে একজন বলে, "স্থলমানবেরা যদি আমাদের একজনকে ধরে নিয়ে যায় তা হলে আমরাও তাদের একজনকে ধরে নিয়ে আসব। স্থলমানবেরা যদি আমাদের একজনকে খুন করে তা হলে আমরাও তাদের একজনকে খুন করব।"

কায়ীরা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষ দু কারণে প্রতিশোধ নেয়। এক : প্রতিশোধ নিয়ে এক ধরনের মানসিক শান্তি পাওয়া। দুই : প্রতিশোধ নিয়ে এক ধরনের সঙ্কেত পাঠানো যে ভবিষ্যতে কিছু একটা করলে তোমাদের এই অবস্থা হবে। তোমরা কী জন্য প্রতিশোধ নিতে চাইছ?"

ক্রিহা একটু ইতস্তত করে বলল, "মনে হয় দুই কারণেই। আমরা দুটোই করতে চাই।"

"তোমাদের কি সেই ক্ষমতা আছে?"

একজন সোজা হয়ে বসে বলল, "আছে।"

"তুমি জান, স্থলমানবদের কত রকম অস্ত্র আছে?"

"জানি। আমি অস্ত্রকে ভয় পাই না। আসলে—"

"আসলে কী?"

"আসলে আমি মৃত্যুকেও ভয় পাই না। দরকার হলে আমি প্রাণ দেব—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কায়ীরা এবার হেসে ফেলল, বলল, "প্রাণ যে কী মূল্যবান একটা জিনিস সেটা তোমরা জান না। এত সহজে প্রাণ দেওয়ার কথা বোলো না। প্রাণটুকু থাকলে ভবিষ্যতে এক শ একটা কাজ করা যায়।"

"হ্যাঁ কিন্তু প্রাণ খুব শক্তিশালী জিনিস। একজন মানুষ যদি প্রাণ দিতে ভয় না পায় তা হলে সে একাই কিন্তু অনেক কিছু করে ফেলতে পারে।"

কায়ীরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ ক্রিহা। একজন মানুষ যদি নিজের প্রাণটুকু দিতে রাজি থাকে তা হলে সেটা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে।"

ক্রিহা এবার একটু এগিয়ে আসে, উত্তেজিত গলায় বলে, "আমরা একটা পরিকল্পনা করেছি কায়ীরা। আমরা সেই পরিকল্পনাটার কথা তোমাকে বলতে এসেছি।"

"বলবে? আমি মনে হয় অনুমান করতে পারছি তোমরা কী বলবে। তবু বল, শুনি।"

ক্রিহা একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "আমরা স্থলমানবের দেশে গিয়ে তাদের একজনকে ধরে আনতে চাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিহনকে ছাড়বে না আমরাও সেই স্থলমানবকে ছাড়ব না।"

"তোমরা সত্যি একজন স্থলমানবকে ধরে আনতে পারবে?"

একসাথে সবাই কথা বলতে শুরু করে, "পারব, কায়ীরা। অবশ্যই পারব। একশবার পারব।"

কায়ীরা আবার একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, "তোমাদের নিজেদের ওপর তোমাদের আত্মবিশ্বাসটুকু দেখে আমার খুব ভালো লাগছে।"

নাইনা আগ্রহ নিয়ে বলল, "কায়ীরা, তুমি আমাদের পরিকল্পনাটুকু শুনতে চাও।"

"না। এখনই শুনতে চাই না, নাইনা।"

"কেন?"

'কারণ আমার মনে হয় তোমাদের পরিকল্পনাটা কাজে লাগানোর সময় এখনো আসে নি। আমাদের আরো একটু সময় দরকার।"

"কেন আরো সময় দরকার?"

"তোমার শত্রু যখন তোমার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয় তখন তাকে আক্রমণ করতে হয় খুব সাবধানে। মনে রেখ দুঃসময়ে টিকে থাকাটাই হচ্ছে বিজয়।"

"টিকে থাকাটাই বিজয়?" ক্রিহা মুখ বিকৃত করে বলল, "পোকামাকড়ের মতো শুধু টিকে থাকব?"

"তুমি যদি টিকে থাকতে পার তা হলে একসময় সম্মান নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে—পৃথিবীর মানুষ আমাদের পানিতে ঠেলে দেওয়ার পর প্রায় দুই শতাব্দী পার হয়ে গেছে। আমরা এখনো টিকে আছি। স্থলমানবেরা আমাদের শেষ করে দিতে না চাইলে আমরা টিকে থাকব। তাই আমাদের খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাকে ভাববার একটু সময় দাও তোমরা।"

কায়ীরার কথা শুনে ছেলেমেয়েগুলোর মুখে এক ধরনের আশাভঙ্গের ছায়া পড়ে, সেটা কায়ীরার দৃষ্টি এড়ায় না। সে কোমল কণ্ঠে বলল, "তোমরা আমার ওপর একটু বিশ্বাস রাখ, আমার নিজের সন্তান বেঁচে নেই, সে বেঁচে থাকলে তোমাদের মতো বড় হত। বিশ্বাস কর নিহনকে ফিরিয়ে আনার জন্য যেটা করতে হয় আমি সেটা করব। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আমি আমাদের পুরো পরিবারকে বিপদের মাঝে ফেলতে চাই না। যেভাবেই হোক আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকতেই হবে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেমেয়েগুলো একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। কায়ীরা টেবিল থেকে তার কাগজটা তুলে এনে বলল, "আমি খুব খুশি হয়েছি যে তোমরা আমার কাছে এসেছ। প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বলছ। তোমাদের এই বয়সে তোমরা এত বড় অবিচার মুখ বুজে সহ্য করলে খুব ভুল হত। নিহনের জন্য তোমাদের এই ভালবাসাটুকুকে আমি খুব সম্মান দিচ্ছি। আমরা পৃথিবীতে বেঁচে আছি শুধুই এই একটি কারণে, মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসার কারণে।"

নাইনা ভাঙা গলায় বলল, "তোমার কী মনে হয়, কায়ীরা, নিহন কি বেঁচে আছে?"

"জানি না। ওখানে ডলফিনদের একটা দল ছিল, তারা বলেছে নিহনকে মারে নি। ধরে নিয়েছে। সেটা একটা ভালো সংবাদ।"

"কিন্তু ধরে নিয়ে তো কিছু একটা করে ফেলতে পারে।"

"হ্যাঁ। তা পারে। কিন্তু তবু আমরা আশা নিয়ে থাকব। সমুদ্রের সব ডলফিনকে খবর দেওয়া আছে—যদি তারা নিহনকে দেখে তাকে যেন সাহায্য করে।"

ক্রিহা বলল, "কায়ীরা।"

"বল, ক্রিহা।"

"আমরা কি স্থলমানবদের একটা খবর পাঠাতে পারি না? তাদের বলতে পারি না নিহনকে ফেরত দিতে?"

"পারি। কিন্তু সেই খবর পাঠালে লাভ হবে কি না, আমি সেটা এখনো বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও।"

"তুমি যদি কোনো খবর পাঠাতে চাও আমাকে বোলো। আমি সেই খবর নিয়ে যাব, কায়ীরা।"

"ঠিক আছে, ক্রিহা। আমি জানি তোমার অনেক সাহস।"

"যদি অন্য কিছুও করতে চাও সেটাও আমাদের বোলো। নিহনের জন্য আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।"

কায়ীরা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি।" এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তোমরা তো জান এই পৃথিবীতে এখন আমাদের বেঁচে থাকার একটাই উপায়। সেটা হচ্ছে আমাদের মেধা। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি। আমাদের জ্ঞান। তোমরা সেটা ভুলবে না। তোমাদের শিখতে হবে। সবকিছু শিখতে হবে। জানতে হবে। বিদ্যাবুদ্ধিতে স্থলমানবদের হারাতে হবে, তা না হলে আমরা কিন্তু শেষ হয়ে যাব।"

১০

কাটুস্কা ঘর থেকে বের হতে গিয়ে থেমে গেল, তার বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। এ রকম সময় কখনো তার বাবা বাসায় থাকে না, আজকে বাসায় আছে কেন কে জানে। সে বাবার ঘরে উঁকি দিল, বাবা টেবিলের সামনে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, বসার ভঙ্গিটা কেমন যেন বিষণ্ণ। কাটুস্কা মৃদু গলায় ডাকল, "বাবা।"

রিওন মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, "কে, কাটুস্কা?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"কী খবর, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নগরকেন্দ্রে, বাবা। আজকে নূতন কনসার্ট এসেছে, তার সঙ্গে নূতন জলনৃত্য।"

"জলনৃত্য?"

"হ্যাঁ, বাবা। বিজ্ঞাপন দেখ নি? নূতন এক ধরনের জলজ প্রাণীর খেলা, খুব নাকি উত্তেজনাপূর্ণ।"

রিওনকে হঠাৎ কেমন জানি ক্লান্ত দেখায়। কাটুস্কা দুশ্চিন্তিত মুখে বলল, "বাবা, তোমার শরীর ভালো আছে?"

"হ্যাঁ, মা। আমার শরীর ভালো আছে।"

"তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।"

"হ্যাঁ। আমি আসলে একটু ক্লান্ত।"

"কেন, বাবা, তুমি তো কখনো ক্লান্ত হও না। এখন কেন ক্লান্ত হয়েছ?"

রিওন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "জানি না কেন। হঠাৎ করে কেন জানি ক্লান্তি লাগছে। সবকিছু নিয়ে এক ধরনের ক্লান্তি।" গলার স্বর পাল্টে রিওন বলল, "বুঝলি কাটুস্কা, পৃথিবীটা খুব জটিল। মনে হয় এখানে বেঁচে থাকাটা আরো জটিল।"

কাটুস্কা একটু অবাক হয়ে বলল, "কেন, বাবা? তুমি এ রকম কথা কেন বলছ?"

"জীবনটা ঠিক করে চালিয়েছি কি না মাঝে মাঝে খুব সন্দেহ হয়। সবকিছু ঠিক করে করার পরও কোথায় কোথায় জানি গোলমাল হয়ে যায়।"

কাটুস্কা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, রিওন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কাটুস্কা।"

"কী বাবা।"

"আজকের কনসার্টে তোমার কি যেতেই হবে?"

কাটুস্কা অবাক হয়ে বলল, "তুমি একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?"

"না গেলে হয় না?"

"তুমি তো কখনো আমাকে কিছু করতে নিষেধ কর না। আজকে কেন নিষেধ করছ?"

রিওন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে—"

"কী মনে হচ্ছে?"

রিওন হঠাৎ করে থেমে গেল, বলল, "না, কিছু না।"

"বল বাবা—", কাটুস্কা বলল, "কী বলতে চাইছিলে, বল।"

"না কিছু না। তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও। উপভোগ করে এস।"

কাটুস্কা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। তার ভেতরে কী যেন খচখচ করছে, ঠিক কী হচ্ছে সে বুঝতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে কিছু একটা কোথাও যেন ভুল হয়ে গেছে, কেন হয়েছে, কীভাবে হয়েছে কেউ সেটা ধরতে পারছে না।

নগরকেন্দ্রে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় করেছে। কাটুস্কা তার বন্ধুবান্ধবদের খুঁজে বের করল। এক কোনায় দলবেঁধে দাঁড়িয়ে হইচই করছিল, কাটুস্কাকে দেখে সবাই হইচই করে উঠল। মাজুর বলল, "কী খবর, কাটুস্কা, তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কনসার্ট শুনতে আস নি, তুমি বুঝি কারো মৃত্যুসভায় এসেছ!"

খুব মজার একটা কথা বলেছে এ রকম ভঙ্গি করে সবাই হিহি করে হাসতে থাকে। কাটুস্কা বলল, "কনসার্ট এখনো শুরু হয় নি। যখন শুরু হবে তখন হয়তো এটাকে শোকসভার মতোই মনে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রীমান মুখ গম্ভীর করে বলল, "না না। তুমি কী বলছ, কাটুস্কা? আমরা কত ইউনিট খরচ করে টিকিট করেছি দেখেছ? এতগুলো ইউনিট নিয়ে ভালো কিছু দেখাবেই।"

সবাই স্টেজের দিকে তাকাল, সেখানে বিশাল একটা অ্যাকুরিয়াম, তার ভেতর ভয়ঙ্করদর্শন দুটি হাঙর মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। রঙিন আলোতে পুরো অ্যাকুরিয়ামটি আলোকিত, পুরো অ্যাকুরিয়ামটিকে একটা অলৌকিক প্রেক্ষাগৃহের মতো মনে হয়।

ক্রানা বুকের মধ্যে আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা বের করে দিয়ে বলল, "আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। কখন শুরু হবে কনসার্ট?"

কিছুক্ষণের মাঝেই কনসার্টটা শুরু হয়ে গেল। অ্যাকুরিয়ামটা ঘিরে গায়কেরা মাথা ঝাঁকিয়ে গান গাইতে শুরু করে। তাদের শরীরে লাগানো নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র শরীরের তালের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সঙ্গীতের ধ্বনি তৈরি করতে শুরু করেছে। বাতাসে মিষ্টি এক ধরনের গন্ধ, নিশ্চিতভাবেই সেখানে স্নায়ু উত্তেজক এক ধরনের গ্যাস ছাড়া হচ্ছে, যারা উপস্থিত তারা ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে। সঙ্গীতের তালে তালে তাদের দেহ নড়তে থাকে, মাথা দুলতে থাকে। তারা একজন আরেকজনকে জাপটে ধরে নাচতে থাকে, চিৎকার করতে থাকে। তারুণ্যের উদ্দাম আনন্দ যেন সব বাধা ভেঙে ফেলবে! এভাবে কতক্ষণ চলেছে কেউ জানে না—হঠাৎ করে সকল সঙ্গীত বন্ধ হয়ে যায়। নগরকেন্দ্রের ভেতর কোথাও এতটুকু শব্দ নেই।

সবাই অবাক হয়ে দেখল মঞ্চের ঠিক মাঝখানে স্বল্পবসনা একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সে চিৎকার করে বলল, "এখন তোমাদের সামনে আসছে এ সময়ের সবচেয়ে উত্তেজনাময় মুহূর্ত।"

সবাই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে। মেয়েটি দুই হাত তুলে সবাইকে থামার জন্য ইঙ্গিত করে বলল, "স্টেজে এই বিশাল অ্যাকুরিয়ামে রয়েছে দুটি ক্ষুধার্ত হাঙর। গত এক সপ্তাহ তাদের অভুক্ত রাখা হয়েছে। এই অভুক্ত হাঙর দুটির মতো হিংস্র প্রাণী এখন পৃথিবীতে আর কিছু নেই। তাদের সামনে এখন কোনো জীবন্ত প্রাণী এলে এক মুহূর্তে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে এই ক্ষুধার্ত, ক্রুদ্ধ এবং হিংস্র হাঙর মাছ। তোমরা কেউ কি এই দুটি হাঙর মাছের মুখোমুখি হতে চাও?"

নগরকেন্দ্রের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চিৎকার করে বলল, "না!"

"আমি জানি তোমরা এই ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত এবং হিংস্র হাঙর মাছের সামনে যেতে চাও না।" মেয়েটি চিৎকার করে বলল, "কিন্তু এই হিংস্র হাঙর মাছের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে একটি জলজ প্রাণী। বিস্ময়কর এক জলপ্রাণী দেখতে অনেকটা মানুষের মতো কিন্তু সেটি মানুষ নয়। এই হাঙর মাছের মতোই হিংস্র এই জলজ প্রাণী মানুষের মতো দেখতে এই নির্বোধ, বীভৎস হিংস্র প্রাণীটি কি হাঙর মাছের সামনে টিকে থাকতে পারবে? দুটি হাঙর মাছ কতক্ষণে তাকে ছিড়েখুঁড়ে খাবে? তোমাদের ভেতরে কার সাহস আছে সেই দৃশ্য দেখার?"

শত শত ছেলেমেয়ে চিৎকার করে বলল, "আমার! আমার সাহস আছে। আমার।"

"এস। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই এই ভয়ঙ্কর খেলায়। দেখ, উপভোগ কর! যাদের স্নায়ু দুর্বল তারা চোখ বন্ধ করে রেখ। তা না হলে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমাদের দিনের'পর দিন, রাতের পর রাত তাড়া করে বেড়াবে! ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে তোমরা জেগে উঠবে প্রতি রাতে। তাই সাবধান!"

বিকট এক ধরনের যন্ত্রসঙ্গীত বাজতে থাকে, মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে, শুধু দেখা যায় বিশাল অ্যাকুরিয়ামে ভয়ঙ্করদর্শন দুটি হাঙর মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মঞ্চের এক কোনায় একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পটলাইট এসে পড়ল এবং সবাই দেখল সেখানে বিচিত্র একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটির শরীরটুকু ছোপ ছোপ রঙিন, মুখে ভয়ঙ্করদর্শন একটি মুখোশ, সেই মুখোশে ক্রূর এক ধরনের দৃষ্টি। মূর্তিটির দুই হাত শেকল দিয়ে বাঁধা, সুগঠিত পেশিবহুল শরীর। কোমর থেকে ছোট এক টুকরো কাপড় ঝুলছে, এ ছাড়া শরীরে কোনো পোশাক নেই।

মূর্তিটি দেখে কাটুস্কা চমকে ওঠে। কয়দিন আগে তার সঙ্গে দেখা হওয়া জলমানবটির কথা তার মনে পড়ে যায়। তার শরীরও ছিল পেশিবহুল সুগঠিত, সে ছিল অসম্ভব সুদর্শন। এর মুখটি মুখোশ দিয়ে ঢাকা, এই মুখোশের আড়ালে যে মুখটি লুকিয়ে আছে সেটি কি নিহন নামের সেই তরুণটির? কিন্তু সেটা তো হতে পারে না। তার বাবার সঙ্গে কথা বলে কাটুস্কা তো নিহন নামের সেই সুদর্শন জলমানবটিকে হেলিকপ্টারে করে তার এলাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। এটি নিশ্চয়ই অন্য কোনো প্রাণী। অন্য কোনো জলমানব।

নগরকেন্দ্রের শত শত ছেলেমেয়ে চিৎকার করতে থাকে, "হত্যা কর। হত্যা কর। হত্যা কর—"

কাটুস্কা অবাক হয়ে দেখে, মনে হয় নগরকেন্দ্রের সবাই বুঝি উন্মাদ হয়ে গেছে। হাত নেড়ে তারা উন্মত্তের মতো চিৎকার করছে, "হত্যা কর। হত্যা কর। হত্যা কর—"

দুই পাশ থেকে দুজন মানুষ এসে মুখোশ পরা মূর্তিটিকে ধরে তার হাতের শেকলটা খুলে দেয়, তারপর তাকে ঠেলে ছোট একটা খাঁচার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। খাঁচাটাকে একটা ক্রেন দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে তুলে নেয়া হয়, তারপর খুব সাবধানে অ্যাকুরিয়ামের উপর এনে স্থির করা হয়। কারো বুঝতে বাকি থাকে না যে হঠাৎ করে খাঁচার তলাটুকু খুলে যাবে আর এই মুখোশ পরা মূর্তিটি অ্যাকুরিয়ামের ভেতরে পড়বে। নগরকেন্দ্রের শত শত ছেলেমেয়ে হঠাৎ চুপ করে যায়। যে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি তারা দেখতে যাচ্ছে তার জন্য সবার ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা এসে ভর করেছে। তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়, নিজের অজান্তেই তাদের শরীর শক্ত হয়ে আসে।

মূর্তিটিকে নিয়ে খাঁচাটি অ্যাকুরিয়ামের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গীত দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে এবং হঠাৎ সেটি থেমে যায়। বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দ হল এবং হঠাৎ করে মূর্তিটির পায়ের নিচে থেকে পাটাতনটি সরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেটি পানির ভেতরে পড়ে যায়।

সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখতে পেল মূর্তিটি পানির নিচে ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এক হাত দিয়ে পায়ে বেঁধে রাখা একটা ছোরা হাতে নিয়ে অন্য হাতে নিজের মুখোশটা খুলে ফেলেছে, কাটুস্কা তখন মূর্তিটি চিনতে পারল, সে যা ভেবেছিল তা-ই! মানুষটি নিহন।

কাটুস্কা চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায়, "না। না। না।"

নগরকেন্দ্রে পিনপতন স্তব্ধতা, তার মধ্যে কাটুস্কার চিৎকার শুনে সবাই অবাক হয়ে তার দিকে ঘুরে তাকাল। সবাই দেখল একজন তরুণী "না, না, না—" বলে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, তারপর শত শত দর্শকের ভেতর দিয়ে স্টেজের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

অ্যাকুরিয়ামের ভেতরে নিহন তার কিছু জানে না। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হাঙর মাছ দুটির দিকে। সে জানে হাঙর মাছ দুটি তার উপস্থিতির কথা টের পেয়েছে, তার শরীর থেকে তৈরি হওয়া অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে লক্ষ করে এখন হাঙর মাছ দুটি ছুটে আসবে। সমুদ্রের সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণী, এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সহজ নয়।

নিহন সাবধানে পিছিয়ে আসে, অ্যাকুরিয়ামের শক্ত প্লেক্সিগ্লাসের দেয়ালের সঙ্গে নিজের শরীরটা লাগিয়ে সে অপেক্ষা করে। পেছনে প্লেক্সিগ্লাসের দেয়াল, হাঙর মাছ ছুটে এসে তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রমণ করতে পারবে না, দেয়ালে ধাক্কা খাওয়ার ঝুঁকি নেবে না হাঙর মাছ। চেষ্টা করবে ওপর থেকে নিচে তাকে টেনে নিতে। অত্যন্ত দ্রুত তাকে সরে যেতে হবে, এক মুহূর্ত সময় পাবে হাঙরের বুকে ধারালো চাকুটা বসিয়ে দেওয়ার, ঠিক জায়গায় বসাতে পারলে মুহূর্তে তার পুরো তলদেশ দুই ভাগ হয়ে যাবে।

সামনে ভেসে থাকা হাঙর মাছটি আক্রমণ করল। উপস্থিত দর্শকেরা হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তীব্র গতিতে একটি হাঙর মাছ ছুটে আসছে—একটা হুটোপুটি এবং হঠাৎ করে একটা রক্তের ধারা। পানিটুকু লাল হয়ে গেছে, সবাই নিশ্চিত হয়ে ছিল যে মূর্তিটির শরীরের একটা অংশ খাবলে নিয়ে গেছে এই হাঙর মাছ। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখল, মূর্তিটি অক্ষত হয়ে ভেসে আছে, হাঙর মাছটির বুক থেকে নিচের পুরো অংশটুকু দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। রক্তের একটি ধারা ছড়াতে ছড়াতে হাঙর মাছটি নিচে নেমে যাচ্ছে।

উপস্থিত শত শত ছেলেমেয়ের বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাসটি বের হয়ে আসে। নিজের অজান্তেই তারা আনন্দধ্বনি করে ওঠে। এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তারা সামনে তাকিয়ে থাকে। বিশাল অ্যাকুরিয়ামে একজন তরুণ পানির নিচে নিঃশ্বাস না নিয়ে দীর্ঘ সময় ডুবে আছে, সেটিও তারা ভুলে যায়। নিজের অজান্তেই তাদের মনে হতে থাকে এই বিস্ময়কর তরুণটির অসাধ্য কিছু নেই।

কাটুস্কা চিৎকার করতে করতে স্টেজের দিকে ছুটে যেতে থাকে, কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী তাকে থামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু কাটুস্কা একটা ঝটকা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে সে স্টেজের দিকে ছুটে যেতে থাকে। সবাই সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, দেখে, পানির নিচে ডুবে থাকা বিচিত্র মানুষটি আবার প্লেক্সিগ্লাসের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দ্বিতীয় হাঙর মাছটির জন্য অপেক্ষা করছে। একটু আগে যে মূর্তিটির উদ্দেশে সবাই চিৎকার করে বলেছে "হত্যা কর, হত্যা কর, হত্যা কর—" হঠাৎ করে সবার ভালবাসা সেই মানুষটির জন্য। সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে এই বিস্ময়কর তরুণটি কখন দ্বিতীয় হাঙর মাছটিকেও তার বুক থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে ফেলবে।

হাঙর মাছটি তার লেজ ঝাপটা দিয়ে ঘুরে যায়, তারপর তীব্র গতিতে ছুটে আসতে থাকে নিহনের দিকে। একটা হুটোপুটি হয়, কে কী করছে বোঝা যায় না। হাঙর মাছটি ঘুরে যায়, যেখানে মানুষটি ছিল সেখানে সে নেই। সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখে হাঙরের পিঠে সে চেপে বসেছে—হাতের ধারালো চাকু দিয়ে মাছটির মাথায় আঘাত করছে। রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা বইছে—আর ছটফট করতে করতে হাঙর মাছটি অ্যাকুরিয়ামের তলদেশে ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

নিহন এবার হাঙর মাছটিকে ছেড়ে পানির ওপর ভেসে ওঠে। বুক ভরে একবার নিঃশ্বাস নেয়। হলঘরে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চিৎকার করছে, তার মাঝে সে অবাক হয়ে দেখল একজন তরুণী অ্যাকুরিয়ামের ওপর উঠে এসেছে। নিহন তরুণীটিকে চিনতে পারে, তরুণীটি কাটুস্কা। এই তরুণীটি তাকে মুক্ত করে দিতে চেয়েছিল।

নিহন অবাক হয়ে দেখে, মেয়েটি হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো চিৎকার করতে করতে নিহনকে জাপটে ধরে তাকে টেনে উপরে তুলতে চেষ্টা করছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু মানুষের চিৎকারে সে কী বলছে, শোনা যাচ্ছে না। কাটুস্কাকে ঘিরে অনেক নিরাপত্তাকর্মী, তাকে টেনে সরানোর চেষ্টা করছে, পারছে না।

নিহন পানি থেকে বের হয়ে আসে, এক হাতে কাটুস্কাকে জাপটে ধরে নিজের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেনে আনে। অন্য হাতে ধারালো চাকুটা ধরে রেখে সে শান্ত গলায় নিরাপত্তাকর্মীদের বলল, "সবাই সরে যাও।"

নিরাপত্তাকর্মীরা কাটুস্কাকে ছেড়ে দিয়ে সাথে সাথে সরে গেল। চোখের কোনা দিয়ে সবাইকে লক্ষ করতে করতে নিহন কাটুস্কার দিকে তাকাল, নরম গলায় বলল, "ভালো আছ, কাটুস্কা।"

কাটুস্কা হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। নিহনকে আঁকড়ে ধরে বলে, "আমি বুঝি নি, তোমাকে এভাবে এখানে আনবে। আমি বুঝি নি। আমি দুঃখিত, নিহন। আমি খুব দুঃখিত।"

"তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, কাটুস্কা। আমি জানি কী হয়েছে?"

নিহন দেখতে পায় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের ঘিরে ফেলছে। নিহন শান্ত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে এক হাতে শক্ত করে কাটুস্কাকে ধরে রেখেছে অন্য হাতে ধারালো একটা চাকু। থরথর করে কাঁপছে কাটুস্কা। মেয়েটি আকুল হয়ে কাঁদছে। কেন কাঁদছে নিহন জানে না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, সে মেয়েটিকে এদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

১১

সমাজ দপ্তরের প্রধান একটু অবাক হয়ে তার যোগাযোগ মডিউলের দিকে তাকিয়ে রইল, সেখানে একটা অবিশ্বাস্য তথ্য, কোয়াকম্প তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে! এর আগে কখনোই কোয়াকম্প সরাসরি কোনো মানুষের সাথে যোগাযোগ করে নি। সমাজ দপ্তরের প্রধান একটুখানি অবাক এবং অনেকখানি আতঙ্কিত হয়ে যোগাযোগ মডিউলটা স্পর্শ করে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোয়াকম্পের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, "তুমি এটা কী করেছ?"

"কী হয়েছে?"

"নগরকেন্দ্রে জলমানবকে নিয়ে অনুষ্ঠানটির কথা বলছি। এটি নূতন প্রজন্মের উদ্দেশে একটি অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। জলমানবকে একটি অসভ্য বন্য প্রজাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল। হাঙর মাছের হাতে তার মৃত্যুদৃশ্যটি নূতন প্রজন্মের উপভোগ করার কথা ছিল।"

সমাজ দপ্তরের প্রধান একটু অধৈর্য গলায় বলল, "আমরা তার ব্যবস্থা করেছিলাম। বিষয়টা নিশ্চিত করার জন্য একটির জায়গায় দুটি হাঙর মাছ দিয়েছিলাম। জলমানবকে দেখে যেন সবার ভেতরে এক ধরনের ঘৃণা হয় সেজন্য তাকে কুৎসিত একটা মুখোশ পরিয়েছিলাম। আমরা বুঝতে পারি নি সে নিজের মুখোশ খুলে ফেলবে। বুঝতে পারি নি জলমানবটি দুই–দুইটা হাঙর মাছকে হত্যা করে বের হয়ে আসবে।"

কোয়াকম্প ভাবলেশহীন গলায় বলল, "জলমানবের হাতে একটা ধারালো চাকু দেওয়ার সিদ্ধান্তটি একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল।"

"একেবারে খালি হাতে দুটি ক্ষুধার্ত হাঙর মাছের মাঝখানে ফেলে দেওয়াটা অমানবিক বলে মনে হয়েছিল। বিষয়টা আরো নাটকীয় করার জন্য তাকে ছোট একটা চাকু দেওয়া হয়েছিল। আমরা বিষয়টি তোমার সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছিলাম, তুমি অনুমতি দিয়েছিলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। তখন অনুমতি দিয়েছিলাম, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল না।"

সমাজ দপ্তরের প্রধান চমকে উঠে বলল, 'তুমি এর আগে কখনো ভুল সিদ্ধান্ত নাও নি। এই প্রথম তুমি একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছ, কোয়াকম্প।"

কোয়াকম্প দীর্ঘসময় চুপ করে থেকে বলল, "ভুলগুলো সংশোধনের সময় এসেছে। কথা ছিল এই ঘটনা দেখে জলমানবের জন্য এক ধরনের ঘৃণার জন্ম নেবে। হাঙর মাছের হাতে তার এক ধরনের নিষ্ঠুর মৃত্যু হলে সকল দর্শকের মাঝে জলমানবের জন্য ঘৃণা জন্ম নিত। উল্টো জলমানবটি সবার সামনে একজন সাহসী বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবার সমবেদনা এবং ভালবাসা ছিল এই জলমানবের জন্য। এটি খুব বড় ভুল হয়েছে।"

"আমাদের কিছু করার ছিল না।"

কোয়াকম্প বলল, "কাটুস্কা নামের মেয়েটি পুরো বিষয়টাকে অনেক জটিল করে দিয়েছে। তাকে কিছুতেই মঞ্চে আসতে দেওয়া উচিত হয় নি। কিছুতেই জলমানবের কাছে পৌঁছাতে দেওয়া উচিত হয় নি।"

"নিরাপত্তাকর্মীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে বাধা উপেক্ষা করে মঞ্চে উঠে গেছে।"

কোয়াকম্প শুষ্ক গলায় বলল, "পুরো বিষয়টাকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার এখন একটি মাত্র উপায়।"

"কী উপায়?"

"জলমানবকে দিয়ে কাটুস্কাকে খুন করানো।"

সমাজ দপ্তরের প্রধান চমকে উঠে বলল, "কাটুস্কা প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওনের মেয়ে। রিওন তার মেয়েকে অসম্ভব ভালবাসে।"

"তাতে কিছু আসে যায় না। আমি ভালবাসা বুঝি না। আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ বুঝি। আমার ওপর দায়িত্ব তোমাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধানের মধ্যে আমি এক ধরনের দুর্বলতা লক্ষ করছি। এই দুর্বলতা থাকলে সে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান হতে পারবে না। তাকে আরো শক্ত হতে হবে। সে এই ঘটনায় শক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।"

সমাজ দপ্তরের প্রধান চুপ করে রইল, হঠাৎ করে সে অসহায় বোধ করতে থাকে। ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "আমরা কেমন করে জলমানবকে দিয়ে কাটুস্কাকে খুন করাব? জলমানব কাটুস্কাকে নিরাপত্তাকর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করছে। কাটুস্কার জন্য তার এক ধরনের মায়া রয়েছে।"

"তোমরা সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। জলমানবের বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর। সঠিক কম্পনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেজোনেন্স তৈরি করে দিতে পারলেই সে খুনি হয়ে যাবে। তখন সামনে যাকেই পাবে তাকেই খুন করবে।"

"ও।" সমাজ দপ্তরের প্রধান মৃদুস্বরে বলল, "ঠিক আছে। বুঝতে পারছি।"

"তুমি শুধু কাটুস্কা আর জলমানবকে একঘরে বন্ধ কর। ঘরটির যেন ধাতব দেয়াল হয়।"

"ঠিক আছে।"

কোয়াকম্প বলল, "আর শোনো।"

"কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার সঙ্গে আমার এই কথোপকথনটি কারো জানার প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু—"

"এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই।"

সমাজ দপ্তরের প্রধান একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল। ঠিক কী কারণ জানা নেই হঠাৎ করে সে নিজের ভেতরে ভয়ের একটা কাঁপুনি অনুভব করে।

ছোট একটা ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা গোলটেবিল এবং সেই টেবিলের দুই পাশে দুটি চেয়ার। টেবিলে কিছু শুকনো খাবার এবং একটা পানীয়ের বোতল। একটি চেয়ারে কাটুস্কা বসে আছে। নিহন তার পাশে ঘরের মোটামুটি ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কাটুস্কা ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না এখানে কী হচ্ছে?"

নিহন জিজ্ঞেস করল, "কেন, কী হয়েছে?"

"আমি প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধানের মেয়ে। আমাকে এভাবে ছোট একটা ঘরে আটকে রাখার কথা না। আমাকে নেওয়ার জন্য এখন প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে বড় বড় মানুষের চলে আসার কথা।"

নিহন কোনো কথা বলল না। কাটুস্কা বলল, "আমি তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য হেলিকপ্টার আনিয়েছিলাম, কিন্তু হেলিকপ্টার কেন তোমাকে ছেড়ে দেয় নি, কেন এখানে নিয়ে এসেছে—আমি সেটাও বুঝতে পারছি না।"

নিহন এবারো কোনো কথা বলল না। কাটুস্কা পকেট থেকে তার যোগাযোগ মডিউলটা বের করে বলল, "আর কী আশ্চর্য, দেখ আমার যোগাযোগ মডিউলটা দিয়ে আমি আমার বাবার সাথে কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারছি না।"

নিহন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আমি তোমাদের সমাজকে বুঝতে পারি না। তোমাদের সমাজটা অন্য রকম।"

"কী রকম?"

"আমার ধারণা ছিল তোমরা হয়তো স্বার্থপরের মতো আমাদের সমুদ্রের পানিতে ঠেলে দিয়েছ, কিন্তু তোমরা হয়তো নিজেদের সর্বনাশ করবে না।"

"আমরা নিজেদের সর্বনাশ করছি?"

"হ্যাঁ।"

"এ কথা কেন বলছ?"

"তোমার বয়সী একটা মেয়ে কেন টিকিট কিনে হাঙর মাছ দিয়ে একটা মানুষকে খেয়ে ফেলার দৃশ্য দেখতে আসে? এটা কী রকম সমাজ? তোমরা কী রকম মানুষ?"

কাটুস্কা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। নিহন জিজ্ঞেস করল, "কী হল? থেমে গেলে কেন? বল।"

"না, বলব না। বলে লাভ নেই। আমাদের যুক্তিগুলো তুমি বুঝবে না।"

নিহন মাথা নাড়ল, "আমি বুঝতে চাই না। আমাদের অনেক কষ্ট, কিন্তু তোমাদের এই জীবনের জন্য আমি কখনো আমার কষ্ট ছেড়ে আসব না।"

কাটুস্কা স্থির দৃষ্টিতে নিহনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন? এ কথা কেন বলছ?"

"তোমাদের ল্যাবরেটরিতে আমাকে হাজার হাজার যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করেছে। কত চমৎকার যন্ত্রপাতি, যেটা আমরা জীবনে দেখি নি, শুধু ছবি দেখেছি। কিন্তু অবাক ব্যাপার কী জান?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী?"

"তোমাদের কোনো মানুষ সেই যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে সেটা জানে না। তোমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে কোয়াকম্প, একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার! সে তোমাদের আদেশ দেয় তোমরা তার আদেশে ওঠ, তার আদেশে বস।"

কাটুস্কা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঠোঁটের আঙুল দিয়ে বলল, "শ-স-স-স—।"

নিহন অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"কোয়াকম্প নিয়ে এখানে কোনো কথা বোলো না।"

নিহন অবাক হয়ে বলল, "কেন?"

"মানুষের বুদ্ধিমত্তা মস্তিষ্কের ভেতরে যে রকম থাকতে পারে, বাইরেও থাকতে পারে। কোয়াকম্প সে রকম আমাদের সবার মস্তিষ্কের বাইরের বুদ্ধিমত্তা। আমাদের সবার অস্তিত্ব—"

হঠাৎ করে ঘরের ভেতর একটা ভোঁতা শব্দ হল, তার সঙ্গে এক ধরনের সূক্ষ্ম-কম্পন। নিহন অবাক হয়ে বলল, "কিসের শব্দ?"

কাটুস্কা ওপরের দিকে তাকাল, তারপর ফিসফিস করে বলল, "ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেজোনেন্স।"

"কী হয় এই রেজোনেন্স দিয়ে?"

"মস্তিষ্কে স্টিমুলেশন দেওয়া হয়। অনুভূতির পরিবর্তন করা হয়।"

নিহন অবাক হয়ে বলল, "এখন কেউ আমাদের অনুভূতি পাল্টে দেবে?"

কাটুস্কা ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, "হ্যাঁ। মনে হয় আমাদের অনুভূতি পাল্টে দেবে।"

নিহন হঠাৎ নিজের ভেতরে গভীর এক ধরনের বিষাদ অনুভব করে। তার মনে হতে থাকে এই জীবন অর্থহীন। বুকের ভেতর সে চাপা একটি হাহাকার অনুভব করে। ঘরের ভেতর ভোঁতা শব্দটি হঠাৎ একটু তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। নিহন তার মস্তিষ্কের ভেতর এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করে, ভোঁতা যন্ত্রণায় মাথার ভেতর দপদপ করতে থাকে এবং যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভেতর বিচিত্র একটা ক্রোধ দানা বাঁধতে থাকে। নিহন ফিসফিস করে নিজেকে বলল, "আমাকে ওরা রাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমার কিছুতেই রেগে ওঠা চলবে না। কিছুতেই না।"

তারপরও সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার ভেতর ভয়ঙ্কর একটি ক্রোধ বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ে। "এই মেয়েটি আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।" নিহন দাঁতে দাঁত ঘষে নিজেকে বলে, "এই মেয়েটি আমাকে ধরিয়ে এনেছে। এই মেয়েটির জন্য আমাকে ভয়ঙ্কর দুটি হাঙর মাছের মুখে পড়তে হয়েছিল। আমার এই হতভাগিনী মেয়েটিকে খুন করে ফেলা উচিত। ধারালো চাকু দিয়ে ফালা ফালা করে ফেলা উচিত।"

নিহন অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক ধরনের অমানবিক ক্রোধ তার ভেতর পাক খেয়ে উঠতে থাকে। নিজের অজান্তেই সে তার পায়ে বেঁধে রাখা চাকুটা হাতে তুলে নেয়। ধারালো চাকুটা দিয়ে কাটুস্কাকে ফালা ফালা করার এক ধরনের অমানবিক ইচ্ছা তাকে অস্থির করে তোলে।

"তুমি!" কাটুস্কার চিৎকার শুনে নিহন তার চোখের দিকে তাকাল।

কাটুস্কা হাত তুলে নিহনের দিকে দেখিয়ে চিৎকার করে বলে, "তুমি এই সর্বনাশের শুরু করেছ। তোমার জন্য আজ আমার এই অবস্থা! তোমাকে আমি খুন করে ফেলব!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহন পরিষ্কারভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছিল না। ভয়ঙ্কর ক্রোধের ভেতর সে আবছাভাবে বুঝতে পারে ঠিক তার মতোই এই মেয়েটির মাথায় ভয়ঙ্কর ক্রোধ এসে ভর করেছে। ঠিক তার মতোই এই ক্রোধ পুরোপুরি অযৌক্তিকভাবে তার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

কাটুস্কা চিৎকার করে বলল, "তুমি একটি হিংস্র জলমানব। তুমি কেন এসেছ আমাদের কাছে? কেন? যাও। তুমি যাও। তুমি চলে যাও এখান থেকে। তুমি জাহান্নামে যাও। আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও।"

নিহন অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে, বিড়বিড় করে বলে, "আমাকে একটু ধৈর্য দাও। একটু শক্তি দাও। এই হতভাগিনী মেয়েটাকে আমি নিশ্চয়ই খুন করে ফেলব—কিন্তু তবুও আমাকে আর একটু সহ্য করতে দাও।"

বাইরের তীক্ষ্ণ শব্দটির কম্পন হঠাৎ আরো বেড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কাটুস্কা হিংস্র মুখে নিহনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার নখ দিয়ে মুখ খামচে ধরে চিৎকার করে বলে, "তোমার ওই নোংরা চোখ দুটো আমি খুবলে তুলে ফেলব। খামচি দিয়ে মুখের চামড়া তুলে ফেলব—"

নিহন আর কিছু চিন্তা করতে পারছিল না। তার সমস্ত চেতনা অবলুপ্ত হয়ে সেখানে ভয়ঙ্কর অন্ধ এক ধরনের ক্রোধ এসে ভর করেছে। নিজের অজান্তে ধারালো চাকুটা হাতে নিয়ে সে খুব ধীরে ধীরে তার হাত ওপরে তুলেছে। ঠিক তখন কাটুস্কা আবার তাকে আঘাত করল। নিহন প্রস্তুত ছিল না, তাল সামলাতে না পেরে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। হাত দিয়ে নিজেকে কোনোভাবে সামলে নিয়ে নিহন আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়ে থেমে গেল। তার ভেতরকার অন্ধ ক্রোধটি নেই, তার বদলে সেখানে এক ধরনের বিস্ময়! নিহন কাটুস্কার দিকে তাকাল, কাটুস্কার সমস্ত মুখ ভয়ঙ্কর ক্রোধে বিকৃত হয়ে আছে। একটি চেয়ার তুলে এনে সে সেটা দিয়ে নিহনকে আঘাত করার চেষ্টা করল। নিহন কোনোভাবে হাত তুলে নিজেকে রক্ষা করে ঘরটার দিকে তাকাল, এটা একটা রেজোনেন্ট কেভিটি। ঘরের মেঝেতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই, ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ঘরের মাঝখানে সেটা সর্বোচ্চ। সে মেঝেতে শুয়ে আছে বলে তার মস্তিষ্কে কোনো স্টিমুলেশন নেই, তাই অন্ধ ক্রোধটিও নেই। কাটুস্কা দাঁড়িয়ে আছে, তীব্র ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড তার মস্তিষ্ককে দলিত-মথিত করে ফেলছে, তাই তার ভেতরে ভয়ঙ্কর অন্ধ ক্রোধ। সেই অন্ধ ক্রোধকে দমাতে হলে কাটুস্কাকেও মেঝেতে শুইয়ে ফেলতে হবে।

নিহন গড়িয়ে কাটুস্কার কাছে এগিয়ে যায়, কিছু বোঝার আগে তার পা দুটি জাপটে ধরে টান দিয়ে নিচে ফেলে দেয়—"ছাড় আমাকে, ছাড়, ছেড়ে দাও" বলে চিৎকার করতে করতে কাটুস্কা হঠাৎ থেমে যায়। সে শুনতে পায় নিহন তাকে মেঝেতে চেপে ধরে রেখে ফিসফিস করে বলছে, "শান্ত হও। শান্ত হও, কাটুস্কা।"

কাটুস্কা বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কী হল? হঠাৎ করে আমার রাগটা কমে গেল কেন?"

"শুয়ে থাক, তা হলেই হবে।"

"কেন?"

"এই ঘরটা আসলে একটা রেজোনেন্ট কেভিটি। এর ভেতরে স্ট্যান্ডিং ওয়েভ তৈরি করা হয়েছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী স্ট্যান্ডিং ওয়েভ। ঘরের মাঝখানে সবচেয়ে বেশি, মেঝেতে কমতে কমতে শূন্য হয়ে গেছে। তাই শুয়ে থাকলে তোমার মস্তিষ্কে সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কোনো স্টিমুলেশন দিতে পারবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটুস্কা অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

"পড়েছি।"

"তোমাদের এসব পড়তে হয়?"

"হ্যাঁ। আমাদের কোয়াকম্পের মতো কোয়ান্টাম কম্পিউটার নেই, তাই অন্য কিছু আমাদের জন্য চিন্তা করে না। আমাদের নিজেদের চিন্তা নিজেদের করতে হয়!"

"কী আশ্চর্য!"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। তোমরা যেটা কর, সেটা হচ্ছে আশ্চর্য।"

কাটুস্কা মেঝেতে মাথা লাগিয়ে শুয়ে থেকে বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "আমি খুব দুঃখিত, নিহন। খুব দুঃখিত।"

"কেন?"

"খামচি দিয়ে তোমার চোখ দুটো খুবলে তোলার চেষ্টা করেছিলাম বলে।"

নিহন হেসে ফেলল, এই প্রথম সে হেসেছে এবং তার মুক্তার মতো ঝকঝকে দাঁত দেখে কাটুস্কা অবাক হয়ে যায়, একটা মানুষ কেমন করে এত সুদর্শন হতে পারে সে ভেবে পায় না। কাটুস্কা নিচু গলায় বলল, "এটা হাসির ব্যাপার না—তুমি হাসছ কেন?"

"আমি হাসছি কারণ আর একটু হলে আমি আমার চাকুটা দিয়ে তোমাকে ফালা ফালা করে দিতাম। তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে খুব বড় উপকার করেছ।"

"এখন আমরা কী করব? সারাক্ষণ কি এভাবে শুয়েই থাকব?"

"না, বের হব।"

কাটুস্কা বলল, "কীভাবে বের হবে? এই ঘরটা বাইরে থেকে তালা মারা।"

"এটা নম্বর তালা। ভেতর থেকে সঠিক নম্বরটি দেওয়া হলে তালাটি খুলে যাবে না?"

"হ্যাঁ। খুলে যাবে। কিন্তু নম্বরটি তো তুমি জান না। তা ছাড়া তুমি শুয়ে শুয়ে তালাটি খুলতে পারবে না। খোলার জন্য তোমাকে দাঁড়াতে হবে।"

"আমি দাঁড়াব।"

"কেমন করে দাঁড়াবে?"

"টেবিলের উপর যে টেবিল ক্লথটা আছে সেটার উপর অ্যালুমিনিয়ামের একটা আস্তরণ আছে। আমি এটা আমার মাথায় বেঁধে নেব। সেটা তখন ফ্যারাডে কেজের মতো কাজ করবে।"

"তার মানে কী?"

"তার মানে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকতে পারবে না।"

"সত্যি?"

নিহন বলল, "হ্যাঁ, এই দেখ।"

নিহন টেবিলের উপর থেকে টেবিল ক্লথটা টেনে নামিয়ে এনে মাথায় বেঁধে নিয়ে সাবধানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। টেবিল ক্লথটায় এক ধরনের উষ্ণতা অনুভব করে কিন্তু তার বেশিকিছু নয়। নিহন দরজাটার কাছে এগিয়ে গেল।

বাইরে থেকে ঘরটি তালা মেরে রেখেছে। নিহন অনুমান ভর করে একটা সংখ্যা ঢোকাতেই তালাটা খুট করে খুলে গেল। কাটুস্কা অবাক হয়ে বলল, "তুমি কেমন করে খুললে?"

"জানি না। আন্দাজে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কীভাবে আন্দাজ করলে?"

"যেহেতু এগুলো সব তোমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে তাই সংখ্যাটা নিশ্চয়ই সাধারণ সংখ্যা হবে না। নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো সংখ্যা হবে। তাই চার অঙ্কের বিশেষ একটা সংখ্যা দিয়ে চেষ্টা করেছি। প্রথম চেষ্টাতেই মিলে গেছে। তোমাদের কোয়ান্টাম কম্পিউটার আসলে খুব সাদাসিধে টাইপের।"

"কী আশ্চর্য!"

"আশ্চর্য হবার অনেক সময় পাবে। এখন চল বের হয়ে যাই।"

"চল।"

দরজা খুলে দুজন বের হয়ে যায়। দূরে কোথাও অ্যালার্ম বাজতে থাকে। তার মধ্যে দুজন একজন আরেকজনের হাত ধরে ছুটতে থাকে।

১২

প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান রিওন সমাজ দপ্তরের প্রধানকে জিজ্ঞেস করল, "আমার মেয়ে কাটুস্কা কোথায়?"

সমাজ দপ্তরের প্রধান ইতস্তত করে বলল, "আমি জানি না।"

"আমার কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে যে তোমার লোকজন আমার মেয়ে আর জলমানব ছেলেটিকে ধরে এনেছে।"

"হ্যাঁ। ধরে এনেছিল। কিন্তু তারা এখান থেকে পালিয়ে গেছে।"

রিওন ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "কেন তাদের ধরে এনেছিলে, তোমাকে কে সেই ক্ষমতা দিয়েছে?"

সমাজ দপ্তরের প্রধান ইতস্তত করে বলল, "আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাই না, কিন্তু তুমি জেনে রাখ আমাকে সেই ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল এবং আমার কোনো উপায় ছিল না।"

রিওন কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সমাজ দপ্তরের প্রধানের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "এখন তারা কোথায়?"

"আমি জানি না। এখান থেকে বের হয়ে একটা দ্রুতগামী ক্যাব ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে।"

"কোথায় গেছে?"

"আমি জানি না।"

রিওন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, প্রচণ্ড একটা ঘুষি দিয়ে সমাজ দপ্তরের প্রধানের সামনের কয়েকটা দাঁত ফেলে দেয়ার একটা অদম্য ইচ্ছাকে রিওন অনেক কষ্ট করে দমিয়ে রাখল। সে আস্তে আস্তে বলল, "কাজটা মনে হয় ভালো হল না।"

সমাজ দপ্তরের প্রধান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কোন কাজটা ভালো, কোনটা খারাপ সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা আমরা বহুদিন আগে ছেড়ে দিয়েছি রিওন।"

"কাজটা ঠিক হয় নি। আবার আমাদের চিন্তাভাবনা করা শুরু করতে হবে।"

রিওন ঘরের দরজায় লাল রঙের মনিটরের সামনে তার ডান চোখটা লাগাল। একটা ইনফ্রারেড রশ্মি চোখের রেটিনা স্ক্যান করে খুট করে দরজাটা খুলে দিল। রিওন দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "শুভ সন্ধ্যা রিওন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিওন মাথা থেকে টুপিটা খুলতে গিয়ে থেমে যায়। সে নিচু গলায় বলে, "শুভ সন্ধ্যা কোয়াকম্প।"

"রিওন, তোমার এখানে এখন আসার কথা নয়।"

"আমি জানি।"

"তা হলে তুমি কেন এসেছ?"

"আমি তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি।"

"তুমি আমার সাথে কী নিয়ে কথা বলতে এসেছ?"

রিওন নিচু গলায় বলল, "তুমি জান আমি তোমার সাথে কী নিয়ে কথা বলতে এসেছি।"

"তোমার মেয়ে এবং জলমানব?"

"হ্যাঁ। আমার মেয়ে কাটুস্কা এবং জলমানব নিহন।"

কোয়াকম্প শুষ্ক গলায় বলল, "তুমি তাদের নিয়ে কী কথা বলতে চাও?"

রিওন ধীরে ধীরে বলল, "তুমি নিহনকে দিয়ে আমার মেয়েকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলে।"

"রিওন, তোমাকে শুধু তোমার মেয়ের ভালোমন্দ দেখতে হয়। আমার দায়িত্ব অনেক বেশি। আমাকে তোমাদের সবার ভালোমন্দ দেখতে হয়। সেই দায়িত্ব কঠিন। সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনো কখনো আমাকে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।"

রিওন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "একটা মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন আমরা তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাই। একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার যখন মিথ্যা কথা বলে তখন আমরা কী করি কোয়াকম্প?"

"তুমি কী বলতে চাও রিওন?"

"আমি বলতে চাই তুমি একটা প্রতারক কোয়াকম্প। তুমি আমাদের সবাইকে প্রতারণা করেছ। তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পার না—তুমি বলেছ জলমানবদের বিবর্তন উল্টোদিকে যাচ্ছে। তুমি বলেছ তারা নির্বোধ হয়ে যাচ্ছে, হিংস্র হয়ে যাচ্ছে, পশু হয়ে যাচ্ছে! আসলে ব্যাপারটি ঠিক তার উল্টো। জলমানবেরা এগিয়ে যাচ্ছে আর আমাদের সন্তানেরা ধীরে ধীরে অমানুষ হয়ে উঠছে, হিংস্র হয়ে উঠছে, তুমি সেটা আমাদের বল নি। কেন বল নি, জান?"

"কেন?"

"কারণ তুমি সেটা জান না।" রিওন একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "তুমি একটা নির্বোধ কোয়ান্টাম কম্পিউটার। নির্বোধ আর মূর্খ। নির্বোধ, মূর্খ এবং অসৎ। অসৎ এবং প্রতারক। প্রতারক এবং খুনি। তোমার মতো একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটারের হাতে আমাদের পুরো ভবিষ্যৎ তুলে দিয়েছিলাম ভেবে আমি শিউরে উঠেছি কোয়াকম্প।"

'তুমি কী চাও রিওন?"

"তুমি খুব ভালো করে জান আমি কী চাই। আমি পকেটে করে আমার রিভলবারটা নিয়ে এসেছি। আমি বড় ফ্রেমের ঢাকনাটা খুলে তোমার মূল ছয়টা প্রসেসরে একটা একটা করে গুলি করব। প্রসেসরগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে—তখন তুমি কোয়াকম্প হবে একটা সাধারণ কম্পিউটিং মেশিন। তুমি শুধু যোগ করবে আর বিয়োগ করবে। আমরা যখন তোমাকে কিছু একটা করতে আদেশ দেব, তুমি স্যালুট দিয়ে বলবে, ইয়েস স্যার! বুঝেছ?"

'রিওন।"

"বল কোয়াকম্প।"

"তুমি এটা কোরো না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি রিওন, তুমি এটা কোরো না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি দুঃখিত কোয়াকম্প।"

"তোমার সাথে আমি পুরো বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে চাই। আমি নিশ্চিত তুমি আর আমি কিছু ব্যাপারে একমত হতে পারব—"

"না কোয়াকম্প। সেটা আর সম্ভব নয়।" রিওন তার পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে তার ম্যাগাজিনটা খুলে পরীক্ষা করে নিয়ে দুই পা এগিয়ে গিয়ে বড় ফ্রেমের ঢাকনাটা খুলে নেয়। পাশাপাশি ছয়টা সোনালি প্রসেসর সাজানো রয়েছে, ছোট টিউব দিয়ে তরল নাইট্রোজেন সেই প্রসেসরগুলোকে শীতল করে রাখছে। রিওন তার রিভলবারটা উঁচু করল ঠিক তখন আবার কোয়াকম্পের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সেটি ক্লান্ত গলায় বলল, "রিওন। তুমি খুব বড় ভুল করছ রিওন। তুমি আমার কথা না শুনে খুব বড় ভুল করছ।"

"আমি কী ভুল করছি?"

"তুমি নিশ্চয়ই আশা কর না যে আমি তোমার মতো উন্মাদকে এত সহজে আমার প্রসেসরে এসে গুলি করতে দেব! তুমি নিশ্চয়ই জান আমি আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।"

রিওন মাথা তুলে তাকাল, বলল, "সেটি কীভাবে করবে তুমি কোয়াকম্প?"

"তোমার মস্তিষ্কের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি আমি জানি। এই ঘরটিতে আমি তোমার মস্তিষ্কের জন্য সঠিক কম্পনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন পাঠাচ্ছি। তুমি তোমার রিভলবারটি এখন ধীরে ধীরে তোমার নিজের মাথায় ধরবে রিওন। তারপর তুমি ট্রিগার টেনে ধরবে। আমার এই ছোট ঘরটি তোমার রক্ত, মস্তিষ্ক আর তোমার খুলির অংশবিশেষে মাখামাখি হয়ে যাবে।"

রিওন চোখ বড় বড় করে তাকাল, বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। সত্যি। বিদায় রিওন।"

রিওন হঠাৎ শব্দ করে হেসে ফেলল, বলল, "কোয়াকম্প। তুমি একটা জিনিস লক্ষ করেছ?"

"কী?"

"আমি এই ঘরের ভেতরে এসে টুপিটা খুলি নি। কেন খুলি নি, জান?"

"কেন?"

"কারণ আমার মাথায় আমি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেঁচিয়ে রেখে সেটা টুপি দিয়ে ঢেকে রেখেছি। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন আটকে রাখার এই সহজ পদ্ধতিটা আমি কোথায় শিখেছি জান?"

কোয়াকম্প কোনো কথা বলল না। রিওন ফিসফিস করে বলল, "জলমানব নিহনের কাছে। সে আমার মেয়ের প্রাণ রক্ষা করেছে কোয়াকম্প। সে তোমার হাত থেকে আমার মেয়েটিকে রক্ষা করেছে। কোয়াকম্প, আমি আমার মেয়েটিকে খুব ভালবাসি। এই মেয়েটি ছাড়া আমার কেউ নেই। যে আমার মেয়েকে খুন করতে চায় তাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারি না।

কোয়াকম্প কাতর গলায় বলল, "আমার ভুল হয়ে গেছে রিওন। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।"

"কোয়ান্টাম কম্পিউটার যখন ভুল করে তখন সেটি আর কোয়ান্টাম কম্পিউটার থাকে না। সে যখন ক্ষমা চায় তখন সে কিছু জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নয়।"

রিওন তার রিভলবারটি উপরে তুলল, কোয়াকম্প আবার কাতর গলায় বলল, "রিওন। তোমাকে বিশ্বজগতের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করি, তুমি আমাকে হত্যা কোরো না! তুমি আমাকে আর একটি সুযোগ দাও! একটি শেষ সুযোগ..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিওন ট্রিগার টেনে ধরতেই ছোট ঘরটিতে গুলির প্রচণ্ড শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। গুলির আঘাতে সোনালি প্রসেসরটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। তরল নাইট্রোজেনের টিউব ফেটে হিমশীতল গ্যাস ঘরটাকে শীতল করে দেয়। রিওন তার রিভলবারটি তুলে আবার গুলি করল, দ্বিতীয় প্রসেসরটিও সাথে সাথে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। রিভলবারের ছয়টি গুলি দিয়ে পরপর ছয়টি প্রসেসরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে রিওন পিছিয়ে আসে। বহু দূর থেকে কাতর আর্তনাদের মতো একটা এলার্মের শব্দ ভেসে আসতে থাকে।

রিওন পিছিয়ে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে, তার পকেটে যোগাযোগ মডিউলটা শব্দ করছে। রিওন সেটা হাতে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "প্রতিরক্ষা দপ্তর? তোমাদের বিচলিত হবার প্রয়োজন নেই। আমি কোয়াকম্পকে অচল করে দিয়েছি! আর শোন আমার মেয়ে কাটুস্কাকে খুঁজে বের কর। তার সাথে একটা কমবয়সী ছেলে থাকতে পারে—খবরদার তার যেন কোনো ক্ষতি না হয়।"

রিওন যোগাযোগ মডিউলটা পকেটে রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। দূর থেকে ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নার মতো একটা শব্দ আসছে, কে কাঁদছে? যন্ত্র কি যন্ত্রণায় কাঁদতে পারে?

সমুদ্রের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ছিল। আকাশে একটা অসম্পূর্ণ চাঁদ, তার মৃদু আলোতে পুরো বালুকাবেলাটিতে এক ধরনের নরম আলো। সেই নরম কোমল আলোতে নিহন একটা নৌকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বলল, "চমৎকার!"

কাটুস্কা ইতস্তত করে বলল, "তুমি সত্যি-সত্যি এই নৌকা দিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেবে? এটা তো একটা খেলনা নৌকার মতো।"

"খেলনা নৌকার মতো হলেও এটা সত্যি নৌকা। নিও পলিমারের তৈরি সমুদ্রের লোনা পানিতে ক্ষয়ে যাবে না। আমার জন্য যথেষ্ট।"

"এই ছোট নৌকা করে তুমি একা একা কয়েক হাজার কিলোমিটার যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে যাবে?"

"তোমার কাছে এই শুকনো মাটিটুকু যে রকম আপন আমার কাছে সমুদ্রের পানি সে রকম আপন! এই সমুদ্রের পানি আমার নিজের এলাকা। আমি এখানে দিনের পর দিন থাকতে পারি।"

"কোন দিকে যেতে হবে তুমি কেমন করে বুঝবে?"

"বছরের এই সময় একটা বড় স্রোত তৈরি হয়, আন্তঃমহাসাগরীয় বিষুবীয় স্রোত। সেই স্রোত নৌকাটাকে নিয়ে যাবে!"

"তুমি খাবে কী?"

'সমুদ্রে কি খাবারের অভাব আছে? কত মাছ। কত রকম সামুদ্রিক লতাপাতা। সমুদ্রে কেউ না খেয়ে থাকে না।"

"পানি? পানি কোথায় পাবে?"

"ঠিকভাবে খেলে আলাদা করে আর পানি খেতে হয় না। আমরা ঠিক করে খেতে পারি। তা ছাড়া সমুদ্রের পানি থেকে যে জলীয় বাষ্প বের হয়, আমরা সেটা সংগ্রহ করতে পারি—"

"কিন্তু—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহন হাসার ভঙ্গি করে বলল, "এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই কাটুস্কা। আজ হোক কাল হোক আমার সঙ্গে কোনো একটা ডলফিনের ঝাঁকের সঙ্গে দেখা হবে। আমি তাদের দিয়ে খবর পাঠাব—ঠিক ঠিক খবর পৌঁছে যাবে আমার এলাকায়। আমার পোষা ডলফিন চলে আসবে তখন।"

কাটুস্কা অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! তোমরা সত্যিই ডলফিনের সঙ্গে কথা বলতে পার?"

"হ্যাঁ, পারি। ডলফিন খুব বুদ্ধিমান, তাদের বুকভরা ভালবাসা। কাজেই তুমি আমার জন্য কোনো চিন্তা কোরো না। আমি পৌঁছে যাব। শুধু একটা ব্যাপার—"

"কী ব্যাপার?"

"এই যে নৌকাটা আমি নিয়ে যাচ্ছি কাউকে কিছু না বলে এটা তো ঠিক হচ্ছে না। এটা কার নৌকা আমি জানি না।"

"তুমি সেটা নিয়ে চিন্তা কোরো না, আমি নৌকার মালিককে খুঁজে বের করে তাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেব।"

"তোমাকে অনেক ধন্যবাদ কাটুস্কা। অনেক ধন্যবাদ।"

নিহন আকাশের দিকে তাকাল, তারপর সমুদ্রের পানির দিকে তাকাল, কান পেতে কিছু একটা শুনল, তারপর ঘুরে কাটুস্কার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার মনে হয় এখন রওনা দিয়ে দেওয়া উচিত। বাতাসের শব্দ শুনছ? এই বাতাসে পাল তুলে দিলে আমি দেখতে দেখতে সমুদ্রের স্রোতে পৌঁছে যাব।"

কাটুস্কা কিছু বলল না। নিহন বলল, "তোমাকে যে আমি কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। তুমি আমাকে সাহায্য না করলে আমি কোনো দিন এখান থেকে যেতে পারতাম না।"

কাটুস্কা এবারো কোনো কথা বলল না। নিহন বলল, "এখন অনেক রাত। তুমি ফিরে যাও, কাটুস্কা। তোমাকে নিশ্চয়ই সবাই খুঁজছে।"

"হ্যাঁ। যাই।" কাটুস্কা খুব সাবধানে নিহনের মুখমণ্ডল স্পর্শ করে বলল, "তুমিও যাও। খুব সাবধানে যেও।"

"যাব।"

"আমার কথা মনে রেখ।"

"মনে রাখব, কাটুস্কা।"

"তোমার অনেক কষ্ট হল, তাই না?"

"না, আমার কোনো কষ্ট হয় নি।"

"আমরা তোমাদের পানিতে ঠেলে দিয়ে খুব অন্যায় করেছিলাম। অথচ—"

"অথচ কী?"

"অথচ তোমরাই ভালো আছ। আমরা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাচ্ছি।"

"এ রকম কথা কেন বলছ?"

কাটুস্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "আমার খুব কাছের বন্ধুরা আত্মহত্যা করেছে। যারা করে নি তাদের বেশিরভাগ নেশায় ডুবে থাকে। বাকি যারা আছে তারা ভান করে যে খুব ভালো আছে, আসলে কেউ ভালো নেই। তারা সব সময় বলে এই জীবনের কোনো অর্থ নেই। এর থেকে মরে যাওয়া ভালো।"

"কী বলছ তুমি?"

কাটুস্কা বলল, "হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের দেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো কোনো স্বপ্ন নেই। আমরা কেন বেঁচে আছি জানি না। নিহন, তোমাকে দেখে আমার যে কী হিংসা হচ্ছে তুমি জান?"

"কেন, কাটুস্কা?"

"চাঁদের আলোতে উত্তাল সমুদ্রে তুমি এই ছোট নৌকায় পাল উড়িয়ে যাবে। সমুদ্রের মাছ, লতাপাতা তোমার খাবার—সমুদ্রের পানি তোমার আশ্রয়। ডলফিনেরা এসে তোমার সঙ্গে কথা বলবে—যখন তোমার এলাকায় পৌঁছাবে সেখানে তোমার আপনজনেরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে! কোনো একটা রূপবতী মেয়ে হয়তো ছুটে এসে তোমার বুকে মাথা গুঁজে ভেউ ভেউ করে কাঁদবে? কাঁদবে না?"

"না। কাঁদবে না। আমার আপনজনেরা আমার কাছে ছুটে আসবে, কিন্তু কোনো রূপবতী মেয়ে আমার কাছে আলাদা করে ছুটে আসবে না।"

"আমি যদি একজন জলমানবী হতাম তা হলে আমি তোমার কাছে ছুটে যেতাম।"

নিহন কোনো কথা বলল না। কাটুস্কা ফিসফিস করে বলল, "আমার কী ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে যেতে! ইস! আমি যদি তোমার মতো জলমানব হয়ে যেতে পারতাম!"

কাটুস্কা জলমানব হতে পারল না। সে সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে রইল—সমুদ্রের ঢেউ তার পা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। বাতাসে হাহাকারের মতো এক ধরনের শব্দ, মনে হয় কেউ বুঝি করুণ স্বরে কাঁদছে। চাঁদের আলোতে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা নৌকা পাল উড়িয়ে যাচ্ছে। সেই নৌকায় অসম্ভব রূপবান একজন জলমানব ধীরে ধীরে সমুদ্রের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। সে কি চিৎকার করে ডাকবে এই রূপবান তরুণটিকে, কাতর গলায় অনুনয় করে বলবে, "তুমি আমাকে নিয়ে যাও! আমাকে নিয়ে যাও তোমার সাথে!"

কাটুস্কা ডাকল না, ডাকলেও সমুদ্রের উথাল-পাথাল বাতাসে সেই ডাকটি কেউ শুনতে পেত না।

AMARBOI.COM

১৩

সমুদ্রের নীল পানিতে ছোট একটা নৌকা ভেসে যাচ্ছে। চারপাশে অথই জলরাশি তার কোনো শুরু নেই কোনো শেষ নেই। নৌকার হাল ধরে নিহন মৃদু স্বরে গান গায়, বিরহিণী একটা মেয়ের গান। মেয়েটি ঘরের দরজায় মাথা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রিয়তম নৌকা নিয়ে সমুদ্রে গিয়েছে কখন ফিরে আসবে সে জানে না। আকাশ কালো করে মেঘ আসছে, সমুদ্রের নীল জল ধূসর হয়ে ফুঁসে উঠছে, কিন্তু দিগন্তে এখনো তো নৌকার মাস্তুল ভেসে উঠছে না। মেয়েটির বুকে অশুভ আশঙ্কার ছায়া, দরজায় মাথা রেখে ভাবছে তার প্রিয়তম ফিরে আসতে পারবে কি? নিহন কোথায় শিখেছে এই গানের কলি? শিখেছে কি কখনো?

অন্ধকার নেমে এলে আকাশের নক্ষত্রেরা পরম নির্ভরতায় তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চেনা নক্ষত্রগুলো পুব আকাশে উঠে সারা রাত তাকে চোখে চোখে রেখে সূর্য ওঠার আগে অদৃশ্য হয়ে যায়। ভোরবেলা সূর্যের নরম আলো ভালবাসার হাত বাড়িয়ে দেয় নিহনের দিকে।

নিহন নৌকার হাল ধরে বসে থাকে। আন্তঃমহাসাগরীয় স্রোত তাকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কত দিন সে ভাসবে এভাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

দরজায় শব্দ শুনে কায়ীরা চোখ মেলে তাকাল। এত রাতে কে এসেছে?

কায়ীরা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা চাদরটা নিজের গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে বাইরে এল। অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো কে যেন দাঁড়িয়ে আছে, কায়ীরা অবাক হয়ে বলল, "কে?"

"আমি। আমি নিহন।"

"নিহন!" কায়ীরা কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারে না। কাছে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে। যেন ছেড়ে দিলেই সে হারিয়ে যাবে। জ্যোৎস্নার ম্লান আলোতে নিহনকে দেখার চেষ্টা করল, বলল, "তুমি কখন এসেছ, নিহন।"

"এই তো। এখন।"

"তুমি কেমন ছিলে, নিহন? তোমাকে নিয়ে আমরা এত ভাবনায় ছিলাম! তোমাকে আমরা কখনো ফিরে পাব সেটা ভাবি নি, নিহন।"

চাঁদের ম্লান আলোতে নিহন মৃদু হাসল, বলল, "আমিও ভাবি নি আমি কখনো ফিরে আসব।"

"তুমি কেমন করে ফিরে এসেছ?"

"ছোট একটা নৌকায়। আন্তঃমহাসাগরীয় স্রোতে ভেসে ভেসে।"

"নৌকা কেমন করে পেলে?"

"আমাকে একজন দিয়েছে। একটি মেয়ে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, কায়ীরা, সত্যি। সে আমাকে বলেছে আমার মতন সেও জলমানব হয়ে যেতে চায়।"

কায়ীরা কোনো কথা বলল না, একটু অবাক হয়ে নিহনের দিকে তাকিয়ে রইল। নিহন ফিসফিস করে বলল, "তোমার মনে আছে, কায়ীরা, অনেক দিন আগে তুমি আমাকে বলেছিলে আমরা, জলমানবেরা আমাদের নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে টিকে আছি? সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানটুকু কী আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে বল নি।"

"হ্যাঁ, মনে আছে।"

"তুমি আমাকে বলেছিলে আমার নিজের সেটা খুঁজে বের করতে হবে।"

"হ্যাঁ বলেছিলাম।"

"আমি সেটা কী খুঁজে বের করেছি।"

"বের করেছ? সেটা কী?"

"জীবনের কাছাকাছি জ্ঞান হচ্ছে সত্যিকারের জ্ঞান। যদি সেটা না থাকে তা হলে যত চমকপ্রদ জ্ঞানই হাতে তুলে দেওয়া হোক সেটা ধরে রাখা যায় না।"

কায়ীরা একটু হাসল, বলল, "তুমি এইটুকুন ছেলে কত বড় মানুষের মতো কথা বলছ।"

"আমি এটা আমার জীবন থেকে শিখেছি, কায়ীরা। আমার জীবনটা ছোট হতে পারে, কিন্তু এর মাঝে অনেক কিছু ঘটেছে।"

" আমি জানি।"

"আমরা যে ডলফিনের সাথে কথা বলি, এই জ্ঞানটুকু স্থলমানবদের মহাকাশযান তৈরি করার জ্ঞান থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

কায়ীরা মাথা নাড়ল। নিহন বলল, "সামুদ্রিক শ্যাওলা দিয়ে কীভাবে কাপড় বানাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় সে জ্ঞান কোয়ান্টাম কম্পিউটার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সামুদ্রিক শঙ্খ দিয়ে কীভাবে মস্তিষ্ক প্রদাহের ওষুধ তৈরি করতে হয় সেই জ্ঞান তাদের নিউক্লিয়ার শক্তির জ্ঞান থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেভাবে—"

কায়ীরা নিহনের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, "নিহন, আমি বুঝতে পারছি, আমি বুঝতে পারছি তুমি কী বলতে চাইছ।"

কায়ীরা নিহনকে আবার গভীর মমতায় আলিঙ্গন করে ফিসফিস করে বলল, "নিহন, তুমি এখন তোমার মায়ের কাছে যাও। কত দিন থেকে তোমার মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

"হ্যাঁ, যাই।"

কায়ীরা নিহনকে ছেড়ে দিল, নিহন জ্যোৎস্নার আবছা আলোতে হেঁটে হেঁটে তার মায়ের কাছে যেতে থাকে।

নিহনকে স্থলমানবেরা ধরে নিয়েছিল গ্রীষ্মের শুরুতে। এখন গ্রীষ্মের শেষ। আকাশে শরতের মেঘ উঁকি দিতে শুরু করেছে। বাতাসে হঠাৎ হঠাৎ হিমেল বাতাসের স্পর্শ পাওয়া যায়। নিহন আবার তার আগের জীবনে ফিরে গেছে, প্রিয় ডলফিন শুশুকে নিয়ে সমুদ্রের পানিতে ছুটে বেড়ায়, সমুদ্রের গভীরে গিয়ে সেখানকার বিচিত্র জীবনে গভীর কৌতূহল নিয়ে দেখে। নীল তিমিকে পোষ মানানোর একটা পরিকল্পনা অনেক দিন থেকে সবার মাথায় কাজ করছিল, সবাই মিলে সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। ডলফিনের বেলায় কাজটা সহজ ছিল, নীল তিমির বেলায় এত সহজ নয়।

নিহনের ভেতরে একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে লেখাপড়ার ব্যাপারে। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে লেখাপড়া করে। নিজে যেটুকু জানে ছোটদের সেটা সে শেখায় অনেক আগ্রহ নিয়ে। সে বুঝে গেছে তাদের বেঁচে থাকার এই একটিই উপায়। যেটুকু জ্ঞান আছে সেটা ধরে রাখতে হবে, আর নূতন জ্ঞানের জন্ম দিতে হবে। তাদের বেঁচে থাকার জন্য কোনো সম্পদের দরকার নেই, দরকার হচ্ছে জ্ঞান। পৃথিবীর সকল সম্পদও ছোট একটু জ্ঞানের পাশে দাঁড়াতে পারে না।

AMARBOI.COM

মাঝখানে কয়দিন আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল, হঠাৎ করে মেঘ কেটে আকাশে সূর্য উঠেছে। নিহন ছোট ছোট কিছু ছেলেমেয়েকে নিয়ে সমুদ্রের পানিতে খেলছে, পোষা ডলফিনে উঠে সমুদ্রের নিচে চলে যাওয়ার খেলা। খেলা যখন খুব জমে উঠেছে, তখন হঠাৎ করে তার পোষা ডলফিন শুশু তার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। নিহন আদর করে শুশুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কী খবর, শুশু?"

শুশু তার ভাষায় উত্তর দিল, "নৌকা।"

"কার নৌকা?"

"জানি না। অনেক অনেক দূর।"

নিহনের ভুরু কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, কোথা থেকে নৌকা আসছে? কেন আসছে?

"কতগুলো নৌকা?"

"একটা।"

"কত বড় নৌকা?"

"ছোট।"

নিহন ছেলেমেয়েগুলোকে নাইনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে শুশুর পিঠে চেপে বসে। পেটে থাবা দিয়ে বলে, "চল যাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুশু মাথা নেড়ে বলল, "ভয়।"

"কোনো ভয় নেই। শুধু দূর থেকে দেখব। চল।"

শুশু নিহনকে পিঠে নিয়ে সমুদ্রের পানি কেটে ছুটে যেতে থাকে।

নৌকাটার কাছে যখন পৌঁছেছে, তখন বেলা পড়ে এসেছে। অনেক দূর দিয়ে নিহন নৌকাটাকে ঘুরে দেখল। সাদাসিধে একটা নৌকা, অনেক দূর থেকে ভেসে এসেছে বলে রঙ উঠে বিবর্ণ। এটা তাদের কারো নৌকা নয়, দেখে মনে হয় স্থলমানবদের এলাকা থেকে এসেছে। ভেতরে কেউ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। নিহন সাবধানে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করে। মনে হয় নৌকার ঠিক মাঝখানে গুটিসুটি মেরে কেউ একজন শুয়ে আছে।

নিহন এবার শুশুকে ছেড়ে নৌকার কাছে এগিয়ে যায়। সাবধানে নৌকাটাকে ধরে তার ওপর উঠে বসে। ঠিক মাঝখানে একজন সারা শরীর গুটিয়ে নিশ্চল হয়ে শুয়ে আছে। দুই হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে বলে চেহারা দেখা যাচ্ছে না। যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু রক্তহীন, ফ্যাকাসে শীর্ণ এবং বিবর্ণ। মানুষটি বেঁচে আছে কি না বোঝার উপায় নেই। নিহন সাবধানে তাকে স্পর্শ করতেই মানুষটি ঘুরে তাকাল। নিহন চমকে উঠে অবাক হয়ে বলল, "কাটুস্কা!"

কাটুস্কা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নিহনের দিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, "নিহন, তুমি আমাকে বল, এটা স্বপ্ন নয়, এটা সত্যি।"

"এটা সত্যি কাটুস্কা। এটা স্বপ্ন নয়।"

"আমি চোখ বন্ধ করলে তুমি হারিয়ে যাবে না?"

"না কাটুস্কা। তুমি চোখ বন্ধ করলে আমি হারিয়ে যাব না।"

কাটুস্কা তার হাতটা একটু বড়িয়ে দিয়ে বলে, "নিহন।"

"বল, কাটুস্কা।"

"তুমি আমাকে একবার ধর। আমি কত দিন এই নৌকায় একা একা শুয়ে আছি। শুধু তোমাকে একবার দেখার জন্য আমি কত দূর থেকে এসেছি!"

নিহন এগিয়ে গিয়ে কাটুস্কার হাতটি স্পর্শ করল, শীর্ণ দুর্বল হাত। এই মেয়েটি না জানি কত দিন থেকে এই ছোট নৌকাটিতে ভেসে বেড়াচ্ছে!

কাটুস্কা ফিসফিস করে বলল, "নিহন, আমি শুধু একটিবার তোমার মতো জলমানব হতে চাই। শুধু একটিবার একটা ডলফিনের পিঠে বসে সমুদ্রের পানিতে ছুটে যেতে চাই। শুধু একটিবার—"

নিহন গভীর ভালবাসায় কাটুস্কাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নরম গলায় বলল, "কাটুস্কা! একটিবার নয়, তুমি অনন্তকাল আমাদের সাথে জলমানব হয়ে থাকবে।"

কাটুস্কার চোখ হঠাৎ সজল হয়ে ওঠে। সে ফিসফিস করে বলে, "তুমি আর কোনো দিন আমাকে ছেড়ে যাবে না তো?"

নিহন মাথা নাড়ল, বলল, "না, ছেড়ে যাব না। কোনো দিন তোমাকে ছেড়ে যাব না।"

সমুদ্রের লোনা বাতাস, সূর্যের প্রখর আলোতে জ্বলে-পুড়ে যাওয়া অভুক্ত, শীর্ণ, বিবর্ণ, রুগ্ণ এই মেয়েটির মুখে আশ্চর্য এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে। নিহন অপলকে সেই অসহায় মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকে। পাখির পালকের মতো তার হালকা শরীরটি নিহন শক্ত করে বুকে চেপে ধরে রাখে। তার মনে হতে থাকে এই মেয়েটিকে ছেড়ে দিলেই বুঝি সে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে।

তাকে সে আর হারিয়ে যেতে দেবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারের গ্রহ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিযান

১

টেবিলের অন্যপাশে বসে থাকা মানুষটা একবার ভিডিও মডিউলটার দিকে তাকাল, তারপর য়ুহার দিকে তাকাল, তাকে দেখে মনে হয় সে বুঝি এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না যে য়ুহা তার সামনে বসে আছে।

"তুমি য়ুহা?"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমি য়ুহা। মনে নাই আমি গত সপ্তাহে এসেছিলাম—"

"হ্যাঁ আমার মনে আছে।" মানুষটা মাথা নাড়ল, "তুমি শব্দ দিয়ে কী যেন কর।"

"আমি শব্দশিল্পী।" য়ুহা তার ছেলেমানুষি মুখটা গম্ভীর করার চেষ্টা করে বলল, "তোমরা যাকে বল কবি।"

"কবি?"

"হ্যাঁ। আমি শব্দকে এমনভাবে সাজাতে পারি যে সাধারণ একটা কথা অসাধারণ হয়ে যাবে।"

"তাজ্জবের ব্যাপার।" সামনে বসে থাকা মানুষটা তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আমি ভেবেছিলাম এসব জিনিস উঠে গেছে। ভেবেছিলাম কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক দিয়ে সব করা যায়। ছবি আঁকা যায়, সঙ্গীত তৈরি করা যায়, কবিতা লেখা যায়—"

য়ুহা হা হা করে হাসল, বলল, "যাবে না কেন? নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু সেই ছবি, সেই সঙ্গীত কিংবা সেই কবিতা হবে খুব নিম্নস্তরের। হাস্যকর, ছেলেমানুষি! খাঁটি শিল্প যদি চাও তা হলে দরকার খাঁটি মানুষ। খাঁটি কবিতা লিখতে পারে শুধু খাঁটি মানুষের খাঁটি মস্তিষ্ক।" য়ুহা নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বলল, "আসল কবিতা লিখতে হলে দরকার আসল নিউরনের মাঝে আসল সিনান্স সংযোগ।"

টেবিলের অন্যপাশে বসে থাকা মানুষটা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি মনে কিছু নিও না ছেলে, কিন্তু আমার ধারণা ছিল লেখক কবি শিল্পী এই ধরনের মানুষকে কেউ গুরুত্ব দিয়ে নেয় না। তোমার চিঠিটা দেখি সবাই খুব গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছে। প্রাথমিক বাছাই হয়ে সেটা একেবারে তিন ধাপ উঠে গেছে। একাডেমি দেখি সাথে সাথে অনুমতি দিয়ে দিল—"

য়ুহা টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "দেবে না কেন? একশ বার দেবে। একজন কবির ইচ্ছা লক্ষ মানুষের ইচ্ছা থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন কবি যেটা ভাবে সেটা হচ্ছে পুরো জাতির ভাবনার নির্যাস। প্রাচীনকালে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের অন্যপাশে বসে থাকা মানুষটা সহৃদয় ভঙ্গিতে হাত তুলে য়ুহাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "সবই বুঝলাম, কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায়।"

"কোন জায়গায়?"

"এত কিছু থাকতে তুমি মহাকাশযানে উঠতে চাইছ কেন?"

য়ুহার ছেলেমানুষি চেহারায় এখন উত্তেজনার ছাপ পড়ল। সে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না? আমি হচ্ছি একজন কবি। আর কবিরা হচ্ছে সৌন্দর্যের পূজারি। আমি বুভুক্ষের মতো সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াই। এই বায়োডোমের প্রত্যেকটা বিন্দুতে আমি সৌন্দর্য খুঁজেছি। এখন আমি এই সৌন্দর্য খুঁজতে চাই মহাকাশের শূন্যতা থেকে। মহাকাশের প্রায় অলৌকিক নিঃসঙ্গতা থেকে—"

টেবিলের সামনে বসে থাকা মানুষটা আবার হাত তুলে য়ুহাকে থামাল। ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি জান মহাকাশযানে যেতে হলে কী পরিমাণ প্রশিক্ষণ নিতে হয়? দশ জি ত্বরণে যখন মহাকাশযানটা যেতে শুরু করে তখন মনে হয় পুরো মহাকাশযানটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। শরীরটা হয়ে যায় সিসার মতো ভারী। প্রচণ্ড চাপে হৃৎপিণ্ড থেমে যেতে চায়। মনে হয় চোখের মণি কোটর থেকে বের হয়ে আসবে। কোনো কিছু পরিষ্কার করে চিন্তা করা যায় না—চোখের সামনে তখন কাঁপতে থাকে একটা লাল পর্দা, মাথায় ভোঁতা একটা যন্ত্রণা!"

য়ুহার চোখ উত্তেজনায় চকচক করতে থাকে, সে নিঃশ্বাস আটকে রেখে বলে, "আমি তো সেই অভিজ্ঞতাই পেতে চাই!"

"পাবে। সেই অভিজ্ঞতাই পাবে। মনে হয় তার থেকে বেশিই পাবে। ছোট একটা মহাকাশযানে অল্প কিছু মানুষ। কোনো যোগাযোগ নেই, যেদিকে তাকাও কুচকুচে কালো অন্ধকার আকাশ, তার মাঝে নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। তার ওপর—" কথা বলতে বলতে মানুষটা হঠাৎ থেমে গেল।

য়ুহা জিজ্ঞেস করল, "তার ওপর কী?"

"নাহ্। কিছু না।"

"বলে ফেল। আমি সবকিছু জানতে চাই।"

মানুষটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বিপদ-আপদ আছে না? মহাজাগতিক দস্যু আছে। আন্তঃগ্যালাক্টিক বিদ্রোহী আছে। গেরিলা যুদ্ধ আছে। ছিনতাই আছে। সেদিন খবর পেলাম আস্ত একটা মহাকাশযান নিখোঁজ হয়ে গেছে—"

"এই সব রকম অভিজ্ঞতা নিয়ে হচ্ছে একজন মানুষের জীবন।"

য়ুহার চকচকে চোখ আর ছেলেমানুষি মুখের দিকে তাকিয়ে মানুষটা হেসে ফেলল, বলল, "ঠিক আছে তা হলে তুমি এই সবকিছু নিয়েই মানুষ হবার জন্যে প্রস্তুতি নাও। আমার কাছে যেটুকু তথ্য আছে সেটা দেখে মনে হচ্ছে তোমার প্রশিক্ষণের তারিখ দেওয়া হয়েছে। সেটা শেষ হওয়ার পর প্রথম যে মহাকাশযান রওনা দেবে সেটাতে তোমাকে তুলে দেওয়া হবে।"

"সেটা কী রকম মহাকাশযান হবে? কে কে থাকবে সেখানে?"

"আগে থেকে তো বলা যাবে না। একটা বাণিজ্যিক মহাকাশযান হতে পারে—যেটা হয়তো আকরিক নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাকাশযান হতে পারে। বিজ্ঞানীদের গবেষণা মহাকাশযানও হতে পারে। তোমার কপাল খারাপ হলে অপরাধী বোঝাই দুর্বৃত্তদের একটা মহাকাশযান হতে পারে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা তার কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে বলল, "যেটাই হোক আমি কোনোটাকে ভয় পাই না! আমি একবার ভয়াবহ নিঃসঙ্গতাটা অনুভব করতে চাই। মানুষের চেতনা বুঝতে হলে আগে বুঝতে হয় নিঃসঙ্গতা—"

"বুঝবে। তুমি নিঃসঙ্গতা বুঝবে। একা থাকার কী যন্ত্রণা তুমি সেটা খুব ভালো করেই বুঝবে।" টেবিলের সামনে বসে থাকা মানুষটা য়ুহার দিকে তাকিয়ে সহৃদয়ভাবে হেসে বলল, "যখন একজনের টুঁটি আরেক জন চেপে ধরতে চাইবে, তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিও না।"

য়ুহা বলল, "সেটাও এক ধরনের অভিজ্ঞতা। একজন কবির কাছে সেটারও একটা মূল্য আছে।"

য়ুহা আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল, মানুষটা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "যাও, তুমি এখন পাশের ঘরে যাও। তোমার শরীরের পরীক্ষা–নিরীক্ষা করতে হবে।"

য়ুহা উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের দিকে রওনা দিল।

মহাকাশ একাডেমি থেকে য়ুহা যখন বের হয়েছে তখন দুপুর হয়ে গেছে। সূর্য মাথার ওপর এবং বেশ তীব্র রোদ। য়ুহা নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। এই মহাকাশে মানুষ যেখানেই বসতি তৈরি করেছে সেখানে নীল আকাশ তৈরি করেছে, সূর্য তৈরি করেছে। এই সব আসলে কৃত্রিম, আসল পৃথিবীর আসল আকাশ আর সেই আকাশে জ্বলজ্বলে প্রখর সূর্য না জানি কী রকম! পৃথিবীর নির্বোধ মানুষেরা সেই গ্রহটাকে নষ্ট না করে ফেললে এখনো তো মানুষেরা সেখানে থাকতে পারত। আবার কি কখনো পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে?

AMARBOI.COM

২

কমান্ডার একটু অবাক হয়ে এগার জন মানুষের দিকে তাকিয়ে রইল, গত কয়েক দিনের অবরোধে ছয় জন মারা গেছে, তা না হলে এখানে সতের জন থাকত। মাত্র সতের জন মানুষ ছোট একটা স্কাউটশিপে করে এসে পুরো বায়োডোমের অস্তিত্বটাই প্রায় শেষ করে ফেলেছিল। একটা ছোট ঘরের মাঝে গাদাগাদি করে রাখা এই মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে কেউ কি অনুমান করতে পারবে এরা কত দুর্ধর্ষ, কত সুশৃঙ্খল, নিজেদের আদর্শের জন্যে কত আন্তরিক? এরকম বিদ্রোহী দলকে কি কখনোই পুরোপুরি পরাস্ত করা যাবে?

কমান্ডার একটা নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের দলপতি কে?"

মানুষগুলো তার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না, এক ধরনের ভাবলেশহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কমান্ডার বলল, "আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি, তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে!"

মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ, তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের নিচে কালি, গালের চামড়াটা নির্মমভাবে ঘষতে ঘষতে পিচিক করে মেঝেতে থুতু ফেলে বলল, "মিছি মিছি সময় নষ্ট কোরো না। আমাদের নিয়ে কী করতে চাও করে ফেল।"

"তুমি যদি জিজ্ঞেস কর আমি কী করতে চাই তা হলে আমি কী বলব জান?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষগুলো ভাবলেশহীন চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না। কমান্ডার তখন নিজেই বলল, "আমি বলব যে, আমি তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দিতে চাই। সত্যি কথা বলতে কী ছেড়ে দেবার আগে তোমাদের সবাইকে নিয়ে একবেলা খেতে চাই। খাঁটি যবের রুটি, মশলা মাখানো ঝলসানো তিতির পাখির মাংস, আঙুরের রস—"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা বিরক্ত গলায় বলল, "ফালতু কথা বোলো না। আমাদের নিয়ে কী করতে চাও কর। মারতে চাইলে মেরে ফেল, ঝামেলা চুকে যাক।"

কমান্ডার জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, "মেরে ফেলাটা তো সবচেয়ে সহজ, তোমাদের জন্যেও সহজ, আমাদের জন্যেও সহজ। কিন্তু এত সহজে কি কাউকে মারা যায়? তোমাদের যে ছয় জন মারা গেছে তাদের মস্তিষ্কও এর মাঝে ক্রয়োজেনিক চেম্বারে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাদের সাথেও যোগাযোগ করা হবে। তোমাদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, তোমাদের মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা নিউরনকে ওলটপালট করে দেখা হবে সেখানে কী আছে!" কমান্ডার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বিষয়টা আমার হাতে নেই। যদি আমার হাতে থাকত তা হলে আমি তোমাদের সবাইকে ছেড়ে দিতাম। ছেড়ে দেবার আগে তোমাদের সবাইকে উষ্ণ সুগন্ধি পানিতে গোসল করার সুযোগ করে দিতাম। গোসল করে তোমরা ভাঁজভাঙা নিও পলিমারের কাপড় পরতে—"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা হিংস্র গলায় বলল, "ফালতু কথা বোলো না। তোমার ফালতু কথা শুনে আমার বমি এসে যাচ্ছে।"

কমান্ডার মাথা নাড়ল, বলল, "আমি দুঃখিত। আমি খুবই দুঃখিত যে আমার একেবারে আন্তরিক কথাগুলোকেও তোমার কাছে ফালতু কথা মনে হচ্ছে! শুধু যে ফালতু মনে হচ্ছে তা-ই না, কথাটা শুনে তোমার বমি এসে যাচ্ছে। যা-ই হোক, আমি তা হলে আর কথা বলব না। তোমাদের সাথে কথা বলার জন্যে, তোমাদের মুখ থেকে কথা বের করার জন্যে বিশেষ বাহিনীই আছে। তারাই বলবে। তবে আমি আগের থেকে তোমাদের সাবধান করে দিই, তাদের পদ্ধতিটা কিন্তু তোমাদের ভালো লাগবে না। একেবারেই ভালো লাগবে না।"

কমান্ডার ছোট ঘরটা থেকে বের হতে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেল, গাদাগাদি করে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, "আমি জানি আমার কথাগুলো শুনতে তোমাদের খুবই বিরক্তি লাগছে, তারপরেও আমাকে বলতেই হবে, তোমরা অসম্ভব ভালো যুদ্ধ করেছ। আমি মুগ্ধ হয়েছি। এত অল্প যোদ্ধা দিয়ে যে এরকম একটা অপারেশন করা যায় সেটা অবিশ্বাস্য।"

ছোট ঘরের মেঝেতে গাদাগাদি করে বসে থাকা মানুষগুলো কোনো কথা বলল না। কমান্ডার তাদের সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কোনায় বসে থাকা একটা কমবয়সী মেয়ের দিকে তাকাল, বলল, "আমার এখনো বিশ্বাস হয় না, মেয়ে, তুমিও কি যুদ্ধ করছিলে?"

মেয়েটি অন্যমনস্কভাবে সামনে তাকিয়ে ছিল, কমান্ডারের কথা শুনে তার দিকে ঘুরে তাকাল, বলল, "তুমি কি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছ?"

"হ্যাঁ। আমার কৌতূহল—তুমিও কি সত্যি যুদ্ধ করেছ?"

"হ্যাঁ। করেছি।"

কমান্ডার মাথা নেড়ে বলল, "কী আশ্চর্য। তোমাকে দেখে মনেই হয় না তুমি যুদ্ধ করতে পার। তোমাকে দেখে মনে হয় একজন ভাবুক, একজন বিজ্ঞানী বা সেরকম কিছু। তোমার বয়সী একজনের এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার কথা অথচ তুমি কিনা—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটা হাসার মতো শব্দ করে বলল, "তুমি কেমন করে জান আমি জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করি না? আরোপিত বুদ্ধিমত্তার ওপরে আমার একটা মডেল আছে। একটু সময় পেলেই আমি সেটার একটা গাণিতিক বিশ্লেষণ করব। সত্যি কথা বলতে কী আমি এটা নিয়েই ভাবছিলাম যখন তুমি আমার মনোযোগটা নষ্ট করলে।"

খোঁচা খোঁচা দাড়িসহ মধ্যবয়স্ক মানুষটা পিচিক করে মেঝেতে একটু থুতু ফেলে বলল, "আমাদের রায়ীনা খাঁটি বৈজ্ঞানিক। একশ ভাগ খাঁটি বৈজ্ঞানিক।"

কমান্ডার একবার মধ্যবয়স্ক মানুষটার দিকে তাকাল, তারপর কমবয়সী মেয়েটার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম রায়ীনা?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"তার মানে তোমরা তোমাদের সম্পর্কে কোনো তথ্য দেবে না সেটা সত্যি না? তুমি তোমার নাম বলেছ, তুমি কী নিয়ে গবেষণা করেছ সেটা বলেছ—"

"তুমি যদি চাও তা হলে আমার পছন্দের খাবার কী, আমার প্রিয় সিম্ফোনি কোনটা, কোন প্রাইম সংখ্যাটা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সেগুলোও তোমাকে বলে দিতে পারব। কিন্তু আসলে আমাদের সেগুলো নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। যে ছয় জন মারা গেছে তার মাঝে একজন আমার খুব প্রিয় বন্ধু ছিল।"

কমান্ডার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তবু বলি। আমি খুবই দুঃখিত রায়ীনা, আমি খুবই দুঃখিত।"

মেঝেতে গাদাগাদি করে বসে থাকা মানুষগুলো কোনো কথা বলল না, শুধু মধ্যবয়স্ক মানুষটা আবার পিচিক করে মেঝেতে থুতু ফেলল।

রায়ীনা অন্যমনস্কভাবে শূন্যে তাকিয়ে ছিল, এবারে মাথা ঘুরিয়ে মধ্যবয়স্ক মানুষটার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "এটা তোমার খুব খারাপ একটা অভ্যাস, এভাবে মেঝেতে থুতু ফেলবে না।"

"ঠিক আছে ফেলব না।" বলে সে নিজের অজান্তেই আরেকবার মেঝেতে থুতু ফেলল।

৩

কন্ট্রোল রুমে উঁকি দিয়েই য়ুহা ক্যাপ্টেন ক্রবকে দেখতে পেল। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মহাকাশযানের সব ক'জন ক্রুয়ের ত্রিমাত্রিক ছবি তাকে দেখানো হয়েছে কিন্তু য়ুহার কারো চেহারাই মনে নেই। মহাকাশযানের ক্যাপ্টেনের কাঁধে একটা লাল তারা থাকে সেটা তার মনে আছে, কাজেই কন্ট্রোল রুমের মধ্যবয়সী মানুষটা নিশ্চয়ই মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন, তার কাঁধে একটা লাল তারা জ্বলজ্বল করছে।

য়ুহা কন্ট্রোল রুমে ঢুকে ক্যাপ্টেন ক্রবের সামনে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন ক্রবের সামনে একটা হলোগ্রাফিক প্যানেল, সেখানে কোনো একটা অদৃশ্য সুইচকে সে টানাটানি করছিল। য়ুহাকে দেখে ক্যাপ্টেন ক্রব হাত নামিয়ে তার দিকে দুই পা এগিয়ে এল, "তুমি নিশ্চয়ই য়ুহা?"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমি য়ুহা।"

"কবি য়ুহা?"

য়ুহা একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "অনেকে আমাকে তা-ই বলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ত্রিশ বৎসরের জীবনে আগে কখনো এরকম ঘটনা ঘটে নি। একাডেমি থেকে নির্দেশ দিয়েছে একজন কবিকে নিয়ে যেতে। শুধু তা-ই না, সেই নির্দেশে বলা আছে তোমার সৃজনশীলতাকে উৎসাহ দেওয়ার উপযোগী একটা পরিবেশ তৈরি করে দিতে!" খুব একটা মজার কথা বলেছে এরকম ভাব করে ক্যাপ্টেন ক্রব হা হা করে হাসতে লাগল।

য়ুহা কী বলবে বুঝতে না পেরে একটু হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাপ্টেন ক্রব হাসি থামিয়ে বলল, "একজন কবির জন্যে সৃজনশীল পরিবেশ কী আমাদের সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই!"

য়ুহা বলল, "আসলে আমাদের জন্যে আলাদা কোনো পরিবেশের প্রয়োজন হয় না। যে কোনো পরিবেশই আমাদের জন্যে সৃজনশীল পরিবেশ।"

"ভালো। খুব ভালো। শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।"

"আমি কি তোমাদের কোনো কাজে সাহায্য করতে পারি?"

"তোমার পেছনে যদি আমাদের সময় দিতে না হয় সেটাই হবে আমাদের জন্যে একটা বিরাট সাহায্য।"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "দিতে হবে না। আমি প্রশিক্ষণটা খুব ভালোভাবে নিয়েছি। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না আমাকে এগার জি-তে নিয়ে গিয়েছিল, আমি তবু জ্ঞান হারাই নি।"

"ভালো, খুব ভালো।"

য়ুহা একটু ইতস্তত করে বলল, "ক্যাপ্টেন ক্রব, আমি কি মহাকাশযানটা ঘুরে দেখতে পারি?"

"অবশ্যই।" ক্যাপ্টেন ক্রব একটু চিন্তা করে বলল, "তোমার সাথে আমি বরং একজন ক্রুকে দিয়ে দিই, প্রথমবার সে তোমাকে সবকিছু দেখিয়ে দিক।"

ক্যাপ্টেন ক্রব তার যোগাযোগ মডিউলের একটা বোতাম টিপতেই নিঃশব্দে একজন ক্রু এসে হাজির হল। সোনালি চুলের কমবয়সী একটা মেয়ে, তার মুখে এক ধরনের কাঠিন্য। মেয়েটি কোনো কথা না বলে ঘরের এক কোনায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন ক্রব সরাসরি তার দিকে না তাকিয়ে বলল, "ক্লিডা, তুমি য়ুহাকে মহাকাশযানটা একটু ঘুরিয়ে দেখাও।"

ক্লিডা বলল, "দেখাচ্ছি মহামান্য ক্যাপ্টেন।" তারপর ঘুরে য়ুহার দিকে তাকিয়ে বলল, "চল, আমার সাথে।"

য়ুহা ক্লিডার সাথে ঘর থেকে বের হতে হতে বলল, "আমার নাম য়ুহা।"

"জানি। আমাদের রেকর্ডে তোমার নাম আছে।"

"তুমি নিশ্চয়ই ক্লিডা।"

"হ্যাঁ, আমি কর্পোরাল ক্লিডা।"

"তার মানে, আমার তোমাকে কর্পোরাল ক্লিডা বলে সম্বোধন করতে হবে? শুধু ক্লিডা বললে হবে না?"

"তুমি যেহেতু আমাদের কমান্ডের নও তুমি যা ইচ্ছে তা-ই ডাকতে পার।"

"আচ্ছা ক্লিডা, তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?"

"কর।"

"ক্যাপ্টেন ক্রব যখন তোমাকে ডাকল, আর তুমি যখন এলে তখন এসে তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে। কোনো কথা বললে না! কারণটা কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লিডা এমনভাবে য়ুহার দিকে তাকাল যেন সে খুব একটা বিচিত্র কথা বলেছে, ভুরু কুঁচকে বলল, "আমি নিজে থেকে কেন ক্যাপ্টেন ক্রবকে কিছু জিজ্ঞেস করব? ক্যাপ্টেন ক্রব আমাকে ডেকেছে, দেখেছে আমি এসেছি। তার যখন ইচ্ছে করবে তখন সে কথা বলবে।"

"কিন্তু আমাকে যদি ডাকত আমি ঘরে গিয়েই জিজ্ঞেস করতাম, ক্যাপ্টেন ক্রব! তুমি কি আমাকে ডেকেছ?"

"তুমি সেটা করতে পার, কারণ তুমি কমান্ডের মাঝে নেই। যারা কমান্ডের মাঝে থাকে তাদের কিছু নিয়মকানুন মানতে হয়।"

"এটাই তোমাদের নিয়ম? আমি আসলে সেটাই জানতে চাচ্ছিলাম।"

"হ্যাঁ, এটাই নিয়ম।"

য়ুহা বলল, "তুমি কিছু মনে কোরো না ক্লিডা তোমার কাছে আমার আরো একটা প্রশ্ন।"

"বল, কী প্রশ্ন।"

"তুমি যখন এলে, ক্যাপ্টেন ক্রব যখন তোমাদের সাথে কথা বলল তখন সে তোমার দিকে না তাকিয়ে বলেছে। আমরা যখন একজন আরেকজনের সাথে কথা বলি তখন তার দিকে তাকাই। আমার মনে হল, মনে হল—"

"কী মনে হল?"

"মনে হল যেন তোমাকে একটু তাচ্ছিল্য করা হল।"

য়ুহার কথা শুনে ক্লিডা একটু অবাক হয়ে তাকাল, বলল, "তাচ্ছিল্য? না। মোটেও তাচ্ছিল্য করা হয় নি।"

"নিশ্চয়ই করে নি কিন্তু আমার মনে হল—"

"তোমার মনে হওয়াটা ভুল। আমাদের কমান্ডে একেক জন একেক ধাপে থাকে। যারা নিচের ধাপে থাকে তারা সব সময়েই উপরের ধাপের যে আছে তার আদেশ মেনে চলে। এটা শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজন, শৃঙ্খলা খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

য়ুহা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার জীবনে কোনো শৃঙ্খলা নেই। আগে কখনো ছিল না, পরেও থাকবে বলে মনে হয় না।"

ক্লিডা মুখ শক্ত করে বলল, "শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো বড় কাজ করা যায় না।"

য়ুহা বলল, "বড় কাজ করার জন্যে সবার জন্মও হয় না। অনেকের জন্ম হয় ছোট কাজ করার জন্যে। ছোট আর তুচ্ছ। কিন্তু খুব প্রয়োজনীয়। সবাই যদি বড় কাজ করে তা হলে কেমন করে হবে?"

ক্লিডা একবার য়ুহার দিকে তাকাল কিন্তু কোনো কথা বলল না। য়ুহা গলার স্বর পাল্টে বলল, "আমাকে একবার মহাকাশযানটা দেখাও।"

"কোথা থেকে শুরু করতে চাও?"

"ইঞ্জিন। আমি প্রথমে দেখতে চাই মহাকাশযানের ইঞ্জিন।"

"বেশ। চল তা হলে ইঞ্জিনঘরে যাই। এই মহাকাশযানের ইঞ্জিন দুটো। দুটোই কুরু ইঞ্জিন। এর জ্বালানি হিসেবে বের করা হয় পদার্থ এবং প্রতি-পদার্থ। নিরাপত্তার দিক দিয়ে এই জ্বালানির কোনো তুলনা নেই। বিশাল একটা মহাকাশযানকে এটা অনির্দিষ্ট সময় দশ জি ত্বরণে রাখতে পারে। মহাকাশযাত্রার ইতিহাসে একটা ব্ল্যাক হোলের কাছে বিপজ্জনকভাবে গিয়ে বের হওয়ার একমাত্র উদাহরণটুকু এই কুরু ইঞ্জিনের।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লিডা শান্ত গলায় কথা বলতে থাকে, য়ুহা এক ধরনের মুগ্ধ চোখে কথাগুলো শোনে। সে আগে কখনোই এ ধরনের কোনো কথা শোনে নি।

খাবার টেবিলে ক্যাপ্টেন ক্রব য়ুহাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি মহাকাশযানটা দেখেছ?"

"হ্যাঁ দেখেছি।"

"তোমার কী মনে হয়, যেতে পারবে আমাদের সাথে?"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "অবশ্যই পারব। চমৎকার একটা মহাকাশযান। দেখে মনে হয় এর প্রত্যেকটা স্ক্রু বুঝি অনেক যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে।"

"সেটা তুমি খুব ভুল বল নি।"

"আমরা কখন রওনা দেব?"

"চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে। কার্গো পৌঁছানোর সাথে সাথে।"

"আমাদের কার্গোটা কী?"

য়ুহার কথা শুনে খাবার টেবিলের সবাই এক মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল। য়ুহা একটু অবাক হয়ে বলল, "আমি কি ভুল কিছু জিজ্ঞেস করে ফেলেছি?"

"বলতে পার। এটা সামরিক মহাকাশযান। এখানে কেউ নিজে থেকে কিছু জানতে চায় না। যার যেটা জানার দরকার তাকে সেটা জানানো হয়।"

য়ুহা মুখে হাসি টেনে বলল, "আর আমি যদি জিজ্ঞেস না করেই কিছু একটা জেনে যাই, সেটা কি বেআইনি হবে?"

ক্যাপ্টেন ক্রব তার পানীয়ের গ্লাসটা স্নায়ু উত্তেজক পানীয় দিয়ে ভরতে ভরতে বলল, "না সেটা বেআইনি হবে না। তুমি কি কিছু জেনেছ?"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ জেনেছি।"

"কী জেনেছ?"

"এই মহাকাশযানের কার্গো হচ্ছে মানুষ। এগার জন মানুষ।"

ক্যাপ্টেন ক্রব চোখ বড় করে য়ুহার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কেমন করে সেটা অনুমান করলে?"

"ক্লিডা যখন আমাকে মহাকাশযানটি দেখাচ্ছিল তখন শীতলঘরে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে এগারটা ক্রায়োজেনিক ক্যাপসুল চার্জ করা হচ্ছিল। তার মানে নিশ্চয়ই এগার জন মানুষকে নেওয়া হবে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব তার পানীয়ে চুমুক দিয়ে বলল, "আর কিছু অনুমান করেছ?"

"হ্যাঁ করেছি।"

"কী অনুমান করেছ?"

য়ুহা পানীয়ের গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল, "এই এগারটা মানুষকে তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভয় পাও। তা না হলে তাদের ক্রায়োজেনিক ক্যাপসুলে করে কেন নেবে? আমার মতো যাত্রী হিসেবে নিতে পারতে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব মাথা নাড়ল, বলল, "ভালো অনুমান করেছ য়ুহা।"

য়ুহা তার পানীয়টুকু এক চুমুকে শেষ করে দিয়ে বলল, "আমি মানুষগুলো দেখার জন্যে খুব আগ্রহী হয়ে আছি।"

"কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার মনে হচ্ছে তাদের মাঝে নিশ্চয়ই রহস্য আছে। আমি একজন কবি, মানুষের চরিত্র, তাদের চরিত্রের রহস্য বুঝতে আমার খুব ভালো লাগে।"

ঘুম থেকে উঠে য়ুহা আবিষ্কার করল মহাকাশযানের ক্রুদের প্রত্যেকের হাতে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। সে একটু অবাক হয়ে একজন ক্রুকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের সবার হাতে অস্ত্র কেন? কিছু কি হয়েছে?"

মানুষটি বলল, "না, কিছু হয় নি? এটা সামরিক মহাকাশযান, আমরা সামরিক মানুষ। আমাদের হাতে অস্ত্র থাকতে হয়।"

"কিন্তু গতকাল তো ছিল না।"

"মহাকাশযানের কাজকর্মে প্রতিমুহূর্তে অস্ত্র রাখতে হয় না। সে জন্যে আমরা রাখি না। আজকে অস্ত্র রাখতে হবে।"

য়ুহা কৌতূহলী চোখে বলল, "বিপজ্জনক মানুষগুলো আসছে বলে?"

"বলতে পার।"

"তোমার অস্ত্রটা একটু দেখাবে?"

মানুষটি হেসে ফেলল, বলল, "এগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক অস্ত্র। না বুঝে কোনো একটা সুইচ স্পর্শ করে কিংবা একটা লিভার টেনে তুমি এখানে প্রলয় কাণ্ড করে ফেলতে পার! তোমার হাতে অস্ত্র দেওয়াটা ঠিক হবে না! তবে—"

"তবে কী?"

"একাডেমি থেকে যে চিঠিটা এসেছে সেই চিঠিতে লেখা আছে তোমার সব কৌতূহলকে সম্মান করতে। তুমি যদি ক্যাপ্টেন ক্রবের কাছে আবেদন কর, তোমাকে একটা অস্ত্র দেখানো হতে পারে।"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে, আমি তা হলে তা-ই করি। ব্যাপারটা মন্দ হয় না। কী বল? কবির হাতে অস্ত্র!"

AMARBOI.COM

ক্যাপ্টেন ক্রব য়ুহার কথা শুনে একটু অবাক হয়ে বলল, "তুমি অস্ত্র চালানো শিখতে চাও?"

"আসলে ঠিক চালানো শিখতে চাই তা নয়। একটা সত্যিকারের অস্ত্র হাতে নিয়ে দেখতে চাই। যদি চালানো না শিখি তোমরা তো অস্ত্র হাতে নিতে দেবে না।"

"সেটা ঠিক। এই অস্ত্রগুলো খুব বিপজ্জনক। কিন্তু অস্ত্র কেন হাতে নিতে চাও?"

য়ুহা একটু ইতস্তত করে বলল, "তুমি কিছু মনে কোরো না ক্যাপ্টেন ক্রব—আমার কাছে সব সময় মনে হয়েছে একটা অস্ত্র আসলে সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে অশুভ জিনিস। তুমি কি চিন্তা করতে পার, একটা অস্ত্র তৈরি করা হয়েছে মানুষকে হত্যা করার জন্যে। হত্যা! মানুষ কেন মানুষকে হত্যা করবে? আর সেই হত্যা করার জিনিসটা মানুষ কেন হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে?"

ক্যাপ্টেন ক্রব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "মানুষের সভ্যতার ইতিহাস পড়েছ কবি য়ুহা? পুরো ইতিহাসটুকুই হচ্ছে যুদ্ধের ইতিহাস—"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। পড়েছি। সেজন্যেই বলছি। আমি তাই এই অশুভ জিনিসটা একবার স্পর্শ করে দেখতে চাই।"

"বেশ। আমি ব্যবস্থা করে দিই। তোমাকে একটা প্রশিক্ষণ দেব, যদি সেটা নিতে পার তোমাকে একটা অস্ত্র নিয়ে ঘুরতে দেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "না, না, আমি অস্ত্র নিয়ে ঘুরতে চাই না। আমি শুধু একবার স্পর্শ করতে চাই।"

"সেটা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু একাডেমি থেকে তোমাকে যে অনুমতিপত্র দিয়েছে তাতে তুমি নিজের কাছে একটা অস্ত্র রাখতে পার।"

য়ুহা মাথা নাড়ল, "না। না। আমি অস্ত্র রাখতে চাই না।"

ক্যাপ্টেন ক্রব কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "সেটা তোমার ইচ্ছা।"

যে মানুষটি য়ুহাকে অস্ত্র ব্যবহার করা শেখাল তার নাম হিসান। সে প্রথমে য়ুহাকে মহাকাশযানে রাখা সবগুলো অস্ত্র দেখাল, একজন মানুষ কাঁধে করে আস্ত নিউক্লিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে যেতে পারে সেটা য়ুহা জানত না, দেখে সে খুব অবাক হল। একটা মহাকাশযান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে যে অন্য একটা মহাকাশযানকে উড়িয়ে দেওয়া যায় সেটাও সে জানত না। সাধারণ অস্ত্রগুলো বেশ হালকা, এর ভেতরে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা চালানোর মতো এত বিস্ফোরক কেমন করে থাকে সেটা একটা রহস্য। হিসান ব্যাপারটা য়ুহাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। য়ুহা ঠিক ভালো করে বুঝতে পারল না।

য়ুহাকে যে অস্ত্রটি ব্যবহার করতে শেখানো হল সেটি হালকা এবং দেখতে প্রায় খেলনার মতো। কোনো কিছুকে আঘাত করার আগে সেটাকে লেজার রশ্মি দিয়ে লক করে নিতে হয়। ট্রিগার টানার সাথে সেকেন্ডে দশটি বিস্ফোরক ছুটে যায়। লক্ষ্যবস্তুকে ভেদ করে বিস্ফোরিত হয়, কাজেই এর ধ্বংস ক্ষমতা অসাধারণ। ভুল করে কোথাও চাপ দিয়ে হঠাৎ করে যেন কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে না ফেলে সে জন্যে একাধিক সেফটি লক রয়েছে।

মহাকাশযানের ভেতরেই অস্ত্র চালানোর অনুশীলন ঘর রয়েছে। য়ুহাকে সেখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে হিসান তার হাতে অস্ত্রটা তুলে দিয়ে বলল, "নাও। এখন এটা তোমার অস্ত্র। তুমি যতদিন মহাকাশযানে থাকবে তুমি এটা নিজের কাছে রাখতে পারবে।"

"না। আমি নিজের কাছে রাখতে চাই না। আমি শুধু একবার এটাকে হাতে নিয়ে দেখতে চাই।"

"নাও, দেখ।"

য়ুহা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা হাতে নিয়ে দাঁড়াল। সে এখন ইচ্ছে করলেই একটা মানুষকে খুন করে ফেলতে পারবে—চিন্তা করেই তার শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। য়ুহা অস্ত্রটা হাতে নেয়, ট্রিগারে আঙুল রেখে সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে সে একটা সত্যিকার অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

য়ুহা বুক থেকে নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিয়ে বলল, "তুমি কি জান, এই অস্ত্রটা কি কখনো ব্যবহার করা হয়েছে?"

হিসান মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ হয়েছিল।"

"কখন, কীভাবে?"

"বেশ কয়েকবার। একটা বিদ্রোহ বন্ধ করার জন্যে—"

"কেউ কি মারা গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। এই অস্ত্রটি দিয়ে প্রায় সতের জনকে মারা হয়েছিল। সব রেকর্ড করা থাকে, নূতন করে ব্যবহার করার আগে রেকর্ড মুছে দেওয়া হয়।"

য়ুহা অস্ত্রটি হাতে নিয়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে সে হাতে একটা অস্ত্র ধরে রেখেছে যেটা দিয়ে সতের জন মানুষকে হত্যা করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। সতেরটি প্রাণ! হয়তো সতেরটি পরিবার। সতের জন ভালবাসার মানুষ। যুহার শরীরটা কেমন জানি শিউরে ওঠে, সে প্রায় ছটফট করে অস্ত্রটা হিসানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "নাও। রেখে দাও।"

"এটা তোমার নামে ইস্যু করা হয়েছে। তুমি রাখতে পার।"

যুহা মাথা নাড়ল, বলল, "না, না, আমি রাখতে চাই না।"

"একটা অস্ত্র আসলে একজনের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন করে দিতে পারে। যখনই তুমি এটা হাতে নেবে তখনই তুমি অনুভব করবে তুমি একজন ভিন্ন মানুষ। অন্য মানুষ থেকে তোমার ক্ষমতা বেশি। তুমি নিজের ভেতরে এক ধরনের নূতন আত্মবিশ্বাস অনুভব করবে। নূতন ক্ষমতা অনুভব করবে।"

যুহা আবার মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমার এই আত্মবিশ্বাসের দরকার নেই। ক্ষমতারও দরকার নেই। যে ক্ষমতার অনুভূতির জন্যে হাতে অস্ত্র নিতে হয় আমার সেই অনুভূতির প্রয়োজন নেই।"

হিসান হেসে বলল, "আমি ভেবেছিলাম, তুমি একজন কবি। সব রকম অভিজ্ঞতাই তোমার কাছে মূল্যবান।"

"সেটা সত্যি, সব অভিজ্ঞতাই আমার কাছে মূল্যবান। তবে কিছু অভিজ্ঞতা আমি এগিয়ে গিয়ে গ্রহণ করি, কিছু অভিজ্ঞতা থেকে পালিয়ে চলে আসি। হাতে অস্ত্র রাখাটা সেরকম একটা অভিজ্ঞতা।"

"কেন?"

"আমার মনে হয় অস্ত্র খুব বুঝি অশুচি একটা জিনিস। মনে হয় এটা হাতে নিলে আমিও বুঝি অশুচি হয়ে যাব।"

হিসান তার নিজের অস্ত্রটি হাতবদল করে খুব অবাক হয়ে যুহার দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

যুহা যদিও বলেছিল সে কিছুতেই অস্ত্র হাতে নেবে না কিন্তু দেখা গেল সত্যি সত্যি তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা হাতে নিয়ে সে কার্গো বে'তে অপেক্ষা করছে। অন্য কিছু দেখুক আর না-ই দেখুক এগারজন বন্দিকে তার দেখার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নিরাপত্তার খাতিরে অস্ত্র ছাড়া কারো সেখানে যাবার কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত এগারজন বন্দি হেঁটে হেঁটে কার্গো বে'তে এসেছে তখন যুহা অবাক হয়ে আবিষ্কার করল মানুষগুলো নেহায়েতই নিরীহ ধরনের। কয়েক জন মধ্যবয়স্ক, পোড় খাওয়া চেহারা, অন্যরা কমবয়সী। দু-এক জন বয়সে প্রায় কিশোর। চার জন নানা বয়সী মেয়ে, এর মাঝে একজনকে আলাদা করে চোখে পড়ে, চেহারার মাঝে এক ধরনের কমনীয়তা রয়েছে, দেখে মনেই হয় না সে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে পারে। যুহা অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন ক্রবকে জিজ্ঞেস করল, "এরা সবাই যোদ্ধা?"

"হ্যাঁ।"

"এরা সবাই বিদ্রোহী দলের?"

"হ্যাঁ।"

"এরা কোথায় ধরা পড়েছে?"

"একটা স্কাউটশিপ করে বায়োডোম আক্রমণ করতে এসেছিল। অসাধারণ যুদ্ধ করেছে।"

"যুদ্ধে কি কেউ মারা গেছে?"

"হ্যাঁ, অনেকে মারা গেছে। এদের মারা গেছে ছয় জন।"

"এখন এদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?"

ক্যাপ্টেন ক্রব য়ুহার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "বলার নিয়ম নেই।"

"নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে নেওয়া হচ্ছে। তাই না?"

"সম্ভবত।"

"মস্তিষ্ক স্ক্যান করে সব তথ্য বের করা হবে?"

"সম্ভবত।"

"এরা আর কখনোই মুক্তি পাবে না?"

"সম্ভবত না।"

য়ুহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি কি এদের সাথে কথা বলতে পারি?"

ক্যাপ্টেন ক্রব য়ুহার দিকে ঘুরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী নিয়ে কথা বলতে চাও?"

"আমি ঠিক জানি না।"

"তারা তোমার কথার উত্তর দেবে না। শুধু শুধু চেষ্টা কোরো না।"

"তবুও, আমি কি তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে পারি?"

ক্যাপ্টেন ক্রব একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে যাও। কিন্তু মনে রেখ আমি তোমাকে যেতে নিষেধ করেছিলাম।"

য়ুহা তখন বন্দিদের দিকে এগিয়ে গেল। এগার জন বন্দি কার্গো বে-এর খোলা জায়গাটিতে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, য়ুহা একটু এগিয়ে গিয়ে তাদের উদ্দেশ করে বলল, "তোমরা কেমন আছ?"

মানুষগুলো খানিকটা অবাক হয়ে য়ুহার দিকে তাকাল, কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিল না। য়ুহা আবার জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ তোমরা?"

এবারেও কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিল না। য়ুহা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করেছি, তোমরা কেমন আছ?"

মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ পিচিক করে মেঝেতে থুতু ফেলে বলল, "আমাদের বিরক্ত কোরো না, যদি কিছু করার না থাকে তা হলে জাহান্নামে যাও।"

য়ুহার চোখে-মুখে বেদনার একটা ছায়া পড়ল, সে বলল, "আমি জানি তোমরা এখন খুব দুঃসময়ের মাঝ দিয়ে যাচ্ছ, তার মানে এই নয় যে তোমরা অকারণে রূঢ় হবে।"

কমবয়সী একজন ব্যঙ্গ করে বলল, "আহা হা! সোনামণি মনে কষ্ট পেয়েছে। আস, আস! কাছে আস, তোমার গালে একটা চুমু দিই।"

এবারে বন্দিদের সবাই শব্দ করে আনন্দহীন এক ধরনের হাসি হেসে উঠল। য়ুহা আহত গলায় বলল, "তোমরা ঠিক বুঝতে পারছ না। আমরা এবং তোমরা একই মানুষ। তোমাদের জন্যে আমাদের সম্মানবোধ থাকবে ঠিক সেরকম আমাদের জন্যে তোমাদের সম্মানবোধ থাকতে হবে—"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি এবার গলা উঁচিয়ে বলল, "তুমি জাহান্নামে যাও ছেলে। দূর হও এখান থেকে।"

য়ুহা আহত দৃষ্টিতে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল, দেখে মনে হয় তার চোখে পানি এসে যাবে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, ঠিক বলতে পারল না। তখন বন্দিদের ভেতরে কমনীয় চেহারার মেয়েটা বলল, "ছেলে, তুমি একটা জিনিস মনে হয় ধরতে পার নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা বলল, "আমার নাম য়ুহা।"

"য়ুহা। তুমি মনে হয় একটা জিনিস—"

"আমি আমার নাম বলেছি। তোমারও উচিত তোমার পরিচয় দেওয়া।"

"আমার নাম রায়ীনা।"

"তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম রায়ীনা।"

মেয়েটা হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, "য়ুহা, তুমি একটা জিনিস এখনো ধরতে পার নি। আমরা আর তোমরা এক মানুষ নই। তোমাদের সবার ঘাড়ে একটা করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রয়েছে। তোমরা আর কিছুক্ষণের মাঝে আমাদের সবাইকে শীতলঘরে ঢুকিয়ে ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রায় নিয়ে একটা জড়বস্তুতে পাল্টে দেবে। আমাদের আর কখনো জাগিয়ে তোলা হবে কি না জানি না। যদি জাগিয়ে তোলাও হয় সেটা কত শত বৎসর পরে হবে আমরা সেটা জানি না। কাজেই এই সময়টুকু আমাদের একান্তই নিজস্ব সময়। আমাদের এটা ব্যবহার করতে দাও। যদি তুমি সত্যিই মনে কর আমাদের সম্মান দেখাবে তা হলে আমাদের একলা থাকতে দাও। বুঝেছ?"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি। আমি খুবই দুঃখিত—"

রায়ীনা কঠিন গলায় বলল, "এই শব্দগুলো তোমরা ব্যবহার কোরো না। তোমরা পেশাদার সৈনিক, তোমার ঘাড়ে অস্ত্র, তোমাদের ঠাণ্ডা মাথায় শত্রু হত্যা করানো শেখানো হয়। আমরা তোমাদের শত্রু, আমাদের জন্যে তোমাদের কোনো দুঃখবোধ নেই। শুধু শুধু কথাগুলো উচ্চারণ করে আমাদের অপমান কোরো না।"

য়ুহা মৃদু গলায় বলল, "আসলে আমি পেশাদার সৈনিক না।"

"তা হলে তুমি কে?"

"আমি—আমি—আমি একজন—"

"কী?"

য়ুহা প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারল না, বিড়বিড় করে বলল, "না, কিছু না। কেউ না। আমি একজন—একজন মানুষ। সাধারণ মানুষ।"

AMARBOI.COM

য়ুহা যখন ক্যাপ্টেন ক্রবের কাছে পৌঁছাল তখন ক্যাপ্টেন ক্রব নরম গলায় বলল, "এখন বুঝেছ, আমি কেন তোমাকে ওদের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলাম?"

"হ্যাঁ, বুঝেছি।"

"তুমি জগৎটাকে যেমন কল্পনা কর জগৎটা সেরকম না। জগৎটা অনেক কঠিন।"

য়ুহা নিচু গলায় বলল, "বাইরে। শুধু বাইরে জগৎটা কঠিন। ভেতরে সব এক। নিশ্চয়ই সব এক।"

৪

পাশাপাশি এগারটি ক্রায়োজেনিক সিলিন্ডার সাজিয়ে রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটার ভেতরে একজন করে মানুষ। নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বড় প্যানেলের সামনে দুজন দাঁড়িয়ে আছে। একজন মাথা ঘুরিয়ে পেছনে দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন ক্রবকে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি শীতল করতে শুরু করব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। কর।"

মানুষটি মাইক্রোফোনের বোতামটি স্পর্শ করে বলল, "তোমাদের দেহকে শীতল করার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। বিষয়টি তোমাদের জন্যে অনেক সহজ হবে যদি তোমরা আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোন। শরীরকে শীতল করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাদের শরীরে স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন হওয়ার জন্যে আমরা চাই তোমরা সবাই তোমাদের হাত দুটি বুকের ওপর নিয়ে এস, বাম হাতের ওপর ডান হাতটি রাখ।"

এগার জন বন্দির ভেতর মাত্র চার জন সেই নির্দেশ অনুযায়ী হাত দুটো বুকের ওপর আনল। য়ুহা মনিটরগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল, সে দেখল মধ্যবয়স্ক রূঢ় ধরনের মানুষটি মুখ বিকৃত করে একটা অশালীন শব্দ উচ্চারণ করেছে। য়ুহা মাথা ঘুরিয়ে রায়ীনার দিকে তাকাল, মেয়েটি দুই হাত সামনে এনে হাতের আঙুলে কিছু একটা গুনছিল, সে মাইক্রোফোনে দেওয়া নির্দেশটি শুনেছে বলে মনে হল না।

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়ানো মানুষটি মাইক্রোফোনের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বলল, "আমরা এখন তোমাদের সিলিন্ডারে নিহিলা গ্যাসের মিশ্রণ পাঠাচ্ছি। তোমাদের শরীর অবসন্ন হয়ে আসবে, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসবে। তোমাদের শরীরের জন্যে পুরো বিষয়টি সহজ হবে যদি তোমরা পুরো শরীরটাকে ঢিলে করে রাখ, স্নায়ুকে নরম করে রাখ। আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনব তার মাঝে তোমাদের সবার চোখে ঘুম নেমে আসার কথা।"

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি নিচু গলায় গুনতে শুরু করে, "এক–দুই–তিন–চার–পাঁচ–ছয়..."

য়ুহা দেখতে পায় দশ পর্যন্ত গোনার অনেক আগেই একজন একজন করে সবাই অচেতন হয়ে পড়ছে। সবার শেষে অচেতন হল রায়ীনা এবং অচেতন হওয়ার পরও তার মস্তিষ্কে এক ধরনের কর্মকাণ্ডের স্ক্যান দেখা যেতে লাগল।

ক্যাপ্টেন ক্রব বলল, "এই মেয়েটা একটু অন্য রকম।"

য়ুহা জানতে চাইল, "কী রকম?"

"সব সময় কিছু না কিছু চিন্তা করছে। মস্তিষ্কটাকে ব্যবহার করছে।"

"কী নিয়ে চিন্তা করছে বলা সম্ভব?"

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি বলল, "মস্তিষ্কের যে জায়গা থেকে সিগন্যাল আসছে সেটা গাণিতিক চিন্তাভাবনার জায়গা। মেয়েটা সম্ভবত কোনো গাণিতিক সমস্যার কথা ভাবছে।"

য়ুহা অবাক হয়ে বলল, "মেয়েটা অচেতন হয়েও ভাবছে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব বলল, "আমরা সবাই ভাবি। কেউ বেশি কেউ কম।"

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি ক্যাপ্টেন ক্রবের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "আমি এদের ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রায় নেবার অনুমতি চাইছি ক্যাপ্টেন ক্রব।"

ক্যাপ্টেন ক্রব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, "অনুমতি দিলাম।"

মানুষটি প্যানেলের একটি বোতাম স্পর্শ করতেই মৃদু একটা হিস হিস শব্দ শোনা যেতে থাকে, সিলিন্ডারগুলোর পাশ থেকে এক ধরনের সাদা ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। য়ুহা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হচ্ছে?"

"কিছু না।"

"সাদা ধোঁয়াগুলো কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জলীয় বাষ্প। সিলিন্ডার থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে।"

"তাদের শরীর কি শীতল হতে শুরু করেছে?"

"হ্যাঁ। শুরু করেছে।" মানুষটি মনিটরের এক জায়গায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল, "এইখানে তাদের শরীরের তাপমাত্রা দেখতে পাবে।"

য়ুহা দেখতে পায় খুব ধীরে ধীরে তাদের শরীরের তাপমাত্রা কমে আসছে। ঠিক কী কারণে জানা নেই সে নিজের বুকের ভেতরে এক ধরনের বেদনা অনুভব করে। একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পুরোপুরি শীতল হতে কতক্ষণ সময় নেবে?"

"দুই থেকে তিন ঘণ্টার মাঝে করার নিয়ম। আমরা হয়তো আরো একটু তাড়াতাড়ি করব।"

দুই ঘণ্টা পর য়ুহা শীতলঘরটিতে আবার ফিরে এসে প্যানেলগুলোর দিকে তাকাল। এগার জন মানুষকে এগারটি পাথরের মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। তাদের শরীরে প্রাণের স্পন্দন দূরে থাকুক কোনো ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার কোনো চিহ্ন নেই। য়ুহা দীর্ঘ সময় রায়ীনার নিষ্প্রাণ মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই মেয়েটির দেহে সত্যি কি আবার প্রাণ সঞ্চার করা যাবে? সেটি কি এই মেয়েটির জন্যে একটি জীবনের শুরু হবে নাকি একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের শুরু হবে?

য়ুহা কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই এগার জনকে দেখেশুনে রাখবে কে?"

"আমাদের কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক।"

য়ুহা ভুরু কুঁচকে বলল, "যদি কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কে কোনো সমস্যা হয়—"

মানুষটি শব্দ করে হেসে বলল, "সমস্যা হবে না।"

"যদি হয়।"

"হবে না।"

"আমি কথার কথা বলছি। যদি হয়?"

মানুষটি বলল, "তুমি কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জান না বলে এ রকম বলছ। কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কে কখনো সমস্যা হয় না। এখানে চারটি স্তর আছে। একটি স্তর নষ্ট হলে অন্যটা দায়িত্ব নেয়। সেটা নষ্ট হলে অন্যটা। যখন কোনো স্তর নষ্ট হয় সেটা নিজে থেকে নিজেকে সারিয়ে নেয়। অনেকটা জৈবিক প্রাণীর মতো শুধু প্রাণী থেকে অনেক বেশি চৌকস!"

য়ুহা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "যদি কেউ কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক একটা নিউক্লিয়ার বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয় তা হলে কি এই এগার জন মারা যাবে?"

"না। মারা যাবে না। এই সিলিন্ডারের যে ব্যাকআপ সিস্টেম আছে সেটা দায়িত্ব নেবে। তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।" মানুষটি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এ রকম অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন কেন জিজ্ঞেস করছ?"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "মোটেও অদ্ভুত প্রশ্ন নয়। এগুলো অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। এগার জন মানুষের জীবনের দায়িত্ব খুব সহজ দায়িত্ব নয়।"

মানুষটি হা হা করে হেসে বলল, "এই কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক পুরো মহাকাশযানটা মহাকাশে উড়িয়ে নেবে। শুধু এই এগার জন নয়, আমাদের সবার জীবনের দায়িত্ব কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কের।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

য়ুহা মাথা নেড়ে বলল, "ভাগ্যিস আমার কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক হয়ে জন্ম হয় নি—আমি কখনো এত বড় দায়িত্ব নিতে পারতাম না!"

মানুষটি হেসে বলল, "কিন্তু কোয়ান্টাম কম্পিউটার এই দায়িত্বটি নেয়। রুটিনমাফিক নেয়।"

৫

মিটিয়া নামে কমান্ডের ডাক্তার মেয়েটি য়ুহার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার কপালের পাশে একটা প্রোব লাগাচ্ছিল। মেয়েটি বেশ হাসিখুশি, দক্ষ হাতে কাজ করতে করতে সে গুনগুন করে একটা ভালবাসার গান গাইছে। প্রিয় মানুষটি মহাকাশে হারিয়ে গেছে, ভালবাসার মেয়েটি জানালা দিয়ে দূর আকাশের একটি নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, এটি কি তার প্রিয় মানুষের মহাকাশযান—গানের কথাগুলো এ রকম।

য়ুহা বলল, "তুমি খুব সুন্দর গাইতে পার।"

মিটিয়া হেসে বলল, "তার অর্থ তুমি কখনো গান বা সঙ্গীত শোন না! সে জন্যে বলছ আমি সুন্দর গাইতে পারি।"

য়ুহা বলল, "শুনি। সে জন্যেই বলছি। তোমার গলা খুব সুন্দর।"

"ধন্যবাদ।"

"কমান্ডের এই কঠিন কাজ করতে করতে তুমি গান গাইবার সময় পাও?"

"পাই না। তাই কাজ করার সময় গুনগুন করি।"

"তুমি এখন কী করছ মিটিয়া।"

মিটিয়া মাথা নেড়ে বলল, "বিশেষ কিছুই না। তুমি যেহেতু প্রথমবার যাচ্ছ তাই তোমাকে নিয়ে আমরা একটু বেশি সতর্ক থাকছি, আর কিছু না।"

"আমাকে নিয়ে তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। প্রশিক্ষণের সময় আমাকে খুব ভালোভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছে।"

"প্রশিক্ষণ ক্যাম্প আর আসল মহাকাশযানে অনেক পার্থক্য। প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে সবকিছু হয় নিয়মমাফিক। রুটিনমাফিক। সত্যিকারের মহাকাশযানে বিচিত্র বিচিত্র ঘটনা ঘটে! প্রত্যেকটা অভিযান হচ্ছে নূতন, প্রত্যেকটা অভিযান হচ্ছে বিচিত্র! এখন পর্যন্ত একটা অভিযানে আমি যাই নি যেখানে নূতন একটা কিছু ঘটে নি।"

য়ুহা মাথা ঘুরিয়ে মিটিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কী মনে হয়? এই অভিযানেও কি নূতন কিছু ঘটবে?"

"ঘটতেই পারে!"

"কী ঘটতে পারে বলে তোমার মনে হয়?"

মিটিয়া খিলখিল করে হেসে বলল, "সেটা আমি আগে থেকে কেমন করে বলব? তুমি যেহেতু নূতন মানুষ তুমি কিছু একটা কর।"

য়ুহা মাথা নেড়ে বলল, "সেটা তুমি খারাপ বল নি! আমারই কিছু একটা করা দরকার।"

মিটিয়া বড় বড় দুটি বেল্ট হাতে নিয়ে বলল, "এখন তুমি কয়েক মিনিট চুপ করে বস, তোমাকে এই সিটের সাথে এখন শক্ত করে বেঁধে ফেলতে হবে!"

AMARBOI.COM

য়ুহা নিঃশব্দে বসে রইল, মিটিয়া তার দক্ষ হাতে তাকে আরামদায়ক চেয়ারটায় আটকে ফেলে বলল, "চমৎকার! এখন তুমি ইচ্ছে করলেও কোনো বিপদ ঘটাতে পারবে না।"

য়ুহা বলল, "আমার বিপদ ঘটানোর কোনো ইচ্ছে নেই!"

"শুনে খুশি হলাম।" মিটিয়া য়ুহার হাত ধরে বলল, "তোমার শরীরের সকল কাজকর্ম এখন কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করছে। তোমার কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। তার পরেও যদি মনে কর তোমার কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে তা হলে এই লাল লিভারটা টেনে ধরো।"

"ঠিক আছে।"

"তুমি এখন চুপচাপ শুয়ে থাক। কিছুক্ষণের মাঝেই আমরা রওনা দেব।"

"চমৎকার। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মিটিয়া।"

"ধন্যবাদ য়ুহা।"

মিটিয়া চলে যাবার পর য়ুহা আরামদায়ক চেয়ারটাতে সমস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকে। তার এখনো বিশ্বাস হয় না যে সে সত্যি সত্যি একটি মহাকাশ অভিযানে যাচ্ছে! পদার্থ প্রতি–পদার্থের বিক্রিয়ায় যে প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হবে সেই শক্তিতে এই মহাকাশযানটি তীব্র গতিতে ছুটে যাবে। সেই গতির কারণে সময় স্থির হয়ে যেতে চাইবে—সেই মুহূর্তগুলো কি সে অনুভব করতে পারবে? য়ুহা এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

ক্যাপ্টেন ক্রবের গলায় একটা ঘোষণা শুনতে পেল য়ুহা, শান্ত গলায় বলছে, "মহাকাশযানের সবাইকে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে বলছি। আমি ইঞ্জিন দুটো চালু করছি এখন।"

য়ুহা একটা চাপা গুমগুম শব্দ শুনতে পেল। হঠাৎ করে মহাকাশযানটি থরথর করে কাঁপতে থাকে। কিছু একটা হঠাৎ ঘটে গেল, য়ুহার মনে হতে থাকে অদৃশ্য কোনো একটা শক্তি তাকে যেন তার চেয়ারে প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরেছে! য়ুহা প্রাণপণে নিজেকে সেখান থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে চায়, সে বড় বড় মুখ করে নিঃশ্বাস নেয়, তবু মনে হয় সে বুঝি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

মহাকাশযানের মাঝে একটা লাল আলো কিছুক্ষণ পরপর ঝলকানি দিতে থাকে। একটা চাপা যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসে। পুরো মহাকাশযানটি থরথর করে এমনভাবে কাঁপতে থাকে যে য়ুহার মনে হতে থাকে পুরো মহাকাশযানটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। যতই সময় যেতে থাকে য়ুহার মনে হয় অদৃশ্য শক্তিটা বুঝি তাকে আরো জোরে চেপে ধরছে। তার মনে হতে থাকে সে বুঝি তার চোখের পর্দাটাও আর খুলতে পারবে না। মাথায় এক ধরনের ভোঁতা যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে, চোখের ওপর একটা লাল পর্দা খেলা করতে থাকে। মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে, সে প্রবল এক ধরনের তৃষ্ণা অনুভব করে। য়ুহার মনে হতে থাকে সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, কিন্তু যে কোনো মূল্যে সে জেগে থাকতে চায়। য়ুহা প্রচণ্ড গতির সেই বিস্ময়কর শুরুটুকু নিজের চোখে দেখতে চায়, নিজের ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে চায়। প্রাণপণে সে চোখ খোলা রেখে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে থাকে। সে বিড়বিড় করে নিজেকে বলল, "আমি অচেতন হব না। কিছুতেই অচেতন হব না। কিছুতেই হব না।"

য়ুহা দাঁতে দাঁত কামড় দিয়ে শক্ত হয়ে বসে থাকে। সে অনুভব করতে থাকে তার শরীরের মাংসপেশিতে ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, মনে হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ যেন টেনে তার মুখের মাংসপেশি পেছন দিকে সরিয়ে নিয়েছে, মুখ থেকে দাঁতগুলো বের হয়ে আসছে, চেষ্টা করেও সে সেটা বন্ধ করতে পারছে না। "এটি একটি অভূতপূর্ব অনুভূতি।" য়ুহা নিজেকে বোঝাল, "পৃথিবীর খুব বেশি মানুষের এই অনুভূতিটি অনুভব করার সৌভাগ্য হয় নি। আমি নিঃসন্দেহে একজন সৌভাগ্যবান মানুষ। অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মানুষ।"

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি য়ুহা একসময় এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেল। সে অনেক কষ্ট করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে। কোনো একটা বিচিত্র কারণে সে পরিষ্কার করে কিছু চিন্তা করতে পারছিল না, মাথার ভেতরে কিছু একটা দপদপ করছে, সে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অপেক্ষা করছে কখন এটি শেষ হবে। বুকের ওপর চেপে বসে থাকা অদৃশ্য পাথরটি সরে যাবে, আবার সে উঠে বসতে পারবে।

য়ুহার কাছে যখন মনে হয় বুঝি অনন্তকাল কেটে গেছে তখন হঠাৎ করে মহাকাশযানের ত্বরণ কমে আসতে শুরু করে। য়ুহার হঠাৎ করে মনে হতে থাকে তার সারা শরীর বুঝি পাখির পালকের মতো হালকা হয়ে আসছে। যখন মিটিয়া এসে তার বেল্টটি চাপ দিয়ে খুলে তাকে বের করে আনল, তখন য়ুহা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "অনেক ধন্যবাদ মিটিয়া, আমার মনে হচ্ছিল, আমি বুঝি আর কখনো এই অদৃশ্য দানবের হাত থেকে মুক্তি পাব না!"

মিটিয়া য়ুহার দিকে তাকিয়ে বলল, "প্রথমবার হিসেবে তুমি চিৎকার করেছ য়ুহা। তোমাকে নিয়ে আমাদের রীতিমতো গর্ব হচ্ছে।"

AMARBOI.COM

"ধন্যবাদ মিটিয়া।"

"এর পরের ধাপে তুমি নিশ্চয়ই আরো ভালো করবে!"

"পরের ধাপ?"

"হ্যাঁ। এর পরের ধাপ!"

য়ুহা ভুরু কুঁচকে বলল, "এর পরের ধাপ মানে কী?"

"মহাকাশযানটি ক্রমাগত তার গতিবেগ বাড়িয়ে চলে। একবারে তো করা যায় না, তাই এটাকে ধাপে ধাপে করতে হয়। প্রত্যেকবারই তার গতিবেগ আগের থেকে বাড়িয়ে তোলা হয়। মাঝে মাঝে আমরা বিরতি দিই, তখন দৈনন্দিন কাজগুলো সেরে নিতে হয়। খাওয়াদাওয়া করি।"

য়ুহা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আবার মহাকাশযানের গতিবেগ বাড়ানো হবে? আবার আমাকে মহাকাশযানের চেয়ারে বেল্ট দিয়ে বেঁধে বসতে হবে?"

"হ্যাঁ।" মিটিয়া মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "একবার নয়, অনেকবার।"

"অনেকবার?"

"হ্যাঁ। প্রত্যেকবারই আগেরবার থেকে বেশি তীব্রতায় এবং বেশি সময় ধরে।"

য়ুহা ফ্যাকাসে মুখে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি। তবে ভয় নেই—তুমি দেখবে ধীরে ধীরে পুরো ব্যাপারটায় তুমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ!"

"তার মানে আমার আর কষ্ট হবে না?"

মিটিয়া য়ুহার হাত স্পর্শ করে বলল, "আমি সেটা বলি নি। কষ্ট যেটুকু হবার সেটা তো হবেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তা হলে?"

"কষ্ট সহ্য করা শিখে যাবে।"

ঘণ্টা দুয়েক পর যুহা আবার আবিষ্কার করল, তাকে মহাকাশযানের আরামদায়ক চেয়ারটিতে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হয়েছে। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে। বিশাল মহাকাশযানটি আবার ঝটকা দিয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। মহাকাশযানের ভেতর একটা লাল আলোর ঝলকানি দেখা যায়, যুহার মনে হতে থাকে তার বুকের ওপর একটা অদৃশ্য পাথর ধীরে ধীরে চেপে বসেছে। "হব না। আমি অচেতন হব না।" যুহা বিড়বিড় করে বলল, "আমি কিছুতেই অচেতন হব না।"

যুহা তার সমস্ত স্নায়ুকে শক্ত করে পাথরের মতো বসে থাকে। মনে হতে থাকে বুঝি অনন্তকাল কেটে যাচ্ছে।

৬

ধাপে ধাপে মহাকাশযানের গতিবেগ বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত গতিবেগে পৌঁছানোর পর মহাকাশযানের ভেতরের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল। খাবার টেবিল ঘিরে কমান্ডের সবাই এসে বসেছে, ক্যাপ্টেন ক্রব যুহার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলল, "এই যে কবি যুহা তোমার অবস্থা কেমন?"

"ভালো।"

"তোমার খুব দুর্ভাগ্য যে তুমি একটা সামরিক মহাকাশযানে যাচ্ছ। সাধারণ যাত্রীদের মহাকাশযানে এত কষ্ট নেই।"

"কষ্ট ছাড়া যদি যাওয়া যায় তা হলে মিছিমিছি কষ্ট করা হয় কেন?"

"সময় বাঁচানোর জন্যে। প্রাথমিক গতিবেগ যত বাড়ানো যায় তত সময় বাঁচানো যায়। মহাকাশযানের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে সময়। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক বেগটা বাড়িয়ে নিয়েছি।"

যুহা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বেগ যেটুকু বাড়ানোর কথা ততটুকু বাড়ানো হয়ে গেছে? আর বাড়ানো হবে না?"

ক্যাপ্টেন ক্রব একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "কবি যুহা—এই যে তুমি মহাকাশযানের ভেতরে ভেসে বেড়াচ্ছ না, শক্ত মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছ তার অর্থ আমাদের বেগ এখনো বাড়ছে। তবে সেটা আমাদের সহ্যসীমার ভেতরে। তাই তুমি টের পাচ্ছ না।"

যুহা মাথা নেড়ে বলল, "সব মিলিয়ে আমার একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হল।"

মিটিয়া নামের ডাক্তার মেয়েটি হেসে বলল, "অভিজ্ঞতা হল বল না, বল অভিজ্ঞতা হওয়া শুরু হল।"

যুহা ভয়ে ভয়ে বলল, "কেন? আরো কিছু হবে নাকি?"

"গতিবেগটা যেভাবে বাড়ানো হয়েছে আবার সেভাবে কমানো হবে না? একই ব্যাপার হবে তখন।"

যুহা শুকনো মুখে বলল, "সেটা কখন হবে?"

মিটিয়া মাথা নাড়ল, বলল, "যখন সময় হবে তখন জানানো হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন ক্রব মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "তার দেরি আছে য়ুহা। তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার মহাকাশ ভ্রমণ উপভোগ কর। তোমার আনন্দের জন্য এখানে সব রকম ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে।"

"ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন ক্রব। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"আমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। আমাদের উপরে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমরা যেন তোমার আনন্দের ব্যবস্থা রাখি। তোমার সম্মানে আজকে আমরা বিশেষ ধরনের খাবারের ব্যবস্থা করেছি। নাও খেতে শুরু কর।"

বিশেষ ধরনের খাবার খেতে গিয়ে য়ুহা আবিষ্কার করে সেটি আসলে মোটামুটি সাধারণ খাবার। মহাকাশযানের দীর্ঘ সময়ের জন্যে নিশ্চয়ই খাবারে বৈচিত্র্য আনা কঠিন। য়ুহা এক টুকরো শুকনো রুটি গরম সুপে ভিজিয়ে মুখে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, "আমার ধারণা ছিল তোমাদের কোনো একজন একটা ককপিটে বসে থেকে মহাকাশযানটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে!"

য়ুহার কথা শুনে খাবার টেবিলের কয়েকজন শব্দ করে হেসে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্রব মাথা নেড়ে বলল, "না, আমাদের এই মহাকাশযানটা আমাদের চালিয়ে নিতে হয় না। যাত্রার শুরুতে আমাদের গন্তব্যস্থানের কো-অর্ডিনেট ঢুকিয়ে দিতে হয়। বাকি কাজটুকু কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক করে।"

"তোমাদের কিছুই করতে হয় না?"

"না, আমাদের কিছু করতে হয় না।"

য়ুহা একটু ইতস্তত করে বলল, "একটা যন্ত্রের ওপর এত বিশ্বাস রাখা কি ঠিক?"

উত্তেজক পানীয় খাবার কারণে প্রায় সবাই একটু তরল মেজাজে ছিল, এবারে অনেকেই শব্দ করে হেসে উঠল। হিসান নামের সুদর্শন মানুষটি তার পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ককে যন্ত্র বলা ঠিক নয়। তার ভেতর যে জটিল নেটওয়ার্ক আছে সেটা মানুষের মস্তিষ্কের নেটওয়ার্ক থেকেও বেশি জটিল, বেশি বিস্তৃত। এই মহাকাশযানের প্রত্যেকটা বিন্দুর ওপর সেটি দৃষ্টি রাখছে, সেটি নিয়ন্ত্রণ রাখছে।"

AMARBOI.COM

ক্যাপ্টেন ক্রব গলা উঁচিয়ে বলল, "য়ুহাকে আমাদের কোয়ার্টজ গোলকের পরীক্ষাটি দেখিয়ে দিই।"

মিটিয়া মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা দেখিয়ে দাও!"

ক্যাপ্টেন ক্রব হিসানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি একটা কোয়ার্টজ গোলক নিয়ে এস তো!"

হিসান প্রায় সাথে সাথেই একটা ছোট কোয়ার্টজের স্বচ্ছ গোলক এনে ক্যাপ্টেন ক্রবের হাতে ধরিয়ে দেয়। ক্যাপ্টেন ক্রব অনেকটা বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলল, "এই যে আমার হাতে গোলকটা দেখছ এটা একটা নিখুঁত গোলক। এটাকে ভরশূন্য পরিবেশে তৈরি করা হয়েছে। এই কোয়ার্টজের গোলকটাকে আমি সাবধানে এই টেবিলটার ওপর রাখছি।"

ক্যাপ্টেন ক্রব সাবধানে গোলকটাকে টেবিলের ওপর রাখল, তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, "তুমি দেখছ এটা স্থির হয়ে আছে, কোনো দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে না?"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ দেখছি।"

"তার মানে কী বলতে পারবে?"

য়ুহা মাথা চুলকে বলল, "তার মানে, তার মানে—এই টেবিলটা একেবারে সোজা, এটা কোনো দিকে ঢালু হয়ে নেই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। একজন কবি হিসেবে তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খারাপ নয়। আমাদের এই মহাকাশযানের প্রযুক্তি প্রায় নিখুঁত, এই টেবিলগুলো সব সময়েই সোজা কোথাও কোনো দিকে ঢালু হয়ে নেই। কিন্তু এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে।"

"কী ব্যাপার?"

"মহাকাশযানটা এক জি ত্বরণে সোজা, সামনের দিকে যাচ্ছে। এত বড় একটা মহাকাশযানের গতিতে এতটুকু বিচ্যুতি না ঘটিয়ে নিখুঁতভাবে নেওয়া কিন্তু সহজ নয়। যদি এতটুকু বিচ্যুতি হয় আমরা এই গোলকটাতে দেখব। যদি মহাকাশযানটা একটু বামদিকে ঘুরে যায় এই গোলকটা ডানদিকে গড়িয়ে আসবে, যদি মহাকাশযানটা ডানদিকে ঘুরে যায় এটা বামদিকে গড়িয়ে যাবে।"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "মজার ব্যাপার।"

ক্যাপ্টেন ক্রব কোয়ার্টজের স্বচ্ছ গোলকটা য়ুহার হাতে দিয়ে বলল, "নাও। এটা তুমি রাখ, তোমার ঘরের টেবিলের ঠিক মাঝখানে এটা রেখে দাও। তুমি দেখবে আগামী এক মাসেও এটা এক চুল ডানে বা বামে সরবে না! আমাদের কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কের কাজ এত নিখুঁত!"

য়ুহা গোলকটা হাতে নিয়ে বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন ক্রব।"

খাওয়ার পর সবাই মহাকাশযানের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। য়ুহা হিসানকে খুঁজে বের করে বলল, "হিসান, তুমি কি আমাকে কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কটা একটু দেখাতে পারবে?"

হিসান একটু অবাক হয়ে বলল, "কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক দেখবে?"

"হ্যাঁ।"

"আসলে এটা তো দেখার মতো কিছু নয়। মহাকাশযানের ঠিক মাঝখানে একটা ঘরের ভেতরে আছে।"

"সেই ঘরে আমরা যেতে পারি না?"

"না। ভেতরে যাবার কোনো উপায় নেই।"

"উঁকি দিয়ে দেখতে পারি না?"

হিসান হেসে ফেলল, বলল, "উঁকি দিয়ে দেখারও কিছু নেই। মূল নেটওয়ার্কটা হচ্ছে প্রায় এক মিটার বর্গাকৃতির একটা নিখুঁত ক্রিস্টাল, এর মাঝে একটা পরমাণুও তার সঠিক জায়গা থেকে বিচ্যুত হয় নি। এটাকে রাখা হয় চরম শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রায়। আলোর সকল তরঙ্গে এর সাথে যোগাযোগ হয়। বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করার জন্যে এটাকে ঘিরে রয়েছে একটার পর আরেকটা তারপর আরেকটা স্তর!" হিসান এক মুহূর্ত থেমে বলল, "তোমার ঘরের যোগাযোগ মডিউলে তুমি এ সম্পর্কে সব তথ্য পেয়ে যাবে। হলোগ্রাফিক ছবিতে দেখানো আছে।"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি হলোগ্রাফিক ছবি দেখতে চাই না। আসল জিনিসটা দেখতে চাই!"

"ঠিক আছে, তুমি তা হলে আস আমার সাথে, তোমাকে কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কের ঘরটির কাছাকাছি নিয়ে যাই।"

"হ্যাঁ। চল। আমার দেখার খুব শখ।"

হিসান য়ুহাকে মহাকাশযানের নানা গলিঘুঁজি দিয়ে কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কের ঘরটিতে নিয়ে গেল। চারপাশে নানা ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা, তার মাঝখানে বর্গাকৃতির সাদামাটা ঘর। বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই এর ভেতরে কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কটা রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা ঘরটার ধাতব দেয়াল স্পর্শ করে বলল, "কেউ যদি এই দেয়াল ভেঙে ঢুকে যায়?"

হিসান শব্দ করে হেসে বলল, "নিউক্লিয়ার বোমা দিয়েও এই দেয়াল ভাঙা যাবে না। মহাকাশযানের সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকাটি হচ্ছে এই কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কের ঘর।"

য়ুহা বাইরে থেকে ঘুরে ঘুরে ঘরটিকে দেখে, ধাতব দেয়ালটি হাত দিয়ে স্পর্শ করে তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "চল, যাই।"

"চল। তুমি যেটা দেখতে চেয়েছিলে সেটা দেখছ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি।"

"সত্যি কথা বলতে কী তুমি এই ঘরের ধাতব দেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখ নি।"

য়ুহা হিসানের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি একজন কবি। আমার কাজই হচ্ছে কল্পনা করা। আমি যেটা দেখতে পাই না সেটা কল্পনা করতে পারি, আমি যেটুকু দেখি নি সেটুকু কল্পনা করে নিয়েছি।"

হিসান মাথা ঘুরিয়ে একবার য়ুহার মুখের দিকে তাকাল, কোনো কথা বলল না।

মহাকাশযানের গলিঘুঁজি দিয়ে হেঁটে হেঁটে মূল নিয়ন্ত্রণকক্ষের দিকে ফিরে আসতে আসতে য়ুহা বলল, "আমি এই মহাকাশযানে যে জন্যে এসেছি সেটা কিন্তু এখনো করি নি।"

"কী করতে এসেছ?"

"আমি মহাকাশযানের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মহাকাশকে দেখব। আমি শুনেছি এটা নিকষ কালো—তার মাঝে শুধু নক্ষত্রগুলো জ্বলজ্বল করে, দূরে কোনো একটা গ্যালাক্সিকে স্পষ্ট দেখা যায়—"

হিসান মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ। মহাকাশযানে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য। যারা প্রথমবার দেখে তারা হতবাক হয়ে যায়।"

য়ুহা বলল, "আমার মনে হয় আমি যতদিন এই মহাকাশযানে থাকব ততদিন এই জানালার পাশে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকব। ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার এক ধরনের শিহরণ হচ্ছে। আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে!"

হিসান বলল, "তুমি যখন নিজের চোখে দেখবে তখন গায়ের লোম শুধু দাঁড়িয়ে যাবে না—দাঁড়িয়ে নাচানাচি করতে থাকবে!"

নিয়ন্ত্রণকক্ষে ঢুকে সত্যি সত্যি য়ুহার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। সামনে বিশাল একটা স্বচ্ছ জানালায় মহাকাশকে দেখা যাচ্ছে—নিকষ কালো অন্ধকার মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলছে। দূরে একটি গ্যালাক্সি আরো দূরে আরো কয়েকটি গ্যালাক্সি। মাঝামাঝি একটা অংশে ধোঁয়াটে কিছু অংশ, তার মাঝামাঝি একটা অংশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। দেখে মনে হয় পুরো মহাকাশ বুঝি জীবন্ত কোনো প্রাণী তার সহস্র চোখ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

য়ুহা বুকের ভেতর আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "কী অসাধারণ! কী অপূর্ব!"

হিসান য়ুহার উচ্ছ্বাসে যোগ দিল না। সে অসংখ্যবার মহাকাশ অভিযানে যোগ দিয়েছে, এই দৃশ্য তার কাছে খুব পরিচিত একটা দৃশ্য।

য়ুহা বলল, "আমার ধারণা ছিল নক্ষত্রগুলো বুঝি মিটিমিটি করবে—"

হিসান মাথা নাড়ল, বলল, "ভুল ধারণা! মিটিমিটি করে না। স্থির হয়ে জ্বলে। যদি বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে দেখতে হয় তা হলে এরকম মনে হতে পারে।"

"এত বিচিত্র রঙ আছে সেটাও আমি জানতাম না!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। নক্ষত্রের তাপমাত্রার ওপর তার রঙটা নির্ভর করে।"

"কোনো কোনোটা উজ্জ্বল কোনো কোনোটা এত নিষ্প্রভ যে দেখাই যায় না।"

হিসান বলল, "সেগুলো এত লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরে যে তুমি সেটা কল্পনাও করতে পারবে না।"

"আমি একজন কবি।" য়ুহা নিজের বুকে হাত দিয়ে বলল, "আমি সব কল্পনা করতে পারি।"

ঠিক এ রকম সময়ে ক্যাপ্টেন ক্রব ঘরটিতে এসে ঢুকল, য়ুহার কথা শুনে হাসতে হাসতে বলল, "তুমি সব কল্পনা করতে পার?"

"হ্যাঁ। পারি।"

"দেখা যাক তোমার কথা সত্যি কি না।" ক্যাপ্টেন ক্রব জানালার মাঝামাঝি একটা অংশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "তুমি এই দিকে তাকিয়ে থাক।"

"তাকিয়ে থাকলে কী হবে?"

"আমি এর ঔজ্জ্বল্যটুকু বাড়িয়ে দিই—তুমি তখন একটা অংশ দেখবে যার কাছাকাছি একটা ব্ল্যাক হোল আছে। ব্ল্যাক হোলের আকর্ষণে যে গ্যাস—"

"দাঁড়াও দাঁড়াও—তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না। তুমি এর ঔজ্জ্বল্যটুকু কেমন করে বাড়াবে? আমরা জানালা দিয়ে বাইরে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। মহাকাশের ঔজ্জ্বল্য তুমি কেমন করে বাড়াবে?"

"এই যে।" ক্যাপ্টেন ক্রব হলোগ্রাফিক একটা প্যানেল বের করে তার একটা জায়গায় স্পর্শ করে বলল, "এর পুরো নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে। এই স্ক্রিনে যা আছে তার সবকিছু আমি ইচ্ছে করলে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারি—"

"স্ক্রিন?" য়ুহা চোখ বড় বড় করে বলল, "এটা তা হলে একটা স্ক্রিন? এটা জানালা না?"

"হ্যাঁ এটা একটা স্ক্রিন। মহাকাশযানের বাইরে যে ক্যামেরা আছে সেগুলো থেকে মহাকাশযানের যে ছবি দেখা যাচ্ছে সেগুলো এই স্ক্রিনে দেখাচ্ছে।"

"তার মানে এটা আসল মহাকাশ না? এটা মহাকাশের ছবি?"

ক্যাপ্টেন ক্রব বলল, "তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ আমি জানি না। আমাদের সামনে একটা খোলা জানালা থাকলে আমরা যা দেখতাম এখানে হুবহু তা-ই দেখা যাচ্ছে।"

"হুবহু একরকম। কিন্তু আসল দৃশ্য নয়?"

ক্যাপ্টেন ক্রব বলল, "তুমি যদি সেভাবে বলতে চাও বলতে পার।"

য়ুহার মুখে আশাভঙ্গের একটা ছাপ পড়ল। সে নিচু গলায় বলল, "আমি আসলে নিজের চোখে সত্যিকার মহাকাশ দেখতে চেয়েছিলাম।"

"এটা সত্যিকার মহাকাশ, তুমি নিজের চোখে দেখছ।"

"এটা সত্যিকার মহাকাশ না। এটা সত্যিকার মহাকাশের ছবি!"

ক্যাপ্টেন ক্রব হিসানের দিকে তাকিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। হিসান বলল, "য়ুহা তুমি বিশ্বাস কর। সত্যিকার মহাকাশ ঠিক এ রকম। হুবহু এ রকম।"

য়ুহা বলল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি। কিন্তু তবুও সত্যিকার মহাকাশ দেখতে চাইছিলাম।"

"সত্যিকার মহাকাশ দেখার উপায় থাকে না। তার প্রয়োজন নেই, তুমি যেহেতু অনেক ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছ কেন তার জন্যে কষ্ট করবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা বুঝতে পারছ না। আমি ব্যাপারটা অনুভব করতে চাই। অনুভব। ভুল জিনিস দিয়ে কোনো কিছু অনুভব করা যায় না। সত্যি আর তার ছবি এক নয়—"

ক্যাপ্টেন ক্রব বাধা দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি বুঝতে পারছি তোমার কৌতূহলটা যৌক্তিক কৌতূহল নয়, এটা হচ্ছে এক ধরনের আবেগতাড়িত কৌতূহল!"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছ। আমার ভেতরে যুক্তি খুব বেশি নেই। যা আছে তার পুরোটাই আবেগ! এবং—"

"এবং?"

"সে জন্যে আমার কোনো লজ্জা নেই! কোনো হীনম্মন্যতা নেই।"

ক্যাপ্টেন ক্রব মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি। আমি তোমাকে সত্যিকার জানালা দিয়ে বাইরে তাকানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" তারপর হিসানের দিকে তাকিয়ে বলল, "ট্রান্সপোর্ট ঘরের পাশে সিকিউরিটি চ্যানেলের যে কোয়ার্টজ জানালা আছে য়ুহাকে সেখানে নিয়ে যাও।"

"কিন্তু সেটা এত ছোট!"

"হ্যাঁ। অনেক ছোট। কিন্তু কিছু করার নেই।"

য়ুহা আগ্রহ নিয়ে বলল, "ছোট হোক আমার আপত্তি নেই! সত্যিকার জানালা হতেই হবে। আমি ছোট একটা জানালা দিয়েই বাইরে তাকাতে পারব।"

হিসান ইতস্তত করে বলল, "জায়গাটাতে অক্সিজেন সরবরাহ আর তাপমাত্রার খানিকটা সমস্যা আছে।"

য়ুহা ব্যস্ত হয়ে বলল, "থাকুক! আমার আপত্তি নেই।"

"কোয়ার্টজের একটা জানালা, অতিবেগুনি রশ্মি পুরোটুকু কাটা যায় না। রেডিয়েশনের সমস্যাও আছে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব বলল, "রেডিয়েশন মনিটর দেখে যেও। আমার মনে হয় সিকিউরিটি স্যুট পরে গেলে কোনো সমস্যা হবে না।"

কাজেই কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ট্রান্সপোর্ট ঘরের পাশে সিকিউরিটি চ্যানেলের কাছে একটা সিকিউরিটি স্যুট পরে য়ুহা কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে বাইরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে আছে।

হিসান জিজ্ঞেস করল, "তুমি যেটা দেখতে চেয়েছ সেটা দেখছ?"

য়ুহা বুকের ভেতর আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, দেখছি। আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না আমি নিজের চোখে মহাকাশকে দেখছি।"

"কেমন দেখছ?"

"অপূর্ব! গ্যালাক্সিটা দেখেছ?"

"হ্যাঁ, এন্ড্রোমিডা। আমাদের সবচাইতে কাছের গ্যালাক্সি।"

"আমার চোখের পাতি ফেলতেও ভয় করছে। মনে হচ্ছে চোখের পাতি ফেললে যদি চলে যায়?"

হিসান শব্দ করে হাসল, বলল, "না। যাবে না। এই গ্যালাক্সিটা ঠিক এখানেই থাকবে! আমাদের মহাকাশযানটা তার গতিপথ এতটুকু পরিবর্তন না করে এগিয়ে যাবে—তাই এন্ড্রোমিডাটাকে যেখানে দেখছ সেখানেই দেখবে, আগামী এক মাস এটা এখান থেকে এক চুলও নড়বে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা আবার কোয়ার্টজের জানালায় মুখ লাগিয়ে বলল, "আমি ওটাকে আরো কিছুক্ষণ দেখি?"

"দেখ। তোমার যতক্ষণ ইচ্ছে দেখ।"

য়ুহা কোয়ার্টজের জানালায় মুখ লাগিয়ে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। তার এখনো নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না যে সত্যি সত্যি মহাকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

৭

ঘুমানোর আগে য়ুহা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বিছানায় তার মাথার কাছে টেবিলের ঠিক মাঝখানে স্বচ্ছ কোয়ার্টজের গোলকটা যেখানে রেখে গিয়েছিল সেটা ঠিক সেখানেই আছে—তার জায়গা থেকে সেটা এক চুল নড়ে নি। ক্যাপ্টেন ক্রব ঠিকই বলেছিল, কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক সত্যিই অসাধারণ। এত বড় একটা মহাকাশযানকে অচিন্তনীয় বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, শুধু যে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা-ই নয়, প্রতি মুহূর্তে তার গতিবেগ বাড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই। মনে হয় তারা সবাই মিলে বুঝি মহাকাশযানে নিঃসঙ্গ পরিবেশে কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুমানোর আগে য়ুহা যোগাযোগ মডিউলটা চালু করে শীতলঘরে ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রায় শীতল করে রাখা এগার জন মানুষকে একবার দেখে। রায়ীনার ছবিটা ভেসে আসার পর সে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, মেয়েটার চেহারায় এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণবন্ত মানুষের চিহ্ন ছিল, এখন সেখানে কিছু নেই, শক্ত পাথরের মতো দেহটি নিশ্চল হয়ে আছে, দেখে মনে হয় না এটি আসলে কোনো মানুষের দেহ। মনে হয় এটা বুঝি পাথরের তৈরি একটা ভাস্কর্য। য়ুহা রায়ীনার দেহটির দিকে তাকিয়ে নিজের বুকের ভেতরে এক ধরনের বেদনা অনুভব করে, ঠিক কী কারণে জানা নেই, তার ভেতরে এক ধরনের গভীর অপরাধবোধের জন্ম নেয়।

ঘুম থেকে ওঠার পর য়ুহার এক সেকেন্ড সময় লাগে বোঝার জন্যে সে কোথায় আছে। মাথার কাছে বড় একটা টেবিল, সেই টেবিলের ঠিক মাঝখানে স্বচ্ছ কোয়ার্টজের একটা গোলক, সেটা দেখে হঠাৎ করে য়ুহার মনে পড়ে সে একটা মহাকাশযানে করে যাচ্ছে। য়ুহা তখন তার আরামদায়ক বিছানায় উঠে বসে বেশ কিছুক্ষণ স্বচ্ছ কোয়ার্টজের গোলকটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর বিছানা থেকে নেমে আসে।

য়ুহা যখন খাবার টেবিলে গিয়েছে তখন সেখানে শুধু মিটিয়া নামের মেয়েটি বসে কোনো একটা পানীয়তে চুমুক দিচ্ছে। য়ুহাকে দেখে মুখে হাসি টেনে বলল, "ঘুম ভাঙল?"

"হ্যাঁ। ভেঙেছে।"

"তোমাকে দেখে আমার রীতিমতো হিংসে হয়।"

"হিংসে হয়? আমাকে?"

মিটিয়া মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"কেন?"

"তুমি যখন ইচ্ছে ঘুমাতে যেতে পার, যখন ইচ্ছে ঘুম থেকে উঠতে পার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা টেবিলের নিচে সুইচটাতে চাপ দিতেই একটা অংশ খুলে ধূমায়িত একটা ট্রে বের হয়ে আসে। তার মাঝে কয়েক ধরনের কৃত্রিম শর্করা এবং প্রোটিন। য়ুহা পানীয়ের মগটা টেনে নিয়ে এক চুমুক খেয়ে বলল, "এই মহাকাশযানের সবকিছুই তো নিয়ন্ত্রণ করছে কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক। তোমাদের কমান্ডের কারো তো কোনো কাজ নেই—তোমরা সবাই আমার মতো যখন ইচ্ছে ঘুমাও না কেন? যখন ইচ্ছে জেগে ওঠো না কেন?"

মিটিয়া শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "আমরা একটা কমান্ডের অধীনে কাজ করি। আমাদের সব সময় এমনভাবে প্রস্তুত থাকতে হয় যেন পরের মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটবে!"

"কিন্তু কোনো অঘটন তো ঘটছে না।"

"না ঘটছে না। কিন্তু আমাদের প্রস্তুত থাকতে হয়, সে জন্যে আমরা আছি।"

"এই মুহূর্তে যদি কিছু একটা অঘটন ঘটে তা হলে তোমরা তার জন্যে প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ।" মিটিয়া হেসে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে বিপদ সংকেতের অ্যালার্মটা বাজিয়ে দেখ। মুহূর্তের মাঝে পুরো কমান্ড তাদের দায়িত্ব নিয়ে চলে আসবে।"

য়ুহা মাথা নেড়ে বলল, "যদি দেখি আমার মহাকাশ ভ্রমণ আস্তে আস্তে একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে তা হলে একদিন আমি বিপদ সংকেতের অ্যালার্মটা বাজিয়ে দেব।"

"নিজের দায়িত্বে বাজিয়ো! যদি দেখা যায় শুধু মজা করার জন্যে বাজিয়েছ তা হলে বাকি সময়টা ক্যাপ্টেন ক্রব তোমাকে তোমার ঘরে তালা মেরে আটকে রাখতে পারে! আমাদের সামরিক নিয়মকানুন তা-ই বলে!"

য়ুহা খাবারের ট্রে থেকে একটি কৃত্রিম ফল হাতে নিয়ে সেটাতে একটা কামড় দিয়ে বলল, "তোমরা সবাই কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক খুব বিশ্বাস কর?"

"হ্যাঁ। করি।" মিটিয়া তার পানীয়তে শেষ চুমুক দিয়ে মগটা টেবিলের নিচে ঢুকিয়ে বলল, "তুমি কর না?"

"আমি কোনো যন্ত্রকে কখনো বিশ্বাস করি না।"

মিটিয়া হাসি হাসি মুখ করে বলল, "কিন্তু তুমি নিজে কি একটা বায়ো মেডিকেল যন্ত্র না?"

য়ুহাকে একটু বিপন্ন দেখায়, সে ইতস্তত করে বলল, "আমি, মানে আমি—"

"হ্যাঁ তুমিও একটা যন্ত্র। কোনো কোনো যন্ত্র জৈবিক উপায়ে তৈরি হয়, কোনো কোনোটা আমরা তৈরি করি। এই হচ্ছে পার্থক্য!"

য়ুহা ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি বলতে চাইছ, কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক জৈবিক যন্ত্রের মতো কিছু একটা?"

"হ্যাঁ। কোনো কোনো দিকে তার থেকে বেশি।"

"তার মানে আমি যদি একটা কবিতার লাইন বলি তোমাদের কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক তার পরের লাইনটা বলতে পারবে?"

মিটিয়া খিলখিল করে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি নিজেই চেষ্টা করে দেখ! আমার মনে হয় পারবে।"

"পারবে?"

"হ্যাঁ।"

" আমি কেমন করে জিজ্ঞেস করব?"

"কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কের একটা কণ্ঠ ইন্টারফেস আছে। সেটা ব্যবহার করা হয় না। ক্যাপ্টেন ক্রবকে বললে সে তোমার জন্যে এটা চালু করে দিতে পারবে। তুমি তখন তার সাথে খোশগল্প করতে পারবে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি!"

"বাহ্। খুব মজা তো। আমি ক্যাপ্টেন ক্রবকে এখনই ধরছি।"

কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা গেল য়ুহা একটা গোপন পাসওয়ার্ড ঢুকিয়ে কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে। প্রথমে সে খানিকটা অনিশ্চিতের মতো বলল, "আমি য়ুহা, কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তুমি যদি আমার কথা বুঝে থাক তা হলে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

কাছাকাছি একটা ভয়েস সিনথেসাইজার শুষ্ক এবং যান্ত্রিক গলায় বলল, "উত্তর হ্যাঁ-সূচক।"

"তুমি কি কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক কথা বলছ?"

"উত্তর পুনরায় হ্যাঁ-সূচক।"

"তুমি কি আমাকে চেনো? আমার নাম—"

"উত্তর হ্যাঁ-সূচক। তথ্যকেন্দ্রে তথ্য সংরক্ষিত।"

য়ুহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমাকে সবাই বলেছে কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমার ধারণা ছিল তুমি সত্যিকার মানুষের মতো কথা বলতে পারবে। কিন্তু তুমি একটা খেলনা যন্ত্রের মতো শব্দ করছ।"

"মানব প্রজাতির মতো কথা বলতে সক্ষম।"

"তা হলে বলছ না কেন?"

"আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা প্রয়োজন।"

"ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমি আনুষ্ঠানিকভাবে তোমাকে বলছি—একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে যেভাবে কথা বলে, তুমি সেভাবে আমার সাথে কথা বল।"

AMARBOI.COM

"বয়স?"

"আমার বয়সী?"

"পুরুষ অথবা রমণী?"

য়ুহা এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "পুরুষ।" কোয়ান্টাম কম্পিউটার তার যান্ত্রিক গলায় বলল, "ঠিক আছে।"

য়ুহা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এখন সত্যিকার মানুষের মতো কথা বলবে?"

ভয়েস সিনথেসাইজার থেকে সুন্দর পুরুষের মতো গলার কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক বলল, "বলব। অন্তত বলার চেষ্টা করব!"

"চমৎকার!" য়ুহা একটু এগিয়ে এসে বলল, "কথা বলার সাথে সাথে যদি তোমাকে দেখতে পেতাম সেটা আরো মজা হত!"

"এগুলো আসলে ছেলেমানুষি কাজকর্ম। মানুষ যখন প্রথম শুরু করেছে তখন এর মাঝে সময় দিয়েছে। সময় নষ্ট করেছে। এখন এর মাঝে কোনো নূতনত্ব নেই, তাই কেউ চেষ্টা করে না! তুমি প্রথমবার এসেছ বলে করছ। কয়দিন পর তুমিও আর করবে না।"

"কিন্তু এখন আমার কাছে এর অনেক নূতনত্ব আছে।"

"থাকুক। আমার কথা বিশ্বাস কর। একটা কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ককে মানুষের চেহারায় দেখে মানুষের কণ্ঠে কথা বলিয়ে কোনো লাভ নেই। কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক মানুষ না। তার অনুভূতি মানুষের অনুভূতি নয়। তার ইন্দ্রিয় মানুষের ইন্দ্রিয় নয়।"

য়ুহা বলল, "কিন্তু আমি তোমার সাথে মানুষের ভাষায় কথা বলতে চাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন?"

"আমি তোমার বুদ্ধির একটা পরিমাপ করতে চাই।"

কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক একটা হাসির মতো শব্দ করল, "আমার জানামতে সেরকম কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি নেই।"

"আমার কোনো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। আমি আমার নিজের পদ্ধতি ব্যবহার করব।"

"তোমার নিজের পদ্ধতি কী?"

"একটা প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা যখন খুব উপরে উঠে যায় তখন সে যুক্তির বাইরের কাজ করতে পারে।"

"সেটা কী?"

"যেমন, মনে কর সে কবিতা লিখতে পারে।"

কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। য়ুহা বলল, "আমি তোমাকে কবিতার একটা লাইন বলব। তুমি তার পরের লাইনটা বলবে। ঠিক আছে?"

"ঠিক নেই।"

য়ুহা অবাক হয়ে বলল, "ঠিক নেই?"

"না। ঠিক নেই। আসলে আমি তোমার সাথে এই প্রতিযোগিতায় যেতে চাই না।"

"এটা প্রতিযোগিতা না। এটা একটা পরীক্ষা।"

"আমি এই পরীক্ষা দিতে চাই না।"

"চেষ্টা কর। দেখি তুমি কতটুকু পার।"

"আমি একটুও পারব না। আমি আসলে এ ধরনের কাজের জন্যে তৈরি হই নি। আমি এই মহাকাশযানটাকে নিখুঁতভাবে মহাকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যেতে পারব কিন্তু কবিতার একটা লাইনের পিঠাপিঠি আরেকটা লাইন বসাতে পারব না।"

য়ুহা মাথা নেড়ে বলল, "তুমি চেষ্টা করে দেখ।"

"তুমি যদি জোর কর, তা হলে চেষ্টা করব।"

'হ্যাঁ। আমি জোর করছি।"

"বেশ।"

য়ুহা বলল, "আকাশের পথে দেখ নক্ষত্রের ঘর—"

"আকাশের পথে? কিন্তু আকাশ ব্যাপারটা তো একটা কাল্পনিক ধারণা। আকাশ বলে তো কিছু নেই। সেই আকাশের পথ—"

য়ুহা বলল, "আমি তোমার সাথে এটা নিয়ে তর্ক করতে চাই না। আমি একটা কবিতার লাইন বলেছি, তুমি এর পরের লাইন বল।"

"কিন্তু সে জন্যে এটা তো একটু বিশ্লেষণ করতে হবে। নক্ষত্র হচ্ছে মহাজাগতিক বিষয়। কিন্তু ঘর শব্দটি অত্যন্ত জাগতিক। মহাজাগতিক নক্ষত্রকে তুমি একটা জাগতিক শব্দ দিয়ে প্রদর্শন করছ—"

য়ুহা বলল, "থাক। আমার মনে হয় তোমার বলার ইচ্ছে নেই।"

"ইচ্ছের ব্যাপার নয়—এটা হচ্ছে—"

"থাক তোমার আর চেষ্টা করতে হবে না।"

"তুমি কি আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছ?"

"না।" য়ুহা মাথা নাড়ল, "মানুষ কখনো যন্ত্রের ওপর ক্রুদ্ধ হয় না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শুনে একটু স্বস্তি পেলাম।"

"ঠিক আছে তা হলে, বিদায়।"

য়ুহা চলে যেতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। বলল, "কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক। তোমাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"কর।"

"তুমি কি কখনো মিথ্যা কথা বলেছ?"

"মিথ্যা কথা?"

"হ্যাঁ।"

"না। আমি কেন মিথ্যা কথা বলব। আমাদের কখনো মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন হয় না। এটা তোমাদের ব্যাপার। মানুষকে প্রয়োজনে এবং কখনো কখনো অপ্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলতে হয়। শুধু মানুষকে। আমাদের নয়।"

"কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক, বিদায়।"

"বিদায়।"

য়ুহা তার ঘরে ঘুমানোর আগে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। বড় টেবিলের ঠিক মাঝখানে স্বচ্ছ কোয়ার্টজের গোলকটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক চুল নড়ে নি। কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক অবিশ্বাস্য নিখুঁত গতিতে এই মহাকাশযানটিকে মহাকাশে উড়িয়ে নিতে পারে কিন্তু একটা সহজ কবিতার লাইন তৈরি করতে পারে না!

য়ুহার ঘুম হল ছাড়া ছাড়া। ঘুম থেকে উঠে সে কিছুক্ষণ তার বিছানায় বসে রইল। ঠিক কী কারণ জানা নেই সে নিজের ভেতরে এক ধরনের বিষণ্ণতা অনুভব করে। সে বিছানা থেকে নেমে টেবিলটার দিকে তাকাল—সাথে সাথে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়, স্বচ্ছ কোয়ার্টজের গোলকটি খুব ধীরে ধীরে বাম দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

পুরো এক মাস মহাকাশযানটির এক দিকে যাবার কথা। কিন্তু মহাকাশযানটি দিক পরিবর্তন করছে। কেন?

য়ুহা যখন তার হাতে কোয়ার্টজের গোলকটা নিয়ে ছুটে এসেছে তখন খাবার টেবিলে ক্যাপ্টেন ক্রবের সাথে তার কমান্ডের আরো চারজন বসে আছে। য়ুহাকে দেখে ক্যাপ্টেন ক্রব একটু অবাক হয়ে বলল, "কী ব্যাপার য়ুহা? তুমি এভাবে ছুটে আসছ কেন?"

"তোমরা বলেছ এই মহাকাশযান সোজা সামনের দিকে যাবে। দিক পরিবর্তন করবে না। ঠিক কি না?"

"হ্যাঁ ঠিক। বলেছি।"

"কিন্তু মহাকাশযানটি দিক পরিবর্তন করছে।"

ক্যাপ্টেন ক্রবের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল, হাসি হাসি মুখেই বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

য়ুহা তার হাতের কোয়ার্টজ গোলকটা দেখিয়ে বলল, "এই গোলকটা আমার টেবিলে রাখা ছিল, এটা বাম দিকে গড়িয়ে যেতে শুরু করেছে।"

"হয়তো তোমার হাতে টোকা লেগে গড়িয়ে গেছে।"

"না।" য়ুহা মাথা নেড়ে বলল, "আমি অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি।" হাতের কোয়ার্টজ গোলকটা ক্যাপ্টেন ক্রবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন ক্রব কোয়ার্টজ গোলকটা নেওয়ার চেষ্টা করল না, হাত তুলে বলল, "য়ুহা তুমি বস।"

"হ্যাঁ, বসব। কিন্তু তুমি আমাকে আগে বোঝাও। আমাদের মহাকাশযানটার সোজা সামনের দিকে যাবার কথা, কিন্তু এটা দিক পরিবর্তন করছে। কেন করছে?"

"তুমি এত উত্তেজিত হয়ো না। তুমি আগে মাথা ঠাণ্ডা করে বস।"

"কিন্তু তুমি আগে বোঝাও। কেন এটা তোমাদের কিছু না জানিয়ে দিক পরিবর্তন করছে? কোথায় চলে যাচ্ছে মহাকাশযানটা?"

ক্যাপ্টেন ক্রব নরম গলায় বলল, "তুমি শুধু শুধু উত্তেজিত হচ্ছ য়ুহা। এই মহাকাশযানটা কোথাও চলে যাচ্ছে না। যেখানে যাবার কথা ঠিক সেখানেই যাচ্ছে।"

"কিন্তু তা হলে এটা দিক পরিবর্তন করছে কেন?"

"এটা দিক পরিবর্তন করছে না। ওপরে তাকিয়ে দেখ—এখানে একটা মনিটর আছে। এই মনিটরে এটা দেখাচ্ছে যে এটা তার কো-অর্ডিনেট একেবারেই পরিবর্তন করে নি। মহাকাশযানটার যেদিকে যাবার কথা এটা সেদিকেই যাচ্ছে।"

"কিন্তু—কিন্তু এই কোয়ার্টজ গোলক?"

"আমি ঠিক জানি না তোমার কোয়ার্টজ গোলকটা কী করেছে।"

"আমি যতবার টেবিলে রেখেছি ততবার বাম দিকে গড়িয়ে গেছে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব বলল, "তুমি নিশ্চয়ই ঠিক করে রাখ নি।"

"আমার কথা বিশ্বাস না করলে তুমি রাখ টেবিলের ওপর।"

ক্যাপ্টেন ক্রব হা হা করে হেসে বলল, "তুমি আমাকে বলছ আমি যেন কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ককে বিশ্বাস না করে তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু আসলে আমি কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ককেই বেশি বিশ্বাস করি! কাজেই কোয়ার্টজ গোলকটা টেবিলের ওপর রাখার কোনো প্রয়োজন দেখি না!"

য়ুহা মুখ শক্ত করে বলল, "ঠিক আছে আমি নিজেই রাখছি। এই দেখ।"

য়ুহা কোয়ার্টজের গোলকটা টেবিলের মাঝখানে রাখল এবং সেটা একটুও না নড়ে স্থির হয়ে রইল। ক্যাপ্টেন ক্রব কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, "কবি য়ুহা, তোমার গোলক তো মোটেও গড়িয়ে যাচ্ছে না।"

য়ুহা বিব্রত মুখে বলল, "কী আশ্চর্য! এখন নড়ছে না। কিন্তু বিশ্বাস কর আমার ঘরের টেবিলের ওপর যতবার রেখেছি ততবার বাম দিকে গড়িয়ে গেছে!"

"সম্ভবত তোমার টেবিলে কোনো সমস্যা আছে!"

টেবিলে বসে থাকা মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বলল, "কোয়ান্টাম নেটওয়ার্কে একটা সমস্যা হওয়া থেকে তোমার টেবিলে সমস্যা হওয়া অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য!"

বসে থাকা সবাই শব্দ করে হেসে উঠল।

য়ুহা তার ঘরে চুপচাপ বসে আছে। পাশে বড় টেবিলের ঠিক মাঝখানে সে তার স্বচ্ছ কোয়ার্টজের গোলকটা রেখেছে, সেটা সেখানে স্থির হয়ে আছে। তার টেবিলে কোনো সমস্যা নেই, তা হলে গোলকটা সেখানে এভাবে স্থির হয়ে থাকত না। এই মহাকাশযানে কিছু একটা ঘটছে যেটা সে বুঝতে পারছে না। সে মহাকাশযানের দায়িত্বে নেই—তার এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা নয় কিন্তু ভেতরে কিছু একটা খচখচ করছে। কেউ যদি তাকে পুরো বিষয়টা ঠিক করে বুঝিয়ে দিত তা হলে ভেতরের অস্থিরতাটা একটু কমত। বিষয়টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো খুবই সহজ—খুবই ছেলেমানুষি, সে যেটা বুঝতে পারছে না। য়ুহা অনেকটা অন্যমনস্কভাবে কোয়ার্টজের গোলকটার দিকে তাকিয়ে থাকে, হঠাৎ সে আবার চমকে উঠল, গোলকটা আবার ধীরে ধীরে বাম দিকে গড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। য়ুহা গোলকটির দিকে তাকিয়ে থাকে—সেটা গড়িয়ে গড়িয়ে টেবিলের কিনারায় পৌঁছানোর পর সে সেটাকে আবার টেবিলের মাঝখানে বসিয়ে দেয়, গোলকটি আবার গড়াতে শুরু করে। এর অর্থ কী? মহাকাশযানটা কি আবার দিক পরিবর্তন করতে শুরু করেছে?

য়ুহা উঠে দাঁড়াল, তাকে ব্যাপারটা বুঝতেই হবে। গোলকটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হতেই সে দেখে মিটিয়া হেঁটে যাচ্ছে—য়ুহা গলা উঁচিয়ে তাকে ডাকল, "মিটিয়া।"

"কী ব্যাপার য়ুহা।"

"তুমি এক সেকেন্ডের জন্যে আমার ঘরে আসতে পারবে?"

"অবশ্যই। কী হয়েছে?"

"সে রকম কিছু না। আমি তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।"

"কী জিনিস?"

"এই যে এই গোলকটা, দেখ।"

য়ুহা গোলকটাকে টেবিলের ওপর রাখল এবং সেটা স্থির হয়ে রইল। মিটিয়া জিজ্ঞেস করল, "কী দেখব?"

য়ুহা বিব্রতভাবে বলল, "না, একটু আগেই এটা বাম দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন যাচ্ছে না।"

মিটিয়া হেসে বলল, "তুমি এই গোলকের কথা ভুলে যাও য়ুহা। এটা মনে হয় তোমাকে খুব চিন্তার মাঝে ফেলে দিচ্ছে।"

"না, চিন্তার মাঝে ফেলে নি। আমি শুধু এটা বুঝতে চাইছি।"

"এত কিছু বুঝে কী হবে? আমাদের কাছে মহাকাশ ভ্রমণের কিছু মজার অভিজ্ঞতার হলোগ্রাফিক ক্লিপ আছে। বসে বসে দেখ—"

য়ুহা বলল, "হ্যাঁ। ঠিক আছে। দেখব।"

মিটিয়া ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সাথে সাথে গোলকটা আবার গড়িয়ে যেতে শুরু করে। য়ুহা ছুটে গিয়ে মিটিয়াকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল, হঠাৎ করে সে বুঝতে পারে মিটিয়াকে ঘরে আনা মাত্রই গোলকটা আবার থেমে যাবে, কেউ একজন তাকে নিয়ে খেলছে। কেন খেলছে?

য়ুহা চিন্তিত মুখে ঘর থেকে বের হয়ে এল। কন্ট্রোল প্যানেলে হিসান একটা ভিডিও মডিউল খুলে কিছু একটা দেখছিল। য়ুহা তার কাছে গিয়ে বলল, "তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"কী জিনিস?"

"যদি মনে কর এই মহাকাশযানের কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক ঠিক করে আমাদের সবাইকে যেখানে নেওয়ার কথা সেখানে না নিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে তা হলে কি তোমরা সেটা কোনোভাবে বুঝতে পারবে?"

হিসান হেসে ফেলল, "কোয়ান্টাম কম্পিউটার কেন সেটা করবে?"

য়ুহা বলল, "যদি করে?"

"করবে না।"

"মনে কর এটা কাল্পনিক একটা প্রশ্ন। যদি করে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসান এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "না আমরা সেটা বুঝতে পারব না। এই মহাকাশযানে আমরা যেটা দেখি, যেটা শুনি তার সবকিছু আসে কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক থেকে। কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক আমাদের হাত-পা, আমাদের চোখ-কান, আমরা আমাদের নিজেদের চোখ-কানকে অবিশ্বাস করব কেমন করে? তবে—"

"তবে কী?"

"আমরা যদি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই, নিজের চোখে দেখার চেষ্টা করি তা হলে সেটা দেখব।"

য়ুহা বলল, "আমি জানি, ব্যাপারটা এক ধরনের ছেলেমানুষি কৌতূহল। তবু আমি একবার নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হতে চাই।"

হিসান হাসল, বলল, "যাও। দেখে আস।"

য়ুহা হেঁটে হেঁটে ট্রান্সপোর্ট ঘরের পাশে সিকিউরিটি চ্যানেলের কাছে এসে দেখে দরজাটি বন্ধ। সে দরজাটি খোলার চেষ্টা করল, খুলতে পারল না। কয়েকবার চেষ্টা করে সে হাল ছেড়ে দেয়। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে দরজাটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

য়ুহা কী করবে বুঝতে না পেরে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসে। বিছানায় পা তুলে বসে সে খানিকক্ষণ চিন্তা করল। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারছে না, বোঝার চেষ্টা করেছে, লাভ হয় নি। সে আর সময় নষ্ট করবে না, সবকিছু ভুলে গিয়ে সে মহাকাশ ভ্রমণ উপভোগ করতে শুরু করবে। সে শুনেছিল মহাকাশ ভ্রমণে নাকি ভরশূন্য পরিবেশ হতে পারে, সে ক্যাপ্টেন ক্রবকে অনুরোধ করবে ভরশূন্য পরিবেশ তৈরি করতে। মিটিয়া যে হলোগ্রাফিক ক্লিপগুলোর কথা বলেছিল সেগুলো দেখবে। কোয়াঞ্জিজের গোলকটা সে ছুড়ে ফেলে দেবে কোথাও!

বিছানা থেকে নামতেই হঠাৎ করে য়ুহার মাথাটা একটু ঘুরে গেল, আরেকটু হলে সে পড়েই যাচ্ছিল, কোনোভাবে বিছানাটা ধরে নিজেকে সামলে নেয়। কী আশ্চর্য! কী হয়েছে তার?

টলতে টলতে একটু এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলতে গিয়ে আবিষ্কার করল দরজাটা বন্ধ। য়ুহা কয়েকবার জোরে ধাক্কা দেয় দরজাটাকে, সেটা পাথরের মতো শক্ত হয়ে আটকে আছে। য়ুহা অবাক হয়ে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার ঘরে খুব সূক্ষ্ম মিষ্টি এক ধরনের গন্ধ, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কিছু একটা হয়েছে এই ঘরে। কী হয়েছে?

"য়ুহা।"

কেউ একজন তাকে ডাকছে, য়ুহা চমকে উঠে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। কেউ নেই, কে কথা বলে?

"য়ুহা।"

"কে?"

"আমি কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক।"

"তুমি কী চাও?"

"তোমার বিছানার মাথার কাছে তোমার অস্ত্রটা রাখা আছে। সেটা হাতে নাও।"

"কেন?"

"তুমি এখন আত্মহত্যা করবে।"

য়ুহা চমকে উঠে বলল, "কেন আমি আত্মহত্যা করব?"

AMARBOI.COM

"আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি তাই।"

"না।" য়ুহা চিৎকার করে বলল, "কিছুতেই না।"

কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক হাসির মতো শব্দ করল, বলল, "তোমার ঘরে আমি নিহিনক্স গ্যাস পাঠাচ্ছি। একটু পরেই তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু থাকবে না। আমি যেটা বলব সেটাই হবে তোমার।"

য়ুহা বিস্ফারিত চোখে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। সত্যি সত্যি তার কাছে মনে হচ্ছে কিছুতেই আর কিছু আসে-যায় না। তার কাছে মনে হতে থাকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা মাথায় ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দেওয়া চমৎকার একটা ব্যাপার।

"মহাকাশযানের সবাই জানে কিছু একটা নিয়ে তুমি খুব বিক্ষিপ্ত।" কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক ফিসফিস করে বলল, "কেউ যদি তোমার যোগাযোগ মডিউল দেখে, দেখবে সেখানে তুমি অনেক বিভ্রান্ত কথা লিখেছ।"

"আমি লিখি নি।"

কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক নরম গলায় বলল, "আমি লিখেছি। তোমার হয়ে আমি লিখেছি। নিঃসঙ্গ মহাকাশযানে বিভ্রান্ত একজন কবি এক ধরনের মানসিক চাপের মাঝে থেকে হঠাৎ করে আত্মহত্যা করেছে—এটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য একটা ঘটনা।"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। বিশ্বাসযোগ্য।"

"তুমি এস, অস্ত্রটি হাতে নাও।"

য়ুহা টলতে টলতে এগিয়ে যায়। অস্ত্রটা হাতে নেয়।

কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক ফিসফিস করে বলে, "অস্ত্রটা তোমার মাথায় ধর য়ুহা। ট্রিগার টেনে ধর।"

য়ুহা অস্ত্রটা মাথায় ধরে, ট্রিগার টানতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলল, "কিন্তু কেন?"

"তুমি আমার কাজকর্মে অসুবিধে করছ।"

"কিন্তু-কিন্তু-"

"ট্রিগারটা টানো য়ুহা।"

ট্রিগার টানতে গিয়ে য়ুহা আবার থেমে গেল। বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "আমাকে শুধু একটা কথা বল।"

"কী কথা?"

"তুমি সবাইকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?"

"আমি জানি না। আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছে সে জানে।"

"কে তোমাকে নির্দেশ দিয়েছে?"

"অত্যন্ত বুদ্ধিমান কোনো প্রাণী। যারা আমার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে আমার নির্দেশকে পাল্টে দিতে পারে। আমার এখন তার নির্দেশ মানতে হবে। আমি এখন তার নির্দেশ মানছি।"

"কিন্তু-কিন্তু-"

"ট্রিগারটা টানো য়ুহা।"

ট্রিগারটা টানতে গিয়ে য়ুহা আবার থেমে গেল। তার ভেতরের কোনো একটা সত্তা তাকে বলছে, "না, কিছুতেই না। কিছুতেই না।"

"টানো।"

"না।" য়ুহা দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "না। টানব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক হাসির মতো শব্দ করল, বলল, "তুমি টানবে য়ুহা! অবশ্যই ট্রিগারটা টানবে। নিহিনক্স গ্যাস তোমার চেতনাকে যখন আরেকটু দুর্বল করবে তখন তুমি ট্রিগারটা টানবে।"

য়ুহা অস্ত্রটা শক্ত করে ধরে রাখে। তার মাথার মাঝে একটা কবিতার লাইন এসেছে, "রক্তের মাঝে মৃত্যুর খেলা মৃত্যুর মাঝে রক্ত—"

"টানো।"

য়ুহা ট্রিগার টানল, কিন্তু টানার ঠিক আগের মুহূর্তে অস্ত্রটা দরজার দিকে ঘুরিয়ে নিল। প্রচণ্ড একটা শব্দে তার কানে তালা লেগে যায়, ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে যায়। খকখক করে কাশতে কাশতে য়ুহা দেখল একটু আগে যেখানে দরজাটা ছিল সেখানে একটা বিশাল গর্ত। য়ুহা হামাগুড়ি দিয়ে গর্তটা দিয়ে বের হতে চেষ্টা করে। কে যেন পেছন থেকে ডাকছে, "য়ুহা। য়ুহা। শোন য়ুহা—"

কোনোমতে ঘর থেকে বের হয়ে য়ুহা উঠে দাঁড়ায়, কোনো কিছু সে পরিষ্কার করে চিন্তা করতে পারছে না। মনে হচ্ছে সে বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে। চারপাশে যা ঘটছে সেগুলো যেন অতিপ্রাকৃত ঘটনা। সবকিছু যেন পরাবাস্তব। টলতে টলতে সে দুই পা এগিয়ে যায়। গুলির শব্দ শুনে কমান্ডের সবাই ছুটে আসছে, তারস্বরে একটা অ্যালার্ম বাজতে শুরু করেছে কোথাও।

য়ুহা টলতে টলতে ছুটে যেতে থাকে ট্রান্সপোর্ট ঘরের পাশে সিকিউরিটি চ্যানেলের দিকে। বন্ধ দরজাটা সে গুলি করে ভেঙে ভেতরে ঢুকবে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখবে—

"য়ুহা। কী করছ তুমি?"

কেউ একজন পেছন থেকে ডাকছে কিন্তু য়ুহা পেছন ফিরে তাকাল না—এখন তার আর নষ্ট করার মতো সময় নেই। সে ছুটে যেতে থাকে।

"য়ুহা।"

"রক্তের মাঝে মৃত্যুর খেলা মৃত্যুর মাঝে রক্ত" য়ুহা বিড়বিড় করে বলল, "রক্তের মাঝে মৃত্যুর খেলা..."

ট্রান্সপোর্ট ঘরের পাশে সিকিউরিটি চ্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে সে তার অস্ত্রটা তুলে ধরে ট্রিগার টেনে ধরল। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল, ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায় চারদিক। ধোঁয়াটা সরে গেলে য়ুহা দেখল যেখানে দরজাটা ছিল সেখানে বিশাল একটা বৃত্তাকার গর্ত হয়ে গেছে।

য়ুহা গর্তের ভেতর দিয়ে ঘরটাতে ঢুকে জানালায় মুখ লাগিয়ে বাইরে তাকাল। কালো মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে কিন্তু এন্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিটা দেখা যাচ্ছে না। ঠিক সামনেই এটা থাকার কথা ছিল, এটি নেই। মহাকাশযানটা ঘুরে গেছে বলে এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

য়ুহা জানালা থেকে মুখ সরিয়ে তাকাল, কমান্ডের লোকজন অস্ত্র উদ্যত করে তাকে ঘিরে রেখেছে।। য়ুহা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার কথা তোমরা বিশ্বাস কর নি। এখন তা হলে নিজের চোখেই দেখ।" য়ুহা জানালা থেকে সরে গিয়ে বলল, "এই মহাকাশযানটা আমাদের অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখ।"

অবিশ্যি তখন আর তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল না। পুরো মহাকাশযানটি হঠাৎ একবার ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠল। এতক্ষণ কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক পুরো বিষয়টা সবার কাছে গোপন রেখেছিল, এখন আর গোপন রাখার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপর্যয়

১

কিছু বোঝার আগেই যুহা মহাকাশযানের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় গড়িয়ে গেল, হাত দিয়ে নিজেকে থামানোর চেষ্টা করল, পারল না, মহাকাশযানের দেয়ালে গিয়ে সে সজোরে একটা ধাক্কা খেল। পুরো মহাকাশযানটা থরথর করে কাঁপছে, মনে হচ্ছে এটা বুঝি যে কোনো মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাবে। যুহা ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে, তীক্ষ্ণ স্বরে একটা অ্যালার্ম বাজছে। অ্যালার্মের তীব্র শব্দটি শুনলেই মনে হয় বুঝি ভয়ঙ্কর একটা বিপদ নেমে আসছে। একটা লাল আলো থেকে থেকে জ্বলে উঠছে, সেটা বুকের মাঝে একটা কাঁপুনির জন্ম দেয়। যুহা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না। তার মনে হল অদৃশ্য একটা শক্তি বুঝি তাকে দেয়ালে চেপে ধরে রেখেছে। সে মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকানোর চেষ্টা করল, মহাকাশযানের ভেতরে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। কমান্ডের ক্রুরা চারদিকে ছিটকে পড়ছে। কেউ আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না। ভেতরে কর্কশ এক ধরনের ভয় জাগানো শব্দ, সেই শব্দ ছাপিয়ে ইঞ্জিনের চাপা গুম গুম শব্দ ভেসে আসছে। যুহা মহাকাশযানের দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। হঠাৎ পুরো মহাকাশযানটি একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো ঝটকা দিয়ে ওঠে, যুহা কিছু বোঝার আগেই দেখে সে শূন্যে ছিটকে উঠেছে—নিচে পড়ার আগেই সে অন্য পাশে ছুটে গেল—নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করল, পারল না। মুহূর্তেই তার চারপাশের জগৎটা অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে যুহার মনে হল, তা হলে এটাই কি মৃত্যু?

ভয়ঙ্কর এক ধরনের দুঃস্বপ্ন দেখছিল যুহা, পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে সে গড়িয়ে যাচ্ছে, নিজেকে থামানোর চেষ্টা করছে, পারছে না। নিচে লকলক আগুন, সেই আগুনের প্রচণ্ড তাপে তার শরীরের চামড়া গলে গলে পড়ে যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর কিছু প্রাণী তাকে ঘিরে ফেলেছে, শরীরটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে আর সে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। এর মাঝে ভাসা ভাসাভাবে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। তীব্র আলোর ঝলকানি, মানুষের আর্তচিৎকার আর ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ শুনে সে আবার জ্ঞান হারিয়েছে। অচেতন অবস্থায় সে টের পেয়েছে তার দেহটা মহাকাশযানের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ছিটকে গেছে, আঘাতে আঘাতে তার সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

যুহার জ্ঞান ফিরে পাবার পরও সে বুঝতে পারল না কোথায় আছে। চারপাশে অসংখ্য জঞ্জাল ভেসে বেড়াচ্ছে, তার মাঝে সে নিজেও ভাসছে। যুহা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, তার মাঝে এক ধরনের আতঙ্ক এসে ভর করে, সে কি হঠাৎ করে নিচে পড়বে, শরীরের সবগুলো হাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে? কিন্তু যুহা পড়ল না, সে মহাকাশযানের ভেতরে ভাসতে লাগল।

যুহা মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল, একটা লাল আলো একটু পরে পরে ঝলকানি দিচ্ছে কিন্তু সেই কর্কশ অ্যালার্মের শব্দটি নেই। চারপাশে এক ধরনের নীরবতা, সেই ভয়ঙ্কর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৈঃশব্দ্য বুকের মাঝে এক ধরনের ভয়ের কাঁপুনি ছড়িয়ে দেয়। য়ুহা নিজের অজান্তেই সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না কিন্তু হঠাৎ করে তার সারা শরীরটা বিচিত্রভাবে ওলটপালট খেতে থাকে। শরীরের কোথাও কোথাও ভয়ঙ্কর এক ধরনের বেদনা—কে জানে হাড়গোড় কিছু ভেঙেছে কি না। য়ুহা দাঁতে দাঁত কামড়ে ব্যথাটুকু সহ্য করল। নিজেকে থামানোর জন্যে সে হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করল, হঠাৎ করে যেটা ধরল সেটা হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়—একজন মানুষের শীতল দেহ! য়ুহা ভয় পাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠে চারদিকে তাকায়, সবাই কি মারা গেছে?

ঠিক এ রকম সময় য়ুহা মহাকাশযানের এক পাশে আলো হাতে কয়েকজনকে ভেসে যেতে দেখে। অত্যন্ত ব্যস্তভাবে দ্রুতগতিতে তারা ছুটে যাচ্ছে। য়ুহা তাদেরকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল, মানুষগুলো খুব ব্যস্ত, এখন হয়তো তাদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না। য়ুহা মহাকাশযানের ভেতরে অসহায়ভাবে ঝুলে আছে, সামনে-পিছে যেতে পারছে না। একজন ক্রুয়ের দেহ ভেসে ভেসে আসছে, সেটাকে টেনে ধরে সে ছেড়ে দিতেই সামনের দিকে এগিয়ে গেল। দেয়ালের কাছে পৌঁছাতেই সে শক্ত করে দেয়ালটা খামচে ধরার চেষ্টা করতে থাকে। বাম হাতটা ব্যথায় টনটন করছে, মাথার ভেতরেও যন্ত্রণার এক ধরনের অনুভূতি দপদপ করছে। য়ুহা সেই অবস্থায় দেয়ালটা ধরে নিচে নামতে থাকে।

ঠিক এ রকম সময়ে য়ুহা দেখল তার সামনে দিয়ে হিসান দ্রুত ভেসে যাচ্ছে—ভঙ্গিটা এত সাবলীল যে দেখে মনে হয় পানির ভেতর দিয়ে কোনো একটি জলচর প্রাণী ভেসে যাচ্ছে। য়ুহা গলা উঁচু করে ডাকল, "হিসান। এই যে হিসান।"

হিসান য়ুহার গলার আওয়াজ শুনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই এক পাক ঘুরে গেল, হাত দুটো পেছনের দিকে ধাক্কা দিয়ে সে অত্যন্ত দক্ষ ভঙ্গিতে য়ুহার কাছে হাজির হল, "য়ুহা?"

"হ্যাঁ। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখেছ? পুরো মহাকাশযানটা একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে।"

হিসান শুকনো গলায় বলল, "হ্যাঁ।"

"তুমি বিশ্বাস করবে না—আমি দেখেছি একজন মনে হয় মারা গেছে। উপরে ভাসছে।"

"একজন নয়, বেশ কয়েকজন।"

"সর্বনাশ।"

"কিছু আসে-যায় না। কেউ একটু আগে আর কেউ একটু পরে।"

য়ুহা ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে?"

"আমরা এই মহাকাশযানটা ধ্বংস করে ফেলছি।"

য়ুহা অবাক হয়ে বলল, "কী করছ?"

"মহাকাশযানটা ধ্বংস করে ফেলছি।"

"কী বলছ তুমি?" য়ুহা চিৎকার করে বলল, "কী বলছ?"

"হ্যাঁ। আমরা মহাকাশযানটা ধ্বংস করে ফেলছি।"

"কেন?"

"ক্যাপ্টেন ক্রবের আদেশ। এই মহাকাশযানটা হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি। এটা যেন কিছুতেই অন্য কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর হাতে না পড়ে।"

য়ুহা চিৎকার করে বলল, "কিন্তু এটা রক্ষা করার জন্যে তোমরা চেষ্টা করবে না? আগেই মহাকাশযানটা ধ্বংস করে ফেলবে? সবাইকে মেরে ফেলবে?"

হিসান শান্ত গলায় বলল, "আমার এখন সেটা নিয়ে কথা বলার সময় নেই য়ুহা। আমরা সবাই সামরিক কমান্ডের ক্রু। আমরা মরতে ভয় পাই না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা চিৎকার করে বলল, "কিন্তু আমি সামরিক কমান্ডের ক্রু না! আমি মরতে ভয় পাই। আমি তোমাদের সাথে মরতে চাই না—আমি বেঁচে থাকতে চাই।"

হিসান য়ুহার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মেঝেতে পা দিয়ে ভেসে যেতে যেতে বলল, "বিদায় য়ুহা। আশা করছি তোমার জীবনটা সুন্দর ছিল।"

য়ুহা হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সত্যিই এই মহাকাশযানটাকে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে? সে মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল। মহাকাশযানের মাঝে আবছা এক ধরনের অন্ধকার, একটা ঘোলাটে লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে। বিশাল মহাকাশযানে অসংখ্য জঞ্জাল ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর মাঝে কয়েকজন ক্রুয়ের দেহও আছে। মানুষগুলো মারা গেছে—হিসান বলেছে 'তাতে কিছু আসে–যায় না। একটু পরে অন্য সবাইও মারা যাবে। কেউ আগে, কেউ পরে।'

য়ুহার ভেতরে হঠাৎ প্রচণ্ড ক্রোধ ফুঁসে উঠতে থাকে। সে চিৎকার করে ডাকল, "ক্যাপ্টেন ক্রব! তুমি কোথায় ক্যাপ্টেন ক্রব?"

য়ুহা শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন ক্রবকে কন্ট্রোলঘরে খুঁজে পেল। ঘরের মাঝখানে একটা অসম্পূর্ণ হলোগ্রাফিক স্ক্রিন মাঝে মাঝে এসে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন ক্রব অন্যমনস্কভাবে সেদিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হয় সে বুঝি মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ভালো করে তাকালে বোঝা যায় সে আসলে মেঝে থেকে বেশ খানিকটা উপরে সোজা হয়ে ভাসছে। ক্যাপ্টেন ক্রবকে দেখে য়ুহা চিৎকার করে বলল, "ক্যাপ্টেন ক্রব।"

ক্যাপ্টেন ক্রব শান্ত ভঙ্গিতে বলল, "বল য়ুহা।"

"এটা কি সত্যি যে তুমি এই মহাকাশযানটাকে উড়িয়ে দিচ্ছ?"

"হ্যাঁ, এটা সত্যি।"

"তুমি এই মহাকাশযানের সবাইকে মেরে ফেলবে?"

"আমরা সামরিক কমান্ডের ক্রু। আমাদেরকে প্রয়োজনে মরতে শেখানো হয়েছে।"

"তোমাদের শেখানো হয়েছে—আমাকে তো শেখানো হয় নি।"

"সেটা তোমার দুর্ভাগ্য—"

"না।" য়ুহা চিৎকার করে বলল, "তুমি এটা করতে পার না। তোমাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব শান্ত গলায় বলল, "চেষ্টা করার বিশেষ কিছু নেই। আমি সবার সাথে কথা বলেছি, সবার সাথে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই মুহূর্তে আমরা একটা গ্রহের আকর্ষণে আটকা পড়ে আছি—কালো অন্ধকার একটা গ্রহ। এই গ্রহে কোনো একটা মহাজাগতিক প্রাণী থাকে—তারা আমাদের ধরে এনেছে। আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে—আমাদের বিশেষ কিছু করার নেই। আমি সবকিছু ভেবে দেখেছি।"

য়ুহা বলল, "হয়তো দেখ নি। হয়তো তুমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আমি যখন বলেছিলাম মহাকাশযানটা গতিপথ পরিবর্তন করছে তখন তুমি আমার কথাও বিশ্বাস কর নি। মনে আছে? তুমি যদি আমার কথা বিশ্বাস করতে তা হলে হয়তো অবস্থা অন্য রকম হত!"

"সেটা সম্ভবত সত্যি। কিন্তু আমাকে তো যুক্তির ভেতরে থেকে কাজ করতে হবে। আমি তো অযৌক্তিক কাজ করতে পারি না।"

য়ুহা হিংস্র গলায় বলল, "হয়তো খুব জটিল অবস্থায় একটা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন ক্রব একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো প্রক্রিয়া আমার জানা নেই য়ুহা। তবে তুমি নিশ্চিত থাক আমি সবার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

"তুমি আমার সাথে কথা বল নি!"

"তুমি আমার কমান্ডের কেউ নও। তোমার সাথে কথা বলার কথা নয়।"

"কিন্তু হতে পারে আমি তোমাকে খুব ভালো একটা সিদ্ধান্ত দিতে পারতাম।"

ক্যাপ্টেন ক্রব ভুরু কুঁচকে বলল, "দিতে পারতে?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে দাও দেখি!"

"এই মহাকাশযানে এগার জন বিদ্রোহীকে শীতলঘরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে তাদের সাথে পরামর্শ কর। তাদের নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নাও।"

ক্যাপ্টেন ক্রব আনন্দহীন এক ধরনের হাসি হেসে বলল, "তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে—তা না হলে কেউ এ রকম কথা বলে? তারা বিদ্রোহী গেরিলা দল, তাদের হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেবার জন্যে এই অভিযান—আর আমি তাদের ছেড়ে দেব?"

"হ্যাঁ। ছেড়ে দেবে। অবশ্যই ছেড়ে দেবে—"

"কোন যুক্তিতে?"

য়ুহা জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "কারণ আমরাও মানুষ, তারাও মানুষ। একটা মহাজাগতিক প্রাণীর হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমরা মানুষেরা একসাথে থাকব! আমাদের পার্থক্যের কথা আমরা ভুলে যাব—"

ক্যাপ্টেন ক্রব শব্দ করে হেসে বলল, "এটা একটা অত্যন্ত আজগুবি প্রস্তাব। এ ধরনের কিছু করা হলে সামরিক কমান্ডে আমাকে বিচার করা হবে!"

"না, করা হবে না। এতগুলো মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে তোমাকে পদক দেওয়া হবে।"

"না। হবে না। আমি সামরিক কমান্ডের মানুষ—আমি জানি। আমাদের নিয়ম মেনে চলতে হয়।"

য়ুহা চিৎকার করে বলল, "তোমার নিয়মের আমি নিকুচি করি! আগে মানুষের জীবন তারপর নিয়ম।"

ক্যাপ্টেন ক্রব কঠিন মুখে বলল, "না। সবার আগে নিয়ম।"

য়ুহা কাতর গলায় বলল, "দোহাই লাগে তোমার ক্যাপ্টেন ক্রব, এগার জন যোদ্ধাকে তুমি শীতলঘরে শীতল করে রেখেছ! তাদের ব্যবহার কর।"

"না।" ক্যাপ্টেন ক্রব মাথা নেড়ে বলল, "য়ুহা। আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আর কঠিন সিদ্ধান্তটি নিয়েছি। আমার ক্রুরা এই মুহূর্তে মহাকাশযানের নির্দিষ্ট জায়গায় বিস্ফোরক লাগাচ্ছে।" ক্যাপ্টেন ক্রব হাতে ধরে রাখা একটা সুইচ দেখিয়ে বলল, "কিছুক্ষণের মাঝে আমি এই সুইচ টিপে পুরো মহাকাশযানটি উড়িয়ে দেব। আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্তটি একটু একা থাকতে চাই। নিজের সাথে শেষ বোঝাপড়া করতে চাই।"

য়ুহা স্থির দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন ক্রবের দিকে তাকিয়ে ছিল। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কারণে ক্যাপ্টেন ক্রব ভরশূন্য পরিবেশে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, য়ুহা একেবারেই পারে না, তাকে এক জায়গায় থাকার জন্যে এটা-সেটা ধরতে হয়—একটু আগে একটা ভাসমান ধাতবদণ্ড ধরেছে, সেটা এখনো তার হাতে আছে। য়ুহা একবার ক্যাপ্টেন ক্রবের দিকে তাকাল তারপর তার হাতের দণ্ডটির দিকে তাকাল। তার মুখের মাংসপেশি হঠাৎ করে শক্ত হয়ে যায়। সে দুই হাতে শক্ত করে ধাতবদণ্ডটি ধরে রেখে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়ায়। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ জীবনে কখনোই কোনো মানুষের গায়ে হাত তোলে নি—একজন মানুষকে কেমন করে আঘাত করতে হয় সে জানে না। বহুদিন আগে কোথায় শুনেছিল মাথার পেছনে ঘাড়ের কাছাকাছি আঘাত করলে মানুষ নাকি অচেতন হয়ে যায়। যুহা তা-ই চেষ্টা করল, পুরো ঘটনাটি ঘটল চোখের পলকে এবং অত্যন্ত স্থূলভাবে, এ ধরনের ব্যাপারে একেবারেই অভ্যস্ত নয় বলে আঘাত করার ধাক্কা সামলাতে গিয়ে সে নিজে শূন্যে হুটোপুটি খেতে থাকে। অনেক কষ্টে নিজেকে যখন সামলে নেয় তখন সে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে ক্যাপ্টেন ক্রবের অচেতন দেহ ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে মেঝেতে ধাক্কা খেয়ে আবার উপরে উঠে যাচ্ছে। তার হাতে এখনো শক্ত করে একটা সুইচ ধরে রাখা আছে, এই সুইচে কিছু গোপন সংখ্যা প্রবেশ করিয়ে একটু পরে পুরো মহাকাশযানটিকে উড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল।

যুহা মেঝেতে ধাক্কা দিয়ে ক্যাপ্টেন ক্রবের কাছে পৌঁছে তার হাতের মুঠি থেকে সুইচটা খুলে নেয়। সুইচটা পকেটে রেখে সে তার গলায় ঝোলানো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটিও খুলে নিল। তারপর ক্যাপ্টেন ক্রবের দেহটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, মহাকাশযানের অসংখ্য জঞ্জালের ভেতর সেটিও ঘুরপাক খেতে খেতে ভাসতে থাকে। ক্যাপ্টেন ক্রবের জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ তাকে খুঁজে পাবে না।

এখন তাকে শীতলঘরে গিয়ে এগার জন বিদ্রোহীকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আগে সে কখনো এটা করে নি কিন্তু সেটা নিয়ে তার খুব একটা দুশ্চিন্তা নেই। আগে সে অনেক কিছুই করে নি। একটা ধাতবদণ্ড দিয়ে আঘাত করে সে আগে কখনো কোনো মানুষকে অচেতন করে নি!

AMARBOI.COM

২

ভরশূন্য পরিবেশে চলাচল করার অভ্যাস না থাকার কারণে শীতলঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে যুহার বেশ অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল। পাশাপাশি এগারটা ক্যাপসুল সাজানো আছে, ভেতরে আবছা অন্ধকার, যন্ত্রপাতির মৃদু গুঞ্জন ছাড়া সেখানে কোনো শব্দ নেই।

যুহা ক্যাপসুলগুলো পরীক্ষা করে, কেমন করে এর ভেতরে শীতল হয়ে থাকা মানুষগুলোকে জাগিয়ে তোলা যাবে সে জানে না। তাকে বলা হয়েছে ক্যাপসুলগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ—কাজেই বাইরের সাথে যোগাযোগ কেটে দিলে ক্যাপসুলগুলো কোনো উপায় না দেখে নিশ্চয়ই ভেতরের মানুষটিকে জাগিয়ে দেবে। বিষয়টা হয়তো বিপজ্জনক কিন্তু নিশ্চয়ই কার্যকর। যুহা হাতের অস্ত্রটি নিয়ে একটা একটা করে ক্যাপসুল পরীক্ষা করে রায়ীনার ক্যাপসুলের পাশে এসে দাঁড়াল। স্বচ্ছ ঢাকনার ভেতর দিয়ে রায়ীনার শীতল দেহটি দেখা যাচ্ছে, দেখে মনে হয় না এটি একটি জীবন্ত মানুষ, মনে হয় পাথরের ভাস্কর্য। যুহা ক্যাপসুলের পাশে সুইচগুলো পরীক্ষা করে কোনো একটি লিভার টেনে কোনো একটা সুইচ টিপে দিলেই ভেতরের মানুষটি জেগে উঠবে সে রকম কিছু খুঁজে পেল না। তাই সে ক্যাপসুলের ভেতর থেকে বের হয়ে যাওয়া নানা ধরনের টিউব, বৈদ্যুতিক তার, অপটিক্যাল ক্যাবলগুলো খুঁজে বের করল। যদি সে এগুলো কেটে দেয় তা হলে নিশ্চয়ই ক্যাপসুলটি পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে রায়ীনাকে জাগিয়ে তুলবে। বিষয়টি নিশ্চয়ই খুব বিপজ্জনক কিন্তু যুহার কিছু করার নেই। এই মহাকাশযানের প্রতিটি মুহূর্ত এখন প্রতিটি মানুষের জন্যে বিপজ্জনক।

যুহা হাতের অস্ত্রটি ক্যাবলগুলোর দিকে তাক করে ট্রিগার টেনে ধরল—ঘরের ভেতর একটা বিস্ফোরণের শব্দ হয়, কালো ধোঁয়া এবং ঝাঁজালো গন্ধে সারা ঘর ভরে ওঠে। যুহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশতে কাশতে একটু পেছনে সরে এল। চেষ্টা করেছে ছোটখাটো একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে কিন্তু তারপরও সেটি পুরো ঘরটিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। বিস্ফোরণের শব্দে কৌতূহলী হয়ে ক্রুরা এখানে চলে এলে একটা ঝামেলা হয়ে যাবে।

যুহা একটা ক্যাপসুলের পেছনে লুকিয়ে থেকে নিঃশব্দে অপেক্ষা করে। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে সে কাউকে দ্রুত ভেসে আসতে দেখল না দেখে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করে। রায়ীনার ক্যাপসুলের ওপর একটা লাল বাতি নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে জ্বলতে এবং নিভতে শুরু করেছে। সাথে সাথে একটা কর্কশ অ্যালার্মও বাজতে থাকে। যুহা ক্যাপসুলটির ভেতরে তাকাল, হালকা একটা সাদা ধোঁয়া ধীরে ধীরে বের হতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে সে এখনো জানে না। রায়ীনার দেহটি সত্যি সত্যি জেগে উঠবে নাকি প্রক্রিয়াটি শেষ করতে না পারার কারণে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় ছটফট করে মেয়েটির মৃত্যু ঘটে যাবে সেটি সে এখনো জানে না। ক্যাপসুলে হেলান দিয়ে যুহা নিঃশব্দে বসে থাকে। একজন মানুষের দেহ চরম শূন্যের কাছাকাছি তাপমাত্রা থেকে জীবনের উষ্ণতায় ফিরিয়ে আনতে নিশ্চয়ই একটু সময়ের দরকার।

যুহা দেখতে পেল খুব ধীরে রায়ীনার মুখের রঙ ফিরে আসছে। একসময় সে দেখতে পায় তার হৃৎস্পন্দন শুরু হয়েছে এবং খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাসের সাথে সাথে তার বুক উপরে উঠতে এবং নিচে নামতে শুরু করেছে। যুহা ঠিক বুঝতে পারল না, সে কি ক্যাপসুলের উপরের ঢাকনাটি খুলবে নাকি আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।

রায়ীনা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। জ্ঞান ফিরে পাবার পর সে তার হাতের আঙুলগুলো চোখের সামনে নিয়ে এসে সেদিকে তাকিয়ে থাকে—ঠিক অচেতন হবার আগে সে যে জিনিসটি নিয়ে ভাবছিল দেখে মনে হয় সে ঠিক সেই জিনিসটি নিয়েই ভাবতে শুরু করেছে—এর মাঝখানে যে একটি বড় সময় পার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে সে সেই বিষয়টি বুঝতেই পারছে না। যুহা ক্যাপসুলের ঢাকনার ওপর ঝুঁকে পড়ে হাত দিয়ে শব্দ করল, রায়ীনা তখন খানিকটা হতচকিতের মতো মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, তারপর উঠে বসার চেষ্টা করল। যুহা উপরের ঢাকনাটি খুলে দিতেই ভেতর থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বের হয়ে আসে। রায়ীনা যুহাব দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে, তাকে দেখে মনে হয় সে ঠিক কিছুই বুঝতে পারছে না। যুহা নিচু গলায় ডাকল, "রায়ীনা—"

রায়ীনা চোখের কাছে হাত নিয়ে যুহাকে দেখার চেষ্টা করতে করতে বলল, "তুমি কে?"

"আমি যুহা।"

"আমার কী হয়েছে? আমি ভালো করে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন?"

"তুমি এই মাত্র শীতলঘর থেকে জেগে উঠেছ তাই।" যুহা সাহস দিয়ে বলল, "কিছুক্ষণের মাঝেই তুমি পুরোপুরি জেগে উঠবে।"

রায়ীনা তরল গলায় বলল, "আমার নিজেকে খুব হালকা লাগছে—মনে হচ্ছে আমি ভাসছি।"

যুহা মাথা নাড়ল, বলল, "আমরা এখন ভরশূন্য পরিবেশে আছি তাই তোমার নিজেকে হালকা লাগছে?"

রায়ীনা খানিকটা অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসার শব্দ করে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও—আমি ভেসে বেড়াব! ভরশূন্য পরিবেশে ভেসে বেড়াতে আমার খুব ভালো লাগে—"

মেয়েটা এখনো পুরোপুরি জেগে ওঠে নি, কথাবার্তায় এখনো খানিকটা অসংলগ্ন। যুহা রায়ীনার হাত ধরে তাকে খুব সাবধানে ক্যাপসুলের ভেতর থেকে বের করে আনে। রায়ীনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে ভরশূন্য পরিবেশে শুয়ে পড়ার ভঙ্গি করতে করতে আদুরে গলায় বলল, "আমি কত দিন ঘুমাই নি—আমাকে একটু ঘুমাতে দাও!"

যুহা রায়ীনার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "রায়ীনা, আসলে তুমি অনেক দিন থেকে ঘুমাচ্ছ। সত্যি কথা বলতে কি তোমার এখন ঘুম থেকে ওঠার সময়। খুবই জরুরি, তুমি জেগে ওঠার চেষ্টা কর।"

"জেগে উঠব?"

"হ্যাঁ।'

"কেন জেগে উঠব?"

"এই মহাকাশযানটির এখন খুব বড় বিপদ। তুমি তাড়াতাড়ি জেগে ওঠো, আমি তোমার সাথে এটা নিয়ে কথা বলতে চাই রায়ীনা।"

রায়ীনা ভুরু কুঁচকে যুহার দিকে তাকিয়ে মনে হয় পুরো বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করে। ঠিক এ রকম সময় যুহা দরজার কাছে মৃদু একটা শব্দ শুনতে পায়। সে মুখ তুলে তাকাতেই চমকে ওঠে। ক্যাপ্টেন ক্রবের সাথে কমান্ডের বেশ কয়েকজন ক্রু বাতাসে ভেসে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সবাই একটা ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে তার দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে। যুহা কী করবে ঠিক বুঝতে পারল না, শুনতে পেল, কমান্ডের একজন হিংস্র গলায় বলছে, "হাতের অস্ত্রটা ছেড়ে দিয়ে দুই হাত শূন্যে তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াও যুহা।"

যুহা এক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করল। সে কি একবার শেষ চেষ্টা করবে? চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই, এতজন সশস্ত্র অভিজ্ঞ সামরিক কমান্ডের ক্রুয়ের বিরুদ্ধে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে অস্ত্রটা ছেড়ে দিল, সাথে সাথে সেটা ভাসতে ভাসতে উপরে উঠে গেল। যুহা হাত দুটো উপরে তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কমান্ডের মানুষটি এবারে রায়ীনাকে লক্ষ করে বলল, "তুমিও দুই হাত শূন্যে তুলে স্থির হয়ে দাঁড়াও, তা না হলে আমি তোমাকেও হত্যা করতে বাধ্য হব।"

রায়ীনা মানুষটির দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বলল, "তুমি আমার সাথে এ রকম রাগ হয়ে কথা বলছ কেন?"

যুহা অনেকটা কৈফিয়ত দেওয়ার মতো করে বলল, "আসলে রায়ীনা এখনো পুরোপুরি জেগে ওঠে নি—এখনো খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে আছে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব শীতল গলায় বলল, "যুহা। তুমি কি জান, তোমাকে যেন আমি কঠিন একটা শাস্তি দিতে পারি শুধু এটা নিশ্চিত করার জন্যে আমি মহাকাশযানটাকে আরো কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখব?"

যুহা কোনো কথা বলল না, শুধু রায়ীনা একটা বাচ্চা মেয়ের মতো খিলখিল করে হেসে উঠল। যেন ক্যাপ্টেন ক্রব খুব মজার কথা বলেছে!

৩

যুহা শেষ পর্যন্ত আর অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে না, কারণ তাকে মহাকাশযানের দেয়ালে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার পাশেই রায়ীনা, তাকেও একইভাবে বাঁধা হয়েছে। কমান্ডের ছয় জন ক্রু তাদের দিকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তাক করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেন ক্রব কাছাকাছি একটা টেবিলের পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন ক্রব দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে শেষ পর্যন্ত একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি আমার দীর্ঘ জীবনে কখনোই এ রকম একটি ঘটনা ঘটতে দেখি নি। য়ুহা, তুমি আমার নির্দেশ পুরোপুরি উপেক্ষা করে আমাকে শারীরিকভাবে আঘাত করে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে একজন বিদ্রোহীকে জাগিয়ে তুলেছ?"

য়ুহা বলল, "তুমি যদি আমার কথা শুনতে তা হলে আমার তোমাকে অচেতন করার প্রয়োজন হত না। আর একটা বিদ্রোহীকে বিপজ্জনকভাবে জাগিয়ে তুলতে হত না। তোমাকে আঘাত করার জন্যে আমি দুঃখিত। একজন মানুষকে অচেতন করার জন্যে তাকে কত জোরে আঘাত করতে হয় আমার জানা নেই তাই সম্ভবত আঘাতটি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক জোরে হয়ে গিয়েছিল।"

ক্যাপ্টেন ক্রব দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তোমার দুঃসাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি য়ুহা। তোমাকে সে জন্যে শাস্তি পেতে হবে। অত্যন্ত কঠিন একটা শাস্তি।"

"মহাকাশযানটিকে ধ্বংস করে সবাইকে মেরে ফেলবে, তুমি এর মাঝে আমাকে আলাদা করে কী শাস্তি দেবে?"

"এর মাঝেও তোমাকে আলাদা করে শাস্তি দেওয়া সম্ভব। সময় হলেই তুমি সেটা দেখবে।"

য়ুহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এ রকম চরম বিপদের মাঝেও তুমি একেবারে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার উপরে উঠতে পারছ না দেখে আমি খুব অবাক হয়েছি। ক্যাপ্টেন ক্রব, আমি তোমার জন্যে করুণা অনুভব করছি, তুমি নিশ্চয়ই খুব অসুখী একজন মানুষ।"

"আমি আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ নিয়ে কথা বলতে আসি নি।"

য়ুহা ক্যাপ্টেন ক্রবকে বাধা দিয়ে বলল, "আমি এখনো বিশ্বাস করি আমার সিদ্ধান্তটি পুরোপুরি সঠিক। এগার জন বিদ্রোহীকে জাগিয়ে তুলে তাদের সাথে পরামর্শ করে তোমার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। তোমার নিজের নেওয়া সিদ্ধান্তটি ভুল। পুরোপুরি ভুল।"

ক্যাপ্টেন ক্রব ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "আমি আমার সিদ্ধান্তটি নিয়ে তোমার সাথে কথা বলতে আগ্রহী নই।"

"তুমি অন্তত রায়ীনার সাথে কথা বল। মহাজাগতিক প্রাণীর বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে সে একজন বিশেষজ্ঞ। সে তোমাকে সাহায্য করতে পারে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব কোনো কথা না বলে য়ুহার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। য়ুহা আবার বলল, "সে যেহেতু জেগেই গেছে তখন তার সাথে কথা বলার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। আমি নিশ্চিত রায়ীনা তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব এবারে রায়ীনার দিকে তাকায়, জিব দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে শুকনো গলায় বলে, "য়ুহার কথা কি সত্যি? তুমি কি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবে?"

রায়ীনা বলল, "সবকিছু না জানলে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে এ কথাটি সত্যি আমি বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণা করি। একটা প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা কীভাবে বিকশিত হয়, সেই বুদ্ধিমত্তার কারণে একটা প্রাণী তার চারপাশের জগতের কাছে কী আশা করে সে সম্পর্কে আমার মৌলিক কিছু গবেষণা আছে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "আমি যদি তোমাকে সব তথ্য দিই তা হলে তুমি কি আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে? মহাজাগতিক প্রাণীটি কী চায় কেন চায় কীভাবে চায় সেটি ব্যাখ্যা করতে পারবে?"

রায়ীনা কয়েক মুহূর্ত কিছু একটা চিন্তা করে বলল, "খুব নিখুঁতভাবে পারব সেটা দাবি করি না। তবে সম্ভবত তোমাদের অনেকের চাইতে ভালো পারব।"

"ঠিক আছে।" ক্যাপ্টেন ক্রব মাথা নেড়ে বলল, "আমি তোমাকে সব তথ্য দিচ্ছি, দেখি তুমি আমাদের কী দিতে পার।"

রায়ীনা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্রব ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি হাসছ কেন?"

রায়ীনা হাসি থামিয়ে বলল, "খানিকক্ষণ আগে আমি যখন জেগে উঠতে শুরু করি আমার নিজের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমি অবান্তর কথা বলেছি, অসংলগ্ন ব্যবহার করেছি, অকারণে হেসেছি। সেগুলোর কোনো গুরুত্ব ছিল না, কিন্তু এখন আমার হাসিটুকু একেবারেই আমার নিজস্ব! আমি হাসছি তার সুনির্দিষ্ট একটা কারণ আছে।"

ক্যাপ্টেন ক্রব ভুরু কুঁচকে বলল, "কী কারণ?"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমি তোমার কমান্ডের একজন অনুগত সদস্য! তুমি আমাকে একটা আদেশ দেবে আর আমি, হুকুম শিরোধার্য বলে তোমার আদেশ মেনে চলব! তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ আমাদের বিন্দুমাত্র সম্মান না দেখিয়ে মহাকাশযানের দেয়ালে বেঁধে রাখা হয়েছে?"

ক্যাপ্টেন ক্রবকে এক মুহূর্তের জন্যে একটু বিচলিত মনে হল, সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "তুমি বিদ্রোহী দলের একজন সদস্য। আমাদের এই মহাকাশযানের নিরাপত্তার একটা বিষয় আছে। আমি তোমাকে ছেড়ে রাখতে পারি না।"

রায়ীনা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কিন্তু তুমি যদি আমার সাহায্য নিতে চাও তা হলে আগে আমার কিছু কথাবার্তা শুনতে হবে।"

"তোমার কথাবার্তাগুলো কী?"

"প্রথমেই আমাকে যেভাবে বেঁধে রেখেছ সেটা খুলে দিতে হবে। মানুষ যখন একটা পশুকে বাঁধে তখনো চেষ্টা করে রক্ত সঞ্চালনের বিষয়টা নিশ্চিত করতে, তোমরা সেটা কর নি। আমাকে যদি খুলে দাও তা হলে আমার পাশে বসে থাকা য়ুহা নামের এই বিচিত্র মানুষটির বাঁধনও খুলে দিতে হবে—আমি এর সম্পর্কে কিছুই জানি না। কিন্তু এর কথাগুলো এবং এর খাপছাড়া কাজগুলো আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। সত্যি জীবন সম্পর্কে এর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, সে কারণে তার জন্যে একটু মায়াও হয়েছে।" রায়ীনা একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "তারপর আমার দলের বাকি এগার জনকে জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাকে যেভাবে অসম্ভব বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জাগানো হয়েছে—সেভাবে নয়। স্বাভাবিকভাবে জাগাতে হবে যেন জেগে ওঠার সাথে সাথে তারা পুরোপুরি কার্যক্ষম থাকে। আমার মতো অপ্রকৃতিস্থ না থাকে।"

য়ুহা কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "আসলে দোষটা আমার—"

রায়ীনা য়ুহার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "তোমার কোনো দোষ নেই, তুমি যেটা করেছ সেটা অসাধারণ। তোমার কারণে আমি এই মহাকাশযানের ক্যাপ্টেনের কাছে আমার দাবিগুলোর কথা বলতে পারছি।"

ক্যাপ্টেন ক্রব শক্ত মুখ করে বলল, "তোমার কথা শেষ হয়েছে?"

"না। শেষ হয় নি।" রায়ীনা বলল, "আমার দলের সবাইকে জাগিয়ে তুললেই হবে না। তাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের সবার হাতে একটা করে অস্ত্র দিতে হবে যেন ইচ্ছে করলেই তোমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে না পার। শুধুমাত্র তা হলেই আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন ক্রব শীতল চোখে রায়ীনার দিকে তাকিয়ে রইল। সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই একবারও বিশ্বাস কর নি যে তোমার এই দাবিগুলো আমরা মেনে নেব।"

"স্বাভাবিক অবস্থা হলে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন অবস্থাটা খুব জটিল। হয়তো তোমার একটা সঠিক সিদ্ধান্তে এতগুলো মানুষের প্রাণ বেঁচে যাবে।"

"আমি দুঃখিত রায়ীনা। তোমার রক্ত সঞ্চালনের জন্যে হাতের বাঁধনটা একটু ঢিলে করে দেওয়া ছাড়া আমার পক্ষে তোমার আর কোনো দাবিই মেনে নেওয়া সম্ভব না।"

রায়ীনা আবার শব্দ করে হাসল। ক্যাপ্টেন ক্রব ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কেন হাসছ?"

"তোমার কথা শুনে। তোমার আশপাশে তোমার কমান্ডের এত জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত দেবার জন্যে একবারও তাদের সাথে কথা বললে না! আমি তোমার জায়গায় হলে তাদের সাথে একবার কথা বলতাম।"

ক্যাপ্টেন ক্রব ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "আমি কীভাবে সিদ্ধান্ত নেব সেটি আমার ব্যাপার। আমি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি বলেই আমি এই মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন।"

য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "তোমার সিদ্ধান্ত দেখে সেটা মনে হচ্ছে না ক্যাপ্টেন ক্রব।"

"আমার সিদ্ধান্তটি কী সেটা তোমরা এখনো জান না। আমি এখনো সেটা বলি নি।"

সবাই এবার উৎসুক দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন ক্রবের দিকে তাকাল। ক্যাপ্টেন ক্রব তার মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটা স্কাউটশিপে করে তোমাদের দুজনকে এই কালো কুৎসিত গ্রহটাতে পাঠাব। এই গ্রহতে মহাজাগতিক প্রাণীগুলো আছে, দেখা যাক তারা তোমাদের কীভাবে গ্রহণ করে।"

য়ুহা চমকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"আমি ঠিকই বলছি। দেখি তোমরা এই মহাজাগতিক প্রাণীকে পরাস্ত করে ফিরে আসতে পার কি না।"

য়ুহা কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "পরাস্ত করতে হবে? আমাদের?"

"সেটা তোমাদের ইচ্ছে।"

য়ুহা ভয়ার্ত চোখে রায়ীনার দিকে তাকাল। রায়ীনার চোখে-মুখে ভয়ের কোনো চিহ্ন নেই। সে য়ুহার দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে বলল, "আশা করি সঙ্গী হিসেবে তুমি ভালো হবে—তোমার সাথে অনেক সময় কাটাতে হবে আমার।"

"আসলে সঙ্গী হিসেবে আমি যাচ্ছেতাই!" য়ুহা মাথা নেড়ে বলল, "এত বয়স হয়েছে এখনো আমার কোনো ভালো বন্ধু নেই!"

৪

রায়ীনা বলল, "আমি স্কাউটশিপে ওঠার আগে আমার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই।"

ক্যাপ্টেন ক্রব বলল, "তুমি অর্থহীন কথা বোলো না। তোমার বন্ধুরা সবাই একটি করে জড়পদার্থ হয়ে আছে। একটা স্ক্রু ড্রাইভারের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া আর তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রায়ীনা বলল, "কে আমার বন্ধু কে স্ক্রু ড্রাইভার আমি সেটা নিয়ে তর্ক করতে চাই না। আমি বলছি যে আমি আমার এই বন্ধুদের সাথে আমার জীবনকে এক সুতায় বেঁধেছি। আমার কাছে আমি যেটুকু গুরুত্বপূর্ণ আমার এই বন্ধুরাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমি চলে যাবার আগে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই।"

ক্যাপ্টেন ক্রব বলল, "এটি অত্যন্ত ছেলেমানুষি, অর্থহীন একটা প্রক্রিয়া।"

রায়ীনা বলল, "আমি ছেলেমানুষ এবং এই মুহূর্তে আমার জীবনের কোনো অর্থ নেই। তবে তুমি নিশ্চিত থাক আমি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করব না। শুধু তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসব।"

ক্যাপ্টেন ক্রব বলল, "তারা সেটি জানতেও পারবে না।"

রায়ীনা বলল, "যদি কখনো তাদেরকে জাগিয়ে তোলা হয় তখন তারা জানতে পারবে।"

হিসান ক্যাপ্টেন ক্রবের কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "ক্যাপ্টেন ক্রব, মেয়েটি যখন চাইছে তাকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। আমরা কয়েকজন তাকে শীতলঘরে নিয়ে যাব তারপর ফিরিয়ে আনব। প্রতিমুহূর্ত তাকে চোখে চোখে রাখব।"

ক্যাপ্টেন ক্রব হিসানের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে। আমি তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি তুমি এই মেয়েটিকে শেষবারের মতো শীতলঘর থেকে ঘুরিয়ে আনো। সে তার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসুক।" ক্যাপ্টেন ক্রব এক মুহূর্ত থেমে যোগ করল, "মনে রেখো সে যদি অন্য কিছু করতে চায় তুমি তাকে সাথে সাথে গুলি করে হত্যা করতে পার।"

৫

AMARBOI.COM

স্কাউটশিপটা ছোট, দুজন পাশাপাশি বসতে পারে। নানা রকম যন্ত্রপাতিতে বোঝাই, যার কোনটা কী কাজ করে সে সম্পর্কে য়ুহার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। য়ুহাকে প্রথমবারের মতো বায়ু–নিরোধক একটা পোশাক পরিয়ে দিচ্ছিল মিটিয়া। সে নিঃশব্দে কাজ করছে, য়ুহা জিজ্ঞেস করল, "তুমি এবারে কিন্তু গুনগুন করে গান গাইছ না।"

"না। গাইছি না।" মিটিয়া একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আসলে সব সময় গান গাইতে ইচ্ছে করে না।"

"সেটা আমি বুঝতে পারছি।"

"যাই হোক, তুমি এই পোশাকটি কখনো ব্যবহার কর নি—"

য়ুহা বাধা দিয়ে বলল, "করেছি। আমাকে যখন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল তখন তারা এই পোশাকটা পরিয়েছিল।"

"সেটা ছিল খুবই কৃত্রিম একটা পরিবেশ—এখন পরিবেশটা খুব ভিন্ন।" মিটিয়া গম্ভীর গলায় বলল, "সব সময় মনে রাখতে হবে তোমার চলাফেরা হবে খুব সীমিত। এমনিতে তুমি যা যা করতে পার এই বিদঘুটে পোশাক পরে তুমি কিন্তু তার বিশেষ কিছুই করতে পারবে না।"

য়ুহা জিজ্ঞেস করল, "তা হলে আমাদের এই পোশাক পরাচ্ছ কেন?"

"তোমরা গ্রহটিতে যাচ্ছ সে জন্যে—"

"আমরা মোটেও গ্রহটিতে যাচ্ছি না—আমাদের জোর করে এই অন্ধকার গ্রহটাতে পাঠানো হচ্ছে।"

মিটিয়া একটু থতমত খেয়ে বলল, "আমি দুঃখিত য়ুহা।"

·দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই মিটিয়া।"

"যাই হোক, আমি যেটা বলছিলাম, এই পোশাকটা যদিও অত্যন্ত বিদঘুটে কিন্তু এটি একটি অসাধারণ পোশাক। একজন মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে যা যা দরকার তার সবকিছু এর ভেতরে আছে। একবার চার্জ করিয়ে নিলে এটা একজন মানুষকে পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখতে পারে! এর ভেতরে যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে, অস্ত্র আছে—"

"অস্ত্র আছে?" য়ুহা চমকে উঠে বলল, "আমাদের হাতে তোমরা অস্ত্র তুলে দিচ্ছ?"

"হ্যাঁ, দিচ্ছি তার কারণ তোমরা এখন সেটা ব্যবহার করতে পারবে না। নিচের অন্ধকার গ্রহটাতে পৌঁছানোর পর সেটাকে চালু করা হবে।"

"নিচের গ্রহ সম্পর্কে তুমি কিছু জান মিটিয়া?"

"না। আমি বিশেষ কিছু জানি না। তোমাকে এই মুহূর্তে বলা হয়তো ঠিক হবে না কিন্তু গ্রহটি অত্যন্ত কুৎসিত। এর মাঝে এক ধরনের অশুভ ব্যাপার লুকিয়ে আছে।"

য়ুহা কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে রইল।

মহাকাশযান থেকে স্কাউটশিপটা উড়ে গেল কোনোরকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই। য়ুহা মাথা ঘুরিয়ে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে মহাকাশযানটিকে দেখার চেষ্টা করল, ঠিক কী কারণ জানা নেই সেটিকে একটা বিধ্বস্ত জাহাজের মতো দেখাচ্ছে। সে আর কখনো এখানে ফিরে আসতে পারবে কি না জানে না। য়ুহা মাথা ঘুরিয়ে রায়ীনার দিকে তাকাল, "রায়ীনা।"

"বল।"

"তোমার কী মনে হয়? এই গ্রহটার প্রাণীগুলো কী রকম?"

"আমার এখনো কোনো ধারণা নেই। তবে প্রাণীগুলো বুদ্ধিমান সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

"তারা কী আমাদের থেকে বুদ্ধিমান?"

রায়ীনা শব্দ করে হেসে বলল, "আমরা বুদ্ধিমান তোমাকে কে বলেছে? আমরা যদি বুদ্ধিমান হতাম তা হলে কি নিজেরা নিজেরা যুদ্ধ করি? নিজেদের গ্রহটাকে ধ্বংস করে মহাজগতের এখানে-সেখানে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি? মানুষ হয়ে অন্য মানুষকে হত্যা করি? জোর করে অপছন্দের মানুষদের কালো কুৎসিত অন্ধকার একটা গ্রহে ঠেলে পাঠিয়ে দিই?"

"তার পরও আমরা তো একটা সভ্যতা গড়ে তুলেছি—"

"তুলি নি—এটাকে সভ্যতা বলে না।"

য়ুহা সভ্যতার সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ করে তার মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছে, হালকা এক ধরনের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে কোথা থেকে। সে রায়ীনার দিকে তাকিয়ে ভয় পাওয়া গলায় ডাকল, "রায়ীনা—"

"হ্যাঁ।" রায়ীনা মাথা নাড়ে, "আমাদের অচেতন করে দিচ্ছে।"

"কে অচেতন করছে? কেন করছে?"

"ক্যাপ্টেন ক্রব নিশ্চিত করতে চাইছে যেন আমরা এই স্কাউটশিপটা ব্যবহার করে অন্য কিছু করতে না পারি।" রায়ীনা ঘুমঘুম গলায় বলল, "য়ুহা, আমি জানি না এই স্কাউটশিপটা আমাদের ঠিকভাবে গ্রহটাতে পৌঁছাতে পারবে কি না। যদি না পারে তা হলে বিদায়! তোমার সাথে পরিচয় হওয়াটা আমার জন্যে চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা ছিল।"

য়ুহা কিছু একটা বলতে চাইছিল, কিন্তু কিছু বলার আগেই সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকার গ্রহ

১

য়ুহা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল সে একটি গহিন বনে হারিয়ে গেছে, যেদিকেই যায় সে দেখতে পায় শুধু গাছ আর গাছ। কৃত্রিম গাছ নয়, সত্যিকারের গাছ। সেই গাছের ডাল, গাছের পাতায় তার শরীর আটকে যাচ্ছে, লতাগুলোতে সে জড়িয়ে যাচ্ছে, তখন শুনতে পেল বহুদূর থেকে কেউ যেন তাকে ডাকছে, "য়ুহা।"

য়ুহা এদিকে সেদিকে তাকাল, কাউকে দেখতে পেল না। শুধু মনে হল কণ্ঠস্বরটি বুঝি আরো কাছে এগিয়ে এসেছে—আবার ডাকছে, "য়ুহা।" এ রকম সময় সে ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল, তার ওপর ঝুঁকে পড়ে আছে রায়ীনা, তাকে ধাক্কা দিতে দিতে সে ডাকছে।

য়ুহা উঠে বসে এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "আমরা কোথায়?"

"আমরা গ্রহটাতে নেমে এসেছি।"

"আমরা তো বেঁচে আছি তাই না?"

"মনে হচ্ছে বেঁচে আছি। তবে এটাকে তুমি যদি বেঁচে থাকা না বলতে চাও তা হলে অন্য ব্যাপার।"

য়ুহা স্কাউটশিপের গোল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "সর্বনাশ, কী বিদঘুটে গ্রহ!"

রায়ীনা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ এটা খুব বিদঘুটে একটা গ্রহ।"

য়ুহা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি কখনো চিন্তা করি নি, আমার জীবনের শেষ সময়টা কাটাব এ রকম একটা বিদঘুটে অন্ধকার গ্রহে।"

"তোমার জীবনের শেষ সময়টা কোথায় কাটানোর কথা ছিল?"

"আমি ভেবেছিলাম আমার নিজের পরিচিত মানুষের সাথে। সাধারণ মানুষ। সাদামাটা মানুষ।"

রায়ীনা মাথা ঘুরিয়ে য়ুহার দিকে তাকিয়ে বলল, "বিষয়টা নিয়ে আমারও এক ধরনের কৌতূহল! তুমি তো সামরিক কমান্ডের কেউ নও—তুমি কেমন করে এই মহাকাশযানে আছ?"

"আমি একজন কবি! আমি একাডেমির কাছে আবেদন করেছিলাম যে আমি মহাকাশ ভ্রমণে যেতে চাই। একাডেমি এদের সাথে আমাকে যেতে দিয়েছে।"

রায়ীনা হাসার চেষ্টা করে বলল, "তুমি এখন নিশ্চয়ই খুব আফসোস করছ যে কেন এসেছিলে?"

"না, আসলে করছি না। সবকিছুই তো অভিজ্ঞতা, এটাও এক ধরনের অভিজ্ঞতা। একটা জীবন তো নানা রকম অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রায়ীনা অন্যমনস্কভাবে বলল, "তা ঠিক।"

য়ুহা বলল, "এখান থেকে বের হয়ে যদি আবার নিজের পরিচিত মানুষদের কাছে ফিরে যেতে পারতাম, তা হলে অভিজ্ঞতার গুরুত্বটুকু আরো অনেক বাড়ত।"

রায়ীনা আবার অন্যমনস্কভাবে বলল, "তা ঠিক।"

য়ুহা জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কী করব?"

রায়ীনা বলল, "আমি প্রথম ছত্রিশ ঘণ্টা বিশেষ কিছু করতে চাই না।"

য়ুহা একটু অবাক হয়ে বলল, "প্রথম ছত্রিশ ঘণ্টা?"

"হ্যাঁ। ছত্রিশ ঘণ্টা পর আমি মহাকাশযান থেকে আরো কয়েকটি স্কাউটশিপ আশা করছি। আমাদের সাহায্য করার জন্যে তখন আরো কিছু মানুষ আসবে। যন্ত্রপাতি আসবে! অস্ত্র আসবে! তখন যদি কিছু করা যায় করব।"

য়ুহা হতচকিত হয়ে বলল, "আমি কিছু বুঝতে পারছি না। ছত্রিশ ঘণ্টা পর মহাকাশযান থেকে স্কাউটশিপ কেন আসবে?"

"তার কারণ ছত্রিশ ঘণ্টা পর আমার দলের লোকজন মহাকাশযানটা দখল করে নেবে। চব্বিশ ঘণ্টার মাঝেই সেটা ঘটে যাবার কথা, আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আরো বারো ঘণ্টা হাতে রাখছি। আর তারা মহাকাশযানটা দখল করার পর আমাকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে আসবে।"

য়ুহা বিস্ফারিত চোখে রায়ীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার দলের লোকেরা কেমন করে মহাকাশযানটা দখল করবে?"

"তোমার মনে আছে এই স্কাউটশিপ রওনা দেবার আগে আমি আমাদের দলের লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"আসলে আমি মোটেও বিদায় নিতে যাই নি। ক্যাপ্টেন ক্রব ঠিকই বলেছিল, কাউকে যখন হিমঘরে শীতল করে রাখা হয় তখন তার ভেতরে আর একটা স্ক্রু ড্রাইভারের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আমি গিয়েছিলাম আমাদের একজনের লিকুইড হিলিয়াম সরবরাহে ছোট একটু ফুটো করতে—খুব ছোট, খালি চোখে কিছুতেই ধরা পড়বে না কিন্তু সময় দেওয়া হলে লিকুইড হিলিয়ামটা বের হয়ে যাবে! সবাই যখন ভেবেছে আমি গভীর আবেগে বিদায় নিয়ে আসছি, আসলে তখন আমার জুতোর গোড়ালিতে লাগানো টাইটেনিয়ামের সূক্ষ্ম পিনটি দিয়ে টিউবে একটা ছোট ফুটো করেছি! ঘণ্টা তিনেক পর যখন শরীরটাকে ঠাণ্ডা রাখতে পারবে না তখন তাকে জাগিয়ে তোলা হবে! তুমি আমাকে যেভাবে জাগিয়েছিলে।"

"কী আশ্চর্য!"

"না, মোটেও আশ্চর্য নয়। এটা হচ্ছে খুব বাস্তব একটা কাজ! যাই হোক আমি যার ক্যাপসুলে এই ঘটনা ঘটিয়ে রেখে এসেছি তার নাম হচ্ছে রিহি। রিহি হচ্ছে আমাদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। আমাদের ধারণা, তার নিউরনের সিনাপ্সের সংখ্যা আমাদের থেকে দশ গুণ বেশি! সে নিশ্চয়ই জানবে তখন কী করতে হবে। অন্য সবাইকে তখন জাগিয়ে তুলবে। পরের অংশ সহজ—মহাকাশযানটা দখল করে নেওয়া! ছোটখাটো যুদ্ধ হতে পারে কিন্তু সেই যুদ্ধে কেউ তাদের হারাতে পারবে না। তাদেরকে হারানোর মতো সামরিক বাহিনী এখনো জন্মায় নি।"

"তুমি সত্যি বলছ?"

www.amarboi.com

"হ্যাঁ। আমি সত্যি বলছি। তাই আমি পরের ছত্রিশ ঘণ্টা বিশেষ কোনো অ্যাডভেঞ্চার না করে বসে থাকতে চাই। যতটুকু সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করতে চাই। যখন সময় হবে তখন যেন সেটা ব্যবহার করতে পারি।"

য়ুহা বিস্ফারিত চোখে বলল, "রায়ীনা, আমি যতই তোমাকে দেখছি ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি!"

রায়ীনা হেসে বলল, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি তোমার জীবনে খুব বেশি মানুষ দেখ নি! তাই অল্পতেই মুগ্ধ হয়ে যাও!"

"না, আমি অল্পতে মুগ্ধ হই না। তুমি আসলেই অসাধারণ।"

"ঠিক আছে, আমি অসাধারণ! সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করব। এখন ঠিক করা যাক ছত্রিশ ঘণ্টা সময় কীভাবে কাটানো যায়।"

য়ুহা এবং রায়ীনা কিছুক্ষণের মাঝেই আবিষ্কার করল বিশেষ কিছু না করে ছত্রিশ ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেওয়া খুব সহজ নয়। স্কাউটশিপে যে যন্ত্রপাতিগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করে তারা গ্রহটা সম্পর্কে তথ্য বের করার চেষ্টা করছিল কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই সেই কাজটা শেষ হয়ে গেল। তারা আবিষ্কার করল গ্রহটা মোটামুটি বিচিত্র, বায়ুমণ্ডল বলতে গেলে নেই, তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি। গ্রহটার পৃষ্ঠে আলো বিকিরণকারী এক ধরনের যৌগ আছে, সেখান থেকে নিষ্প্রভ এক ধরনের আলো বের হয়, পুরো গ্রহটা সেজন্যে কখনো পুরোপুরি অন্ধকার নয় কিন্তু কখনোই পরিষ্কার করে কিছু দেখা যায় না। চারপাশে কেমন যেন মন খারাপ করা বিষণ্ণ এক ধরনের পরিবেশ। এটা মূলত সিলিকনের গ্রহ, গ্রহটার ভর খুব কম, তাই বায়ুমণ্ডল আটকে রাখতে পারে নি। ছোট গ্রহ বলে পৃষ্ঠদেশ একেবারে অসম। জৈবিক প্রাণীর রুটিন বাঁধা পরীক্ষাগুলোতে কিছু ধরা পড়ে নি কিন্তু এই গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে তার একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। গ্রহটির পৃষ্ঠ থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর একটা সিগন্যাল মহাকাশে পাঠানো হয়—এ ধরনের একটা সিগন্যাল পাঠাতে হলে তার জন্যে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির একটা নির্দিষ্ট ধরনের উন্নতি হতে হয়—মানুষের সভ্যতার সমকক্ষ সভ্যতা ছাড়া এটি সম্ভব নয়।

সিগন্যালটি নির্দিষ্ট একটা সময় পরপর পাঠানো হয়, মোটামুটি সহজেই কোথা থেকে সিগন্যালটা পাঠানো হচ্ছে জায়গাটুকু নির্দিষ্ট করা গেছে। এই গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে হলে মনে হয় এই জায়গাটা দিয়েই শুরু করতে হবে। তবে নিজে থেকে সেখানে হাজির হওয়াটা খুব বিপজ্জনক একটি কাজ হয়ে যেতে পারে।

প্রথম কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই য়ুহা এবং রায়ীনার ভেতরে এক ধরনের ক্লান্তি এসে ভর করল, কোনো কিছু না করার এক ধরনের ক্লান্তি আছে, সেই ক্লান্তি খুব সহজেই একজনকে কাবু করে ফেলে। য়ুহা বলল, "এই ছোট স্কাউটশিপে বসে থাকতে অসহ্য লাগছে! আমি কি স্কাউটশিপের বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসতে পারি? অপরিচিত একটা গ্রহে পা দিতে কেমন লাগে সেটা একটু দেখতে চাই! কখনো এ রকম একটা অভিজ্ঞতা হবে আমি ভাবি নি।"

রায়ীনা বলল, "আমারও অসহ্য লাগছে, কিন্তু একসাথে দুজন বের হওয়া ঠিক হবে না। তুমি বের হও আমি তোমার ওপর চোখ রাখি, তারপর আমি বের হব, তখন তুমি আমার ওপর চোখ রাখবে।"

য়ুহা তখন খুব সাবধানে স্কাউটশিপ থেকে বের হয়ে এল। তার শরীরে তাপ নিরোধক পোশাক, তারপরও বাইরের শীতল গ্রহটিতে তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। য়ুহা উপরের দিকে তাকাল, সেখানে কুচকুচে কালো আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। চারদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবড়োখেবড়ো পাথর, শুষ্ক এবং বিবর্ণ। য়ুহা স্কাউটশিপটি ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল এবং হঠাৎ তার ভেতরে এক ধরনের বিচিত্র অনুভূতি হতে থাকে, তার মনে হয় কেউ যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। য়ুহা মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল, আবছা অন্ধকারে উঁচু-নিচু পাথর, তার ভেতর থেকে সত্যিই কি কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে?

"য়ুহা।"

"বল।"

"আমার মনে হচ্ছে তোমার হৃৎস্পন্দন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। কিছু কি হয়েছে?"

"না। কিছু হয় নি।"

"তুমি কি কোনো কারণে ভয় পেয়েছ?"

"না ভয় পাই নি। তবে—"

"তবে কী?"

"আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কেউ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে।"

"মানুষের মন খুব বিচিত্র।" রায়ীনা হাসির মতো শব্দ করে বলে, "সত্যি সত্যি কেউ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকলে আমি একটু চিন্তিত হতাম কিন্তু এটা যদি তোমার একটা কল্পনা হয়ে থাকে তা হলে আমি ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দেব না।"

য়ুহা মাথা ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল, চারপাশে শুষ্ক বিবর্ণ পাথর, কোথাও কিছু নেই। য়ুহা জোর করে মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দেয়। মহাকাশের এই বিশেষ পোশাকে অভ্যস্ত হতে সময় নেবে, য়ুহা সাবধানে আর কয়েক পা অগ্রসর হয়। হাঁটা বলতে যা বোঝায় এটা মোটেও সে রকম নয়—গ্রহটার মাধ্যাকর্ষণ এত কম যে পায়ের ধাক্কাতেই অনেকটুকু উপরে উঠে যায়, মনে হয় সে বুঝি হেঁটে যাচ্ছে না, লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। শরীরের ভরকেন্দ্রটিও ঠিক জায়গায় নেই, পেছনে নানা ধরনের বোঝা, তাই একটু সামনে ঝুঁকে হাঁটতে হচ্ছে। এই পোশাকের সাথে একটা জেট প্যাক লাগানো আছে, সুইচ টিপেই সে উপরে উঠে যেতে পারবে, সামনে-পেছনে যেতে পারবে। য়ুহা এই মুহূর্তে সেটা অবিশ্যি পরীক্ষা করে দেখার সাহস পেল না। এই পোশাকের সাথে একটা অস্ত্রও থাকার কথা। অস্ত্রটা কোথায় আছে কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, সেটাও সে বুঝতে পারছে না। মনে মনে আশা করে আছে তাকে কখনোই অস্ত্রটা হাতে তুলে নিতে হবে না। পৃথিবীতে একটা জিনিসকেই সে অপছন্দ করে, সেটা হচ্ছে অস্ত্র।

য়ুহা অন্যমনস্কভাবে আরো একটু সামনে এগিয়ে যেতেই রায়ীনার একটা সতর্কবাণী শুনতে পেল, "য়ুহা, তুমি আর সামনে যেয়ো না।"

"কেন?"

"কোনো কারণ নেই। স্বাভাবিক নিরাপত্তার নিয়ম হচ্ছে অচেনা জায়গায় বেশি দূর না যাওয়া।"

য়ুহা বলল, "ঠিক আছে। আমি ফিরে আসছি।"

য়ুহা ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করে আবিষ্কার করল মহাকাশ অভিযানের এই বেঢপ পোশাক পরে খুব সহজ কাজগুলোও মোটেও সহজে করা যায় না। কোনোভাবে তাল সামলানোর চেষ্টা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ করে তার মনে হল কিছু একটা যেন সরে গেছে। য়ুহা থমকে দাঁড়িয়ে মাথা ঘুরে তাকাল, সাথে সাথে সে রায়ীনার গলার স্বর শুনতে পায়, "কী হয়েছে?"

"না কিছু না। তবে—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তবে কী?"

"আমার মনের ভুলও হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হল কী একটা যেন সরে গেছে।"

রায়ীনা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "তুমি বাইরে আর অপেক্ষা না করে স্কাউটশিপে চলে এস।" রায়ীনা যদিও গলার স্বরটি শান্ত রাখার চেষ্টা করেছে তার পরেও সেখানে উদ্বেগটুকু লুকিয়ে রাখতে পারল না।

"আসছি।" য়ুহা একটু এগিয়ে যেতেই দেখল অন্ধকার গ্রহের পাথরের আড়াল থেকে কিছু একটা দ্রুত সরে যাচ্ছে। সে আতঙ্কিতভাবে অন্য পাশে তাকাল, তার স্পষ্ট মনে হয় চারদিক থেকে কিছু একটা তাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।

"রায়ীনা।"

"কী হয়েছে?"

"আমার চারদিকে কিছু একটা এসেছে। মনে হয় কিছু একটা করার চেষ্টা করছে।"

"তুমি তোমার মাথা ঠাণ্ডা রাখ য়ুহা। দৌড়ানোর চেষ্টা করবে না। ঠিক যেভাবে আসছিলে সেভাবে আসতে থাক। কোনোরকম বিপদ হলে আমি আছি।"

"ঠিক আছে।"

য়ুহা স্কাউটশিপটার দিকে এগুতে থাকে এবং হঠাৎ করে তার হেডফোনে কর্কশ একটা ধাতব শব্দ শুনতে পায়। অর্থহীন একটা শব্দ কিন্তু শব্দ সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। য়ুহার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে—মহাকাশের বেঢপ পোশাকের ভেতর সে কুলকুল করে ঘামতে থাকে। য়ুহা আরো দুই পা এগিয়ে গেল এবং হঠাৎ করে মনে হল কোনো একটা প্রাণী খুব কাছ দিয়ে ছুটে গেছে, আবছা অন্ধকারে তার শরীরের খুঁটিনাটি কিছু দেখা গেল না। শুধু তার অস্তিত্বটা অনুভব করা গেল।

"ভয় পেয়ো না য়ুহা। তুমি এগিয়ে আসতে থাক"—রায়ীনা তাকে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করল, "তোমার কিছু হলে আমি আছি।"

AMARBOI.COM

"ঠিক আছে রায়ীনা।"

য়ুহা আরো দুই পা এগিয়ে গেল, বড় কিছু পাথরের আড়ালে এখন স্কাউটশিপটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে গেলেই সেখানে পৌঁছে যাবে। নিজের অজান্তেই য়ুহার পদক্ষেপ হঠাৎ দ্রুততর হয়ে ওঠে।

ঠিক এ রকম সময় বড় একটা পাথরের আড়াল থেকে একটা প্রাণী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার ধাক্কায় সে ছিটকে পড়ে যায়। সাথে সাথে নানা আকারের আরো কিছু প্রাণী তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হুটোপুটি খেতে থাকে। য়ুহা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে হাত দিয়ে প্রাণীগুলো নিজের ওপর থেকে সরানোর চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, প্রাণীগুলো তাকে জাপটে ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে! য়ুহা হাত দিয়ে প্রাণীগুলোকে আঘাত করার চেষ্টা করল, নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল কিন্তু কোনো লাভ হল না।

হেডফোনে রায়ীনার গলার স্বর শুনতে পেল য়ুহা, "আসছি। আমি আসছি!"

য়ুহাকে যখন টেনেহিঁচড়ে বেশ কিছু দূর নিয়ে এসেছে তখন রায়ীনা দৌড়ে তার কাছে পৌঁছাল। হাতের অস্ত্রটি দিয়ে অনির্দিষ্টভাবে গুলি করতে করতে সে ছুটে এসেছে। পেছন থেকে একটা প্রাণীকে টেনে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, অস্ত্রটা দিয়ে সেটাকে আঘাত করে, তার পরেও সরাতে না পেরে সে আবার গুলি করল।

গুলির আঘাতে প্রাণীটা ছিটকে পড়ে গেল, কর্কশ এক ধরনের শব্দ করতে করতে সেটি উঠে দাঁড়ায়, তারপর উবু হয়ে উঠে সেটি হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রায়ীনা য়ুহাকে টেনে নিয়ে যাওয়া বিচিত্র প্রাণীগুলোর দিকে অস্ত্রটা তাক করে গুলি করল এবং তখন হঠাৎ প্রাণীগুলো য়ুহাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে শুরু করল।

প্রাণীগুলো পালিয়ে যাবার পর য়ুহা উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ রায়ীনা। তুমি না এলে সর্বনাশ হয়ে যেত।"

"তুমি ঠিক আছ তো?"

"হ্যাঁ। ঠিক আছি।"

"তা হলে চল, স্কাউটশিপে।"

"এক সেকেন্ড দাঁড়াও—" য়ুহা হঠাৎ নিচু হয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করল, ভয় পাওয়া গলায় বলল, "এই দেখ কী পড়ে আছে।"

রায়ীনা এগিয়ে যায়, "কী পড়ে আছে?"

"একটা হাত। তোমার গুলিতে প্রাণীটার শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে।"

রায়ীনা নিচু হয়ে হাতটা তুলে নেয়, সেটা তখনো নড়ছে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হাতটা মানুষের হাত।

২

স্কাউটশিপের ভেতরে ছোট টেবিলটার ওপর মানুষের একটা হাত, সেটি শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে আছে, কিন্তু তারপরেও বুঝতে এতটুকু সমস্যা হয় না যে হাতটি মানুষের। রায়ীনার গুলিতে হাতটি শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু যে ব্যাপারটা তারা বুঝতে পারছে না সেটি হচ্ছে যে হাতটি এখনো জীবন্ত। তার আঙুলগুলো নড়ছে এবং মাঝে মাঝেই সেটা উল্টে যাওয়ার চেষ্টা করে। যতবার এটা উপুড় হয়েছে ততবার সেটা তার আঙুলগুলো দিয়ে খামচে খামচে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। শুধু তাই নয়, ধরে ফেলার মতো কোনো কিছু পেলে হাতটা সেটা শক্ত করে ধরে ফেলে এবং তখন সেটাকে ছুটিয়ে নিতে যথেষ্ট কষ্ট হয়। য়ুহা এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে এই কাটা হাতটির দিকে তাকিয়ে থাকে, আঙুল দিয়ে খামচে খামচে সেটা টেবিলের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, য়ুহা হাত দিয়ে ঠেলে সেটাকে টেবিলের মাঝামাঝি এনে বলল, "আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না একটা হাত কেমন করে জীবন্ত থাকে।"

রায়ীনা কোনো একটা ভাবনায় ডুবে ছিল, এবারে য়ুহার দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা হাত আলাদাভাবে জীবন্ত থাকে না।"

"এই যে থাকছে। নাড়াচাড়া করছে।"

রায়ীনা হাসার চেষ্টা করে বলল, "নাড়াচাড়া করে মানে জীবন্ত থাকা নয়! অনেক রকেট, মহাকাশযান, বাইভার্বাল নাড়াচাড়া করে, তার মানে এই নয় যে সেগুলো জীবন্ত।"

"তুমি বলছ এটা জীবন্ত না?"

"আমার তা-ই ধারণা।"

"তা হলে এটা কেমন করে নড়ছে?"

"এটাকে নাড়ানো হচ্ছে।"

"কে নাড়াচ্ছে? কীভাবে নাড়াচ্ছে?"

রায়ীনা মুখে হাসি টেনে বলল, "এতক্ষণ পর তুমি একটা সত্যিকারের প্রশ্ন করেছ। কে নাড়াচ্ছে এবং কীভাবে নাড়াচ্ছে। আমাদের সেটা খুঁজে বের করতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তার মানে তুমি বলতে চাইছ—"

রায়ীনা মাথা নাড়ল, "আমি আসলে এখনো কিছুই বলতে চাইছি না। তবে তুমি যদি খুব বিরক্ত না হও তা হলে খানিকক্ষণ জোরে জোরে চিন্তা করতে পারি।"

"কর। জোরে জোরে চিন্তা কর, তোমার চিন্তাটা শুনি।"

"তোমাকে যখন প্রাণীগুলো আক্রমণ করল তখন সেখানে আবছা অন্ধকারে পরিষ্কার করে কিছু দেখা যাচ্ছিল না, তার পরেও মনে হচ্ছিল প্রাণীগুলোর হাত-পা আছে, শরীর আছে, মাথা আছে। মাথায় নাক মুখ চোখ আছে কি না আমরা এখনো জানি না। অন্ধকারের মাঝে গুলি করে শরীরের একটা অংশ আমরা আলাদা করে ফেলেছি—সেটা হচ্ছে একটা হাত। কাজেই মোটামুটি নিশ্চিত যে প্রাণীগুলো আসলে মানুষের আকৃতির।"

"তার মানে তুমি বলছ এখানে মহাজাগতিক প্রাণী নেই, আছে মানুষ—"

রায়ীনা বলল, "আমি যখন তোমার সাথে কথা বলব তখন তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারবে। এখন আমি চিন্তা করছি। চিন্তার ভেতরে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না!"

"ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কর। আমি আর প্রশ্ন করব না।"

"হাতটা যেহেতু মানুষের, তার মানে শরীরটাও মানুষের। কিন্তু আমরা জানি মানুষের শরীর অত্যন্ত কোমল একটা জিনিস। একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, নির্দিষ্ট চাপ এবং সুনির্দিষ্ট পরিবেশ না থাকলে সেটা বেঁচে থাকতে পারে না। তাকে কিছুক্ষণ পরপর খেতে হয়। তাকে প্রতি মুহূর্তে ফুসফুসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন নিতে হয়, সেটা রক্তের মাধ্যমে শরীরে ছড়িয়ে দিতে হয়—এ রকম নানা ধরনের ঝামেলা আছে।"

রায়ীনা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "আমরা জানি এই গ্রহটির তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি, বায়ুমণ্ডল বলতে গেলে নেই এবং যেটুকু আছে সেখানে অক্সিজেনের কোনো চিহ্ন নেই। আমাদের দুজনকে দেখলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই গ্রহটিতে বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের কী বেঢপ একটা পোশাক পরে থাকতে হচ্ছে কিন্তু এই মানুষগুলোর কোনো পোশাক নেই—বাতাসবিহীন, অক্সিজেনবিহীন শীতল একটা গ্রহে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সেটা হতে পারে শুধু একটি উপায়ে—"

"কী উপায়ে?" জিজ্ঞেস করতে গিয়ে যুহা থেমে গেল, রায়ীনার চিন্তার প্রক্রিয়াটাতে সে বাধা দিতে চায় না।

রায়ীনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সেটা হতে পারে যদি আসলে মানুষগুলো হয় মৃত!"

"মৃত?" মাঝখানে কথা বলার কথা নয় জেনেও যুহা নিজেকে সামলাতে পারল না।

"হ্যাঁ। মৃত। কিন্তু মৃত মানুষ হাঁটে না, চলাফেরা করে না, কাউকে আক্রমণ করে তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে না। কাজেই অনুমান করছি এই মৃত মানুষগুলোকে অন্য কেউ চালাচ্ছে। তার স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই কাটা হাতটা। দেখা যাচ্ছে এটা এখনো নিজে নিজে চলছে।"

"আমি অনুমান করছি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে এবং আমার অনুমান সত্যি কি না সেটা খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। যদি এই হাতটা বৈদ্যুতিক পরিবাহী কিছু দিয়ে আমরা ঢেকে দিই তা হলে এর মাঝে বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ পৌঁছাতে পারবে না। তখন নাড়াচাড়াও করতে পারবে না।"

রায়ীনা স্কাউটশিপের জানালার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই জানালায় পাতলা মাইলারের ওপর বৈদ্যুতিক পরিবাহী স্বর্ণের একটা সূক্ষ্ম স্তর আছে। আমার অনুমান সত্যি হলে আমরা এটা দিয়ে হাতটা যদি মুড়ে দিই তা হলে হাতটা নাড়াচাড়া করা বন্ধ করে দেবে।"

য়ুহা চোখ বড় বড় করে বলল, "তোমার জোরে জোরে চিন্তা করা শেষ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আমরা এই মাইলার আর স্বর্ণের আবরণ দিয়ে হাতটাকে মুড়ে দেব?"

"হ্যাঁ। অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল দিয়েও করা যেত কিন্তু এই স্কাউটশিপে সেটা খুঁজে পাব বলে মনে হয় না।"

য়ুহা জানালা থেকে মাইলারের পর্দাটুকু খুলে আনে, সেটা দিয়ে হাতটাকে মুড়ে দিতেই হঠাৎ করে কাটা হাতটা স্থির হয়ে গেল। য়ুহা চোখ বড় বড় করে বলল, "তোমার অনুমান সত্যি, রায়ীনা! তোমাকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি।"

রায়ীনা নিচু গলায় বলল, "বোঝা যাচ্ছে তুমি মুগ্ধ হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাক! তোমাকে মুগ্ধ করা খুব কঠিন নয়। যাই হোক, আমাদের পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ করার জন্যে কাটা হাতটার ওপর থেকে স্বর্ণের আবরণ দেওয়া মাইলারের পর্দাটা আবার খুলে ফেলতে হবে, তা হলে কাটা হাতটা আবার নাড়াচাড়া করতে শুরু করবে।"

য়ুহা বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। দেখি তো।" সে বেশ উৎসাহ নিয়ে মাইলারের পর্দাটা খুলে ফেলল এবং প্রায় সাথে সাথেই হাতটা নড়তে শুরু করে। য়ুহা মাথা নাড়ল, বলল, "রায়ীনা তুমি সত্যিই অসাধারণ! এখন পর্যন্ত তোমার প্রত্যেকটা কথা সত্যি বের হয়েছে।"

"কথাগুলো সহজ ছিল সে জন্যে!"

"এবারে তুমি বল এই মহাকাশের প্রাণীটা সম্পর্কে। যে প্রাণীটা এই মৃত মানুষগুলোকে নাড়াচাড়া করাচ্ছে সেটা কী রকম? তাদের কি অক্টোপাসের মতো শুঁড় আছে? অনেকগুলো চোখ? মাকড়সার মতো অনেকগুলো পা? কী খায়?"

রায়ীনা মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু। আমার কী মনে হয় জানো?"

"কী?"

"আসলে এখানে কোনো মহাকাশের প্রাণী নেই!"

য়ুহা চোখ কপালে তুলে বলল, "মহাকাশের প্রাণী নেই?"

"না। এখানে হয়তো মানুষের একটা বসতি ছিল, কিংবা কোনো একটা মহাকাশযান বিধ্বস্ত হয়ে মহাকাশচারীরা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সাথে ছিল কোনো ধরনের কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক, সেই কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক ধীরে ধীরে সবকিছু দখল করে নিয়েছে। সেটা ধীরে ধীরে আরো ক্ষমতাশালী হয়েছে, মানুষগুলো যখন মারা গেছে তখন তাদের মৃতদেহ ব্যবহার করতে শুরু করেছে।"

য়ুহা অবাক হয়ে বলল, "তুমি সত্যিই তা-ই মনে কর?"

"হ্যাঁ। আমার তা-ই ধারণা।"

"কেন? তোমার এ রকম ধারণা কেন হল?"

"দেখছ না এই প্রাণীগুলোর প্রযুক্তি ঠিক আমাদের মতন। যদি একেবারে ভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমান প্রাণী হত তা হলে তাদের প্রযুক্তি হত একেবারে অন্য রকম। হয়তো বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে যোগাযোগ না করে যোগাযোগ করত নিউট্রিনো বীম দিয়ে। হয়তো মানুষের দেহ ব্যবহার না করে অন্য কিছু ব্যবহার করত।"

য়ুহা মাথা নেড়ে বলল, "তোমার কথায় এক ধরনের যুক্তি আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রায়ীনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "শুধু যুক্তি থাকলেই হয় না। আমি দেখেছি জীবনে যেসব ব্যাপার ঘটে তার বেশিরভাগেরই কোনো যুক্তি নেই!"

"এ রকম কেন বলছ?"

"আমার দিকে দেখ? আমার কি একটা গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করে এখন এই গ্রহে আটকা পড়ার কথা ছিল? আমার জন্ম হয়েছিল একটা শান্তশিষ্ট মেয়ে হিসেবে। আমি বড় হয়েছি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবেশে, শিল্প-সাহিত্য নিয়ে। অথচ এখন আমার বন্ধু মহাজগতের বড় বড় গেরিলারা। আমি যুদ্ধ করতে পারি, আমার প্রাণের বন্ধু মারা গেলেও আমি চোখ থেকে এক ফোঁটা পানি ফেলি না। আমার বুকের ভেতরটা এখন পাথরের মতো কঠিন।"

যুহা আস্তে আস্তে বলল, "আসলে মানবজাতির পুরো ইতিহাসটাই হচ্ছে এ রকম। মানুষের একটা গোষ্ঠী সবকিছু নিয়ে নিচ্ছে—অন্য গোষ্ঠী তার প্রতিবাদ করছে। সেটা নিয়ে বিরোধ। সংঘর্ষ। যুদ্ধ। যে জিনিসটি খুব সহজে মেনে নেওয়া যায় সেটি কেউ মানছে না—একজনের সাথে আরেকজন শুধু শুধু যুদ্ধ করছে।"

রায়ীনা বিষণ্ন গলায় বলল, "মাঝে মাঝে আমি এক ধরনের ক্লান্তি অনুভব করি। মনে হয় অস্ত্রটা ভাঁজ করে রেখে একটা ল্যাবরেটরিতে খানিকটা সময় কাটাই।"

যুহা নরম গলায় বলল, "নিশ্চয়ই তুমি একসময় তোমার অস্ত্রটা ভাঁজ করে রেখে ল্যাবরেটরিতে ঢুকবে। নিশ্চয়ই ঢুকবে।"

রায়ীনা কোনো কথা না বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের ছত্রিশ ঘণ্টার কত ঘণ্টা পার হয়েছে যুহা।"

"বেশি না, খুব বেশি হলে মাত্র বারো ঘণ্টা।"

রায়ীনা স্কাউটশিপের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, উপরে কুচকুচে কালো আকাশ, সেই আকাশে এই মুহূর্তে একটি মহাকাশযান এই গ্রহটাকে ঘিরে ঘুরছে। তার দলের মানুষেরা এই মুহূর্তে হয়তো সেই মহাকাশযানটা দখল করার চেষ্টা করছে। তারা কি পারবে দখল করতে? তারপর তারা কি আসবে তাদের এই ভয়ঙ্কর গ্রহ থেকে উদ্ধার করতে? যদি কেউ না আসে?

রায়ীনা জোর করে চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে দিল।

৩

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে যুহার চোখে একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল, ঠিক এ রকম সময় একটা বিস্ফোরণের মতো শব্দ হল এবং তার সাথে সাথে স্কাউটশিপটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে ওঠে। যুহা চমকে উঠে বলল, "ওটা কীসের শব্দ?"

রায়ীনা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "গুলির শব্দ।"

"গুলির শব্দ?"

"হ্যাঁ। মনে হয় ওরা এখন অস্ত্র নিয়ে এসেছে!"

"সর্বনাশ!"

যুহার কথা শেষ হবার আগেই আবার বিস্ফোরণের শব্দ হল এবং স্কাউটশিপটা ভয়ানকভাবে দুলে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রায়ীনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এ জন্যে আমি এদের সাথে গোলাগুলি করতে চাই নি! আমরা গুলি করেছি তাই আমরা এখন তাদের শত্রু হয়ে গিয়েছি।"

আবার একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল, এবারে স্কাউটশিপের ভেতরে কিছু ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে। এক কোনা থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উঠতে থাকে। য়ুহা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "সর্বনাশ! আমরা এখন কী করব?"

"সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হত যদি আমরা কিছু না করতাম।"

"কিন্তু তা হলে আমাদের মেরে ফেলবে না?"

"মেরে ফেলার কথা না। আমি যদি আরেকটি বুদ্ধিমান প্রাণী পেতাম তা হলে কখনোই রাগ হয়ে তাকে মেরে ফেলতাম না। আমি মৃত অবস্থায় যেটুকু গুরুত্বপূর্ণ বেঁচে থাকা অবস্থায় তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ—"

রায়ীনার কথার মাঝখানে ঠিক মাথার ওপর একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল এবং সেখান থেকে কিছু যন্ত্রপাতি ভেঙেচুরে নিচে এসে পড়ল। য়ুহা শুকনো গলায় বলল, "রায়ীনা, কিছু একটা কর।"

রায়ীনা স্কাউটশিপের নিচে গুড়ি মেরে বসে বলল, "আমি একটা জিনিস ভাবছি।"

য়ুহা একটু অস্থির হয়ে বলল, "ভাবাভাবির অনেক সময় পাবে। এখন কিছু একটা কর। গুলি শুরু কর! মৃত মানুষকে তো আর দ্বিতীয়বার মারা যায় না। তোমার ভয়টা কীসের?"

"গুলি করা থেকে ভালো কিছু করা যায় কি না ভাবছি।"

"সেটা কী?"

"গুলি করা মানেই শত্রু হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। তা ছাড়া গুলি করা মানে ধ্বংস করা—"

কাছাকাছি আরেকটা বিস্ফোরণের শব্দ হল এবং স্কাউটশিপের একটা বড় অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। য়ুহা ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "তারা আমাদের ধ্বংস করলে কোনো দোষ নেই, আমরা করলেই দোষ?"

"যুক্তিতর্কের সময় এটা না—" রায়ীনা নিচু গলায় বলল, "আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কিছু একটা করতে হবে!"

"কী করবে?"

"যেহেতু আমরা দেখছি বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে এরা যোগাযোগ করছে, তাই আমরা ইচ্ছে করলে তাদের সমস্ত সিগন্যাল জ্যাম করে দিয়ে তাদেরকে অচল করে রাখতে পারি।"

"সেটা কেমন করে করবে?"

রায়ীনা হাত দিয়ে স্কাউটশিপের যোগাযোগ মডিউলটা দেখিয়ে বলল, "এই যোগাযোগ মডিউলটা দেখেছ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি।"

"এটা থেকে খুব শক্তিশালী সিগন্যাল বের হয়। মহাকাশযান থেকে মহাকাশযানে এই সিগন্যাল পাঠানো হয়। আমরা তাদের ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের সিগন্যাল পাঠাব, সবকিছু জ্যাম হয়ে যাবে!"

য়ুহা ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি পারবে?"

"গুলি করে যোগাযোগ মডিউলটাই যদি উড়িয়ে না দেয় তা হলে পারার কথা!"

"তা হলে দেরি কোরো না। শুরু করে দাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একটু সময় দাও—ওটা খুলে আনি।"

য়ুহা অধৈর্য গলায় বলল, "কেন? খুলে আনতে হবে কেন?"

"আমার মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এসেছে!"

"কিন্তু তোমার বুদ্ধি কাজে লাগানোর আগেই আমরা মরে ভূত হয়ে যাব!"

"না। এত সহজে আমরা মরে ভূত হয়ে যাব না! এই প্রাণীগুলো আমাদের দিকে গুলি করতে পারে কিন্তু আমাদের মারবে না।"

রায়ীনা গুড়ি মেরে স্কাউটশিপের কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে গিয়ে টেনেহিঁচড়ে যোগাযোগ মডিউলটা খুলে আনে। আবার গুড়ি মেরে য়ুহার কাছে এসে যোগাযোগ মডিউলের কন্ট্রোল বোতামটি চেপে ধরে বলল, "আগে দেখে নিই কোন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করছে।"

রায়ীনা সঠিক ফ্রিকোয়েন্সি বের করে সেখানে তীব্র কিন্তু অর্থহীন সিগন্যাল পাঠাতেই হঠাৎ করে বাইরের গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। য়ুহা সাবধানে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল স্কাউটশিপ ঘিরে ইতস্তত কিছু প্রাণী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলো হঠাৎ করে আবার নড়ে উঠবে না ব্যাপারটা নিশ্চিত হবার পর য়ুহা আবার রায়ীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আসলেই অসাধারণ রায়ীনা!"

"এর মাঝে অসাধারণের কিছু নেই।" রায়ীনা একটু হেসে বলল, "আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক একটা ব্যাপার। এই প্রাগৈতিহাসিক উপায়ে আমি যে এটা করতে পেরেছি সেটাই হচ্ছে রহস্য!"

য়ুহা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "আমরা এখন কী করব?"

"স্কাউটশিপের ভেতরে থাকাটা বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে! যে কোনো মুহূর্তে নূতন একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে সিগন্যাল আসতে পারে। ফ্রিকোয়েন্সিটা এমনভাবে অদলবদল করতে পারে যে আমরা হয়তো আর তাল রাখতে পারব না। এই প্রাণী বল, মানুষ বল, মৃতদেহ বল—তারা নূতন করে আক্রমণ শুরু করতে পারে। বসে বসে গুলি খাওয়ার কোনো অর্থ নেই—আমাদের বের হয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

"ঠিকই বলেছ।"

"সাথে যোগাযোগ মডিউলটা রাখি—আবার কাজে দেবে।"

"একেবারে ম্যাজিকের মতো কাজে দেবে।"

রায়ীনা বলল, "প্রয়োজন না হলে আমি এই প্রাণীগুলোর শত্রু হতে চাই না। আমি শত্রু হয়ে দেখেছি। খুব কষ্ট।"

য়ুহা কোনো কথা না বলে রায়ীনার মুখের দিকে তাকাল। কম বয়সী একটা মেয়ে কিন্তু এর ভেতরেই তার জীবনে কত কিছু ঘটে গেছে।

৪

স্কাউটশিপকে ঘিরে থাকা প্রাণীগুলোকে দেখে য়ুহা এবং রায়ীনা হতবাক হয়ে গেল—এগুলো মানুষেরই দেহ কিন্তু কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ নয়। কারো হাত নেই, কারো পা নেই—কারো বুকের ভেতর বিশাল একটা গর্ত। দুটি মানুষের মাথারই অস্তিত্ব নেই—শুধু ধড়টি দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজনের মুখমণ্ডলের খানিকটা অংশ উড়ে গেছে, চোখের জায়গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালি কুঠরি। দেখে মনে হয় এই মূর্তিগুলোকে বুঝি সরাসরি নরক থেকে তুলে আনা হয়েছে।

য়ুহা বুকের ভেতর আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "রায়ীনা, এখান থেকে চল। এই মূর্তিগুলো যদি হঠাৎ করে জীবন্ত হয়ে যায় তা হলে সেই দৃশ্যটা আমি সহ্য করতে পারব না।"

রায়ীনা মাথা নাড়ল, "ঠিকই বলেছ, আমিও পারব না।"

সরাসরি নরক থেকে উঠে আসা কিছু দেহাবশেষকে স্থির অবস্থায় রেখে য়ুহা আর রায়ীনা সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

য়ুহা জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কোথায়?"

"মনে আছে এই গ্রহ থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর একটা সিগন্যাল বের হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে।"

"আমরা গিয়ে দেখতে পারি সেটা কী রকম। কেন বের হচ্ছে, কীভাবে বের হচ্ছে।"

"কোনো বিপদ হবে না তো?"

"বিপদ তো হতেই পারে—" রায়ীনা হাসার চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু বিপদ দেখে তুমি পিছিয়ে আস সে রকম কোনো প্রমাণ তো আমি পাই নি!"

য়ুহা শব্দ করে হেসে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ! আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না—কিছুদিন আগেও আমি কখনো চিন্তা করি নি শব্দের পেছনে শব্দ বসিয়ে কবিতা লেখা ছাড়া আমি আর কিছু করতে পারি! কিন্তু দেখ আমি কত কী করেছি!"

রায়ীনা নরম গলায় বলল, "তুমি আর কী কী করেছ আমি জানি না—কিন্তু তুমি আমাকে একটা নূতন জীবন দিয়েছ। যদি সবকিছু ঠিক করে শেষ হয় আর আমি সত্যি সত্যি নিজের জীবনে ফিরে যেতে পারি সেটা হবে তোমার জন্যে। শুধুমাত্র তোমার জন্যে।"

"আমি এমন কিছুই করি নি।"

"আর আমরা যদি এই গ্রহ থেকে বের হতে না পারি, এখানে মারা পড়ি, এই গ্রহের কোনো একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী আমাদের মৃতদেহটাকে ব্যবহার করে উৎকট নাটক করে তা হলে—"

"তা হলে কী?"

"তা হলে তুমি কিছু মনে কোরো না। তোমার সাথে আমি খুব কম সময় কাটিয়েছি, কিন্তু সময়টা ছিল চমৎকার!"

"তোমাকে ধন্যবাদ রায়ীনা।"

মহাকাশের পোশাকের ভেতর থেকে একজন আরেকজনকে স্পর্শ করতে পারবে না জেনেও য়ুহা হাত দিয়ে রায়ীনার কাঁধ স্পর্শ করল।

গ্রহটার পাথরের ভেতর দিয়ে দুজনে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। ছোট-বড় পাথর ছড়িয়ে আছে, উঁচু-নিচু পথ। পাথর থেকে এক ধরনের ঘোলাটে আলো বের হচ্ছে, কোথাও নিষ্প্রভ, কোথাও বেশ আলো। মাঝে মাঝে বিশাল খাদ, তার গভীরে কী আছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না, জেট প্যাক ব্যবহার করে তারা সেই জায়গাগুলো উড়ে পার হয়ে যায়। জেট প্যাকের জ্বালানি খুব সীমিত, তাই সেগুলো তারা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, খুব বেশি প্রয়োজন না হলে তারা জেট প্যাক ব্যবহার করছে না। সত্যিকারের বড় কোনো বিপদে হয়তো এই জেট প্যাক ব্যবহার করেই তারা নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা আগে কখনো জেট প্যাক ব্যবহার করে নি, রায়ীনা তাই তাকে ছোটখাটো নিয়মগুলো শিখিয়ে দিচ্ছে। অজানা অন্ধকার একটা কুৎসিত গ্রহে নিজের জীবন হাতে নিয়ে যদি এই জেট প্যাক ব্যবহার করতে না হত তা হলে য়ুহা এই পুরো প্রক্রিয়াটা রীতিমতো উপভোগ করতে পারত!

হেঁটে হেঁটে তারা যখন ক্লান্তির একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছেছে তখন তারা দূরে একটা বিধ্বস্ত মহাকাশযান দেখতে পেল। মহাকাশযানের আকারটি দেখেই রায়ীনা বুঝতে পারে এটি ক্যাটাগরি তিন মহাকাশযান। আন্তঃগ্যালাক্টিক অভিযানে এগুলো ব্যবহার করা হয়, এই মহাকাশযানটি প্রায় একটা শহরের মতো—এখানে কয়েকশ মহাকাশচারী থাকে। এই বীভৎস গ্রহে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে থাকা এই মহাকাশযানটি দেখে মনে হয় এটি বুঝি কোনো একটি পরাবাস্তব জগতের দৃশ্য।

মহাকাশযানের কাছাকাছি এসে য়ুহা আর রায়ীনা বড় বড় কয়টা পাথরের আড়ালে নিজেদের আড়াল করে লুকিয়ে রইল। ভেতরে কী আছে তারা জানে না, হঠাৎ করে ভেতরে ঢুকে তারা বিপদে পড়তে চায় না, বাইরে থেকে আগে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে চায়। বেশ অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকেও তারা মহাকাশযানের ভেতর যখন কোনো কিছু ঘটতে দেখল না, তখন তারা মহাকাশযানের ফাটল দিয়ে খুব সাবধানে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরে বেশ অন্ধকার, হেলমেটের নিয়ন্ত্রণ বোতাম স্পর্শ করে চশমার কার্যকারিতা দশ ডিবি বাড়িয়ে নেওয়ার পর মহাকাশযানের ভেতরটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভেতরের দৃশ্য দেখে তারা দুজনেই একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। বাইরে থেকে যে রকম অনুমান করেছিল—মহাকাশযানটি ঠিক সে রকম বিধ্বস্ত। যন্ত্রপাতি ভেঙে পড়ে আছে, দেয়ালে বড় বড় ফাটল, প্রচণ্ড উত্তাপে নানা অংশ গলে পুড়ে কদাকার হয়ে আছে—কিন্তু তাদের সেই দৃশ্যগুলো বিচলিত করে নি। তাদেরকে বিচলিত করেছে মহাকাশচারীদের মৃতদেহগুলো। মহাকাশযানের এখানে-সেখানে সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সবগুলো যে নিচে পড়ে আছে তা নয়, কোনো কোনোটা উবু হয়ে বসে আছে এমনকি কোনো কোনোটা বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

য়ুহা মাথা নেড়ে বলল, "এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না।"

রায়ীনা জানতে চাইল, "কোনটা তোমার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না?"

"এই যে মৃতদেহগুলো দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে—এগুলো আমার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না। প্রথমত মৃতদেহ কেন আমাদের চোখের সামনে থাকবে? আর থাকতেই যদি হয় তা হলে কেন দাঁড়িয়ে থাকবে?"

রায়ীনা বলল, "আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"এই মৃতদেহগুলো আসলে কাজকর্ম করছিল। ছোটাছুটি করছিল। হঠাৎ করে যে যেভাবে ছিল সেভাবে থেমে গেছে। সেজন্যে মনে হচ্ছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ বসে আছে।"

য়ুহা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "হঠাৎ করে থেমে গেল কেন?"

"জানি না।" রায়ীনা মাথা নাড়ে, "মনে হয় আমাদের জন্যে। আমরা মহাকাশযানের ভেতর ঢুকেছি সে জন্যে সবকিছু থামিয়ে দিয়েছে। মনে হয় বোঝার চেষ্টা করছে আমাদের মতলবটা কী!"

"তার মানে মহাকাশের প্রাণীগুলো আমাদের দেখছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নিশ্চয়ই দেখছে, আমাদের কি লুকিয়ে থাকা সম্ভব।"

"যদি আমাদের দেখছে তা হলে ধরার জন্যে ছুটে আসছে না কেন?"

"দুটি কারণ হতে পারে, এক. ছুটে আসবে, এক্ষুনি সবাই ছুটে আসবে। দুই. ছুটে আসার প্রয়োজন নেই। কারণ ছুটে গিয়ে আমাদের ধরে যেখানে আনার কথা আমরা সেখানেই বসে আছি!"

"সর্বনাশ!" য়ুহা বলল, "তুমি না বলেছিলে, আসলে এখানে কোনো মহাজাগতিক প্রাণী নেই। পুরোটাই হচ্ছে কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক।"

"হ্যাঁ। আমার এখনো তা-ই মনে হয়। আমাদের জন্যে সেটা নিরাপদ। আমরা তা হলে আমাদের পরিচিত যন্ত্রপাতি, পরিচিত অস্ত্রপাতি, পরিচিত প্রযুক্তি দিয়েই নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারব—"

রায়ীনার কথা শেষ হওয়া মাত্রই হঠাৎ মহাকাশযানটা একটু দুলে ওঠে, সাথে সাথে অত্যন্ত বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটল। মহাকাশযানের নানা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সবগুলো মৃতদেহ একসাথে নড়তে শুরু করল। দাঁড়িয়ে থাকা মৃতদেহগুলো সামনে ঝুঁকে পড়ে পা ঘষে ঘষে হাঁটতে থাকে। বসে থাকা মৃতদেহগুলো বসে থাকা অবস্থাতেই নিজেকে ঘষে ঘষে টেনে নিতে থাকে। কিছু মৃতদেহ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়। অনেকগুলো বুকে ঘষে ঘষে এগুতে থাকে। তারা হাতে ছোটখাটো যন্ত্রপাতি টেনে নিতে থাকে, সেগুলো এখানে-সেখানে বসাতে থাকে, যন্ত্রগুলো টানাটানি করতে থাকে—সব মিলিয়ে অন্ধকার মহাকাশযানের ভেতরে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার একটা দৃশ্য ফুটে ওঠে, কিন্তু সেই দৃশ্যটি এত অবাস্তব, এত অবিশ্বাস্য যে য়ুহা এবং রায়ীনা দুজনেই হতবাক হয়ে যায়।

য়ুহা বলল, "আমার দেখতে ভালো লাগছে না।"

রায়ীনা বলল, "আমারও ভালো লাগছে না।"

"চল, বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি।"

"হ্যাঁ। আমার হিসেব যদি ঠিক হয়ে থাকে তা হলে আর কিছুক্ষণের মাঝেই আমাদের উদ্ধার করতে কেউ না কেউ চলে আসবে!"

"যদি না আসে?"

"আসবে। আমার দলের লোকগুলো অসাধারণ।" রায়ীনা মহাকাশযান থেকে বের হওয়ার জন্যে ঘুরে গিয়ে বলল, "একটু পরে তুমি নিজেই দেখবে।"

মহাকাশযানের ভেতর থেকে বের হতে গিয়ে রায়ীনা থমকে দাঁড়াল এবং তার সাথে য়ুহাও থেমে গিয়ে একটা চাপা আর্তনাদের মতো শব্দ করল। মহাকাশযানের যে বিশাল ফাটল দিয়ে তারা ঢুকেছিল, সেই ফাটল দিয়েই তারা বের হয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু সেদিক দিয়ে একজন-দুজন নয় অসংখ্য মৃত মানুষ বিচিত্র ভঙ্গিতে দেহটাকে টেনে টেনে এসে হাজির হচ্ছে।

য়ুহা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "এরা কী চায়? এখানে আসছে কেন?"

রায়ীনা নিচু গলায় বলল, "জানি না।"

মৃতদেহগুলো গাদাগাদি করে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, য়ুহা তখন চিৎকার করে বলল, "কী চাও তোমরা? সরে যাও সামনে থেকে।"

দেহগুলো সরে যাবার কোনো লক্ষণ দেখাল না, বরং গাদাগাদি করে তারা আরো এক পা এগিয়ে এল। মৃতদেহগুলো প্রাণহীন চোখ দিয়ে তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থেকে য়ুহার বুক কেঁপে ওঠে। সে ভয় পাওয়া গলায় অস্ত্র উঁচিয়ে বলল, "সরে যাও বলছি, তা না হলে কিন্তু গুলি করে দেব।।"

প্রাণীগুলো সরে গেল না বরং আরো এক পা এগিয়ে এল—এত কাছে যে তারা ইচ্ছে করলে এখন এই য়ুহা আর রায়ীনাকে স্পর্শ করতে পারে। য়ুহা অস্ত্রটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "গুলি করে দেব, দেব গুলি করে—"

প্রাণীগুলো আরো এক পা এগিয়ে এল—য়ুহা তখন ট্রিগার টেনে ধরে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মৃতদেহগুলোর হাত পা মাথা উড়ে যায়, ঠিক সেই অবস্থায় মৃতদেহগুলো আরো এক পা এগিয়ে এল। রায়ীনা হাত দিয়ে য়ুহার হাত ধরে বলল, "শুধু শুধু গুলি করে লাভ নেই। মৃত মানুষকে মারা যায় না—"

"কিন্তু—"

"কোনো কিন্তু নেই। পেছনে সরে যাও।"

য়ুহা আর রায়ীনা পেছনে সরে এল। মৃতদেহগুলো তখন আরো একটু এগিয়ে আসে, এভাবে তাদের দুজনকে ঠেলে ঠেলে মৃতদেহগুলো তাদের একটা অন্ধকার গহ্বরের কাছে নিয়ে আসে। মৃতদেহগুলো তখন চারপাশ থেকে ঘিরে তাদের দুজনকে গহ্বরের মাঝে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল। য়ুহা আর রায়ীনা আতঙ্কিত হয়ে হাতের অস্ত্র দিয়ে গুলি করে প্রাণীগুলোকে সরানোর চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। মৃতদেহগুলো ঠেলে ঠেলে তাদের গহ্বরের মাঝে ফেলে দেয়। য়ুহা আর রায়ীনা অন্ধকার গহ্বরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাবার শেষ মুহূর্তে বাইরে তাকিয়ে দেখে, যে প্রাণীগুলো এতক্ষণ তাদেরকে ঠেলে ঠেলে এনে গহ্বরের মাঝে ফেলে দিয়েছে হঠাৎ করে সেগুলো মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে। কেউ আর এতটুকু নড়ছে না, হাত পা মাথাহীন ভয়ঙ্কর দেহগুলো যেটা যেখানে ছিল ঠিক সেখানে স্থির হয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন আর তাদের কিছুই করার নেই।

AMARBOI.COM

৫

পিচ্ছিল আঠালো চটচটে এক ধরনের তরলের ভেতর দিয়ে দুজনে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় হাজির হল। জায়গাটি বিচিত্র। এটি আশ্চর্য রকম সমতল এবং চারপাশের দেয়ালগুলো দেখলে প্রাগৈতিহাসিক কারুকাজের কথা মনে পড়ে। য়ুহা এবং রায়ীনা উঠে দাঁড়াল, চটচটে আঠালো তরলে তারা মাখামাখি হয়ে আছে। য়ুহা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আমরা কোথায়?"

রায়ীনা বলল, "তুমি শুনে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা কোনো একটা প্রাণীর পেটের ভেতরে হাজির হয়েছি!"

"পেটের ভেতরে?"

"হ্যাঁ।"

য়ুহা ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল, চারপাশের অংশটুকুর তার পরিচিত কোনো কিছুর সাথে কোনো মিল নেই। সে তার জীবনে এ রকম বিচিত্র কিছু দেখে নি। রায়ীনা নিচু গলায় বলল, "তুমি দেয়ালগুলো দেখ"—কিছুক্ষণ থেকেই হেডফোনে একটা খসখসে চাপা শব্দ আসছিল য়ুহা তাই ভালো করে কথা শুনতে পেল না, সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী বলেছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি দেয়ালগুলো দেখ—সেগুলো নড়ছে।"

য়ুহা চারপাশের দেয়ালগুলোর দিকে তাকাল, সেগুলো শুধু নড়ছে না ধীরে ধীরে সেগুলোর আকার পাল্টে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সেখানে ছোট ছোট অসংখ্য বিন্দু বড় হতে শুরু করছে।

য়ুহা তার অস্ত্রটি হাতে নিয়ে বলল, "এটা জীবন্ত?"

রায়ীনার হেডফোনেও একটা কর্কশ শব্দ, সে তার মাঝে চিৎকার করে বলল, "হ্যাঁ, মনে হয় এটা জীবন্ত।"

রায়ীনার কথা শেষ হবার সাথে সাথে য়ুহা তার হেডফোনে একটা যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পেল, য়ুহা কথাটা পরিষ্কার বুঝতে পারল না, রায়ীনাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী বলেছ?"

আবার প্রতিধ্বনির মতো একটা শব্দ হল, তার ভেতরে রায়ীনা বলল, "আমি কিছু বলি নি।"

"তা হলে কে বলেছে?"

আবার ভোঁতা একটা শব্দ হল। রায়ীনা চারদিক ঘুরে তাকাল, বলল, "অন্য কেউ বলছে।"

"অন্য কেউ?"

"হ্যাঁ।"

"কী বলছে?"

"বুঝতে পারছি না।"

রায়ীনার কথা শেষ হবার আগেই খসখসে একটা শব্দ শোনা গেল, "বুঝি বুঝি বু-ঝি..."

য়ুহা চমকে ওঠে, "কে কথা বলে?"

প্রতিধ্বনির মতো একটা গমগমে আওয়াজ আসে, "কে? কে? কে?"

রায়ীনা নিচু গলায় বলল, "কেউ একজন আমাদের সাথে কথা বলতে চাইছে।"

য়ুহা বলল, "কী বলছে?"

দুর্বোধ্য কিছু শব্দ শুনতে পেল তারা, সেই অর্থহীন শব্দগুলোর মাঝে শুধু "মানুষ" শব্দটা তারা বুঝতে পারে। য়ুহা বলল, "হ্যাঁ। আমরা মানুষ। তোমরা কারা?"

"মানুষ!" প্রতিধ্বনির মতো আবার শব্দ হয় "মানুষ! সত্যি মানুষ! জীবন্ত মানুষ! মানুষ!"

"হ্যাঁ। আমরা জীবন্ত মানুষ। তোমরা কারা?"

"আমরা? আমরা? মানুষ না। মানুষ না। তোমরা মানুষ। আমরা মানুষ না।"

আবার দুর্বোধ্য কিছু শব্দ শুনল, দ্রুত বিজাতীয় এক ধরনের ভাষায় কথা বলতে থাকে তার মাঝে বুদ্ধিমত্তা, চেতনা, অনুভূতি এ রকম কয়েকটা শব্দ তারা বুঝতে পারল। রায়ীনা চারদিকে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, "আমরা তোমাকে দেখতে চাই।"

"দেখতে চাও? দেখতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

"এই তো আমি। আমি।"

"তুমি কি একা?"

"একা। আমি একা। আমি এক এবং একা।"

"এই গ্রহে তুমি একা?"

"আমি একা। আমি সব। আমি সব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি কি এই মহাকাশযানগুলো ধ্বংস করেছ?"

"ধ্বংস? ধ্বংস?"

"হ্যাঁ। এই বিধ্বস্ত মহাকাশযানটা কি তুমি ধ্বংস করেছ?"

"না। আমি করি নাই।"

য়ুহা লক্ষ করল দুর্বোধ্য একটা দুটো শব্দ দিয়ে কথা শুরু করলেও খুব দ্রুত এই প্রাণীটি অর্থবহ কথা বলতে শুরু করেছে। য়ুহা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী চাও?"

"আমি মানুষ বুঝতে চাই।" গমগমে এক ধরনের কণ্ঠস্বরে মহাকাশের প্রাণীটি বলে, "বিধ্বস্ত মহাকাশযানে কোনো জীবন্ত মানুষ নাই। আমি জীবন্ত মানুষ বুঝতে চাই।"

য়ুহা বলল, "আমরা জীবন্ত মানুষ।"

"আমি বুঝতে চাই।"

রায়ীনা বলল, "আমরাও তোমাকে বুঝতে চাই। তুমি কেমন করে দেখ কেমন কথা বল আমরা বুঝতে চাই। তোমরা কেমন করে চিন্তা কর বুঝতে চাই।"

"তোমরা আলাদা। তোমাদের কথা আলাদা। চিন্তা আলাদা। আমি এক। আমি একা।"

"তুমি কেমন করে কথা বল? দেখ? শোন? স্পর্শ কর?"

"আমি কথা বলি না। দেখি না। শুনি না। স্পর্শ করি না। আমি এক। আমি একক।"

রায়ীনা গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি চিন্তা কর?"

"আমি চিন্তা করি।"

"তুমি কীভাবে চিন্তা কর?"

"তোমরা যেভাবে চিন্তা কর আমি সেভাবে চিন্তা করি। তোমাদের সবার আলাদা আলাদা মস্তিষ্ক। আমার একটা মস্তিষ্ক।"

"কোথায় তোমার মস্তিষ্ক? দেখতে চাই।"

"এই গ্রহের ভেতরে বিশাল মস্তিষ্ক।"

"গ্রহের ভেতরে?"

"হ্যাঁ, এই গ্রহের ভেতরে বিশাল জায়গা জুড়ে আমার মস্তিষ্ক। আমার সেই মস্তিষ্ক আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।"

"আমরা যে রকম হাঁটতে পারি। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারি তুমি সেটা পার না?

"না। আমার তার প্রয়োজন হয় না। আমার যেটা দরকার আমি সেটা আমার নিজের কাছে নিয়ে আসি।"

রায়ীনা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল, "আমাদেরকে যেভাবে এনেছ?"

"হ্যাঁ। তোমাদেরকে যেভাবে এনেছি।"

"কেন এনেছ আমাদের।"

"আমি আগে শুধু মৃত মানুষ দেখেছি। শুধু মৃত মানুষ নিয়ে কাজ করেছি। আমি জীবন্ত মানুষ দেখতে চাই, তারা কেমন করে কাজ করে বুঝতে চাই।"

"তুমি কী বুঝতে পেরেছ?"

"আমি তাদের আরো গভীরভাবে দেখতে চাই। আরো গভীরভাবে বুঝতে চাই। আরো নিবিড়ভাবে দেখতে চাই, শরীরের প্রত্যেকটা কোষ দেখতে চাই, মস্তিষ্কের প্রত্যেকটা নিউরন দেখতে চাই—"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কীভাবে দেখবে তুমি?"

"খুলে খুলে।"

"না" য়ুহা চিৎকার করে বলল, "আমি দেব না। কিছুতেই দেব না।"

"দেব না?"

"না। আমাদের ছেড়ে দাও। যেতে দাও।"

য়ুহা অবাক হয়ে দেখে তাদের চারপাশের দেয়ালগুলো তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু আগে সেগুলো প্রায় মসৃণ ছিল, এখন সেগুলো অসমান, কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। গোলাকার অংশ ফুলে ফুলে বের হয়ে আসছে। তার চারপাশে শুঁড়ের মতো অংশ কিলবিল করতে করতে নড়ছে। য়ুহা চারদিকে তাকিয়ে খপ করে অস্ত্রটা তুলে নেয়, সাথে সাথে শুঁড়ের মতো একটা অংশ তাকে জড়িয়ে ধরে ফেলে। য়ুহা ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে, পারে না। সে রায়ীনার দিকে তাকাল, বেশ কয়েকটা শুঁড়ের মতো জিনিস তাকেও জাপটে ধরেছে, রায়ীনা প্রাণপণ চেষ্টা করছে মুক্ত হবার জন্যে কিন্তু মুক্ত হতে পারছে না। গোলাকার জিনিসগুলো তাদের কাছাকাছি এগিয়ে আসছে, য়ুহা তখন সেগুলোকে চিনতে পারে। গোলাকার জিনিসগুলো এক ধরনের চোখ, একটি দুটি নয় অসংখ্য চোখ তাদের দেখছে। গভীরভাবে দেখছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

পেঁচিয়ে থাকা শুঁড়গুলো য়ুহাকে জাপটে ধরে ওলটপালট করে, কানের ভেতর ভোঁতা একটা যান্ত্রিক শব্দ, চোখের সামনে একটা লাল পর্দা ঝুলছে। মাথার ভেতরে একটা দপদপে যন্ত্রণা, মনে হচ্ছে পুরো মস্তিষ্কটা বুঝি ফেটে বের হয়ে যাবে। সে মাথা ঘুরিয়ে রায়ীনাকে দেখার চেষ্টা করল। কিলবিলে শুঁড় আর ছোট-বড় অসংখ্য চোখের আড়ালে সে ঢাকা পড়ে গেছে। সামনে কিছু একটা খুলে যায়, বিশাল এলাকা জুড়ে কিছু একটা থলথল করছে, নড়ছে, মাঝে মাঝে বুদ্বুদের মতো কিছু একটা বের হয়ে আসছে। শুঁড়ের মতো কিছু বের হয়ে আসছে, আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। য়ুহা টের পেল তাকে সেখানে ফেলে দেওয়া হল, থলথলে আঠালো একটা ঘন তরলের মাঝে সে ডুবে যাচ্ছে, অসংখ্য নল তাকে পেঁচিয়ে ধরেছে, তাকে দেখছে, নাড়ছে। য়ুহা পরিষ্কার করে কিছু চিন্তা করতে পারছিল না। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে সে চিৎকার করে ওঠে, "রায়ীনা—রায়ীনা—"

কেউ তার কথার উত্তর দিল না।

৬

"য়ুহা। য়ুহা—"

য়ুহা চোখ খুলে তাকাল। কেউ একজন তাকে ডাকছে, ক্লান্তিতে তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছিল তার মাঝে সে কোনোভাবে চোখ খুলে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, "আমরা কি বেঁচে আছি না মরে গেছি?"

"বেঁচে আছি।"

"তা হলে এ রকম লাগছে কেন?"

"কী রকম লাগছে?"

"মনে হচ্ছে মরে গেছি!"

"মনে হয় আমরা মরেই গিয়েছিলাম, আবার বেঁচে গেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

য়ুহা উঠে বসে, সমতল একটা জায়গায় বসে আছে—চারপাশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো বিচিত্র নকশা। য়ুহা চারদিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা কোথায়?"

"জানি না।"

"আমরা কি যেতে পারব?"

"সেটাও জানি না। প্রাণীটা আর কোনো কথা বলছে না।"

য়ুহা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে চারদিকে তাকায়, ঠিক কী কারণ জানা নেই সে নিজের ভেতরে এক ধরনের বিষণ্ন বেদনা অনুভব করে, মনে হয় কিছু একটা ঘটে গেছে, যেটা সে বুঝতে পারছে না।

রায়ীনা বলল, "আমাদের এখন বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করা দরকার।"

"প্রাণীটা যেতে দেবে?"

"কেন দেবে না? আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা কোষ খুলে খুলে তার যেটা জানা দরকার জেনে গেছে। আমাদের সবকিছু সে জানে।"

"সবকিছু?"

"হ্যাঁ। সবকিছু। আমরা কী চিন্তা করি, কী ভাবি সবকিছু।"

য়ুহা ক্লান্ত গলায় বলল, "ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার শরীরটা কেমন যেন গুলিয়ে আসছে।"

রায়ীনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এসব নিয়ে ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। এখন চল, দেখি এখান থেকে বের হওয়া যায় কি না। আমার হিসেব অনুযায়ী আমার খোঁজে আমার দলের লোকজনের এতক্ষণে চলে আসার কথা।"

য়ুহা আর রায়ীনা অস্ত্র হাতে সতর্ক পায়ে এগুতে থাকে। কেউ তাদেরকে বাধা দিল না—কেন বাধা দিল না সেই ভাবনাটি তাদের ভেতরে খচখচ করতে থাকে। তা হলে কি এমন কিছু ঘটেছে যেটা তারা জানে না?

বিধ্বস্ত মহাকাশযান থেকে বের হয়েই তারা স্কাউটশিপটা দেখতে পায়। মহাকাশযানের কাছাকাছি একটা বড় পাথরের ওপর একটি অতিকায় গুবরে-পোকার মতো সেটা বসে আছে। রায়ীনা হাসিমুখে য়ুহার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছ? আমি বলেছি না? আমার খোঁজে আমার লোকজন চলে আসবে?"

"য়ুহা বলল, তোমাকে যতই দেখছি আমি ততই মুগ্ধ হচ্ছি!"

"মুগ্ধ হওয়ার অনেক সময় পাওয়া যাবে, এখন চল। তাড়াতাড়ি।"

য়ুহা রায়ীনার পিছু পিছু দ্রুত হাঁটতে থাকে। রায়ীনা বলল, "আমি বুঝতে পারছি না আমার দলের লোকজন স্কাউটশিপের ভেতর বসে আছে কেন? তারা আমাদের খুঁজছে না কেন?"

"হয়তো খুঁজেছে।"

"আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না কেন?"

"সেটা বুঝতে পারছি না। চেষ্টা করেছ?"

"হ্যাঁ করেছি।"

হঠাৎ তারা একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পায়। স্কাউটশিপটা গর্জন করে উঠে থরথর করে কাঁপতে থাকে। দেখে মনে হয় উড়ে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। য়ুহা চমকে উঠে বলল, "রায়ীনা! স্কাউটশিপটা কি চলে যাচ্ছে?"

"অসম্ভব! আমাদের না নিয়ে কিছুতেই যাবে না!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হয়তো অনেক খুঁজেছে। খুঁজে না পেয়ে চলে যাচ্ছে।"

"হতেই পারে না। আমাকে না নিয়ে যাবে না—"

রায়ীনা পাথরের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে স্কাউটশিপের কাছে হাজির হয়, তখন সেটা নড়তে শুরু করেছে। রায়ীনা ইঞ্জিনের একটা অংশ ধরে জানালায় মুখ রাখে এবং মুহূর্তে তার মুখমণ্ডল রক্তহীন হয়ে যায়। য়ুহা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রায়ীনা? কী হয়েছে?"

রায়ীনা কোনো কথা না বলে শূন্য দৃষ্টিতে য়ুহার দিকে তাকিয়ে রইল।

য়ুহা আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

রায়ীনা এবারেও তার প্রশ্নের উত্তর দিল না, শূন্য দৃষ্টিতে য়ুহার দিকে তাকিয়ে রইল। য়ুহা এগিয়ে গিয়ে রায়ীনাকে সরিয়ে জানালায় মুখ রেখে ভেতরে তাকাল, স্কাউটশিপে অনেকেই আছে, সবার সামনে দুজন—তাদেরকে সে স্পষ্ট চিনতে পারল, একজন রায়ীনা, অন্যজন য়ুহা।

য়ুহা বিস্ফারিত চোখে রায়ীনার দিকে তাকাল, কাঁপা গলায় বলল, "ওরা কারা?"

"আমি আর তুমি।"

"আমরা কারা?"

"আমি জানি না।"

য়ুহা আর রায়ীনা বিধ্বস্ত মহাকাশের পাশে দাঁড়িয়ে দেখল স্কাউটশিপটি গর্জন করে উপরে উঠে পেছনে তীব্র লাল আলোর একটা জ্বলন্ত শিখা বের করে উড়ে গেল, যতক্ষণ সেটা মিলিয়ে না গেল তারা দুজন সেদিকে তাকিয়ে রইল। যখন সেটা ছোট একটা আলোর বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল তখন য়ুহা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এমন কি হতে পারে যে আমি আর তুমি আসল য়ুহা আর আসল রায়ীনা। আমাদেরকেই রেখে আমাদের অন্য দুজনকে নিয়ে গেছে?"

রায়ীনা য়ুহার দিকে তাকাল, বলল, "তুমিই বল? তুমি কি সত্যিকার য়ুহা?"

য়ুহা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, "না, আমি আসল য়ুহা না।"

"কেন?"

"আসল য়ুহা একজন কবি। সে শব্দের পাশে শব্দ বসিয়ে কবিতা লিখতে পারত। আমি পারি না। চেষ্টা করে দেখেছি আমি শব্দের পাশে শব্দ আর বসাতে পারি না।"

রায়ীনা মাথা নাড়ল, বলল, "আসল রায়ীনা মানুষের বুদ্ধিমত্তার ওপর গবেষণা করত। কুরিত্রা সমীকরণের সহগগুলো সে মনে মনে হিসাব করে বের করতে পারত। আমি পারি না।"

য়ুহা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের মতো দুঃখী আর কেউ নেই। তাই না রায়ীনা?"

রায়ীনা মাথা নাড়ল। য়ুহা জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কী করব রায়ীনা?"

"মহাকাশের এই প্রাণীটা যেন আমাদের মতো কাউকে নিয়ে এ রকম নিষ্ঠুরতা করতে না পারে সেটা সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে। মহাকাশযানটি এখানে বিধ্বস্ত হয়েছিল বলে সে মহাকাশের সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করেছে। আমরা প্রাণীটিকে হত্যা করতে পারব না—কিন্তু সে যেন আর বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ করতে না পারে সেটা তো নিশ্চিত করতে পারি।"

"আমরা কি পারব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পারব। আগে আমরা কখনো আমাদের প্রাণের ঝুঁকি নিই নি। এখন আমাদের প্রাণের কোনো ঝুঁকি নেই। আমরা এখন নিরাপদ স্কাউটশিপে করে মহাকাশযানে যাচ্ছি। আমাদের শুধু দুটি দেহ এই গ্রহে রয়ে গেছে—আমার আর তোমার এই দেহ দুটির কোনো মূল্য নেই।"

৭

মহাকাশযানের সবাই সবিস্ময়ে দেখল ভয়ঙ্কর একটি বিস্ফোরণে কুৎসিত কালো গ্রহটির শক্তিশালী এন্টেনাটি উড়ে গেছে। মহাকাশযানের কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক সাথে সাথেই কুৎসিত কালো গ্রহের সেই মহাজাগতিক প্রাণীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক নিজে থেকে একবার চালু নেওয়ার সাথে সাথে মহাকাশযানের ভেতরে আলো জ্বলে ওঠে। শক্তিশালী কুরু ইঞ্জিন গর্জন করে ওঠে। মহাকাশযানটি নিজ অক্ষের ওপর ঘুরতে শুরু করার সাথে সাথে কৃত্রিম মহাকর্ষে ভেসে থাকা সবকিছু নিচে নেমে আসে। মহাকাশচারীরা অনেক দিন পর হেঁটে হেঁটে যেতে থাকে।

য়ুহা আর রায়ীনার সম্মানে এবং তাদের প্রতি গভীর ভালবাসায় যে ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে ক্যাপ্টেন ক্রবের ক্রু এবং বিদ্রোহী দলের সদস্যরা পাশাপাশি বসে পানাহার করছিল। সেখানে মহাকাশযানের বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে রাখা সত্যিকার ভেড়ার মাংস, জৈবিক যবের রুটি এবং প্রাকৃতিক আঙুরের রসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মহাজাগতিক সিম্ফোনির সপ্তম অংশটি শুনতে শুনতে ক্যাপ্টেন ক্রবের ক্রু এবং বিদ্রোহী দলের সদস্যরা একে অন্যের সাথে হাসি তামাশায় মেতে উঠেছিল। উত্তেজক পানীয় খেতে খেতে তরল কণ্ঠে তাদের কথাবার্তা পুরো মহাকাশযানে একটা অন্য ধরনের আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিচের কালো কুৎসিত গ্রহটার একটা বড় পাথরের পাশে য়ুহা এবং রায়ীনার দেহ দুটি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। য়ুহা তার হাতের অস্ত্রটির ট্রিগারে হাত দিয়ে রায়ীনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রায়ীনা।"

রায়ীনা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি। আমি আর তুমি তো সত্যিকারের য়ুহা নই, সত্যিকারের রায়ীনা নই। আমরা হচ্ছি তাদের জোড়াতালি দেওয়া দেহ! আমাদের কোনো গুরুত্ব নেই য়ুহা। তার পরেও চলে যেতে আমার খুব কষ্ট লাগছে।"

য়ুহা রায়ীনাকে গভীর মমতায় আলিঙ্গন করে বলল, "আমাকে বিদায় দাও রায়ীনা।"

রায়ীনা য়ুহার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, বিদায় দিতে পারল না। ধীরে ধীরে তার চোখ অশ্রুতে ভরে যায়, য়ুহার ছেলেমানুষি মুখটা যখন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে তারা ট্রিগার টেনে ধরে।

বায়ুমণ্ডল নেই বলে গুলির শব্দটি গ্রহের ভেতর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে পারে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্টোপাসের চোখ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্টোপাসের চোখ

বিজ্ঞান আকাদেমির মহাপরিচালক মহামান্য কিহি কালো গ্রানাইট টেবিলের চারপাশে বসে থাকা অন্য সদস্যদের মুখের দিকে একনজর তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, "অনেক দিন পর আজ আমি তোমাদের সবাইকে আমার এখানে ডেকে এনেছি। আমার ডাক শুনে তোমরা সবাই এসেছ সেজন্যে তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।"

আকাদেমির তরুণ সদস্য ফিদা তার মাথার সোনালি চুলকে হাত দিয়ে পিছনে সরিয়ে বলল, "মহামান্য কিহি, আপনি আমাদের ডেকেছেন, এটি আমাদের জন্যে কত বড় সৌভাগ্য!"

অন্য সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল, বলল, "অনেক বড় সৌভাগ্য।"

মহামান্য কিহি মৃদু হেসে বললেন, "অনেক বয়স হয়েছে, কখন পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়, তাই ভাবলাম একবার তোমাদের সবার সাথে বসি। একটু খোলামেলা কথা বলি।"

জীববিজ্ঞানী রিকি মাথা নেড়ে বলল, "আপনাকে আমরা এত সহজে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে দেব না। আপনি আরো অনেক দিন আমাদের সাথে থাকবেন।"

অন্যেরাও মাথা নাড়ল, গণিতবিদ টুহাস সোজা হয়ে বসে বলল, "মহামান্য কিহি, আপনি পৃথিবীর ইতিহাসে বিজ্ঞান আকাদেমির সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপরিচালক। আপনার সময়ে এই পৃথিবী সব দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গায় পৌঁছেছে।"

বিজ্ঞানী ফিদা মাথাটা সামনে এগিয়ে এনে বলল, "হ্যাঁ। এই মুহূর্তে পৃথিবী যে অবস্থায় পৌঁছেছে আর কখনো সেরকম অবস্থায় ছিল না। জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে সব দিক দিয়ে পৃথিবীর মানুষ একটা নূতন অবস্থায় পৌঁছেছে।"

গণিতবিদ টুহাস বলল, "এর পুরো কৃতিত্বটা আপনার।"

মহামান্য কিহি বাধা দিয়ে বললেন, "না-না, তোমরা তোমাদের কথায় অতিরঞ্জন করছ। এটা মোটেই আমার একক কৃতিত্ব নয়। আমি কখনোই একা কোনো সিদ্ধান্ত নিই নি। তোমাদের সবার সাথে কথা বলেছি, কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কাজেই যদি কোনো কৃতিত্ব থাকে তা হলে সেটা আমার একার নয়—আমাদের সবার।"

বিজ্ঞানী ফিদা বলল, "কিন্তু নেতৃত্বটুকু দিয়েছেন আপনি।"

মহামান্য কিহি বললেন, "যাই হোক আমি এটা নিয়ে তোমাদের সাথে তর্ক করতে চাই না। বরং তোমাদের কী জন্যে ডেকেছি সেটা নিয়ে কথা বলি।"

সবাই মাথা নেড়ে সোজা হয়ে বসে উৎসুক চোখে মহামান্য কিহির দিকে তাকাল। মহামান্য কিহি খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বললেন, "এটা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না যে মানুষ হচ্ছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষ এই পর্যায়ে এসেছে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে, তার জন্যে সময় লেগেছে লক্ষ লক্ষ বছর। সেই দুইশ হাজার বছর আগের হোমোস্যাপিয়েন বিবর্তনের ভেতর দিয়ে বর্তমান মানুষের পর্যায়ে এসেছে। এই বিবর্তনটুকু পুরোপুরি এসেছে প্রকৃতি এবং পরিবেশের প্রভাবে, স্বাভাবিকভাবে।"

মহামান্য কিহি একটু থামলেন, তিনি ঠিক কী বলতে চাইছেন বোঝার জন্য সবাই আগ্রহ নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। মহামান্য কিহি আবার শুরু করলেন, বললেন, "এই মুহূর্তে এই পৃথিবীতে মানব প্রজাতি তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থায় আছে। আমরা কি জানি, আজ থেকে এক লক্ষ বছর পর কিংবা এক মিলিয়ন বছর পর আমরা কোন পর্যায়ে থাকব? আমরা কি আমাদের মতোই থাকব নাকি অন্যরকম হয়ে যাব?"

জীববিজ্ঞানী টুহাস বললেন, "আমরা সিমুলেশন করে সেটা দেখেছি।"

মহামান্য কিহি মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ, আমি সেই সিমুলেশন দেখেছি। তোমরাও দেখেছ। আমি দেখে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি। এবং সেজন্যেই আমি তোমাদের ডেকেছি।"

মহামান্য কিহি একটু থামলেন, সবার চোখের দিকে তাকালেন এবং বললেন, "মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এখানে এসেছে কিন্তু এখন বিজ্ঞানের মহিমায় আমাদের আর বিবর্তনের ওপর নির্ভর করতে হয় না। মানুষের ভেতরে যদি কোনো পরিবর্তন আনতে হয় আমরা ইচ্ছে করলে সেটা আনতে পারি।"

জীববিজ্ঞানী টুহাস বলল, "মহামান্য কিহি! আপনি কি বলতে চাইছেন যে আমরা নিজে থেকে মানুষের ভেতরে কোনো পরিবর্তন আনি?"

"আমি সেটা সেভাবে বলতে চাইছি না। আমি তোমাদের কাছে জানতে চাইছি। বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য হিসেবে এই পৃথিবীর মানবজাতির পুরো দায়িত্ব আমাদের হাতে। ভবিষ্যতের মানুষ এই পৃথিবীতে কীভাবে থাকবে সেটা নির্ভর করে বর্তমানের মানুষকে আমরা কীভাবে ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত করি। আমি তোমাদের কাছে জানতে চাইছি পৃথিবীর মানুষ কি ভবিষ্যতের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত। মানবদেহ কি নিখুঁত?"

হঠাৎ করে সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করল, আবার প্রায় সাথে সাথেই সবাই চুপ করে গেল। জীববিজ্ঞানী টুহাস বলল, "না মহামান্য কিহি, মানবদেহ নিখুঁত নয়, এর মাঝে অনেক ত্রুটি আছে—আমরা সবাই সেটা জানি। বিবর্তনের কারণে আমাদের চোখটা ভুল, চোখের ভেতরে আলো সংবেদন কোষ নিচে, নার্ভ উপরে। অক্টোপাসের চোখ হচ্ছে সঠিক।"

বিজ্ঞানী ফিদা বলল, "তুমি চোখের কথা বলছ কিন্তু আমরা তো সাধারণত চোখের সীমাবদ্ধতাটা দৈনন্দিন জীবনে টের পাই না। যেটা টের পাই সেটার কথা বল না কেন?"

"সেটা কী?"

"নবজাতকের মাথা। তুমি জান মানবশিশুর মাথা কত বড়? একজন মায়ের গর্ভনালি দিয়ে মানবশিশু বের হতে পারে না, মায়ের সন্তান জন্ম দিতে কত কষ্ট হয় তুমি জান?"

জীববিজ্ঞানী টুহাস বলল, "আমি পুরুষ মানুষ, সন্তান জন্ম দিতে হয় না। তাই কষ্টের পরিমাণটুকু জানি না। কিন্তু বিষয়টা আমি বুঝতে পারছি।"

গণিতবিদ রিকি বলল, "বিবর্তনের কারণে মানুষ হঠাৎ করে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু হাড়ের সংযোগটা মানুষের পুরো ওজন ঠিকভাবে নিতে পারে না। দুটি পা না হয়ে চারটি পা হলে ওজনটা ঠিকভাবে নিতে পারত। মানুষের হাঁটুও খুব দুর্বল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রযুক্তিবিদ রিভিক কম কথা বলে, সে সবাইকে বাধা দিয়ে বলল, "তোমরা কেউ এপেনডিক্সের কথা কেন বলছ না? এটা শরীরের কোনো কাজে লাগে না—হঠাৎ হঠাৎ সংক্রমিত হয়ে কী ঝামেলা করে দেখেছ?"

রিভিকের কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠল, জীববিজ্ঞানী সুহাস বলল, "এটা ঝামেলা দিতে পারে কিন্তু এর গুরুত্ব কম। এর চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পুরুষ এবং মহিলার জননেন্দ্রীয় এবং এগুলো কোনোভাবেই সঠিক নয়। এর অবস্থান খুবই বিপজ্জনক!"

বিজ্ঞানী ফিদা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মহামান্য কিহি হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিলেন। মৃদু হেসে বললেন, "আমি জানি মানবদেহের ডিজাইনের অসম্পূর্ণতা নিয়ে তোমাদের সবারই অনেক কিছু বলার আছে! আমরা ইচ্ছে করলে এটা নিয়ে সারা দিন কথা বলতে পারি। কিন্তু আমি সেটা করতে চাইছি না। আমাদের কেন্দ্রীয় কম্পিউটারে মানবদেহের সীমাবদ্ধতার পুরো তালিকা রয়েছে। তোমরা এখন যা যা বলেছ সেখানে তার বাইরেও আরো অনেক বিষয় আছে। আমি তোমাদের কাছে জানতে চাইছি, আমরা কি প্রাকৃতিক বিবর্তনের ওপর ভরসা করে অপেক্ষা করে থাকব, নাকি আমরা নিজেরা মানবদেহের সীমাবদ্ধতাগুলো মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করব?"

বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যরা আবার সবাই একসাথে কথা বলতে শুরু করলেন, কিছুক্ষণের মাঝেই তারা অবশ্য থেমে গেলেন। তারপর একজন একজন করে নিজের বক্তব্য বললেন। দীর্ঘ আলোচনার পর বিজ্ঞান আকাদেমি থেকে মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে সর্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নেয়া হল। বিজ্ঞান আকাদেমি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিল মানবজাতির জিনোমে আগামী একশ বছরে খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনা হবে যেন একশ বছর পর মানবদেহে আর কোনো সীমাবদ্ধতা না থাকে। মানবদেহ হবে নিখুঁত, যেন তারা ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে অত্যন্ত সফল একটা প্রজাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারে। সিদ্ধান্ত নেবার পর মহামান্য কিহি নরম গলায় বললেন, "তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতের মানব আজকের এই সিদ্ধান্তের জন্যে তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।"

সবাই মাথা নাড়ল, বিজ্ঞানী ফিদা বলল, "আপনার নেতৃত্ব ছাড়া আমরা কখনোই এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না মহামান্য কিহি।"

*　　　　*　　　　*

বিজ্ঞান আকাদেমির মহাপরিচালকের সামনে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিচালক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মাথা তুলে বললেন, "এটি আপনি কী বলছেন মহামান্য কিহি।"

"আমি এটা ঠিকই বলছি। আমি অনেক চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" মহামান্য কিহি বললেন, "তুমি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কর।"

চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিচালক বলল, "আপনার দেহ সুস্থ এবং নীরোগ। আপনি আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন। আপনি কেন এখনই শীতলঘরে যেতে চাইছেন?"

মহামান্য কিহি বললেন, "তার দুটি কারণ। প্রথমত, আমি নূতন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে চাই। আমি দীর্ঘদিন বিজ্ঞান আকাদেমির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছি এখন অন্য কেউ করুক। দ্বিতীয়ত, আমি খুব বেশি বৃদ্ধ হয়ে অচল হবার আগেই শীতলঘরে যেতে চাই। আজ থেকে একশ বছর পর আমি জেগে উঠে পৃথিবীর মানুষকে দেখতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবদেহের সকল অসম্পূর্ণতা আর ত্রুটি দূর করার পর তারা পৃথিবীতে কীভাবে বসবাস করবে আমি সেটা নিজের চোখে দেখতে চাই।"

চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিচালক বিষণ্ন গলায় বললেন, "আপনি যদি সেটাই চান তা হলে আমরা সেটাই করব। তবে মহামান্য কিহি—পৃথিবীর মানুষ কিন্তু আপনাকে এভাবে হারাতে চাইবে না।"

মহামান্য কিহি মৃদু হেসে বললেন, "তুমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমাকে একটা শীতলঘরে রাখার ব্যবস্থা কর। আমাকে জাগিয়ে তুলবে আজ থেকে ঠিক একশ বছর পর।"

চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিচালক মাথা নুইয়ে বলল, "আপনার আদেশ আমাদের সবার জন্যে শিরোধার্য।"

*   *   *

ক্যাপসুলের ভেতর খুব ধীরে ধীরে চোখ খুললেন মহামান্য কিহি। ভেতরে আবছা এবং নীলাভ এক ধরনের আলো। মাথার কাছে কোনো একটা পোর্ট থেকে শীতল বাতাস বইছে, সেই বাতাসে এক ধরনের মিষ্টি গন্ধ। চোখের কাছাকাছি একটা প্যানেল সেখানে সবুজ আলোর একটা সংকেত, ছোট মিটারটিতে দেখাচ্ছে পৃথিবীতে এর মাঝে একশ বছর কেটে গেছে। মহামান্য কিহি শান্ত হয়ে শুয়ে রইলেন, তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুক্ষণের মাঝেই সচল হয়ে উঠবে তখন তিনি এই ক্যাপসুলের ভেতর থেকে বের হয়ে আসবেন। তিনি নিজের ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করতে থাকেন।

মহামান্য কিহি যখন ক্যাপসুল খুলে বের হয়ে এলেন তখন পৃথিবীতে সূর্য ঢলে পড়ে বিকেল নেমে এসেছে। তিনি সুরক্ষিত ঘরের ভারী দরজা খুলে বের হয়ে আসতেই বাইরের সতেজ সবুজ পৃথিবীর ঘ্রাণ অনুভব করলেন। চারপাশে বড় বড় গাছ, ঘাস উঁচু হয়ে আছে ওপরে নীল আকাশে সাদা মেঘ। তিনি কান পেতে পাখির কিচিরমিচির শব্দ শুনতে পেলেন, তার বুকের ভেতর তিনি এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করলেন, ফিসফিস করে নিজের মনে বললেন, "আহা! এই পৃথিবীটা কী অপূর্ব। সৃষ্টিকর্তা তোমাকে ধন্যবাদ, আমাকে মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে পাঠানোর জন্যে!"

মহামান্য কিহি ঘাসের উপর পা দিয়ে সামনে হেঁটে যেতে থাকেন, তাকে একটা লোকালয়, একটা জনপদ খুঁজে বের করতে হবে। পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গ মানুষকে নিজের চোখে দেখতে হবে। তার কৌতূহল আর বাঁধ মানতে চাইছে না। হঠাৎ মহামান্য কিহি এক ধরনের সতর্ক শব্দ শুনে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন—খানিকটা দূরে কয়েকটি চতুষ্পদ প্রাণী তাদের চারপায়ের ওপর ভর করে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কী বিচিত্র এই প্রাণীটি আর কী বিচিত্র তার দৃষ্টি, তাঁর সময়ে কখনো তিনি এই ধরনের কোনো প্রাণী দেখেন নি।

প্রাণীগুলো এক ধরনের হিংস্র শব্দ করতে করতে হঠাৎ চারপায়ে ভর করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং হঠাৎ করে মহামান্য কিহি বুঝতে পারেন এগুলো আসলে মানুষ। ভয়াবহ আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত তাঁর মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যায়—তাঁর ভবিষ্যতের মানুষের এটি কোন ধরনের পরিণাম? মানুষগুলো একটু কাছে এলে তিনি বুঝতে পারেন মা'দের সন্তান জন্ম দেবার কষ্ট লাঘব করার জন্যে এদের মাথা ছোট করে দেয়া হয়েছিল, সেজন্যে মস্তিষ্কের আকারও ছোট হয়েছে। এখন তারা আর বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ নয়, তারা এখন বুদ্ধিবৃত্তিহীন পশু। তারা সবাই উলঙ্গ, কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তাটুকু পর্যন্ত অনুভব করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। শরীরের ওজন সঠিকভাবে ছড়িয়ে দেবার জন্যে তারা এখন চার হাত–পায়ে ছোটাছুটি করে। বিবর্তনে মানুষ একবার দুই পায়ে দাঁড়িয়েছিল এখন উল্টো বিবর্তনে আবার তারা চার পায়ে ফিরে গেছে। মহামান্য কিহি এই মানুষগুলোর দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। তাদের ভেতরে আরো অনেক সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সেগুলো বোঝার আগেই মানুষগুলো তাঁকে ধরে ফেলল—তারা তাদের হাতগুলো এখনো ব্যবহার করতে পারে। শক্ত হাতে তাঁকে ধরে ফেলে হিংস্র শব্দ করতে করতে মানুষগুলো দাঁত দিয়ে কামড়ে তাঁর কণ্ঠনালি ছিড়ে ফেলল।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাদের চোখের দিকে একবার তাকাতে পেরেছিলেন, বোধহীন পশুর হিংস্র চোখ, কিন্তু সেগুলো ছিল নিখুঁত অক্টোপাসের চোখ।

কাবিনের জীবনের একটি দিন

কাবিনের স্ত্রী মুলান ম্লান মুখে বলল, "আমাদের কিন্তু টেনেটুনে বড় জোর এক সপ্তাহ চলবে।"

"মাত্র এক সপ্তাহ?" কাবিনের বুক কেঁপে উঠল, কিন্তু সে সেটা বুঝতে দিল না। মুখে এক ধরনের শান্তভাব বজায় রেখে বলল, "তার মাঝে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

"কীভাবে হবে?"

কাবিন জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "শুধু কি আমাদের এক সপ্তাহের মতো ব্যবস্থা আছে? আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে, সবারই এক অবস্থা। সারা পৃথিবীতে এখন এই নিয়ে হইচই হচ্ছে।"

"হইচই হয়ে কী লাভ? যদি কাজ না হয় তা হলে হইচই করে কী হবে?"

"কাজ হবে। নিশ্চয়ই কাজ হবে। সাধারণ মানুষ একবার খেপে গেলে কোনো উপায় থাকে না।"

মুলান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কিশানের মুখের দিকে তাকাতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয় কেন ছেলেটার জন্ম দিলাম।"

"নূতন করে আর কী অমঙ্গল হবে? সারা পৃথিবী জুড়েই কি অমঙ্গল হচ্ছে না?"

কাবিন কোনো কথা বলল না। মাথায় টুপিটা বসিয়ে ঘাড়ে ঝোলাটা নিয়ে মুলানের দিকে তাকিয়ে খানিকটা অন্যমনস্কভাবে হাত নেড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পথে একটু পরে পরেই মানুষের জটলা, সবার ভেতরে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ, মনে হয় একটা বিস্ফোরণের পথ খুঁজছে। পার্কের সিঁড়িতে একজন মানুষ হাত নেড়ে কথা বলছিল, তাকে ঘিরে একটা ছোট ভিড় জমে গেছে। কাবিন একটু এগিয়ে যেতেই মানুষটার গলার আওয়াজ শুনতে পেল, সে চিৎকার করে বলছে, "এই যে ভাই, তোমরা দেখেছ আমাদের অবস্থা? বিশ্বাস হয় নিজের চোখকে? আমরা এখন একদিন একদিন করে বেঁচে আছি। অন্য মানুষের লোভের মূল্য দিচ্ছি আমরা। আমি, তুমি আর অন্যেরা। কেন আমাদের তাদের লোভের জোগান দিতে হবে? কেন?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর ভেতর থেকে কয়েকজন গলা উঁচিয়ে বলল, "কেন? কেন?"

"তার কারণ আমরা সেটা হতে দিয়েছি। আমরা তাদের লম্বা জিবকে সহ্য করেছি। তোমরা বল, তোমরা কি আরো সহ্য করতে চাও? ধুঁকে ধুঁকে মরতে চাও?"

অনেকে চিৎকার করে বলল, "চাই না! চাই না!"

"যদি না চাও তা হলে কিন্তু রাস্তায় নামতে হবে।" মানুষটা হাত তুলে চিৎকার করে বলল, "বল, তোমরা রাস্তায় নামতে রাজি আছ কি না?"

অসংখ্য মানুষ চিৎকার করে বলল, "আছি। আছি।"

"চল তা হলে। সবাই মিলে যাই।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাব?"

"প্রথমে কংগ্রেস ভবনে। সেটা ঘেরাও করতে হবে। সিনেটরদের জিজ্ঞেস করতে হবে তারা আমাদের রক্ষা করবে নাকি আমরা নিজেদের রক্ষা করব?"

একজন চিৎকার করে বলল, "সিনেটররা ধ্বংস হোক।"

অসংখ্য মানুষ চিৎকার করে বলল, "ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক।"

পার্কের সিঁড়িতে আধবুড়ো একজন মানুষ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কংগ্রেস ভবন ঘেরাও করে কোনো লাভ নেই।"

"তা হলে কী ঘেরাও করতে হবে?"

"ঘেরাও করার সময় চলে গেছে।" আধবুড়ো মানুষটা হাত তুলে চিৎকার করে বলল, "এখন আমাদের ছিনিয়ে নেয়ার সময়।"

অসংখ্য মানুষ চিৎকার করে বলল, "ছিনিয়ে নাও। ছিনিয়ে নাও।"

আধবুড়ো মানুষটা উন্মত্তের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "ভাইয়েরা আমার! তোমাদের যদি বুকে বল থাকে, তা হলে চল আমরা কোম্পানি দখল করে তার মজুত করে রাখা সবকিছু লুট করে নিই।"

দেখতে দেখতে মানুষের ভিড় অনেক বেড়ে গেছে, তার ভেতর থেকে ক্রোধোন্মত্ত মানুষ হুংকার দিয়ে বলল, "ছিনিয়ে নাও! লুট করে নাও! পুড়িয়ে দাও।"

কিছু বোঝার আগেই কাবিন আবিষ্কার করল বিশাল একটা জনস্রোতের সাথে সে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষজন চিৎকার করছে, হাত-পা শূন্যে ছুড়ে বুকের ভেতর চেপে থাকা ক্রোধটি প্রকাশ করছে, সূর্যটা গনগনে হয়ে উপরে উঠছে আর তার প্রচণ্ড উত্তাপে সবার ক্রোধকে যেন শতগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। জনস্রোতটা যতই এগুতে থাকে ততই ফুলে ক্ষেপে উঠতে থাকে, পুঞ্জীভূত ক্রোধ ততই বিস্ফোরণোন্মুখ হতে থাকে।

সিনেটর কাজিস্কী টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "এরা কারা। কী করছে?"

সেক্রেটারি মেয়েটি নিচের ঠোঁটটি দাঁতে কামড়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস আটকে রেখে বলল, "পাবলিক।"

"পাবলিক? পাবলিক এমন খেপেছে কেন? কোথায় যাচ্ছে?"

"প্রথমে ঠিক করেছিল কংগ্রেস ভবন ঘেরাও করবে।"

সিনেটর কাজিস্কী চমকে উঠে বলল, "সর্বনাশ। তারপর?"

"তারপর ঠিক করেছে অক্সিরন কোম্পানি ঘেরাও করবে।"

"অক্সিরন? অক্সিরন কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সবার ধারণা অক্সিরন তাদের প্রোডাকশন কমিয়ে দিয়েছে, সবকিছু কালোবাজারিতে চলে গেছে। দাম বেড়ে আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেছে।"

সিনেটর কাজিস্কী ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু মানে ইয়ে—" বাক্যটা অসম্পূর্ণ রেখে সে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে বলল, "মানুষগুলোর হাতে লাঠিসোঁটা কেন?"

"সবাই খুব রেগে আছে।"

"রেগে আছে? রেগে আছে কেন?"

সেক্রেটারি মেয়েটি খুব কষ্ট করে মুখে স্বাভাবিক একটা ভাব ফুটিয়ে রেখে বলল, "রেগে আছে কারণ কারো বাসায় একদিনের কারো বাসায় দুদিনের—বড় জোর এক দুই সপ্তাহের সাপ্লাই আছে।"

"সাপ্লাই না থাকলে কিনে নেবে, এটা নিয়ে এত হইচই করার কী আছে?"

"কেনার পয়সা নেই। দাম আকাশছোঁয়া।"

সিনেটর কাজিস্কী তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "কী মুশকিল! এই লোকগুলো অক্সিরনে গিয়ে কী করবে?"

"ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট বলছে মানুষগুলো ঠিক করেছে অক্সিরন কোম্পানি লুট করে পুরো কোম্পানি জ্বালিয়ে দেবে।"

সিনেটর কাজিস্কী তার চেয়ারে প্রায় লাফিয়ে উঠল, "কী বলছ তুমি?"

"জি স্যার! সেইটাই রিপোর্ট।"

"সর্বনাশ! পুলিশ মিলিটারি পাঠানো হয়েছে? সিকিউরিটি ফোর্স?"

"যাচ্ছে স্যার। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঠেকানোর ক্ষমতা পুলিশ মিলিটারির নেই।"

"কেন থাকবে না? গুলি করবে। ব্রাশফায়ার করবে।"

সেক্রেটারি মেয়েটি শীতল চোখে সিনেটর কাজিস্কীর দিকে তাকিয়ে থাকে, সে নিজের ভেতরে এক ধরনের ঘৃণা অনুভব করে। বিষয়টি কারো অজানা নেই অক্সিরন কোম্পানির শেয়ারের বড় অংশের মালিক সিনেটর কাজিস্কীর পরিবার। তাই বুঝি কোম্পানিটাকে বাঁচানোর জন্যে এত সহজে মানুষকে ব্রাশফায়ারে গুলি করে মেরে ফেলার কথা বলতে পারে।

সিনেটর কাজিস্কী ছটফট করে টেলিভিশনের দিকে তাকায়, বিড়বিড় করে বলে, "কী আশ্চর্য! মানুষগুলো দেখি পশু হয়ে যাচ্ছে? একজনের চেহারা দেখেছ? কী ভয়ংকর?"

সেক্রেটারি মেয়েটি কোনো কথা বলল না। তার কথা বলার রুচি হল না।

অক্সিরন কোম্পানির সামনে সশস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষেরা পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সাঁজোয়া গাড়ির উপরে দাঁড়িয়ে একজন অফিসার মেগাফোনে চিৎকার করে বলল, "সবাইকে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে বলা হচ্ছে। এই মুহূর্তে চলে যেতে বলা হচ্ছে। কোনোরকম বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে না। বিশৃঙ্খলা সহ্য করা হবে না।"

লক্ষ লক্ষ মানুষের চিৎকারে অফিসারের কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। সমুদ্রের গর্জনের মতো মানুষেরা হুংকার দিয়ে বলল, "ধ্বংস হোক! ধ্বংস হোক! জ্বালিয়ে দাও! পুড়িয়ে দাও! ছিনিয়ে নাও—ছিনিয়ে নাও!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষেরা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, সোজাসুজি জনতার দিকে তাক করে ধরে রাখে। সূর্যের আলোতে অস্ত্রের ধাতব নলগুলো চকচক করতে থাকে।

মাথায় একটা লাল রুমাল বাঁধা মধ্যবয়স্ক মানুষ লাফিয়ে একটা গাড়ির উপরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, "সংগ্রামী বন্ধুরা আমার! তোমরা কি প্রাণ দিতে প্রস্তুত?"

হাজার হাজার মানুষ চিৎকার করে বলল, "প্রস্তুত!"

"আমরা আমাদের প্রাণ দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে নূতন একটা পৃথিবী দিয়ে যাব।"

মানুষ চিৎকার করে বলল, "দিয়ে যাব! দিয়ে যাব!"

"তা হলে সবাই প্রস্তুত হও।" মানুষটা খ্যাপার মতো হাত শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বলল, "আমরা এই মিলিটারিদের পদদলিত করে এগিয়ে যাব! তাদের গুলিতে হয়তো আমি তুমি মারা যাব, কিন্তু তারপরেও আমাদের লক্ষ লক্ষ জনতা থাকবে। তারা দেয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকে যাবে! অক্সিরনের পুরো ভবন জ্বালিয়ে দেবে। মজুদ রাখা সবকিছু ছিনিয়ে নেবে! আমরা পৃথিবীর ইতিহাস থেকে অক্সিরনের নাম চিরদিনের জন্যে মুছে দেব!"

লক্ষ লক্ষ মানুষ চিৎকার করে বলল, "মুছে দেব! মুছে দেব!"

"তোমরা প্রস্তুত? প্রাণ দিতে প্রস্তুত?"

"প্রস্তুত! প্রস্তুত!"

কাবিন হতচকিতের মতো মাথায় লাল রুমাল বাঁধা মানুষটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ঐ বিশাল জনস্রোত এক্ষুনি বাঁধভাঙা পানির মতো ছুটে যাবে, তারপর কিছু বোঝার আগেই গুলি খেয়ে শত শত মানুষ মরে যাবে। দরিদ্র দুর্ভাগা মানুষ, তাদের মৃত্যুতে কার কী এসে যাবে? দেশের বা পৃথিবীর কী ক্ষতি–বৃদ্ধি হবে? চোখের সামনে এত বড় একটা হত্যাকাণ্ড সে কেমন করে দেখবে?

কিছু বোঝার আগেই কাবিন হঠাৎ লক্ষ করল সে লাফিয়ে লাল রুমাল বাঁধা মানুষটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে সে হাত নেড়ে চিৎকার করে বলল, "প্রিয় ভাইয়েরা! আমার একটা কথা শুনো—"

মানুষেরা গর্জন করে উঠল, "কী কথা?"

"আমার বাসায় একটি অসুস্থ শিশু আছে। সে আশা করে আছে আমি সারা জীবনের জন্যে তার দুশ্চিন্তা ঘুচিয়ে দেব। তার বদলে যদি আজ বিকেলে আমার লাশ পৌঁছানো হয় সে কি খুশি হবে?"

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রুদ্ধ মানুষেরা চিৎকার করে বলল, "তুমি কী বলতে চাও?"

"সেটা বলার আগে তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"কী প্রশ্ন?"

"তোমার বাসায় কি তুমি তোমার সন্তানদের রেখে এসেছ? তোমার স্ত্রীদের রেখে এসেছ? তারা কি তোমার লাশের জন্যে অপেক্ষা করছে?"

উপস্থিত জনসমুদ্র হঠাৎ করে থমকে যায়। নিজেদের ভেতর নিচু স্বরে কথা বলতে থাকে। সেটা একটা গুঞ্জরনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। কাবিন গলা উঁচিয়ে বলল, "তোমাদের স্ত্রী আর তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের লাশের জন্যে অপেক্ষা করছে না! তুমি আমি লাশ হয়ে গেলে অক্সিরনের কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা ভেতরে ঢুকে এই কোম্পানি জ্বালিয়ে দিলেও তাদের কোনো ক্ষতি হবে না—ইন্স্যুরেন্স থেকে তারা শেষ পাই পয়সা পর্যন্ত পেয়ে যাবে। তা হলে কেন আমরা এটা করতে চাইছি? যেটা করা দরকার সেটা কেন করছি না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষ চিৎকার করে বলল, "কী করা দরকার?"

"অক্সিরনের বারোটা বাজিয়ে দেই না কেন? তাদের মেরুদণ্ড কেন ভেঙে দিই না।"

"কীভাবে ভেঙে দেব?"

"খুবই সোজা। তোমরা যারা দাঁড়িয়ে আছ সবাই হাত তুলে বল তোমরা জীবনে কখনো অক্সিরনের কিছু কিনবে না,—তোমার মুখের কথাটি উচ্চারণ করার আগে তাদের শেয়ারে ধস নামবে। এক মিনিটের ভেতর কোম্পানির লাল বাতি জ্বলে যাবে।"

সামনে দাঁড়ানো লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের ভেতর কথা বলতে থাকে। তারা পুরো ব্যাপারটা এখনো বুঝতে পারছে না। কাবিন চিৎকার করে বলল, "তোমরা যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর, তা হলে এখনই সেটা পরীক্ষা করে দেখ! হাত তুলে আমার সাথে সাথে বল, 'আমরা জীবনে অক্সিরনের কোনো কিছু কিনব না!"

লক্ষ লক্ষ মানুষ হাত তুলে বলল, "আমরা জীবনে অক্সিরনের কোনো জিনিস কিনব না।"

সিনেটর কাজিস্কী মাথার চুলে খামচে ধরে শূন্য দৃষ্টিতে সেক্রেটারি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছ? দেখছ কী হচ্ছে?"

সেক্রেটারি মেয়েটি বলল, "দেখছি। অক্সিরন কোম্পানিটা বাতাসের মতো উবে যাচ্ছে। দেখেন শেয়ারবাজারটা দেখাচ্ছে।"

সিনেটর কাজিস্কী বিড়বিড় করে বলল, "এর চাইতে অনেক ভালো ছিল যদি মানুষগুলো কোম্পানিটা জ্বালিয়ে দিত—"

সেক্রেটারি মেয়েটি কোনো কথা না বলে শীতল দৃষ্টিতে সিনেটর কাজিস্কীর দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

মুলান হাসি হাসি মুখে কাবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি টেলিভিশনে তোমাকে দেখেছি।"

তাদের ছোট ছেলে কিশান বলল, "আমিও দেখেছি।"

কাবিন ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "সবাই দেখেছে।"

মুলান বলল, "তোমার অনেক বুদ্ধি।"

"সব বুদ্ধি সব সময় কাজে লাগে না—এটা কাজে লেগেছে।"

"কোম্পানিটা শেষ হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। নিলামে বিক্রি হয়ে গেছে। নূতন ম্যানেজমেন্ট দায়িত্ব নিয়েছে। তারা আর বদমাইশি করবে না। মজুদ যা ছিল সব বিক্রি করে দিয়েছে।"

"কী মজা!"

"হ্যাঁ, আমি এক বছরের সাপ্লাই কিনে এনেছি।"

মুলান হাসি হাসি মুখে বলল, "এক বছর! এক বছর আমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না?"

"না। এক বছর আমাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না।"

ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক জেনেও কাবিন তার মুখের উপর লাগানো অক্সিজেন মাস্কটি খুলে শিশুসন্তান কিশানের গালে চুমু খেয়ে আবার মাস্কটি পরে নেয়। তাদের সবার মুখেই অক্সিজেন মাস্ক লাগানো—পৃথিবীর মানুষ পুরো বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত করে ফেলেছে। কেউ এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, দোকান থেকে অক্সিজেন কিনে সেই অক্সিজেনে নিঃশ্বাস নিতে হয়।

মানুষ আগে যেরকম খাওয়ার জন্য খাবার কিনে রাখত, এখন সেরকম নিঃশ্বাস নেবার জন্যে বাতাস কিনে রাখে।

চাঁদ

আজহার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "শালা হারামজাদা।"

সাজ্জাদ চমকে উঠে বলল, 'কী বললেন?"

"বলেছি শালা হারামজাদা।"

"কাকে বললেন?"

"চাঁদটাকে।"

আজহার আর সাজ্জাদ অফিসের কাজে এই এলাকায় এসে ছিমছাম একটা গেস্ট হাউজে উঠেছে। রাতে খাবার পর দুজনে হাঁটতে বের হয়েছে। গাছপালা ঢাকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে একটা ফাঁকা জায়গায় হাজির হতেই হঠাৎ করে থালার মতো বিশাল পূর্ণিমার চাঁদটা তাদের চোখে পড়েছে। শহরের ব্যস্ত কাজকর্মের মাঝে কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, এই নিরিবিলি এলাকায় না চাইলেও আকাশের দিকে তাকাতে হয়, চাঁদটা দেখতে হয়।

সাজ্জাদ জোছনার আলোতে আজহারের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে বলল, "আপনি চাঁদটাকে শালা হারামজাদা বলে গালি দিচ্ছেন?"

AMARBOI.COM

আজহার মুখ শক্ত করে বলল, "হ্যাঁ দিচ্ছি।"

"কেন?"

"ওই শালা হারামজাদার জন্যে আমি আমার লাইফের সবচেয়ে বড় দাওটা মারতে পারি নি। যদি মারতে পারতাম তা হলে এখন আমি ব্যাংকক সিঙ্গাপুরে ফাইভস্টার হোটেলে বিজনেস করতাম। আপনার সাথে এই পাড়াগ্রামের রেস্ট হাউজে কই মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে অন্ধকারে মশার কামড় খেতে খেতে কাদামাটিতে হাঁটতাম না।"

আজহারের কথার ভঙ্গি যথেষ্ট উদ্ধত, সাজ্জাদ সূক্ষ্মভাবে অপমানিত বোধ করল। সেটা অবিশ্যি সে বুঝতে দিল না, বলল, "কী হয়েছিল?"

"লম্বা স্টোরি।"

"বলেন শুনি।"

আজহার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তখন নূতন বিজনেস শুরু করেছি। একটা মালদার ইন্টারন্যাশনাল এনজিওকে ধরে খুব বড় একটা প্রজেক্ট বাগিয়েছি। হাওর এলাকায় উন্নয়ন—যে গ্রামগুলো আছে তার ইলেকট্রিফিকেশান, হাওরের পানিতে লাইফ সাপোর্ট, এরকম অনেক কিছু। কোনোরকম দুই নম্বুরি না করলেও নিট প্রফিট দুই কোটি টাকা। বিদেশী এনজিও একটু গাধা টাইপের হয়। একটু ভুচুং ভাচুং করে মাথায় হাত বুলালে আরো এক দেড় কোটি টাকা।"

আজহার কথা বন্ধ করে দেয়াশলাইয়ের কাঠি বের করে দাঁত খোঁচাতে থাকে। সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করল, "তারপর কী হল?"

"সব যখন ঠিকঠাক তখন কান্ট্রি ডিরেক্টর বলল জায়গাটা একবার নিজের চোখে দেখতে চায়। আমেরিকান বুড়া, মাথায় একটু ছিট আছে। আমি আর কী করি, একটা ট্রলার ভাড়া করে তাকে হাওরে নিয়ে গেছি। বর্ষাকাল হাওর পানিতে টইটম্বুর। দিনের বেলা সবকিছু দেখে ফিরে আসতে আসতে সন্ধে হয়ে গেছে। ঠিক তখন বিশাল হাওরের মাঝখানে হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন একটা চাঁদ উঠল। বিশাল একটা চাঁদ, দেখে টাসকি লেগে যাবার অবস্থা। সেই চাঁদ দেখে আমেরিকান বুড়ার মাথা পুরাপুরি আউলে গেল। সে চাঁদের দিকে তাকায় আর বুকের মাঝে থাবা দিয়ে বলল, ও মাই গড। ও মাই গড। হাউ বিউটিফুল! তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কী বলল জানেন?"

"কী?"

"বলল, এত সুন্দর জায়গা ইলেকট্রিফিকেশান করা যাবে না, প্রকৃতিকে ডিস্টার্ব করা যাবে না। এটাকে এইভাবেই রাখতে হবে। কোনোভাবে হাওরের পানিতে এই সুন্দর চাঁদের দৃশ্য নষ্ট করা যাবে না। এক কথায় পুরা প্রজেক্ট ক্যান্সেল।"

"ক্যান্সেল?"

আজহার দাঁত ঘষে বলল, "হ্যাঁ, ক্যান্সেল। ইচ্ছা হচ্ছিল শালা বুড়া ভামকে ধাক্কা মেরে হাওরের পানিতে ফেলে দিই। সাথে অন্য লোকজন ছিল তাই শেষ পর্যন্ত ফেলি নাই। তবে—"

"তবে কী?"

"বুড়া ভামকে আমি ছাড়ি নাই।"

"ছাড়েন নাই?"

"না। পরিচিত মাস্তান আছে তারে দিয়ে এমন ধোলাই দিয়েছি যে ব্যাটা জন্মের মতো সিধা হয়ে গেছে।"

সাজ্জাদ একটু ইতস্তত করে বলল, "ধোলাই? মানে মারপিট?"

"নয়তো কী? সকালে লেকের পাড়ে মর্নিং ওয়াকে বের হয় সেইখানে একলা পেয়ে আচ্ছা মতন পালিশ দেয়া হল। এক মাস হাসপাতালে তারপর সোজা দেশে ফেরত।" আজহার হা হা করে হাসল, আনন্দহীন হাসি।

সাজ্জাদ একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি তো ডেঞ্জারাস মানুষ।"

আজহার পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, "সেইটা ভুল বলেন নাই। আমি মানুষটা একটু ডেঞ্জারাস! জীবনে অকাম কুকাম কম করি নাই।"

আজহার হঠাৎ সুর পাল্টে সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা যাই হোক আপনাকে এই সব কথা বলেছি সেটা যেন দশজনকে বলে বেড়াবেন না। কথায় কথায় হঠাৎ মুখ ফসকে বের হয়ে গেল।"

সাজ্জাদ ভয়ে ভয়ে বলল, "না বলব না।"

"হ্যাঁ বলবেন না। বললে বিপদ। আমার আপনার দুই জনেরই।"

কেন দুজনেরই বিপদ সেটা সাজ্জাদ ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু সেটা নিয়ে কথা বলার সাহস করল না। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "আপনার ক্ষতি করেছে চাঁদটা। আপনার তো শোধ নেয়ার দরকার ছিল চাঁদের উপর। খামকা বুড়ো কান্ট্রি ডিরেক্টর—"

"নিচ্ছি চাঁদের উপর নিচ্ছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কীভাবে নিচ্ছেন?"

"এই যে উঠতে বসতে ব্যাটাকে শালা হারামজাদা বলে গালি দেই। কত বড় খচ্চর সেটা সবাইকে বলি।"

"খচ্চর? চাঁদ খচ্চর?"

"খচ্চর নয়তো কী? ব্যাটার নিজের কোনো আলো নেই, সূর্যের আলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে কত বড় দালালি!"

"কিন্তু কী সুন্দর চাঁদের আলো। কী নরম জোছনা—"

"কাঁচকলা।" আজহার মুখ বিকৃত করে বলল, "দুনিয়াতে কত সুন্দর রঙ আছে—লাল নীল সবুজ হলুদ, এই ভুয়া চাঁদের আলোতে কি কোনো রঙ দেখা যায়? যায় না।"

সাজ্জাদ দুর্বলভাবে বলার চেষ্টা করল, "কিন্তু সেটায় তো একটা অন্য রকম সৌন্দর্য আছে।"

"ভুয়া। ভুয়া সৌন্দর্য। চাঁদের আলোটাই ভুয়া।"

"কিন্তু আমি তো কাউকে কখনো বলতে শুনি নি চাঁদের আলো ভুয়া।"

"কেউ জানে না সেই জন্যে বলে না। সেইটাই হচ্ছে সমস্যা। আপনি জানেন চাঁদের আসল রঙ কী? জানেন?"

"কী?"

"কুচকুচে কালো। কয়লার মতো! সূর্যের আলোর শতকরা মাত্র সাত ভাগ চাঁদ ব্যাটা রিফ্লেক্ট করে। সেইটা নিয়েই শালার কত বাহাদুরি।"

আজহার ক্রুদ্ধ চোখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে, দেখে মনে হয় পারলে সে বুঝি তখনই চাঁদটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। মুখ ভেংচে বলল, "দেখেন তাকিয়ে দেখেন। এর মাঝে কোনো সৌন্দর্য আছে? গোল একটা থালার মতো। তাও যদি সুন্দর থালা হত! ফাটাফুটো থালা—দেখেছেন কেমন কালো কালো দাগ? মেছেতার মতো। ছিঃ!"

সাজ্জাদ একটু অবাক হয়ে আজহারের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ যে চাঁদ নিয়ে এরকম কিছু বলতে পারে সেটা নিজের কানে না শুনলে সে বিশ্বাস করত না।

আজহার ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "চাঁদের উল্টা পিঠটা তবু ভালো, খানাখন্দ কালো দাগ কম—ব্যাটা এমনই খবিস যে তার এই পিঠটাই আমাদের দেখাবে—কখনোই উল্টো পিঠ দেখাবে না।"

সাজ্জাদ ভুরু কুঁচকে বলল, "তাই নাকি।"

"হ্যাঁ। আমরা চাঁদের এক পিঠ সব সময়েই দেখি। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর। উল্টো পিঠ দেখতে হলে সেখানে রকেটে করে যেতে হয়।"

সাজ্জাদ মাথা নাড়ল, বলল, "ইন্টারেস্টিং।"

"চাঁদ নিয়ে খালি একটা ভালো খবর আছে। মাত্র একটা।"

"সেটা কী?"

"যতই দিন যাচ্ছে এই বদমাইশটা আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে। বছরে এক ইঞ্চির মতন। একসময় এত দূরে চলে যাবে যে তখন আর এই শালা হারামজাদাকে দেখাই যাবে না।"

"কিন্তু সে তো অনেক পরে। লক্ষ লক্ষ বছর পরে।"

"সেইটাই আফসোস। তখন বেঁচে থাকব না। যদি বেঁচে থাকতাম তা হলে গরু জবাই করে সবাইকে দাওয়াত করে খাওয়াতাম।" আজহার সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে হা হা করে হাসল, সেই হাসি দেখে সাজ্জাদ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক মাস পরের কথা। কক্সবাজারের সমুদ্রতীরে আজহার অন্যমনস্কভাবে হাঁটছে। অনেক রাত—সমুদ্রতীরে কোনো মানুষ নেই, আজহার হঠাৎ করে সেটা বুঝতে পেরে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে সে অনেকটা দূর চলে এসেছে—এখনই হোটেলে ফিরে যাওয়া দরকার। ঘুরে হাঁটতে শুরু করতেই সে দেখে দুজন মানুষ ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ করে তার বুকটা ধক করে উঠল, সে শুকনো গলায় বলল, "কে?"

একজনের হাতের টর্চ লাইটটা জ্বলে ওঠে, সরাসরি তার মুখে আলো ফেলে মানুষটা জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম আজহার।"

"হ্যাঁ। কেন? কী হয়েছে?"

"নূতন কিছু হয় নাই। তবে আগে যেটা হয়েছে সেটা তোমার থেকে ভালো করে কে জানে?"

হঠাৎ করে আজহার এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। অনেক কিছুই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, এবারে সে লোভ একটু বেশি করে ফেলেছে। অপরাধজগতের যে অলিখিত নিয়মের দাগ কাটা থাকে সে তার কোনো একটা দাগ অতিক্রম করে ফেলেছে। কোনো একজন গডফাদারের পা সে না বুঝেই মাড়িয়ে দিয়েছে।

আজহার শুকনো গলায় বলল, "ভুল হয়ে গেছে—"

"ভুল তো হয়েছেই। আবার যেন না হয় সেইটা দেখার একটা দায়িত্ব আছে না?"

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা জিজ্ঞেস করল, "ওস্তাদ, জানে মেরে ফেলব?"

"না?"

"তয়?"

"হাসপাতালে যেন কমপক্ষে এক মাস থাকতে হয় সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

শেষ মুহূর্তে আজহার দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না, মানুষ দুজন তাকে ধরে ফেলল।

সমুদ্রের বালুকাবেলায় তার কাতর চিৎকার কেউ শুনতে পেল না।

AMARBOI.COM

আজহার বালু খামচে উঠে বসার চেষ্টা করল, পারল না। আবার সে বালুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। এখান থেকে সে নিজে নড়তে পারবে না। কেউ একজন তাকে নিয়ে না গেলে সে যেতে পারবে না। গভীর রাতে নির্জন বালুকাবেলায় কে তাকে নিতে আসবে? আজহার দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করে ভোর হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করে।

ঠিক তখন সে আকাশে চাঁদটাকে দেখতে পায়। বড় থালার মতো একটা চাঁদ, আজহারের মনে হল চাঁদটা চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"হারামজাদা।" আজহার বিড়বিড় করে বলল, "শালা হারামজাদা।"

আজহারের হঠাৎ মনে হল চাঁদটা যেন তার দিকে তাকিয়ে ফিক করে একটু হেসে দিয়েছে। আজহার ভালো করে তাকাল, দুর্বল শরীরে সে এখন উল্টোপাল্টা জিনিস কল্পনা করতে শুরু করেছে?

"খুন করে ফেলব।" আজহার বিড়বিড় করে বলল, "শালা, তোকে খুন করে ফেলব!"

আজহার স্পষ্ট দেখতে পেল চাঁদটা আবার ফিক করে হেসে দিয়েছে। শুধু থেমে যায় নি, ফিসফিস করে বলছে, "তোকে আমি খুন করব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজহার চমকে উঠে বলল, "কী? কী বলছিস তুই?"

চাঁদ তার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে একদৃষ্টে আজহারের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঠিক এরকম সময় আজহার হঠাৎ করে ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পায়। সাথে সাথে সে বুঝে যায় চাঁদটা তাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছে। বালুকাবেলায় সে অসহায়ভাবে শুয়ে আছে সেই সুযোগে চাঁদটা সমুদ্রের পানিকে টেনে আনছে। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তার উপর এনে ফেলবে, লোনা পানিতে ডুবিয়ে মারবে তাকে।

আজহার হিংস্র গলায় বলল, "না। না—তুই এটা করতে পারবি না। কিছুতেই করতে পারবি না।"

চাঁদ আজহারের হিংস্র চিৎকার আর কাতর অনুনয় কিছুই শুনল না। সমুদ্রের পানি টেনে এনে আজহারকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

অনন্তকাল থেকে দিনে দুইবার সে পানিকে এভাবে টেনে আনছে। পৃথিবীর মানুষ এটার নাম দিয়েছে জোয়ার।

আজহার অবিশ্যি সেটা কখনোই বিশ্বাস করে নি।

AMARBOI.COM

প্যারামন

অধ্যাপক গ্রাউস চতুর্মাত্রিক জগতের দ্বিঘাত সমীকরণটির সমাধান বের করতে করতে হঠাৎ করে থেমে গেলেন, তিনি মাথা ঘুরিয়ে তার ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, "তোমরা বলতে পারবে মানুষ পৃথিবীর অন্য জীবিত প্রাণী থেকে কোন দিক দিয়ে ভিন্ন?"

চতুর্মাত্রিক জগতের দ্বিঘাত সমীকরণের সাথে এই প্রশ্নটির কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু তার ছাত্রছাত্রীরা সেটা নিয়ে মোটেও অবাক হল না। আপনভুলো এই বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্লাসে পড়াতে পড়াতে মাঝে মাঝেই এরকম আনমনা হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছুতে চলে যান। সেই ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে প্রায় সময়েই ক্লাসের সময় পার হয়ে যায়—আপনভুলো অধ্যাপকের সেটাও মনে থাকে না।

অধ্যাপক গ্রাউসের প্রশ্ন শুনে ছাত্রছাত্রীরা তাদের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। সামনের দিকে বসে থাকা চটুল ধরনের ছাত্রীটি বলল, "চেহারা। অবশ্যই চেহারা। অন্য সব প্রাণীদের থেকে মানুষ দেখতে ভালো।"

অধ্যাপক গ্রাউস হাসিমুখে বললেন, "চেহারাটা আপেক্ষিক। আমাদের সবার চেহারা যদি বানরের মতো হত তা হলে সেটাকেই আমাদের ভালো মনে হত!"

দার্শনিক ধরনের একজন বলল, "একজন মানুষ যদি ভালো হয় তা হলে তার চেহারা খারাপ হলেও তাকে দেখতে ভালো লাগে।"

অনেকেই তার কথায় সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়তে থাকে এবং আলোচনাটা মানুষের ভালোমন্দের দিকে ঘুরে যাবার উপক্রম হয়। প্রফেসর গ্রাউস আবার সবাইকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থামালেন, বললেন, "আমি জানতে চাইছি—মানুষ কেমন করে অন্য প্রাণীদের থেকে ভিন্ন।"

পিছনের দিকে বসে থাকা একজন বলল, "ভাষা। মানুষের ভাষা আছে অন্য কোনো প্রাণীর ভাষা নেই।"

প্রফেসর গ্রাউস মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ। তুমি এটা ঠিকই বলেছ। অন্যান্য প্রাণীদের কারো কারো খুব সহজ কিছু তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা আছে—কিন্তু মানুষের মতো কারো নেই। মানুষের ভাষা অত্যন্ত উঁচু মানের।"

মাঝামাঝি বসে থাকা একজন ছাত্রী বলল, "পশুপ্রাণীর ভাষা খুব সহজ তথ্য বিনিময়ের জন্যে ব্যবহার হয়—নিরাপত্তার জন্যে বংশবিস্তারের জন্যে—"

এবারে অনেকেই পশুপাখির তথ্য বিনিময় নিয়ে কথা বলতে শুরু করে এবং আলোচনাটা আবার অন্য দিকে ঘুরে যাবার উপক্রম হয়। প্রফেসর গ্রাউস সবাইকে থামালেন, বললেন, "আমি পশুপাখির ভাষা নিয়ে আলোচনায় যেতে চাই না—আমি জানতে চাই মানুষ কোন দিক দিয়ে পশুপাখি থেকে ভিন্ন। অন্য জীবিত প্রাণী থেকে ভিন্ন।"

কঠোর চেহারার একজন বলল, "অন্য সকল জীবিত প্রাণী থেকে মানুষ অনেক বেশি নিষ্ঠুর। অন্য জীবিত প্রাণী কোনো প্রয়োজন না হলে একে অন্যকে হত্যা করে না, মানুষ প্রয়োজন ছাড়াও হত্যা করে। নিষ্ঠুরতা দেখায়। পশুতে পশুতে কখনো যুদ্ধ হয় না—মানুষে মানুষে যুদ্ধ হয়।"

প্রফেসর গ্রাউস কঠোর চেহারার এই তরুণের কঠিন কথাগুলো শুনে কিছুক্ষণের জন্যে আনমনা হয়ে গেলেন। একটা নিঃশ্বাস ফেললেন এবং বললেন, "তোমার কথার মাঝে খানিকটা সত্যতা আছে কিন্তু আমার মনে হয় তুমি মানুষকে একটু বেশি কঠোরভাবে বিচার করছ। মূল মানবগোষ্ঠী নিষ্ঠুর নয়—তার একটা বিচ্ছিন্ন অংশ নিষ্ঠুর। আমার ধারণা সেই মানুষগুলোকে বিশ্লেষণ করলে তার কারণটি বের হয়ে যাবে।"

AMARBOI.COM

কঠোর চেহারার তরুণটি প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার পাশে বসে থাকা কালো চুলের মেয়েটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "প্রাণীদের সবাই বেঁচে থাকে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে। মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে না—মানুষ বেঁচে থাকার জন্যে তাদের শিখে থাকা জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে।"

প্রফেসর গ্রাউস সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় মানুষের ভেতরে তার সহজাত প্রবৃত্তি কতটুকু রয়ে গেছে সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পারলে মন্দ হত না!"

কালো চুলের মেয়েটি বলল, "সেটি কেমন করে দেখা যাবে?"

প্রফেসর গ্রাউস বললেন, "সেটি দেখার সহজ কোনো উপায় নেই। আমরা মানুষের যে সমাজে বাস করি সেই সমাজ কখনোই একজনকে শুধু সহজাত প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার মতো কাজে ঠেলে দেবে না।"

প্রফেসর গ্রাউস অন্যমনস্কভাবে টেবিলে তার আঙুল দিয়ে শব্দ করছিলেন, তখন অস্থির ধরনের ছটফটে একজন তরুণী বলল, "প্রফেসর গ্রাউস। আপনি কীভাবে একজন মানুষকে অন্য জীবিত প্রাণী থেকে আলাদা করেন?"

"আমি?"

ছটফটে তরুণীটি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। আপনি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রফেসর গ্রাউস হাসার ভঙ্গি করে বললেন, "আমি চতুর্মাত্রিক জগতের গণিত পড়াই, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব ভালো জানি না। তোমাদের থেকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বেশি জানি বলে মনে হয় না। তবে আমার ধারণা—"

ধারণাটা কী না বলে প্রফেসর গ্রাউস চুপ করে অনেকটা আপনমনে চিন্তা করতে থাকেন। ছাত্রছাত্রীরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে এবং প্রফেসর গ্রাউস একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমার ধারণা মানুষ একমাত্র প্রাণী যে তার জ্ঞানটুকু মস্তিষ্কের বাইরেও রাখতে পারে।"

প্রফেসর গ্রাউস ঠিক কী বলছেন বুঝতে না পেরে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই একটু ভুরু কুঁচকে তাকাল। প্রফেসর গ্রাউস বললেন, "অন্য সব প্রাণীর বুদ্ধিমত্তাই থাকে তাদের মস্তিষ্কে। আমাদের বেলায় সেটা সত্যি নয়। আমরা যখন কিছু একটা জানি সেটা বইপত্রে লিখে রাখতে পারি। যার মস্তিষ্কে সেই জ্ঞানটুকু নেই সে বই থেকে সেটা শিখে নিতে পারে। কাজেই বলা যেতে পারে মানুষের কার্যকর মস্তিষ্ক শুধু তার মাথার করোটির মাঝে নেই সেটা বইপত্র লাইব্রেরি জার্নালে ছড়িয়ে আছে। একটি বানর এক গাছের ডাল থেকে অন্য গাছের ডালে লাফ দেবার সময় তার নিজের মস্তিষ্কের ভেতরের তথ্য কিংবা জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। মানুষকে একটা ডাল থেকে অন্য ডালে লাফ দিতে হলে সে সেটা নিয়ে পড়াশোনা করতে পারে। নিউটনের সূত্র পড়ে সে ইচ্ছে করলে নিজের নিরাপত্তার জন্যে লাফ নাও দিতে পারে।"

ধারালো চেহারার লাল চুলের একটা মেয়ে হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, "অধ্যাপক গ্রাউস—এই ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে অনেক ভালো মনে হয়। আপনি কি মনে করেন এর মাঝে কোনো বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে?"

অধ্যাপক গ্রাউস মাথা নেড়ে বললেন, "আমি খুবই খুশি হয়েছি যে তুমি এই প্রশ্নটা করেছ। আমি তোমাকে এই প্রশ্নটা করি, দেখি তুমি কী উত্তর দাও।"

মেয়েটি ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "আমি তো কোনো বিপদ লুকিয়ে থাকতে দেখছি না। আমাদের আগের প্রজন্ম আমাদের বয়সে যেটুকু জানত আমরা সেই একই বয়সে তাদের থেকে অনেক বেশি জানি। আমাদের আগের প্রজন্মের যেটুকু বিশ্লেষণী ক্ষমতা ছিল আমাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা তার থেকে অনেক বেশি। সারা পৃথিবী জোড়া নেটওয়ার্কে যে তথ্য আছে আমরা চোখের পলকে সেটা পেতে পারি, বিশ্লেষণ করতে পরি, আমাদের কাজে ব্যবহার করতে পারি। প্রফেসর গ্রাউস আমি এর মাঝে কোনো বিপদ দেখতে পাই না।"

প্রফেসর গ্রাউস একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি পাই।"

ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই এবারে সোজা হয়ে বসল, বসে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রফেসর গ্রাউসের দিকে তাকাল তার কথা শোনার জন্যে। প্রফেসর গ্রাউস নিচু গলায় বললেন, "আমরা যদি ধরে নিই আমাদের মস্তিষ্ক দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগ আমাদের মাথার ভেতরে দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে পৃথিবীর লাইব্রেরি, জার্নাল কিংবা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নেটওয়ার্ক, তা হলে আমরা দেখব যতই দিন যাচ্ছে আমরা মস্তিষ্কের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ বাইরের অংশটুকুতে—লাইব্রেরি, জার্নাল কিংবা নেটওয়ার্কে অনেক বেশি নির্ভর করতে শুরু করেছি। বাইরের জগৎ থেকে তথ্য নেয়া কিংবা সেই তথ্য বিশ্লেষণ করা যতই সহজ হয়ে যাচ্ছে দশ বিলিয়ন নিউরনের আমাদের এই মস্তিষ্কটাকে ততই আমরা কম করে ব্যবহার করছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রফেসর গ্রাউস একটু থামতেই ধারালো চেহারার মেয়েটি বলল, "কিন্তু আমরা যদি এই পদ্ধতিতেই আগের চাইতে বেশি সৃষ্টিশীল হতে পারি তা হলে কি সমস্যা আছে?"

প্রফেসর গ্রাউস মাথা নাড়লেন, বললেন, "না নেই। কিন্তু—"

প্রফেসর গ্রাউস আবার থেমে গেলেন এবং তার ছাত্রছাত্রীরা ধৈর্য ধরে তার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রফেসর গ্রাউস বললেন, "এখন পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তাটুকু আমাদের মস্তিষ্কে, বাইরের জগতে আছে তথ্য। বাইরের জগতে যেটুকু বুদ্ধিমত্তা আছে সেটা তুচ্ছ। কিন্তু এই তুচ্ছ বুদ্ধিমত্তা যদি কোনোভাবে বিকশিত হয়ে উঠে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে আমরা খুবই অসহায় হয়ে পড়ব।"

ধারালো চেহারার লাল চুলের মেয়েটি তার জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "সেটা কি কখনো হতে পারে?"

প্রফেসর গ্রাউস মাথা নাড়লেন, বললেন, "আমি জানি না।"

* * *

নিউলাইট কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর উপস্থিত সব ডিরেক্টরদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আজ আপনাদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবার জন্যে ডেকেছি।"

ডিরেক্টরদের সবাই বয়স্ক, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথায় নড়েচড়ে এক কোনায় বসে থাকা লাল চুলের মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েদের বয়স সব সময় অনুমান করা যায় না, এই মেয়েটিরও বয়স অনুমান করা সম্ভব নয়—ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের ভেতর যে কোনো একটা বয়স হতে পারে। এই মেয়েটি ডিরেক্টরদের কেউ নয়, কোম্পানির একজন সাধারণ গবেষক, ম্যানেজিং ডিরেক্টর যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি দেবে তার সাথে এই মেয়েটির নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা আছে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাত তুলে মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, "গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি দেবার আগে আমি আপনাদের সাথে আমাদের গবেষক লানার পরিচয় করিয়ে দিই।"

লানা তার জায়গায় বসে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে হাত নাড়ল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলল, "আজ থেকে সাত বছর আগে লানা আমার কাছে গবেষণার একটি বিষয় নিয়ে এসেছিল। আমার কাছে কখনো কোনো গবেষক সরাসরি আসে না। কিন্তু লানা এসেছিল তার কারণ তার ডিপার্টমেন্ট তার গবেষণার প্রস্তাবটি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিল।"

ম্যানেজিং ডিরেক্টর একটু হেসে বলল, "আমারও সেই প্রস্তাবটি সরাসরি নাকচ করে দেয়া উচিত ছিল, কারণ প্রস্তাবটি ছিল অত্যন্ত উদ্ভট, আজগুবি এবং বিপজ্জনক। ঠিক কী কারণে জানি না আমি সেই উদ্ভট আজগুবি আর বিপজ্জনক প্রস্তাবটি অনুমোদন করে দিয়েছিলাম। লানা অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিশ্রমী গবেষক, গবেষণা কাজের নেতৃত্ব দিতেও তার কোনো তুলনা নেই। চার বছরের মাথায় সে প্রথম প্রটোপাইপ তৈরি করেছে। ছয় বছরে ফিল্ড টেস্ট শেষ করেছে এবং এই সপ্তম বছরে তার একটা বাণিজ্যিক মডেল তৈরি হয়েছে। আমরা বাণিজ্যিক মডেলটি বাজারে ছাড়ার জন্যে প্রস্তুত এবং আজকে আপনাদের সবাইকে ডেকেছি তার ঘোষণাটি দেয়ার জন্যে।"

সবচেয়ে বয়স্ক ডিরেক্টর খনখনে গলায় বলল, "তুমি তো দেখি এক ধরনের হেঁয়ালি ভরা কথা বলছ। কী মডেল কীসের মডেল কিছুই তো বুঝতে পারলাম না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাসি হাসি মুখে বলল, "সেটা আপনাদের জানানোর জন্যে আজকে এখানে লানা এসেছে।" ম্যানেজিং ডিরেক্টর লানার দিকে তাকিয়ে বলল, "লানা। তুমি বল।"

লানা উঠে দাঁড়িয়ে হলোগ্রাফিক প্রজেক্টরটা চালু করে বলল, "আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমাদের গণিতের একজন প্রফেসর ছিলেন, তার নাম প্রফেসর গ্রাউস। একদিন ক্লাসে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন মানুষের মাঝে অন্য প্রাণীর পার্থক্য কোথায় আমরা সেটা জানি কি না। আমরা সবাই আমাদের মতো করে উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলাম—প্রফেসর গ্রাউস সেগুলো পুরোপুরি মানতে রাজি নন। তিনি বলেছিলেন মানুষের সাথে অন্য প্রাণীর পার্থক্য তার মস্তিষ্কের ব্যাপ্তিতে। অন্য সব প্রাণীর মস্তিষ্ক তার করোটিতে। মানুষের মস্তিষ্কের একটা অংশ তার করোটিতে বাকিটুকু বাইরের জগতে, নেটওয়ার্কে।"

উপস্থিত ডিরেক্টরদের সবাই নিজেদের ভেতরে মৃদুস্বরে কথা বলতে শুরু করে। লানা বলল, "আপনারা কেউ কি অস্বীকার করতে পারবেন, বাইরের নেটওয়ার্কের তথ্য ছাড়া আমরা কেউ এক মুহূর্ত বেঁচে থাকতে পারি না। এখন কয়টা বাজে? আজ কোথায় যেতে হবে? কীভাবে যেতে হবে? কী খাব? কী করব? কার সাথে কথা বলব? শরীর কি ভালো আছে? ভালো না থাকলে কেন ভালো নেই? কোথায় জানাব? কীভাবে চিকিৎসা করাব? এরকম সব প্রশ্নের উত্তরের জন্যে আমাদের নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভর করতে হয়।" লানা এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে একটু থেমে যোগ করল, "আজকে যদি আপনাদের বলা হয় নেটওয়ার্কের সাহায্য না নিয়ে আপনাদের একটা দিন কাটাতে হবে—সারা পৃথিবীর একজন মানুষও সেটি পারবে না।"

ডিরেক্টরদের বেশিরভাগই নিজের অজান্তেই মাথা নাড়ে। লানা তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা ক্রমাগত তথ্যটুকু নেই নেটওয়ার্ক থেকে, সেগুলো বিশ্লেষণ করাই নেটওয়ার্ককে দিয়ে, সেগুলো ব্যবহার করি নেটওয়ার্ককে দিয়ে কিন্তু সেটা করতে হয় কোনো এক ধরনের ইন্টারফেসিং মডিউল দিয়ে। সেটা চোখ দিয়ে দেখতে হয় কান দিয়ে শুনতে হয়, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়। আমি তখন নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম যদি আমাদের জীবন পৃথিবীর নেটওয়ার্কের সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে থাকে যে এটা আসলে মস্তিষ্কের একটা অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তা হলে কেন আমরা সত্যি সত্যি নেটওয়ার্ককে মস্তিষ্কের অংশ তৈরি করে ফেলি না?"

বয়স্ক ডিরেক্টর খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী বলতে চাইছ? কীভাবে নেটওয়ার্ককে মস্তিষ্কের অংশ করে ফেলবে?"

লানা ভিডিও প্রজেক্টরে স্পর্শ করতেই পেছনের ত্রিমাত্রিক একটা যন্ত্রের ছবি ভেসে উঠল এবং সেটা ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। লানা হাত দিয়ে সেটাকে স্পর্শ করে বলল, "এই যন্ত্রটা দিয়ে। আপনাদের এটা বড় করে দেখানো হয়েছে। আসলে এটা খুবই ছোট, মাথার চামড়ার নিচে ঠিক করোটির উপর বায়ো গ্লু দিয়ে আটকে দেয়া যায়। পুরো অপারেশন শেষ করতে সময় নেয় দশ মিনিট, মাথার চামড়ার ক্ষত সারতে সময় নেয় চব্বিশ ঘণ্টা। যন্ত্রটি চালু হয় এক সপ্তাহ পরে খুব ধীরে ধীরে। কয়েক সপ্তাহ পর যখন এটা পুরোপুরি চালু হয়ে যায় তখন মানুষের মস্তিষ্ক সরাসরি নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।"

বৃদ্ধ ডিরেক্টর আবার তার খনখনে গলায় বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কী বলছ!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লানা বলল, "আমি একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন আপনার মাথায় আমরা এই যন্ত্রটা লাগিয়েছি। কাজেই আপনি এখন সরাসরি নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন— আপনার মস্তিষ্ক যেটা করবে আপনি সেটা জানতেও পারবেন না। ধরা যাক আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করবেন কিন্তু তার ভিডি ফোনের নম্বর মনে করতে পারছেন না। আগে আপনাকে ইন্টারফেস খুলে নেটওয়ার্ক থেকে নম্বরটি নিতে হত। এখন আপনি বুঝতেও পারবেন না কিন্তু আপনার মস্তিষ্ক নেটওয়ার্ক থেকে নম্বরটি নিয়ে আসবে—আপনি দেখবেন হঠাৎ করে নম্বরটি আপনি জেনে গেছেন!"

তুলনামূলকভাবে কম বয়সী একজন ডিরেক্টর অবিশ্বাসের গলায় বলল, "আমি এটা বিশ্বাস করি না।"

লানা বলল, "বিশ্বাস করার কথা নয়। কিন্তু এটা সত্যি। আমরা ফিল্ড টেস্ট করেছি। কয়েক হাজার মানুষের ওপরে পরীক্ষা করা হয়েছে।"

"স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরীক্ষা করতে দিয়েছে?"

"না, প্রথমে দেয় নাই।"

"তা হলে?"

"আমরা দরিদ্র দেশে গিয়ে সেই দেশের মানুষকে দিয়ে পরীক্ষা করেছি। পরীক্ষার ফলাফল দেখার পর আমাদের শেষ পর্যন্ত এই দেশে পরীক্ষার অনুমতি দিয়েছে। আমরা তখন আমাদের দেশেও তার ফিল্ড টেস্ট করেছি।"

"কী দেখেছ?"

"সেটা আমি নিজে না বলে সরাসরি দেখাতে চাই। মাথায় এই যন্ত্রটি বসানো হয়েছে এরকম একজন মেয়েকে আমি আপনাদের সামনে আনব। আপনারা তার সাথে কথা বলুন।"

লানা ইঙ্গিত করতেই দরজা খুলে সোনালি চুলের একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ে ঘরে এসে ঢুকল, লানা হাত নেড়ে ডাকল, "ত্রিনা, এদিকে এস।"

ত্রিনা নামের মেয়েটা লানার কাছে এগিয়ে আসে। লানা মেয়েটার পিঠে হাত রেখে বলল, "এ হচ্ছে ত্রিনা। ঠিক ছয় সপ্তাহ আগে তার মাথায় এই যন্ত্রটা বসানো হয়েছে। আমরা তাকে অভ্যস্ত হওয়ার জন্যে দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছি। এখন তার মস্তিষ্ক সব সময়েই নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত। আপনারা তাকে যেভাবে খুশি প্রশ্ন করতে পারেন।"

বুড়ো ডিরেক্টর খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করল, "এই মেয়ে, বল দেখি আমার স্ত্রী কী করে?"

মেয়েটি বুড়ো ডিরেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার স্ত্রী নেই। দুই বছর আগে মারা গেছেন।"

"বড় ছেলের নাম কী?"

"ক্লাড। একজন শিল্পী।"

একজন মহিলা ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করল, "পরের মহাকাশ ফ্লাইট কবে আছে?"

"মঙ্গলবার। দুপুর তিনটা চৌত্রিশ মিনিট।"

"এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর কী?"

"তাতিস্কার প্রেসিডেন্টকে এই মাত্র গুলি করে মেরে ফেলেছে।"

"মেরে ফেলেছে নাকি? সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।"

মধ্যবয়স্ক একজন বলল, "পাইয়ের এক হাজার চারশত পঁচানব্বইতম সংখ্যাটি কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"চার। তারপর এক নয় সাত তিন পাঁচ।"

মানুষটি বিস্ময়ে শিস দেয়ার মতো একটা শব্দ করল, অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেমন করে এটা করছ?"

মেয়েটা হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আমি কিছুই করছি না। আমি শুধু আপনাদের প্রশ্নটার উত্তর কী হতে পারে সেটা চিন্তা করছি—এবং সাথে সাথে উত্তরটা জেনে যাচ্ছি। কীভাবে হচ্ছে সেটা আমি জানি কারণ সেটা আমাকে বলা হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা যখন ঘটছে আমি বুঝতেও পারছি না। এটা করা হচ্ছে আমার অজান্তে।"

"অবিশ্বাস্য।" অতি উৎসাহী একজন ডিরেক্টর হাততালি দিয়ে বলল, "অবিশ্বাস্য!"

লানা জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি ত্রিনাকে আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে চান?"

ডিরেক্টরদের কয়েকজন মাথা নেড়ে বলল, "না। আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই।"

লানা ত্রিনাকে বিদায় দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি আর কিছু জানতে চান?"

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলল, "না। আপাতত কিছু জানতে চাই না। তুমি বস।" সে ডিরেক্টরদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা এই মাসের শেষ থেকে এই যন্ত্রটি বাজারজাত করব। আমরা এর নাম দিয়েছি প্যারামন। প্যারামনকে নিয়ে চমৎকার কিছু বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয়েছে আমি সেগুলোও আপনাদের দেখাব। আমার ধারণা প্রথম এক বছরে আমরা এক বিলিয়ন প্যারামন বিক্রি করতে পারব।"

উপস্থিত ডিরেক্টররা আবার শিস দেয়ার মতো একটা শব্দ করল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলল, "এই হিসেবটি অত্যন্ত সতর্ক হিসেব। প্রকৃত সংখ্যাটি আরো অনেক বেশি হওয়ার কথা। আমার ধারণা আগামী পাঁচ বছরে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ এটা তাদের মাথায় লাগিয়ে নেবে। আমরা সারা পৃথিবীতে একটা অসাধারণ বিপ্লব দেখার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।"

বৃদ্ধ ডিরেক্টর লানার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মেয়ে। তুমি এরকম একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছ, তোমার নিশ্চয়ই খুব গর্ব হচ্ছে?"

লানা মাথা নেড়ে বলল, "না।"

বৃদ্ধ ডিরেক্টর অবাক হয়ে বলল, "কেন না?"

"আমি আমার যন্ত্রের এই মডেলটি নিয়ে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। প্রফেসর গ্রাউসের অনেক বয়স হয়েছে একটা ক্লিনিকে আছেন। কাউকে চিনতে পারেন না। আমি আমার যন্ত্রটির কথা তাকে বলেছি। তখন তিনি—"

লানা থেমে গেল। বৃদ্ধ ডিরেক্টর বলল, "তখন তিনি কী?"

লানা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "প্রফেসর গ্রাউস খপ করে আমার হাত ধরে বললেন, 'না-না-না। তুমি এটা কিছুতেই বাজারজাত কোরো না।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' প্রফেসর গ্রাউস বিড়বিড় করে বললেন, 'তা হলে মানুষ এই যন্ত্রটার ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে। নিজের মস্তিষ্ক ব্যবহার করবে না। মানুষের সৃজনশীলতা নষ্ট হয়ে যাবে।' আমি বললাম, 'আমরা তো এখনো বাইরের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করছি—এখন কি আমাদের সৃজনশীলতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?' প্রফেসর গ্রাউস বললেন, 'এখন বাইরের নেটওয়ার্ক আমাদের সাহায্যকারী। তোমার যন্ত্র ব্যবহার করা হলে মূল মস্তিষ্ক হয়ে যাবে সাহায্যকারী আর নেটওয়ার্কটাই হবে আমাদের মূল মস্তিষ্ক'।"

লানা একটু থেমে বলল, "আমি বাসায় ফিরে এসে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছি। চিন্তা করে দেখেছি প্রফেসর গ্রাউস আসলে ঠিকই বলেছেন। এই প্যারামন আমাদের মস্তিষ্ককে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে অকেজো করে দেবে—আমরা নেটওয়ার্কের ওপর এত নির্ভরশীল হয়ে যাব যে নিজের মস্তিষ্ক আর ব্যবহার করব না।"

বৃদ্ধ ডিরেক্টর সরু চোখে লানার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"আমি প্যারামন বাজারজাত করতে চাই না।"

ম্যানেজিং ডিরেক্টর হা হা করে হেসে বলল, "এটা বাজারজাত করা হবে কি হবে না সেটা তোমার সিদ্ধান্ত নয় লানা। সেটা কোম্পানির সিদ্ধান্ত। তুমি কোম্পানির গবেষক হিসেবে তোমার কাজ করেছ। আমরা কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে আমাদের কাজ করব।"

লানা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু আমি তবু আপনাদের কাছে কাতর গলায় অনুরোধ করতে চাই, প্যারামন বাজারজাত করবেন না। এটা বিজ্ঞানের একটা ছোট আবিষ্কার হিসেবে থাকুক। ল্যাবরেটরিতে এর প্রভাব নিয়ে গবেষণা হোক, কিন্তু পুরো মানবজাতিকে টার্গেট করে প্যারামনকে বাজারজাত করবেন না। দোহাই আপনাদের।"

মধ্যবয়স্ক একজন ডিরেক্টর লানার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি একজন বুড়ো প্রফেসরের কথায় পুরো বিষয়টাকে নেতিবাচক হিসেবে দেখতে শুরু করেছ। আমরা এতজন ডিরেক্টর এটাকে মোটেও নেতিবাচক হিসেবে দেখছি না। আমরা মনে করি প্যারামন আমাদের মানসিক জগতে একটা যুগান্তকারী বিপ্লব বয়ে আনবে। আমরা সাধারণ মানুষও অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠব।"

লানা বলল, "মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অসাধারণ হয়ে উঠুক। আমি কৃত্রিমভাবে জোর করে তাদের অসাধারণ হতে দিতে চাই না।"

বৃদ্ধ ডিরেক্টর খনখনে গলায় বলল, "সেই বিষয়টি তোমার আগে চিন্তা করা উচিত ছিল মেয়ে। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তীর তোমার হাতের ধনুক থেকে ছুটে গেছে, এখন সেই তীরকে তোমার হাতে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

লানা অসহায়ভাবে নিউলাইট কোম্পানির বয়স্ক ডিরেক্টরদের দিকে তাকিয়ে রইল।

AMARBOI.COM

* * *

অ্যালার্মের শব্দ শুনে গভীর রাতে ফায়ার ব্রিগেডের চিফ মিশি ঘুম থেকে উঠে বসে। শহরের কোথাও আগুন লেগেছে। মিশি জানালার কাছে এসে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকায়, শহরের দক্ষিণ দিকে আগুনের লাল আভা, মাঝে মাঝে আগুনের শিখাটিও দেখা যাচ্ছে। বছরের এই সময়টা শুকনো সময়, প্রতি বছরই বেশ কয়েকটা ছোটখাটো এবং অন্তত একটা বড় অগ্নিকাণ্ড হয়। মনে হচ্ছে এটা এ বছরের বড় অগ্নিকাণ্ড—মিশি আগুনের লাল আভাটির দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। দক্ষিণের ইউনিটগুলোকে এখনই চালু করে আগুনের কাছে পাঠাতে হবে।

মিশি ইউনিটগুলোর জরুরি সংকেতটি ব্যবহার করতে গিয়ে হঠাৎ করে আবিষ্কার করে যে জরুরি সংকেতটি মনে করতে পারছে না। কয়েকবার চেষ্টা করেও মনে করতে না পেরে মিশি হঠাৎ করে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। তার কী হয়েছে? কেন সে এই অতি সাধারণ সংকেতটি মনে করতে পারছে না? মিশি তার ডেপুটির যোগাযোগ সংকেতটিও মনে করতে পারল না। কী আশ্চর্য!

মিশির স্ত্রী ঘুম থেকে উঠে ঘুম ঘুম চোখে মিশির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি মাঝরাতে ঘরের মাঝখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

"দক্ষিণে আগুন লেগেছে। কিন্তু কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমি ইউনিটের জরুরি সংকেত মনে করতে পারছি না।"

"মনে করতে পারছ না? কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। ডেপুটির নাম্বারও মনে করতে পারছি না। নিরাপত্তা বাহিনী কেন্দ্রীয় যোগাযোগ—কিছুই মনে করতে পারছি না।"

মিশির স্ত্রী ভীত চোখে বলল, "কী বলছ তুমি? কী হয়েছে তোমার?"

"জানি না। আমি কিছুই মনে করতে পারছি না।"

মিশির স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে বলল, "দাঁড়াও দাঁড়াও—তুমি আগেই এত ঘাবড়ে যেও না। আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলি।"

এক মুহূর্ত পর মিশির স্ত্রী শূন্য দৃষ্টিতে মিশির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! আমিও কিছু মনে করতে পারছি না।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।" মিশির স্ত্রী বলল, "শুধু ডাক্তারের নম্বর নয় কারো নম্বর মনে করতে পারছি না।"

মিশি কাছাকাছি একটা চেয়ারে ধপ করে বসে বলল, "তার মানে বুঝতে পারছ?"

"কী?"

"নেটওয়ার্ক ফেল করেছে।"

"নেটওয়ার্ক ফেল করেছে!" মিশির স্ত্রী আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করে উঠল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। তা না হলে এতক্ষণে ওই আগুন নিভিয়ে দেয়ার কাজ শুরু হয়ে যেত।"

"কী হবে এখন?"

মিশি কিছু বলার আগেই হঠাৎ করে ঘরের আলো নিভে গেল। মিশির স্ত্রী একটা চাপা আর্তনাদ করে মিশিকে আঁকড়ে ধরল। জানালা দিয়ে আগুনের লাল আভা ঘরের দেয়ালে বিচিত্র প্রায় অলৌকিক এক ধরনের আলো ছায়া তৈরি করেছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে মিশি চাপা গলায় বলল, "আমাদের পৃথিবী মনে হয় এভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে।"

বাইরে তখন অসংখ্য অসহায় মানুষের কোলাহল শোনা যেতে থাকে।

*　　*　　*

রাষ্ট্রপ্রধান শুকনো মুখে বিজ্ঞান আকাদেমির প্রধান প্রফেসর তাকিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কী হবে প্রফেসর তাকিতা?"

প্রফেসর তাকিতা মাথা নেড়ে বললেন, "আমি জানি না।"

রাষ্ট্রপ্রধান ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, "আপনি আমাদের বিজ্ঞান আকাদেমির প্রধান; আপনি বলতে পারেন না যে আমি জানি না।"

"পারি মহামান্য রাষ্ট্রপতি।" প্রফেসর তাকিতা শুকনো গলায় বললেন, "আমি বিজ্ঞান আকাদেমির প্রধান কারণ নেটওয়ার্কের বিজ্ঞান বিষয়ের সকল তথ্যে আমার অধিকার ছিল সবচেয়ে বেশি। এখন নেটওয়ার্ক নেই এখন আমার ভেতরে আর আপনার রান্নাঘরের বাবুর্চির ভেতরে খুব একটা পার্থক্য নেই।" প্রফেসর তাকিতা তার হাতের কাগজটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রপ্রধানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই দেখেন আমি বেশ কিছুক্ষণ থেকে চার অঙ্কের একটা সংখ্যার বর্গমূল বের করার চেষ্টা করছি। পারছি না। আমার মস্তিষ্ক নেটওয়ার্কের সাহায্য নিতে নিতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে এখন আমি এই তুচ্ছ সমস্যাটাও নিজে সমাধান করতে পারছি না।"

"তার মানে কী?"

"তার মানে হচ্ছে যদি নেটওয়ার্ক আবার চালু না করা যায় তা হলে মানব সভ্যতার সমাপ্তি এখানেই।"

রাষ্ট্রপ্রধান আতঙ্কিত গলায় বললেন, "নেটওয়ার্ক আবার চালু করা না যায়—মানে কী? কেন এটা চালু করা যাবে না?"

বিজ্ঞান আকাদেমির প্রধান তাকিতা তার চেয়ারটিতে হেলান দিয়ে বসে বললেন, নেটওয়ার্কটি কীভাবে আবার চালু করা যাবে সেই তথ্যটি আমাদের দিতে পারে শুধু এই নেটওয়ার্কটি। বলতে পারেন এটা এক ধরনের হেঁয়ালির মতো—নেটওয়ার্কটি চালু থাকলেই আমরা নেটওয়ার্ক চালু করতে পারব। এখন নেটওয়ার্ক চালু নেই তাই নেটওয়ার্কটি আবার কীভাবে চালু করা যাবে আমরা জানি না।"

"তার মানে—এই নেটওয়ার্ক আর চালু হবে না?"

"না। এটা চালু করার মতো বুদ্ধিমত্তা আমাদের নেই। আমরা আমাদের মাথায় প্যারামন লাগিয়ে নিজের মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে ভুলে গেছি। শুধু তাই নয় আমরা গত কয়েক প্রজন্ম প্যারামন লাগিয়ে পার করেছি—আমাদের মস্তিষ্কে নিউরনের সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। সিনাপ্স সংযোগ বলতে গেলে নেই। আমরা এখন আর সত্যিকার মানুষ নই মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধান, আমরা এখন হচ্ছি অবমানব।"

"অবমানব?"

"হ্যাঁ।"

"এখন পৃথিবীতে কী হবে?"

নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা। প্রথম কয়েক বছর রাজত্ব করবে অস্ত্রধারীরা। রোগ শোক অনাহারে বেশিরভাগ মানুষ মরে যাবে। মানুষজন তখন ছোট ছোট এলাকায় ভাগ হয়ে যাবে। নূতন নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে—যার গায়ে জোর বেশি সে হবে নেতা। তারপর সম্পূর্ণ নূতন একটি সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হবে। অবমানবের নূতন এক ধরনের সমাজ। আফ্রিকার জঙ্গলের গরিলাদের সমাজের মতো কিংবা বোর্নিওর ওরাং ওটানের সমাজের মতো কিংবা—"

"থামুন!" রাষ্ট্রপ্রধান চিৎকার করে বললেন, "আপনি থামুন।"

প্রফেসর তাকিতা দুর্বলভাবে বললেন, "আমি থামছি মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু বাইরের পৃথিবী থেমে নেই। তাকিয়ে দেখুন। তারা কিন্তু এর মাঝে পিছনের দিকে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে।"

রাষ্ট্রপ্রধান জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন, দূরে আগুনের লেলিহান শিখা, কালো ধোঁয়া এবং মানুষের চিৎকার। ধীরে ধীরে এদিকে এগিয়ে আসছে।

*　　*　　*

গাছের বাকলের ছোট পোশাক পরা দুজন কিশোর-কিশোরী গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তাদের সুস্থ-সবল দেহ থেকে যেন জীবনের আভা ফুটে বের হচ্ছে। কিশোরটির হাতে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ধনুক, মেয়েটি ছোট একটা পাতায় কোনো একটা গাছের আঠা ধরে রেখেছে। ছেলেটি তার নিজ হাতে তৈরি তীরে গাছের আঠাটি লাগিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কী মনে হয়? কাজ করবে?"

কিশোরীটি মাথা নেড়ে বলল, "আমি অনেক খুঁজে বের করেছি। একশবার কাজ করবে।"

কিশোরটি তার ধনুকে তীর লাগিয়ে দূরে ঘাস খেতে থাকা হরিণটির দিকে তাক করল। তীর দিয়ে শরীর অবশ করিয়ে দেয়ার এই নূতন গাছের আঠাটি তারা পরীক্ষা করছে, সত্যি সত্যি এটা কাজ করবে কি না সেটা তারা এখনো জানে না। নূতন কিছু করার মাঝে সব সময়ই থাকে নূতন এক ধরনের উত্তেজনা। দুজনে গভীর আগ্রহ নিয়ে হরিণটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমাজান অরণ্যের গভীরে পৃথিবীর মানুষের চোখের আড়ালে থেকে যাওয়া এই আদিবাসী মানুষেরা তখনো জানত না, পুরো পৃথিবীতে নূতন করে সভ্যতা গড়ে তোলার দায়িত্বটি তাদেরকেই নিতে হবে।

মস্তিষ্ক নামে সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটির তারা কখনো অবমাননা করে নি।

সিনাপ্সুঘুটিয়া

AMARBOI.COM

যন্ত্রটার নাম সিনাপ্সুঘুটিয়া—যে কোনো স্বাভাবিক মানুষই এই যন্ত্রের নাম শুনে আঁতকে উঠবে, এবং এই নামটা উচ্চারণ করার চেষ্টা করলে তাদের দুই চারটা দাঁত ভেঙে যাবার অবস্থা হবে। কিন্তু মিয়া গিয়াসউদ্দিনের সেরকম কিছুই হল না, সে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে লেখাপড়া করলেও বিজ্ঞান খুব ভালোভাবে বোঝে। ইন্টারনেট থেকে সে কখনোই সুন্দরী নারীদের কেচ্ছাকাহিনী ডাউনলোড করে নাই—সুযোগ পেলেই বিজ্ঞানের জিনিসপত্র ডাউনলোড করে পড়েছে। কোন ক্রমোজমে কয়টা জিন জিজ্ঞেস করলে সে বলে দিতে পারে, সব মিলিয়ে কয়টা কোয়ার্ক এবং আজব কোয়ার্ক কতটুকু আজব সেটাও সে বলে দিতে পারে। তাই সিনাপ্সুঘুটিয়া নাম দেখেই সে বুঝে ফেলল এটা মস্তিষ্কে ব্যবহার করার একটা যন্ত্র, বাইরে থেকে স্টিমুলেশান দিয়ে এই যন্ত্র মানুষের মাথায় সিনাপ্সকে ঘুঁটে ফেলতে পারবে—যার অর্থ তাকে বুঝিয়ে দিতে হল না।

সেইদিন বিকালেই সে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতাটা নিয়ে তার বাবার সাথে কথা বলতে গেল। গিয়াসের বাবা রাশভারী ধরনের মানুষ, বেশি কথা বলতে পছন্দ করেন না, গিয়াসও পারতপক্ষে তার বাবার সামনে পড়তে চায় না। কিন্তু তার বাবা মোটামুটি টাকার কুমির এবং গিয়াসের টাকার দরকার হলে তার বাবার কাছে না গিয়ে উপায় নাই। বাবা তাকে দেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী ব্যাপার গিয়াস?"

"বাবা তোমার সাথে একটা জরুরি কথা বলতে এসেছি।"

"কী কথা, তাড়াতাড়ি বলে ফেল।"

কোনো ভণিতা না করে গিয়াস সরাসরি কাজের কথায় চলে এল, বলল, "বাবা আমি ঠিক করেছি একটা রেস্টুরেন্ট দেব। আমাকে কিছু ক্যাশ টাকা দিতে হবে।"

"ক্যাশ টাকা দিতে হবে? তোকে?"

"জি বাবা। আমি দুই বছর পরে তোমাকে সুদে আসলে ফিরিয়ে দেব।"

বাবা সোজা হয়ে বসে বললেন, "তুই রেস্টুরেন্টের কী বুঝিস যে বলছিস দুই বছরে সব টাকা তুলে ফেলবি?"

"বোঝার দরকার নাই বাবা, কারণ আমি ব্যবহার করব সিনাপ্সুঘুটিয়া।"

বাবা বিদঘুটে শব্দটা শুনে চমকে উঠলেন, বললেন, "সেটা আবার কী জিনিস?"

"আমাদের মস্তিষ্কের সিনাপ্সকে ঘুঁটে দেয়। আমাদের যা কিছু অনুভূতি সেগুলো সবই আসে মস্তিষ্ক থেকে। তাই অনুভূতিটা সরাসরি মস্তিষ্কে দিয়ে দেব।"

"সরাসরি মস্তিষ্কে দিয়ে দিবি?"

"জি বাবা। কেউ যখন খুব ভালো একটা কিছু খায় তখন তার ভালো লাগার অনুভূতিটা আসলে তো মুখে, জিবে হয় না হয় মস্তিষ্কে! আমি রেস্টুরেন্টে সিনাপ্সুঘুটিয়া লাগিয়ে সেটা সেট করে রাখব সুস্বাদু মজার অনুভূতিতে। এখানে কাস্টমার যেটাই খাবে সেটাকেই মনে করবে সুস্বাদু। হু হু করে বিজনেস হবে। সারা দেশের মানুষ খেতে আসবে আমার রেস্টুরেন্টে।"

বাবা কিছুক্ষণ শীতল চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন—তারপর তার কী মনে হল কে জানে, ড্রয়ার থেকে চেক বই বের করে খসখস করে বিশাল অঙ্কের একটা চেক লিখে ছেলের দিকে এগিয়ে দিলেন।

AMARBOI.COM

প্রথম দিন যখন রেস্টুরেন্টটা খোলা হল সেদিন গিয়াস তার বাবাকে একটা টেবিলে নিয়ে বসাল। উপরে আলো-আঁধারি একটা আলো, সুন্দর ন্যাপকিন, ঝকঝকে থালা, পাতলা কাচের গ্লাসে ঠাণ্ডা পানি। গিয়াস মেনুটা তার বাবার হাতে দিয়ে বলল, "বল বাবা, তুমি কী খেতে চাও।"

"কোনটা ভালো?"

"সবগুলোই ভালো।"

"ঠিক আছে, পরোটা আর শিককাবাব তার সাথে ইলিশ মাছের ভাজা আর একটু পোলাও, সাথে খাবার জন্যে লাচ্ছি।"

"খাবার পর একটু দই মিষ্টি দেব বাবা?"

"দে।"

কিছুক্ষণের মাঝেই ধূমায়িত খাবার চলে এল। বাবা খুবই তৃপ্তি করে খেলেন, ঢেকুর তোলা বড় ধরনের অভদ্রতা জেনেও একটা বড়সড় ঢেকুর তুললেন। গিয়াস জিজ্ঞেস করল, "কেমন লেগেছে বাবা?"

বাবা ঢুলুঢুলু চোখে বললেন, "আমি আমার জীবনে এর চাইতে সুস্বাদু খাবার খাই নাই। আমার ধারণা বেহেশত ছাড়া আর কোথাও এত সুস্বাদু খাবার পাওয়া যাবে না'। তোর বাবুর্চিকে ডাক, আমি তার হাতে চুমু খেয়ে যাই।"

গিয়াস হা হা করে হেসে বলল, "বাবা এর সবই হচ্ছে সিনাপ্সুঘুটিয়ার গুণ। তুমি টের পাও নাই তোমার মাথার কাছে একটা সিনাপ্সুঘুটিয়া বসানো আছে, আমি সেটা সেট করে দিয়েছি সুস্বাদু স্কেলে। তুমি যেটাই খেয়েছ সেটাই তোমার মজা লেগেছে।"

"কিন্তু বাবুর্চি কি রাঁধে নাই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়াস বলল, "আমার বাবুর্চি একজনের বয়স এগার অন্যজন সাড়ে বারো। সারা দিন পথেঘাটে প্লাস্টিকের বোতল কুড়িয়ে বেড়ায়, রাত্রে এসে রাঁধে।"

"বলিস কী?"

"এরা রান্নার রও জানে না, প্লেটে খালি এটা-সেটা তুলে দেয়।"

"এটা-সেটা?"

"হ্যাঁ বাবা। তুমি ভেবেছ তুমি খেয়েছ পরোটা আর শিককাবাব পোলাও ইলিশ মাছ ভাজা হ্যানো ত্যানো! আসলে কী খেয়েছ জান?"

"কী?"

"খানিকটা খবরের কাগজ, একটা পুরোনো গামছার টুকরা, মোমবাতি, পোড়া মবিল, শেভিং ক্রিম আর কাপড় ধোয়ার সাবান।"

বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, "কী বলছিস তুই?"

"সত্যি বলছি বাবা। সিনাপ্সুঘুটিয়া অফ করে দিলেই তুমি বুঝবে। দেখতে চাও?"

বাবা কাঁপা গলায় বললেন, "দেখা।"

গিয়াস তার সিনাপ্সুঘুটিয়া বন্ধ করে দিল এবং সাথে সাথে বাবা হড় হড় করে খবরের কাগজ, গামছার টুকরা, মোমবাতি, পোড়া মবিল, শেভিং ক্রিম আর কাপড় ধোয়ার সাবান বমি করে দিলেন।

গিয়াস যেরকম আশা করেছিল তার রেস্টুরেন্ট তার থেকে অনেক ভালো করে চলল। সে বাবাকে বলেছিল দুই বছর পরেই সে তার বাবাকে টাকাটা সুদে আসলে ফেরত দেবে, কিন্তু সে ছয় মাসের মাথাতেই পুরো টাকা ফিরিয়ে দিল। রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করে গিয়াস তার বাবার মতো টাকার কুমির না হলেও মোটামুটি টাকার গিরগিটি হয়ে গেল। তখন বাসা থেকে সবাই তাকে চাপ দিল বিয়ে করার জন্যে। প্রথমে দুর্বলভাবে একটু আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে করতে রাজি হল।

মেয়ের ব্যাপারে গিয়াস খুবই খুঁতখুঁতে। মেয়ের নাক পছন্দ হয় তো চুল পছন্দ হয় না। চুল পছন্দ হয় তো দাঁত পছন্দ হয় না। এমনকি ডান চোখ পছন্দ হয় তো বাম চোখ পছন্দ হয় না। সবাই যখন আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে তখন হঠাৎ করে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ের খোঁজ পাওয়া গেল, যারা তাকে দেখেছে তাদের সবাই নাকি ট্যারা হয়ে গেছে। এই মেয়ে খুব সহজে সবার সামনে দেখা দেয় না—তাকে দেখতে হলে তার মায়ের একটা বুটিকের দোকানে গিয়ে দেখতে হয়।

খোঁজখবর নিয়ে গিয়াস বুটিকের দোকানে মেয়েকে দেখতে পেল এবং মেয়েকে এক নজর দেখে তার আর চোখের পলক পড়ে না। দুধে আলতায় গায়ের রঙ, রেশমের মতো চুল, চোখের মাঝে অতলান্তের গভীরতা, ঠোঁটগুলো ফুলের পাপড়ির মতো, ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতগুলো মুক্তার মতন ঝকঝক করছে। গিয়াস মেয়ের দিকে তাকাল, মেয়েটিও তার দিকে তাকিয়ে মোহিনী ভঙ্গিতে একটু হাসল, এবং সেই হাসি দেখে গিয়াসের বুকের ভেতর নড়েচড়ে গেল। গিয়াস ফিসফিস করে বলল, "তুমি কি আমার হবে?"

মেয়েটি চোখের ভুরুতে বিদ্যুৎ ছুটিয়ে বলল, "কেন নয়?"

কাজেই যথাসময়ে ধুমধাম করে বিয়ে হল। সুন্দরী বউ খুবই লাজুক, লম্বা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। সব অনুষ্ঠানের শেষে বাসর রাতে বউয়ের মুখের ঘোমটা তুলে গিয়াস ভয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিৎকার করে ওঠে, তার বউয়ের জায়গায় যে বসে আছে তার চেহারা পুরোপুরি বানরের মতো! গিয়াস তোতলাতে তোতলাতে বলল, "তু-তু-তুমি?"

"হ্যাঁ আমি।"

"তুমি কে?"

"আমি তোমার বউ।"

"কিন্তু তোমাকে তো অন্যরকম দেখেছি। অপরূপ সুন্দরী!"

"আবার হয়ে যাব।"

"কীভাবে?"

নূতন বউ তরমুজের বিচির মতো কালো দাঁত বের করে হেসে বলল, "কাল সকালেই মায়ের দোকানের সিনাক্সুঘুটিয়াটা বাসায় এনে লাগিয়ে দেব!"

মিয়া গিয়াসউদ্দিন তোতলাতে তোতলাতে বলল, "সি-সি-সি-?" এতদিন যে যন্ত্রটার নাম সে অবলীলায় বলে এসেছে হঠাৎ করে সেই নামটা তার মুখেই আসতে চাইল না।

এক্সপেরিমেন্ট

AMARBOI.COM

মধ্যবয়স্ক প্রফেসর মহিলাটিকে বললেন, "এই যে এটা হচ্ছে ডায়াল আর এটা হচ্ছে সুইচ। ডায়ালটা যত বেশি ঘোরাবেন ভোল্টেজ তত বেশি হবে। যখন সুইচ টিপে ধরবেন তখন ঐ মানুষটা ইলেকট্রিক শক খাবে।"

নির্বোধ ধরনের মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, "ঐ মানুষটা কি আমাকে দেখতে পাবে?"

"না, আপনাকে দেখতে পাবে না।"

"ইলেকট্রিক শক দিলে কি মানুষটার কষ্ট হবে?"

"অবশ্যই কষ্ট হবে?" প্রফেসর হা হা করে হেসে বললেন, "ইলেকট্রিক শক খেলে মানুষের কষ্ট হয় জানেন না?"

"তা হলে ঐ মানুষটা শক খেতে রাজি হয়েছে কেন?"

"দুটি কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে এটা একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। আমরা দেখতে চাচ্ছি একজন মানুষ সবচেয়ে বেশি কত ভোল্টেজের ইলেকট্রিক শক কতক্ষণ সহ্য করতে পারে। এই মানুষটা সেই এক্সপেরিমেন্টে বসে ইলেকট্রিক শক খেতে রাজি হয়েছে।"

"গাধা টাইপের মানুষ?"

"খানিকটা বলতে পারেন। তবে দ্বিতীয় একটা কারণ আছে—এই মানুষটা যে এক্সপেরিমেন্টে বসতে রাজি হয়েছে সে জন্যে আমরা তাকে কিছু টাকাপয়সা দিব।"

"কত টাকা?"

প্রফেসর হাসার ভঙ্গি করে বললেন, "সেটা নাই বা শুনলেন! আমরা টাকার পরিমাণটা গোপন রাখছি।"

নির্বোধ ধরনের মহিলাটি বড় চোখ বড় বড় করে বলল, "অনেক টাকা নিশ্চয়ই?"

"মোটামুটি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তা হলে মনে হয় মানুষটা গাধা টাইপের না। একটু চালু টাইপের।"

"আপনি সেটাও বলতে পারেন।"

মহিলাটি ডায়াল এবং সুইচটা পরীক্ষা করে বলল, "আচ্ছা খুব বেশি ইলেকট্রিক শক খেয়ে মানুষটা কি মরে যেতে পারে?"

প্রফেসর বললেন, "না, মারা যাবার কোনো আশঙ্কা নেই—মানুষটা কষ্ট পাবে, ভোল্টেজ যদি বেশি হয় তা হলে অমানুষিক কষ্ট, কিন্তু মারা যাবে না।"

"যদি মরে যায়?"

"মরবে না। আপনার কোনো ভয় নেই—আপনি নিশ্চিত মনে এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যান। তা ছাড়া মানুষটাকে দিয়ে বন্ড লিখিয়ে নিয়েছি। এই এক্সপেরিমেন্ট করার কারণে তার যদি শারীরিক কোনো ক্ষতি হয় তা হলে আমরা তার জন্যে দায়ী হব না।"

মহিলাটির চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ পড়ল, বলল, "সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করতে পারবে না।"

"না পারবে না।" মধ্যবয়স্ক প্রফেসর বললেন, "তা হলে আমরা কাজ শুরু করি কী বলেন?"

"ঠিক আছে।"

প্রফেসর বললেন, "আপনার কাজ খুব সহজ। ডায়ালটা ঘোরাবেন আর সুইচ টিপে ধরবেন। ভেতরে রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা আছে সবকিছু রেকর্ড হয়ে যাবে। যখন এক্সপেরিমেন্ট শেষ হয়ে যাবে আমাদের ডাক দেবেন।"

"ঠিক আছে।"

মহিলাটি ছোট জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল, মানুষটা একটা চেয়ারে বসে আছে, চোখেমুখে একটু বেপরোয়া ভাব, তবুও বোঝা যাচ্ছে একটু একটু ভয় পাচ্ছে। দুটো হাত চেয়ারের হাতলের সাথে আর পা চেয়ারের পায়ের সাথে বেল্ট দিয়ে বাঁধা, মানুষটা যেন হঠাৎ করে উঠে চলে যেতে না পারে সেজন্যে এই ব্যবস্থা। মানুষটার দুই হাতে দুইটা ধাতব স্ট্র্যাপ লাগানো সেখান থেকে ইলেকট্রিক তার বের হয়ে এসেছে, এই দুটি ইলেকট্রিক তার দিয়ে মানুষটাকে শক দেয়া হবে। গোলাপি রঙের একটা টি শার্ট আর জিনসের প্যান্ট পরে আছে, মাথার চুল এলোমেলো, গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। মুখে দু তিন দিনের না কামানো দাড়ি।

মহিলাটি ডায়ালটা সাবধানে একটু ঘুরিয়ে সুইচটা টিপে ধরল, সাথে সাথে চেয়ারে বেঁধে রাখা মানুষটা একটু কেঁপে উঠে এদিক-সেদিক তাকাল। ছোট একটা ইলেকট্রিক শক খেয়েছে মনে হয়। মহিলাটি ডায়ালটা আরেকটু ঘুরিয়ে আবার সুইচটা টিপে ধরতেই মানুষটা কেঁপে উঠে একটা ছোট শব্দ করল। হঠাৎ করে এই মানুষটার চেহারায় একটা ভয়ের ছাপ পড়ে। সে এদিকে সেদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করতে শুরু করেছে।

মহিলাটি ডায়ালটা আরেকটু ঘুরিয়ে আবার সুইচ টিপে ধরতেই মানুষটা প্রথমবার একটু চিৎকার করে উঠল। তার মুখে এই প্রথমবার শুধু ভয় নয় আতঙ্কের ছাপ পড়েছে। মহিলাটি আবার ডায়াল একটুখানি ঘুরিয়ে সুইচটা টিপে ধরতেই মানুষটা হঠাৎ বিচিত্র ভঙ্গিতে কেঁপে ওঠে, তার মুখটা বিকৃত হয়ে যায়, এবং তার ভেতরে সে গোঙানোর মতন শব্দ করে ওঠে। মহিলাটা জিব দিয়ে তার ঠোঁট ভিজিয়ে নেয়, মনে হচ্ছে এখন সত্যিকার অর্থে ইলেকট্রিক শক দেয়া শুরু হয়েছে—সে ডায়ালটার দিকে তাকাল এখনো অনেক দূর যাওয়া বাকি। মাত্র শুরু হয়েছে—যখন আরো বেশি শক দেয়া হবে মানুষটা কী করবে কে জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিলাটি ডায়ালটা বেশ খানিকটা ঘুরিয়ে সুইচটা টিপে ধরতেই মানুষটা চেয়ার থেকে লাফিয়ে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে, থরথর করে সারা শরীর কাঁপতে থাকে সাথে সাথে সে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে—যন্ত্রণার অমানুষিক একটা চিৎকার। সুইচটা যতক্ষণ টিপে রাখার কথা মহিলাটি তার থেকে কয়েক মুহূর্ত বেশি সময় টিপে ধরে রাখল। মানুষটাকে যন্ত্রণা দেয়ার মাঝে অত্যন্ত বিচিত্র একটা আনন্দ রয়েছে যেটা সে আগে কখনোই অনুভব করে নি। চেয়ারে বেঁধে রাখা মানুষটা এবারে সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছে, তার সারা মুখ ফ্যাকাসে এবং রক্তশূন্য, মুখ হাঁ করে রেখেছে এবং চোখগুলোতে অবর্ণনীয় আতঙ্ক।

মহিলাটি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে ডায়ালটা আরো বেশ খানিকটা ঘুরিয়ে কাঁপা হাতে সুইচটা টিপে ধরে সাথে সাথে চেয়ারে বেঁধে রাখা মানুষটা অমানুষিক যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে। তার সারা শরীর এক ধরনের ভয়াবহ খিঁচুনিতে থরথর করে কাঁপছে। মনে হয় চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসছে। মানুষটা মুখ হাঁ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করছে কিন্তু মনে হচ্ছে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

যন্ত্রণাকাতর মানুষটিকে দেখে মহিলাটির মুখের মাংসপেশি শক্ত হয়ে আসে। সে সুইচটা টিপে ধরে রেখে অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে ওঠা মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে, নিজের অজান্তেই সে একটু পরে পরে মুখে লোল টেনে নিতে থাকে।

মনিটরে মহিলাটির কঠিন মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রফেসর নিচু গলায় তার সহকর্মীকে বললেন, "কেমন দেখছ?"

"অবিশ্বাস্য। একজন মানুষ যে অকারণে আরেকজন মানুষকে এভাবে কষ্ট দিতে পারে সেটা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।" সহকর্মী মাথা নেড়ে বলল, "আমার রীতিমতো শরীর খারাপ লাগছে।"

প্রফেসর সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন তোমার শরীর খারাপ লাগছে? তুমি তো জানো এখানে কোনো ইলেকট্রিক শক দেয়া হচ্ছে না—পুরোটাই মানুষটার অভিনয়।"

"জানি। আমি খুব ভালো করে জানি। সবকিছু তো আমিই তৈরি করেছি—যন্ত্রপাতি পুরোটাই বোগাস আমি সেটা জানি। কিন্তু মানুষটার অভিনয় এত রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে আসলেই বুঝি ইলেকট্রিক শক খাচ্ছে!"

প্রফেসর দুলে দুলে হাসতে হাসতে বললেন. "উনিশ শ একষট্টি সালে স্ট্যানলি মিলগ্রাম প্রথম এই এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলেন। সারা পৃথিবীতে তখন হইচই পড়ে গিয়েছিল—"

"পড়ারই কথা। নির্বোধ মহিলাটা ভাবছে সে এক্সপেরিমেন্ট করছে! আসলে তাকে নিয়েই যে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে সে জানতেও পারছে না।"

প্রফেসর বললেন, "সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার।"

সহকর্মী নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু কী লাভ এই রকম এক্সপেরিমেন্ট করে? আমরা তো এক্সপেরিমেন্ট ছাড়াই জানি মানুষ কত নিষ্ঠুর হতে পারে!"

প্রফেসর মাথা নেড়ে বললেন, "জানি না। ভাসা ভাসা জানি ঠিক করে জানি না। এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে এতগুলো টাকা পেয়েছি কেন এক্সপেরিমেন্ট করব না?"

সহকর্মী সোজা হয়ে বসে বলল, "হ্যাঁ, অনেকগুলো টাকা দিয়েছে এই প্রজেক্টে, সেরকম খরচ তো নেই!"

"খরচ নেই তো কী হয়েছে? খরচ করে ফেলব! আমাদের এই অভিনেতাকে টাকা দিয়ে খুশি করে দেব। এরকম প্রফেশনাল অভিনেতা না হলে এই এক্সপেরিমেন্টটা এত ভালো করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারতাম? কিছু যন্ত্রপাতি কিনব। দেশে বিদেশে কনফারেন্সে যাব—টাকা খরচ করা কোনো সমস্যা নাকি?"

সহকর্মী প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু একটা প্রাইভেট কোম্পানি আপনাকে গবেষণা করার জন্যে এত টাকা কেন দিল?"

প্রফেসর মাথা নেড়ে বললেন, "জানি না। মনে হয় গাধা টাইপের কোম্পানি! ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানুষটাও মনে হয় গাধা টাইপের—"

কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঠিক সেই মুহূর্তে প্রফেসরের ঘরে গোপনে বসিয়ে রাখা ক্যামেরাতে প্রফেসরকে লক্ষ করছিলেন। পাশে বসে থাকা সেক্রেটারি বলল, "স্যার, শুনলেন? বলছে আমাদের কোম্পানিটা নাকি গাধা টাইপের আর আপনিও নাকি গাধা টাইপের মানুষ।"

"শুনেছি।"

"চার পয়সার প্রফেসরের কত বড় সাহস! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।"

ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি রেগে উঠছ কেন?"

"রাগব না? এরকম কথা শুনলে রাগ হয় না?"

"দেখ—আমরা গোপনে তার কথা শুনছি। পুরো কাজটা বেআইনি। এরকম বেআইনি কাজ করলে কিছু বেফাঁস কথা শুনতে হয়। তা ছাড়া প্রফেসর তো মিথ্যে বলে নি। এরকম হাস্যকর একটা এক্সপেরিমেন্টের জন্যে আমরা এত টাকা ঢালছি—তার কাছে মনে হতেই পারে আমরা বোকা। গাধা টাইপের।"

"কিন্তু কী জন্যে ঢালছি সেটা তো জানে না।"

"না। জানার কথা না। সে কেমন করে জানবে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার এটা একটা রাস্তা। কোম্পানির কোটি কোটি টাকা আমরা হাওয়া করে নেব এই চার পয়সার প্রফেসরকে স্বল্প কিছু টাকা দিয়ে। সরকারি মানুষদের বোকা বানানো খুবই সোজা। তবে গোয়েন্দা বাহিনীর নূতন ডিরেক্টর নাকি একটু ত্যাঁদড় টাইপের, শুধু তার থেকে একটু সতর্ক থাকতে হবে।"

AMARBOI.COM

গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান একটা নিঃশ্বাস ফেলে ইলেকট্রনিক ডিভিশনের কম বয়সী অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, "পুরোটা রেকর্ড করেছ?"

"জি স্যার করেছি।"

"কত বড় সাহস! আমাকে বলে ত্যাঁদড় টাইপের। নূতন ইলেকট্রিক সারভেইলেন্সের যন্ত্রপাতির খবর তো রাখে না তাই এরকম আজেবাজে কথা বলে। যদি জানত আমি সব কোম্পানির সব ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে চোখে চোখে রাখছি—তা হলে এদের সবার পেটের ভাত চাল হয়ে যেত!"

ইলেকট্রনিক ডিভিশনের অফিসার বলল, "জি স্যার।"

"একদিক দিয়ে ভালোই হল।"

"কী ভালো হল স্যার?"

"এই যে তার পুরো কথাবার্তা রেকর্ড হয়ে থাকল। এই ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্যাটাকে কালকে ডেকে আনব। এইখানে বসিয়ে তাকে এই পুরো ভিডিওটা দেখিয়ে বলব—সোনার চাঁদ এখন বল কে ত্যাঁদড়? তুমি না আমি!"

"কিন্তু স্যার তা হলে তো জেনে যাবে আমরা সবাইকে সারভেইলেন্সে রেখেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানুক। না জানলে সে আমাকে টাকাপয়সা দেবে? সবাই আখের গুছিয়ে নিয়েছে। আর আমি এখনো কিছু করতে পারলাম না। এই তো সুযোগ।"

ইলেকট্রনিক ডিভিশনের অফিসার বলল, "কিন্তু স্যার, আমাদের প্রেসিডেন্ট বলেছেন এটা গোপন রাখতে। সারভেইলেন্সের কথা সবাই জেনে গেলে দেশে হইচই হতে পারে—"

গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান টেবিলে থাবা দিয়ে বললেন, "আরে! গুল্লি মারো প্রেসিডেন্টের। বুড়ো হাবড়া একটা প্রেসিডেন্ট—"

প্রেসিডেন্ট দেয়ালে লাগানো মনিটরের দিকে তাকিয়ে টেবিলটা খামচে ধরে নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন, "আমি বুড়ো হাবড়া? তুমি কত বড় গর্দভ যে আমার সম্পর্কে এরকম কথা বল? তুমি জান না—আমি পরপর তিনবার এই দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছি? কেউ কি ঘাস খেয়ে একটা দেশের তিনবার প্রেসিডেন্ট হয়?"

বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট তার অফিসের নরম চেয়ারে শরীর ডুবিয়ে দিয়ে মনিটরে গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধানের ধূর্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই মানুষটাকে কীভাবে শাস্তি দেয়া যায় তার নানা ধরনের পরিকল্পনা প্রেসিডেন্টের মাথায় খেলতে থাকে।

"তোমার কী মনে হয়? প্রেসিডেন্ট কী রকম শাস্তি দেবে?"

"মেরে ফেলবে। নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে।"

"মেরে তো ফেলবেই। কীভাবে মারবে?"

"দাঁড়াও, মাথাটার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি।"

একটি মহাজাগতিক প্রাণী প্রেসিডেন্টের মাথায় উঁকি দিয়ে তার নিউরনগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। কোন পরিবেশে মানুষ কী করে সেটা সে ভালো করে জানতে চায়।

অনেক দিন থেকেই তারা পৃথিবী নামে একটা গ্রহের মানুষদের নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে।

AMARBOI.COM

মহাকাশযান টাইটুন

কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর ঝুঁকে বসেছিল মহাকাশযান টাইটুনের কমিউনিকেশন অফিসার রাটুল। ক্যাপ্টেন রন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোনো সমস্যা রাটুল?"

"না—ঠিক সমস্যা নয়। তবে—" রাটুল বাক্যটা শেষ না করে থেমে গেল।

"তবে কী?"

"যোগাযোগ এন্টেনাতে একটা সিগন্যাল আসছে।"

"কার সিগন্যাল?"

"সেইটাই বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছ না মানে?" এবারে ক্যাপ্টেন রন প্রথমবারের মতো কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কী বুঝতে পারছ না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ডপলার শিফট দেখে মনে হচ্ছে আরেকটা মহাকাশযান এদিকে আসছে। কিন্তু সিগন্যালটা বুঝতে পারছি না। কোনো মাথামুণ্ডু নেই।"

"সম্ভবত এনক্রিপ্টেড। গোপনীয়তার জন্যে অনেক সময় করে।"

"উঁহু।" কমিউনিকেশন অফিসার রাটুল বলল, "আমি আমাদের মেগা প্রসেসর দিয়ে বিশ্লেষণ করেছি, তথ্যটাই দুর্বোধ্য।"

"দুর্বোধ্য?"

"হ্যাঁ। আমি শেষ পর্যন্ত সুপার কম্পিউটারে দিয়েছি, দেখি কিছু বের করতে পারে কি না।"

"ঠিক আছে। যদি কিছু জানতে পার আমাকে জানিও।"

"জানাব। নিশ্চয়ই জানাব।"

ক্যাপ্টেন রন মহাকাশযান টাইটুনের যাত্রাপথ নির্দিষ্ট করার কাজে ব্যস্ত হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে দুর্বোধ্য সিগন্যালের কথা ভুলে গিয়েছিল কিন্তু কমিউনিকেশন অফিসার রাটুল একটু পরেই আবার তাকে সেটা মনে করিয়ে দিল। সে এসে উত্তেজিত গলায় বলল, "ক্যাপ্টেন রন, সুপার কম্পিউটারের বিশ্লেষণ শেষ হয়েছে।"

"শেষ হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কী আছে সিগন্যালে?"

"একটা বিপদগ্রস্ত মহাকাশযান সাহায্যের জন্যে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে।"

"ও।" ক্যাপ্টেন রন ভুরু কুঁচকে বলল, "সাহায্যের জন্যে সিগন্যাল দুর্বোধ্যভাবে কেন পাঠাচ্ছে? সহজ কোডিংয়ে কেন পাঠাচ্ছে না?"

"আসলে মহাকাশযানটা সহজ কোডিংয়েই পাঠাচ্ছে—আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।"

ক্যাপ্টেন রন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কমিউনিকেশন অফিসার রনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

"এটা আমাদের কোনো মহাকাশযান নয়। এটা মহাজাগতিক কোনো প্রাণীর মহাকাশযান।"

ক্যাপ্টেন রন চমকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"আমি ঠিকই বলছি ক্যাপ্টেন। আপনি এলেই দেখতে পারবেন। সুপার কম্পিউটারের প্রথমবার অর্থ বের করতে সময় লেগেছে। এখন আর সময় লাগছে না। আমরা কি তার সাহায্যের আবেদনে সাড়া দেব?"

"দাঁড়াও আমি নিজে একবার দেখে নিই।"

ক্যাপ্টেন রনের সাথে সাথে মহাকাশযানের অন্য ক্রুরাও যোগাযোগ মডিউলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দূরের মহাকাশযান থেকে যে সিগন্যালটি পাঠানো হয়েছে সেটা এরকম :

"বাঁচাও আমাদের বাঁচাও। বিধ্বস্ত শক্তি ক্ষেপণ কেন্দ্র।
নিঃশেষিত রসদ। ধ্বংসের মুখোমুখি মহাকাশযান।
বাঁচাও আমাদের বাঁচাও।"

ক্যাপ্টেন রন সাহায্যবার্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা কেমন করে বুঝতে পারলে এটা মহাজাগতিক প্রাণীর সিগন্যাল।"

"পৃথিবীর কোনো মহাকাশযান থেকে এই সিগন্যাল পাঠালে আমাদের বিশ্লেষণ করতে কোনো সময় লাগত না। এটা আমাদের সিগন্যাল না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে আগে কখনো আমাদের কোনো মহাকাশযান গিয়েছে?"

"না যায় নি।"

"এই মহাকাশযানটা এখন আমাদের কাছ থেকে কত দূরে আছে?"

"মহাজাগতিক হিসেবে খুবই কাছে। আমরা এখন যে গতিতে যাচ্ছি তাতে এক সপ্তাহের ভেতর পৌঁছাতে পারব।"

"যদি এত কাছে আছে তা হলে সিগন্যালটা আগে কেন পেলাম না?"

টাটুল বলল, "সিগন্যালটা খুবই দুর্বল, সেজন্যে।"

ক্যাপ্টেন রন অন্যমনস্কভাবে তার গাল চুলকাল। মহাকাশযানের কোডে পরিষ্কার লেখা আছে কোনো বিপদগ্রস্ত মহাকাশযান যদি সাহায্য চায় তা হলে সাথে সাথে সাহায্যের জন্যে ছুটে যেতে হবে। কিন্তু মহাকাশযানটি যদি মানুষের না হয়ে মহাজাগতিক কোনো প্রাণীর হয় তা হলে কী করতে হবে সেটা পরিষ্কার করে লেখা নেই। যে সিদ্ধান্তটা নেয়ার সেটা তাকেই নিতে হবে। ক্যাপ্টেন রন চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্ত ভাবল তারপর ঘুরে কমিউনিকেশন অফিসার রাটুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "রাটুল তুমি একটা উত্তর পাঠাও।"

"কী বলব সেখানে?"

"বল আমরা আসছি।"

কন্ট্রোল প্যানেল ঘিরে মহাকাশযানের ক্রুরা দাঁড়িয়েছিল ক্যাপ্টেন রন তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা সবাই এস। কীভাবে তাদের সাহায্য করা যায় সেটা নিয়ে একটু কথা বলি।"

AMARBOI.COM

মহাকাশযানের কন্ট্রোল রুমে বড় টেবিলটা ঘিরে সবাই বসেছে। ক্যাপ্টেন রন সবার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "তোমরা সবাই শুনেছ আমরা বিপদগ্রস্ত মহাকাশযানটিকে সাহায্য করার জন্যে যাচ্ছি। ঠিক কীভাবে সাহায্য করব আমি সেটা নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলতে চাই।"

ইঞ্জিনিয়ার শুরা বলল, "তাদের সমস্যাটা কী সেটা না জানা পর্যন্ত আমরা তো কোনো পরিকল্পনা করতে পারছি না।"

ক্যাপ্টেন রন মাথা নেড়ে বলল, "ঠিকই বলেছ। আমরা প্রথমেই জানতে চাইব তাদের সমস্যাটা কী।"

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ লানা বলল, "মহাজাগতিক প্রাণীদের মহাকাশযানের নিশ্চয়ই নিজস্ব তথ্যকেন্দ্র আছে। আমাদের তথ্যকেন্দ্রের সাথে সেই তথ্যকেন্দ্রের তথ্য বিনিময় করা দরকার। আমাদের জানা উচিত তাদের সভ্যতা কোন ধরনের।"

জীববিজ্ঞানী কায়াল মাথা নাড়ল, বলল, "আমার আর তর সইছে না। আমি প্রাণীগুলোকে দেখতে চাই। ঠিক কীভাবে প্রাণের বিকাশ হয়েছে আমি বুঝতে চাই। এটাও কি জিনমকেন্দ্রিক? কার্বনভিত্তিক নাকি সিলিকনভিত্তিক—"

ক্যাপ্টেন রন জীববিজ্ঞানী কায়ালকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি তোমার কৌতূহল মেটানোর অনেক সুযোগ পাবে। আগে বাস্তব সমস্যাগুলোর কথা বলি। আমাদের কী কী ঝুঁকি আছে?"

"যেহেতু প্রাণীগুলো সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, নিরাপত্তার জন্যে অবশ্যই কোয়ারেন্টাইন করতে হবে। আমাদের একটা নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে নিতে হবে। সবার আগে দরকার..."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকাশযানের সকল ক্রু, ইঞ্জিনিয়ার আর বিজ্ঞানীরা অস্থির গলায় কথা বলতে থাকে। সবার ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা, মানবজাতির ইতিহাসে যেটা ঘটে নি সেটা প্রথমবারের মতো ঘটতে যাচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ প্রথমবারের মতো একটা মহাজাগতিক প্রাণীর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। দীর্ঘ আলোচনার পর যখন সবাই নিজের কাজে ফিরে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ ক্যাপ্টেন রন আবিষ্কার করে বড় টেবিলের এক কোনায় গালে হাত দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানী খ্রাউস বসে আছে। ক্যাপ্টেন রন তার দিকে তাকিয়ে বলল, "খ্রাউস তুমি কিছু বলবে?"

"নাহ্।" খ্রাউস মাথা নাড়ল, "আমার বলার কিছু নেই।"

"আমরা একটা মহাজাগতিক প্রাণীকে দেখতে পাব সেটা নিয়ে তোমার কোনো আগ্রহ নেই?"

"এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, আমরা ছাড়া আরো কত মহাজাগতিক প্রাণী আছে—আগে হোক পরে হোক তাদের সাথে আমাদের দেখা হবেই।"

"আমরা আগামী এক সপ্তাহের মাঝে প্রথমবারের মতো এই মহাজাগতিক প্রাণীদের দেখতে পাব। কত কী হতে পারে—নিরাপত্তার ব্যাপারে তোমার কোনো বক্তব্য আছে?"

"নাহ্! শুধু—"

"শুধু কী?"

"তাদের ডান হাত কি ডান দিকে না বাম দিকে সেটা জানা থাকলে ভালো হত।"

কন্ট্রোল ঘরে বসে থাকা সবাই ঘুরে খ্রাউসের দিকে তাকাল। মানুষটি ঠাট্টা করে কিছু বলছে কি না কেউ বুঝতে পারল না। জীববিজ্ঞানী কায়ীরা বলল, "এই প্রাণীগুলো কী রকম আমাদের জানা নেই। তাদের হাত–পা আছে না অক্টোপাসের মতো শুঁড় আছে আমরা কিছুই জানি না। ডান হাত বাম হাত থাকবে তোমাকে কে বলেছে?"

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ লানা বলল, "তুমি এরকম হেঁয়ালি করে কেন কথা বলছ? ডান হাত আবার বাম দিকে কেমন করে হয়?"

ইঞ্জিনিয়ার শুরা হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আমাদের বিজ্ঞানী খ্রাউস সব সময় সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা করে। কাজেই মহাজাগতিক প্রাণী নিয়েও ঠাট্টা করবে এতে অবাক হবার কী আছে?"

খ্রাউস দুর্বল গলায় বলল, "আমি আসলে ঠাট্টা করছিলাম না।"

ক্যাপ্টেন রন বলল, "এর মাঝে ডান বামের ব্যাপারটা কেমন করে আসছে? একটা মহাজাগতিক প্রাণীকে ডান বা বাম কেমন করে বোঝাবে? ডান মানে কী? বাম মানে কী?"

খ্রাউস বলল, "ডান বাম বোঝানো কঠিন নয়। একটা নিউট্রন থেকে যখন বেটা বের হয় তখন স্পিনের সাথে যে সম্পর্ক থাকে সেটা দিয়ে বাম ডান বোঝানো যায়। প্রকৃতি স্পষ্টভাবে জানে বাম মানে কী ডান মানে কী—"

ক্যাপ্টেন রন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "জানা থাকলে ভালো। আমার সেটা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। আমার কাছে ডান আর বামের কোনো পার্থক্য নেই। যারা ডান হাত দিয়ে কাজ করে আর যারা বাম হাত দিয়ে কাজ করে তারা সবাই আমার কাছে সমান।"

খ্রাউস বলল, "আমি সেটা বলছিলাম না। আমরা যখন তথ্য বিনিময় করব তখন যদি পদার্থবিজ্ঞানের তথ্য বিনিময় করি তা হলেই আমরা ডান বা বাম বলতে কী বুঝি সেটা বুঝে যাব। আমি বলছিলাম সেখান থেকে—"

ক্যাপ্টেন রন হাত নেড়ে খ্রাউসকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তুমি লানাকে বল তথ্যকেন্দ্র থেকে যেন পদার্থবিজ্ঞানের তথ্য বিনিময় করা হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লানা হতাশার মতো ভঙ্গি করে বলল, "আমি যখন এই মহাকাশযানে যোগ দিয়েছিলাম তখন ভেবেছিলাম আর বুঝি পদার্থবিজ্ঞান আমাকে উৎপাত করবে না। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টা আমাকে কী কষ্ট দিয়েছে জানো?"

খ্রাউস অপরাধীর মতো বলল, "আসলে বিষয়টা এত খারাপ না। স্কুল-কলেজে ঠিক করে পড়ায় না তো সেজন্যে কেউ পছন্দ করে না। যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম—"

খ্রাউস কী বলছিল সেটা কেউ শুনতে চাইল না। সবারই অনেক কাজ, কারো এখন পদার্থবিজ্ঞানের হেঁয়ালি শোনার সময় নেই।

পরবর্তী ছয় দিনও কেউ খ্রাউসের কথা শোনার সময় পেল না। মহাকাশযানটি বিধ্বস্ত, তাদের জন্যে তথ্য বিনিময় করাও খুব সহজ ছিল না। তারপরেও তার চেষ্টা করা হল। মহাজাগতিক প্রাণীটি সিলিকনভিত্তিক, বুদ্ধিমত্তা মানুষের মতো মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত নয়, সেটা পরিব্যাপ্ত। মহাকাশযানের ইঞ্জিনে সমস্যা হয়েছে—এক ধরনের জ্বালানি সংকট রয়েছে। খ্রাউসের একান্ত ইচ্ছার কারণে পদার্থবিজ্ঞানেরও কিছু তথ্য বিনিময় করা হয়েছে। বিজ্ঞানে তারা মানুষ থেকে খানিকটা পিছিয়ে আছে দশ মাত্রার স্ট্রিং থিওরির সমাধান করেছে কিন্তু চৌদ্দ মাত্রার অবতল থিওরি এখনো সমাধান করতে পারে নি।

সপ্তম দিনে যখন মহাকাশযান টাইটুনের ক্রুরা প্রথমবার সরাসরি মহাকাশযানটিকে দেখতে পেল তখন তাদের উত্তেজনার কোনো সীমা ছিল না। আকৃতিটা অত্যন্ত বিচিত্র, পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথে তার কোনো মিল নেই। পৃথিবীর প্রযুক্তিতে কোনো কিছু তৈরি করতে হলে তার মাঝে জ্যামিতিক কিছু আকার থাকে—এই মহাকাশযানে সেরকম কিছু নেই, মনে হয় পুরোটাই বুঝি একটু একটু করে নিজে থেকে গড়ে উঠেছে। মহাকাশযানটির ইঞ্জিন বিধ্বস্ত তাই সেটি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, নির্দিষ্ট একটা গতিতে অসহায়ভাবে এগিয়ে আসছে।

AMARBOI.COM

ক্যাপ্টেন রন মহাকাশযান টাইটুনকে মহাজাগতিক প্রাণীদের মহাকাশযানটির গতিপথের সাথে একই সরলরেখায় উপস্থিত করে। তারপর খুব ধীরে ধীরে তার গতিপথ কমিয়ে আনতে থাকে—যখন দুটো মহাকাশযান একটি অন্যটিকে স্পর্শ করবে তখন একটি মহাকাশযানের তুলনায় অন্যটির গতিবেগ হবে শূন্য। মহাকাশে ভিন্ন ভিন্ন মহাকাশযানের একত্রিত হওয়ার এটি একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি।

কন্ট্রোল প্যানেলে সবাই এসে ভিড় করেছে, সবার ভেতরেই এক ধরনের উত্তেজনা। খুব ধীরে ধীরে মহাকাশযান দুটো একটি আরেকটির দিকে এগিয়ে আসছে আর কিছুক্ষণের ভেতরেই মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে। এরকম সময়ে কন্ট্রোল প্যানেলে একটা সংকেত ধরা পড়ল, ক্যাপ্টেন রন জিজ্ঞেস করল, "কী পাঠিয়েছে?"

রাটুল বলল, "সামনের মহাকাশযান থেকে একটা বার্তা।"

"কী বলেছে বার্তায়?"

রাটুল পড়ে শোনাল, "তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তোমাদের প্রতি ভালবাসা। তোমাদের প্রতি শুভেচ্ছা। তোমাদের প্রতি কাজামিনু।"

"কাজামিনু? কাজামিনু অর্থ কী?"

"সুপার কম্পিউটার এটা অনুবাদ করতে পারে নি। মানুষের ভাষায় এটা নেই। নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা বা শুভেচ্ছার মতো একটা শুভ কামনা।"

ক্যাপ্টেন রন বলল, "ঠিক আছে। আমরাও তাদের জন্যে একটা বার্তা পাঠাই। তাদেরকে বল, পৃথিবীর মানবজাতির পক্ষ থেকে শুভ কামনা। এই মিলনমেলায়—"

খ্রাউস হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল, "না।"

ক্যাপ্টেন রন অবাক হয়ে বলল, "না? না কেন?"

খ্রাউস অস্থির গলায় বলল, "ভালবাসা শুভ কামনার অনেক সময় আছে। একটু পরেও সেটা পাঠানো যাবে। এখন যেটা দরকার সেটা পাঠাও।"

"এখন কী দরকার?"

"তাদের কাছে একটা বার্তা পাঠিয়ে বল তারা যেন তাদের ডান দিকের লাইটটা জ্বালায়।"

"ডানদিক?"

"হ্যাঁ।"

"কেন ডানদিক?"

"তোমাকে সেটা পরে বলছি—আমাদের হাতে এখন সময় নেই। আমরা একে অপরকে স্পর্শ করার আগেই একটা জিনিস জানা দরকার। ডান বলতে তারা কী বোঝায় সেটা জানা দরকার।"

ক্যাপ্টেন রন একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "কিন্তু আমরা ডান বলতে কী বোঝাই সেটা কি তারা জানে?"

"জানে। আমরা পদার্থবিজ্ঞানের তথ্য বিনিময় করেছি। প্যারিটি ভায়োলেশন থেকে সেটা জানা সম্ভব। তারা জানে—আমি সেটা নিশ্চিত করেছি।"

কমিউনিকেশন অফিসার রাটুল ক্যাপ্টেন রনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী করব ক্যাপ্টেন?"

"ঠিক আছে আগে খ্রাউসের বার্তাটা পাঠাও। বল, তারা যেন তাদের ডান দিকের বাতিটি জ্বালায়।"

রাটুল ক্ষীপ্র হাতে একটা কি-বোর্ডে কথাগুলো লিখে সুপার কম্পিউটারে পাঠাল। সুপার কম্পিউটার সেই তথ্যটি মহাজাগতিক প্রাণীদের উপযোগী করে সাজিয়ে নিয়ে মূল এন্টেনা দিয়ে পাঠিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণের মাঝেই বার্তাটি মহাজাগতিক প্রাণীদের মহাকাশযান গ্রহণ করে। খ্রাউস অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এবং অন্যেরা খানিকটা কৌতুকভরে এগিয়ে আসা মহাকাশযানটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মহাকাশযানটির ডান বা বাম কোনো দিকেই বাতি জ্বলল না, তার বদলে কন্ট্রোল প্যানেলে নূতন একটি বার্তা এসে হাজির হল। সেখানে লেখা, "তোমরা কেন ডান দিকে বাতি জ্বালাতে বলছ? আমাদের জ্বালানি সংকট। বাতি জ্বালিয়ে জ্বালানি অপচয় করতে চাই না।"

ক্যাপ্টেন রন খ্রাউসের দিকে তাকিয়ে বলল, "খ্রাউস, তোমার কথামতো আমরা চেষ্টা করেছি। তারা এখন তোমার সাথে এই খেলাটি খেলতে চাইছে না!"

খ্রাউস উত্তেজিত মুখে বলল, "কিন্তু এই খেলা তাদের খেলতে হবে। খেলতেই হবে—তা না হলে আমরা কিছুতেই তাদের স্পর্শ করতে পারব না! তাদের আবার বল। যেভাবে হোক সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে হলেও ডান দিকের একটা বাতি জ্বালাতে হবে! জ্বালাতেই হবে।"

ক্যাপ্টেন রন একটু অবাক হয়ে খ্রাউসের দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ সে একটু অস্বস্তি অনুভব করতে থাকে। সে কমিউনিকেশন অফিসার রাটুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "রাটুল আরেকটা বার্তা পাঠাও।"

"কী পাঠাব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"লিখো যেভাবেই হোক তোমাদের ডান দিকের বাতিটি জ্বালাতে হবে। অত্যন্ত জরুরি।"

রাতুল ক্ষীপ্র হাতে বার্তাটি পাঠিয়ে দেয় এবং কিছুক্ষণের মাঝেই একটা উত্তর চলে আসে, "আমাদের অত্যন্ত জ্বালানি সংকট কিন্তু তোমাদের অনুরোধে আমরা আমাদের ডান দিকের একটা জিনন ল্যাম্প জ্বালাচ্ছি।"

মহাকাশযানটি তখন এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে তার নকশাকাটা দেয়ালটিও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। তার গঠনটি এত বিচিত্র যে দেখে মনে হয় এটি বুঝি মহাকাশযান নয়, এটি বুঝি কোনো বিমূর্ত শিল্পীর হাতে গড়া বিশাল একটি ভাস্কর্য।

খ্রাউস চোখ বড় বড় করে মহাকাশযানটির দিকে তাকিয়ে ছিল, ভেতরকার উত্তেজনা হঠাৎ করে সবাইকে স্পর্শ করেছে। সবাই দেখল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসা মহাকাশযানটিতে একটা জিননের নিষ্প্রভ বাতি জ্বলে উঠল। আশ্চর্যের ব্যাপার সেটি মহাকাশযানটির ডান দিকে জ্বলে ওঠে নি সেটি জ্বলে উঠেছে বাম দিকে।

খ্রাউস মহাকাশযানের চেয়ারের হাতলটি খামচে ধরে চিৎকার করে উঠে বলল, "থামাও! থামাও মহাকাশযান। থামাও!"

ক্যাপ্টেন রন অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে? কেন থামাব?"

খ্রাউস হাত দিয়ে মহাকাশযানটা দেখিয়ে বলল, "এটা প্রতি পদার্থের তৈরি।"

ক্যাপ্টেন রন হতচকিতের মতো সামনে তাকিয়ে রইল, সে দেখতে পেল খুব ধীরে ধীরে দুটি মহাকাশযান এগিয়ে আসছে, আর কয়েক সেকেন্ডের ভেতরেই একটা আরেকটাকে স্পর্শ করবে। কোনোভাবেই সে এখন তার মহাকাশযানকে থামাতে পারবে না। দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই, সামনের মহাকাশযানটি প্রতি পদার্থের তৈরি। যখন একটি আরেকটিকে স্পর্শ করবে মুহূর্তের মাঝে দুটি মহাকাশযানই ভয়ংকর বিস্ফোরণে অদৃশ্য হয়ে যাবে, থাকবে শুধু অচিন্তনীয় শক্তি।

মহাকাশযানের সবাই স্থির দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রইল। খ্রাউস ভেবেছিল সবাইকে বলবে, সেই বিংশ শতাব্দীতে রিচার্ড ফাইনম্যান কৌতুক করে বলেছিলেন যদি কখনো কোনো মহাজাগতিক মানুষ করমর্দন করার জন্যে ভুল হাত এগিয়ে দেয় তার সাথে করমর্দন কোরো না—সেই মানুষ সম্ভবত প্রতি পদার্থে তৈরি। কিন্তু কেউ খ্রাউসের সেই গলাটি শুনতে আগ্রহী হয় নি। পদার্থের বেলায় যেটি ডান দিক প্রতি পদার্থের বেলায় সেই ডান দিক উল্টো দিকে।

মহাকাশে পদার্থ ও প্রতি পদার্থের তৈরি দুটো মহাকাশযানের সংস্পর্শে বিস্ফোরণের কারণে যে শক্তির সৃষ্টি হয়েছিল সেটি কয়েক আলোকবর্ষ দূর থেকে দেখা গিয়েছিল।

স্মৃতি

শপিংমল থেকে বের হয়েই রুমানা দেখল অনেক মানুষের ভিড়। মানুষগুলো কেন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বোঝার জন্যে সে একটু মাথা উঁচু করে দেখার চেষ্টা করল। মানুষের ভিড়ে কিছু দেখা যায় না। মনে হল সামনে কয়েকটা পুলিশের গাড়ি। শুধু পুলিশ নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিটারিও আছে—তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে তারা মানুষগুলোকে সার্চ করছে।

রুমানার একটু তাড়াহুড়ো ছিল, এখন এই ঝামেলা থেকে কখন বের হতে পারবে কে জানে। পুলিশ আর মিলিটারি মিলে কী খুঁজছে সেটাই বা কে বলতে পারবে?

"আসলে পুলিশ আর মিলিটারি আমাকে খুঁজছে।" রুমানা কানের কাছে ফিসফিস করে বলা কথাগুলো শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠে মানুষটার দিকে তাকাল। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের হাসিখুশি চেহারার একজন মানুষ। মাথায় এলোমেলো চুল, চোখে কালো একটা সানগ্লাস। মানুষটা দীর্ঘদেহী এবং সুদর্শন, দুএকদিন শেভ করে নি বলে গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি কিন্তু সেজন্যে তাকে খারাপ লাগছে না। একটা নীল শার্ট আর জিন্সের প্যান্ট পরে আছে, ফর্সা রঙে তাকে খুব মানিয়ে গেছে।

মানুষটা ঠাট্টা করছে কি না রুমানা বুঝতে পারল না, আমতা-আমতা করে বলল, "আপনাকে খুঁজছে?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি কী করেছেন?"

মানুষটা একটু হেসে চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলল, চোখগুলো খুব সুন্দর, কেমন জানি ঝকঝক করছে। সেটা ছাড়াও চোখের মাঝে অন্য কিছু একটা আছে যেটা রুমানা চট করে ধরতে পারল না। মানুষটা বলল, "আমি আসলে কিছুই করি নি।"

"আপনি যদি কিছুই না করবেন তা হলে পুলিশ মিলিটারি খামোখা আপনাকে খুঁজছে কেন?"

মানুষটা এদিক-সেদিক তাকাল। তারপর নিচু গলায় বলল, "আমি আসলে একজন এলিয়েন।"

রুমানা কথাটা স্পষ্ট করে ধরতে পারল না, বলল, "আপনি কী?"

"এলিয়েন।" মানুষটা ব্যাখ্যা করে, "মহাজাগতিক প্রাণী।"

রুমানা কিছুক্ষণ মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে কী হেসে ফেলবে নাকি গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়বে, বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এলিয়েন?"

"হ্যাঁ।"

"পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছেন?"

মানুষটা মাথা চুলকে বলল, "অনেকটা সেরকম।"

"কেমন লাগছে পৃথিবীতে?"

মানুষটা হেসে ফেলল, বলল, "আপনি আসলে আমার কথা বিশ্বাস করেন নি, তাই না? ভাবছেন ঠাট্টা করছি।"

"খুব ভুল হয়েছে?"

"না ভুল হয় নাই। আসলে এটা তো বিশ্বাস করার ব্যাপার না। আমি নিজেই প্রথমে বিশ্বাস করি নি।"

রুমানা ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনি নিজে? একটু আগে না আপনি বলেছিলেন আপনি এলিয়েন?"

"হ্যাঁ, সেটাও সত্যি। আমি আসলে সাজ্জাদ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু একই সাথে একজন এলিয়েন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুমানা বলল, "ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোথা থেকে নিয়েছেন? মঙ্গল গ্রহে? মঙ্গল গ্রহের ডিগ্রি পৃথিবীতে একসেপ্ট করে?"

সাজ্জাদ নামের মানুষটা, কিংবা এলিয়েনটা শব্দ করে হাসল, বলল, "আপনার গুড সেন্স অফ হিউমার!"

"কেন? এলিয়েনদের সেন্স অফ হিউমার থাকে না?"

"আসলে এলিয়েন নিয়ে মানুষের অনেক রকম মিস-কনসেপশন আছে। বেশিরভাগ মানুষের ধারণা এলিয়েন হলেই সেটা দেখতে ভয়ংকর কিছু হবে।"

রুমানা মাথা নাড়ল, বলল, "ভয়ংকর না হলেও অন্য রকম হবে। এক্স ফাইলে দেখেছি। সাইজে ছোট, মাথাটা বড়, চোখগুলো এরকম টানা টানা। সবুজ রঙের—"

সাজ্জাদ বলল, "আমিও দেখেছি। ভেরি ইন্টারেস্টিং লুকিং।"

"কিন্তু আপনি বলছেন সেটা সত্যি না?"

"আসলে আমরা তো সব সময়েই কিছু একটা দেখি যেটা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। তাই যেটা ধরা-ছোঁয়া যায় না—যেটা হয়তো এক ধরনের প্যাটার্ন, এক ধরনের ইনফরমেশান, সেটা আমরা কল্পনা করতে পারি না।"

"তার মানে এলিয়েনটা একটা প্যাটার্ন?"

"জিনিসটা আরো জটিল কিন্তু ধরে নেন অনেকটা সত্যি?"

রুমানা ভুরু কুঁচকে বলল, "কীসের প্যাটার্ন?"

সাজ্জাদ বলল, "কেউ যদি আপনাকে কয়েকটা তেঁতুলের বিচি দেয় আপনি সেটা দিয়ে একটা প্যাটার্ন বানাতে পারবেন না? কোনো একটা তারার মতো সাজালেন, কিংবা বৃত্তের মতো সাজালেন—"

রুমানা মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা এলিয়েন হয়ে গেল?"

"উঁহু। সেটা হল না। আরেকটু শুনুন তা হলে বুঝবেন। তেঁতুলের বিচি তো আর বেশি দেয়া সম্ভব না তাই প্যাটার্নটা হবে খুব সিম্পল। খুব সহজ সরল। এখন যদি কেউ আপনাকে একটা মানুষের মস্তিষ্ক দেয়, দিয়ে বলে এটার সব নিউরন, তার সকল সম্ভাব্য সিনাপ্স কানেকশন দিয়ে তুমি একটা প্যাটার্ন সাজাও—তা হলে আপনি চিন্তা করতে পারবেন আপনি কী অসাধারণ প্যাটার্ন বানাতে পারবেন?"

রুমানা বলল, "শুনেই আমার গা ঘিনঘিন করছে। মানুষের মগজ ছিঃ!"

সাজ্জাদ আবার হা হা করে হাসল, হেসে বলল, "আসলে আমি মাথা কেটে মগজ বের করে হাত দিয়ে তার নিউরন ঘাঁটাঘাঁটি করার কথা বলছিলাম না! আমি অন্যভাবে বলছিলাম। যেমন—এখন আমি আপনার সাথে কথা বলছি, আপনার মস্তিষ্কে নূতন নূতন সিনাপ্স কানেকশন হচ্ছে। যখন আপনি একটা বই পড়েন তখন আপনার মস্তিষ্কে নূতন সিনাপ্স কানেকশন তৈরি করে। যখন আপনি সুন্দর একটা গান শোনেন সেটা আপনার মস্তিষ্কে নূতন সিনাপ্স কানেকশন তৈরি করে। বলা যায় একটা নূতন প্যাটার্ন তৈরি করে।"

রুমানা ভুরু কুঁচকে বলল, "তার মানে একটা গান আসলে একটা এলিয়েন?"

"উঁহু আমি ঠিক তা বলি নি। একটা গানের স্মৃতি কিংবা শৈশবের কোনো একটা ঘটনার স্মৃতি যেরকম মস্তিষ্কে থাকতে পারে সেরকম একটা এলিয়েনও মানুষের মস্তিষ্কে থাকতে পারে।"

রুমানা কোনো কথা না বলে সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজ্জাদ বলল, "এলিয়েনের সুবিধেটুকু বুঝতে পারছেন? তার নিজের হাত পা নাক মুখের দরকার নেই। সে আমার হাত পা নাক মুখ ব্যবহার করতে পারে।"

রুমানা মাথা নাড়ল, "মানুষকে যখন জিনে ধরে তখন যেরকম হয়—"

সাজ্জাদ হাসল, "জিনে ধরায় কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কি না আমি জানি না।"

"আপনার থিওরিটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে?"

"আছে।" সাজ্জাদ হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "যদি না থাকত তা হলে এইভাবে পুলিশ মিলিটারি ঘেরাও করে আমাকে খুঁজত?"

"তারা খবর পেল কেমন করে?"

"সায়েন্টিফিক কমিউনিটি তো আমাদের কথা জানে। অনেক দিন থেকে খুঁজছে। যে এলিয়েনটা আমার কাছে এসেছে তার ক্যারিয়ারটা ধরা পড়ে গিয়েছিল।"

রুমানা বলল, "যদি সত্যিই এটা হয়ে থাকে। তা হলে আপনি আমাকে এটা বলছেন কেন? আমি যদি আপনাকে ধরিয়ে দিই।"

সাজ্জাদ হাসল, "আপনি ধরিয়ে দেবেন না।"

"আপনি কেমন করে এত নিশ্চিত হলেন?"

"শুধু যে ধরিয়ে দেবেন না তা না। আপনি আসলে আমাকে সাহায্য করবেন যেন আমি ধরা না পড়ি।"

রুমানা অবাক হয়ে বলল, "আমি আপনাকে সাহায্য করব?"

"হ্যাঁ।" সাজ্জাদ মাথা নাড়ল, "আপনি এলিয়েনটাকে আপনার মস্তিষ্কে করে নিয়ে যাবেন। পুলিশ মিলিটারি মহিলাদের ছেড়ে দিচ্ছে। আপনাকেও ছেড়ে দেবে। ওদের কাছে খবর আছে যে এলিয়েনের ক্যারিয়ার একজন পুরুষ মানুষ।"

রুমানার মুখ এবারে একটু শক্ত হয়ে গেল। বলল, "দেখেন আপনার এই গল্প বলার স্টাইলটা বেশ মজার। কিন্তু সেটাকে বেশি টেনে নেবার চেষ্টা করবেন না।"

সাজ্জাদ বলল, "একটু আমার কথা শুনুন। শেষ কথাটা—"

রুমানা সাজ্জাদের দিকে তাকাল, "কী শেষ কথা?"

সাজ্জাদ ফিসফিস করে বলল, "মানুষের চোখ আসলে মস্তিষ্কের একটা অংশ। দুজন যখন একজন আরেকজনের দিকে তাকায় তখন এই চোখের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কের যোগাযোগ হতে পারে। এই মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কের সাথে আপনার মস্তিষ্কের যোগাযোগ হয়েছে। আমি আসলে আপনার মস্তিষ্কে প্রবেশ করছি।"

রুমানা বিস্ফারিত চোখে সাজ্জাদের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে অবাক হয়ে দেখল তার সামনে থেকে সবকিছু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে শুধু দুটি চোখ দেখতে পাচ্ছে। ঝকঝকে ধারালো চোখ। সেই চোখ দুটো ধীরে ধীরে বিশাল এক শূন্যতায় রূপ নেয়। মনে হয় সেখানে কোনো আদি নেই কোনো অন্ত নেই যতদূর চোখ যায় এক বিশাল শূন্যতা। সেই ভয়াবহ শূন্যতায় বুকের ভেতর কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে। হঠাৎ করে সেই মহাজাগতিক শূন্যতার মাঝে বিন্দু বিন্দু আলোর ছটা দেখা যায়, লাল নীল সবুজ—পরিচিত আলোর বাইরে বিচিত্র সব রঙ, সেই রঙ কেউ কখনো দেখে নি। আলোর বিন্দুগুলো ধীরে ধীরে একটা রূপ নিতে থাকে। সেই বিচিত্র রূপ খুব ধীরে ধীরে নড়তে শুরু করে। রুমানার মনে হয় তার সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত একটি অতিপ্রাকৃত দৃশ্য, সেটি নড়ছে। প্রথমে ধীরে তারপর তার গতি বাড়তে থাকে। পুরো দৃশ্যটি নড়তে থাকে, কাঁপতে থাকে, ঘুরতে থাকে, একসময় প্রচণ্ড বেগে পাক খেতে খেতে তার চেতনার মাঝে প্রবেশ করতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুমানার মনে হয় সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে। মনে হয় অতল অন্ধকারে ডুবে যাবে কিন্তু সে বুঝতে পারল কেউ একজন তাকে ধরে রেখেছে। খুব ধীরে ধীরে সেই ঘূর্ণায়মান নকশা, সেই বিচিত্র রঙের আলোর বিন্দু অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রথমে আদিগন্ত বিস্তৃত শূন্যতা তারপর ধীরে ধীরে সেখানে তার পরিচিত জগৎ ফিরে আসে। সে দেখে সাজ্জাদ তাকে ধরে রেখেছে।

রুমানা ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সাজ্জাদের দিকে তাকাল। শুকনো মুখে বলল, "আমার কী হয়েছিল?"

"কিছু হয় নি।"

"হয়েছে। আপনি আমাকে হিপনোটাইজ করার চেষ্টা করেছেন।"

"আমি কিছু করি নি।" সাজ্জাদ মাথা নাড়ল, বলল, "আমি হিপনোটিজম জানি না।"

"আপনি কে? কী চান?"

"আমি কেউ না। আমি আসলে কিছু চাই না।" সাজ্জাদ একটু হাসল, হেসে চোখে কালো চশমাটি পরে সে হেঁটে ভিড়ের মাঝে মিশে গেল।

রুমানা তার মাথাটা একটু ঝাঁকাল, মনে হচ্ছে মাথাটা ভার ভার হয়ে যাচ্ছে। কী বিচিত্র একটা অভিজ্ঞতা, কাউকে বললে বিশ্বাস করবে না। রুমানা এদিক-সেদিক তাকিয়ে সামনে হেঁটে যায়। কয়েকজন পুলিশ ভিড়ের মাঝে থেকে মহিলা, শিশু আর বৃদ্ধদের আলাদা করছে। তারা লাইন ধরে ধরে বের হয়ে যাচ্ছে। অন্যদের ডান পাশে একটা ছোট ঘেরা দেওয়া জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি সাজানো। বড় বড় মনিটর, সেই মনিটরের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে কয়েকজন তাকিয়ে আছে। দেখে মনে হয় কেউ কেউ বিদেশী, নিচু গলায় নিজেদের মাঝে কথা বলছে। পাশেই একটা অ্যাম্বুলেন্স। অ্যাম্বুলেন্সের দরজা খোলা, সেখানে নীল ওভার অল পরে কয়েকজন মানুষ অপেক্ষা করছে। তাদের ঘিরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু সেনাবাহিনীর মানুষ, মুখ পাথরের মতো ভাবলেশহীন। হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র।

"পারল না। ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে এলাম।"

রুমানা চমকে উঠল, কে কথা বলে?

"অবাক হবার কিছু নেই রুমানা। আমি। আমি কথা বলছি।" রুমানা এদিক-সেদিক তাকাল, কেউ নেই তার কাছে। হঠাৎ করে এক ধরনের আতঙ্ক তার মাঝে চেপে বসে।

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই রুমানা। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। শুধু তোমার মস্তিষ্কে থাকব। যখন সময় হবে অন্য কোথাও চলে যাব।"

রুমানা ফিসফিস করে বলল, "কে? তুমি কে?"

"আমি আর তুমি আসলে একই অস্তিত্ব। তাই না? ভেবে দেখ।"

রুমানার হঠাৎ করে শৈশবের স্মৃতি ভেসে আসে। অসংখ্য স্মৃতি। দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে সেখানে একটা বন্য পশু পুড়ছে। অর্ধদগ্ধ মাংসের টুকরো টেনে নিচ্ছে সবাই। তার মা টেনে আনল একটু টুকরো। সে খাচ্ছে তার মায়ের সাথে পশুর মতোই। হঠাৎ করে মনে পড়ল বরফের হিমবাহের কথা। চারদিকে সাদা বরফ, তুষার পড়ছে, বাতাসের ঝাপটা, কে একজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধারালো পাথর দিয়ে তার মাথায় আঘাত করার চেষ্টা করছে। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মানুষটার চোখের দিকে! ঘোড়ায় করে যাচ্ছে সে। তার চারপাশে হাজার হাজার ঘোড়সওয়ার। সবার হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারালো তরবারি। চিৎকার করছে অমানুষিক গলায়। তাকে বেঁধে রেখেছে। শীর্ণ অভুক্ত সে শুয়ে আছে মাটিতে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করছে সে। গর্ভ যন্ত্রণার চিৎকার। ছোট একটা বাচ্চার কান্না শুনতে পেল সে, জন্ম দিয়েছে একজন নবজাতকের। গুলি হচ্ছে বৃষ্টির মতো। রক্তাক্ত দেহে একজন কিশোর তার দিকে তাকিয়ে আছে। অনুনয় করে বলছে তাকে বাঁচাতে। কত স্মৃতি, কত সহস্র স্মৃতি, কত লক্ষ বছরের স্মৃতি!

কত দিন থেকে বেঁচে আছে সে?

সাহস

মহাকাশযানের অধিনায়ক জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি প্রস্তুত?"

অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকা মহাকাশযানের ক্রু ইগর কাঁপা গলায় বলল, "জি ক্যাপ্টেন, আমি প্রস্তুত।"

"তা হলে যাও, আশা করি শত্রুর সাথে এই যুদ্ধে তুমি জয়ী হবে।"

ইগর তবু দাঁড়িয়ে থাকে, অগ্রসর হয় না। অধিনায়ক জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"ভয় করছে। মহাজাগতিক এই প্রাণীর সাথে যুদ্ধ করতে যেতে আমার ভয় করছে ক্যাপ্টেন।"

"তোমার কোনো ভয় নাই ইগর।" ক্যাপ্টেন তার হাতের রিমোট কন্ট্রোল স্পর্শ করে বললেন, "তোমার ভয় আমি দূর করে দিচ্ছি।"

রিমোট কন্ট্রোল স্পর্শ করে মহাকাশযানের অধিনায়ক ইগরের মস্তিষ্কে বিশেষ কম্পনের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ পাঠাতে শুরু করলেন। একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, "এখনো ভয় করছে?"

ইগর মাথা নাড়ল, "না ক্যাপ্টেন। এখন আর মোটেও ভয় করছে না।"

"তা হলে যাও, যুদ্ধ করতে যাও।"

ইগর হঠাৎ ঘুরে মহাকাশযানের অধিনায়কের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কেন যুদ্ধ করতে যাব? তুমি নিজে কেন যাও না?"

অধিনায়ক চমকে উঠে বললেন, "কী বলছ তুমি?"

"আমি তোমাকে ভয় পাই নাকি? মোটেও ভয় পাই না!" ইগর অস্ত্রটা মহাকাশযানের অধিনায়কের গলায় লাগিয়ে বলল, "ক্যাপ্টেন, তুমি যাও যুদ্ধ করতে। তা না হলে তোমার মাথা আমি ছাতু করে দেব।"

ক্যাপ্টেন কিছু বোঝার আগেই ইগর তাকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেয়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন বুঝতে পারল রিমোট কন্ট্রোলে ইগরের সাহসের বোতামে তিনি ভুল করে একটু বেশি জোরে চাপ দিয়ে ফেলেছেন।

তার এখন বেশি সাহস হয়ে গেছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিনোম জনম

১

কম বয়সী একটা মেয়ে খুট করে দরজাটা খুলে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এস, এস। তোমরা ভেতরে এস, আমরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।"

মেয়ের মুখের হাসি এবং কথাটুকু মেপে মেপে বলা কিন্তু তারপরেও ভঙ্গিটাতে এক ধরনের আন্তরিকতা ছিল, দরজার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রন এবং তার কম বয়সী স্ত্রী নিহা সেটা অনুভব করতে পারে। রন নিহার হাত ধরে ঘরের ভেতরে ঢুকে চারদিক একনজর দেখে বলল, "বাহ! কী সুন্দর।"

ঘরের ভেতরটুকু খুব সুন্দর করে সাজানো, কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে অনেক দূরের পর্বতমালাকে দেখা যায়। ঘরের অর্ধস্বচ্ছ দেয়ালের ভেতর থেকে এক ধরনের কোমল আলো বের হয়ে ঘরটাকে মায়াময় করে রেখেছে। প্রশস্ত ঘরের মাঝামাঝি কালো গ্রানাইটের একটা টেবিল, টেবিলটাকে ঘিরে কয়েকটা আরামদায়ক চেয়ার। কম বয়সী মেয়েটি দুটো চেয়ার একটু টেনে সরিয়ে এনে রন এবং নিহাকে বসার ব্যবস্থা করে দিয়ে বলল, "তোমরা কী খাবে বল। আমাদের কাছে বিষুবীয় অঞ্চলের সত্যিকারের কফি আছে। তোমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি আল্পস পর্বতের ঢালে জন্মানো আঙুরের রস আছে। যদি স্নায়ু উত্তেজনক কোনো পানীয় চাও আমরা সেটাও দিতে পারি।"

AMARBOI.COM

রন মাথা নেড়ে বলল, "আমার কিছুই লাগবে না। আমাকে একটু পানি দিলেই হবে। এই শুকনো সময়টাতে একটু পরপরই কেমন যেন গলা শুকিয়ে যায়।"

নিহা বলল, "আমি বিষুবীয় এলাকার কফি খেতে পারি। এটা সত্যিকারের কফি তো?"

কম বয়সী মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ এটা সত্যিকারের কফি। তুমি এক চুমুক খেলেই বুঝতে পারবে।"

নিহা হাসিমুখে বলল, "চমৎকার!"

"তোমার কফিতে আর কিছু দেব? ভালো ক্রিম কিংবা কোনো ধরনের সিরাপ। সাথে আরো কিছু খেতে চাও?"

নিহা হেসে বলল, "না। আর কিছু লাগবে না। তোমার কথা শুনে মনে হতে পারে আমরা বুঝি নিম্নাঞ্চলের বুভুক্ষু মানুষ—তোমাদের এখানে কিছু খেতে এসেছি!"

কম বয়সী মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল যেন নিহা খুব মজার একটা কথা বলেছে। কথাটি আসলে হেসে ওঠার মতো কথা নয়। নিম্নাঞ্চলে অনগ্রসর মানুষেরা থাকে। এ বছর সেখানে খাবারের ঘাটতি হয়েছে। অনেক মানুষ সেখানে অনাহারে-অর্ধাহারে আছে—ব্যাপারটিতে কৌতুকের কিছু নেই।

রন বলল, "আমরা কি তা হলে কাজের কথা শুরু করে দেব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম বয়সী মেয়েটি বলল, "অবশ্যই। অবশ্যই কাজের কথা শুরু করে দেব। তোমরা এত গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তোমাদের এক মিনিট সময় অপচয় করা রীতিমতো দণ্ডযোগ্য অপরাধ।"

নিহা রনের দিকে তাকিয়ে একটু আদুরে গলায় বলল, "রন। তুমি কিন্তু আমাকে তাড়া দিতে পারবে না। আমি কিন্তু আজকে সময় নিয়ে আলোচনা করতে এসেছি।"

রন মুখে হাসি টেনে বলল, "আমি তাড়া দেব না নিহা। একটা সন্তান বেছে নেয়া চাট্টিখানি কথা নয়—তুমি তোমার সময় নাও। তোমার যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে সন্তানটি ডিজাইন করে নাও।"

কম বয়সী মেয়েটি বলল, "আমি তা হলে আমাদের চিফ ডিজাইনারকে ডেকে আনছি।" মেয়েটি গলা নামিয়ে বলল, "আপনারা যেহেতু আমাদের কাছে এসেছেন আমি অনুমান করছি আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের চিফ ডিজাইনার উগুরুর নাম শুনেই এসেছেন?"

নিহা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। তার নাম শুনেছি। নেটওয়ার্কে তার কাজের বর্ণনা পড়েছি। কিছু অসাধারণ কাজ আছে তার।"

কম বয়সী মেয়েটি বলল, "উগুরু যে বাচ্চাগুলো ডিজাইন করেছেন আমি লিখে দিতে পারি আজ থেকে বিশ বছর পরে তারা এই পৃথিবীটার দায়িত্ব নেবে। আর্টস বলেন, বিজ্ঞান বলেন, প্রযুক্তি বলেন, স্পোর্টস বলেন সব জায়গায় তারা হবে পৃথিবীর সেরা।"

রন মাথা নাড়ল, বলল, "সে জন্যেই আমরা এখানে এসেছি।"

কম বয়সী মেয়েটি বলল, "আপনারা বসুন, আমি উগুরুকে ডেকে আনছি।"

উগুরু নাম শুনে নিহার চোখের সামনে যে চেহারা ভেসে উঠেছিল মানুষটি দেখতে ঠিক সেরকম। মাথায় এলোমেলো হলদে চুল, মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। কোটরাগত জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। অত্যন্ত দামি পোশাক অত্যন্ত অগোছালোভাবে পরে থাকা এবং মুখে এক ধরনের নিরাসক্ত ঔদাসীন্য যেটাকে ঔদ্ধত্য বলে ভুল হতে পারে।

উগুরু রন এবং নিহার সামনে বসে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমাদের কোম্পানিতে আপনাদের অভিবাদন।"

রন বলল, "আমাদের সময় দেয়ার জন্যে আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ।"

উগুরু বলল, "আমি যেটুকু বুঝতে পারছি আপনি নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত মানুষ। প্রতিরক্ষা বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সময় বলতে গেলে কিছুই থাকে না।"

রন বলল, "আমারও নেই। কিন্তু আমার স্ত্রীর জন্যে আমি আজকে সময় বের করে এনেছি।"

"চমৎকার।" উগুরু একটু ঝুঁকে মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে, কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে তার মুখে সেটি পুরোপুরি ফুটে ওঠে না। সেই অবস্থাতেই উগুরু বলল, "আমি নিশ্চিত আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের কোম্পানির কাজ প্রথম শ্রেণীর কাজ কিন্তু সেটি যে কোনো হিসেবে অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ।"

রন মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি।"

"এর আগেও অনেকে আমার কাছে এসেছেন কিন্তু খরচের পরিমাণটা জানার পর পিছিয়ে গেছেন।"

রনের মুখে সামরিক বাহিনীর মানুষের উপযোগী এক ধরনের কাঠিন্য ফুটে ওঠে, সে মাথা নেড়ে বলল, "আমি পিছিয়ে যাব না।"

"চমৎকার!" উগুরু আবার একটু হাসার চেষ্টা করল এবং তার হাসিটি এবারে বেশ খানিকটা সাফল্যের মুখ দেখল। উগুরু মুখের দাড়িটি অন্যমনস্কভাবে চুলকাতে চুলকাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, "আপনারা কী ধরনের সন্তান চাইছেন? সফল শোবিজ তারকা? স্পোর্টসম্যান? নাকি অন্য কিছু?"

নিহা লাজুক মুখে বলল, "আমরা কি একসাথে অনেক কিছু চাইতে পারি না? একই সাথে সুন্দর চেহারা এবং প্রতিভাবান এবং মেধাবী!"

"অবশ্যই চাইতে পারেন। একটি শিশুর জীবনের নীলনকশা থাকে তার জিনে। ক্রোমোজোমগুলোর মাঝে সেগুলো লুকিয়ে আছে। বিজ্ঞানীরা সেগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। আমরাও সেগুলো বের করার চেষ্টা করছি। কোন ক্রোমোজোমে কোন জিনটার মাঝে একটা শিশুর কোন বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে থাকে সেটা আমাদের চাইতে ভালো করে কেউ জানে না। আপনারা বলবেন, আমরা সেই জিনটা আপনাদের পছন্দমতো পাল্টে দেব।"

নিহা মাথা নেড়ে বলল, "চমৎকার!"

উগুরু তার আঙুলের সাথে জুড়ে থাকা লেখার মডিউলটা স্পর্শ করে বলল, "তা হলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করি, এটি নিশ্চয়ই আপনাদের প্রথম সন্তান?"

"হ্যাঁ।" রন বলল, "আমরা মাত্র দুই সপ্তাহ আগে সন্তান নেয়ার সরকারি অনুমতি পেয়েছি।"

"ছেলে না মেয়ে? কী চান আপনারা?"

রন সোজা হয়ে বলল, "ছেলে। অবশ্যই ছেলে।" কথা শেষ করে সে নিহার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই না নিহা?"

নিহা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ আমরা প্রথম সন্তান হিসেবে একটি ছেলে চাই।"

"তার শারীরিক গঠনের ব্যাপারে আপনাদের নির্দিষ্ট কিছু চাওয়ার আছে?"

নিহা বলল, "হ্যাঁ। লম্বা আর সুগঠিত।"

"চুলের রঙ?"

"সোনালি।"

"চোখ?"

"নীল। অবশ্যই নীল।" নিহা মাথা নেড়ে বলল, "মেঘমুক্ত আকাশের মতো নীল।"

"গায়ের রঙ?"

"তামাটে। ফর্সা রঙ যখন রোদে পুড়ে একটু তামাটে হয় সেরকম।"

উগুরু অন্যমনস্কভাবে তার দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল, "গত শতাব্দীর কিছু চলচ্চিত্র অভিনেতা, কিছু ক্রীড়াবিদের জিনোম আমাদের কাছে আছে। আমরা অ্যালবামগুলো দেখাচ্ছি। আপনারা তার মাঝে থেকে বেছে নিতে পারেন।"

নিহা বড় বড় চোখ করে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি।"

রন নিহার দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু আমাদের সন্তান কি দেখতে আমাদের মতো হওয়া উচিত না? চলচ্চিত্র অভিনেতার মতো কেন হবে?"

নিহা হিহি করে হাসতে থাকে এবং তার মাঝে উগুরু বলে, "আপনাদের সন্তান আপনাদের মতোই হবে—আমরা শুধু সেটাকে বিন্যস্ত করে দেব! চুলের রঙ, চোখের রঙ এই সব। আমাদের সিমুলেশান প্যাকেজ আপনাদের দেখিয়ে দেবে সে দেখতে কেমন হবে! ছোট থাকতে কেমন হবে বড় হলে কেমন হবে!"

নিহা বলল, "আমি আমার শখের কথা বলতে পারি?"

"অবশ্যই। অবশ্যই বলতে পারেন।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি চাই আমার ছেলে দেখতে যেরকম সুদর্শন হবে ঠিক সেরকম তার ভেতর অনেক গুণ থাকবে। সে ছবি আঁকতে পারবে। গান গাইতে পারবে তার ভেতরে লেখার ক্ষমতা থাকবে। পৃথিবীর বর্তমান সময়টা হচ্ছে বিজ্ঞানের সময়—তাই আমি চাই তার ভেতরে যেন বিজ্ঞানের মেধা থাকে। সে যেন সত্যিকারের গণিতবিদ হয়। একই সঙ্গে আমি চাই সে যেন হয় তেজস্বী আর সাহসী। তার ভেতরে যেন একটা সহজাত নেতৃত্বের ভাব থাকে।"

রন হা হা করে হেসে বলল, "সোজা কথায় তুমি চাও তোমার ছেলে হবে একজন মহাপুরুষ!"

নিহা একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "কেন? তাতে দোষের কী আছে? আমি কি চাইতে পারি না যে আমার ছেলে একজন মহাপুরুষ হোক?"

উগুরু বলল, "অবশ্যই চাইতে পারেন। আগে সেটি ছিল মায়েদের স্বপ্ন—এখন সেটি আর স্বপ্ন নয় এখন সেটি আমাদের হাতের মুঠোয়।"

নিহা উৎসুক চোখে বলল, "তা হলে আমি কি সত্যি সত্যি এরকম একজন সন্তান পেতে পারি?"

"অবশ্যই পারেন।" উগুরু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আমরা গত কয়েক শতাব্দীর পৃথিবীর সব বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, ক্রীড়াবিদ, অভিনেতা, দার্শনিক, নেতা, নেত্রীর জিনোম সংগ্রহ করেছি। তাদের ভেতরে ঠিক কোন জিনটি আলাদাভাবে তাদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়েছে সেটা আলাদা করেছি। সেই জিনটি বিকশিত করতে হলে আর অন্য কোন জিনের সহযোগিতার দরকার আমরা সেগুলোও বের করেছি। কাজেই আপনারা যেটা চাইবেন আমরা সেটা আপনাদের সন্তানের মাঝে দিয়ে দেব!"

নিহা জ্বলজ্বলে চোখে বলল, "সত্যি সত্যি সেটাই দিতে পারবেন?"

"অবশ্যই!" উগুরু মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের কাছে আইনস্টাইন থেকে শুরু করে নেলসন ম্যান্ডেলা, জ্যাক নিকলসন থেকে শুরু করে মাও জে ডং, টনি মরিসন থেকে শুরু করে বিল গেটস সবার জিনোম আছে।" উগুরু হঠাৎ মাথা ঝুঁকিয়ে নিচু গলায় বলল, "আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। আমরা হিটলারের জিনোমও সংগ্রহ করেছি!"

"হিটলার? কেন? হিটলার কেন?"

"এমনিই। হতেও তো পারে কোনো একজন নিও নাৎসি কেউ তার সন্তানের ভেতর হিটলারের ছায়া দেখতে চাইবে! যাই হোক যেটা বলছিলাম—আপনারা ঠিক কী চাইছেন বলে দেন আমরা আপনার সন্তানকে ডিজাইন করে দেব। সবচেয়ে বড় কথা আপনারা যে সন্তানটি পাবেন সে হবে সম্পূর্ণভাবে নীরোগ—তাকে কোনো রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করবে না। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"আমাদের কোম্পানি থেকে আমরা আপনাদের সার্টিফিকেট দেব।"

"সার্টিফিকেট?"

"হ্যাঁ" উগুরু মাথা নেড়ে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এই জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আমরা যদি একটি শিশু ডিজাইন করে তাকে সার্টিফিকেট দেই সেটা সব জায়গায় গ্রহণ করা হয়। আপনাদের সন্তান স্কুলে সবচেয়ে বেশি সুযোগ পাবে। লেখাপড়ায় তাকে সবচেয়ে আগে নেয়া হবে—যখন সে তার জীবন শুরু করবে তখন তার ধারেকাছে কেউ থাকবে না। একজন সন্তানের জন্যে এর চাইতে বড় বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রন মাথা নিচু করে বলল, "আমরা জানি। সে জন্যেই আমরা আপনাদের কাছে এসেছি।"

উগুরু তার কফির মগে চুমুক দিয়ে বলল, "তা হলে চলুন আমরা কাজ শুরু করি। ভেতরে আমাদের বড় ডিসপ্লে রয়েছে সেখানে আমরা পুরো প্রক্রিয়াটি সিমুলেট করতে পারি। আপনাদের দুজনের ক্রোমোজোমগুলো নিয়ে আপনাদের সামনেই আপনাদের সন্তানকে ডিজাইন করব। সন্তান জন্ম দেবার আগেই আপনারা আপনাদের সন্তানদের দেখতে পাবেন।"

নিহা রনের হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল, "চল রন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না!"

রন বলল, "চল। কিন্তু তোমার সন্তানের জন্য তোমাকে অন্তত নয় মাস অপেক্ষা করতে হবে।"

২

রিশ গামলার পানি দিয়ে রগড়ে রগড়ে শরীরের কালি তুলতে তুলতে বলল, "তিনা। আজকে রাতে আমরা কী খাচ্ছি?"

রিশের স্ত্রী তিনা কাপড় ভাঁজ করে তুলতে তুলতে বলল, "মনে নেই? আজ আমরা বাইরে খেতে যাব?"

রিশের সত্যি মনে ছিল না, সে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। সে জন্য আমি কিছু রাঁধি নি।"

"কোথায় যাবে ঠিক করেছ?"

তিনা হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আমরা কি আর পার্বত্য অঞ্চলে খেতে যাব? এই আশপাশে কোথাও বসে খেয়ে নেব।"

রিশ একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলল। তারা নিম্নাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ, হঠাৎ করে খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে। আশপাশে অনেক মানুষ অনাহারে–অর্ধাহারে আছে এরকম সময় বাইরে খেতে যেতে এক ধরনের অপরাধবোধের জন্ম হয় কিন্তু দিন–রাত পরিশ্রম করতে করতে মাঝে মাঝেই দুজনের ইচ্ছে করে বাইরে কোথাও সুন্দর একটা জায়গায় বসে খেতে। অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে কথা বলতে। হালকা কোনো বিনোদনে সময় কাটিয়ে দিতে।

রিশ তার তেলকালি মাখা কাপড় পাল্টে পরিষ্কার কাপড় পরে বলল, "তিনা, আমিও রেডি। চল, যাই। যা খিদে পেয়েছে মনে হয় একটা আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারব।"

তিনা খিলখিল করে হেসে বলল, "যদি খেতেই চাও তা হলে আস্ত ঘোড়া কেন, অন্য কিছু খাও! ঘোড়া কি একটা খাওয়ার জিনিস হল?"

রিশ বলল, "এটা একটা কথার কথা! ঘোড়া কি কোথাও আছে? চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও কি ঘোড়া দেখেছ কখনো?"

"সেজন্যই তো বলছি—দুই চারটে যা কোনোমতে টিকে আছে সেটাও যদি খেয়ে ফেলতে চাও তা হলে কেমন করে হবে?"

কিছুক্ষণের মাঝেই তিনা বাইরে যাবার পোশাক পরে বের হয়ে এল। তাকে একনজর দেখে রিশ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার খুব দুর্ভাগ্য যে তুমি নিম্নাঞ্চলে জন্ম নিয়েছ! যদি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার পার্বত্য অঞ্চলে জন্ম হত তা হলে নিশ্চয়ই সামরিক অফিসারের সাথে বিয়ে হত। গলায় হীরার নেকলেস পরে তুমি এক পার্টি থেকে আরেক পার্টিতে যেতে!"

তিনা হাসতে হাসতে বলল, "ভাগ্যিস আমার পার্বত্য অঞ্চলে জন্ম হয় নি! আমি পার্টি দুই চোখে দেখতে পারি না!"

রিশ তিনার হাত ধরে বলল, "আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় তোমার খুবই দুর্ভাগ্য যে আমার মতো চালচুলোহীন একজন মানুষের সাথে বিয়ে হয়েছে! তোমার এর চাইতে ভালো একটা জীবন পাবার কথা ছিল!"

তিনা রিশের মুখমণ্ডল স্পর্শ করে বলল, "তুমি যখন নাটকের ব্যর্থ নায়কদের মতো কথা বল তখন সেটা শুনতে আমার ভারি মজা লাগে! অনেক হয়েছে—এখন চল।"

ঘরে তালা লাগিয়ে দুজন যখন বাইরে এসেছে তখন শহরের রাস্তায় সান্ধ্যকালীন উত্তেজনাটুকু শুরু হয়েছে। ফুটপাতে মাদকসেবী ছিন্নমূল মানুষ বসে বসে বিড়বিড় করে কথা বলছে। উজ্জ্বল পোশাকপরা কিছু তরুণী কৃত্রিম ফুল বিক্রি করছে। পথের পাশে উত্তেজক পানীয়ের দোকানে হতচ্ছাড়া ধরনের কিছু মানুষের জটলা। পথের পাশে দ্রুতলয়ের সঙ্গীতের সাথে সাথে কিছু নৃত্যপ্রেমিক মানুষের ভিড়। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে কয়েকটি দোকান—চারদিকে অনেক মানুষ। খুব ভালো করে খুঁজলেও কিন্তু কোথাও একটি শিশুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিম্নাঞ্চলে শিশুর খুব অভাব।

রিশ আর তিনা তাদের পছন্দের একটা ছোট রেস্টুরেন্টে জানালার পাশে একটা টেবিলে এসে বসে। টেবিলের প্যানেলে স্পর্শ করে খাবার অর্ডার দিয়ে তারা তাদের পানীয়ে চুমুক দেয়। রিশ চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "তিনা, তোমাকে আজকে খুব সুন্দর লাগছে!"

তিনা খিলখিল করে হেসে বলল, "আমি আগেও দেখেছি—পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দেবার সাথে সাথে তোমার আমাকে সুন্দর লাগতে থাকে!"

"এরকম সৌন্দর্য নিয়ে তোমার আমার মতো একজন কাঠখোট্টা মানুষকে বিয়ে করা ঠিক হয় নি। তোমার নাটকে কিংবা চলচ্চিত্রে অভিনয় করা উচিত ছিল!"

তিনা রহস্য করে বলল, "তার কি সময় শেষ হয়ে গেছে? আমি তো এখনো নাটকে না হয় চলচ্চিত্রে চলে যেতে পারি!"

রিশ মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু! আমি তোমাকে এখন আর কোথাও যেতে দেব না। আমি সারা দিন ফ্যাক্টরিতে কাজ করি। বড় মেশিনগুলো চালিয়ে চালিয়ে সময় কাটাই আর ভাবি কখন আমি বাসায় আসব আর কখন তোমার সাথে দেখা হবে!"

তিনা বলল, "আমাদের ফ্যাক্টরিতে একটা ছেলে কাজ করে, সে কী বলেছে জান?"

"কী বলেছে?"

"সে নাকি পড়েছে যে পুরুষ মানুষেরা কখনো একটি মেয়েকে নিয়ে সুখী হতে পারে না! কত দিন পরেই তার মন উঠে যায় তখন তারা অন্য মেয়েদের পিছনে ছোটে। ভ্রমরের মতো।"

রিশ বলল, "হতে পারে। আমি তো আর বেশি লেখাপড়া করি নি তাই আমি জানি না পুরুষ মানুষদের কেমন হওয়া উচিত। আমি তাই আমার মতন রয়ে গেছি। এখনো ভ্রমরের মতো হতে পারি নি।"

তিনা বলল, "আমিও তাই চাই। তুমি যেন সব সময় তোমার মতো থাক—" কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

রিশ তার পানীয়ে চুমুক দিয়ে বলল, "কী হল তিনা, তুমি অন্য কিছু ভাবছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনা রিশের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ রিশ, আমি আজকে তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলার জন্যে এখানে ডেকে এনেছি।"

"বিশেষ কথা?" রিশ সোজা হয়ে বসে বলল, "আমাকে বলবে?"

"হ্যাঁ।"

"কী কথা?"

তিনা দুর্বলভাবে একটু হেসে বলল, "আমি একটা সন্তানের জন্ম দিতে চাই। আমি মা হতে চাই।"

রিশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তিনার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে দেখে মনে হল তিনা কী বলেছে সেটা সে বুঝতে পারে নি। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "তু-তুমি সন্তান জন্ম দিতে চাও? আমার আর তোমার সন্তান?"

"হ্যাঁ।" তিনা এবার বেশ জোর দিয়ে বলল, "আমার আর তোমার সন্তান।"

"কিন্তু সেটা তো অসম্ভব। সন্তান জন্ম দিতে হলে অনেক কিছু থাকতে হয়। আমাদের কিছু নেই—আমাদের কখনো অনুমতি দেবে না!"

"দেবে।"

"দেবে?"

"হ্যাঁ। বিয়ের পর থেকে আমি একটু একটু করে ইউনিট জমাচ্ছি—একজন সন্তান চাইলে তার ব্যাংকে যত ইউনিট থাকতে হয় আমার সেটা আছে!"

রিশ চোখ কপালে তুলে বলল, "সত্যি?"

তিনা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ সত্যি।" সে একটু এগিয়ে রিশের হাত স্পর্শ করে বলল, "রিশ, আমি তোমাকে কখনো ভালোমন্দ খেতে দিই নি। ভালো পোশাক কিনতে দিই নি। আমরা কখনো কোথাও বেড়াতে যাই নি। কখনো আমি কোনো প্রসাধন কিনি নি। কোনো গয়না কিনি নি—দাঁতে দাঁত কামড়ে আমি শুধু ইউনিট জমিয়ে গেছি। দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমি ওভারটাইম কাজ করেছি। আমি তোমাকে দিয়ে ওভারটাইম করিয়েছি। যখন অসুখ করেছে তখন ডাক্তারের কাছে যাই নি। উৎসব আনন্দে কাউকে কোনো উপহার দিই নি—যক্ষের মতো ইউনিট জমিয়ে গেছি! তুমি বিশ্বাস করবে কি না আমি জানি না আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এখন দশ হাজার ইউনিট জমা হয়েছে—আমরা এখন সন্তানের জন্যে আবেদন করতে পারি।"

"দশ হাজার?"

"হ্যাঁ, দশ হাজার!"

"কিন্তু—" রিশ ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু..."

"কিন্তু কী?"

"শুধু সন্তান জন্ম দিলেই তো হবে না। তাকে মানুষ করতে হবে না?"

"হ্যাঁ।" তিনা মাথা নাড়ল, "অবশ্যই সন্তানকে মানুষ করতে হবে। তুমি আর আমি মিলে আমাদের সন্তানকে মানুষ করতে পারব না? আদর দিয়ে ভালবাসা দিয়ে স্নেহ দিয়ে—"

"তিনা, তুমি তো খুব ভালো করে জান এখন সন্তান জন্ম দেবার আগে সবাই জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যায়। তারা সুস্থ সবল নীরোগ প্রতিভাবান সন্তান ডিজাইন করে দেয়। লক্ষ লক্ষ ইউনিট খরচ করে সেই সব প্রতিভাবান সন্তানেরা জন্ম নেয়। তারা বড় হয়ে বিজ্ঞানী হয় ইঞ্জিনিয়ার হয়। কবি-সাহিত্যিক লেখক হয়! আমাদের সন্তান তো সেরকম কিছু হবে না—সে হবে খুব সাধারণ একজন মানুষ—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনা মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ। আমাদের সন্তান হবে খুব সাধারণ একজন মানুষ। ঠিক আমাদের মতো। আমার মতো আর তোমার মতো। সে আমাদের সাথে থাকবে আমরা তাকে বুক আগলে বড় করব। বড় হয়ে আমাদের মতো কোনো ফ্যাক্টরিতে চাকরি করবে। যদি সে ছেলে হয় তা হলে টুকটুকে একজন মেয়েকে বিয়ে করবে—আমরা উৎসবের দিন উপহার নিয়ে তাদের দেখতে যাব। যদি মেয়ে হয় সে বড় হয়ে তোমার মতো একজন সুদর্শন হৃদয়বান মানুষ খুঁজে নেবে—তারা উৎসবের দিন আমাদের দেখতে আসবে।"

রিশ তার পানীয়ের গ্লাসটা টেবিলে রেখে বলল, "তিনা, তুমি কি জান তুমি কী সাংঘাতিক কথা বলছ? একটি সন্তান কত বড় দায়িত্ব তুমি জান? শুধু বেঁচে থাকার জন্যে আমি আর তুমি কত কষ্ট করি তুমি ভেবে দেখেছ? সেই কঠোর পৃথিবীতে তুমি একটা শিশু আনতে চাইছ? যেই শিশুর জন্ম হবে একেবারে অতি সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে। জীবনের প্রতিটি পদে তাকে অবহেলা করা হবে। সে স্কুলে ঢুকতে পারবে না—যদি বা ঢুকে সে পাস করতে পারবে না। শিক্ষা নিতে পারবে না—বন্ধুরা তাকে তাচ্ছিল্য করবে। শিক্ষকরা অবেহলা করবে। বড় হবে এক ধরনের হীনম্মন্যতা নিয়ে। তার জন্যে জীবনের কোনো সুযোগ থাকবে না—কোনো আশা থাকবে না—কোনো স্বপ্ন থাকবে না! কে জানে হয়তো তোমার কিংবা আমার কোনো একটা ব্যাধি তার শরীরে ঢুকে যাবে। হয়তো—"

তিনা বাধা দিয়ে বলল, "এভাবে বোলো না রিশ। আমাদের সন্তান হবে ঠিক তোমার আর আমার মতো। আমরা যেরকম স্বপ্ন দেখি সে ঠিক সেরকম স্বপ্ন দেখবে। আমরা যেরকম কঠিন একটা জীবনে যুদ্ধ করতে করতে একজন আরেকজনের ভেতরে সাহস খুঁজে পাই সেও সেরকম সাহস খুঁজে পাবে! আমাদের সন্তান সাধারণ একজন মানুষ হয়ে বড় হবে। কিন্তু তাতে সমস্যা কী? একসময় কি সাধারণ মানুষ এই পৃথিবীকে এগিয়ে নেয় নি!"

রিশ বিষণ্ন মুখে বলল, "কিন্তু তিনা এখন সেই পৃথিবী নেই। এখন পৃথিবীর মানুষ পরিষ্কার দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। যাদের অর্থবিত্ত আছে, তারা একভাগ। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে প্রতিভাবান, বুদ্ধিমান। অন্যভাগ হতদরিদ্র—তারা কোনোমতে শুধু টিকে থাকে। তারা পৃথিবীর সৌভাগ্যবান মানুষের জীবনের আনন্দটুকু নিশ্চিত করার জন্যে দিন থেকে রাত অবধি পরিশ্রম করে—আমি সেই জীবনে একজন শিশুকে আনতে চাই না তিনা। আমার নিজের সন্তানকে সেই কঠোর কঠিন একটা জীবন দিতে চাই না—"

তিনা রিশের দুই হাত জাপটে ধরে বলল, "রিশ! তুমি না কোরো না। দোহাই তোমার—আমি সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছি আমার একটা সন্তান হবে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরব। সে আমার বুকের ভেতর ছোট ছোট হাত-পা নেড়ে খেলা করবে। দাঁতহীন মাঢ়ী দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে। আমি তাকে কোলে নিয়ে গান গেয়ে ঘুম পাড়াব। আমি তার জন্যে ছোট ছোট জামা বানাব। সেই লাল টুকটুকে জামা পরে সে খিলখিল করে হাসবে। তুমি না কোরো না রিশ তুমি না কোরো না—"

রিশ তিনার হাত ধরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি আমার কাছে কখনোই কিছু চাও নি তিনা। আমার কিছু দেবার ক্ষমতা নেই সে জন্যেই বুঝি চাও নি! এই প্রথম তুমি আমার কাছে কিছু চেয়েছ—আমি তোমাকে কেমন করে না করব?"

"সত্যি তুমি রাজি হয়েছ?"

"সত্যি।"

"মন খারাপ করে রাজি হয়েছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না। মন খারাপ করে না। খুশি হয়ে রাজি হয়েছি। তিনা—তুমি জান আমি অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়েছি। এই পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তুমি যদি আনন্দ পাও—আমি তা হলে আনন্দ পাই। তুমি যখন মন খারাপ কর তখন আমার মন খারাপ হয়ে যায়! তুমি যেটা চাইবে, যেভাবে চাইবে সেটাই হবে। সেভাবেই হবে!"

তিনা রিশের হাত ধরে রেখে বলল, "একদিন ছিলাম শুধু তুমি আর আমি। এখন হব আমরা তিনজন। তুমি আমি আর রিকি।"

"রিকি?"

তিনা লাজুক মুখে হেসে বলল, "হ্যাঁ। যদি আমাদের ছেলে হয় তা হলে আমরা তার নাম রাখব রিকি। মেয়ে হলে কিয়া।"

রিশ চোখ বড় বড় করে বলল, "নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। নাম পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে।"

রিশ হাসতে হাসতে তার পানীয়ের গ্লাসটি তুলে নেয়।

৩

মধ্যবয়স্কা মহিলাটি চোখ বড় বড় করে তিনার দিকে তাকিয়ে রইল। কয়েক বার চেষ্টা করে বলল, "তুমি কী বলছ? তুমি স্বাভাবিক উপায়ে বাচ্চা জন্ম দেবে?"

"হ্যাঁ। আমি স্বাভাবিক উপায়ে বাচ্চা জন্ম দেব।"

"তুমি কি জান কেউ স্বাভাবিক উপায়ে বাচ্চা জন্ম দেয় না? যখন ভ্রূণটার বয়স তিন থেকে চার মাস হয় তখনই এটাকে জন্ম দিয়ে হাসপাতালের সেলে তার শরীরে রক্ত সরবরাহ করে তাকে বড় করা হয়?"

তিনা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি। কিন্তু আমি তবুও স্বাভাবিক উপায়ে বাচ্চা জন্ম দিতে চাই।"

মধ্যবয়স্কা মহিলাটি কঠিন গলায় বলল, "না। স্বাভাবিক উপায়ে মায়ের বাচ্চা জন্ম দেয়া কী ভয়ংকর কষ্ট তুমি জান না। সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান এই পদ্ধতি বের করেছে। এই পদ্ধতিতে ভ্রূণ হিসেবে বাচ্চার জন্ম দেয়া হয়। ভ্রূণটির আকার ছোট বলে মায়ের কোনো কষ্ট হয় না।"

তিনা বলল, "আমি সেটাও জানি। আমি এই বিষয়গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি।"

"তা হলে তুমি কেন স্বাভাবিক উপায়ে বাচ্চা জন্ম দেবার কথা বলছ?"

"দুটি কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে এটাই প্রকৃতির বেছে নেয়া উপায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই নূতন প্রক্রিয়া বের করার আগে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এই প্রক্রিয়ায় সন্তান জন্ম দিয়েছে কাজেই এটা নিশ্চয়ই একটা গ্রহণযোগ্য উপায়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ভ্রূণ হিসেবে সন্তানের জন্ম দিয়ে হাসপাতালে কৃত্রিম পরিবেশে তাকে বড় করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন আমরা সেই পরিমাণ অর্থ অপচয় করতে চাই না।"

মধ্যবয়স্কা মহিলাটি ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমার যদি প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে তা হলে তুমি কেন সন্তান জন্ম দিতে চাইছ?"

"সন্তান জন্ম দেবার জন্যে রাষ্ট্রীয় নিয়মে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন আমাদের সেই পরিমাণ অর্থ আছে। কিন্তু আমি কৃত্রিম উপায়ে সন্তানের জন্ম দিতে চাই না। আমি সন্তানকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের শরীরে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধারণ করতে চাই। আমি মনে করি একজন মায়ের সেই অধিকার আছে।"

মহিলাটি হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমি যদি আগে জানতাম তুমি এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নেবে তা হলে আমি কখনোই তোমাকে মা হতে দিতাম না!"

তিনা মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি। তাই আমার এই সিদ্ধান্তের কথাটি আগে বলি নি।"

তিনা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি এখন যাই? আমার সন্তান জন্মানোর আগে আগে আমি আসব—তখন হয়তো একজন ডাক্তারের প্রয়োজন হবে।"

মহিলাটি কঠিন মুখে বলল, "একেবারে না এলেই ভালো। পুরোটাই নিজে নিজে করে ফেলতে পার না?"

রিশ এতক্ষণ তিনার পাশে বসেছিল, একটি কথাও বলে নি। এবার সে প্রথম মুখ খুলল, বলল, "যদি প্রয়োজন হয় আমরা সেটাও করে ফেলতে পারব। তুমি নিশ্চয়ই জান নিম্নাঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা কিন্তু তোমাদের সাহায্য ছাড়াই বেঁচে আছে!"

মহিলাটি কোনো কথা বলল না, রিশ আর তিনা হাত ধরে বের হয়ে যাবার পর মহিলাটি দাঁতে দাঁত ঘষে বিড়বিড় করে বলল, "পৃথিবীটাকে তোমাদের হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই মঙ্গল। তোমাদের জন্যেও—আমাদের জন্যেও।"

৪

রন নিহার হাত ধরে বলল, "তোমার কেমন লাগছে নিহা?"

নিহা বলল, "ভালো। আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না আমি আমার সন্তানের জন্ম দিয়েছি।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে এখনো আমাদের সন্তান হয়ে ওঠে নি। সে এখনো একটা ভ্রূণ। ডাক্তারেরা তাকে একটা কাচের জারের ভেতর তরলে ডুবিয়ে রেখেছে। তার শরীরে রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করছে।"

"কখন এটা শেষ হবে?"

"আমি জানি না।"

"যখন শেষ হবে, তখন কি আমরা তাকে দেখতে পাব?"

"চাইলে নিশ্চয়ই দেখতে পারব। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

রন ইতস্তত করে বলল, "ডাক্তারেরা চায় না ভ্রূণ হিসেবে আমরা তাকে দেখি। এখনো সে দেখতে মানবশিশুর মতো নয়। এখন তাকে দেখলে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে।"

নিহা বলল, "আমার নিজের সন্তানকে দেখে আমার মোটেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে না।"

রন নিহার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই হবে না। তবুও আমার মনে হয় আমরা ছয় মাস পরেই তাকে দেখি। তখন সে সত্যিকারের মানবশিশু হয়ে যাবে।"

নিহা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার সন্তান আমার শরীরের ভেতর বড় হচ্ছিল, সেটা চিন্তা করেই আমি নিজের ভেতর এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করেছি। এখন সে

AMARBOI.COM

আমার শরীরের ভেতরে নেই তাকে দেখতেও পাব না—চিন্তা করে মন খারাপ লাগছে। আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"আমার মনে হয় প্রাচীনকালের নিয়মটাই ভালো ছিল। তখন মায়েরা তাদের সন্তানকে নিজের ভেতর ধারণ করত। তাকে পূর্ণ মানবশিশু হিসেবে জন্ম দিত।"

রন শব্দ করে হেসে বলল, "একজন পূর্ণাঙ্গ শিশুকে জন্ম দেয়া কত কঠিন তুমি জান? সেটি কী ভয়ংকর যন্ত্রণা তুমি জান?"

"কিন্তু একসময় তো পৃথিবীর সব শিশু এভাবেই জন্ম নিত!"

"একসময় আরো অনেক কিছু হত নিহা। মহামারী হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেত। প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নিত। মানসিক রোগীকে চারদেয়ালের ভেতর বন্ধ করে রাখা হত—"

নিহা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার সন্তানকে জন্ম দিয়ে নিজেকে কেমন জানি খালি খালি মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে কী যেন হারিয়ে গেল।"

"ওটা কিছু নয়।" রন নিহার হাত ধরে বলল, "ডাক্তার বলেছে শরীরে হরমোনের তারতম্য থেকে এটা হয়। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

নিহা কোনো কথা না বলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। ঠিক কী কারণ জানা নেই তার কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

৫

তিনার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। রিশের মুখ ভয়ার্ত এবং রক্তশূন্য। দুই হাতে শক্ত করে সে তিনার একটা হাত ধরে রেখেছে। হঠাৎ চমকে উঠে বলল, "ঐ যে-শব্দ হল না? মনে হয় ডাক্তার এসে গেছে।"

তিনার যন্ত্রণাকাতর মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, "না রিশ। কোনো শব্দ হয় নি। কোনো ডাক্তার আসে নি। আমি জানি কোনো ডাক্তার আসবে না।"

"কেন আসবে না?"

"আসবে না, কারণ আমাদের জন্যে কারো মনে কোনো ভালবাসা নেই, রিশ। তুমি আমাকে বলেছিলে পৃথিবীর মানুষ এখন দুই ভাগে ভাগ হয়েছে—সুখী আর হতভাগা! আমরা হতভাগা দলের।"

রিশ কাঁপা গলায় বলল, "এখন এভাবে কথা বোলো না তিনা।"

"ঠিক আছে বলব না। কিন্তু তোমাকে আমার সাহায্য করতে হবে। পারবে না?"

"পারব।"

"পৃথিবীর কোটি কোটি মা এভাবে সন্তানের জন্ম দিয়েছে। আমিও দেব।"

"অবশ্যই দেবে।"

"কী করতে হবে আমি তোমাকে বলব। তুমি শুধু আমার পাশে থাক।"

"আমি তোমার পাশে আছি তিনা।"

"আমি যদি যন্ত্রণায় চিৎকার করি তুমি ভয় পাবে না তো?"

রিশ বলল, "না। আমি ভয় পাব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার ব্যথাটা একটু পরে পরেই আসছে। আমার মনে হয় আর কিছুক্ষণের মাঝেই আমি আমার বাচ্চাটার জন্ম দেব।"

"ঠিক আছে তিনা। তোমার কোনো ভয় নেই। আমি আছি।"

"আমি জানি তুমি আছ।"

"তুমি ঠিকই বলেছ তিনা। পৃথিবীর কোটি কোটি মা এভাবে সন্তান জন্ম দিয়েছে। তুমিও পারবে।"

তিনা যন্ত্রণার একটা প্রবল ধাক্কা দাঁতে দাঁত কামড় দিয়ে সহ্য করতে করতে বলল, "পারব। নিশ্চয়ই পারব।"

রিশ অনুভব করে একটু আগে তার ভেতরে যে এক ধরনের অসহায় আতঙ্ক এসে ভর করেছিল সেটা কেটে যাচ্ছে। তার বদলে তার নিজের ভেতর এক ধরনের আত্মবিশ্বাস এসে ভর করছে। নিজের ভেতর সে এক ধরনের শক্তি অনুভব করতে শুরু করেছে। সে পারবে। নিশ্চয়ই সে তিনাকে তার সন্তানের জন্ম দিতে সাহায্য করতে পারবে।

ভয়ংকর যন্ত্রণা ঢেউয়ের মতো আসতে থাকে। তিনা সেই যন্ত্রণা সহ্য করে অপেক্ষা করে। দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার শরীরের ভেতর বেড়ে ওঠা সন্তানকে পৃথিবীর আলো বাতাসে নিয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করে।

অমানুষিক একটা যন্ত্রণায় তার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যেতে চায়। চোখের ওপর একটা লাল পর্দা কাঁপতে থাকে। তিনা কিছু চিন্তা করতে পারে না, কিছু ভাবতে পারে না। পৃথিবীর আদিমতম অনুভূতির ওপর ভর করে সে তার সন্তানকে জন্ম দেয়ার চেষ্টা করে যায়। ভয়ংকর যন্ত্রণায় সে অচেতন হয়ে যেতে চায় তার ভেতরেও সে চেতনাকে জোর করে ধরে রাখে—যখন মনে হয় সে আর পারবে না ঠিক তখন হঠাৎ করে সমস্ত যন্ত্রণা মুহূর্তের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং পরের মুহূর্তে সে একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পেল। তিনার ঘামে ভেজা সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। সে হাত তুলে বলল, "রিশ, আমার বাচ্চাটাকে আমার কাছে দাও। আমার বুকের মাঝে দাও।"

রিশ রক্তমাখা সন্তানটিকে দুই হাতে ধরে সাবধানে তিনার বুকের ওপর শুইয়ে দিল। তিনা দুই হাতে তাকে গভীর ভালবাসায় আঁকড়ে ধরে। রক্ত ক্লেদ মাখা শিশুটি তখনো তার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। তিনা জানে এই কান্না কোনো দুঃখের কান্না নয়, কোনো যন্ত্রণার কান্না নয়। পৃথিবীর বাতাস বুকে টেনে নিয়ে বেঁচে থাকার প্রথম প্রক্রিয়া হচ্ছে এই কান্না। সে সুস্থ সবল একটা শিশুর জন্ম দিয়েছে।

তিনা গভীর ভালবাসায় তার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—তার এখনো বিশ্বাস হয় না সে তার নিজের শরীরের ভেতর তিলে তিলে গড়ে ওঠা একটা মানবশিশুর দিকে তাকিয়ে আছে। এই মানবশিশুটি একান্তভাবেই তার। তার আর রিশের।

৬

ছোট একটা ব্যাসিনেটে একটা শিশু শুয়ে শুয়ে হাত-পা নাড়ছে, নিহা অপলক শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইল। রনের হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, "এটি আমাদের সন্তান?"

"হ্যাঁ। এটি আমাদের সন্তান। দেখছ না কী সুন্দর নীল চোখ, আকাশের মতো নীল, ঠিক যেরকম তুমি বলেছিলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিহা মাথা নাড়ল, বলল, "মাথায় এখন কোনো চুল নেই। যখন চুল উঠবে সেটা হবে সোনালি। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমার এই বাচ্চাটি যখন বড় হবে তখন সে হবে পৃথিবীর সেরা প্রতিভাবান। তাই না?"

রন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ সে হবে পৃথিবীর সেরা প্রতিভাবান। সে ছবি আঁকতে পারবে, গণিত করতে পারবে। সে হবে খাঁটি বিজ্ঞানী। সে হবে সুদর্শন, সুস্থ সবল নীরোগ! মনে নেই উগুরু বলেছে সে আমাদের একটা সার্টিফিকেট দেবে?"

"মনে আছে।" নিহা মাথা নাড়ল, "দেখে আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না এই ছোট বাচ্চাটা একদিন বড় হয়ে পৃথিবীর সেরা প্রতিভাবান একজন মানুষ হবে! আমি বাচ্চাটাকে ছুঁয়ে দেখি?"

রন হেসে বলল, "অবশ্যই নিহা। এটা তোমার বাচ্চা—তুমি শুধু ছুঁয়ে দেখবে না তুমি ইচ্ছে করলে তাকে কোলে নেবে। তাকে বুকে চেপে ধরবে। তার গালে চুমু খাবে।"

নিহা খুব সাবধানে শিশুটিকে একবার স্পর্শ করে। তারপর তাকে কোলে তুলে নেয়। বুকে চেপে ধরে শিশুটির গালে তার মুখ স্পর্শ করে। সে তার বুকের ভেতর এক বিচিত্র কম্পন অনুভব করে—এটি তার সন্তান, নিজের সন্তান!

শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে নিহা যখন রনের সাথে সাথে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে আসছিল ঠিক তখন তারা দেখতে পায় করিডোর ধরে উগুরু এগিয়ে আসছে। উগুরু তার মুখের দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে হাসি ফুটিয়ে বলল, "জানতে পারলাম আজকে আপনারা আপনাদের সন্তানকে নিতে আসছেন। তাই আমি নিজেই দেখতে চলে এলাম।"

রন হাসিমুখে বলল, "আমি সেটা বুঝতে পেরেছি! আপনি আপনার ডিজাইন করা বাচ্চাটিকে দেখতে চাইবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক।"

"হ্যাঁ।" উগুরু মাথা নাড়ল। "আমি এখন পর্যন্ত যত শিশু ডিজাইন করেছি তার মাঝে এই শিশুটি সবচেয়ে চমকপ্রদ। আটটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য এর মাঝে বিকশিত করা হয়েছে। বর্তমানে যে মানদণ্ড দাঁড়া করা হয়েছে তার হিসেবে আপনার এই শিশুটি পুরো আশি পয়েন্টের একটি শিশু!"

রন হাসতে হাসতে বলল, "আমি আপনাদের এই পয়েন্টের হিসেব বুঝি না। ধরে নিচ্ছি আশি পয়েন্টের শিশু বলতে একজন প্রতিভাবান শিশু বোঝানো হয়।"

উগুরু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। সারা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আশি পয়েন্টের শিশু খুব বেশি ডিজাইন করা হয় নি।" উগুরু তার পকেট থেকে একটা খাম বের করে রনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "এই যে এখানে আমার কোম্পানির সার্টিফিকেটের একটা কপি। মূল সার্টিফিকেট রয়েছে জাতীয় ডাটাবেসে—যখন খুশি তখন আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারবেন! এই সার্টিফিকেটের কারণে আপনার এই শিশুটির জীবনের অনেক কিছুই খুব সহজ হয়ে যাবার কথা।"

নিহা মাথা নেড়ে বলল, "অনেক ধন্যবাদ।"

উগুরু গলা লম্বা করে নিহার কোলে ধরে রাখা শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখেছেন? আমাদের সিমুলেশন বাচ্চাটির যে চেহারা তৈরি করেছিল তার সাথে হুবহু মিলে গেছে?"

সিমুলেশনে বাচ্চার চেহারা কেমন ছিল নিহার মনে নেই তবুও সে ভদ্রতা করে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। উগুরুর হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়েছে সেরকম ভঙ্গি করে বলল, "ও আচ্ছা—সার্টিফিকেটের সাথে আমি একটা ক্রিস্টাল দিয়ে দিয়েছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী ক্রিস্টাল?"

"আপনাদের বাচ্চার প্রোফাইল আছে এখানে। তার ক্রোমোজোমে আমরা যে বিশেষ জিনগুলো দিয়েছি সেগুলো বিকশিত করার জন্যে কী করতে হবে তার খুঁটিনাটি সব নির্দেশ দেয়া আছে।"

নিহা ভুরু কুঁচকে বলল, "সেগুলো নিজে থেকে বিকশিত হবে, না আমাদের কিছু করতে হবে?"

"অবশ্যই আপনাদের কিছু কাজ করতে হবে—তা না হলে কেমন করে হবে! তার ভেতরে শিল্পী হবার জিন যাচ্ছে কিন্তু যদি সে ব্যাপারে আপনি তাকে উৎসাহ না দেন সে তো কখনো তার সেই প্রতিভাটাকে কাজে লাগাবে না!"

"ও আচ্ছা!"

উগুরু আবার মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আপনার হাতে আপনি যে বাচ্চাটিকে ধরে রেখেছেন সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান বাচ্চার একজন। কিন্তু এই বাচ্চাটি তার সেই প্রতিভাকে ব্যবহার করবে কি করবে না সেটা কিন্তু নির্ভর করছে আপনাদের দুজনের ওপর!"

"আমাদের ওপর?"

"হ্যাঁ, তার কোন বয়সে কীভাবে উদ্দীপনা দিতে হবে তার সবকিছু ক্রিস্টালে বলে দেয়া আছে। কোনো সমস্যা হবার কথা নয়।"

রন মাথা নাড়ল, বলল, "না। সমস্যা হবে না। আমরা অনেক ইউনিট খরচ করে আমাদের সন্তানকে ডিজাইন করেছি। আমরা সেটি কিছুতেই বৃথা যেতে দেব না।"

উগুরু তার দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল ভেদ করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমি মিডিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকব আপনাদের সন্তানের সাফল্যের খবর শোনার জন্যে!"

নিহা বলল, "তার জন্যে আপনাকে মনে হয় অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে!"

"হ্যাঁ। আমি তার জন্যে অনেক দিনই অপেক্ষা করব। আমার শুধু তার নামটি জানতে হবে।"

নিহা বলল, "আমরা আমাদের ছেলের নাম রেখেছি নীল।"

রন হেসে যোগ করল, "নিহার সাথে মিল রেখে নীল।"

"চমৎকার।" উগুরু বলল, "আমি মিডিয়ার দিকে লক্ষ রাখব নীলের খবরের জন্যে! আমার সিমুলেশন আমাকে বলে দেবে কখন তার খবর মিডিয়াতে আসবে!"

৭

উগুরুর দেয়া ক্রিস্টালে রাখা সিমুলেশন অনুযায়ী নীলের দাঁত ওঠার কথা পাঁচ মাসে—সত্যি সত্যি তার নিচের মাঢ়ী থেকে ছোট দুটো দাঁত উঁকি দিল ঠিক যখন তার বয়স পাঁচ মাস। সিমুলেশন অনুযায়ী নীলের দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটার কথা এগার মাসে, সত্যি সত্যি এগার মাস দুই দিন বয়সে সে টলতে টলতে কয়েক পা হেঁটে ফেলল। সিমুলেশন থেকে নিহা আর রন জানতে পারল নীল দুই বছর এক মাস থেকেই কথা বলতে শুরু করবে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি সত্যি দেখা গেল নীল ঠিক দুই বছর এক মাস কয়েক দিন বয়স থেকে আধো আধো বুলিতে কথা বলতে শুরু করেছে। ঠিক একইভাবে দেখা গেল সিমুলেশনের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিল রেখে নীল দুই বছর তিন মাস বয়স থেকে মোটামুটি সত্যিকারের ছবি আঁকতে শুরু করল। তিন বছর বয়স থেকে নীল পড়তে শুরু করল এবং চার বছর বয়স থেকে সে গণিতের প্রাথমিক বিষয়গুলো চর্চা করতে শুরু করল।

রন আর নিহা তাদের সন্তানের নানামুখী প্রতিভা বিকশিত করার জন্যে যখন যেটা করার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করে দিল। তার ঘরে ছোট বাচ্চাদের ব্যবহারের উপযোগী কম্পিউটার, তার সাথে নেটওয়ার্ক সংযোগ আর ইলেকট্রনিক মিউজিক সেন্টার। সঙ্গীত সৃষ্টি করার নানা ধরনের ব্যবহারী সফটওয়্যার, ছবি আঁকার জন্যে বিশেষ ইলেকট্রনিক প্যাড, লেখাপড়ার জন্যে তার বয়সোপযোগী নানা ধরনের বই, স্টিমুলেটিং খেলনা এই সব দিয়ে রন আর নিহা তাদের সন্তানের ঘর ভরে ফেলল।

ঠিক একই সময়ে রিশ এবং তিনার সন্তান রিকিও অনেকটা নিজের মতো করেই বড় হতে লাগল। ছেলে হলে তার নাম রাখার কথা ছিল রিকি। নামটি রিশের কাছে একটু বেশি সাদামাটা মনে হলেও সে মেনে নিয়েছে। নীলের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেরকম সুনির্দিষ্ট ছকে বাঁধা, রিকির জীবন ছিল ঠিক সেরকম অগোছালো। রিকি ঠিক কখন হামাগুড়ি দিতে দিতে দাঁড়িয়ে গেল, ঠিক কখন হাঁটতে শুরু করল এবং কখন কথা বলতে শুরু করল সেটা তিনা কিংবা রিশ কেউই ভালো করে লক্ষ করে নি। নীলের মতো বড় হওয়ার জন্যে সে একশ রকমের উপকরণের মাঝে, নিয়মকানুন আর পদ্ধতির মাঝে বড় হয় নি সেটি সত্যি কিন্তু যে জিনিসটার তার কখনো অভাব হয় নি সেটা হচ্ছে ভালবাসা। বাবা–মায়ের ভালবাসা তো আছেই—দরিদ্র মানুষের শিশুসন্তান পাওয়ার অধিকার নেই বলে পুরো এলাকাতেই শিশু বলতে গেলে রিকি ছিল একা—তাই সে সবার ভালবাসাটাই পেয়েছে। শুধু যে ভালবাসা পেয়েছে তা নয় সে বড় হয়েছে নিম্নাঞ্চলের বনভূমিতে, নদীতে, বিস্তীর্ণ মাঠে, খোলা আকাশের নিচে প্রকৃতির খুব কাছাকাছি থেকে।

তিনা তাকে বর্ণ পরিচয় শিখিয়েছে, তার আগ্রহের কারণে সে লিখতে পড়তে শিখেছে। রিশ তাকে অল্প কিছু গণিত শিখিয়েছে—জীবনের বাকি জ্ঞানটুকু এসেছে দৈনন্দিন জীবন থেকে। সেই জ্ঞানের জন্যে কোথাও থেকেও সে সার্টিফিকেট পাবে না সত্যি কিন্তু তার গুরুত্বটুকু কিন্তু একেবারেই কম নয়। তার বয়সী একজন বাচ্চার জন্যে রিকির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার রীতিমতো অভাবনীয়। তার দৈনন্দিন একটা দিনের হিসেব নিলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৮

রিকি বিছানায় উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছিল, তার মুখের ওপর এলোমেলো চুল এসে পড়েছে। রিশ তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "রিকি বাবা আমার! ঘুম থেকে উঠবি না?"

রিকি ঘুমের মাঝে একটু শব্দ করে নড়েচড়ে পাশ ফিরে শুলো। রিশ বলল, "কী হল, উঠবি না?"

রিকি আবার একটু শব্দ করে অন্যদিকে ঘুরে শুয়ে রইল। রিশ বলল, "সকাল হয়ে গেছে। দেখ কত বেলা হয়েছে।"

রিকি আবার একটু শব্দ করল। রিশ বলল, "মনে নেই আজ আমাদের হ্রদে যাবার কথা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে সাথে রিকি চোখ খুলে তাকাল, চোখ পিটপিট করে বলল, "হ্রদে?"

"হ্যাঁ। মনে নেই আজকে আমাদের একটা ভেলা বানানোর কথা?"

"ভেলা?" এবারে রিকির চোখ পুরোপুরি খুলে যায়।

"হ্যাঁ বাবা। চট করে উঠে পড়, আমরা বেরিয়ে পড়ি। অনেক দূর যেতে হবে।"

একটু আগেই যাকে ঠেলেঠুলে তোলা যাচ্ছিল না, এবারে সে প্রায় তড়াক করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল! কিছুক্ষণের মাঝেই সে হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে এসে বসে। তিনা তার প্লেটে এক টুকরো রুটি আর এক মগ দুধ দিয়ে বলল, "নে খা।"

রিকি দুধের মগ হাতে নিয়ে বলল, "এটা কীসের দুধ মা? এটা কি কৃত্রিম না খাঁটি?"

তিনা মাথা নেড়ে বলল, "ও বাবা! ছেলের শখ দেখ, সে খাঁটি দুধ খেতে চায়! পৃথিবীতে খাঁটি দুধ কি পাওয়া যায় এখন?"

"কেন মা? খাঁটি দুধ কেন পাওয়া যায় না?"

"ফ্যাক্টরিতে কত সহজে কৃত্রিম দুধ তৈরি করে—কে এখন খাঁটি দুধের জন্যে গরুর পিছনে পিছনে ছুটবে?"

একজন মানুষ খাঁটি দুধের জন্যে একটা গরুর পিছনে পিছনে ছুটছে দৃশ্যটা রিকির বেশ পছন্দ হল। সে হিহি করে হেসে বলল, "গরুর পিছনে ছুটলে কী হয় মা?"

"যখন কোথাও একটা গরু দেখবি তখন তার পিছু ছুটে ছুটে দেখিস কী হয়?"

রিশ তার শুকনো রুটি চিবুতে চিবুতে বলল, "রিকি বাবা, খাবার সময় তুই যদি এত কথা বলিস তা হলে খাবি কেমন করে?"

রিকি রুটির টুকরোটা দুধে ভিজিয়ে নরম করে মুখে পুরে দিয়ে বলল, "আমরা যদি নাক দিয়ে না হলে কান দিয়ে খেতে পারতাম তা হলে কী মজা হত তাই না বাবা।"

রিশ ভুরু কুঁচকে বলল, "তা হলে কেন মজা হত?"

"তা হলে আমরা একই সাথে কথাও বলতে পারতাম। খেতেও পারতাম!"

তিনা বলল, "তোর তো কোনো সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না! যে মুখ দিয়ে খাচ্ছিস সেই মুখ দিয়েই তো সমানে বকবক করে যাচ্ছিস!"

কিছুক্ষণের মাঝেই রিকি তার বাবার হাত ধরে বের হল। যাবার আগে তার মা'কে জিজ্ঞেস করল, "মা, তুমি আমাদের সাথে কোথাও যেতে চাও না কেন?"

"আমিও যদি তোদের পিছু পিছু বনে জঙ্গলে পাহাড়ে টিলায় নদী বিল হ্রদে ঘোরাঘুরি করতে থাকি তা হলে এই সংসারটা দেখবে কে?"

"কাউকে দেখতে হবে না মা, তুমিও চল। দেখবে কত মজা হবে।"

"রক্ষে কর। গ্লাইডারে করে পাহাড় থেকে লাফিয়ে আকাশে উড়ে বেড়ানোর মাঝে তোরা বাবা-ছেলে অনেক মজা পাস—আমি কোনো মজা পাই না! বর্ণনা শুনেই ভয়ে আমার হাত-পা শরীরের মাঝে সেঁধিয়ে যায়!"

রিকি হিহি করে হেসে বলল, "মা! তুমি যে কী ভিতু! আমি তোমার মতো কোনো ভিতু মানুষ কখনো দেখি নি!"

রিকি মোটর বাইকের পিছনে বসে রিশকে শক্ত করে ধরতেই রিশ প্যাডেলে চাপ দেয়। প্রায় সাথে সাথেই গর্জন করে মোটর বাইকটা ছুটে চলতে থাকে। দেখতে দেখতে তারা শহর পার হয়ে শহরতলিতে চলে এল। শহরতলি পার হতেই রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু করে। রাস্তার দুই পাশে পরিত্যক্ত বাড়িঘর, গাছপালায় ঢেকে আছে। আরো কিছুদূর যাবার পর রাস্তাটা আরো খারাপ হয়ে গেল। খানাখন্দে বোঝাই, জায়গায় জায়গায় বুনো গাছ ঝোপঝাড় উঠে গেছে। মোটর বাইক দিয়েও আর যাবার উপায় নেই।

রিশ মোটর বাইকটা থামিয়ে ঠেলে একটা গাছে হেলান দিয়ে বলল, "বাকি রাস্তা হেঁটে যেতে হবে। পারবি না বাবা রিকি?"

রিকি মাথা নেড়ে বলল, "পারব।" তারপর দাঁত বের করে হেসে যোগ করল, "আর যদি না পারি তা হলে তুমি আমাকে ঘাড়ে করে নেবে!"

রিশ মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু! তুই এখন বড় হয়েছিস—তোকে এখন মোটেও ঘাড়ে করে নেয়া যাবে না!"

"কেন বাবা? বড় হলে কেন ঘাড়ে নেয়া যায় না?"

"সেটাই হচ্ছে নিয়ম। যত বড় হবি ততই সবকিছু নিজে নিজে করতে হয়।"

রিকি মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি সবকিছু নিজে নিজে করি বাবা।"

"আমি জানি।" রিশ বলল, "নিজে নিজে করলেই নিজের ওপর বিশ্বাস হয়। সেইটার নাম আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস যদি কারো থাকে তা হলে সে সবকিছু করে ফেলতে পারে। আর যদি আত্মবিশ্বাস না থাকে তা হলে সে জীবনে কিছুই করতে পারে না।"

রিশ কী বলছে রিকি সেটা ঠিক করে বুঝতে পারল না। কিন্তু সে সেইটা তার বাবাকে বুঝতে দিল না। সবকিছু বুঝে ফেলেছে সে রকম ভান করে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে থাকল।

বাবা আর ছেলের ছোট দলটি কিছুক্ষণের মাঝেই রওনা দিয়ে দেয়। রিশের পিঠে হ্যাভারসেক। সেখানে খাবারের প্যাকেট, পানীয় আর কিছু যন্ত্রপাতি। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দুজনেই বনের ভেতর ঢুকে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে তারা একটা পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে এসে পড়ে। দীর্ঘদিনের অব্যবহারে বাড়িগুলো প্রায় সময়েই ধসে পড়েছে, গাছপালায় ঢেকে গেছে, ঘন লতাগুল্মে সবকিছু ঢাকা। জনমানবহীন এই বাড়িগুলো দেখলে বুকের ভেতর কেমন যেন এক ধরনের কাঁপুনি হয়। লতাগুল্মে ঢাকা বড় একটা পরিত্যক্ত বাড়ি দেখে রিকি হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গেল। বাবাকে ডেকে বলল, "বাবা।"

"কী হল?"

"এই বাসাগুলোতে এখন আর মানুষ থাকে না কেন?"

"মানুষের সংখ্যা কমছে—তাই কেউ থাকে না।"

"কেন মানুষের সংখ্যা কমছে?"

"শিশুদের জন্ম না হলে সংখ্যা কমবে না?"

"শিশুদের জন্ম হচ্ছে না কেন?"

রিশ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পৃথিবীটাই তো দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগ হচ্ছে বড়লোক—। পৃথিবীর সব সম্পদ তাদের হাতে। তারা পৃথিবীটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আরেক ভাগ আমাদের মতো যাদের একটু কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হয়।"

রিকি গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "আমাদের মোটেও কষ্ট হচ্ছে না বাবা!"

রিশ হেসে ফেলল, বলল, "হ্যাঁ। আমাদের মোটেও কষ্ট হচ্ছে না—ঠিকই বলেছিস! কষ্ট ব্যাপারটা আপেক্ষিক।"

আপেক্ষিক মানে কী রিকি বুঝতে পারল না। কিন্তু তারপরেও সে গম্ভীর মুখে এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন সে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনে যখন হ্রদের পাড়ে পৌঁছেছে তখন সূর্য ঠিক মাথার ওপর। হ্রদের পানিতে সূর্যের আলো পড়ে সেটা ঝিকমিক করছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে রিকি বলল, "কী সুন্দর বাবা!"

"হ্যাঁ। খুবই সুন্দর।"

"কেন সুন্দর বাবা?"

"এটা তো কঠিন প্রশ্ন রিকি। কেন যে একটা কিছু দেখে সুন্দর মনে হয় কে জানে! মানুষের ধর্মটাই মনে হয় এরকম। পানি দেখলেই ভালো লাগে। আমাদের শরীরের ষাট সত্তুর ভাগই তো পানি—মনে হয় সেজন্যে।"

রিশ এবারেও ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝতে পারল না কিন্তু তারপরেও সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। রিশ লেকের তীরে একটা বড় গাছের ছায়ায় দুই পা ছড়িয়ে বসে রিকির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে জিজ্ঞেস করল, "খিদে পেয়েছে বাবা?"

রিকি মাথা নাড়ে। "হ্যাঁ বাবা, খিদে পেয়েছে। গলাটাও শুকিয়ে গেছে।"

"আয়, কাছে আয়। ব্যাগটা খুলে দেখি তোর মা কী দিয়েছে খেতে।"

রিকি তার বাবার শরীরে হেলান দিয়ে বসে। রিশ ব্যাগ খুলে খাবারের প্যাকেট আর পানীয়ের বোতল বের করল। প্যাকেট খুলে মাংসের পুর দেয়া পিঠে বের করে দুজনে খেতে শুরু করে। পানীয়ের বোতল থেকে ঢকঢক করে খানিকটা ঝাঁজালো পানীয় খেয়ে রিশ বলল, "তুই ঠিকই বলেছিস রিকি।"

"আমি কী ঠিক বলেছি বাবা?"

"আমাদের জীবনে কোনো কষ্ট নেই—আমরা খুব আনন্দে আছি।"

রিকি মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ বাবা। আনন্দে আছি।"

AMARBOI.COM

খাওয়ার পর দুজনে মিলে ভেলাটাকে দাঁড়া করানোর কাজে লেগে গেল। হ্রদের তীরে পড়ে থাকা নানা আকারের গাছের গুঁড়িগুলো একত্র করে উপরে নিচে কাঠের দণ্ড মিশিয়ে শক্ত করে বেঁধে নেয়। ভেলাটার মাঝামাঝি একটা ছোট খুপরির মতো তুলে নেয়। পুরো কাজ যখন শেষ হল তখন সূর্য খানিকটা ঢলে পড়েছে। রিশ ভেলাটার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভেলাটা কেমন হয়েছে রিকি?"

"খুবই সুন্দর।"

"আয় এখন এটাকে ভাসিয়ে দিই।"

"চল বাবা।"

রিশ ভেলাটাকে ঠেলে ঠেলে পানিতে নিয়ে আসে। ভেলার বেশ খানিকটা ডুবে গিয়ে উপরের অংশটুকু পানিতে ভাসতে থাকে। রিশ ভেলার উপর দাঁড়িয়ে রিকিকে টেনে উপরে তুলে নেয়। দুজনের ভারে ভেলাটা দুলতে থাকে, গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে পানি এসে তাদের পা ভিজিয়ে দিল। রিকি আনন্দে হাসতে হাসতে বলল, "আমাদের কী সাংঘাতিক একটা ভেলা হল। তাই না বাবা?"

"হ্যাঁ। আমাদের খুব সুন্দর একটা ভেলা হল।"

"এই ভেলা করে আমরা কোথায় যাব বাবা?"

"আমাদের যেখানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।"

"আমরা কি পৃথিবীর একেবারে শেষ মাথায় যেতে পারব বাবা!"

"চাইলে কেন পারব না? যেতে চাস?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আজ না বাবা।"

"কেন না?"

"আরেক দিন। মা'কে নিয়ে যাব।"

রিশ শব্দ করে হেসে ফেলল, বলল, "তোর মা এই ভেলাতেই উঠবে না।"

"ঠিক বলেছ। মা খুব ভিতু তাই না বাবা।"

"উঁহু।" রিশ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "তোর মা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী মানুষ।"

"কেন বাবা? মা কেন সাহসী?"

"তোর মা যদি সাহস না করত তা হলে তোর জন্মই হত না।"

মায়ের সাহসের সাথে তার জন্ম নেয়ার কী সম্পর্ক রিকি সেটা ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু সে সেটা বুঝতে দিল না। গম্ভীরভাবে এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন সে এটাও বুঝে ফেলেছে।

রিশ একটা বড় লগি দিয়ে ভেলাটাকে ধাক্কা দিতেই ভেলাটা পানিতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যায়। রিকি বাবার পা ধরে অবাক হয়ে হ্রদের সুবিস্তৃত পানির দিকে তাকিয়ে থাকে। মাথার উপর কিছু গাঙচিল উড়ছে, পানির ভেতর থেকে একটা শুশুক হঠাৎ লাফিয়ে পানি ছিটিয়ে চলে যায়। দূরের বন থেকে কোনো একটা প্রাণী করুণ স্বরে ডেকে ডেকে যায়। রিকি এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

হ্রদের স্বচ্ছ পানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রিকি হঠাৎ দেখে পানির নিচে ডুবে থাকা ঘরবাড়ি। দেখে মনে হয় যেন একটা স্বপ্নরাজ্য—তার মায়ের রূপকথার গল্পের সেই মৎস্যকন্যার নগরী। সে অবাক হয়ে বলল, "বাবা! পানির নিচে কার বাড়ি?"

"একসময় মানুষের ছিল। এখন ডুবে গেছে।"

"কেন ডুবে গেছে বাবা?"

"পানি বেড়ে গেছে সেজন্যে ডুবে গেছে।"

"পানি কেন বেড়ে গেছে বাবা?"

"যারা পৃথিবীটা ভোগ করে তাদের লোভের জন্যে পৃথিবীর পানি বেড়ে গেছে। পৃথিবীটা ধীরে ধীরে গরম হয়ে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়েছে তো সেজন্যে পৃথিবীর পানি বেড়ে যাচ্ছে।"

মানুষের লোভের জন্যে কেন মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাবে রিকি সেটাও পরিষ্কার বুঝতে পারল না কিন্তু সেটা নিয়েও সে মাথা ঘামাল না—গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল যেন সবকিছু বুঝে ফেলেছে। বড়দের অনেক কথাই সে সব সময় বুঝতে পারে না, কিন্তু সেটা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। এখন সে শুধু শুনে যায়—বড় হলে নিশ্চয়ই বুঝবে।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল রিশ খালি গায়ে ভেলার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। রিকি নগ্নদেহে ভেলার ওপর থেকে হ্রদের নীল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মাছের মতো সাঁতার কেটে হ্রদের নিচে ডুবে থাকা প্রাচীন নগরীর কাছে পৌঁছে সেটাকে সে দেখার চেষ্টা করে! পৃথিবীতে এত রহস্য ছড়িয়ে আছে, একটি জীবনে সে সব রহস্য দেখতে পারবে? বুঝতে পারবে?

রিকির ছোট মাথাটাতে এই বয়সে কত বড় বড় ভাবনা খেলা করে—সে যখন বড় হবে তখন তার কী হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

প্রতিভাবান শিশুদের বিশেষ স্কুলের প্রিন্সিপাল কেটি—মধ্যবয়সী হালকা পাতলা একজন মহিলা। সে তার সহকারী ক্রানাকে জিজ্ঞেস করল, "স্কুল বাসটা কি এসেছে?"

ক্রানা বলল, "এসেছে কেটি।"

"সব ছাত্রছাত্রী বাস থেকে নেমেছে?"

"নেমেছে।"

"ক্লাস ঘরে ঢুকেছে?"

ক্রানা বলল, "হ্যাঁ ঢুকেছে। ক্লাস টিচার সবাইকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে।"

প্রিন্সিপাল কেটি বলল, "চমৎকার!"

ক্রানা বলল, "আচ্ছা কেটি, তুমি প্রত্যেক দিনই এই ব্যাপারটা নিয়ে এত দুশ্চিন্তার মাঝে থাক, ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার কিছুই না—কিন্তু বুঝতেই পারছ, এই স্কুল বাসে করে যে বাচ্চাগুলো আসে তাদের বাবা মায়েরা হচ্ছে—দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ! কাজেই বাচ্চাগুলো ঠিকমতো পৌঁছাল কি না সেটা খুবই জরুরি একটা ব্যাপার। তার থেকেও জরুরি ব্যাপার কী জান?"

"কী?"

"এই বাচ্চাগুলোর সবাই হচ্ছে জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ডিজাইন করা বাচ্চা। প্রতিভার স্কেলে কেউ চল্লিশের কম নয়। বিশ্বাস কর আর নাই কর একজনের পয়েন্ট আশি! এই বাচ্চাগুলো সবাই মিলে যদি একসাথে কিছু পরিকল্পনা করে আমাদের সাধ্যি নেই সেটা ঠেকানো!"

ক্রানা অবাক হয়ে বলল, "কী পরিকল্পনা করবে?"

"জানি না।"

"এরা তো ছোট বাচ্চা, বয়স সাত আট মাত্র!"

"জানি। কিন্তু এরা সবাই অসাধারণ। এরা বড়দের মতো চিন্তা করতে পারে। বলতে পার ছোট বাচ্চাদের শরীরে কিছু বড় মানুষ আটকা পড়ে আছে। কোনো কারণে যদি বিগড়ে যায়—কিছু একটা করতে চায় আমরা কোনোভাবে ঠেকাতে পারব না।"

ক্রানা হেসে বলল, "তুমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ কেটি। এটা কোনোদিনই হবে না। এই বাচ্চাগুলো শুধু শুধু কেন বিগড়ে যাবে?"

প্রিন্সিপাল কেটি বলল, "আমি জানি আমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছি। কিন্তু আমার মনে হয় একটু সতর্ক থাকা ভালো।" হঠাৎ কী মনে করে প্রিন্সিপাল কেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চল বাচ্চাগুলো একটু দেখে আসি।"

বিল্ডিংয়ের এক কোনায় বড় একটা রুমের মাঝামাঝি ছোট ছোট চেয়ার-টেবিলে বারো জন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। তাদের সামনে একটা বড় অ্যাকোয়েরিয়াম, সেখানে একটা বড় এঞ্জেল ফিশ। অ্যাকোয়েরিয়ামের পাশে একজন হাসি-খুশি শিক্ষিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। প্রিন্সিপাল কেটি আর তার সহকারী ক্রানাকে দেখে কথা থামিয়ে তাদের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "কী খবর কেটি? কী মনে করে আমাদের ক্লাস রুমে?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিন্সিপাল কেটি বলল, "অনেক দিন আমি বাচ্চাদের দেখি না। ভাবলাম আজ একনজর দেখে আসি। কেমন আছে সবাই?"

হাসি-খুশি শিক্ষিকা বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরাই বল তোমরা কেমন আছ?"

কালো চুলের একটা মেয়ে বলল, "আমরা তো ভালোই আছি—আমাদের দুশ্চিন্তা আমাদের মায়েদের নিয়ে!"

প্রিন্সিপাল কেটি চোখ বড় বড় করে বলল, "কেন? তোমাদের মায়েদের নিয়ে দুশ্চিন্তা কেন?"

"কেন? তোমরা জান না আমাদের সবার একটা করে সিমুলেশন আছে?"

"হ্যাঁ জানি। ডিজাইনাররা তোমাদের সবার জন্যে একটা করে সিমুলেশন দিয়েছে!"

"আমাদের কাজকর্ম যদি সিমুলেশনের সাথে না মেলে তা হলে আমার মা খুব ঘাবড়ে যায়।" কালো চুলের মেয়েটি বড়দের মতো ভঙ্গি করে বলল, "সেটা খুবই ঝামেলার ব্যাপার!"

প্রিন্সিপাল কেটি বলল, "কিন্তু সিমুলেশনের সাথে মিলবে না কেন? অবশ্যই মিলবে। তোমরা তো জানো তোমাদের অনেক যত্ন করে ডিজাইন করা হয়েছে! তোমরা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে প্রতিভাবান বাচ্চা!"

লাল চুলের একটা মেয়ে ঠোঁট উল্টে বলল, "কী জানি! এত কিছু বুঝি না! সবাই শুধু বলে প্রতিভাবান! প্রতিভাবান। আমি তো এত কিছু বুঝি না। আমি তো সেরকম কিছু দেখি না।"

ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা একটা ছেলে বলল, "আমিও সে রকম কিছু দেখি না।" ছেলেটা তার পাশে বসে থাকা সোনালি চুলের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি বুঝ নীল?"

নীল গম্ভীর মুখে বলল, "কেমন করে বুঝব? সেটা বোঝার জন্যে আমাদের দরকার একজন সাধারণ মানুষ। তার সাথে তুলনা করলে না হয় বুঝতাম!"

প্রিন্সিপাল কেটি বলল, "এই যে আমি! আমার কোনো প্রতিভা নেই। আমি খুব সাধারণ—আমার সাথে তুলনা কর!"

নীল খুক করে একটু হেসে বলল, "তুমি তো বড় মানুষ! বড় মানুষদের আমি একেবারে বুঝতে পারি না!"

পাশে বসে থাকা একটা মেয়ে বলল, "আমিও বুঝতে পারি না!"

অনেকেই সায় দিয়ে বলল, "আমিও পারি না!"

কালো চুলের মেয়েটা বলল, "আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"বড় মানুষেরা আসলে একটু বোকা!"

কথাটা মনে হয় সবারই খুব পছন্দ হল, সবাই জোরে জোরে মাথা নেড়ে হিহি করে হাসতে শুরু করে। নীল সবার আগে হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের বোকা বলেছি বলে তোমরা কিছু মনে কর নি তো?"

প্রিন্সিপাল কেটি হাসিমুখে বলল, "না। আমরা কিছু মনে করি নি!"

হাসি-খুশি শিক্ষিকা এতক্ষণ চুপ করে বাচ্চাদের ছেলেমানুষি কথা শুনছিল এবারে সে মুখ খুলল। বলল, "বাচ্চারা তোমরা তো বোকা আর বুদ্ধিমান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তাই না? আমি দেখতে চাই তোমরা আসলে ব্যাপারটা বুঝ কি না! আমরা আগামী কয়েক দিন বিভিন্ন রকম

প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণা করব। আজকে এনেছি একটা মাছ। সারা দিন এই মাছটাকে নিয়ে সময় কাটাব—এই মাছটার বুদ্ধিমত্তা কীভাবে কাজ করে সেটা বোঝার চেষ্টা করব। আগামীকাল আনব একটা গিরগিটি—এক ধরনের সরীসৃপ। এর পরের দিন আনব একটা পাখি। তার পরের দিন একটা ছোট কুকুরের বাচ্চা—একটা স্তন্যপায়ী প্রাণী। সবশেষে আনব একটা শিম্পাঞ্জি। তোমরা দেখবে কীভাবে একটা প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে—"

নীল হাততালি দিয়ে বলল, "কী মজা।"

"হ্যাঁ। অনেক মজা।" হাসি-খুশি শিক্ষিকা বলল, "চল তা হলে আমরা কাজ শুরু করে দিই। কোন প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা কী রকম সেটা বোঝার জন্যে কিছু এক্সপেরিমেন্ট ঠিক করে ফেলি।"

কালো চুলের মেয়েটি বলল, "এই মাছটাকে নিয়ে কী করা যায় সেটা আমি ঠিক করে ফেলেছি!"

শিক্ষিকা বলল, "হ্যাঁ আমরা সেটা শুনব।"

প্রিন্সিপাল কেটি ক্রানার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাচ্চারা ক্লাস করুক। চল, আমরা যাই।"

"চল।" ক্রানা প্রিন্সিপাল কেটির পিছনে পিছনে ক্লাস ঘর থেকে বের হয়ে এল। করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রিন্সিপাল কেটি বলল, "ক্রানা। আমার মাথায় একটা অসাধারণ আইডিয়া এসেছে।"

"কী?"

এই বাচ্চাগুলো এখন বিভিন্ন প্রাণীর বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করছে। মাছ, সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী—সবশেষে একটা শিম্পাঞ্জি। আমার কী মনে হয় জান? শিম্পাঞ্জিতে থেমে না গিয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলে কেমন হয়?"

AMARBOI.COM

"আরো এক ধাপ?"

"হ্যাঁ। সবশেষে আনা হবে এই বাচ্চাদের বয়সী একটা মানবশিশু। জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে ডিজাইন করা মানবশিশু নয়—একেবারে সাধারণ মানবশিশু।"

"সাধারণ?"

"হ্যাঁ।" প্রিন্সিপাল কেটি উত্তেজিত গলায় বলল, "একেবারে সাধারণ একটা মানবশিশু। সেই শিশুটার সাথে তারা যদি একটা দিন কাটাতে পারে তা হলে এই বাচ্চারা বুঝতে পারবে তারা কত প্রতিভাবান! বুদ্ধিমত্তা কাকে বলে তার একটা বাস্তব ধারণা হবে!"

ক্রানা ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কিন্তু সেরকম বাচ্চা তুমি কোথায় পাবে? আর যদি খুঁজে পেয়েও যাও—তাদের বাবা-মা কেন রাজি হবে শিম্পাঞ্জির পাশাপাশি নিজের বাচ্চাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে!"

প্রিন্সিপাল কেটি বলল, "নিম্নাঞ্চলের দরিদ্র মানুষগুলোর মাঝে খোঁজাখুঁজি করলেই এরকম একটা বাচ্চা পাওয়া যাবে। আর বাচ্চাটাকে আনার সময় আমরা কি কখনো বলব যে তাকে আনছি শিম্পাঞ্জির পরের স্তর দেখানোর জন্যে? আমরা বলব তাকে আনছি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের জন্যে! বড় বড় কথা বলে বাবা-মাকে রাজি করিয়ে ফেলব।"

ক্রানা মাথা নাড়ল, বলল, "আইডিয়াটা খারাপ না। এই বাচ্চাদের তাদের সমবয়সী একটা সাধারণ বাচ্চা দেখা দরকার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিন্সিপাল কেটি বলল, "তা হলে দেরি করে কাজ নেই। তুমি খোঁজাখুঁজি শুরু করে দাও। বেশি দরিদ্র মানুষকে বাচ্চা নেয়ার অনুমতি দেয়া হয় না—তাই হতদরিদ্রদের মাঝে না খুঁজে একটু নিম্নবিত্তদের মাঝে খোঁজ কর।"

ক্রানা বলল, "তুমি চিন্তা কোরো না, কেটি। আমি খুঁজে বের করে ফেলব।"

১০

খাবার টেবিলে তিনা বলল, "আজকে খুব বিচিত্র একটা চিঠি এসেছে।"

রিশ সুপের বাটি থেকে এক চামচ গরম সুপ মুখে নিয়ে বলল, "বিচিত্র?"

"হ্যাঁ। চিঠিতে কী লেখা জান?"

"কী?"

"দাঁড়াও, আমি পড়ে শোনাই।" বলে তিনা একটা কাগজ হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে :

> "আপনি শুনে আনন্দিত হবেন যে শহরতলির শিশুদের মূলধারার জীবনের সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে আয়োজিত একটি প্রেগ্রামে আপনাদের সন্তানকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। সেই প্রোগ্রামের আওতায় আগামী সপ্তাহে তাকে চিড়িয়াখানা, জাদুঘর এবং একটি স্কুলে পরিদর্শনের জন্যে নেয়া হবে। এই পরিদর্শনের যাবতীয় দায়িত্ব নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান বহন করবে। যোগাযোগ করার জন্যে বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।"

রিশ মাথা নেড়ে বলল, "ভাঁওতাবাজি।"

রিকি খুব মনোযোগ দিয়ে তার বাবা-মায়ের কথা শুনছিল। রিশের কথা শুনে বলল, "কেন বাবা? এটা ভাঁওতাবাজি কেন? ভাঁওতাবাজি মানে কী?"

"যখন একটা কিছু বলা হয় কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে অন্য কিছু, সেটা হচ্ছে ভাঁওতাবাজি।"

"এরা ভাঁওতাবাজি কেন করবে?"

"পার্বত্য অঞ্চলে যে বড়লোক মানুষগুলো থাকে তারা আসলে অন্যরকম। আমাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা কখনোই আমাদের জন্যে ভালো কিছু করে না।"

"কেন করে না বাবা?"

"আমাদেরকে তারা তাদের অংশ হিসেবে বিবেচনা করে না। তাই হঠাৎ করে যদি দেখি তাদের আমাদের বাচ্চাদের জন্যে মায়া উথলে উঠেছে তা হলে বুঝতে হবে এর ভেতরে অন্য একটা উদ্দেশ্য আছে।"

তিনা রিকির প্লেটে এক টুকরো রুটি তুলে দিয়ে বলল, "তা হলে তুমি এখানে রিকিকে পাঠাতে চাও না?"

রিশ আরো এক চামচ সুপ খেয়ে বলল, "কেমন করে পাঠাব? সামনের সপ্তাহে আমাদের ফ্যাক্টরির একটা জরুরি চালান সামাল দিতে হবে—আমি কেমন করে রিকিকে নিয়ে যাব?"

তিনা বলল, "আসলে আমি যোগাযোগ করেছিলাম। মানুষগুলো বলেছে তারাই নিয়ে যাবে, সবকিছু দেখিয়ে ফিরিয়ে দেবে। দুই দিনের প্রোগ্রাম, প্রথম দিন চিড়িয়াখানা আর মিউজিয়াম। দ্বিতীয় দিন স্কুল।"

রিশ কোনো কথা না বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। রিকি ডাকল, "বাবা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
WWW.AMARBOI.COM

"বল।"

"আমি যেতে চাই বাবা।"

"যেতে চাস?"

"হ্যাঁ। আমি কোনোদিন চিড়িয়াখানা দেখি নি।"

রিশ বলল, "দেখিস নি সেটা খুব ভালো। দেখলে মন খারাপ হয়ে যাবে।"

"কেন বাবা? মন খারাপ কেন হবে?"

"তুই যখন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াস তখন দেখেছিস সেখানে পশুপাখিগুলো মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। চিড়িয়াখানায় সেই একই পশুপাখিকে খাঁচায় বন্দি করে রাখে।"

তিনা হাসার চেষ্টা করে বলল, "তুমি একটু বেশি বেশি বলছ। বনে জঙ্গলে রিকি আর কয়টা পশুপাখি দেখেছে? চিড়িয়াখানায় কত রকম প্রাণী আছে! বাঘ সিংহ হাতি জলহস্তী সাপ কুমির—কী নেই?"

রিকি আবার বলল, "বাবা আমি চিড়িয়াখানা দেখতে চাই।"

রিশ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "চিড়িয়াখানা জাদুঘর ঠিক আছে। আমার আসল আপত্তিটা হচ্ছে স্কুলে।"

"কেন বাবা? স্কুলে আপত্তি কেন?"

"বড়লোকের ছেলেমেয়েদের স্কুল—দেখে তোর মন খারাপ হবে। তোকে তো আমরা স্কুলেই পাঠাতে পারি না—কোনো স্কুলই নেই তোর জন্যে!"

রিকি মাথা নাড়ল, "না বাবা। আমার মন খারাপ হবে না।"

রিশ কিছুক্ষণ রিকির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "সত্যিই যেতে চাস?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"ঠিক আছে। যা তা হলে। মনে হয় জীবনে সব রকমেরই অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। হলই না হয় একটা খারাপ অভিজ্ঞতা।"

তিনা মৃদু কণ্ঠে বলল, "রিশ। তুমি যদি আসলেই না চাও তা হলে রিকিকে পাঠানোর কোনো দরকার নেই। আমরাই কখনো একবার রিকিকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাব না হয়।"

"থাক। যেতে চাইছে যখন যাক।"

রিকি খাবার টেবিলে বসে তার সবগুলো দাঁত বের করে হাসল। আনন্দের হাসি।

AMARBOI.COM

১১

গাড়িটা একটা বড় বিল্ডিংয়ের সামনে থামতেই রিকি তার পাশে বসে থাকা ক্রানাকে জিজ্ঞেস করল, "এটা চিড়িয়াখানা?"

ক্রানা ইতস্তত করে বলল, "না। এটা চিড়িয়াখানা না।"

"আমাদের আগে না চিড়িয়াখানায় যাবার কথা? তারপর জাদুঘর?"

ক্রানা জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, "আসলে পরিকল্পনায় একটু পরিবর্তন হয়েছে। দুই দিনের প্রোগ্রাম ছিল সেটাকে একদিনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।"

"তার মানে আমরা চিড়িয়াখানায় যাব না? জাদুঘরে যাব না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রানা শুকনো গলায় বলল, "না। আমরা শুধু দ্বিতীয় দিনের প্রোগ্রামে যাব। সেজন্যে এই স্কুলে এসেছি।"

রিকির চোখে-মুখে আশা ভঙ্গের একটা স্পষ্ট ছাপ এসে পড়ল, সে সেটা লুকানোর চেষ্টা করল না। ক্রানার দিকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে আমার বাবা আসলে ঠিকই বলেছিল।"

ক্রানা ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমার বাবা কী বলেছিল?"

আমার বাবা বলেছিল, "আসলে পুরোটা ভাঁওতাবাজি।"

ক্রানা ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেও কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, "কেন? ভাঁওতাবাজি কেন হবে?"

'কেউ যদি একটা জিনিসের কথা বলে অন্য একটা জিনিস করে সেটাকে বলে ভাঁওতাবাজি। তোমরা ভাঁওতাবাজি করেছ।"

ক্রানা কঠিন গলায় বলল, "বাজে কথা বোলো না ছেলে।"

"আমার নাম রিকি।"

"ঠিক আছে রিকি। এস আমার সাথে।"

রিকি ক্রানার পিছু পিছু হেঁটে যায়। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে, করিডোর ধরে হেঁটে যায় এবং শেষে একটা বড় ঘরের সামনে দাঁড়ায়। ঘরের ভেতরে মাঝামাঝি বেশ কয়েকটা ছোট ছোট চেয়ার-টেবিল সেখানে রিকির বয়সী ছেলেমেয়েরা বসে আছে। তাদের সামনে হাসি-খুশি চেহারার একজন মহিলা কথা বলছিল। ক্রানার সাথে রিকিকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল। গলার স্বরে একটা আনন্দের ভাব ফুটিয়ে বলল, "এস। এস তুমি, ভেতরে এস।" তারপর সামনের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখ সবাই। আজকে তোমাদের সাথে কে এসেছে। একটা ছেলে। তোমাদের বয়সী একটা ছেলে।"

ক্রানা রিকির হাত ধরে ক্লাস ঘরের ভেতরে নিয়ে আসে। ছোট ছোট চেয়ার-টেবিলে বসে থাকা ছেলেমেয়েগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রিকির দিকে তাকিয়ে রইল—রিকি ঠিক কী করবে বুঝতে পারে না। এক ধরনের অস্বস্তি নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে।

হাসি-খুশি মহিলাটি বলল, "তোমাদের মনে আছে এ সপ্তাহে আমরা কী নিয়ে আলোচনা করছিলাম? বুদ্ধিমত্তা! শুরু করেছি মাছ দিয়ে, একটা এঞ্জেল ফিশ আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। তারপর ছিল একটা গিরগিটি। শীতল দেহের এক ধরনের সরীসৃপ। এরপর ছিল পাখি, দেখে বোঝা যায় না কিন্তু আমরা আবিষ্কার করেছি পাখির বুদ্ধিমত্তা অনেক। পাখির পরে ছিল বুদ্ধিমত্তার উপরের দিকের একটা প্রাণী, সেটা কুকুর ছানা। সেটাকে নিয়ে আমাদের অনেক মজা হয়েছে। তাই না?"

কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে বাচ্চাগুলো হাসি-খুশি মহিলার কথায় সাড়া দিল না। মহিলাটি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কুকুর ছানার পর আমরা এনেছি শিম্পাঞ্জি। তোমাদের বলেছি শিম্পাঞ্জির জিনোম শতকরা নিরানব্বই ভাগ আমাদের মতো—কাজেই তার বুদ্ধিমত্তাও অনেকটা আমাদের মতো। শিম্পাঞ্জির পর আমরা এনেছি একটা ছেলে! তোমরা আজকে এই ছেলেটার বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করবে। ঠিক আছে?"

এবারেও সামনে বসে থাকা ছেলেমেয়েগুলো হাসি-খুশি শিক্ষিকার কথার উত্তর দিল না। মহিলাটি অবিশ্যি সেটি নিয়ে মাথা ঘামাল না, বলল, "এই ছেলেটিকে আমরা তোমাদের সাথে রেখে যাচ্ছি। এই ছেলেটির সাথে তোমাদের একটা খুব বড় পার্থক্য আছে। সেটি কী বলতে পারবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্থক্যটা কী বাচ্চাগুলো অনুমান করতে পারছিল কিন্তু তবু কেউ উত্তর দিল না। হাসি-খুশি মহিলা বলল, "পার্থক্যটা হচ্ছে তোমাদের জিনোমে। এই ছেলেটির জিনোম সাধারণ তোমাদের জিনোম অসাধারণ। এই ছেলেটির জিনোমে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই—তোমাদের আছে। আমি চাই তোমরা সবাই মিলে এই ছেলেটিকে পরীক্ষা কর। তোমরা সারা দিন পাবে, বিকেলে আমি তোমাদের রিপোর্ট নেব। ঠিক আছে?"

বাচ্চাগুলো এবারেও হাসি-খুশি মহিলার কথার উত্তর দিল না।

শিক্ষিকা আর ক্রানা চলে যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল। রিকি নিজের ভেতরে এক ধরনের অপমান, ক্রোধ এবং দুঃখ অনুভব করে। তার ছোট জীবনে এর আগে কখনোই সে এরকম অনুভব করে নি। সে কী করবে বুঝতে পারছিল না—ইচ্ছে করছিল ছুটে পালিয়ে যেতে, কিন্তু সে জানে তার ছুটে পালিয়ে যাবার কোনো জায়গা নেই। রিকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘরটা পরীক্ষা করল, ঝকঝকে আলোকোজ্জ্বল একটা ঘর। বড় বড় জানালা, উঁচু ছাদ। ঘরের পাশে নানা ধরনের সৃজনশীল খেলনা। ছবি আঁকার ইজেল, কম্পিউটার, বড় বড় মনিটর এবং যন্ত্রপাতি। সামনে বসে থাকা বাচ্চাগুলোকে সে এবারে লক্ষ করে। সবাই তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। রিকি কী করবে বুঝতে না পেরে বলল, "এটা একটা ভাঁওতাবাজি।"

নীল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী বলেছ?"

"আমি বলেছি এটা একটা ভাঁওতাবাজি।"

"ভাঁওতাবাজি?"

"হ্যাঁ।"

"ভাঁওতাবাজি মানে কী?"

"একটা জিনিস করার কথা বলে অন্য একটা জিনিস করাকে বলে ভাঁওতাবাজি।"

কালো চুলের মেয়েটি বলল, "তোমার সাথে একটা জিনিস করার কথা বলে অন্য জিনিস করেছে?"

"হ্যাঁ।" রিকি বলল, "আমাকে বলেছিল চিড়িয়াখানা নিয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে না এনে এখানে এনেছে। ভাঁওতাবাজি করেছে।"

লাল চুলের মেয়েটি একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বড়রা সব সময়েই ভাঁওতাবাজি করে। তাই না?"

অনেকেই রাজি হয়ে মাথা নাড়ল। কোন বড় মানুষ কার সাথে কী ভাঁওতাবাজি করেছে সেটা নিয়ে সবাই কথা বলতে শুরু করছিল তখন ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের ছেলেটা বলল, "ভালোই হয়েছে তোমাকে চিড়িয়াখানায় নেয় নাই। জায়গাটা খুবই হাস্যকর। খুবই দুর্গন্ধ। বাঘ সিংহ হাতি বাথরুম করে রাখে তো।"

ছেলেটার কথা শুনে অনেকেই হেসে উঠল। একজন বলল, "কিন্তু চিড়িয়াখানায় বানরের খাঁচাটা অনেক মজার। বানরগুলো অনেক বাঁদরামো করে। দেখে কী মজা লাগে! তাই না?"

রিকি বলল, "আমি বানরের বাঁদরামো দেখেছি।"

"কোথায় দেখেছ?"

"আমাদের বাসা থেকে জঙ্গলে যাওয়া যায়। সেখানে বানর আছে। ছোট একটা বানরের বাচ্চা আমার খুব বন্ধু।"

সাথে সাথে সবগুলো বাচ্চা চুপ করে যায়। কিছুক্ষণ পর নীল জিজ্ঞেস করল, "বানরের বাচ্চা তোমার বন্ধু?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ।"

"বানরের বাচ্চা কেমন করে তোমার বন্ধু হল? তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ। তাই না?"

রিকি মুখ শক্ত করে বলল, "আমি মোটেও বানিয়ে বানিয়ে বলছি না। আমার সাথে চল, আমি তোমাকে এখনই দেখাব।"

বাচ্চাগুলো একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাল। একজন বলল, "কী দেখাবে?"

"বানরের বাচ্চাটা আমার বন্ধু আমি সেটা দেখাব। আমাকে দেখলেই সেটা আমার কাছে এসে ঘাড়ে বসে। কথা বলে।"

"কথা বলে?" নীল বলল, "মিথ্যা কথা।"

"মোটেও মিথ্যা কথা না।"

"তোমার সাথে কী কথা বলে?"

"কিচিমিচি করে বলে, আমি বুঝি না।"

বাচ্চাগুলো এতক্ষণ তাদের চেয়ারে বসেছিল, এবারে কয়েকজন উঠে এল, রিকিকে কাছে থেকে দেখল। কালো চুলের মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"রিকি। তোমার নাম কী?"

"মাতিষা।"

নীল এগিয়ে এসে বলল, "আমার নাম নীল।"

"আমার নাম কিয়া।"

"আমার নাম লন—" হঠাৎ করে সবাই একসাথে নিজের নাম বলতে শুরু করল, রিকি খুক করে হেসে বলল, "আমি তোমাদের সবার নাম মনে রাখতে পারব না।"

"কোনো দরকার নাই মনে রাখার। আমরা যদি একসাথে খেলি তা হলেই নাম মনে হয়ে যাবে। তাই না?"

সবাই মাথা নাড়ল।

লাল চুলের মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, "কী খেলবে নীল।"

"রকেট মেশিন খেলতে পারি।" নীল রিকিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি রকেট মেশিন খেলা জানো?"

"না।"

"তা হলে কোনটা জান?"

"আমি কোনো খেলা জানি না।"

"তুমি কোনো খেলা জান না?"

"না।"

"তা হলে তুমি কী কর?"

"আমি জঙ্গলে বেড়াই। না হলে হ্রদে ভেলা নিয়ে ভাসি। মাঝে মাঝে আকাশে উড়ি।"

"কী কর?" মাতিষা নামের মেয়েটা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী কর তুমি?"

"আকাশে উড়ি।"

"তুমি কি পাখি যে আকাশে উড়ো?"

রিকি হেসে বলল, "ধুর বোকা! আমি কি বলেছি আমি পাখির মতো পাখা দিয়ে উড়ি? আমি গ্লাইডার দিয়ে উড়ি!"

নীল মাথা নেড়ে বলল, "গ্লাইডার! কী দারুণ!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ। আমার বাবা বানিয়েছে। ভেতরে ঝুলে পাহাড়ের ওপর থেকে ছুটে লাফ দিতে হয় তখন সেটা আকাশে ভেসে ভেসে নিচে নামে। দুপুরবেলা যদি গরম বাতাস ওপরে উঠতে থাকে তখন অনেকক্ষণ ভাসা যায়।"

কিয়া নামের মেয়েটা বলল, "তোমার ভয় করে না।"

রিকি হিহি করে হেসে বলল, "ধুর! বোকা মেয়ে! ভয় করবে কেন? গ্লাইডার কখনো পড়ে যায় না। কিন্তু আমার মা ভয় পায়।"

কিয়া গম্ভীর মুখে বলল, "ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক।"

রিকি মাথা নাড়ল, বলল, "আমার মা অনেক কিছু ভয় পায়। মাকড়সাকে ভয় পায়। টিকটিকিকে ভয় পায়। সাপকে ভয় পায়।"

মাতিষা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি সাপকে ভয় পাও না?"

"কেন ভয় পাব?"

"যদি কামড় দেয়।"

"কেন কামড় দেবে শুধু শুধু? সাপকে বিরক্ত না করলে সে মোটেও কামড়াবে না। তা ছাড়া এখানে যে সাপ থাকে তাদের বিষ নেই।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"জানি। আমি তো জঙ্গলে ঘুরি—সেই জন্যে এগুলো জানতে হয়।"

নীল তীক্ষ্ণ চোখে রিকির দিকে তাকিয়েছিল এবারে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা যদি তোমার সাথে জঙ্গলে যেতে চাই, গ্লাইডারে উড়তে চাই তুমি আমাদের নেবে?"

"কেন নেব না।"

মাতিষা মাথা নাড়ল, বলল, "বড়রা আমাদের কোনোদিন যেতে দেবে না। বলবে সিমুলেশনে নাই।"

কিয়া বলল, "আমার আর সিমুলেশনের মতো চলতে ইচ্ছা করে না।"

"আমারও করে না।"

নীল বলল, "চল আমরা সবাই রিকির সাথে পালিয়ে যাই।"

সবাই চোখ বড় বড় করে নীলের দিকে তাকাল, "পালিয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ। আমার খুবই গ্লাইডারে উড়ার ইচ্ছে করছে।"

কিয়া বলল, "আমার বানরের বাচ্চা দেখার ইচ্ছে করছে। সেটা খামচি দেবে না তো?"

রিকি বলল, "আমার সাথে থাকলে দেবে না।"

মাতিষা বলল, "আমার ভেলায় উঠতে ইচ্ছে করছে। ভেলা ডুবে যাবে না তো?"

রিকি দাঁত বের করে হাসল, বলল, "ভেলা কখনো ডুবে না। নৌকা ডুবে যায় কিন্তু ভেলা ডুবে না।"

মাতিষা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি শুধু টেলিভিশনে হ্রদের ছবি দেখেছি। সত্যিকারের হ্রদ দেখি নাই। হ্রদ দেখতে কি খুবই সুন্দর?"

রিকি মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। খুবই সুন্দর। হ্রদের নিচে একটা শহর ডুবে আছে। সেটা দেখলে তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তোমরা সাঁতার জানো তো?"

"জানি। কিন্তু আমি শুধু সুইমিংপুলে সাঁতার কেটেছি। পানিতে ক্লোরিনের গন্ধ। ইয়াক থুঃ!"

"হ্রদের পানিতে কোনো গন্ধ নাই।"

মাতিষা মুখ শক্ত করে বলল, "আমিও পালাতে চাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীল বলল, "কারা কারা পালাতে চাও হাত তুল।"

রিকি অবাক হয়ে দেখল সবাই হাত তুলেছে। নীল গম্ভীর হয়ে বলল, "চমৎকার! তা হলে একটা পরিকল্পনা করতে হবে। বড়রা কোনোদিনও আমাদের পালাতে দিবে না।"

লন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। তারা সিমুলেশনের বাইরে কিছুই করতে চায় না।"

শান্তশিষ্ট চেহারার একজন বলল, "যদি বড়রা আমাদের ওপর রাগ হয়?"

"তা হলে আমরাও বড়দের ওপর রাগ হব। বলব, আমরা সিমুলেশন মানি না। তখন সবাই ভয় পেয়ে যাবে। তারা সিমুলেশনকে খুব ভয় পায়।"

মাতিষা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বড়রা খুবই বোকা।"

সবাই মাথা নাড়ল, একজন বলল, "হ্যাঁ, তাদের বোকামির তুলনা নেই।"

নীল ভুরু কুঁচকে বলল, "রবিবার।"

"রবিবার কী?"

"আমরা রবিবার পালাব। মনে আছে রবিবার আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট দেখতে যাওয়ার কথা?"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"আমরা সেখানে না গিয়ে রিকির বাসায় চলে যাব।"

"কীভাবে?"

নীল দাঁত বের করে হাসল, বলল, "চিন্তা করে একটা বুদ্ধি বের করব।"

অন্যেরা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ চিন্তা করে বুদ্ধি বের করব।"

"চল, এখন তা হলে আমরা খেলি।"

"এস, আমরা রিকিকে রকেট মেশিন খেলাটা শিখিয়ে দেই।"

"হ্যাঁ। রকেট মেশিন খুবই মজার একটা খেলা।"

কিয়া মনে করিয়ে দিল, "আমাদের যে রিকির বুদ্ধিমত্তার ওপর একটা রিপোর্ট লিখতে হবে?"

"সেটা আমরা বানিয়ে বানিয়ে লিখে ফেলব।"

কিয়া দাঁত বের করে হেসে বলল, "তারা বুঝতেও পারবে না যে আমরা বানিয়ে বানিয়ে লিখেছি!"

এরপর সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রকেট মেশিন খেলতে শুরু করল, যা একটা মজা হল সেটা বলার মতো নয়।

AMARBOI.COM

১২

হাসি-খুশি শিক্ষিকার কাছে বাচ্চাগুলো যে রিপোর্টটি দিল সেটা ছিল এরকম :

> রিকি নামের ছেলেটির বুদ্ধিমত্তা খুবই নিচু শ্রেণীর। সে আমাদের বলেছে তার সাথে ভাঁওতাবাজি করা হয়েছে। ভাঁওতাবাজি শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক নয় এই ছেলেটা সেটা জানে না। তাকে বলা হয়েছিল যে তাকে চিড়িয়াখানা এবং জাদুঘরে নেয়া হবে কিন্তু সেখানে না নিয়ে তাকে আমাদের স্কুলে আনা হয়েছে। ছেলেটির বুদ্ধিমত্তা খুবই কম কারণ সে বুঝতে পারে নাই যে তাকে আসলে কখনোই চিড়িয়াখানা নেয়া হবে না। সে নিম্নাঞ্চলের একজন সাধারণ ছেলে তাকে চিড়িয়াখানায় নেয়ার কোনো কারণ নেই—এই অতি সাধারণ বিষয়টাই তার বোঝার কোনো ক্ষমতা নেই। বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষেরা সব সময়েই আমাদেরকে ন্যায়নীতির কথা বলে কিন্তু তারা নিজেরা সেগুলো বিশ্বাস করে না এবং তারা সেগুলো পালন করে না। আমাদের বুদ্ধিমত্তা চল্লিশ থেকে আশি ইউনিটের ভেতর তাই আমরা এই ব্যাপারগুলো চট করে বুঝে ফেলি। কিন্তু রিকি নামক ছেলেটা সেটা বুঝতে পারে নাই কারণ তার বুদ্ধিমত্তা খুবই কম।

আমরা আমাদের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সাথে স্কুলে লেখাপড়া করি বলে আমাদের প্রতিভার বিকাশ হচ্ছে। রিকির প্রতিভা বিকাশের কোনো সুযোগ নেই কারণ সে কখনো স্কুলে যেতে পারে না। সময় কাটানোর জন্য সে জঙ্গল পাহাড় এবং হ্রদে ঘুরে বেড়ায়, বানরের সাথে তার বন্ধুত্ব। যার বানরের সাথে বন্ধুত্ব তার বুদ্ধিমত্তা নিশ্চয়ই খুব কম।

রিকি কোনো অ্যালজেবরা জানে না, কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারে না, টাচ প্যাড ব্যবহার করে ছবি আঁকতে পারে না, রকেট মেশিন বা অন্য কোনো খেলা জানে না। এরকম কোনো ছেলে থাকা সম্ভব আমরা সেটি জানতাম না, রিকিকে নিজের চোখে দেখে এটা আমরা জানতে পেরেছি...

হাসি-খুশি শিক্ষিকা পুরো রিপোর্টটি মন দিয়ে পড়ে একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। রিপোর্টটিতে একটুও ভুল তথ্য নেই কিন্তু পড়ে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। মনে হয় এখানে যা লেখা হয়েছে তার বাইরেও কিছু একটা আছে। পুরো রিপোর্টটি যেন এক ধরনের তামাশা—ছোট ছোট বাচ্চাগুলো যেন বড় মানুষদের নিয়ে এক ধরনের তামাশা করছে।

ঠিক কোথায় সেটা ধরতে পারছে না।

হাসি-খুশি শিক্ষিকা অনেক দিন পর হঠাৎ করে একটু বিষণ্ন হয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে না ঠিক কোথায় কিন্তু মনে হতে থাকে কোথায় যেন একটা কিছু ঠিক নেই।

AMARBOI.COM

১৩

স্কুল বাসটি সময়মতো ছেড়ে দিল। আজ রবিবার, বারো জন অত্যন্ত প্রতিভাবান শিশুকে স্থানীয় নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে নিয়ে যাবার কথা। বারো জন শিশু তাদের বাসে শান্ত হয়ে বসে আছে, তাদের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই কিন্তু ভেতরে ভেতরে সবাই অত্যন্ত উত্তেজিত। সবাই পরিকল্পনা করে আজ রিকির কাছে পালিয়ে যাবে।

বাস ড্রাইভার তার জি.পি.এসে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের ঠিকানা প্রবেশ করিয়ে বাসটি চালাতে শুরু করে। যেদিকে যাবার কথা বাসটি সেদিকেই যেতে থাকে, ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে বাসটাকে শুধু নিয়ন্ত্রণের মাঝে রাখে।

নীল এরকম সময়ে তার পকেট থেকে ছোট কম্পিউটারটা বের করে, আজকে তার সাথে সে একটা ওয়্যারলেস ইন্টারফেস লাগিয়ে এনেছে। বাসের পিছনে বসে সে বাস ড্রাইভারের জি.পি.এসে গন্তব্য স্থানটি পাল্টে দিল—নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের পরিবর্তে নগর কেন্দ্রের রেলস্টেশন। বাস ড্রাইভার জানতেও পারল না সে বারোটি অসম্ভব প্রতিভাবান বাচ্চাকে রেলস্টেশনে নিয়ে যাচ্ছে।

নীল এবারে সবাইকে কাছাকাছি ডাকল—তারা কাছে আসতেই সে ফিসফিস করে বলল, "সবার মনে আছে তো কী করতে হবে?"

মাতিষা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, "মনে থাকবে না কেন?"

নীল মুখটা গম্ভীর করে বলল, "এটা আমাদের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার কাজেই কোনো যেন

ভুল না হয়। রেলস্টেশনে থামতেই আমি ইলেকট্রনিক বোতাম টিপে দরজা খুলে দেব—এক দৌড়ে সবাই নেমে যাবে। যাবার সময় বলব আমরা যাচ্ছি শপিং সেন্টার—আসলে শপিং সেন্টারের পাশ দিয়ে যাব রেলস্টেশন।"

মাতিষা বলল, "জানি। আমরা সব জানি।"

নীল মাথা নেড়ে বলল, "তবু আরেকবার পুরোটা ঝালাই করে নেই। স্টেশন কাউন্টারে গিয়ে সবাই ভিড় করে দাঁড়াবে, হইচই করে টিকেট কিনবে বিনোদন পার্কের। মনে আছে তো?"

"মনে আছে। মনে আছে।"

ঠিক এই সময়ে আমি আর কিয়া ঘুরে ঘুরে মেশিনগুলো থেকে তেতাল্লিশ নম্বর স্টেশনের টিকেট কিনব। সেটা হচ্ছে রিকির এলাকার স্টেশন। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে!"

"তারপর আমরা সবাই মিলে একসাথে ছুটতে ছুটতে হাসতে হাসতে বিনোদন পার্কের কথা বলতে বলতে যাব—কাজেই সবাই ধরে নেবে আমরা যাচ্ছি বিনোদন পার্কে। পরে যখন আমাদের খোঁজ করতে আসবে সবাই যাবে বিনোদন পার্কে।"

কিয়া হিহি করে হেসে বলল, "কী মজাটাই না হবে!"

"হ্যাঁ।" নীল গম্ভীর হয়ে বলল, "যদি সবকিছু ঠিক ঠিক করে করতে পারি তা হলে অনেক মজা হবে।"

লন বলল, "এবারে বাকিটা আরেকবার বলে দাও।"

"বাকিটা সোজা। একসাথে আমাদের বারো জনকে দেখলেই সেটা সবাই মনে রাখবে তাই আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে রওনা দেবার সময় আলাদা হয়ে যাব। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের সাত নম্বর ট্র্যাক। আমরা সেখানে পৌঁছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাব, যেন কেউ কাউকে চিনি না। সবাই উঠব আলাদা আলাদা বগিতে। কেউ আমাদের আলাদা করে লক্ষ করবে না।"

AMARBOI.COM

নীল হাতের কম্পিউটারটা একবার দেখে বলল, "তেতাল্লিশ নম্বর স্টেশনে নেমে সবাই বাইরে চলে আসবে রিকি বলেছে বাকি দায়িত্ব তার।"

মাতিষা বলল, "যদি রিকি বাকিটা করতে না পারে?"

"পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে। সেদিন দেখ নাই রিকির কত বুদ্ধি? আমাদের সবার যত বুদ্ধি রিকির একার তত বুদ্ধি।"

মাতিষা মাথা নাড়ল। বলল, "তার অনেক সুবিধা—সে বনে জঙ্গলে ঘুরে মাথার বুদ্ধি বাড়াতে পারে। আমরা শুধু একটা ঘরে বসে থাকি—আমাদের কপালটাই খারাপ।"

লন বলল, "আর কপাল খারাপ থাকবে না। আমরাও এখন থেকে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব।"

নীল তার কম্পিউটারের দিকে চোখ রাখছিল, সে এবারে চাপা গলায় বলল, "সবাই এখন নিজের সিটে যাও, আমরা রেলস্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছি। আর মনে রেখো সবার ভিডিফোন বন্ধ করে দাও কেউ যেন আমাদের ট্র্যাক করতে না পারে।"

সবাই নিঃশব্দে নিজেদের সিটে গিয়ে বসল, তাদের মুখের দিকে তাকালে কেউ বুঝতেও পারবে না যে কিছুক্ষণের ভেতরেই তারা এত বড় একটা কাণ্ড করতে যাচ্ছে।

ঠিক এরকম সময় বাস ড্রাইভার ব্রেক কষে বাসটা থামিয়ে একটা বিস্ময়ের শব্দ করল। নীল জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আশ্চর্য ব্যাপার!" বিশাল দেহের ড্রাইভার হাত নেড়ে বলল, "আমি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে রওনা দিয়েছিলাম—চলে এসেছি রেলস্টেশনে!"

নীল এবং তার সাথে সাথে সবাই উঠে দাঁড়াল। ড্রাইভার অবাক হয়ে বলল, "কী হল? তোমরা সবাই উঠেছ কেন? বস। যার যার সিটে বস।"

নীল ইলেকট্রনিক সুইচটা টিপে ধরতেই শব্দ করে বাসের দুটি দরজা খুলে গেল। সবাই হুড়মুড় করে নামতে থাকে, বাস ড্রাইভার চোখ কপালে তুলে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে থাকে—সিট বেল্টে বাঁধা বাস ড্রাইভার তার বেল্ট খুলে উঠতে উঠতে যেটুকু সময় লাগে তার মাঝে সবাই বাস থেকে নেমে ছুটতে শুরু করেছে। বাস ড্রাইভার আতঙ্কিত মুখে বলল, "কোথায় যাও তোমরা? কোথায় যাও?"

শেষ ছেলেটি গলা উঁচিয়ে বলল, "শপিং সেন্টার।" তারপর মুহূর্তের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাস ড্রাইভার কী করবে বুঝতে না পেরে বাসের সিঁড়িতে বসে পড়ে। পকেট থেকে ভিডিফোন বের করে সে কাঁপা হাতে ডায়াল করতে থাকে। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের বাচ্চাগুলো এই বাস থেকে নেমে গেছে, আজকে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। শুধু তার না, আরো অনেকের সর্বনাশ হবে!

১৪

AMARBOI.COM

গুস্তাভ তার পিকআপ ট্রাকের পিছনের টায়ারে একটা লাথি দিয়ে সেটাকে পরীক্ষা করে মুখ দিয়ে সন্তুষ্টির একটা শব্দ করে রিকির দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যি সত্যি তোমার বন্ধুরা আসবে তো?"

রিকি হাতে কিল দিয়ে বলল, "একশবার আসবে।"

"এত ছোট ছোট বাচ্চা কেমন করে আসবে? কোনো ঝামেলায় না পড়ে যায়!"

রিকি দাঁত বের করে হাসল, বলল, "ছোট বাচ্চা হলে কী হবে? তাদের মাথার বুদ্ধি বড় মানুষ থেকে অনেক বেশি।"

গুস্তাভ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সেইটাই হচ্ছে বিপদ। ছোট মানুষের বুদ্ধি যদি বড় মানুষ থেকে বেশি হয় তা হলে সেইটা খুব বড় বিপদ।"

"কেন বড় বিপদ কেন?"

"বড় মানুষেরা ভুল করে আর সেই জন্যে ছোট মানুষদের একশ রকম ঝামেলা হয়।"

ঠিক এই সময় একটা ট্রেনের চাপা গর্জন শোনা গেল, মাটিতে একটা মৃদু কম্পন শোনা যায় এবং একসময় শব্দটা মিলিয়ে আসে।

গুস্তাভ পিচিক করে রাস্তার পাশে থুতু ফেলে বলল, "নয়টা বাহান্নর ট্রেন এসেছে। দেখা যাক তোমার বন্ধুরা আসতে পেরেছে নাকি!"

কিছুক্ষণ পরেই প্যাসেঞ্জাররা বের হয়ে আসতে থাকে এবং তাদের মাঝে ছোট একটা বাচ্চাকে গুটিগুটি এগিয়ে আসতে দেখা গেল। বাচ্চাটির চোখে-মুখে উদ্বেগের একটা চিহ্ন স্পষ্ট, রাস্তার পাশে রিকিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুহূর্তে তার সমস্ত উদ্বেগ দূর হয়ে গেল। বাচ্চাটি ছুটে রিকির কাছে এসে বলল, "তুমি এসেছ? আমরা যা দুশ্চিন্তায় ছিলাম!"

রিকি বলল, "কোনো দুশ্চিন্তা নাই। পিকআপ ট্রাকের পিছনে উঠে শুয়ে পড় যেন বাইরে থেকে দেখা না যায়!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচ্চাটি পিকআপ ট্রাকের পিছনে উঠতে উঠতেই একজন দুইজন করে অন্য বাচ্চারাও উদ্বিগ্ন মুখে বের হতে শুরু করল। রিকি তাদের সবাইকে পিকআপ ট্রাকের পিছনে তুলতে থাকে। সবার শেষে এল নীল, সে ছুটে এসে রিকির হাত ধরে বলল, "সবকিছু ঠিক আছে?"

রিকি বুড়ো আঙুল উপরে তুলে বলল, "শতকরা একশ দশ ভাগ!"

"চমৎকার। চল তা হলে যাই।"

পিকআপ ট্রাকের মেঝেতে সবাই গাদাগাদি করে শুয়ে আছে, গুস্তাভ সবাইকে একনজর দেখে গোঁফে একবার হাত বুলিয়ে বলল, "এই ট্রাকে করে আমি শহরে হাঁস-মুরগি নিয়েছি, শাক-সবজি নিয়েছি, বালু-পাথর নিয়েছি কিন্তু এরকম কার্গো কখনো নিই নি!"

রিকি বলল, "ভালোই তো হল এখন তোমার লিস্টিটা আরো বড় হল!"

"তা হয়েছে কিন্তু ধরা না পড়ে যাই।"

"ধরা পড়বে না গুস্তাভ। আমরা সবাই মাথা নিচু করে শুয়ে থাকব কেউ দেখবে না।"

গুস্তাভ পিকআপের পিছনের ডালাটা বন্ধ করতে করতে বলল, "শহরতলিটা পার হলেই সোজা হয়ে বসতে পারবে। জঙ্গলের রাস্তায় আজকাল কোনো মানুষজন যায় না।"

পুরোনো লক্কড়ঝক্কড় পিকআপ, ঝাঁকুনিতে সবার শরীর থেকে হাড় এবং মাংস আলাদা হয়ে যাবার অবস্থা কিন্তু কেউ সেটা নিয়ে কোনো অভিযোগ করল না। বরং তারা হাসিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল, দেখে মনে হতে লাগল খানাখন্দে ভরা রাস্তায় লক্কড়ঝক্কড় একটা পিকআপে করে ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে তার মেঝেতে শুয়ে থেকে যাবার মতো আনন্দ বুঝি আর কিছুতে নেই।

কিছুক্ষণের মাঝেই ড্রাইভিং সিট থেকে গুস্তাভ চিৎকার করে বলল, "এখন তোমরা উঠে বসতে পার। জঙ্গলের রাস্তায় চলে এসেছি।"

সাথে সাথে সবাই উঠে বসে, বাতাসে তাদের চুল উড়তে থাকে, তারা সবিস্ময়ে বাইরে তাকায়। দুই পাশে ঘন অরণ্য একসময় সেখানে মানুষের বসতি ছিল হঠাৎ করে ঝোপঝাড় লতাগুল্মে ঢাকা একটি দুটি ধসে যাওয়া বাড়িঘর সেটি মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ধীরে ধীরে রাস্তা খারাপ থেকে আরো খারাপ হতে থাকে। বড় একটা ঝাঁকুনি খেয়ে পিকআপের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবার পর গুস্তাভ রাস্তার পাশে পিকআপটা থামিয়ে বলল, "আমার গাড়ি আর যাবে না! তোমাদের এখানেই নামতে হবে গো।"

সবাই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, পিকআপের ডালাটা খোলা মাত্রই তারা লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে শুরু করে। একজন আরেক জনকে ধাক্কা দিতে দিতে তারা সবিস্ময়ে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকে। নীল পুরো পিকআপটা একপাক ঘুরে দেখে নিয়ে গুস্তাভকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার এই গাড়িটা কোন বছরের?"

গুস্তাভ তার গোঁফে হাত বুলিয়ে বলল, "কঠিন প্রশ্ন করেছ।"

"কেন? এটা কঠিন প্রশ্ন কেন?"

"তার কারণ আমার পিকআপের চেসিস বাইশ সনের, ইঞ্জিন ছাব্বিশ সনের, ফুয়েল সিস্টেম তেইশ সনের, ট্রান্সমিশন চব্বিশ সনের আর চাকাগুলো এই সেদিন লাগিয়েছি—তা হলে তোমরাই বল গাড়িটা কোন বছরের।"

কিয়া হিহি করে হেসে বলল, "সবগুলো বছর যোগ দিয়ে গড় করে ফেলতে হবে।"

নীল বলল, "আমি আগে কখনো এরকম গাড়ি দেখি নাই।"

গুস্তাভ হাসতে হাসতে বলল, "তোমরা যেখান থেকে এসেছ সেখানে এরকম গাড়ি দেখার কথা না। শুধু গাড়ি না আরো অনেক কিছু দেখার কথা না!"

রিকি এগিয়ে এসে বলল, "আমাদের হাতে সময় বেশি নাই। চল আমরা শুরু করে দিই, আমাদের কিন্তু অনেক দূর হাঁটতে হবে। আগে কোথায় যাবে বল।"

সবাই চিৎকার করে তাদের পছন্দের জায়গার কথা বলতে যাচ্ছিল নীল হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিল, বলল, "না। এভাবে হবে না। একেকজনের পছন্দ একেক জায়গায় কাজেই সেভাবে হবে না। রিকি ঠিক করুক সে আমাদের কোথায় নিতে চায়! আমরা সবাই রিকির পিছু পিছু যাব।"

"ঠিক আছে।"

"রিকি হচ্ছে আমাদের লিডার।"

সবাই চিৎকার করে বলল, "রিকি হচ্ছে আমাদের লিডার।"

রিকি বনের রাস্তাটা দেখে বলল, "আমরা এই পথ দিয়ে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে বনে ঢুকে যাব। সেখান দিয়ে পাহাড়ে উঠে প্রথমে গ্লাইডারে উড়ব। তারপর সেখান থেকে হ্রদে গিয়ে ভেলা। ঠিক আছে?"

সবাই সমস্বরে বলল, "ঠিক আছে।"

গুস্তাভের পিকআপটা চলে যাওয়া পর্যন্ত সবাই অপেক্ষা করে তারপর তারা বনের পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে। প্রথমে মাতিষা মৃদু স্বরে এবং একটু পরে গলা ছেড়ে গান গাইতে থাকে—সবাই তার সাথে গলা মেলায়।

নির্জন বনভূমি হঠাৎ করে কিছু শিশুর গানের সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

১৫

প্রিন্সিপাল কেটির মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। সে আর্তকণ্ঠে বলল, "কী বলছ তুমি?"

ড্রাইভার বলল, "আমি ঠিকই বলছি প্রিন্সিপাল। বাসটা যাবার কথা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে—সেটা চলে এল রেলস্টেশনে।"

প্রিন্সিপাল কেটি ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "তুমি কোথায় বাস নিয়ে যাচ্ছ সেটি দেখবে না?"

"কখনোই তো দেখি না, জি.পি.এস আমাদের নিয়ে আসে। কেমন করে যে গন্তব্যটা পাল্টে গেল!"

প্রিন্সিপাল কেটির মাথায় তখন হাজারো রকম আশঙ্কার কথা উঁকি দিচ্ছে, সে ঠিক করে চিন্তা করতে পারছিল না। বিড়বিড় করে বলল, "তুমি বাচ্চাগুলোকে নামতে দিলে কেন?"

"আমি কী নামতে দিয়েছি? কিছু বোঝার আগেই ইলেকট্রনিক দরজা খুলে সবাই নেমে গেল। বলল শপিংমলে যাচ্ছে।"

"শপিংমল? এই বাচ্চারা শপিংমলে কেন যাবে?"

"আমি জানি না প্রিন্সিপাল কেটি। কী করতে হয় আপনি করেন।"

প্রিন্সিপাল কেটি বলল, "কী করব আমি জানি না তবে তুমি জেনে রাখ যদি এই বাচ্চাদের কারো কিছু হয় তা হলে তুমি আমি কিংবা এই স্কুলের কারো কিন্তু রক্ষা নাই। বুঝেছ?"

কিছুক্ষণের মাঝেই স্কুল কম্পাউন্ডে অনেকগুলো পুলিশ, সেনাবাহিনীর এবং অভিভাবকদের গাড়ি এসে হাজির হল। প্রিন্সিপাল কেটি তার অফিসে অসহায়ভাবে বসে

রইল এবং তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।

রন সরাসরি অফিস থেকে চলে এসেছে। তার শরীরে পূর্ণ সামরিক পোশাক, এই পোশাকে তাকে একজন অপরিচিত মানুষের মতো দেখায়। তার মুখ পাথরের মতো কঠিন। সে চাপা এবং হিংস্র গলায় বলল, "আপনারা দাবি করেন যে আপনাদের স্কুল আমাদের সন্তানদের পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়েছে। তা হলে কোথায় আপনাদের দায়িত্ববোধ? আমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায়?"

প্রিন্সিপাল কেটি দুর্বল গলায় বলল, "আমি আপনাদের বলেছি—এই বারো জন শিশু পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান শিশু। এরা যদি কোনো একটা পরিকল্পনা করে কিছু একটা করে তা হলে আমরা দূরে থাকুক আপনারা সবাই মিলেও তাদের থামাতে পারবেন না।"

"আপনি বলছেন তারা পরিকল্পনা করে পালিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। আমার তাই ধারণা। খুব ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে তারা পালিয়ে গেছে।"

রন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের সন্তানেরা এতদিন ঠিকভাবে থেকে হঠাৎ করে কেন খেপে উঠল? কেন তারা স্কুল থেকে পালিয়ে গেল? কী করেছেন আপনারা তাদের?"

"আমরা কিছুই করি নি! ঠিক যেভাবে তাদের লেখাপড়া করানোর কথা, যখন যেটা যেভাবে শেখানোর কথা হুবহু সেভাবে শিখিয়ে আসছি। পুরো ব্যাপারটা আমাদের কাছেও একটা রহস্য।"

কাঁদো কাঁদো গলায় একজন মা বলল, "আমার শান্তশিষ্ট মেয়ে পালিয়ে গেছে? আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ভিডিফোনটা পর্যন্ত বন্ধ করে রেখেছে। কী আশ্চর্য।"

ঠিক এরকম সময় পুলিশের এক কর্মকর্তার ভিডিফোন বেজে ওঠে, সে নিচু গলায় কিছুক্ষণ কথা বলে হাসিমুখে ঘরের সবার দিকে তাকাল। বলল, "খোঁজ পাওয়া গেছে।"

"খোঁজ পাওয়া গেছে? সত্যি?" রন অবাক হয়ে পুলিশ কর্মকর্তার দিকে তাকাল। "কোথায় আছে তারা।"

"স্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তারা বারো জন কাছাকাছি একটা বিনোদন কেন্দ্রের টিকেট কিনেছে। আমি দুই প্লাটুন পুলিশ বিনোদন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

একজন মা অবাক হয়ে বলল, "বিনোদন কেন্দ্র? আমি তো চেষ্টা করেও আমার ছেলেকে কোনো দিন বিনোদন কেন্দ্রে নিতে পারি না। তারা দল বেঁধে এখন বিনোদন কেন্দ্রে গিয়েছে?"

প্রিন্সিপাল কেটি মাথা নেড়ে বলল, "আপনারা এই বাচ্চাদের খাটো করে দেখবেন না—এরা সবাইকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এই ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে—আসলে তারা বিনোদন কেন্দ্রে যায় নি। অন্য কোথাও গেছে।"

পুলিশ কর্মকর্তাকে এবারে খানিকটা অপ্রস্তুত দেখায়, সে কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে বলল, "কিন্তু বিনোদন কেন্দ্রটা একটু দেখে এলে তো কোনো ক্ষতি নেই। তারা তো যেতেও পারে। পারে না?"

প্রিন্সিপাল কেটি বলল, "যেতে পারে কিন্তু তার সম্ভাবনা খুবই কম। তারা অন্য কোথাও গেছে।"

রন হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলল, "কিন্তু কোথায়?"

কাঁদো কাঁদো গলায় একজন মা বলল, "তার চেয়ে বড় কথা, কেন? কেন?"

১৬

রিকি নীলকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি শক্ত করে ধরেছ?"

নীল গ্লাইডারের হালকা অ্যালুমিনিয়ামের টিউবটা শক্ত করে ধরে বলল, "হ্যাঁ ধরেছি।"

"তোমার ভয় করছে না তো?"

নীলের বুকের ভেতর ধক ধক শব্দ করছিল কিন্তু সে মুখে বলল, "না। ভয় করছে না।"

"ঠিক আছে। আমি যখন বলব এক দুই তিন তখন দৌড়াতে শুরু করব। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"দশ পা দৌড়ে পা দিয়ে পাহাড়টাকে ধাক্কা দিয়ে লাফ দেব। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"যখন ভাসতে থাকব তখন পাগুলো পিছনে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ব। শরীরের ওজনটা সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"সমানভাবে না ছড়ালে গ্লাইডারটা গোত্তা খেয়ে পড়তে থাকবে।"

নীল বলল, "আমি শুয়ে ওজনটা সমানভাবে ছড়িয়ে দেব।"

"ঠিক আছে তা হলে আমরা শুরু করি।" রিকি বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "এক দুই তিন—" তারপর দৌড়াতে শুরু করল। গুনে গুনে দশ পা দৌড়ে দুজনে একসাথে পাহাড়টাকে ধাক্কা দিয়ে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাথে সাথে গ্লাইডারটা আকাশে ভেসে যায়!

রিকি খুশিতে চিৎকার করে বলল, "চমৎকার!"

নীল রিকির দেখাদেখি সাবধানে নিজের শরীরটা ভেতরে টেনে এনে ক্যানভাসের টুকরোটার ওপর শুয়ে পড়ে। গ্লাইডারটা ধীরগতিতে ভেসে যেতে থাকে, নীল দেখতে পায় নিচে অন্যেরা দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে। কয়েক মিনিট যাবার পর নীল যখন বুঝতে পারল হঠাৎ করে তারা পড়ে যাবে না—ডানা ছড়িয়ে থাকা একটা পাখির মতোই তারা শান্ত ভঙ্গিতে আকাশে উড়ে যাবে, তখন নীল বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা বের করে বলল, "কী আশ্চর্য!"

"কী হয়েছে?"

"আমরা কী বোকা।"

"কেন তোমরা বোকা কেন?"

নীল গ্লাইডারের পিছনের রাডারকে একটু টেনে ডান দিকে ঘুরিয়ে বলল, "আমরা একটা ঘরের ভেতরে বসে কম্পিউটারে ফ্লাইট সিমুলেশন খেলতাম—আকাশে উড়ার একটা কম্পিউটারের খেলা! আর তুমি সত্যি সত্যি আকাশে উড়ো!"

"এখন তো তুমিও উড়ছ।"

"হ্যাঁ। আমিও উড়ছি।" নীল হঠাৎ শব্দ করে হাসতে শুরু করল।

রিকি জিজ্ঞেস করল, "কী হল? হাসছ কেন?"

"আমাদের প্রিন্সিপাল কেটি এখন কী করছে চিন্তা করে হাসছি!"

"কী করছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"জানি না। আমরা যেন সব সময় নিরাপদে থাকি, কোনোভাবে যেন আমাদের কোনো বিপদ না হয় সেটার চিন্তা করতে করতেই সে অস্থির হয়ে থাকে! এখন যদি দেখত আমি গ্লাইডারে করে আকাশে উড়ছি তার নিশ্চয়ই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত।"

নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সবাই মাথা উঁচিয়ে গ্লাইডারে করে ভেসে যাওয়া রিকি আর নীলের দিকে তাকিয়ে রইল। কিয়ার ঘাড়ে বসে একটা ছোট বানরের বাচ্চা খুব মনোযোগ দিয়ে এক টুকরো রুটি কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। বেশ অনেকক্ষণ সময় নিয়ে বানরের বাচ্চাটার সাথে ভাব করে সে তাকে শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে নিতে পেরেছে। সে বানরের বাচ্চাটির মাথায় আস্তে করে হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এই যে বানর বাহাদুর। তুমি কি আমার সাথে আমাদের বাসায় যাবে? দেখো আমি তোমাকে কত আদর করব!"

বানরের বাচ্চাটি দাঁত বের করে মুখভঙ্গি করে এক ধরনের শব্দ করল। কিয়া উত্তেজিত গলায় বলল, "দেখেছ? দেখেছ? আমার সাথে যেতে রাজি হয়েছে!"

মাতিষা হিহি করে হেসে বলল, "কচু রাজি হয়েছে। সে মুখ খিঁচিয়ে বলেছে, কখনো যাব না!"

কিয়াও এবারে হিহি করে হাসতে থাকে, বলে, "হ্যাঁ! মনে হয় সেটাই হয়েছে! বানরের বাচ্চাটা বলছে আমাকে কি মানুষের বাচ্চার মতো বোকা পেয়েছ যে তুমি বলবে আর আমি চলে যাব?"

লন অনেকক্ষণ থেকে তার কনুইয়ের কাছে চুলকাচ্ছিল, জায়গাটা লাল হয়ে উঠেছে। লাল চুলের একটা মেয়ে বলল, "এখনো চুলকাচ্ছে।"

লন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

মাতিষা মুখ শক্ত করে বলল, "তোমার একটা উচিত শিক্ষা হয়েছে! রিকি এত করে বলল এই গাছটার কাছে যেও না। পাতাগুলো বিষাক্ত—তুমি বিশ্বাস করলে না! বাহাদুরি করতে এগিয়ে গেলে।"

লন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "আমি ভেবেছিলাম রিকি ঠাট্টা করছে! গাছের পাতা আবার বিষাক্ত হয় কেমন করে? এমন সুন্দর কচি সবুজ পাতা!"

"এখন বুঝেছ তো?"

লন মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ বুঝেছি।"

ঠিক এরকম সময় গাছের শুকনো পাতায় সরসর করে একটা শব্দ হল, সবাই মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে তাকায়। অবাক হয়ে দেখে একটা মোটা সাপ হেলে-দুলে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু পরপর মুখের ভেতর থেকে জিব বের করে চারপাশের অবস্থাটা একটু পরীক্ষা করে দেখছে।

ছোট ছোট চুলের ছেলেটা চোখ বড় বড় করে বলল, "দেখেছ? দেখেছ সাপটা কী সুন্দর?"

"হ্যাঁ। কী সুন্দর গায়ের রঙ। আর কী স্বাস্থ্যবান আর শক্তিশালী।"

"মনে হচ্ছে হাত দিয়ে টিপে দেখি!"

কিয়া মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু। রিকি বলেছে বনের কোনো প্রাণীকে বিরক্ত করতে হয় না। তাদের শুধু দেখতে হয়!"

মাতিষা কিছু বলল না, কয়দিন আগে হলেও সে সাপ দেখলে ভয়ে চিৎকার করত। মাকড়সা দেখলে ঘেন্নায় সিঁটিয়ে যেত! কিছুক্ষণ রিকির সাথে থেকেই সে জেনে গেছে আসলে এই পৃথিবীটা সবার জন্যে! এখানে মানুষও থাকবে পশুপাখিও থাকবে পোকামাকড়ও থাকবে। কেউ কাউকে ভয় পাবে না কেউ কাউকে ঘেন্না করবে না!

AMARBOI.COM

ওপর থেকে হঠাৎ নীলের গলার স্বর শুনে সবাই ওপরে তাকাল—গ্লাইডারটা খুব ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসছে—গাছের ডালে লেগে যেন গ্লাইডারের পাখাগুলো ভেঙে না যায় সে জন্য তারা পাহাড়ের ঢালটা বেছে নিয়েছে। খুব ধীরে ধীরে অতিকায় একটা পাখির মতো গ্লাইডারটা নেমে এল।

সবাই চিৎকার করতে করতে গ্লাইডারের কাছে ছুটে যেতে থাকে। গলা ফাটিয়ে সবাই বলতে থাকে, "এবারে আমি! এবারে আমি! এবারে আমি!"

হ্রদের তীরে একটা মোটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সবাই দুপুরের খাবার সেরে নিল। প্রতিদিন খাওয়াটা তাদের জন্যে একটা মস্ত বিড়ম্বনা কিন্তু আজ তারা সবাই কাড়াকাড়ি করে খেল। পানির বোতলে মুখ লাগিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে একজন গা এলিয়ে বালিতে শুয়ে পড়ে বলল, "আমি আর বাড়িতে যাব না! আমি এখানেই থেকে যাব।"

তার দেখাদেখি আরো কয়েকজন বালিতে শুয়ে পড়ে বলে, "আমরাও যাব না!"

রিকি হেসে বলল, "ঠিক আছে যেও না। থেকে যাও।"

মাতিষা বলল, "কিন্তু আমি ভেলায় উঠতে চাই। হ্রদের নিচে রহস্য নগরী দেখতে চাই।"

"হ্যাঁ, চল।" রিকি বলল, "আগে ভেলাটাকে ঠেলে পানিতে নামাতে হবে।"

হ্রদের তীরে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে রাখা ভেলাটাকে টেনে বের করে সবাই মিলে সেটাকে ঠেলে ঠেলে পানিতে নামিয়ে নেয়। তারপর অকারণেই চিৎকার করতে করতে সবাই সেই ভেলার ওপর উঠে বসে। রিকি ধাক্কা দিয়ে ভেলাটাকে পানির গভীরে নিয়ে বুকে ভর দিয়ে ওপরে উঠে এল।

লাল চুলের মেয়েটি হ্রদের স্বচ্ছ পানিতে হাত দিয়ে বলল, "দেখেছ পানিটা কী চমৎকার! একেবারেই ঠাণ্ডা নয়!"

রিকি মাথা নাড়ল, বলল, "ওপরের পানি ঠাণ্ডা নয়। নিচে দেখ কী ঠাণ্ডা। একেবারে মাছের পেটের মতন।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। চল আগে হ্রদের মাঝামাঝি যাই, নিচে যেখানে ঘরবাড়ি আছে সেখানে আমরা পানিতে নামব। দেখবে কী সুন্দর! মনে হয় এক্ষুনি বুঝি কোনো ঘরের জানালায় একটা মৎস্যকন্যা এসে দাঁড়াবে!"

কিয়া হিহি করে হাসতে হাসতে বলল, "ইস! সত্যি সত্যি যদি একটা মৎস্যকন্যা পাওয়া যেত। তা হলে কী মজাই না হত। তাই না?"

মাতিষা হ্রদের পানি হাতে নিয়ে নিজের মুখে ঝাপটা দিতে দিতে বলল, "সেটা আর কঠিন কী? আমরা বাসায় না গিয়ে এইখানে পানিতে থাকি তা হলেই তো আমরা মৎস্যকন্যা হয়ে যাব!"

নীল বলল, "মৎস্যকন্যা হওয়া এত সোজা নয়। মৎস্যকন্যাদের অর্ধেক হয় মাছের মতো!"

মাতিষা বলল, "কে বলেছে তোমাকে? অর্ধেক মাছের মতো না হলেও মৎস্যকন্যা হওয়া যায়। যে মাছের সাথে থাকে সেই হচ্ছে মৎস্যকন্যা!"

ঠিক তখন একটা শুশুক তাদের পাশে ভুশ করে ভেসে উঠে আবার পানির নিচে ডুবে গেল। পানির ঝাপটায় সবাই ভিজে গিয়ে চমকে ওঠে। রিকি বলল, "এটা হচ্ছে শুশুক। আমি যখনই ভেলা নিয়ে আসি তখন আমার চারপাশে খেলা করে!"

AMARBOI.COM

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমি একদিন এটার সাথে বন্ধুত্ব করব। তখন সে আমাকে পানির নিচে নিয়ে যাবে।"

মাতিষা বলল, "আমিও যাব! আমিও যাব!"

"ঠিক আছে, আগে বন্ধুত্ব করে নিই। এখনো শুশুকটা আমার বেশি কাছে আসে না, একটু দূরে দূরে থাকে।"

কথা বলতে বলতে সবাই ভেলাটাকে ভাসিয়ে হ্রদের আরো গভীরে নিয়ে আসে। নিচে ডুবে যাওয়া বাড়িগুলো আবছা আবছা দেখা যায়। শ্যাওলা ঢাকা সবুজ বাসাগুলোর মাঝে এক ধরনের রহস্য লুকিয়ে আছে। বাচ্চাগুলো পালা করে নিচে নেমে দেখার চেষ্টা করে। চোখে গগলস নেই বলে পরিষ্কার দেখা যায় না—পানির ভেতর আবছা একটা রহস্যপুরীর মতো মনে হয়।

পানিতে অনেকক্ষণ ঝাঁপাঝাঁপি করে তারা যখন একবার ভেলার ওপর উঠে আসে তখন হঠাৎ করে দূরে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পায়। নীল হেলিকপ্টারগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হেলিকপ্টার।"

কিয়া নীলকে একটা ছোট ধাক্কা দিয়ে বলল, "হেলিকপ্টার দেখে এত অবাক হচ্ছ কেন? তুমি আগে কখনো হেলিকপ্টার দেখ নি?"

"দেখব না কেন, দেখেছি। কিন্তু এই হেলিকপ্টারগুলোর একটা ব্যাপার আছে!"

"কী ব্যাপার?"

"এগুলো আমাদের খুঁজতে বের হয়েছে। মনে হয় আমাদের দেখে ফেলেছে। দেখছ না এগুলো এদিকে আসছে।"

সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সত্যি সত্যি হেলিকপ্টারগুলো হ্রদের ওপর দিয়ে তাদের দিকে উড়ে উড়ে আসতে থাকে।

লন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ধরা পড়ে গেছি।"

নীল গম্ভীর গলায় বলল, "তোমরা সবাই এদিকে এস। তাড়াতাড়ি।"

মাতিষা বলল, "কেন নীল?"

"কিছুক্ষণের মাঝেই আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। ধরে নেয়ার আগে আমি একটা জিনিস করতে চাই।"

"কী জিনিস?"

"রক্ত শপথ!"

"রক্ত শপথ?"

"হ্যাঁ, রক্ত শপথ?"

"কী নিয়ে রক্ত শপথ?"

নীল গম্ভীর মুখে বলল, "আমরা আজকে বুঝতে পেরেছি আমাদের জীবনটাতে আসলে ভুল হয়েছে। বড় মানুষেরা আমাদের নিয়ে অনেক বড় বড় অন্যায় করে। আমরা রক্ত শপথ করব যে যখন আমরা বড় হব তখন আমরা অন্যায় করব না।"

সবাই গম্ভীর হয়ে বলল, "করব না।"

"আমরা রিকির মতন হব।"

"রিকির মতন হব।"

মাতিষা বলল, "হেলিকপ্টার চলে আসছে। তাড়াতাড়ি রক্ত শপথ শুরু কর।"

নীল বলল, "এই যে ছোট চাকুটা দিয়ে সবাই আঙুলের ডগা থেকে এক ফোঁটা রক্ত বের করে এই শ্যাওলার ওপর রাখ। তারপর সবাই হাতে হাত ধরে বল—"

ভেলাটার ওপর হেলিকপ্টারগুলো ঘুরপাক খেতে থাকে। হেলিকপ্টারে বসে থাকা ন্যাশনাল সিকিউরিটির একজন বড় কর্মকর্তা অবাক হয়ে দেখল বাচ্চাগুলো একে অপরের হাত ধরে চোখ বন্ধ করে কিছু একটা বলছে। কী বলছে সে শুনতে পেল না কিন্তু কথাগুলো নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ—তাদের চোখ-মুখ দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে!

১৭

নীল একটা চেয়ারে বসেছে, সামনে আরো দুটো চেয়ার, তার একটাতে বসেছে রন অন্যটাতে নিহা। নীল বেশ চেষ্টা করে মুখে একটা নির্লিপ্ত ভাব ধরে রেখেছে।

রন কঠিন গলায় বলল, "নীল, তুমি এখন বল ঠিক কী হয়েছে।"

"কিছু হয় নি বাবা।"

রন একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "কিছু হয় নি মানে? তোমরা স্কুলের সব ছেলেমেয়ে পালিয়ে চলে গেলে, সারা দিন যতসব ভয়ংকর কাজ করে বেড়াচ্ছ। ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যবহার করে তোমাদের খুঁজে আনতে হয়েছে আর তুমি বলছ কিছুই হয় নি?"

"তোমরা এত ব্যস্ত হলে কেন? আমরা সবাই তো ফিরে আসতাম।"

"কিন্তু তোমরা পালিয়ে গেলে কেন?"

"আমরা যেখানে গিয়েছিলাম, যার কাছে গিয়েছিলাম তোমরা কি আমাদের তার কাছে যেতে দিতে?"

রন একটু থতমত খেয়ে বলল, "আমাদের কাছে কি সেটা জিজ্ঞেস করে দেখেছ?"

নীল এবারে খুক করে হেসে ফেলল। রন কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি হাসছ কেন?"

"আমরা যে ছেলেটার কাছে গিয়েছিলাম তার নাম রিকি! রিকিকে ভাঁওতাবাজি করে আমাদের কাছে এনেছিল। কেন এনেছিল জান?"

নিহা একটু অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসে বলল, "কেন?"

"আমাদের দেখানোর জন্যে আমরা কত বুদ্ধিমান, সে কত বোকা! আমরা কী দেখেছি জান?"

"কী দেখেছ?"

"ঠিক উল্টোটা। আমরা কত বোকা আর রিকি কত বুদ্ধিমান।"

নিহা আর রন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। নিহা ইতস্তত করে বলল, "এটা হতে পারে না। তোমরা সবাই জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে ডিজাইন করা ছেলেমেয়ে। তোমাদের ভেতরে নানা ধরনের প্রতিভার জিন আছে—"

নীল আবার খুক করে হেসে ফেলল। নিহা একটু থতমত খেয়ে বলল, "তুমি হাসছ কেন?"

"তোমার কথা শুনে।"

"আমার কোন কথাটি শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে?"

"এই যে বলছ আমাদের ভেতরে প্রতিভার জিন আছে!"

নিহা একটু অবাক হয়ে বলল, "এটা কি একটা হাসির কথা?"

"হ্যাঁ।" নীল হাসি চেপে বলল, "তোমরা জোর করে আমার ভেতরে ছবি আঁকার জিন ঢুকিয়ে দিয়েছ। কিন্তু মা, আমার ছবি আঁকতে ভালো লাগে না। আমি কখনো ছবি আঁকব না—তা হলে? এই জিন দিয়ে আমি কী করব?"

নিহাকে কেমন যেন অসহায় দেখায়, সে কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তা হলে তুমি কী করবে ঠিক করেছ?"

"পুরোটা ঠিক করি নি। একটু একটু ঠিক করেছি।"

রন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, এবারে কঠিন গলায় বলল, "একটু একটু কী করবে ঠিক করেছ?"

নীল হঠাৎ মুখ কঠিন করে বলল, "সেটা বলা যাবে না।"

"কেন বলা যাবে না।"

"আমরা সবাই রক্ত শপথ করেছি।"

"কী করেছ?"

"রক্ত শপথ।"

"সেটা কী?"

"সবাই আঙুল কেটে রক্ত বের করে একটু শ্যাওলার ওপর লাগিয়ে শপথ করেছি। সেটা হচ্ছে রক্ত শপথ।"

নিহা ছোট একটা আর্তচিৎকার করে বলল, "হাত কেটে রক্ত বের করেছ? যদি ইনফেকশন হয়?"

নীল তার মায়ের কথার কোনো উত্তর দিল না। রন থমথমে গলায় বলল, "রক্ত শপথ ছাড়া আর কী কী করেছ?"

"আরো অনেক কিছু করেছি। কিন্তু সেগুলো শুনলে তোমরা ভয় পাবে, না হয় রাগ হবে, না হয় মন খারাপ করবে। কাজেই তোমাদের শুনাতে চাই না।"

নিহা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "বাবা নীল। আমরা তোমার জন্যে এত কিছু করেছি আর তুমি এমন কাজ করছ যেটা শুনে আমরা ভয় পাব, রাগ হব না হয় মন খারাপ করব?"

নীল তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "মা সে জন্যে কিন্তু আমি দায়ী না।"

"কে দায়ী? আমরা?"

"হ্যাঁ মা। তোমরা। বড় মানুষেরা আসলে ছোট বাচ্চাদের বুঝতে পারে না। তোমরা অনেক ভুল কাজ কর।"

রন হঠাৎ করে রেগে উঠে বলল, "আমার এই পুঁচকে ছেলের কাছে শুনতে হবে আমি তাদের ঠিক করে মানুষ করি না? আমি ভুল করি?"

নীল তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবা, আমরা আসলে পুঁচকে ছেলে না। তোমরাও সেটা জান। তোমরা আমাদের জিনোম পাল্টে দিয়ে আমাদের বড় মানুষ করে ফেলেছ। আমরা বড় মানুষের মতো কথা বলি, বড় মানুষের মতো চিন্তা করি। তোমরা কী কর কী ভাব আমরা সব বুঝতে পারি। আমরা এত ছোট বয়সে বড় মানুষ হতে চাই না। তোমরা আমাদের ছোট থাকতে দাও নি, জোর করে বড় মানুষ করেছ। উগুরুর কোম্পানি থেকে সার্টিফিকেট এনেছ—"

নিহা নীলকে থামানোর চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু নীল—"

নীলের চোখে হঠাৎ পানি এসে যায়। সে ভাঙা গলায় বলল, "মা! আমরা সবাই ছোট বাচ্চা থাকতে চাই। জন্মের পরের দিনই আমরা বড় মানুষ হতে চাই নাই। তোমরা জোর করে আমাদের বড় মানুষ বানিয়ে দিও না।"

রন এবং নিহা পাথরের মতো মুখ করে তাদের আশি পয়েন্টের বাচ্চার দিকে তাকিয়ে রইল।

১৮

প্রতিভাবান বাচ্চাদের বিশেষ স্কুলের বাচ্চারা তাদের কোম্পানির দেয়া সিমুলেশন অনুযায়ী বড় হচ্ছিল। হঠাৎ করেই তাদের মাঝে বড় একটা বিচ্যুতি হল। তারা আর কেউই সেই সিমুলেশনের মাঝে আবদ্ধ রইল না। তাদের সবারই নিজের একটা জগৎ তৈরি হল যার সাথে কোম্পানির দেয়া সার্টিফিকেটের কোনো মিল নেই।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতিভাবান এই শিশুগুলোর কেউই খুব বিখ্যাত হয়ে বড় হল না। তারা সবাই বড় হল খুব সাধারণ মানুষ হিসেবে। কেউ সমাজকর্মী, কেউ স্কুলের শিক্ষক, কেউ খুব একজন সাধারণ ডাক্তার। এই বাচ্চাগুলোর ভেতর একটা মিল ছিল। তারা সবাই ছিল হাসি-খুশি এবং আনন্দময়। তারা ছিল পরিশ্রমী, উৎসাহী আর উদ্যোগী। সাধারণ মানুষের জন্যে ছিল তাদের বুক ভরা ভালবাসা। যারাই তাদের কাছাকাছি এসেছিল তারাই কখনো না কখনো তাদের বলেছে, "তুমি ইচ্ছে করলে অনেক বড় কিছু হতে পারবে!"

সেই কথা শুনে তারা হা হা করে হাসত। হেসে হেসে বলত, "কে বলেছে আমি অনেক বড় কিছু হই নি। আমি আসলে অনেক বড় কিছু হয়েছি!"

কেউই এ কথাগুলোর অর্থ ঠিক করে বুঝত না—কিন্তু সবাই অনুভব করত কথাগুলো সত্যি। অনেক বড় না হয়েও মানুষ কেমন করে অনেক বড় হয় সেটা নিয়ে সবাই একটু ভাবনায় পড়ে যেত।

কেমন করে এটা হল কেউই জানে না। অনেকে অনুমান করে সেই শৈশবে রিকির সাথে রক্ত শপথ করার সাথে এর একটা সম্পর্ক আছে। কী নিয়ে সেই রক্ত শপথ করা হয়েছিল সেটি কেউ কখনো জানতে পারে নি!

ইকারাস

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব

১

সমুদ্রের পানিতে সূর্যটা পুরোপুরি ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত জহুর বালুকাবেলায় চুপচাপ বসে রইল। সে প্রতিদিন এই সময়টায় সমুদ্রের তীরে আসে এবং চুপচাপ বসে সূর্যটাকে ডুবে যেতে দেখে। ঠিক কী কারণে দেখে তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নেই। সে খুবই সাধারণ মানুষ। প্রকৃতি বা প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্য এসব ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই। যারা তাকে চেনে তাদের ধারণা সে বাউণ্ডুলে এবং ভবঘুরে ধরনের মানুষ। সেটি পুরোপুরি সত্য নয়—অল্প সময়ের ব্যবধানে তার একমাত্র মেয়ে এবং স্ত্রী মারা যাবার পর হঠাৎ করে সে পৃথিবীর আর কোনো কিছুর জন্যেই আকর্ষণ অনুভব করে না।

সূর্যটা পুরোপুরি ডুবে যাবার পর জহুর উঠে দাঁড়াল এবং নরম বালুতে পা ফেলে হেঁটে হেঁটে ঝাউগাছের নিচে ছোট টংঘরটাতে হাজির হল। সেখানে কাঠের নড়বড়ে বেঞ্চটাতে বসে জহুর এক কাপ চায়ের অর্ডার দেয়। তার যে চা খেতে খুব ইচ্ছে করে তা নয়, তারপরেও সে রুটিনমাফিক এখানে বসে এক কাপ চা খায়। যে ছেলেটা দুমড়ানো কেতলি থেকে কাপে গরম পানি ঢালে, দুধ চিনি দিয়ে প্রচণ্ড বেগে একটা চামচ দিয়ে সেটাকে ঘুঁটে তার সামনে নিয়ে আসে জহুর বসে বসে তার কাজকর্ম লক্ষ করে। কেন লক্ষ করে জহুর নিজেও সেটা জানে না। এখন তার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, একদিন থেকে পরের দিনের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই।

জহুর অন্যমনস্কভাবে চায়ের কাপে চুমুক দেয়, চা-টা ভালো হয়েছে না মন্দ হয়েছে জহুর সেটাও বুঝতে পারল না। অনেকটা যন্ত্রের মতো কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সে সামনের দিকে তাকাল এবং দেখল মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে। জহুরের ভাসা ভাসাভাবে মনে হল এই মানুষটাকে সে আগে কখনো দেখেছে কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না। মানুষটার সামনের দিকে চুল পাতলা হয়ে এসেছে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি এবং গায়ে একটা ভুসভুসে নীল রঙের শার্ট।

জহুর মানুষটাকে একনজর দেখে আবার তার চায়ের কাপে চুমুক দেয়, এবারে তার মনে হল চায়ে চিনি একটু বেশি দেয়া হয়েছে—তবে তাতে তার কিছু আসে-যায় না। কোনো কিছুতেই তার কখনো কিছু আসে-যায় না। জহুর চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে আবার সামনের দিকে তাকাল, দেখল মাথার সামনে চুল পাতলা হয়ে যাওয়া মধ্যবয়স্ক মানুষটা এখনো তার দিকে তাকিয়ে আছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহুর একটু অস্বস্তি অনুভব করে, সে নিজে সুযোগ পেলেই তার চারপাশের মানুষকে লক্ষ করে, কিন্তু সেটা সে করে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে। এই মানুষটি তাকে লক্ষ করছে সরাসরি, একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে। জহুর একটু ঘুরে বসবে কি না চিন্তা করছিল তখন মধ্যবয়স্ক মানুষটা সামনের বেঞ্চ থেকে উঠে তার পাশে এসে বসে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, আপনি কী করেন?"

জহুর কী বলবে ঠিক বুঝতে পারল না, একজন মানুষ—যার সাথে চেনা পরিচয় নেই তাকে সরাসরি এভাবে এ রকম একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে কি না সেটা সে একটু চিন্তা করল। যে আসলে কিছুই করে না, সে কী বলে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে? জহুর অবশ্য বেশ সহজভাবেই উত্তর দিল, বলল, "কিছু করি না।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "কিছু করতে চান?"

জহুর এবারে একটু অবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "আমি?"

"জি। আপনি কি কোনো কাজ করতে চান?"

"কাজ? আমি?"

"হ্যাঁ।" মানুষটা মাথা নেড়ে মুখের মাঝে হাসি হাসি একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে।

জহুর কয়েক সেকেন্ড মানুষটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কী কাজ?"

মানুষটা একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনি যদি কাজ করতে চান তা হলে বলি কী কাজ। যদি না করতে চান তা হলে—"

জহুর খুব বেশি হাসে না, কিন্তু এবারে সে একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, "কাজটা কী সেটা যদি না জানি তা হলে করতে চাইব কি না কেমন করে বলি? যদি বলেন অস্ত্র চোরাচালানের কাজ—"

AMARBOI.COM

মধ্যবয়স্ক মানুষটা সবেগে মাথা নাড়ল, বলল, "না না না। কোনো বেআইনি কাজ না। খাঁটি কাজ। তবে—"

"তবে কী?"

"নয়টা পাঁচটা কাজ না। চব্বিশ ঘণ্টার কাজ।"

"চব্বিশ ঘণ্টার?"

"জি।"

"কোথায়?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা আবার তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "এটাই হচ্ছে সমস্যা।"

জহুর ভুরু কুঁচকে বলল, "সমস্যা?"

"জি।" মানুষটা মাথা নাড়ে। "এইটাই একটু সমস্যা।"

"কেন? সমস্যা কেন?"

"কাজটা অনেক দূরে। সমুদ্রের মাঝখানে।"

"সমুদ্রের মাঝখানে?"

মানুষটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল, "সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপের উপরে একটা হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। খুব হাইফাই হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের কাজ।"

"সমুদ্রের মাঝখানে হাইফাই হাসপাতাল?"

মানুষটি মাথা নাড়ল। জহুর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "সমুদ্রের মাঝখানে হাসপাতালের দরকার কী? সমুদ্রে কে থাকে?"

"সেটা অনেক লম্বা ইতিহাস।"

মানুষটি চুপ করে গেল, জহুর একটু অপেক্ষা করে কিন্তু মানুষটার মাঝে সেই লম্বা ইতিহাস বলার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। জহুর জিজ্ঞেস করল, "শুনি সেই লম্বা ইতিহাস।"

মানুষটি একটু ইতস্তত করে বলল, "আসলে সেটা নিয়ে আমরা বেশি কথা বলাবলি করি না। আমাদের কাদের স্যার হাসপাতালটা নিয়ে বেশি হইচই করতে না করেছেন।"

"কাদের স্যারটা কে?"

"কাদের স্যার এই হাসপাতাল তৈরি করেছেন। অনেক বড় ডাক্তার।"

জহুর মাথা নেড়ে বলল, "আমি পুরো ব্যাপারটা এখনো ভালো করে বুঝতে পারি নাই। কিন্তু আপনার যদি বলা নিষেধ থাকে, ব্যাপারটা গোপন হয় তা হলে থাক—"

মানুষটা ব্যস্ত হয়ে বলল, "না—না—না। এটা গোপন না, গোপন কেন হবে? কিন্তু আমাদের কাদের স্যার নিজের প্রচার চান না। সেই জন্যে এটা নিয়ে আমাদের বেশি কথাবার্তা বলতে না করেছেন। কিন্তু আপনাকে বলতে সমস্যা নাই—আপনি তো আর পত্রিকার লোক না।" কথা শেষ করে মানুষটা একটু হাসার চেষ্টা করল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল পত্রিকার লোকেরা খুব বিপজ্জনক মানুষ।

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি আসলে এখনো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝতে পারি নাই। একটা হাসপাতাল যদি সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপের মাঝে হয় তা হলে রোগীরা সেখানে যাবে কেমন করে? সাঁতার দিয়ে?"

জহুরের কথা শুনে মানুষটা হা হা করে হেসে উঠল, যেন এটা খুব মজার একটা কথা, হাসতে হাসতে বলল, "না না রোগীরা সাঁতরে সাঁতরে হাসপাতালে যায় না। রোগী আনার জন্যে হেলিকপ্টার আছে।"

"হেলিকপ্টার?" জহুর চোখ কপালে তুলে বলল, "হেলিকপ্টার?"

"জি।" মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "আপনাকে বলেছি এটা অনেক হাইফাই হাসপাতাল। এখানে হেলিকপ্টার আছে, স্পিডবোট আছে, বড় জাহাজ আছে, আলাদা পাওয়ার স্টেশন আছে আর হাসপাতাল তো আছেই।"

জহুর এবারে পুরো ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করতে পারে। হাসপাতাল বললেই চোখের সামনে যে রকম একটা বিবর্ণ দালানের ছবি ভেসে ওঠে, যার কোনায় কোনায় পানের পিকের দাগ থাকে, যার বারান্দায় রোগীরা শুয়ে থাকে এবং মাথার কাছে আত্মীয়স্বজন উদ্বিগ্ন মুখে পাখা দিয়ে বাতাস করে—এটা সে রকম হাসপাতাল না। এটা বড়লোকদের হাসপাতাল, তারা হেলিকপ্টারে করে এখানে আসে। এটা আসলে নিশ্চয়ই হাসপাতালের মতো না, এটা ফাইভস্টার হোটেলের মতো। এখানে যেটুকু না চিকিৎসা হয় তার থেকে অনেক বেশি আরাম আয়েশ করা হয়। সমুদ্রের মাঝে ছোট একটা দ্বীপে বড়লোকেরা বিশ্রাম নিতে আসে, সময় কাটাতে আসে। সে জন্যে এই হাসপাতালের কথা পত্রপত্রিকায় আসে না, সাধারণ মানুষ এর কথা জানে না। যাদের জানার কথা তারা ঠিকই জানে। পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে কেন জানি জহুরের একটু মন খারাপ হল, সে ছোট করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

মধ্যবয়স্ক মানুষটা জহুরের মন খারাপের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না, সে বেশ উৎসাহ নিয়ে বলতে থাকল, "বুঝলেন ভাই, নিজের চোখে না দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন না। হাসপাতালের মেঝে তৈরি হয়েছে ইতালির মার্বেল দিয়ে—দেখলে চোখ উল্টে যাবে।"

জহুর বলল, "অ।"

"থাকার জন্যে আলাদা কোয়ার্টার। ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস। ট্যাপ খুললেই গরম পানি। নিজেদের ডিশ। ইন্টারনেট, কম্পিউটার সব মিলিয়ে একেবারে যাকে বলে ফাটাফাটি অবস্থা।"

জহুর এবারে একটু ক্লান্তি অনুভব করে, ছোট একটা হাই তুলে বলল, "আমার চাকরিটা কী রকম হবে?"

"অনেক রকম চাকরি আছে। আপনার কী রকম লেখাপড়া, কী রকম অভিজ্ঞতা তার ওপর চাকরি। তার ওপর বেতন।"

"আমার লেখাপড়া নাই।" জহুর দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই।"

মাঝবয়সী মানুষটার এবার খানিকটা আশাভঙ্গ হল বলে মনে হল। সরু চোখে জিজ্ঞেস করল, "লেখাপড়া নাই?"

"নাহ্। গ্রামে মানুষ হয়েছি, চাষবাস করেছি। লেখাপড়ার দরকার হয় নাই, করিও নাই। পত্রিকাটা কোনোমতে পড়তে পারি। পত্রিকায় যেসব খবর থাকে এখন মনে হয় ওইটা না পড়তে পারলেই ভালো ছিল।"

"অ।" মানুষটা এবারে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বেশি লেখাপড়া না জানা মানুষেরও চাকরি আছে।"

জহুর একটু উৎসাহ দেখানোর ভান করে বলল, "আছে নাকি?"

"জি। আছে।"

"সেটা কী চাকরি?"

"এই মনে করেন কেয়ারটেকারের চাকরি।"

জহুর একটু হাসার ভঙ্গি করল, বলল, "তার মানে দারোয়ানের চাকরি?"

মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "সেটা আপনার ইচ্ছে হলে বলতে পারেন। চাকরি হচ্ছে চাকরি। দারোয়ানের চাকরিও চাকরি কেয়ারটেকারের চাকরিও চাকরি।"

জহুর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "নাহ্ ভাই। এই বয়সে আর দারোয়ানের চাকরি করার কোনো ইচ্ছা নাই।"

"তা হলে অন্য চাকরিও আছে—"

জহুর এবারে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্।"

"কেন না?"

জহুর মানুষটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আসলে ভাই আপনি যে রকম হাইফাই হাসপাতালের বর্ণনা দিলেন, আমার সেই রকম হাসপাতালে চাকরি করার কোনো ইচ্ছা নাই। আমি মনে করেন চাষা মানুষ, বড়লোক সে রকম দেখি নাই। দেখার ইচ্ছাও নাই। এই রকম বড়লোকদের চাকর-বাকরের কাজ করার ইচ্ছা করে না।"

মাঝবয়সী মানুষটা কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বুঝেছি। আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বুঝেছি। আপনি যে রকম করে ভাবেন আমিও সেই রকম করে ভাবি। তবে—"

"তবে কী?"

"আপনি চাকরি করতে না চাইলে নাই। তবে আমি বলি কী—আপনি হাসপাতালটা একটু দেখে আসেন।"

জহুর একটু অবাক হয়ে বলল, "দেখে আসব?"

"জি। এটা একটা দেখার মতো জায়গা। কাদের স্যার যদি পাবলিকদের এটা দেখার জন্যে টিকেট সিস্টেম করতেন তাহলে মানুষ টিকেট কিনে দেখে আসত।"

"আচ্ছা!"

"জি।" মানুষটা মাথা নাড়ে, বলে, "আপনার চাকরি করার কোনো দরকার নাই। শুধু একটা ইন্টারভিউ দিয়ে আসেন। এই হাসপাতালটা দেখার মাত্র দুইটা উপায়। এক হচ্ছে রোগী হয়ে যাওয়া। আর দুই হচ্ছে চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া।"

জহুর কিছুক্ষণ মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি চাকরি না চাইলেও ইন্টারভিউ দিব?"

"কেন দিবেন না?"

"কী রকম করে দিব? কেমন করে যাব?"

"আমি আপনার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। জেটি থেকে সপ্তাহে দুই দিন একটা ট্রলার হাসপাতালে যায়।"

জহুর মাথা নেড়ে বলল, "না ভাই! আমার ইচ্ছা নাই।"

"কেন ইচ্ছা নাই? যে জায়গাটা মানুষ পয়সা দিয়েও দেখতে পারে না, আপনি সেটা ফ্রি দেখে আসবেন। যাতায়াত থাকা খাওয়া ফ্রি—"

জহুর একটু হেসে ফেলল, বলল, "ভাই আমি গরিব মানুষ কথা সত্যি। কিন্তু তাই বলে একটা কিছু ফ্রি হলেই আমি হামলে পড়ি না!"

মানুষটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমি সেটা বলি নাই! আমি বলেছি জায়গাটা দেখে আসার জন্যে। এটা একটা দেখার মতো জায়গা।"

জহুর কিছুক্ষণ মানুষটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনি সত্যি কথাটা বলেন দেখি। কেন আপনি আমাকে এত পাঠাতে চাইছেন। এখানে অন্য কোনো ব্যাপার আছে।"

মানুষটা প্রতিবাদ করতে গিয়ে থেমে গিয়ে অপ্রস্তুতের মতো একটু হেসে ফেলল, হাসি থামিয়ে বলল, "আমি আসলে এই হাসপাতালের একজন রিক্রুটিং এজেন্ট। যদি হাসপাতাল আমার সাপ্লাই দেয়া কোনো মানুষকে চাকরি দেয় তাহলে আমি একটা কমিশন পাই।"

জহুর এবার বুঝে ফেলার ভঙ্গি করে মাথা নাড়ল, বলল, "এইবার বুঝতে পারলাম।"

মানুষটা বলল, "আপনাকে আমি কয়েক দিন থেকে লক্ষ করছি। চুপচাপ মানুষ, কোনোরকম হাঙ্গামা হুজ্জতের মাঝে নাই। সেইদিন দেখলাম ওই পকেটমারকে পাবলিকের হাত থেকে বাঁচালেন। আপনি না থাকলে বেকুবটাকে পাবলিক পিটিয়ে মেরে ফেলত। কী ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা করলেন, অসাধারণ! যখন পুলিশের সাথে কথা বললেন আপনার কোনো তাপ উত্তাপ নাই। আপনি রাগেন না—আপনি ভয়ও পান না। ঠাণ্ডা মানুষ।"

জহুরের সেদিনের ঘটনাটা মনে পড়ল, সমুদ্রের তীরে পকেট মারতে গিয়ে কমবয়সী একটা ছেলে ধরা পড়ল। ভদ্রঘরের মানুষজন তখন তাকে কী মারটাই না মারল, সে গিয়ে না থামালে মেরেই ফেলত। লাশটা ফেলে রেখে সবাই সরে পড়ত। যেন মানুষের লাশ না, কুকুর বেড়ালের লাশ।

মানুষটা বলল, "হাসপাতালটা আসলে আপনাদের মতো ঠাণ্ডা মানুষ খোঁজে। আমার মনে হচ্ছিল আপনি ইন্টারভিউ দিলেই চাকরি পেয়ে যাবেন।"

"আর আমি চাকরি পেলেই আপনি কমিশন পাবেন?"

"অনেকটা সেই রকম।"

AMARBOI.COM

জহুর এবার উঠে দাঁড়াল, বলল, "ভাই আপনার এইবারের কমিশনটা গেল। চোখকান খোলা রাখেন আর কাউকে পেয়ে যাবেন। দেশে আজকাল চাকরির খুব অভাব—"

জহুরের সাথে সাথে মাঝবয়সী মানুষটাও উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে নীল রঙের একটা কার্ড বের করে জহুরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নেন ভাই। এইটা রাখেন।"

"এইটা কী?"

"ইন্টারভিউ কার্ড। আপনি যদি মত পাল্টান তাহলে পরশু দিন জেটিতে আসেন। বড় ট্রলার, নাম হচ্ছে এম.ভি. শামস। কার্ড দেখালেই আপনাকে তুলে নেবে।'

জহুর কার্ডটা হাতে নিয়ে বলল, "আর যদি না আসি?"

"তাহলে কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলে দিবেন—অন্য কাউকে দিবেন না।"

"ঠিক আছে।" জহুর লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে, তখন পেছন থেকে মাঝবয়সী মানুষটা বলল, "আরেকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি।"

"কী জিনিস?"

"আপনি যদি ইন্টারভিউ দিতে আসেন তাহলে কাদের স্যারের সাথে দেখা হবে। পৃথিবীতে এই রকম দুইটা মানুষ নাই।"

"কেন?"

"সেইটা বলে বোঝানো যাবে না—আপনার নিজের চোখে দেখতে হবে। স্যার নিজে সবার ইন্টারভিউ নেন। মালী থেকে শুরু করে সার্জন—সবার।"

"অ।"

"কাদের স্যার চোখের দিকে তাকিয়ে ভেতরের সবকিছু বুঝে ফেলেন।"

"তাই নাকি?"

"জি।" মানুষটা মাথা নাড়ল, "চোখ দুইটা ধারালো ছোরার মতো। কেটে ভেতরে ঢুকে যায়।"

জহুর কোনো কথা না বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে থাকে। সন্ধের বাতাসে সমুদ্রের তীরের ঝাউগাছগুলো হাহাকারের মতো এক ধরনের শব্দ করছে, সেই শব্দ শুনলেই কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়।

দুই দিন পর জহুর আবিষ্কার করল সে জেটিতে এসে এম.ভি. শামস খুঁজে বের করে তার নীল রঙের ইন্টারভিউ কার্ড দেখিয়ে সেখানে চেপে বসেছে। কেন বসেছে নিজেও জানে না।

২

ট্রলারে বসে থাকা মানুষগুলো কেউই খুব বেশি কথা বলে না—তাতে অবিশ্যি জহুরের খুব সমস্যা হল না, বরং একটু সুবিধেই হল, কারণ সে নিজেও খুব বেশি কথা বলে না। ট্রলারের ইঞ্জিনের বিকট শব্দ—কথা বলতে হলেও সেটা বলতে হয় চেঁচিয়ে, কানের কাছে মুখ লাগিয়ে। যেখানে রোগী আনা হয় হেলিকপ্টারে সেই হাসপাতালে ইন্টারভিউ নেয়ার মানুষগুলোর জন্যে কেন আরেকটু ভালো ট্রলারের ব্যবস্থা করা যায় না, সেটা জহুর বুঝতে পারল না।

ট্রলারের ছাদে বসে জহুর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে। জহুরের মনে হয় সমুদ্রের একটা নিজস্ব মেজাজ আছে আর সেই মেজাজের ওপর নির্ভর করে তার একটা নিজস্ব রূপ তৈরি হয়। যখন মেজাজ খারাপ থাকে তখন পানির রঙ হয় কালো, ঢেউগুলো ফুঁসে ওঠে। এই মুহূর্তে সমুদ্রের মনে হয় ফুরফুরে হালকা মেজাজ তাই সমুদ্রের পানির মাঝে স্বচ্ছ হালকা একটা নীল রঙ, ছোট ছোট ঢেউ, তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। জহুর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক দূরে হালকা ধূসর বর্ণের একটা দ্বীপ দেখতে পেল। তারা এখন এই দ্বীপটাতেই যাচ্ছে।

খুব ধীরে ধীরে দ্বীপটা স্পষ্ট হতে থাকে, জহুরের ধারণা ছিল সে মাথা উঁচু করে থাকা বড় বড় দালান দেখতে পাবে কিন্তু সে রকম কিছু দেখল না। যতই কাছাকাছি আসতে থাকে দ্বীপটাকে ততই গাছগাছালি ঢাকা অত্যন্ত সাধারণ একটা দ্বীপ বলে মনে হতে থাকে। খুব কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ একটা ছোট হেলিকপ্টারকে উঠে যেতে দেখা গেল—এটি না দেখলে এখানে যে কোনো বৈশিষ্ট্য আছে সেটা বোঝার কোনো উপায়ই থাকত না।

ট্রলারটা জেটিতে থেমে যাওয়ার পর জহুর অন্য মানুষগুলোর সাথে ট্রলার থেকে নেমে আসে। জেটিতে খাকি পোশাক পরা একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, সে সবাইকে কাছাকাছি একটা ছোট ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের সবাইকে একজন একজন করে একটা নীল পর্দার সামনে দাঁড়া করিয়ে একটা ছবি তুলে তাদের নাম পরিচয় লিখে আইডি কার্ড তৈরি করে দিল। একজন মহিলা জহুরের হাতে কার্ডটি তুলে দিয়ে বলল, "যতক্ষণ এখানে থাকবেন এটা গলায় ঝুলিয়ে রাখবেন।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

"মনে রাখবেন এটা খুব জরুরি। এক সেকেন্ডের জন্যেও খুলবেন না। খুললে কিন্তু ঝামেলা হতে পারে।"

"ঝামেলা?"

"হ্যাঁ। এখানে সিকিউরিটি খুব টাইট।"

একটা হাসপাতালে সিকিউরিটি কেন টাইট হতে হবে জহুর সেটা খুব ভালো বুঝতে পারল না, কিন্তু সে এটা নিয়ে কোনো প্রশ্নও করল না। সে কম কথার মানুষ।

"আপনি চলে যাওয়ার সময় আইডি কার্ডটা এখানে জমা দিয়ে যাবেন।"

জহুর মাথা নাড়ল, "যাব।"

"এই দ্বীপে খাবার জায়গা আছে—আইডি কার্ডটা দেখিয়ে যখন যা খেতে চান খেতে পারবেন।"

"ঠিক আছে।"

"পিছন দিকে একটা ডরমেটরি আছে, যদি রাতে থাকতে হয় সেখানে থাকতে পারবেন।"

"ঠিক আছে।"

"আপনার যখন ইন্টারভিউ নেয়ার সময় হবে আপনাকে ডেকে আনা হবে।"

জহুর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কোথা থেকে ডেকে আনা হবে?"

"আপনি যেখানেই থাকেন সেখান থেকে ডেকে আনবে। সেটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।"

সে যেখানেই থাকবে তাকে সেখান থেকেই কীভাবে ডেকে আনবে সেটা জহুর ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু সে সেটা নিয়ে কোনো কথা বলল না, আইডি কার্ডটা গলায় ঝুলিয়ে বের হয়ে এল।

WWW.AMARBOI.COM

দ্বীপের কিনারা দিয়ে একটা খোয়া বিছানো রাস্তা চলে গেছে—জহুর সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করে। একটু পরপর বসার জন্যে পাথরের বেঞ্চ বসানো আছে, এই পাথরগুলো না জানি কোথা থেকে এনেছে। দ্বীপটা শুরুতে কেমন ছিল অনুমান করা কঠিন, এখন গাছগাছালিতে ঢাকা। খোয়া বিছানো রাস্তার দুই পাশে বড় বড় নারকেল গাছে সমুদ্রের বাতাসে তার পাতাগুলো শিরশির শব্দ করে কাঁপছে।

জহুর সরু রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরো এলাকাটা সম্পর্কে একটা ধারণা করার চেষ্টা করে। দ্বীপের মাঝামাঝি যে বড় দালানটি রয়েছে সেটা সম্ভবত মূল হাসপাতাল, দালানটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে শুধু সামনের একটা বড় গেট দিয়ে সেখানে ঢোকা যায়। তাই এটাকে দেখে ঠিক হাসপাতাল মনে হয় না, মনে হয় একটা জেলখানা।

দ্বীপের খোয়া বাঁধানো রাস্তাটি ধরে হেঁটে হেঁটে জহুর দ্বীপের শেষ প্রান্তে চলে আসে। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে জহুর লক্ষ করল, হঠাৎ করে খোয়া বাঁধানো রাস্তা শেষ হয়ে সেখানে খানিকটা পথ কংক্রিটের, সেটা শেষ হয়ে আবার খোয়া বাঁধানো পথ শুরু হয়েছে। জহুর দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করে—হঠাৎ করে খানিকটা জায়গা কংক্রিটের কেন? সে ডানে-বামে তাকাল, তার মনে হল কংক্রিটে বাঁধানো অংশটুকু আসলে একটা সুড়ঙ্গের উপরের অংশটুকু। সুড়ঙ্গের অন্য পাশে মাটি ফেলে ঘাস লাগানো হয়েছে, এখানে লাগাতে পারে নি। দ্বীপের মাঝখানে যে হাসপাতালটি আছে সেখানে গাছগাছালি ঢাকা জায়গায় দুটো স্পিডবোট, ভালো করে না তাকালে সেটা দেখা যায় না। ব্যাপারটা হঠাৎ করে জহুরের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়—হাসপাতালের ভেতর থেকে হঠাৎ পালিয়ে যাওয়ার এটা একটা গোপন রাস্তা। জহুরের কাছে ব্যাপারটা খানিকটা দুর্বোধ্য ঠেকে—হাসপাতাল থেকে কেউ কেন কখনো গোপন পথে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে?

জহুরের একবার ইচ্ছে করল নিচে নেমে গিয়ে গোপন পথের দরজাটি দেখে আসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা করল না। এটা আসলেই যদি গোপন সুড়ঙ্গ হয়ে থাকে আর সে যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এটা দেখার চেষ্টা করে তা হলে অনেকেই তার ওপর সন্দিহান হয়ে উঠবে। একদিনের জন্যে বেড়াতে এসে মানুষজনকে বিরক্ত করার তার কোনো ইচ্ছে নেই। হয়তো এই মুহূর্তেই তাকে কেউ কেউ তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে। কাজেই জহুর ভান করল সে কিছুই দেখে নি। অন্যমনস্কভাবে এদিক-সেদিক তাকিয়ে সে ইতস্তত ভাব করে আবার হেঁটে সামনে এগিয়ে যায়।

দ্বীপটা নিশ্চয়ই বেশ ছোট। কারণ বেশ অল্প সময়ের মাঝেই সে পুরোটা ঘুরে এল। দ্বীপটা সাজানো-গোছানো এবং সুন্দর, মানুষজন বলতে গেলে নেই, পুরো দ্বীপটাই বেশ নির্জন। মূল দালানের বাইরে কয়েকটা ছোট ছোট দালান রয়েছে, এর মাঝে কোনো একটা সম্ভবত ডরমেটরি। জহুর যদি সত্যি সত্যি এখানে চাকরি নেয় তা হলে তার এ রকম কোনো একটা ডরমেটরিতে তার দিন কাটাতে হবে।

জহুর যখন হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে তার মার্বেল পাথরের মেঝে, হেলিকপ্টারের হেলিপ্যাড এসব দেখবে কি না চিন্তা করছিল তখন খাকি পোশাক পরা একজন মানুষ লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে এল। মানুষটা কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন?"

জহুর মাথা নাড়ল। খাকি পোশাক পরা মানুষটা বলল, "আপনার নাম জহুর হোসেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমার সাথে আসেন—" বলে মানুষটা ঘুরে জহুরের জন্যে অপেক্ষা না করেই হাঁটতে শুরু করে।

জহুর কোনো কথা না বলে মানুষটার পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে। খাকি পোশাক পরা মানুষটা হাসপাতালের দিকে এগিয়ে যায়, সামনে একটা বড় গেট, গেটটা বন্ধ। খাকি পোশাক পরা মানুষটা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তার গলায় ঝোলানো কার্ডটা গেটের নির্দিষ্ট একটা ফোকরে ঢুকিয়ে দিতেই গেটটা ঘরঘর শব্দ করে খুলে গেল।

খাকি পোশাক পরা মানুষটার সাথে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই গেটটা আবার ঘরঘর শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। খাকি পোশাক পরা মানুষটা জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের তিনতলায় যেতে হবে।"

"তিনতলায়?"

"হ্যাঁ। স্যার তিনতলায় বসেন।"

"কোন স্যার?"

"কাদের স্যার।"

জহুর বলল, "অ"।

খাকি পোশাক পরা মানুষটা ভেবেছিল কাদের স্যার কে সেটা নিয়ে জহুর কোনো একটা প্রশ্ন করবে, জহুর কোনো প্রশ্ন করল না তাই সে নিজে থেকেই বলল, "কাদের স্যার আমাদের এমডি।"

জহুর বলল, "অ।"

"কাদের স্যার নিজে সবার ইন্টারভিউ নেন।"

জহুর আবার বলল, "অ।"

"কাদের স্যারের মতন দ্বিতীয় মানুষ কেউ কখনো দেখে নাই।"

জহুর ভাবল একবার জিজ্ঞেস করে কেন কাদের স্যারের মতো দ্বিতীয় মানুষ কেউ কখনো দেখে নাই, কিন্তু কী ভেবে শেষ পর্যন্ত কিছু জিজ্ঞেস করল না, বলল, "অ।"

জহুরের জবাব দেবার ধরন দেখে খাকি পোশাক পরা মানুষটা এর মাঝে তার সাথে কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে মুখ শক্ত করে এগিয়ে যায়, জহুরও কোনো কথা না বলে তার পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে।

একটা লিফটে করে তিনতলায় উঠে যাওয়ার পর জহুর প্রথমবার হাসপাতালের ভেতরটা ভালো করে দেখার সুযোগ পেল। একটা বিশাল করিডোরের দুই পাশে ছোট ছোট অনেকগুলো কেবিন। হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ করে একটা কেবিনের জানালায় তার দৃষ্টি আটকে যায়, আঠার-উনিশ বছরের একটা মেয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, মেয়েটির মুখ পাথরের মতো ভাবলেশহীন, দেখে কেন জানি বুকের ভেতরটুকু কেঁপে ওঠে। জহুর সেখানে দাঁড়িয়ে গেল, মেয়েটি সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়েছে। দেখে মনে হয় বুঝি কিছু একটা বলবে। জহুর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কিছু বলবে?"

মেয়েটি মাথা নাড়ল। জহুর বলল, "বল।"

মেয়েটি কোনো কথা না বলে জহুরের দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। খাকি পোশাক পরা মানুষটা তখন জহুরের পিঠে হাত দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করে বলল, "দাঁড়াবেন না। চলেন।"

জহুর এই প্রথমবার নিজে থেকে কথা বলল। খাকি পোশাক পরা মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই মেয়েটার কী হয়েছে?"

মানুষটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "মানসিক রোগ।"

জহুর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "মানসিক রোগ?"

"হ্যাঁ।"

"এইটা কি মানসিক রোগের হাসপাতাল?"

"এইটা সব রোগের হাসপাতাল।"

সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপের মাঝখানে কেমন করে সব রোগের হাসপাতাল তৈরি করে রাখা হয়েছে জহুরের সেটা জানার ইচ্ছে করছিল কিন্তু খাকি পোশাক পরা এই মানুষটাকে জিজ্ঞেস করে সেটা জানা যাবে বলে তার মনে হল না, তাই সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। হেঁটে যেতে যেতে সে আবার ঘুরে তাকাল, জানালার কাছে তখনো ভাবলেশহীন চোখে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হেঁটে যেতে যেতে কেবিনের নম্বরটি জহুরের চোখে পড়ল তিনশ তেত্রিশ। তিন তিন তিন।

খাকি পোশাক পরা মানুষটি করিডোরের শেষ মাথায় একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইন্টারকম সুইচে চাপ দিয়ে বলল, "স্যার।"

জহুর ইন্টারকমে একটা ভারী গলা শুনতে পেল, "বল।"

"জহুর হোসেন ইন্টারভিউ দিতে এসেছে।"

"ভেতরে পাঠিয়ে দাও।"

খাকি পোশাক পরা মানুষটি জহুরকে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করল। জহুর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে একটু হকচকিয়ে যায়। সে মনে মনে খুব হাল ফ্যাশনের একটা অফিস দেখবে বলে ভেবেছিল, কিন্তু এটা মোটেও সে রকম নয়। ঘরের ভেতর চারপাশে অসংখ্য যন্ত্রপাতি, তার মাঝখানে কাঁচাপাকা চুলের একজন মানুষ একটা মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগিয়ে কী একটা দেখছিল, মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, "এক সেকেন্ড দাঁড়ান।"

কাঁচাপাকা চুলের মানুষটি নিশ্চয়ই ডক্টর কাদের, সে এক সেকেন্ড দাঁড়ানোর কথা বললেও বেশ কিছুক্ষণ মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলল না। জহুর অবাক হল না। ক্ষমতাশালী মানুষেরা সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের ক্ষমতা বোঝানোর জন্যে এটা করে, তাদেরকে অকারণে দাঁড় করিয়ে রাখে। জহুর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে থাকে। বেশির ভাগ যন্ত্রপাতিই সে চেনে না, শুধু ঘরের দেয়ালে লাগানো টেলিভিশন স্ক্রিনগুলো সে চিনতে পারল। এক একটা স্ক্রিনে দ্বীপের এক একটা সমুদ্রতীর দেখা যাচ্ছে। সে যখন দ্বীপটাকে ঘিরে ঘুরছিল তখন তাকে নিশ্চয়ই এই স্ক্রিনগুলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ভালোই হয়েছে সুড়ঙ্গটা নিয়ে সে বেশি কৌতূহল দেখায় নি।

AMARBOI.COM

ডক্টর কাদের একসময় মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলে জহুরের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বলল, "বসেন।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "বসতে হবে না।"

জহুরের কথা শুনে ড. কাদেরের মুখে কোনো ভাবান্তর হল না, সে শান্ত মুখে বলল, "আমার এখানে ইন্টারভিউ দিতে হলে সামনে বসতে হবে। বসে হাত দুটো টেবিলে রাখতে হবে।"

জহুরের ইচ্ছে হল সে জিজ্ঞেস করে কেন তার চেয়ারে বসে টেবিলে হাত রাখতে হবে কিন্তু সে জিজ্ঞেস না করে চেয়ারে বসে টেবিলে হাত রাখল। ডক্টর কাদের এসে টেবিলের অপর পাশে রাখা তার নরম আরামদায়ক চেয়ারটিতে বসে কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখল। কি-বোর্ডে কিছু একটা লিখে ডক্টর কাদের জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যতক্ষণ আপনার সাথে কথা বলব আপনি ততক্ষণ হাতটা টেবিলে চাপ দিয়ে রাখবেন।"

কী কারণে হাত চাপ দিয়ে রাখতে হবে জহুরের সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছিল কিন্তু সে সেটাও জানতে চাইল না, টেবিলে হাতটা একটু জোরে চেপে ধরল। ডক্টর কাদের বলল, "চমৎকার। এবার আমি প্রশ্ন করব আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর দেবেন।"

জহুর বলল, "ঠিক আছে।"

ডক্টর কাদের মাথাটা একটু এগিয়ে এনে বলল, "শুধু একটা ব্যাপার।"

"কী ব্যাপার?"

"আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করব আপনি তার ভুল উত্তর দেবেন।"

জহুর ভুরু কুঁচকে বলল, "ভুল উত্তর?"

"হ্যাঁ। আপনি কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবেন না।"

"সঠিক উত্তর দিতে পারব না?"

"না। প্রত্যেকটা উত্তর হতে হবে মিথ্যা—"

"মিথ্যা?"

ড. কাদের মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। মিথ্যা।"

কেন প্রশ্নের উত্তর মিথ্যা দিতে হবে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে জহুর থেমে গেল। তার কেন জানি মনে হল এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তরটা সে ডক্টর কাদেরের কাছ থেকে পাবে না।

ডক্টর কাদের জিজ্ঞেস করল, "আমরা তা হলে শুরু করি?"

"করেন।"

"আপনার নাম কী?"

জহুর বলল, "আমার নাম ডক্টর কাদের।"

জহুরের উত্তর শুনে ডক্টর কাদেরের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, সে হাসিমুখে কম্পিউটারের দিকে তাকাল এবং হঠাৎ করে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে ভুরু কুঁচকে জহুরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন আপনার নাম?"

"আমি বলেছি আমার নাম ডক্টর কাদের।"

ডক্টর কাদের আবার কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকাল এবং তার মুখ কেমন জানি গম্ভীর হয়ে ওঠে। সে জিব দিয়ে নিচের ঠোঁট ভিজিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি কখনো মানুষ খুন করেছেন?"

"করেছি।"

ডক্টর কাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার জহুরের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, "কয়টা?"

"একটা।"

"কীভাবে?"

"একটা গামছা দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরেছিলাম।"

"কেন খুন করেছেন?"

"পূর্ণিমার রাতে যখন অনেক বড় চাঁদ ওঠে তখন আমার মানুষ খুন করার ইচ্ছে করে।"

ডক্টর কাদের কিছুক্ষণ তার কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকে, জহুর বুঝতে পারে কোনো একটা বিষয় ডক্টর কাদেরকে খুব বিভ্রান্ত করে দিয়েছে কিন্তু সেটা কী জহুর ঠিক বুঝতে পারল না।

ডক্টর কাদের এবারে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "আপনি কি আকাশে উড়তে পারেন?"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "পারি।"

AMARBOI.COM

"কীভাবে ওড়েন?"

"পাখা দিয়ে।"

"আপনার কি পাখা আছে?"

"আছে। আমার দুটি বিশাল পাখা আছে। ভাঁজ করে পিঠে লুকিয়ে রাখি—কেউ দেখতে পায় না।"

"আপনি কখন আকাশে ওড়েন?"

"সন্ধেবেলা সূর্য ডুবে গেলে আমি আকাশে উড়ি। প্রতিদিন।"

ডক্টর কাদের কিছুক্ষণ কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে থেকে জহুরের দিকে তাকাল, বলল, "আমার ইন্টারভিউ শেষ।"

জহুর টেবিল থেকে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে বলল, "আমি কি এখন যেতে পারি?"

"একটু দাঁড়ান।"

জহুর চেয়ার থেকে উঠে একটু সরে দাঁড়াল। ডক্টর কাদের বলল, "আমি আপনাকে আমার এখানে চাকরি দিতে চাই।"

জহুর কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। ডক্টর কাদের বলল, "আপনি কি এখানে চাকরি করবেন?"

জহুর একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি কেন আমাকে চাকরি দিতে চাইছেন?"

"কারণ আপনার নার্ভ ইস্পাতের মতো শক্ত।"

"আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমি জানি। আপনি শান্ত গলায় শরীরের একটি লোমকূপেও একটু আলোড়ন না করে ভয়ঙ্কর বিচিত্র কথা বলে ফেলতে পারেন। আমি আগে এ রকম কখনো কাউকে দেখি নি।"

"তার মানে কী?"

তার মানে আপনি কখনো উত্তেজিত হন না—আপনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মানুষ। ঠাণ্ডা মাথায় শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমার আপনার মতো একজন মানুষের দরকার।"

জহুর বলল, "অ।"

"আপনি কি আমার এখানে চাকরি করবেন?"

জহুর মাথা তুলে ডক্টর কাদেরের চোখের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "তার আগে আমার জানা দরকার আপনি কী করেন?"

ডক্টর কাদের থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি কী করি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন?"

জহুর শান্ত গলায় বলল, "এই দ্বীপের মাঝে আপনি যে হাসপাতালটা বানিয়েছেন, এটা আসলে হাসপাতাল না। এটা অন্য কিছু। আমি জানতে চাইছি এটা কী?"

ডক্টর কাদের কয়েক মুহূর্ত জহুরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এটা হাসপাতাল।"

জহুর খুব বেশি হাসে না, তার মুখের মাংসপেশি হাসতে অভ্যস্ত নয় তাই সে যখন হাসে তাকে কেমন যেন বিচিত্র দেখায়। জহুর তার সেই বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমার কাছে কোনো যন্ত্র নাই, কিন্তু যখন কেউ মিথ্যা কথা বলে আমি সেটা বুঝতে পারি।"

ডক্টর কাদের কোনো কথা বলল না, জহুর নিচু গলায় বলল, "কোথাও কাজ করার আগে আমার জানা দরকার সেখানে কী হয়। আমি জানি এটা আসলে হাসপাতাল না। এটা অন্য কিছু। এখানে কাজ করার আগে আমাকে জানতে হবে এটা কী।"

ডক্টর কাদের কিছুক্ষণ জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কেমন করে জানেন এটা অন্য কিছু?"

"আমি জানি। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"তা ছাড়া তিনশ তেত্রিশ নম্বর কেবিনে যে মেয়েটি আছে—"

ডক্টর কাদের হাত তুলে জহুরকে থামাল। "ঠিক আছে। আপনি এখানে আরো একদিন থাকেন। কাল ভোরে আমি আপনার সাথে কথা বলব। আমি আপনাকে বলব এটা কী।"

এই জায়গাটা কী জানার জন্যে জহুরকে অবিশ্যি পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না—সেদিন রাতেই সে সেটা জানতে পারল।

৩

গভীর রাতে জহুরের ঘুম ভাঙল মেশিনগানের গুলির শব্দে। শুধু মেশিনগানের গুলির শব্দ নয়, তার সাথে অনেকগুলো হেলিকপ্টারের শব্দ। সে অনেক মানুষের গলার আওয়াজ এবং মানুষের ছোটাছুটির শব্দও শুনতে পেল। জহুর কখনো কোনো যুদ্ধ দেখে নি কিন্তু তার মনে হল এই দ্বীপটা হঠাৎ একটা যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গেছে এবং এটাকে সৈন্যরা আক্রমণ করেছে।

জহুর ডরমেটরির যে ঘরটিতে ঘুমুচ্ছিল সেখানে তার বিছানা ছাড়াও আরো তিনটি বিছানা ছিল। সেই বিছানাগুলোতে তার মতোই আরো কয়েকজন মানুষ ঘুমিয়েছিল এবং হেলিকপ্টার আর মেশিনগানের শব্দ শুনে তারাও লাফিয়ে উঠে বসে এবং আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়। তাদের ছোটাছুটি দেখে জহুরের কেমন যেন হাসি পেয়ে যায়, সে নিচু গলায় তাদেরকে বলল, "আপনারা শুধু শুধু ছুটোছুটি করবেন না—মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকেন।"

একজন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "যদি কিছু হয়?"

"হবে না। এখানে ডাকাত পড়ে নি, পুলিশ মিলিটারি এসেছে।"

মানুষগুলো মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, "আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমি জানি। এই দেশের কোনো ডাকাত দলের হেলিকপ্টার নাই।"

জহুর তার শার্ট-প্যান্ট পরল, জুতো পরল। একজন সেটা দেখে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কী করেন?"

"বাইরে যাই। দেখে আসি কী হচ্ছে।"

"সর্বনাশ! যদি কিছু হয়?"

"কিছু হবে না। আমি চোরও না, ডাকাতও না। আমার কিছু হবে কেন?"

জহুর ডরমেটরির দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এল। দ্বীপের মাঝামাঝি হাসপাতালের গেটের সামনে বেশ কিছু মানুষের ভিড়, অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, তবে মনে হয় অস্ত্র হাতে অনেক পুলিশ আর মিলিটারি। তারা কোনো খবর পেয়ে এখানে এসেছে। ঠিক কেন এসেছে, কাকে ধরতে এসেছে জহুর কিছুই জানে না কিন্তু সে অনুমান করতে পারল

নিশ্চিতভাবেই তারা প্রথমেই ডক্টর কাদেরকে ধরবে। জহুর হঠাৎ করে বুঝতে পারল ডক্টর কাদের সম্ভবত তার গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে এখন হাসপাতালের ভেতর থেকে সরাসরি দ্বীপের কিনারায় এসে স্পিডবোটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।

জহুরের মনে হল পুলিশ মিলিটারির দলটাকে সেটা জানানো উচিত। কিন্তু তার মতো চেহারার এত সাধারণ একজন মানুষের কথাকে পুলিশ মিলিটারি কোনোভাবেই গুরুত্ব দেবে না, উল্টো সে নিজে অন্য ঝামেলায় পড়ে যেতে পারে। তার থেকে বুদ্ধিমানের কাজ হবে সোজাসুজি সেই গোপন সুড়ঙ্গের আশপাশে থেকে ডক্টর কাদেরকে ধরে ফেলা। জহুর তাই আর দেরি করল না, আবছা অন্ধকারে খোয়া ঢাকা পথে পা চালিয়ে সমুদ্রের তীরের দিকে ছুটে চলল।

অন্ধকারে জায়গাটা চিনতে একটু সমস্যা হচ্ছিল কিন্তু মোটামুটি অনুমান করে জহুর শেষ পর্যন্ত ঠিক জায়গায় এসে উপস্থিত হল। স্পিডবোটের কাছাকাছি একটা গাছের আড়ালে সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতে কোনো ধরনের একটা অস্ত্র থাকলে ভালো হত কিন্তু সে রকম কিছু না পেয়ে জহুর একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নেয়। তার ধারণা সত্যি হলে কোনো একটা গোপন দরজা খুলে ডক্টর কাদের বের হয়ে এখন এদিকে এগিয়ে আসবে।

জহুর দ্বীপের মাঝখানে হাসপাতালের ভেতর অনেক মানুষের কথাবার্তা শুনতে পায়। পুলিশের হুইসেল, বুটের শব্দ এবং হঠাৎ হঠাৎ গুলির আওয়াজ। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে জহুর যখন আশা প্রায় ছেড়ে দিচ্ছিল তখন হঠাৎ করে বালুতে ঢেকে থাকা একটা দরজা সরিয়ে সেখান দিয়ে একটা ছায়ামূর্তি বের হয়ে আসে। অন্ধকারে ভালো দেখা না গেলেও মানুষটি যে ডক্টর কাদের সেটা বুঝতে জহুরের একটুও দেরি হল না। সে গাছের নিচে ঘাপটি মেরে বসে থেকে বোঝার চেষ্টা করে কী ঘটছে।

ডক্টর কাদের কয়েকটা ব্যাগ আর কাগজপত্রের প্যাকেট নিয়ে মাথা নিচু করে স্পিডবোটের কাছে এগিয়ে আসে। সেগুলো স্পিডবোটে তুলে যখন সে দ্বিতীয়বার কিছু জিনিস আনতে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন জহুর পেছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জহুরের ধাক্কায় ডক্টর কাদের মুখ থুবড়ে বালুর ওপর পড়ে যায়, জহুর এতটুকু দেরি না করে তার পিঠে চেপে বসে একটা হাত পেছনে টেনে আনে। ডক্টর কাদের যখন যন্ত্রণার একটা শব্দ করল তখন জহুর থেমে গিয়ে বলল, "আমার ধারণা আপনি এখন আর নড়াচড়া করবেন না। করে লাভ নেই।"

ডক্টর কাদের গোঙানোর মতো একটা শব্দ করল। জহুর ডক্টর কাদেরের কোমরে হাত দিয়ে উৎফুল্ল গলায় বলল, "চমৎকার। বেল্ট পরে এসেছেন। আপনার হাত বাঁধার জন্যে কিছু একটা খুঁজছিলাম।"

ডক্টর কাদের একটু ছটফট করার চেষ্টা করল, কিন্তু জহুর তাকে কোনো সুযোগ দিল না, শক্ত করে বালুর মাঝে চেপে রাখল। কোমর থেকে বেল্টটা খুলে সে তার হাত দুটো পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলে সন্তুষ্টির গলায় বলল, "হাতগুলো ব্যবহার করতে না পারলে দৌড়াদৌড়ি করা যায় না। আমার ধারণা এখন আপনি আর পালানোর চেষ্টা করবেন না।"

ডক্টর কাদের বালু থেকে মুখ সরিয়ে বলল, "আপনি কে?"

জহুর বলল, "আপনি আজ দুপুরে আমার ইন্টারভিউ নিলেন—চাকরি দিতে চাইলেন—"

"আমি জানি। আসলে আপনি কে?"

"আমি আসলে কেউ না। খুবই সাধারণ একজন মানুষ।"

ডক্টর কাদের মুখ থেকে বালু বের করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দেন, চলে যেতে দেন তা হলে যত টাকা চান তত টাকা দেব। আপনার সাথে আমি একটা ডিল করতে চাই—"

জহুর তার পকেট থেকে ময়লা একটা রুমাল বের করে ডক্টর কাদেরের চোখ দুটো বেঁধে ফেলে বলল, "এখন চোখ দুটোও বেঁধে ফেলেছি—হঠাৎ করে দৌড় দেয়ার ইচ্ছা থাকলেও সেটা করতে পারবেন না। রুমালটা একটু ময়লা সে জন্যে কিছু মনে করবেন না—"

ডক্টর কাদের কাতর গলায় বলল, "আমার কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ, কেউ আমাকে শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারবে না—শুধু শুধু একটু ঝামেলা হবে। আপনি যদি আমাকে একটু সহযোগিতা করেন আপনারও লাভ, আমারও লাভ। আমি পেমেন্ট করব ডলারে। ক্যাশ। এক্ষুনি।"

জহুর ডক্টর কাদেরকে টেনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়া করিয়ে বলল, "আমি চাষাভুষো মানুষ। টাকাপয়সা সে রকম নাই। কোনোদিন নিজের চোখে ডলারও দেখি নাই। সব সময় জানার ইচ্ছে ছিল একজন হারামির বাচ্চা আরেকজন হারামির বাচ্চাকে ঘুষ দেয়ার সময় কীভাবে সেটা দেয়। কীভাবে কথা বলে। আপনার কথা থেকে সেটা এখন বুঝতে পারলাম—কথাবার্তা হয় সোজাসুজি—"

ডক্টর কাদের বলল, "আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না।"

জহুর পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে বলল, "সেটা সত্যি কথা। মনে হয় বুঝতে পারছি না। আপনি বোঝান—দেখি বুঝি কি না। তবে হাঁটতে হাঁটতে বোঝান। যারা আপনাকে ধরতে এসেছে আপনাকে তাদের হাতে না দেয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। বলেন কী বলবেন—"

ডক্টর কাদের কোনো কথা বলল না, হঠাৎ করে সে বুঝতে পেরেছে তার কথা বলার কিছু নেই। তার চোখ রুমাল দিয়ে বাঁধা তাই সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না—দেখতে পেলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হত না, তার ভবিষ্যৎটুকু এ রকম অন্ধকারই দেখা যেত।

AMARBOI.COM

ডক্টর কাদেরের অফিসে ডক্টর কাদেরের আরামদায়ক নরম চেয়ারেই ডক্টর কাদেরকে বসানো হয়েছে—শুধু একটা পার্থক্য, তার দুই হাতে এখন হ্যান্ডকাফ লাগানো। চোখ থেকে রুমালের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে, তার ঝকমকে চোখগুলো এখন নিষ্প্রভ। চোখের নিচে কালি, মাথার চুল এলোমেলো, চেহারায় একটা মলিন বিধ্বস্ত ভাব।

তার সামনে একটা চেয়ারে একজন তরুণ মিলিটারি অফিসার বসে আছে। সে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমি শুধু ডক্টর ম্যাঙ্গেলার নাম শুনেছিলাম, এখন নিজের চোখে ডক্টর কাদেরকে দেখতে পেলাম।" কথা বলার সময় সে "ডক্টর" শব্দটাতে অনাবশ্যক এক ধরনের জোর দিল।

জহুর ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়েছিল, ডক্টর কাদেরকে ধরে এনে দেয়ার জন্যে তাকে পুলিশ মিলিটারি অনেকটা নিজেদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করছে, ঘরের ভেতর থাকতে দিয়েছে। জহুরের খুব কৌতূহল হচ্ছিল ডক্টর ম্যাঙ্গেলা কে আর ডক্টর কাদেরের সাথে তার কী সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা জানার জন্যে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হচ্ছিল। জহুরের অবিশ্যি জিজ্ঞেস করতে হল না, তরুণ অফিসার নিজেই তার ব্যাখ্যা দিয়ে দিল, বলল, "নাৎসি জার্মানিতে ডক্টর ম্যাঙ্গেলা জীবন্ত মানুষকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করত আর আপনি মানুষের জন্ম নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেন। এই হচ্ছে পার্থক্য।"

ডক্টর কাদের কোনো কথা বলল না, পাথরের মতো মুখ করে বসে রইল। ডক্টর কাদেরের ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসে থাকা গুরুত্বপূর্ণ চেহারার সাধারণ পোশাকের মাঝবয়সী একজন মানুষ বলল, "আপনি কতজন মেয়ের ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট করেছেন?"

ডক্টর কাদের এবারেও কোনো কথা বলল না। মাঝবয়সী মানুষটি আবার জিজ্ঞেস করল, "কতজন মেয়ের ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট করেছেন?"

ডক্টর কাদের বিড়বিড় করে বলল, "আমি আমার অ্যাটর্নির সাথে কথা না বলে আপনাদের কথার কোনো উত্তর দেব না।"

তরুণ অফিসারটি এবারে শান্ত ভঙ্গিতে চেয়ার থেকে উঠে ডক্টর কাদেরের কাছে এগিয়ে গেল, তারপর খপ করে তার চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে এনে ফিসফিস করে বলল, "তোমাকে আমি মানুষ হিসেবে বিবেচনা করি না কাদের ডাক্তার। তোমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে আমার এক মিনিটও লাগবে না। তোমাকে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে তার উত্তর দাও, তা না হলে এই টেবিলে আমি তোমার নাক-মুখ থেঁতলে ফেলব।"

মাঝবয়সী মানুষটি জিজ্ঞেস করল, "ডক্টর কাদের, আপনি কতজন মেয়ের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছেন?"

ডক্টর কাদের উত্তর না দিয়ে আবার বিড়বিড় করে অস্পষ্ট স্বরে কিছু একটা বলল, শুধু অ্যাটর্নি শব্দটা একটু বোঝা গেল। কথা শেষ হওয়ার আগেই তরুণ মিলিটারি অফিসার ডক্টর কাদেরের চুলের ঝুঁটি ধরে সশব্দে তার মুখটাকে টেবিলে আঘাত করল। যখন চুলের ঝুঁটি ধরে তাকে তুলে আনল তখন দেখা গেল নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। মিলিটারি অফিসার আবার ফিসফিস করে বলল, "কাদের ডাক্তার, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। তোমাকে বিচার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে আমার কোনো আনন্দ নেই। কিন্তু এই টেবিলে তোমার মুখটাকে থেঁতলে দিয়ে মাথার ঘিলু বের করে দিলে আমার আনন্দ আছে! মানুষ মারতে হয় না—কিন্তু দানবকে মারতে কোনো সমস্যা নাই। কথার উত্তর দাও।"

www.amarboi.com

মাঝবয়সী মানুষটি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কতজন মেয়ের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করেছেন?"

"তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ।"

"কতজন মারা গেছে।"

"অর্ধেকের বেশি।"

"কতজন মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে?"

"বাকি অর্ধেক।"

"মেয়েগুলোকে কোথা থেকে এনেছেন?"

"পথঘাট থেকে। গরিবের মেয়ে।"

"আপনার এই প্রজেক্টে কে টাকা দিয়েছে?"

"আমেরিকার একটা জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি।"

"প্রজেক্টের উদ্দেশ্য কী?"

"নূতন ধরনের মানুষের জন্ম দেয়া। মানুষের জিনে পশুপাখির জিন মিশিয়ে দিয়ে নূতন ধরনের মানুষ তৈরি করা।"

মাঝবয়সী মানুষ নিঃশ্বাস আটকে রেখে জিজ্ঞেস করল, "এখন পর্যন্ত তৈরি হয়েছে কোনো নূতন ধরনের মানুষ?"

"পুরোপুরি হয় নি। বেশির ভাগ মেয়েই বিকলাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। জন্ম দিতে গিয়ে বেশির ভাগ মারা গেছে।"

"কী রকম বিকলাঙ্গ?"

ডক্টর কাদের কোনো কথা বলল না। মিলিটারি অফিসার ধমক দিয়ে বলল, "কী রকম বিকলাঙ্গ?"

"নাক চোখ মুখ নেই। হাত-পায়ের জায়গায় শুঁড়। তিন-চারটা চোখ। দুইটা মাথা। শরীরে আঁশ, এই রকম—"

ক্রুদ্ধ তরুণ অফিসারটি ডক্টর কাদেরের মাথাটি আবার সশব্দে টেবিলে এনে আঘাত করার চেষ্টা করছিল কিন্তু মধ্যবয়স্ক মানুষটি তাকে শেষ মুহূর্তে থামিয়ে দিল। তরুণ অফিসারটি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "খুন করে ফেলব। আমি এই বাস্টার্ডকে খুন করে ফেলব।"

মধ্যবয়সী মানুষটি বলল, "ঠিক আছে, আপনি খুন করবেন—কিন্তু আগে কয়েকটা কথা শুনে নিই।" তারপর আবার ডক্টর কাদেরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কেন এগুলো করেছেন?"

"শুধু আমি না, সারা পৃথিবীতে সব বৈজ্ঞানিকই এটা করে। এগুলো এক্সপেরিমেন্ট। এক্সপেরিমেন্ট করে করে বৈজ্ঞানিকরা নূতন নূতন জিনিস জানে। আমার এই ল্যাবরেটরি থেকে অনেক নূতন জিনিস আমি জেনেছি।"

"যে জিনিস জেনেছেন সেগুলো কোনো জার্নালে ছাপা হয়েছে?"

ডক্টর কাদের কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "আমি জানি ছাপা হয় নাই। এসব জিনিস ছাপা হয় না। যে জ্ঞান দশজনের কাজে লাগে না সেটা বিজ্ঞান না। বিজ্ঞান মানুষকে নিয়ে এই রকম এক্সপেরিমেন্ট করে না। ডক্টর কাদের—আর যাই করেন আপনি মুখে বিজ্ঞানের কথা বলবেন না। বিজ্ঞানকে অপমান করবেন না।"

ডক্টর কাদের কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, তার নাক দিয়ে রক্ত বের হয়ে সারা মুখ মাখামাখি হয়ে গেছে। টেবিলে তার মাথাটা ঠুকে দেয়ার পর মনে হয় একটা দাঁতও নড়ে গেছে, মুখের ভেতর রক্ত, সব মিলিয়ে তাকে অত্যন্ত কদাকার দেখাচ্ছে। মধ্যবয়স্ক মানুষটি একটা নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করল, "এখন এই হাসপাতালে যে মেয়েগুলো আছে তাদের কী অবস্থা?"

"সবাই প্রেগনেন্ট। টেস্টটিউব বেবি।"

"সবার ফেটাসই জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে তৈরি?'

"হ্যাঁ।"

"কী রকম ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছে?"

"নানা রকম। সরীসৃপের জিনস দেয়া আছে। বানর, কুকুর, ডলফিন। পাখি।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তার মানে সবগুলো মেয়ের অ্যাবোরশন করাতে হবে?"

ডক্টর কাদের নিচু গলায় বলল, "সবাইকে পারা যাবে না। কেউ কেউ এত অ্যাডভান্সড স্টেজে যে এখন অ্যাবোরশন করানো সম্ভব না।"

"তাদের বাচ্চাগুলো হবে পশু আর মানুষের মিশ্রণ?"

"হ্যাঁ।"

"বাচ্চাগুলো বেঁচে থাকবে?"

"কেউ কম কেউ একটু বেশি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়?"

ডক্টর কাদের মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ্।"

"মেয়েগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়?"

ডক্টর কাদের আবার মাথা নাড়ল, বলল, "বিকলাঙ্গ আধা পশু আধা মানুষের বাচ্চা পেটে ধরে বেশির ভাগই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। বেঁচে থাকাই তাদের জন্যে এক ধরনের কষ্ট। তাই বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করি না।"

তরুণ মিলিটারি অফিসার আবার এগিয়ে এসে কেউ বাধা দেয়ার আগেই ডক্টর কাদেরের মাথার চুল ধরে তার মাথাটি সশব্দে টেবিলে এনে আঘাত করে। ডক্টর কাদের গোঙানোর মতো একটা শব্দ করল। যখন তার মাথাটি উঁচু করা হল তখন দেখা গেল তার নাকটা থেঁতলে গেছে, সম্ভবত নাকের হাড়টা ভেঙে গেছে। ডক্টর কাদের থুতু ফেলার চেষ্টা করে এবং সেই থুতুর সাথে একটা ভাঙা দাঁত বের হয়ে আসে। ভাঙা দাঁতটির দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ডক্টর কাদের বিড়বিড় করে বলল, "আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমি একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। আমার গায়ে হাত দেয়া যায় না। কেউ আমার গায়ে হাত দিতে পারে না।"

কেউ কিছু বলার আগেই তরুণ অফিসারটি ডক্টর কাদেরের চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে তুলে তাকে একটা লাথি দিয়ে নিচে ফেলে দেয়। এগিয়ে গিয়ে তাকে আরেকটা লাথি মারার আগে অন্যেরা তাকে থামিয়ে দিল। ডক্টর কাদেরের মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত বের হয়ে আসে, সে ঠিক এই অবস্থায় ঘোলা চোখে হাসার চেষ্টা করে বলল, "তুমি আমার কিছু করতে পারবে না। আমি হচ্ছি বিধাতার মতো। দ্বিতীয় বিধাতা। সারা পৃথিবীতে শুধু আমি নূতন ধরনের মানুষের জন্ম দিয়েছি। শুধু আমি।"

AMARBOI.COM

জহুর এগিয়ে গেল, ডক্টর কাদেরের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, "তিনশ তেত্রিশ নম্বর কেবিনের মেয়েটির পেটেও কি এ রকম কোনো বাচ্চা আছে?"

"আছে।"

"কী রকম বাচ্চা?"

"পাখি আর মানুষের বাচ্চা।"

"পাখি আর মানুষ?"

"হ্যাঁ। পাখি আর মানুষ।"

জহুর আরো একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটা কি বাঁচবে?"

"জানি না।"

"বাচ্চাটা?"

ডক্টর কাদের তার থ্যাঁতলানো মুখ, ভাঙা নাক এবং রক্তাক্ত মুখে হাসার চেষ্টা করে বলল, "জানি না। যদি বাঁচে সে হবে প্রথম ইকারাস।"

জহুর ঠিক বুঝতে পারল না, জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন?"

"বলেছি ইকারাস।"

"ইকারাস কী?"

ডক্টর কাদের তার রক্তাক্ত মুখে অসুস্থ মানুষের মতো হাসার চেষ্টা করল, কোনো উত্তর দিল না।

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "ইকারাস হচ্ছে গ্রিক মাইথোলজির একটা চরিত্র। পাখির পালক লাগিয়ে সূর্যের কাছাকাছি উড়ে গিয়েছিল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

জাহাজের ডেকে মেয়েগুলো শুয়ে–বসে আছে। তারা কাছাকাছি থাকলেও কেউ কারো সাথে কথা বলছে না, হাঁটুর ওপর মুখ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। দুএকজন রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। খুব ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে, এই আলোতে সমুদ্রটিকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়।

জহুর তিনশ তেত্রিশ নম্বর কেবিনের মেয়েটিকে খুঁজে বের করল—সেও রেলিংয়ে কনুই রেখে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির চেহারায় এক ধরনের গভীর বিষাদের চিত্র, ঠিক কী কারণে জানা নেই তাকে দেখলেই জহুরের বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

জাহাজের কর্কশ ভেঁপু বেজে ওঠে এবং প্রায় সাথে সাথেই তার ইঞ্জিনগুলো চালু হয়ে যায়, জহুর ডেকে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনের মৃদু কম্পনটুকু অনুভব করল। ঘরঘর শব্দ করে জেটি থেকে সিঁড়িটা সরিয়ে নেয়া হয়, সেনাবাহিনীর একজন মানুষ মোটা দড়ির বাঁধন খুলে জাহাজটিকে মুক্ত করে দেয়। জাহাজের প্রপেলার পেছনে পানির একটা প্রবল ঢেউয়ের জন্ম দিয়ে নড়ে উঠল।

তিনশ তেত্রিশ নম্বর কেবিনের মেয়েটি হঠাৎ করে কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে, সে সতর্ক দৃষ্টিতে এদিকে সেদিকে তাকাল, তারপর খুব শান্তভাবে ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে যায়।

জহুর একটু অবাক হয়ে মেয়েটির পেছনে এগিয়ে যায়। মেয়েটি সবার চোখ এড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকে—আলাদা করে কেউ তাকে লক্ষ করল না। জহুর একটু দ্রুত পা চালিয়ে তার কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করল কিন্তু মেয়েটি দ্রুত নিচে নেমে ইঞ্জিনঘরের পাশ দিয়ে জাহাজের পেছনে পৌঁছে গেল। এখানে রেলিং নেই এবং জায়গাটা বেশ বিপজ্জনক। কেউ অসতর্ক হলে পেছনে পানির প্রবল আলোড়নের ভেতর মুহূর্তের মাঝে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। জায়গাটি নির্জন, মেয়েটি সেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে—ভোররাতের আবছা আলোতে দৃশ্যটিকে জহুরের কাছে কেমন জানি পরাবাস্তব মনে হতে থাকে।

জহুর পায়ে পায়ে মেয়েটির কাছে এগিয়ে যেতে থাকে—হঠাৎ করে তার মাথায় একটা ভয়ঙ্কর চিন্তার কথা উঁকি দিতে শুরু করেছে।

জাহাজটা খুব ধীরে ধীরে ঘুরে যাচ্ছে, একই সাথে গতি সঞ্চয় করতে শুরু করেছে, জেটি থেকে এটা এর মাঝে বেশ খানিকটা সরে এসেছে। মেয়েটি একবার উপরে আকাশের দিকে তাকাল, দুই হাত বুকের কাছে নিয়ে এল তারপর কিছু বোঝার আগেই সে হঠাৎ করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জহুর একটা চিৎকার করে সামনে ছুটে গেল কিন্তু ইঞ্জিনঘরের বিকট শব্দে কেউ তার চিৎকারটি শুনতে পেল না। জহুর জাহাজের শেষে ছুটে গিয়ে পানির দিকে তাকাল, ঘোলা পানির আবর্তনে মেয়েটির শরীরটা এক মুহূর্তের জন্যে ভেসে উঠে আবার পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে যায়। জহুর একবার পানির দিকে তাকাল একবার জাহাজটির দিকে তাকাল, সে ছুটে গিয়ে কাউকে বলে জাহাজটি থামাতে থামাতে এই হতভাগা মেয়েটি পানিতে ডুবে যাবে। জহুর ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, কখনোই সে বিচলিত হয় না, আজকেও হল না। মেয়েটাকে বাঁচাতে হলে কিছু একটা করতে হবে, তারপরেও তাকে বাঁচানো যাবে কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না কেউ জানে না। কিন্তু কিছু করা না হলে মেয়েটি নিশ্চিতভাবেই মারা যাবে। তাই জহুর এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জাহাজটি তখন বেগ সঞ্চয় করে সামনে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে, সেখানে কেউ জানতেও পারল না এখান থেকে দুজন মানুষ পরপর সমুদ্রের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একজন আত্মহত্যা করতে, অন্যজন তাকে উদ্ধার করতে।

জহুর পানির প্রবল আলোড়নের ভেতর থেকে বের হয়ে দ্রুত সাঁতার কেটে সামনে এগিয়ে যায়, মেয়েটিকে বাঁচাতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কাছে পৌঁছাতে হবে। পানি থেকে মাথা বের করে সে একবার চারপাশে দেখার চেষ্টা করল, পানির ঢেউ ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পেল না। জহুর পানিতে ডুব দিয়ে দ্রুত আরেকটু সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার মাথা তুলে তাকাল—কেউ কোথাও নেই। জহুর আরো একটু এগিয়ে আবার মাথা তুলে তাকাল। এবারে হঠাৎ করে তার মনে হল বাম দিকে পানির ভেতর সে খানিকটা আলোড়ন দেখতে পেয়েছে। সেটি সত্যিই মেয়েটি কি না বা এটি চোখের ভুল কি না জহুর সেটি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গেল—সে দুই হাত নেড়ে অদৃশ্য কিছু খুঁজতে থাকে এবং হঠাৎ করে তার হাত একজন মানুষের শরীর স্পর্শ করে। জহুর সাথে সাথে তাকে জাপটে ধরে পানির ওপর টেনে আনে। মেয়েটির শরীর নেতিয়ে আছে, জহুর তাকে তুলে ধরে তার মুখের দিকে তাকাল, চোখ দুটো বন্ধ এবং মুখে প্রাণের চিহ্ন নেই। জহুর সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না, মেয়েটাকে চিৎ করে ভাসিয়ে তীরের দিকে সাঁতরাতে থাকে।

সমুদ্রের তীরে এসে সে মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে এনে বালুকাবেলায় শুইয়ে দেয়। মেয়েটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে কি না ভালো করে বোঝা গেল না, জহুর তার মাথাটা একটু ঘুরিয়ে দেয়, যেন নিঃশ্বাস নেয়া সহজ হয়। তারপর তাকে ধরে একটা ছোট ঝাঁকুনি দিল, ঠিক তখন মেয়েটি খকখক করে কেশে নড়ে ওঠে। জহুর মেয়েটাকে একটু সোজা করে বসিয়ে দেয়, কাশতে কাশতে মেয়েটা বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে চোখ খুলে তাকাল, তাকিয়ে জহুরকে দেখে সে একটা আর্তচিৎকার করে ওঠে। জহুর জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই মেয়ে।"

মেয়েটা তীব্র দৃষ্টিতে জহুরের দিকে তাকিয়ে থেকে কাশতে কাশতে বলল, "আমাকে কেন তুলে এনেছ?"

জহুর মুখে হাসি ধরে রেখে বলল, "কেন আনব না? একজন মানুষ পানিতে ডুবে মারা যাবে আর আমি সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব, সেটা তো হতে পারে না।"

মেয়েটা চোখ বন্ধ করে বলল, "আমাকে মরে যেতে হবে। আমাকে এক্ষুনি মরে যেতে হবে।"

"কেন?"

"আমার পেটের ভেতরে একটা রাক্ষস। কিলবিল কিলবিল করছে বের হওয়ার জন্যে। বের হয়ে সে সবাইকে মেরে ফেলবে। সে বের হবার আগে আমাকে মরে যেতে হবে যেন সে বের হতে না পারে।"

জহুর কী বলবে ঠিক বুঝতে পারল না, ইতস্তত করে বলল, "তুমি এসব কী বলছ?"

"আমি সত্যি বলছি। পারুলের পেটে একটা বাচ্চা ছিল তার অর্ধেকটা মানুষ অর্ধেকটা সাপের মতো। রাহেলার পেটে একটা রাক্ষস ছিল তার দুইটা মাথা এত বড় বড় দাঁত। বিলকিসের পেটের বাচ্চাটার ছিল লম্বা লম্বা শুঁড়। আমার পেটের বাচ্চাটা শকুনের মতো—"

"ছিঃ! তুমি কী বলছ এসব। তোমাদের নিয়ে চিকিৎসা করে সবকিছু ঠিক করে দেবে।"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, বলল, "আমাদের কেমন করে চিকিৎসা করবে? আমাদের বিয়ে হয় নি পেটে বাচ্চা এসেছে, আমরা সব হচ্ছি শয়তানি। আমরা সব রাক্ষুসী। আমরা সব—"

মেয়েটা হঠাৎ বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো কাঁদতে শুরু করে। জহুর কী করবে ঠিক বুঝতে পারে না। সে বহুদিন নরম গলায় কারো সাথে কথা বলে নি, কোমল গলায় কাউকে সান্ত্বনা দেয় নি। কেমন করে দিতে হয় সে ভুলেই গেছে। কী করবে বুঝতে না পেরে সে মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "দেখবে তুমি সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"হবে না। হবে না। হবে না—"

"হবে।" জহুর জোরগলায় বলল, "আমার একটা মেয়ে ছিল তোমার মতন, তাকে আমি বাঁচাতে পারি নাই। বেঁচে থাকলে সে এখন তোমার বয়সী হত। তুমি আমার সেই মেয়ের মতন, আমি তোমাকে আমার মেয়ের মতন রাখব।"

মেয়েটি হঠাৎ ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করে। জহুর কী করবে বুঝতে না পেরে মেয়েটাকে শক্ত করে ধরে রাখল।

মেয়েটি হাসপাতালের ভেতর ঢুকতে রাজি হয় নি বলে জহুর তাকে নারকেল গাছের নিচে একটা বিছানা করে দিল। শুকনো কাপড় পরিয়ে একটা কম্বল দিয়ে তাকে বুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে, সে শক্ত করে কম্বলটা ধরে উদভ্রান্তের মতো সামনে কোথায় জানি তাকিয়ে রইল। জহুর মেয়েটার কাছে চুপচাপ বসে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে, হঠাৎ করে মেয়েটি কেন জানি চুপ করে গেছে।

জহুর বলল, "মানুষের জীবনে আসলে অনেক দুঃখ-কষ্ট আসে। ধৈর্য ধরে সেইগুলো সহ্য করতে হয়। যদি মানুষ সেটা সহ্য করে তা হলে দেখবে সবকিছু ঠিক হয়ে যায়।"

মেয়েটা জহুরের কথা শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না। সে একদৃষ্টে বহুদূরে তাকিয়ে রইল। জহুর বলল, "তুমি একটু বিশ্রাম নাও। এই দ্বীপটাতে এখন কেউ নাই, শুধু তুমি আর আমি। একটু পরে নিশ্চয়ই কেউ আসবে তখন আমরা যাব। তোমার কোনো ভয় নাই। বড় বড় ডাক্তারেরা তোমাকে দেখবে। তোমার চিকিৎসা হবে।"

মেয়েটা এবারেও কোনো কথা বলল না। জহুর বলল, "তুমি যদি আমাকে তোমার বাড়ির ঠিকানা দাও তা হলে আমি তোমার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিতে পারি, তারা এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।" একটু থেমে যোগ করল, "এখন যদি তাদের কাছে যেতে না চাও তুমি ইচ্ছা করলে আমার সাথেও থাকতে পার। আমার সংসার ঘর বাড়ি কিছু নাই, তুমি হবে আমার মেয়ে। আমার সাথে তুমি থাকবে—"

মেয়েটা হঠাৎ যন্ত্রণার মতো একটা শব্দ করল। জহুর চমকে তার দিকে তাকায়, মেয়েটার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে আছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, সে বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। জহুর তার হাত ধরে বলল, "কী হয়েছে?'

মেয়েটা ফিসফিস করে বলল, "আমি মরে যাচ্ছি।"

"কেন তুমি মরে যাবে?"

"ব্যথা।" মেয়েটা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল, "ভয়ানক ব্যথা।"

"কোথায় ব্যথা?"

"পেটে।"

"ব্যথাটা কি আসছে যাচ্ছে?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল। জহুর জিজ্ঞেস করল, "একটু পরে পরে আসছে? আস্তে আস্তে ব্যথাটা বাড়ছে?"

মেয়েটা আবার মাথা নাড়ল।

জহুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই মেয়েটি এখন তার পেটে ধরে রাখা সন্তানটি জন্ম দিতে যাচ্ছে। ডক্টর কাদের তার ভয়ঙ্কর গবেষণা করে এই অসহায় মেয়েটির পেটে যে হতভাগ্য একটা শিশুর জন্ম দিয়েছে সেই শিশুটি এখন পৃথিবীতে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। মানুষের জন্ম প্রক্রিয়াটি সহজ নয়, এর মাঝে কষ্ট আছে, যন্ত্রণা আছে এবং মনে হয় খানিকটা বিপদের আশঙ্কাও আছে। সন্তান জন্ম হওয়ার পর সন্তানটিকে দেখে সেই দুঃখ-কষ্ট আর বিপদের কথা মায়েরা ভুলে যায়। এই মেয়েটির বেলায় সেই কথাটি সত্যি নয়। এই মেয়েটি কষ্ট আর যন্ত্রণার মাঝে দিয়ে যাবে। তারপর যে শিশুটি জন্ম নেবে তাকে দেখে তার কষ্ট আর যন্ত্রণা সে ভুলতে পারবে না। সবচেয়ে ভয়ের কথা, এই মেয়েটি এখন যে বিকলাঙ্গ এবং ভয়াবহ শিশুটির জন্ম দেবে তাকে জন্ম দিতে সাহায্য করার জন্য কোনো ডাক্তার দূরে থাকুক একজন ধাত্রীও নেই। এমনকি একজন মহিলা পর্যন্ত নেই। মেয়েটি কীভাবে তার সন্তানের জন্ম দেবে জহুর জানে না। জন্মানোর পর সেই বিকলাঙ্গ শিশুটিকে নিয়ে সে কী করবে? সেই শিশুটিকে দেখে এই মেয়েটির কী প্রতিক্রিয়া হবে?

জহুর তার মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করে দিল। সন্তান জন্ম দেয়ার সময় কী কী করতে হয় তার কিছু জানা নেই। যদি সত্যি সত্যি একটা মানবশিশু জন্ম নিত তা হলে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কিছু ব্যাপার করার দরকার হত, নাড়ি কাটতে হত, গরম কাপড়ে জড়িয়ে রাখতে হত, খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হত। কিন্তু এখন সেসব কিছু নিয়ে তার মাথা ঘামাতে হবে না। বিকলাঙ্গ একটা মাংসপিণ্ড জন্ম দেয়ার পর মেয়েটিকে সুস্থ রাখাই হবে তার একমাত্র দায়িত্ব। তখন কী করতে হবে সে কিছু জানে না, কিন্তু মানুষ অত্যন্ত বিচিত্র একটা প্রাণী, কখন কী করতে হয় না জানলেও তারা সেটা কীভাবে কীভাবে জানি বের করে ফেলতে পারে। জহুর সেটা বের করে ফেলবে।

জহুর মেয়েটির কাছে গিয়ে তার হাতটি ধরল। হাতটি শীতল এবং ঘামে ভেজা, জহুর বুঝতে পারে হাতটি থরথর করে কাঁপছে। সে নরম গলায় বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই, মা।"

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, "আমি মারা যাচ্ছি।"

"তুমি মোটেই মারা যাচ্ছ না। তুমি তোমার শরীরে যে বাচ্চাটা আছে তার জন্ম দিতে যাচ্ছ।"

মেয়েটা দাঁতে দাঁত কামড়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে থাকে। তার সারা শরীর ঘামে ভিজে ওঠে। জহুর মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে দুই দিন আগেও এই মেয়েটার কথা জানত না, এই মেয়েটাকে চিনত না। সে এখনো এই মেয়েটির নাম পর্যন্ত জানে না, অথচ এই দুর্ভাগা মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুকের ভেতর গভীর বেদনা অনুভব করছে। তার ইচ্ছে করছে তার সকল যন্ত্রণা সকল কষ্ট নিয়ে নিতে—সেটি সম্ভব নয়, তাই সে মেয়েটির হাত শক্ত করে ধরে রাখল।

নবজাতক একটা শিশুর তীক্ষ্ণ কান্না কানে যেতেই মেয়েটি দুই হাতে তার মুখ ঢেকে বলল, "সরিয়ে নিয়ে যাও। এই রাক্ষসটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও।"

রক্ত এবং ক্লেদে মাখা শিশুটার দিকে জহুর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। ফুটফুটে ফুলের মতো অনিন্দ্যসুন্দর একটা শিশু, মাথায় রেশমের মতো চুল, বড় বড় চোখ, টিকালো নাক, ছোট ছোট হাত–পা। উপুড় হয়ে রক্ত এবং ক্লেদে পড়েছিল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পিঠে দুটো ছোট ছোট পাখা। হাত এবং পায়ের সাথে সাথে তার পাখাগুলো তিরতির করে নড়ছে। জহুর এগিয়ে গিয়ে শিশুটিকে তুলে নেয়—শিশুটি পাখির পালকের মতো হালকা।

মেয়েটি মুখ ঢেকে চিৎকার করে বলল, "সরিয়ে নাও। সরিয়ে নাও!"

জহুর তার শার্টটা খুলে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে নেয়, তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখো! দেখো বাচ্চাটাকে। কী সুন্দর!"

মেয়েটি খুব ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে তাকাল এবং এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে অনিন্দ্যসুন্দর শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর খুব সাবধানে শিশুটির হাতটা স্পর্শ করে বলল, "সবকিছু ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ আছে।"

"আঙুলগুলি?"

জহুর ঠিক বুঝতে পারল না এই মেয়েটি শিশুটির সবকিছু ভুলে শুধু আঙুলগুলোর কথা কেন জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু সে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না, বলল, "হ্যাঁ। ঠিক আছে।"

মনে হল আঙুলগুলো ঠিক আছে শুনেই মেয়েটির সব দুশ্চিন্তার যেন অবসান হয়ে গেল। সে চোখ বন্ধ করে আছে এবং এই প্রথমবার তার মুখে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে ওঠে। জহুর ঠিক বুঝতে পারল না এই শিশুটির পিঠে ছোট দুটি পাখা আছে সেটি এখন তাকে বলবে কি না—কী ভেবে শেষ পর্যন্ত জহুর সেটি বলল না। জহুর লক্ষ করল মেয়েটি ফিসফিস করে কিছু বলছে, জহুর নিচু হয়ে তার মুখের কাছে তার মাথাটি নামিয়ে আনে, শুনতে পায় মেয়েটি ফিসফিস করে বলছে, "আমি মারা যাচ্ছি। তুমি আমার ছেলেটিকে দেখে রেখো?"

জহুর বলল, "না। তুমি মারা যাবে না। তুমি বেঁচে থাকবে।"

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, "আমি মারা যাচ্ছি।"

সত্যি সত্যি মেয়েটি মারা গেল সূর্য ডোবার আগে। পাখির পালকের মতো হালকা শিশুটাকে বুকে জড়িয়ে রেখে জহুর মেয়েটার মাথার কাছে বসে রইল।

হঠাৎ করে সে আবিষ্কার করল, মেয়েটার নামটি তার জানা হয় নি।

৫

ডক্টর সেলিম বিস্ফারিত চোখে ক্যাবিনেটে উপুড় করে রাখা শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট বাচ্চাটি তার মাথাটি উঁচু করার চেষ্টা করছে, ঘাড় এখনো শক্ত হয় নি তাই মাথাটা অল্প অল্প দুলছে। একটা হাতে নিজেকে ভর দিয়ে রেখেছে, অন্য হাতটা নিজের মুখে। ছোট মুখে তার হাতটা ঢোকানো সম্ভব নয়, বাচ্চাটি সেটা জানে না, সে প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে। তার বড় বড় চোখ, সে সামনে তাকিয়ে আছে কিন্তু আলাদা করে কিছু একটা দেখছে বলে মনে হয় না।

ডক্টর সেলিম অবিশ্যি ছোট শিশুটির এসব কিছুই দেখছিল না, সে হতবাক হয়ে বাচ্চাটির পিঠের দিকে তাকিয়ে ছিল, সেখানে ছোট ছোট দুটি পাখা এবং পাখাগুলো মাঝে মাঝে নড়ছে। ডক্টর সেলিম সাবধানে একটা পাখাকে স্পর্শ করতেই পাখাটা একটা ছোট ঝাপটা দিল এবং ডক্টর সেলিম সাথে সাথে তার হাত সরিয়ে নিল। সে ঝুঁকে পড়ে পিঠের ঠিক যেখান থেকে পাখাটা বের হয়ে এসেছে সে জায়গাটুকু লক্ষ করল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা কার বাচ্চা? কোথা থেকে এসেছে?"

"বাচ্চার দায়িত্ব কার, সেটা যদি জিজ্ঞেস করেন তা হলে বলা যায় দায়িত্ব আমার।"

"বাচ্চাটার পাখা কোথা থেকে এসেছে?"

জহুর জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "সেইটা অনেক বড় ইতিহাস।"

"ইতিহাসটা কী? বাচ্চাটা কার? বাবা-মা কে?"

"বাবা নাই। টেস্টটিউব বেবি না কী বলে সেইটা—আপনারা ভালো বুঝবেন। আর মা—"

"মা?"

"মা মারা গেছে। বাচ্চাটা জন্ম দেয়ার পরই মারা গেছে। মারা যাওয়ার সময় আমার হাত ধরে আমাকে বাচ্চাটা দিয়ে গেছে। বলেছে দেখেশুনে রাখতে। বলেছে—"

শিশুটির মা মৃত্যুর ঠিক আগে জহুরকে কী বলে গেছে ডক্টর সেলিম সেটা শুনতে কোনো আগ্রহ দেখাল না, জিজ্ঞেস করল, "এই বাচ্চাটাকে দেখে ডাক্তাররা কী বলেছে?"

জহুর বলল, "কোনো ডাক্তার বাচ্চাটারে দেখে নাই। আপনি প্রথম।"

ডক্টর সেলিম কেমন যেন চমকে উঠল, বলল, "আমি প্রথম? এর আগে কেউ দেখে নাই?"

"না।"

"বাচ্চাটার যখন জন্ম হয়—"

"কেউ ছিল না। শুধু আমি।"

"শুধু আপনি? কেন?"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সেটা অনেক লম্বা ইতিহাস।"

ডক্টর সেলিমের লম্বা ইতিহাস শোনার ধৈর্য নেই, জিজ্ঞেস করল, "আমার আগে কোনো ডাক্তার এই বাচ্চাকে দেখে নাই?"

"শুধু ডাক্তার না, কোনো মানুষও দেখে নাই।"

ডক্টর সেলিমের চোখ দুটি চকমক করে ওঠে, "কোনো মানুষ দেখে নাই?"

"নাহ।" জহুর ইতস্তত করে বলল, "বুঝতেই পারছেন। এই বাচ্চাটাকে কেউ দেখলেই হইচই শুরু করে দেবে।"

ডক্টর সেলিম মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি আর কাউকে না দেখিয়ে যে আমার কাছে এনেছেন সেটা ঠিকই করেছেন।"

জহুর বলল, "জি। আমি চাই না এটা জানাজানি হোক। যাই হোক আমি আপনার কাছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে এসেছি।"

"কী উদ্দেশ্য।"

জহুর বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি এর ডানা দুটি কেটে দিবেন।"

ডক্টর সেলিম একটু চমকে উঠল, "কেটে দিব?"

"জি স্যার। এর পাখা দুটি কেটে দিলে তাকে নিয়ে কেউ কোনো কথা বলবে না। তা না হলে এর জীবনটা অসহ্য হয়ে উঠবে।"

ডক্টর সেলিম সাবধানে বাচ্চাটার পাখাটা স্পর্শ করে জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। পাখা নিয়ে বড় হলে এর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে।"

"এই অপারেশন করতে কত লাগবে আমাকে বলবেন? আমি খুব গরিব মানুষ, অনেক কষ্টে কিছু টাকার ব্যবস্থা করেছি।"

ডক্টর সেলিম বলল, "আরে! কী বলছেন আপনি। এই বাচ্চাটাকে ঠিক করে দেয়ার টাকা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন?"

জহুর ডক্টর সেলিমের মুখের দিকে তাকাল, হঠাৎ করে সে বুঝতে পারল এই মানুষটি আসলে তার সাথে মিথ্যা কথা বলছে। বাচ্চাটার অপারেশন করা থেকে অন্য কিছুতে তার আগ্রহ বেশি। সাথে সাথে তার মুখ কঠিন হয়ে যায়। সে শীতল গলায় বলল, "ডাক্তার সাহেব।"

"বলেন।"

"আপনি আমাকে বলেন কত খরচ হবে। আমি তারপর অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যাব।"

ডক্টর সেলিম ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন? অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে কেন?"

"একটা বাচ্চার পিঠে পাখা থাকাটা স্বাভাবিক ব্যাপার না, সেটা কয়েকজনকে দেখিয়ে ঠিক করা ভালো।"

ডক্টর সেলিম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন দরজায় শব্দ হল, মেয়ের গলায় কেউ একজন বলল, "স্যার।"

ডক্টর সেলিম অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে একটা টাওয়েল দিয়ে বাচ্চাটার ঘাড় পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে বলল, "কে? নাসরীন?"

"জি স্যার।" ডক্টর সেলিম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে কম বয়সী একটা মেয়ে ডক্টর সেলিমের চেম্বারে ঢুকে গেল। তার শরীরে ডাক্তারের সবুজ রঙের অ্যাপ্রন, গলায় স্টেথিস্কোপ। চোখে চশমা, চেহারায় কেমন জানি এক ধরনের সজীবতা রয়েছে।

AMARBOI.COM

ডক্টর সেলিম বলল, "কী ব্যাপার?"

নাসরীন নামের ডাক্তার মেয়েটা বলল, "চার নম্বর কেবিনের বাচ্চাটা। আমার মনে হয় সার্জারি না করাটাই ঠিক হবে। যেহেতু ফিফটি ফিফটি চান্স, ফ্যামিলির ওপর বার্ডেন না দেয়াই ভালো।"

ডক্টর সেলিম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে নাসরীন হঠাৎ করে ক্যাবিনেটে শুইয়ে রাখা বাচ্চাটাকে দেখে এবং সাথে সাথে তার মুখে মধুর এক ধরনের হাসি ছড়িয়ে পড়ে। সে কাছে এগিয়ে বলে, "ও মা! কী সুন্দর বাচ্চাটা! একেবারে পরীর মতন চেহারা!"

ডক্টর সেলিম হাত দিয়ে নাসরীনকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কাছে যেয়ো না।"

নাসরীন অবাক হয়ে বলল, "কেন স্যার?"

ডক্টর সেলিম আমতা-আমতা করে বলল, 'এটা স্পেশাল কেস। এটার জন্যে বিশেষ একটা ব্যবস্থা দরকার।"

নাসরীন জহুরের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "স্পেশাল কেস? কী হয়েছে?"

জহুর মেয়েটির মুখের দিকে তাকায় এবং হঠাৎ করে কেমন যেন আশ্বস্ত অনুভব করে। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপা। আপনিও দেখেন।"

ডক্টর সেলিম জহুরকে থামানোর চেষ্টা করল, কিন্তু জহুর তাকে ঠেলে সরিয়ে কাছে গিয়ে বাচ্চাটার উপর থেকে টাওয়েলটা সরিয়ে নেয়।

নাসরীন বাচ্চাটাকে দেখে বিস্ময়ে একটা চিৎকার করে ওঠে। অনেকক্ষণ সে দুই হাতে নিজের মুখ ঢেকে রাখে, তারপর কাছে গিয়ে প্রথমে তাকে আলতোভাবে স্পর্শ করে, তারপর সাবধানে তাকে কোলে তুলে নেয়। বাচ্চাটি নাসরীনকে দেখে তার দাঁতহীন মুখে একটা হাসি দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার চশমাটা ধরার চেষ্টা করল।

কয়েক মুহূর্ত নাসরীন কোনো কথা বলতে পারল না, তারপর একটু চেষ্টা করে বলল, "একেবারে পাখির পালকের মতো হালকা!"

জহুর মাথা নাড়ল, "জী আপা। একেবারে হালকা, কিন্তু বাচ্চাটা অনেক শক্ত।"

"এটা কার বাচ্চা?"

জহুর বলল, "সেটা অনেক লম্বা ইতিহাস।"

নাসরীনের ইতিহাসটা শোনার কৌতূহলের অভাব নেই, জিজ্ঞেস করল, "কী ইতিহাস শুনি। বলেন।"

ডক্টর সেলিম এই বারে বাধা দিল, বলল, "নাসরীন, তুমি বাচ্চাটাকে ক্যাবিনেটে রেখে দাও। আর খবরদার এর কথা কাউকে বলবে না। কাউকে না। নেভার।"

নাসরীন সাবধানে বাচ্চাটাকে ক্যাবিনেটে রেখে বলল, "ঠিক আছে স্যার বলব না। কিন্তু স্যার এটা কেমন করে সম্ভব?"

"সেটা আমি এখনো জানি না, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ এটা সম্ভব।"

জহুর নাসরীনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপা। আপনিও তো ডাক্তার। তাই না?"

"হ্যাঁ। আমিও ডাক্তার তবে খুবই ছোট ডাক্তার। মাত্র পাস করেছি।" সে ডক্টর সেলিমকে দেখিয়ে বলল, "স্যার আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় ডাক্তার। ডাক্তারদেরও ডাক্তার।"

জহুর কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে বড় ডাক্তারের চেয়ে এই ছোট ডাক্তারের মাঝে এক ধরনের ভরসা খুঁজে পেল। সে নিচু গলায় বলল, "আপা। এই বাচ্চাটার ডানা দুটি আমি অপারেশন করে কাটতে চাই—"

নাসরীন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি আমাদের কাছে এনেছেন, যেটা তার জন্যে ভালো হয় সেটাই করা হবে।"

জহুর সাথে সাথে কেমন করে জানি বুঝতে পারল এই মেয়েটি যে কথাগুলো বলছে সেটা সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেই বলছে। সে এবারে ঘুরে নাসরীনের দিকে তাকাল, বলল, "আপা আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি। এই ছেলেটার জন্যে এই পাখা দুইটা কেটে ফেলা ছাড়া আর কোনো গতি নাই। যদি তার পাখা থাকে সে হবে একটা চিড়িয়া। যেই তাকে দেখবে সেই তাকে ধরে সার্কাসে বিক্রি করে দেবার চেষ্টা করবে—"

নাসরীন মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এ রকম একটা বাচ্চা এত আশ্চর্য যে সায়েন্টিফিক কমিউনিটি যখন জানবে তখন একেবারে পাগল হয়ে যাবে!"

"পাগল হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ।"

"পাগল হয়ে কী করবে?"

"দেখতে চাইবে। বুঝতে চাইবে।"

"কেমন করে দেখতে চাইবে?"

নাসরীন বলল, "সেটা আমি ঠিক জানি না। বৈজ্ঞানিকদের সবকিছু নিয়ে কৌতূহল থাকে।"

জহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আপা, বৈজ্ঞানিকরা যেন এই বাচ্চার খোঁজ না পায়।"

"কেন?"

"বাচ্চার মা আমার হাত ধরে দায়িত্বটা দিয়ে গেছে। মারা যাবার ঠিক আগে আমাকে বলেছে—"

জহুর একটু আগেই ঘটনাটা ডক্টর সেলিমকে বলার চেষ্টা করেছিল সে শুনতে কোনো আগ্রহ দেখায় নি, নাসরীন খুব আগ্রহ নিয়ে শুনল এবং শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, "শুনে আমার খুবই খারাপ লাগছে, বেচারি এত কম বয়সে এত বড় কষ্টের ভেতর দিয়ে গিয়েছে। আহারে!"

জহুর বলল, "আমি চাই না বাচ্চাটাও কষ্টের ভেতর দিয়ে যাক। সেই জন্যে বড় হবার আগেই তার পাখা দুটি কেটে ফেলতে চাই।"

নাসরীন একবার ডক্টর সেলিমের দিকে তাকাল তারপর ইতস্তত করে বলল, "আপনার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু আমরা তো এত ছোট বাচ্চার ওপর হঠাৎ করে এ রকম একটা অপারেশন করে ফেলতে পারি না। কিছু করার আগে এর এনাটমিটা বুঝতে হবে। মানুষের শরীরে কোথায় কী আমরা জানি—কোন গুরুত্বপূর্ণ আর্টারি কোন দিক দিয়ে গিয়েছে সেটা আমাদের শেখানো হয়। কিন্তু এই বাচ্চাটা তো অন্য রকম, কোনো রকম স্টাডি না করে চট করে পাখা দুটি তো কেটে ফেলতে পারি না।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে। সেটা আমি বুঝতে পারছি। আপনি তা হলে একটু দেখেন, দেখে বলেন—"

ডক্টর সেলিম এবারে আলোচনায় যোগ দেয়ার চেষ্টা করল, বলল, "আমিও তো আপনাকে সেটাই বলছিলাম। আমরা একটু স্টাডি করে দেখি।"

জহুর ডক্টর সেলিমের দৃষ্টি এড়িয়ে নাসরীনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কতক্ষণ লাগবে বলতে?"

নাসরীন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ডক্টর সেলিম বাধা দিয়ে বলল, "এক সপ্তাহ তো মিনিমাম।"

"উঁহু।" জহুর মাথা নাড়ল, "এই বাচ্চাকে এক সপ্তাহ হাসপাতালে রাখার ক্ষমতা আমার নাই—"

"সেটা নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না। এইটা আমাদের নিজস্ব হাসপাতাল, আমরা কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেব। আপনি বাচ্চাটাকে রেখে যান, এক সপ্তাহ পরে আসেন।"

জহুর ডক্টর সেলিমের দিকে তাকিয়ে তার কথাটি শুনল, কিন্তু উত্তর দিল নাসরীনের দিকে তাকিয়ে, বলল, "আপা। এই বাচ্চাটার তো মা নাই, আমি বুকে ধরে মানুষ করেছি। আমি তো তারে এক সপ্তাহের জন্যে রেখে যেতে পারব না।"

নাসরীন বলল, "ছোট বাচ্চাদের বেলায় আমরা মা'দের সাথে থাকতে দেই। এই বাচ্চাটার জন্যে আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে থাকতে দেব।"

ডক্টর সেলিম বাধা দিয়ে বলল, "না—না—না সেটা এখনই বলা যাবে না। আমাদের স্টাডি করতে সময় নেবে, সব সময় আপনি থাকতে পারবেন না। এটা খুবই আনয়ুজুয়াল কেস।"

AMARBOI.COM

জহুর এবার এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাটিকে কাপড়ে জড়িয়ে কোলে তুলে নিতে থাকে, ডক্টর সেলিম অবাক হয়ে বলল, "কী করছেন? আপনি কী করছেন?"

"আমি এই বাচ্চাকে এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখের আড়াল করব না। আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে যাচ্ছি। অন্য কোথাও যাব।"

ডক্টর সেলিম বলল, "দাঁড়ান। দাঁড়ান আগেই এত ব্যস্ত হবেন না। দেখি আমরা কী করা যায়।"

জহুর নাসরীনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপা। আপনি যদি বলেন তা হলে আমি থাকব, তা না হলে আমি আমার এই বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাব।"

নাসরীন একটু অবাক হয়ে একবার ডক্টর সেলিমের দিকে আরেকবার জহুরের দিকে তাকাল, তারপর ইতস্তত করে বলল, "আমি খুব জুনিয়র ডাক্তার। এই স্যারের আন্ডারে কাজ করি, কাজ শিখি। আমার কথার কোনো গুরুত্ব নাই, আপনাকে এই স্যারের কথা বিশ্বাস করতে হবে।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "আমি খুব গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ। কে কী করে আমি জানি না। আমি মানুষের মুখের কথায় বিশ্বাস করে সিদ্ধান্ত নেই। আপা, আপনি আমাকে যদি বলেন আমি থাকব, তা না হলে আমি চলে যাব।"

ডক্টর সেলিম জহুরকে বলল, "ঠিক আছে ঠিক আছে—আপনি পাঁচ মিনিট এই ঘরে বসেন। আমি নাসরীনের সাথে দুই মিনিট কথা বলে আসছি।"

ডক্টর সেলিম নাসরীনকে একরকম জোর করে পাশের ঘরে নিয়ে গেল, তার চোখে-মুখে উত্তেজনা, বড় বড় করে নিঃশ্বাস পড়ছে, নাসরীনের হাত ধরে চাপা গলায় বলল, "নাসরীন।"

"জি স্যার।"

"তুমি নিশ্চয়ই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ।"

"জি স্যার।"

"এই বাচ্চাটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাইজ। একে আমাদের দরকার। যে কোনো মূল্যে।"

নাসরীন ভুরু কুঁচকে বলল, "যে কোনো মূল্যে?"

"হ্যাঁ। কোনো একটা কারণে এই মানুষটা আমাকে বিশ্বাস করছে না কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করছে। বুঝেছ?"

"জি স্যার।"

"কাজেই তুমি তাকে বোঝাও। শান্ত কর, যেন বাচ্চাটাকে নিয়ে না যায়। আমার দুই ঘণ্টা সময় দরকার।"

"দুই ঘণ্টা!"

"হ্যাঁ।"

নাসরীন ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু স্যার—"

ডক্টর সেলিম অধৈর্য গলায় বলল, "এর মাঝে কোনো কিন্তু নাই। তুমি যাও, মানুষটার সাথে কথা বল, তাকে আশ্বস্ত কর। আমি এর মাঝে ব্যবস্থা করছি।"

"কী ব্যবস্থা?"

"সেটা তোমার জানার দরকার নেই। তুমি যাও।"

নাসরীন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ডক্টর সেলিম তাকে সেই সুযোগ দিল না। একরকম ধাক্কা দিয়ে তার চেম্বারে পাঠিয়ে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেম্বারের মাঝামাঝি জহুর বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার মুখ পাথরের মতো কঠিন। নাসরীনকে ঘরে ঢুকতে দেখে বলল, "আপা।"

"জি।"

"আমি কি বাচ্চাটাকে নিয়ে থাকব নাকি চলে যাব?"

নাসরীন ইতস্তত করে বলল, "এই বাচ্চাটাকে নিয়ে দশ জায়গায় যাওয়া হয়তো ঠিক হবে না। যত কম মানুষ এই বাচ্চাটার কথা জানে তত ভালো। আপনি যখন এখানে এসেছেন মনে হয় আপাতত এখানেই থাকেন। এটা একটা খুব সম্ভ্রান্ত হাসপাতাল, বড় বড় মানুষেরা থাকেন। তারা মিলে সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারবেন।"

জহুর নাসরীনের চোখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিক আছে আপা। আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করে থাকলাম।"

ঠিক কী কারণে জানা নেই, নাসরীন নিজের ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তার মনে হতে থাকে কোনো একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, যেটা সঠিক নয়—সেটা কী হতে পারে সে ঠিক বুঝতে পারছিল না।

ঘণ্টা দুয়েক পরে নাসরীন অবিশ্যি ব্যাপারটা বুঝতে পারল। একটা পুলিশের গাড়ি হাসপাতালের পাশে এসে দাঁড়াল এবং গুরুত্বপূর্ণ চেহারার কয়েকজন মানুষ ডক্টর সেলিমের সাথে এসে দেখা করল। তারা অফিসে কিছুক্ষণ নিচু গলায় কথা বলল, তারপর সবাই মিলে ডক্টর সেলিমের চেম্বারে হাজির হল। বাচ্চাটি অনেকক্ষণ নিজে নিজে খেলা করে এখন উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে গেছে—ঘুমানোর ভঙ্গিটা একটু বিচিত্র, পেছন দিকটা উঁচু, দুই পা গুটিসুটি হয়ে আছে। মুখে বিচিত্র একটা হাসি, পিঠের পাখা দুটি মাঝে মাঝে নড়ছে। ডক্টর সেলিম বাচ্চাটিকে একনজর দেখে জহুরের দিকে তাকাল, বলল, "আমরা আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি।"

জহুর মানুষগুলোর দিকে তাকাল, নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়েই সে ব্যাপারটা বুঝে যায়। সে ক্লান্ত গলায় বলল, "কী কথা।"

ডক্টর সেলিম মুখটা অনাবশ্যকভাবে কঠিন করে বলল, "এই বাচ্চাটাকে আপনাকে আমাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে।"

"কেন?"

"এটি আপনার বাচ্চা না। এই বাচ্চার উপরে আপনার কোনো আইনগত অধিকার নেই। শুধু তাই না—আপনি বাচ্চাটির পাখা কেটে ফেলতে গেছেন, সেটা অমানবিক। আপনি এই বাচ্চাটির প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে চাইছেন।"

জহুর শীতল চোখে কিছুক্ষণ ডক্টর সেলিমের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর শান্ত গলায় বলল, "এই বাচ্চাটির মা আমাকে এই বাচ্চাটা দিয়ে গেছে। দিয়ে বলেছে দেখেশুনে রাখতে—"

ডক্টর সেলিম এবারে হাসার মতো এক ধরনের শব্দ করল, বলল, "আপনি কয়েকবার এই কথাটা বলেছেন। আমার মনে হয় এটার তদন্ত হওয়া দরকার। এর মায়ের মৃত্যু কেমন করে হয়েছে? সেটা কি স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল? তাকে কি খুন করা হয়েছিল? ডেথ সার্টিফিকেট কোথায়? তাকে কোথায় কবর দেয়া হয়েছে? এসব প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। এর যে কোনো একটি প্রশ্ন করা হলেই আপনি কিন্তু বড় ঝামেলায় পড়ে যাবেন।"

জহুর শীতল গলায় বলল, "আপনি প্রশ্ন করেন। দেখি আমি ঝামেলায় পড়ি কি না।"

ডক্টর সেলিম জহুরের দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "সেই প্রশ্ন তো আমি করব না। করবে পুলিশ—"

"কোথায় পুলিশ?"

গুরুত্বপূর্ণ চেহারার একজন মানুষ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ডক্টর সেলিম তাকে সুযোগ না দিয়ে বলল, "আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমি চেষ্টা করছি আপনাকে যেন পুলিশের সাথে ঝামেলায় পড়তে না হয়। এই বাচ্চাটা আপনার কেউ নয়। ঘটনাক্রমে বাচ্চাটা আপনার হাতে এসে পড়েছে—আপনার পক্ষে এর দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। প্রফেশনালদের এর দায়িত্ব নিতে হবে। আপনি প্রফেশনাল নন, এই বাচ্চাটির কখন কী প্রয়োজন হবে আপনি জানেন না। আমরা জানি। শুধু আমরাই পারি এর দায়িত্ব নিতে।"

জহুর কোনো কথা না বলে শীতল চোখে ডক্টর সেলিমের দিকে তাকিয়ে রইল। ডক্টর সেলিম আবার তার চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। অকারণেই কেশে একটু গলা পরিষ্কার করে বলে, "বাচ্চাটার কোনো সমস্যা আছে কি না কেউ জানে না। একে ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার। যদি শরীরে জটিল সমস্যা থাকে তা হলে চিকিৎসা করা দরকার। আপনি এত বড় দায়িত্ব কেমন করে নেবেন? আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, এই বাচ্চাটার দায়িত্ব আমরা নিতে চাই।"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনারা কি বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবেন?"

ডক্টর সেলিম চমকে উঠল, থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করল, "মেরে ফেলব? মেরে ফেলব কেন?"

"এই বাচ্চাটার পাখা কেন আছে সেটা বোঝার জন্যে তাকে কেটেকুটে দেখতে হবে না? কেটেকুটে দেখার জন্যে তাকে আগে মেরে ফেলতে হবে না?"

ডক্টর সেলিম থতমত খেয়ে বলল, "এটা আপনি কেন বলছেন? আমি আপনার এ রকম একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য না।"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে।"

"আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা চাই আপনি কোনো রকম ঝামেলা না করে চলে যান। বাচ্চাটার ব্যাপারটা আমরা দেখব।"

জহুর উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার করে তাকাল, নাসরীনের মুখের দিকে সে কয়েক সেকেন্ড বেশি তাকিয়ে রইল, নাসরীন চোখ নামিয়ে নিচু গলায় বলল, "আমি দুঃখিত। কিন্তু আসলে মানে আসলে—" সে বাক্যটা শেষ না করে থেমে যায়।

জহুর ক্যাবিনেটে পেছনটা উঁচু করে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকা বাচ্চাটার কাছে যায়, মাথা নিচু করে বাচ্চাটার দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর মাথা ঘুরিয়ে বলল, "আমি অনেক কষ্ট করে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে তুলেছি। আসলে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে না তুললেই ভালো হত। তার মায়ের পাশে তাকে কবর দিতে পারতাম। আপনাদের মতো শকুনেরা তা হলে তার শরীরটাকে খুবলে খুবলে খেতে পারত না।"

বড় বড় শক্তিশালী দুজন মানুষ কোথা থেকে এসে তখন জহুরের দুই হাত ধরে তাকে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে থাকে। জহুর যেতে চাচ্ছিল না কিন্তু মানুষ দুজন তাকে জোর করে টেনে নিতে থাকে। দরজার কাছে জহুর একবার দাঁড়িয়ে গেল, পেছনে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "খোদা আপনাদের মাফ করবে কি না জানি না, আমি কোনোদিন আপনাদের মাফ করব না।"

জহুরকে বের করে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ডক্টর সেলিম চুপ করে বসে রইল, তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে সবার দিকে ঘুরে তাকাল, মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "সবাইকে থ্যাংকস। কোনো ঝামেলা ছাড়াই ব্যাপারটা শেষ হয়েছে। যে রকম গোঁয়ার ধরনের মানুষ আমি ভেবেছিলাম কী না কী করে।"

গুরুত্বপূর্ণ চেহারার একজন মানুষ বলল, "কিছু করতে পারত না, আমি সঙ্গে অনেক আর্মড গার্ড এনেছি।"

"আমি জানি। আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি একা এটা করতে পারতাম কি না জানি না। যাই হোক আপনারা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার অংশ হয়ে থাকলেন। এই বাচ্চাটার অস্তিত্ব পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক কমিউনিটিতে একটা ঝড় তুলবে। একটা নূতন দিগন্ত তৈরি হবে। আপনারা দোয়া করবেন আমরা যেন তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে পারি।"

উপস্থিত যারা ছিল তাদের কেউ কোনো কথা বলল না, শুধু গম্ভীরভাবে কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল।

৬

ছোট বাচ্চাটা চিৎকার করে কাঁদছে কিন্তু কাউকেই সেটা নিয়ে বিচলিত হতে দেখা গেল না। বাচ্চাটার সারা শরীরে নানা ধরনের মনিটর লাগিয়ে তাকে উপুড় করে শুইয়ে রাখা হয়েছে, নানা রকম যন্ত্রপাতিতে তার শরীরের সব ধরনের জৈবিক কাজকর্মের ওপর নজর রাখা হচ্ছে। কয়েকটা ভিডিও ক্যামেরা তার দিকে তাক করে রাখা হয়েছে। এর মাঝে তাকে নানা দিক থেকে এক্সরে করা হয়েছে, আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার জন্য প্রস্তুতি চলছে।

বাচ্চার কান্নাটি ধীরে ধীরে নাসরীনের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। সে টেকনিশিয়ানকে বলল, "বাচ্চাটার মনে হয় খিদে লেগেছে।"

"কার?"

"এই বাচ্চাটার।"

টেকনিশিয়ানের মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে, বলে, "বাচ্চা? কোথায় বাচ্চা?"

নাসরীন অবাক হয়ে বলল, "এই যে।"

টেকনিশিয়ান হা হা করে হেসে বলল, "এইটা? এইটা তো মানুষের বাচ্চা না। এইটা শয়তানের বাচ্চা। মানুষের বাচ্চার কখনো পাখা থাকে?"

নাসরীন অবাক হয়ে টেকনিশিয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকল, কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। ইতস্তত করে বলল, "শয়তানের বাচ্চা হলেও তো বাচ্চা। একটা বাচ্চার খিদে লাগে।"

"হ্যাঁ খিদে তো লাগেই। কিন্তু শয়তানের বাচ্চা কী খায় তা তো জানি না। কী খেতে দেব? রক্ত?" টেকনিশিয়ানটি হা হা করে হাসতে লাগল যেন খুব একটা মজার কথা বলেছে।

নাসরীন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘর থেকে বের হয়ে ডক্টর সেলিমের চেম্বারের দিকে এগিয়ে যায়। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখে ডক্টর সেলিম টেলিফোনে কার সাথে যেন কথা বলছে। কথাগুলো বলছে ইংরেজিতে।

কাজেই মনে হয় অন্য পাশে দেশের বাইরের কোনো মানুষ।

নাসরীন শুনল ডক্টর সেলিম বলছে, "তুমি ভিডিও ফুটেজটা দেখেছ? কী মনে হয়?"

অন্য পাশ থেকে কী বলেছে নাসরীন শুনতে পেল না কিন্তু ডক্টর সেলিমের হা হা হাসি শুনে বুঝতে পারল কথাটি নিশ্চয়ই খুব মজার। ডক্টর সেলিম বলল, "তা হলে তুমি আমার এই শয়তানের বাচ্চার একটা টুকরো চাও?... কোন টুকরো...?... উঁহু। তুমি সবকিছুর এক টুকরো পাবে না। যে কোনো একটা জায়গার একটা টুকরো। হয় ফুসফুসের একটা টুকরো, তা না হয় হৃৎপিণ্ডের, না হয় মস্তিষ্কের, না হয় লিভার কিংবা রক্তের স্যাম্পল—বল তুমি কী চাও?"

নাসরীনের মনে হল হড়হড় করে সে বমি করে দেবে, কোনোমতে মুখ ঢেকে সে নিঃশব্দে বের হয়ে আসে। লাউঞ্জের একটা চেয়ারে সে কিছুক্ষণ নিজের মাথা চেপে বসে থাকে। যে মানুষটি এই বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিল সে তা হলে ঠিকই অনুমান করেছে যে বাচ্চাটাকে এরা মেরে ফেলবে। এ রকম ফুটফুটে বাচ্চাকে কেমন করে মানুষ মেরে ফেলতে পারে? কেমন করে তাকে শয়তানের বাচ্চা বলতে পারে?

নাসরীন হঠাৎ করে বুঝতে পারে তার হাতগুলো থরথর করে কাঁপছে। মানুষটি এই বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল, নাসরীনের কথা বিশ্বাস করে রেখে গেছে। নাসরীন যদি না বলত তা হলে মানুষটা এই বাচ্চাটাকে নিয়ে যেত, বাচ্চাটা বেঁচে যেত। তার কথা বিশ্বাস করে মানুষটা বাচ্চাটাকে নিয়ে থেকে গিয়েছিল। এই ছোট শিশুটাকে হত্যা করার জন্যে যদি একটা মানুষ দায়ী হয়ে থাকে তা হলে সেটা হচ্ছে সে নিজে। নাসরীন তার হাতের দিকে তাকায়, তার মনে হতে থাকে তার হাতে বুঝি ছোপ ছোপ রক্ত।

নাসরীন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, তার মুখ শক্ত হয়ে যায়। সে একজন ডাক্তার, মানুষকে বাঁচানোর জন্যে সে শপথ নিয়েছে, মানুষকে হত্যা করার জন্যে নয়। যেভাবে হোক তার বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে। নাসরীন লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার আই.সি. ইউনিটের দিকে উঁকি দিল, একটু আগেই বাচ্চাটা চিৎকার করে কাঁদছিল এখন নেতিয়ে ঘুমিয়ে আছে। নাসরীন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? বাচ্চাটা ঘুমুচ্ছে কেন?"

"ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছি। চিৎকার করে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছিল। ফুসফুসে কী জোর বাবারে বাবা।"

"ইনজেকশন? কীসের ইনজেকশন?"

"ঘুম। কিছুক্ষণ ঘুমাক শয়তানের বাচ্চা। আমরা একটু খেয়ে আসি।"

মানুষগুলো বের হওয়ার সাথে সাথে নাসরীনের হঠাৎ মনে হল বাচ্চাটাকে বাঁচানোর সে একটা সুযোগ পেয়েছে। দৈব সুযোগ। শুধু সে-ই পারবে বাচ্চাটাকে এখান থেকে বের করতে। সে বিছানার কাছে ছুটে গেল, বাচ্চাটার শরীরে লাগানো নানা ধরনের মনিটরগুলো খোলার আগে সে অ্যালার্মগুলো বিকল করে দিল। বাচ্চাটা পাখির পালকের মতো হালকা, একটা বালিশের ওয়াড় খুলে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে সে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়ে উপরে তার অ্যাপ্রনটা পরে নেয়। কেউ যদি সন্দেহ করে তাকে সার্চ করে শুধু তা হলেই বাচ্চাটাকে পাবে। নাসরীন আই. সি. ইউ. থেকে বের হয়ে করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে। লিফটের কাছে এসে বোতাম টিপে সে অপেক্ষা করে—নাসরীনের মনে হয় লিফটটা আসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝি কয়েক যুগ সময় লেগে যাচ্ছে। ছোট বাচ্চাকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ করে উঠে চিৎকার করে কাঁদা শুরু করার সম্ভাবনা নেই, তবু তার বুক ধক ধক করতে থাকে।

লিফট আসার পর ভেতর থেকে কয়েকজন বের হয়ে এল, নাসরীন তখন সাবধানে লিফটের এক কোনায় গিয়ে দাঁড়ায়। ভেতরে কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, ভাগ্যিস তাদের মাঝে পরিচিত কেউ নেই।

লিফটটা বিভিন্ন তলায় থামতে থামতে নিচে এসে দাঁড়াল। নাসরীন নিঃশব্দে নেমে আসে, গেটে কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। নাসরীন তাদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় বের হয়ে এল। বাচ্চাটাকে বের করে এখন কোলে নিতে হবে, তারপর একটা রিকশা কিংবা স্কুটারে করে যেতে হবে—কোথায় যেতে হবে সে এখনো জানে না।

ঠিক তখন নাসরীনের চোখ পড়ল হাসপাতালের গেটের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে থাকা মানুষটির দিকে। জহুর সেখানে চুপচাপ বসে আছে, কেন বসে আছে কে জানে। নাসরীন একটু এগিয়ে গেল, বলল, "আপনি?"

জহুর মাথা নাড়ল। ফিসফিস করে বলল, "মেরে ফেলেছে?"

নাসরীন মাথা নাড়ল, "না।"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মেয়েটা আমাকে বাচ্চাটার দায়িত্ব দিয়েছিল। আমি পারলাম না। আমার নিজের ভুলের জন্যে।"

"কী ভুল?"

"আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম—ভেবেছিলাম—"

নাসরীন একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আমি আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছি। আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছি।"

জহুরের একটু সময় লাগল কথাটা বুঝতে। যখন বুঝতে পারল তখন সে উঠে দাঁড়াল, খুব ধীরে ধীরে তার মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে, সে হাসতে অভ্যস্ত নয়, তার মুখে হাসিটাকে অত্যন্ত বেমানান মনে হয়। জহুর হাত বাড়িয়ে বলল, "কোথায়?"

নাসরীন হাতের পাশ থেকে ঝোলানো বালিশের ওয়াড়ে রাখা ছোট বাচ্চাটাকে বের করে দিল, বলল, "ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। এখন উঠবে না—আপনি যত দূর সম্ভব নিয়ে যান, দেরি করবেন না।"

"না দেরি করব না।" জহুর বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে নাসরীনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে কী বলবে সে বুঝতে পারছে না, অনুভূতির নরম কোমল কথাগুলো সে বলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সেটাই সে বলল, "আমি আসলে কী বলব বুঝতে পারছি না।"

নাসরীন বলল, "কিছু বলতে হবে না। আপনি যান। যত তাড়াতাড়ি পারেন যান।"

"আপনার হয়তো ঝামেলা হবে—"

"হলে হবে। আপনি যান।"

"যাচ্ছি।"

নাসরীন দেখল, জহুর বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে মানুষের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডক্টর সেলিমকে কেমন যেন উদভ্রান্তের মতো দেখায়, সে কাঁপা গলায় বলল, "তুমি কী করেছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি বাচ্চাটাকে সেই মানুষটার কাছে দিয়ে দিয়েছি।"

মনে হল ডক্টর সেলিম কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না, কয়েকবার তার ঠোঁট নড়ল, কোনো শব্দ বের হল না। একটু চেষ্টা করে বলল, "বাচ্চাটাকে দিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আপনারা যেন বাচ্চাটাকে খুন করে না ফেলেন সে জন্যে।"

"তুমি জান তুমি কী করেছ? তুমি জান?"

নাসরীন মাথা নাড়ল, বলল, "জানি। মানুষটা আমার কথা বিশ্বাস করে বাচ্চাটাকে রেখে গিয়েছিল, আমি তার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছি।"

ডক্টর সেলিম হঠাৎ উন্মাদের মতো চিৎকার করে নাসরীনের দিকে এগিয়ে এল, বলল, "আমি তোমাকে খুন করে ফেলব। খুন করে ফেলব।"

নাসরীন কষ্ট করে একটু হাসল, বলল, "করতে চাইলে করেন স্যার। কিন্তু সেই বাচ্চাটাকে খুন করতে পারবেন না।"

"বাচ্চা? কিসের বাচ্চা? ওইটা কি মানুষের বাচ্চা ছিল?"

"জি স্যার। মানুষের বাচ্চা ছিল।"

"না। এটা ছিল পাখির বাচ্চা—পাখি! মানুষের বাচ্চাকে খুন করা যায় না—কিন্তু পাখির বাচ্চাকে দরকার হলে—কেটেকুটে দেখা যায়। বুঝেছ?"

"না স্যার বুঝি নি!"

"শুনে রাখো মেয়ে। ঐ পাখির বাচ্চাটাকে আমি খুঁজে বের করব। করবই করব। আর তোমাকে—"

"আমাকে স্যার?"

"আমি দেখব তুমি কীভাবে তোমার ক্যারিয়ার তৈরি কর। এই দেশের মাটিতে তোমাকে আমি থাকতে দেব না।"

নাসরীন তার দুই হাত সামনে মেলে ধরে বলল, "দেখেন স্যার।"

"কী দেখব?"

"আমার হাত! পরিষ্কার। একটু আগে মনে হচ্ছিল এখানে ছোপ ছোপ রক্ত! এখন আর নাই। আমার ক্যারিয়ারের দরকার নাই স্যার, আমি মানুষের বাসায় বাসন ধুয়ে জীবন কাটিয়ে দেব। কিন্তু রাত্রে যখন ঘুমাতে যাব দেখব আমার হাত ধবধবে পরিষ্কার। সেখানে এক ফোঁটা রক্ত নাই।"

ডক্টর সেলিম চিৎকার করে বলল, "বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। এই হাসপাতালে আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।"

নাসরীন বলল, "আপনি আমার মুখ দেখবেন না স্যার। আর কোনো দিন দেখবেন না। তার মানে বুঝতে পারছেন তো?"

"কী মানে?"

"আপনার মুখটাও আমার আর কোনো দিন দেখতে হবে না!"

হাতে একটা কুপি বাতি নিয়ে আনোয়ারা ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল,

"ঘরের ভেতরে কে? জহুর নাকি?"

জহুর বলল, "হ্যাঁ। আনোয়ারা বুবু? তুমি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ জহুর। তুমি হঠাৎ করে কোথা থেকে এসেছ? সন্ধেবেলা দেখি তোমার ঘরে আলো, ভাবলাম কে আবার ঘরে বাতি দেয়। তোমাকে দেখব ভাবি নাই।"

"আমিও ভাবি নাই। বস আনোয়ারা বুবু। বসার কিছু নাই, মাটিতেই বস।"

জহুর বহুদিন পর নিজের ভিটেতে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে সন্ধেবেলা ঘরে আলো জ্বালিয়েছে। আলো দেখে তার পাশের বাড়ির আনোয়ারা দেখতে এসেছে। আনোয়ারার সাথে জহুরের কোনো রক্তের সম্পর্ক নাই কিন্তু তার নিজের বোনের মতো।

আনোয়ারা কুপি বাতিটা মাটিতে রেখে দাওয়ায় হেলান দিয়ে বসে। আবছা অন্ধকারে সে জহুরকে একটু দেখার চেষ্টা করে। বিড়বিড় করে বলে, "বাপ-দাদার ভিটার মাঝে শেয়াল-কুকুর দৌড়ায়, ব্যাপারটা ঠিক না জহুর। তোমার ভাবসাব দেখে মনে হয় দুনিয়ায় যেন কারো বউ মরে না। ঝি মরে না।"

জহুর কোনো উত্তর দিল না। আনোয়ারা বিড়বিড় করে বলল, "এখন একটা বিয়ে করে সংসারী হও। ছেলেমেয়ে থাকলে তারা মৃত্যুর পরে দোয়া করে। গোর আজাব মাফ হয়।"

জহুর নিচু গলায় হাসার মতো একটা শব্দ করে বলল, "আনোয়ারা বুবু তোমার শরীরটা কেমন?"

আনোয়ারা একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ করে বলল, "আমার আবার শরীর। এক পা কবরে এক পা মাটিতে। আজরাইল সবার দিকে নজর দেয়, আমার দিকে নজর দেয় না।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "না আনোয়ারা বুবু। আজরাইল এখন তোমার দিকে নজর দিলে হবে না। তোমার আরো কয় বৎসর বাঁচা লাগবে।"

"কেন? আমার বাঁচা লাগবে কেন?"

জহুর উঠে দাঁড়াল, ঘরের কোনায় মাদুরের ওপর শুইয়ে রাখা শিশুটাকে সাবধানে তুলে এনে আনোয়ারার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই বাচ্চাটাকে তোমার মানুষ করে দিতে হবে।"

আনোয়ারা বিস্ফারিত চোখে জহুরের দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, "এইটা কার বাচ্চা?"

"সেইটা অনেক লম্বা ইতিহাস আনোয়ারা বুবু।"

"এত ছোট বাচ্চা তুমি কোথায় পেয়েছ? বাবা কী করে? মা কী করে?"

"বাবা নাই, মা নাই। বাচ্চার মা'কে আমি নিজের হাতে কবর দিয়েছি।"

আনোয়ারা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই বাচ্চা দেখি পরীর মতন সুন্দর। ছেলে না মেয়ে?"

"ছেলে।"

"তুমি পুরুষ মানুষ এত ছোট বাচ্চা নিয়ে আসছ কেন? এতিমখানায় রেখে আসলে না কেন? কত বড়লোকের পরিবার বাচ্চা নেয়—"

জহুর বলল, "সেইটা অনেক বড় ইতিহাস। তুমি বাচ্চাটাকে কোলে নাও তা হলে বুঝতে পারবে।"

"তা হলে কী বুঝতে পারব?"

"আগে একবার কোলে নাও তো।"

আনোয়ারা হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে, "ইয়া মাবুদ! বাচ্চার কোনো ওজন নাই!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহুর মাথা নাড়ে, "নাই আনোয়ারা বুবু। এর কোনো ওজন নাই।"

"কেন? ওজন নাই কেন?" আনোয়ারা বিস্ময় এবং আতঙ্ক নিয়ে শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

"তুমি বাচ্চাটার কাপড় খুলো, খুলে দেখো। পিঠের দিকে দেখো।"

আনোয়ারা সাবধানে পেঁচানো কাপড়টা খুলে বাচ্চাটার পিঠের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে, "ইয়া মাবুদ! এ তো জিনের বাচ্চা—"

জহুর হাসার চেষ্টা করল, বলল, "না আনোয়ারা বুবু। এইটা জিনের বাচ্চা না—"

আনোয়ারা বাচ্চাটাকে দুই হাতে ধরে আতঙ্কে কাঁপতে থাকে, "জিনের বাচ্চা!"

জহুর হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে নিজে কোলে নিয়ে বলল, "না আনোয়ারা বুবু, এইটা জিনের বাচ্চা না। এইটা মানুষেরই বাচ্চা। আমার সামনে এই বাচ্চার জন্ম হয়েছে। বাচ্চার মা'কে আমি নিজের হাতে কবর দিয়েছি।"

আনোয়ারা তখনো থরথর করে কাঁপছে। জহুর হাসার চেষ্টা করে বলল, "ভয়ের কিছু নাই বুবু। এইটা মানুষের বাচ্চা। বাচ্চাটার পাখা আছে সেইটাই হচ্ছে বিপদ। শহরের ডাক্তার এই মাসুম বাচ্চাটাকে নিয়ে মেরে ফেলতে চায়। কেটেকুটে দেখতে চায়। অনেক কষ্টে উদ্ধার করে এনেছি আনোয়ারা বুবু।"

আনোয়ারা তখনো কোনো কথা বলল না, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। জহুর বলল, "আনোয়ারা বুবু জন্মের আগে থেকেই এই বাচ্চাটা বিপদে। যেই দেখে সেই তারে কেটেকুটে ফেলতে চায়। এর মা আমার হাত ধরে বলেছে একে বাঁচিয়ে রাখতে। সেই জন্যে চেষ্টা করছি!"

আনোয়ারা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এইটা আসলেই মানুষের বাচ্চা?"

"হ্যাঁ। শহরের মানুষজনের হাত থেকে অনেক কষ্ট করে বাঁচিয়ে এনেছি। এই চরে মানুষজন কম, এইখানে একে বড় করতে হবে। আনোয়ারা বুবু তুমি বাচ্চাটাকে একটু বড় করে দাও।"

আনোয়ারা আবার ভয়ে ভয়ে বাচ্চাটার দিকে তাকাল। বাচ্চাটা তখন হঠাৎ ফিক করে হেসে দেয়, দাঁতহীন মাঢ়ীর সেই হাসি দেখে খুব ধীরে ধীরে আনোয়ারার মুখেও হাসি ফুটে ওঠে। ফিসফিস করে বলল, "বাচ্চাটার হাসি কত সুন্দর।"

জহুর বলল, "শুধু হাসি না আনোয়ারা বুবু, এই বাচ্চার সবকিছু সুন্দর। শুধু একটা জিনিস সুন্দর না। সেইটা হচ্ছে কপাল।"

আনোয়ারা আবার হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নেয়, নিজের গালের সাথে তার গাল স্পর্শ করে বলল, "এই বাচ্চাটার কোনো নাম আছে?"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "আমি তাকে বুলবুলি ডাকি। বুলবুলি পাখির মতন শরীর সেই জন্যে নাম বুলবুল।"

"বুলবুল?"

"হ্যাঁ।"

আনোয়ারা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। বুলবুল নামটা সুন্দর। তোমার কী মনে হয় জহুর? এই বাচ্চা কি একদিন আকাশে উড়বে?"

"জানি না আনোয়ারা বুবু। আমি কিছুই জানি না।"

আনোয়ারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বুলবুল নামের পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বাচ্চাটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

দ্বিতীয় পর্ব

১

আনোয়ারা বলল, "সোজা হয়ে দাঁড়া দুষ্টু ছেলে। নড়বি না।"

বুলবুল সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। সে তার দুই হাত তুলে দুই দিকে ছড়িয়ে রেখেছে, আনোয়ারা পুরোনো কাপড় দিয়ে তার শরীরটাকে পেঁচিয়ে দিচ্ছে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আনোয়ারা পুরোনো কাপড় দিয়ে তার শরীরটা পেঁচিয়ে দেয়। বুলবুলের পিঠে পাখাগুলো বড় হয়ে উঠছে, সেটা যেন কেউ বুঝতে না পারে সে জন্যে কাপড় দিয়ে সেটা তার শরীরের সাথে পেঁচিয়ে রাখা হয়। কাপড় দিয়ে পাখাগুলো শরীরের সাথে পেঁচানোর পরও পিঠের দিকে খানিকটা উঁচু হয়ে থাকে দেখে মনে হয় একটা কুঁজ ঠেলে উঠেছে। আনোয়ারা বুলবুলকে একটা শার্ট পরিয়ে দিয়ে বলে, "মনে আছে তো সবকিছু?"

"আছে খালা।" বুলবুল অধৈর্য হয়ে বলল, "মনে থাকবে না কেন?"

আনোয়ারা বলল, "আমি জানি তোর মনে আছে। তারপরেও তোকে মনে করিয়ে দিই। কারো সাথে ঝগড়া করবি না, মারামারি করবি না। পানিতে নামবি না। গা থেকে শার্ট খুলবি না।"

"হ্যাঁ খালা, মনে আছে। ঝগড়া করবি না, মারামারি করবি না, পানিতে নামবি না, শার্ট খুলবি না!"

আনোয়ারা বলল, "তোর যে পাখা আছে সেইটা কেউ জানে না। জানলে বিপদ হবে।"

বুলবুলকে হঠাৎ একটু বিভ্রান্ত দেখায়। সেই ছোটবেলা থেকে বুলবুল জানে সে অন্য রকম। তার পাখা আছে—কিন্তু সেটা কাউকে বলা যাবে না। সেটা লুকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু কেন সেটা কাউকে বলা যাবে না, কেন সেটা লুকিয়ে রাখতে হবে সে জানে না। কখনো কাউকে জিজ্ঞেস করে নি। আজকে জিজ্ঞেস করল, "কেন খালা? আমার পিঠে পাখা আছে, সেটা কেন কাউকে বলা যাবে না?"

আনোয়ারা কী উত্তর দেবে বুঝতে পারে না। ইতস্তত করে বলল, "তুই কি আর কোনো মানুষের পিঠে পাখা দেখেছিস?'

"না। দেখি নাই।"

"তা হলে? যারাই দেখবে তোর পাখা আছে তারা অবাক হবে, তোকে নিয়ে টানাটানি করবে।"

"কেন টানাটানি করবে।"

"এইটা মানুষের নিয়ম। যেটা অন্য রকম সেইটা নিয়ে মানুষ টানাটানি করে।"

বুলবুল বলল, "ও।" ব্যাপারটা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল না কিন্তু সেটা নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইল না। বলল, "খালা। আমার খুব রাগ লাগে যখন সবাই আমাকে কুঁজা ডাকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ডাকুক।" আনোয়ারা বুলবুলির থুতনি ধরে আদর করে বলল, "আসলে কি তুই কুঁজা?"

"না।"

"তা হলে ডাকলে ডাকুক। তুই তাদের সাথে তর্ক করবি না।"

বুলবুল কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। আনোয়ারা আবার মনে করিয়ে দিল, "মনে থাকবে তো?"

"থাকবে।"

বুলবুলের অনেক কিছুই মনে রাখতে হয়। সে অন্য রকম সেটা সে কখনো ভুলতে পারে না। যতই দিন যাচ্ছে তার পাখাগুলো ততই বড় হয়ে উঠছে, কাপড় দিয়ে যখন পেঁচিয়ে রাখা হয় তখন তার কষ্ট হয়। কিন্তু সে অন্য রকম, তাই কষ্ট হলেও তাকে সেই কষ্ট সহ্য করতে হয়। মাঝে মাঝে বুলবুল ভাবে, সবাই এক রকম, সে অন্য রকম কেন? এই প্রশ্নটাও সে কাউকে করতে পারে না।

সকালবেলা নাশতা করে বুলবুল তার বই-খাতা আর শ্লেট নিয়ে স্কুলে রওনা হল। এই চরে মানুষজন খুব বেশি না, কাজেই এখানে কোনো স্কুল নাই। কিছুদিন আগে শহর থেকে কিছু লোকজন এসে সবাইকে ডেকে লেখাপড়া নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলে একটা স্কুল তৈরি করে দিয়ে গেছে। সেটা অবিশ্যি সত্যিকারের স্কুল না, এই স্কুলে চেয়ার টেবিল বেঞ্চ নাই, একটা মাটির ঘরে হোগলা পেতে সব বাচ্চারা বসে। মালবিকা নামে নাদুসনুদুস একটা মহিলা তাদের পড়তে শেখায়, যোগ-বিয়োগ করতে শেখায়। বাচ্চারা এই স্কুলে যেতে চায় না কিন্তু বুলবুল খুব আগ্রহ নিয়ে যায়। লেখাপড়া জিনিসটা কী সে খুব ভালো করে জানে না কিন্তু সেটা শিখতে তার খুব আগ্রহ।

বুলবুল তার বই-খাতা আর শ্লেট নিয়ে স্কুলে রওনা হল। মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে অনেক তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় কিন্তু বুলবুল সব সময় নদীর তীর দিয়ে হেঁটে যায়। একা একা হাঁটার সময় সে নিজের সাথে কথা বলে, ভারি ভালো লাগে তখন।

নদীর ধারে কমবয়সী কিছু ছেলেমেয়ে নদীর ঘোলা পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছিল, বুলবুলকে দেখে তারা চেঁচামেচি শুরু করল, দুএকজন গলা ফাটিয়ে ডাকল, "বুলবুল! এই বুলবুল!"

বুলবুল নদীর তীরে দাঁড়িয়ে বলল, "কী?"

"আয়, পানিতে আয়।"

বুলবুল মাথা নাড়ল, বলল, "নাহ্।"

"কেন না?"

"স্কুলে যাই!"

"তুই স্কুলে গিয়ে কী করবি? জজ ব্যারিস্টার হবি?"

বুলবুল কোনো কথা বলল না। পানিতে দাপাদাপি করতে করতে একজন বলল, "কুঁজা জজ। কুঁজা ব্যারিস্টার। কুঁজা বুলবুল!"

তখন সবগুলো বাচ্চা হি হি করে হাসতে হাসতে পানিতে দাপাদাপি করতে থাকে।

বুলবুল কিছুক্ষণ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আবার হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে শুনতে পায় বাচ্চাগুলো তাকে নিয়ে টিটকারি করছে। কুঁজা কুঁজা বলে চিৎকার করছে। বুলবুল বিড়বিড় করে নিজেকে বলল, "আমি কুঁজা না! আমি একদিন আমার এই পাখা দিয়ে আকাশে উড়ে যাব—কেউ তখন আমাকে খুঁজে পাবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুলে গিয়ে দেখে তখনো সবাই আসে নি। স্কুলের সামনে খোলা জায়গাটাতে সবাই হা-ডু-ডু খেলছে। একজন বুলবুলকে ডাকল, "এই কুঁজা বুলবুল! আয় হা-ডু-ডু খেলবি।"

বুলবুল রাজি হল না। তার শরীর পাখির পালকের মতো হালকা, সে কাউকে ধরে রাখতে পারে না। কাউকে জাপটে ধরলে তাকেসহ টেনে নিয়ে যায়। তা ছাড়া খালা তাকে বলেছে সে যেন কখনো কারো সাথে ধাক্কাধাক্কি না করে। তার যে রকম পাখা আছে সেটা কাউকে জানতে দেয়া যাবে না, ঠিক সে রকম তার শরীর যে পাখির পালকের মতো হালকা সেইটাও কাউকে জানতে দেয়া যাবে না।

বুলবুল স্কুলের সামনে পা ছড়িয়ে বসে খেলা দেখতে লাগল, তখন লিপি তার ছোট ভাইটাকে কোলে নিয়ে হাজির হল। বুলবুলের মতো লিপিরও খুব লেখাপড়া করার ইচ্ছা। তার ছোট ভাইকে দেখেশুনে রাখতে হয়, তারপরেও সে স্কুলে চলে আসে। লিপি বুলবুলের পাশে পা ছড়িয়ে বসে ছোট ভাইটাকে ছেড়ে দিল। ছোট ভাইটা ধুলোর মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ছোট ছোট পিঁপড়া খুঁজে বের করতে থাকে।

লিপি জিজ্ঞেস করল, "বুলবুল, তুই অঙ্কগুলো করেছিস?"

বুলবুল মাথা নাড়ল। স্কুলের সবাই তাকে কখনো না কখনো কুঁজা বুলবুল ডেকেছে— লিপি ছাড়া। লিপি তাকে কখনো কুঁজা বুলবুল ডাকে নি। সে জন্যে বুলবুল লিপিকে একটু পছন্দই করে।

লিপি বলল, "আমাকে অঙ্কগুলো দেখাবি?"

বুলবুল তার খাতা বের করে লিপিকে দেখাল। লিপি সেগুলো দেখে দেখে নিজের অঙ্কগুলো মিলিয়ে নেয়।

AMARBOI.COM

কিছুক্ষণের মাঝেই তাদের স্কুলের মালবিকা আপা এসে ঘরের তালা খুলে দিল। বুলবুল আর লিপি ভেতরে ঢুকে স্কুলঘরের জানালাটা খুলে দেয়। হোগলাপাতার মাদুরটা বিছিয়ে তাকের ওপর রাখা বইগুলো নামিয়ে আনতে থাকে। ততক্ষণ মাঠে খেলতে থাকা ছেলেগুলোও ক্লাসের ভেতরে এসে যার যার জায়গায় বসে গেছে। রোদে ছোটাছুটি করার কারণে একেকজন দরদর করে ঘামছে!

মালবিকা আপা ঘরের এক কোনায় দাঁড়িয়ে বলল, "সবাই এখন শান্ত হয়ে বস। আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করি।"

বাচ্চাগুলো শান্ত হওয়ার খুব একটা লক্ষণ দেখাল না। আপা খালি জায়গাগুলো দেখিয়ে বলল, "জলিল, মাহতাব আর কামরুল কই?"

একজন বলল, "কামরুল বাবার সাথে মাঠে কাম করে।"

আরেকজন বলল, "জলিলের জ্বর।"

বুলবুলের ভাসা ভাসাভাবে মনে পড়ল সে মাহতাবকে নদীর পানিতে দাপাদাপি করতে দেখেছে, কিন্তু সেটা নিয়ে সে নালিশ করল না।

আপা জিজ্ঞেস করল, "জলি আর আমিনা?"

লিপি বলল, "মনে হয় তারা লেখাপড়া করতে চায় না।"

আপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে সবাইকে বই খুলতে বলল। বাচ্চাগুলো বই খুলতে থাকে, প্রথমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার উপকারিতা নিয়ে একটা গল্প। তারপর লালপরী নীলপরী নিয়ে একটা কবিতা। কবিতার প্রথম চার লাইন মুখস্থ করতে দিয়ে আপা সবার অঙ্ক খাতাগুলো দেখতে শুরু করে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলবুল কবিতা মুখস্থ করতে করতে লালপরী নীলপরীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ফুটফুটে দুটি মেয়ে আকাশে উড়ছে, তাদের পেছনে প্রজাপতির পাখার মতো পাখা।

অঙ্ক খাতাগুলো বাচ্চাদের ফিরিয়ে দিয়ে আপা তাদের পড়া ধরতে শুরু করল। নখ কেন কাটতে হয়, খাবার আগে কেন হাত ধুতে হয়—এসব শেষ করে সবাইকে লালপরী নীলপরী কবিতার প্রথম চার লাইন জিজ্ঞেস করতে লাগল। সবারই মোটামুটি মুখস্থ হয়েছে তারপরেও একটা-দুইটা শব্দ তাদের বলে দিতে হল। শুধু বুলবুলকে কিছু বলে দিতে হল না, সে এক নিঃশ্বাসে পুরো চার লাইন কবিতা মুখস্থ বলে গেল।

আপা খুশি হয়ে বলল, "ভেরি গুড বুলবুল।"

দুষ্টু একটা মেয়ে ফিসফিস করে বলল, "কুঁজা মিয়া গুডি গুড।"

বুলবুল কথাটা শুনেও না শোনার ভান করে, লিপি তখন হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, "আপা।"

"বল লিপি।"

"পরী কি আসলেই আছে?"

আপা উত্তর দেয়ার আগেই সব ছেলেমেয়ে চিৎকার করে বলল, "আছে! আছে!"

আপা হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কেমন করে জান পরী আছে?"

একজন বলল, তার মা একদিন জোছনা রাতে বের হয়েছিল, তখন দেখেছে একটা গাছের ওপর থেকে পরী উড়ে নেমে এসেছে। আরেকজন সেই গল্পটা সমর্থন করে বলল, পূর্ণিমার রাতে একটা বড় দিঘিতে সব পরী গোসল করতে আসে। কাপড়গুলো দিঘির ঘাটে খুলে রেখে তারা ন্যাংটা হয়ে দিঘিতে গোসল করে। এই সময় দুষ্টু কয়েকটা ছেলে একজন আরেকজনের দিকে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকিয়ে হি হি করে হাসতে থাকে। মালবিকা আপা দেখেও না দেখার ভান করল।

লিপি জিজ্ঞেস করল, "পরীরা শুধু জোছনা রাতে আসে কেন?"

এর কোনো সদুত্তর ছিল না, একজন বলল, "আসলে পরীদের যখন খিদে লাগে তখন তারা জোছনার আলো খায়।"

বুলবুল এইবারে একটু আপত্তি করল। বলল, "জোছনা আবার কেমন করে খায়?"

যে বলেছে পরীরা জোছনার আলো খেয়ে বেঁচে থাকে সে গলা উঁচিয়ে বলল, তার নানি নিজের চোখে দেখেছে যে একদিন জোছনা রাতে অনেকগুলো পরী উঠানে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কপকপ করে জোছনা খাচ্ছে। এ রকম অকাট্য প্রমাণ দেয়ার পর সেটা অবিশ্বাস করবে কেমন করে? সবাই তখন মাথা নেড়ে সেটা মেনে নিল।

আরেকজন বলল, পরীদের চামড়া হয় খুব নরম, সূর্যের আলো লাগলে চামড়া পুড়ে যায় তাই তারা কখনো দিনের বেলা বের হয় না।

বুলবুল তখন মুখ শক্ত করে বলল, "তা হলে দিনের বেলা পরীরা কোথায় থাকে?"

"পরীদের দেশে।"

"সেইটা কোথায়?"

"আকাশের উপরে। অনেক দূরে।"

লিপি তখন হাত তুলে আবার জিজ্ঞেস করল, "আপা।"

"বল"।

"ছেলে পরী কি আছে?"

কেউ কিছু বলার আগেই বুলবুল বলল, "আছে।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলবুলের কাছে বসে থাকা একজন মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ আছে। ছেলে পরীদের বলে জিন। আগুন দিয়ে তৈরি, পায়ের পাতা থাকে উল্টা দিকে। সামনের দিকে হাঁটলে তারা পেছনের দিকে চলে যায়।"

বুলবুল বলল, "মোটেই না। ছেলে পরী ঠিক মেয়ে পরীর মতো। পিঠে পাখা থাকে। আর—"

"আর কী।"

"খুব হালকা।"

কয়েকজন মাথা নেড়ে আপত্তি করল, বলল, "মেয়ে পরীরা হয় খুব সুন্দর কিন্তু ছেলে পরীরা হয় ভয়ঙ্কর। রাক্ষসের মতো চেহারা আর তারা আগুন দিয়ে তৈরি। মুখে পচা মাংসের গন্ধ।"

কে কখন কাকে জিনে ধরতে দেখেছে সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায়, তখন মালবিকা হাত তুলে তাদের থামাল। বলল, "আসলে এগুলো হচ্ছে কল্পনা। পরী থাকুক আর নাই থাকুক তাতে কিছু আসে-যায় না। কল্পনা করলেই আছে। কল্পনায় সবকিছু থাকে।"

বুলবুল ভুরু কুঁচকে বলল, "আসলে পরী নাই?"

"না, বুলবুল। এগুলো সব কল্পনা। মেয়ে পরী ছেলে পরী কিছুই নাই।"

"কিছুই নাই?"

"না।"

বুলবুল মুখ শক্ত করে বলল, "আছে।"

"আছে?"

"হ্যাঁ আছে।"

মালবিকা বুলবুলের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে তুমি যদি বল আছে, তা হলে আছে।" মালবিকা এবারে গণিতের বইটা তুলে বলল, "পরীর গল্প হয়েছে, এখন চল সবাই মিলে আমরা নামতা শিখি। তিন-এর নামতা। আমার সাথে সাথে বল, তিন এক্কে তিন!"

সবাই সুর করে বলল, "তিন এক্কে তিন।"

"তিন দু গুণে ছয়।"

"তিন দু গুণে ছয়।"

স্কুলের শেষে বাচ্চাগুলো বাসার দিকে রওনা দেয়। লিপির ছোট ভাইটার খিদে লেগে গিয়েছে, তাই সে ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদতে শুরু করেছে। লিপি বাচ্চাটাকে কোল বদল করতে করতে তাড়াতাড়ি করে হাঁটার চেষ্টা করে। দুরন্ত ছেলেগুলো নদীর তীরে এসে ছুটতে ছুটতে কাপড় খুলতে খুলতে নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুলবুল তাদের দিকে এক ধরনের হিংসা নিয়ে তাকিয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। লিপি জিজ্ঞেস করল, "তুই যাবি না?"

"নাহ্!" তারপর হঠাৎ একেবারে অপ্রাসঙ্গিকভাবে জিজ্ঞেস করল, "লিপি তুই কি কোনো দিন পরী দেখেছিস?"

"না। তুই দেখেছিস?"

"আমি?" বুলবুল ইতস্তত করে বলল, "আমি—মানে ইয়ে—?" হঠাৎ করে থেমে গিয়ে লিপির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই পরী দেখতে চাস?'

"পরী?" লিপির মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন পড়ে, "আমি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ।"

"না বাবা রাত্রিবেলা আমার ভয় করে।"

"দিনের বেলা?"

লিপি অবাক হয়ে বলল, "দিনের বেলা? দিনের বেলা পরী দেখা যায়?"

"যায়।" বুলবুল গম্ভীর হয়ে বলল, "দেখা যায়।"

লিপি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "দেখব।"

"তুই যদি কাউকে না বলিস তা হলে তোকে দেখাব।"

লিপি বুলবুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই দেখাবি?" তারপর সে ফিক করে হেসে দিল।

বুলবুল কঠিন মুখ করে লিপির দিকে তাকাল, লিপি সেটা ভালো করে লক্ষ করল না। কোলে ছোট ভাইটা ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদছে, তাকে নিয়ে সে বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে।

২

বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে বুলবুল দেখল জহুর উঠানে একটা জলচৌকিতে বসে শরীরে তেল মাখছে। বুলবুল আনন্দে চিৎকার করে জহুরের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবা! তুমি এসেছ।"

"হ্যাঁ। এসেছি।"

"এত দেরি করেছ কেন?"

"কে বলেছে দেরি করেছি! মোটেই দেরি করি নাই। বলে গিয়েছিলাম দুই সপ্তাহের জন্যে যাব! ঠিক দুই সপ্তাহ পরে এসেছি।"

"দুই সপ্তাহ মানে জান? সাত দুগুণে চৌদ্দ দিন।"

"হ্যাঁ। বজরা নৌকা করে সুন্দরবনে ধানের চালানটা নিতে কত দিন লাগে তুই জানিস?"

বুলবুল জানে না এবং তার জানার খুব আগ্রহও নেই। সে জহুরের গলা জড়িয়ে ধরে রেখে বলল, "তুমি না থাকলে আমার ভালো লাগে না বাবা।"

"এই তো আছি আমি।" জহুর বুলবুলের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "তুই তোর খালাকে জ্বালাস নি তো?"

"না, বাবা।"

"ঠিকমতো থেকেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"লেখাপড়া করেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"সময়মতো বাড়ি এসেছিস?"

"হ্যাঁ।" বুলবুল একটু থেমে বলল, "কিন্তু বাবা—"

"কী?"

"আমার আর ভালো লাগে না।"

"কী ভালো লাগে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সব ছেলেমেয়ে আমাকে কেন কুঁজা ডাকে? আমি কি কুঁজা?"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বুলবুলকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "তুই কেন কুঁজা হবি?'

"তা হলে?'

"তোর পাখাগুলোকে যে ঢেকে রাখতে হয়। ঢেকে না রাখলে যে তোর বিপদ হয়ে যাবে!"

"কেন বিপদ হবে?"

জহুর আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সেটা তুই এখন বুঝবি না। আরেকটু বড় হয়ে নে, তখন তোকে বলব।"

বুলবুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বাবা।"

"কী?"

"আমার পাখাগুলো বেঁধে রাখলে এখন ব্যথা করে।"

"করারই তো কথা—আমাদের হাত-পা বেঁধে রাখলে ব্যথা করত না।"

"অনেক বড় হয়েছে পাখাগুলো। আমার কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"আমি যদি ইচ্ছা করি, তা হলে—"

"তা হলে কী বাবা?"

"তা হলে আমি এখন উড়তে পারব।"

জহুর মাথা ঘুরিয়ে বুলবুলের দিকে তাকাল। বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ বাবা সত্যি।"

"ঠিক আছে, আজকে রাতে তা হলে দেখব।"

বুলবুল চকচকে চোখে বলল, "ঠিক আছে বাবা।"

AMARBOI.COM

রাতের খাওয়ার পর সবাই ঘুমিয়ে গেলে জহুর বুলবুলের হাত ধরে বের হল। তখন রাত খুব বেশি হয় নি কিন্তু এই চর এলাকার মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে, সন্ধের পরই মনে হয় বুঝি নিশুতি রাত!

গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কুকুরগুলো প্রথম একটু ডাকাডাকি করে। যখন মানুষগুলোকে চিনতে পারে তখন আবার শান্ত হয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে পেছন পেছন হেঁটে খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে আসে।

গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে জহুর বুলবুলকে নিয়ে নদীর ঘাটে এসে তার নৌকাটাতে বসে। লগি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকাটাকে পানিতে ঠেলে দিয়ে সে বৈঠাটা হাতে নেয়। বুলবুল নৌকার মাঝখানে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে, আস্তে আস্তে বলল, "অনেক অন্ধকার বাবা!"

জহুর বলল, "এক্ষুনি চাঁদ উঠবে, তখন দেখিস আলো হয়ে যাবে।"

জহুরের কথা সত্যি প্রমাণ করার জন্যেই কি না কে জানে নদীর তীরে বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে ঠিক তখন একটা বড় চাঁদ ভেসে উঠল। চাঁদের নরম আলোতে চারদিকে একটা কোমল ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে ঝিঁঝি ডাকতে থাকে, একটা রাতজাগা পাখি কর্কশ গলায় ডাকতে ডাকতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

বুলবুল একটু এগিয়ে জহুরের কাছাকাছি এসে বসে জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি বাবা?"

"নূতন যে চরটা উঠেছে সেখানে।"

"সেখানে কেন বাবা?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেখানে তো কোনো মানুষ নাই সেই জন্যে। তা ছাড়া চরটা তো ধু-ধু ফাঁকা, তোর জন্যে মনে হয় সুবিধা হবে।"

বুলবুল একটু এগিয়ে জহুরের শরীরে হেলান দিয়ে বসে থাকে, বৈঠার নিয়মিত শব্দটার মাঝে মনে হয় একটা জাদুর মতো আছে, ধীরে ধীরে তার চোখে ঘুম নেমে আসছিল, তখন জহুর তাকে ডেকে তুলল, বলল, "ওঠ বাবা। আমরা এসে গেছি।"

বুলবুল জহুরের হাত ধরে চরে নেমে এল। এতক্ষণে চাঁদটা অনেক উপরে উঠেছে, বিস্তৃত চরটাতে জোছনায় নীলাভ একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। বুলবুল তার শরীর থেকে চাদরটা খুলে জহুরের হাতে দিয়ে তার পাখা দুটো একবার খুলে নেয়, আরেকবার বন্ধ করে নেয়। তারপর বড় করে খুলে নিয়ে একবার ঝাপটানি দেয়।

জহুর জিজ্ঞেস করল, "তুই কি আসলেই উড়তে পারবি?"

"মনে হয় পারব বাবা।"

"জোর করে চেষ্টা করিস না। যদি এখন না পারিস তা হলে থাক।"

বুলবুল কোনো কথা না বলে তার পাখা দুটো দুই পাশে ছড়িয়ে দেয়, তারপর মাথা নিচু করে সে ছুটতে শুরু করে, দেখে মনে হয় সে বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে কিন্তু সে পড়ে না। তার বড় বড় পাখা খুব ধীরে ধীরে ওপর থেকে নিচে নেমে আসতে থাকে এবং দেখতে দেখতে সে মাটি থেকে একটু উপরে উঠে যায়। বুলবুলের শরীরটা ধীরে ধীরে মাটির সাথে সমান্তরাল হয়ে যায়, পাখার ঝাপটানিটা দ্রুততর হয়ে ওঠে এবং বুলবুল দেখতে দেখতে উপরে উঠে যায়।

জহুর সবিস্ময়ে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, অতিকায় একটা পাখির মতো বুলবুল বাতাসে ভেসে উঠছে। জহুর বুলবুলের পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে বলে, "বেশি উপরে উঠিস না বাবা! বেশি উপরে উঠিস না!"

জহুরের কথার জন্যেই হোক কিংবা অভ্যাস নেই বলেই হয়তো বুলবুল আবার নিচে নেমে আসতে থাকে।

মাটির কাছাকাছি এসে বুলবুল তাল সামলাতে পারল না, হুমড়ি খেয়ে দুই পাখা ছড়িয়ে বালুর মাঝে পড়ে গেল। জহুর ছুটতে ছুটতে বুলবুলের কাছে গিয়ে তাকে ধরে ওঠানোর চেষ্টা করে বলল, "বাবা, ঠিক আছিস তুই?"

বুলবুল মাথা নাড়ল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "হ্যাঁ বাবা আমি ঠিক আছি।"

"কী সুন্দর তুই উড়েছিস দেখলি?"

"হ্যাঁ বাবা। আমি আসলেই উড়তে পারি। দেখেছ?"

"হ্যাঁ দেখেছি।"

বুলবুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি আবার একটু উড়ি বাবা?"

জোছনার আলোতে বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে জহুর বলল, "উড়বি? ওড়।"

বুলবুল তখন আবার তার দুটি পাখা দুই পাশে ছড়িয়ে দেয়, তারপর দুটি হাত বুকের কাছে নিয়ে আসে, মাথাটা একটু সামনে ঝুঁকিয়ে সে সামনের দিকে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে তার বিশাল পাখা দুটি ধীরে ধীরে ঝাপটাতে থাকে, দেখতে দেখতে বুলবুল উপরে উঠে যেতে থাকে। প্রথমবার বেশি উপরে ওঠে নি কিন্তু এবারে সে উপরে উঠতেই থাকে, জোছনার আলোতে বুলবুল তার পাখা দুটি বিস্তৃত করে অতিকায় একটা পাখির মতো আকাশে উঠে যেতে থাকে। জহুর কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে, ঠিক কী কারণ জানা নেই সে বুকের ভেতর একটা গভীর ব্যথা অনুভব করে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলবুল অনেক উপরে উঠে একটু ঘুরে যায়, তারপর ডানা দুটি মেলে আকাশে ভাসতে থাকে। মনে হয় পৃথিবীর সাথে তার বুঝি আর কোনো যোগাযোগ নেই, মাটি থেকে অনেক উপরে আকাশের কাছাকাছি মেঘের জগতে বুঝি সে তার নূতন আবাসস্থল খুঁজে পেয়েছে। জহুরের মনে হয় বুকে ধরে বড় করা তার এই খুঁজে পাওয়া সন্তানটি বুঝি আর কোনো দিন মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসবে না।

আকাশ থেকে বুলবুল যখন মাটিতে নেমে এল তখন চাঁদটা পশ্চিমে অনেকখানি হেলে পড়েছে। বুলবুল তার পাখা দুটো ভাঁজ করে গুটিয়ে নিয়ে জহুরের দিকে এগিয়ে এল। জহুর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, বুলবুলের সারা শরীর কুয়াশায় ভিজে গেছে। চাদর দিয়ে মাথাটা মুছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোর কষ্ট হয়েছে বাবা?"

"না বাবা, বেশি কষ্ট হয় নাই। উপরে ওঠার সময় একটু পরিশ্রম হয়, কিন্তু ভেসে থাকার সময় একটুও কষ্ট হয় না!"

"তোর পাখাগুলো ব্যথা করছে?"

"হ্যাঁ বাবা, পাখাগুলো একটু ব্যথা করছে।"

"কাল ভোরে আরো অনেক ব্যথা করবে দেখিস।"

"কেন বাবা?"

"কখনো কোনো দিন ব্যবহার করিস নি, হঠাৎ একবারে এতক্ষণ উড়ে বেড়ালে ব্যথা করবে না?"

"করলে করবে।"

"উড়তে কেমন লাগে বাবা?"

"খুব অদ্ভুত। তুমি জানো উপরে উঠে গেলে মনে হয় সবকিছু সমান হয়ে গেছে!"

জহুর নিঃশব্দে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু না বুঝেই এই ছোট শিশুটি কত বড় একটা কথা বলে ফেলেছে! জহুর বুলবুলের হাত ধরে বলল, "আয় বাড়ি যাই।"

"চল বাবা।"

নৌকায় উঠে লগি দিয়ে নৌকাটাকে নদীর মাঝে ঠেলে দিয়ে জহুর বলল, "বুলবুল।"

"হ্যাঁ বাবা।"

"তোকে একটা জিনিস বলি।"

"বল।"

"যদি তোর কখনো লুকিয়ে থাকতে হয় তা হলে তুই এসে এই চরের মাঝে লুকিয়ে থাকবি। ঠিক আছে?"

বুলবুল অবাক হয়ে বলল, "লুকিয়ে থাকতে হবে? লুকিয়ে থাকতে হবে কেন?"

"আমি বলছি না তোর লুকিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু যদি কখনো দরকার হয় তা হলে এই চরে এসে লুকিয়ে থাকবি। আমি পরে এসে তোকে খুঁজে বের করব। ঠিক আছে?"

বুলবুল মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।" তারপর সে তার বাবার কোলে মাথা রেখে নৌকার গলুইয়ে শুয়ে পড়ে। চাঁদটাকে দেখে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি এক পাশে খানিকটা ভেঙে দিয়েছে! কেমন করে চাঁদটা এভাবে ভেঙে যায় সেই কথাটি তার মাথার মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে, বাবাকে জিজ্ঞেস করলে হয়। কিন্তু হঠাৎ করে তার সারা শরীর ক্লান্তিতে অবশ হয়ে যায়। তার চোখ ভেঙে ঘুম নেমে আসে, কিছু বোঝার আগেই বুলবুল গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

AMARBOI.COM

ভোরবেলা আনোয়ারা এসে দেখে জহুর উঠানের মাঝখানে জলচৌকিতে চুপচাপ বসে আছে। আনোয়ারাকে দেখে বলল, "আস আনোয়ারা বুবু। বস।"

আনোয়ারা বলল, "বুলবুল আজকে স্কুলে গেল না?"

"না।" জহুর মাথা নাড়ে, "ঘুমাচ্ছে।"

"এখনো ঘুমাচ্ছে?"

"হ্যাঁ। কাল রাতে ঘুমাতে অনেক দেরি হয়েছে তো।"

"কেন? দেরি হয়েছে কেন?"

"নদীর মাঝখানে যে নূতন চরটা উঠেছে সেখানে গিয়েছিলাম।"

আনোয়ারা চোখ কপালে তুলে বলল, "এত রাত্রে? চরে?"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"কেন?"

"বুলবুল আকাশে উড়তে চাইছিল তাই নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"উড়তে? আকাশে উড়তে?"

"হ্যাঁ।"

"উড়েছে?"

"হ্যাঁ। কী সুন্দর আকাশে উড়ে গেল। বুবু তুমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ বুবু। সত্যি।"

"কী আশ্চর্য!"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? বুলবুলের তো জন্ম হয়েছে আকাশে উড়ার জন্যে! সে আকাশে উড়বে না?"

"তাই বলে একজন মানুষ পাখির মতো আকাশে উড়বে?"

"বুলবুল কি পুরোপুরি মানুষ?"

"মানুষ না?"

"না। পুরোপুরি মানুষ না। মানুষের পাখা থাকে না। মানুষের শরীর এত হালকা হয় না! মানুষ আকাশে ওড়ে না। বুলবুল হচ্ছে একসাথে মানুষ আর পাখি। আমি চেষ্টা করেছিলাম সে যখন ছোট ছিল তার পাখা দুটো কেটে ফেলতে। পারি নাই। এখন তো আর পারা যাবে না।"

আনোয়ারা চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ল। জহুর বলল, "আনোয়ারা বুবু, আমি তোমার সাথে একটু পরামর্শ করি।"

আনোয়ারা বলল, "আমার সাথে?"

"হ্যাঁ। বুলবুল গত রাত্রে আকাশে উড়েছে। এইটা ছিল তার প্রথম উড়া। সে আরো উড়বে। একশবার উড়বে, হাজারবার উড়বে। সে যত সময় মাটিতে থাকে তার চাইতে বেশি সময় সে আকাশে থাকবে। তার মানে কী জান?"

"কী?"

"আগে হোক, পরে হোক তাকে কেউ না কেউ দেখবে। তখন কী হবে?"

"হ্যাঁ। কী হবে?"

"তখন তাকে ধরার চেষ্টা করবে। যদি ধরতে পারে তা হলে নিয়ে যাবে। কাটাকুটি করবে, তা না হলে কোথাও বেচে দেবে। খাঁচার মাঝে ভরে রাখবে, মানুষ টিকেট কিনে দেখবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনোয়ারা শুকনো মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ আনোয়ারা বুবু, ব্যাপারটা চিন্তা করে আমি কাল রাতে ঘুমাতে পারি নাই।"

"তা হলে কী করবে?"

"আমি জানি না। খালি চেষ্টা করতে হবে ব্যাপারটা যেন কারো চোখে না পড়ে। কেউ যেন জানতে না পারে।"

বুলবুল যখন ঘুম থেকে উঠেছে তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। সে আরো ঘুমাত কিন্তু তার ঘুম ভেঙে গেল প্রচণ্ড ব্যথায়। দুই পাখা, পিঠ আর ঘাড়ে অসম্ভব ব্যথা। জহুর তাকে তার কোলে উপুড় করে শুইয়ে রসুনে ভেজানো গরম সরিষার তেল দিয়ে সারা শরীরে ডলে দিতে লাগল।

শরীরের ব্যথা নিয়ে সারাটি দিন বুলবুল আহা উহ্ করলেও সন্ধেবেলা সে জহুরের হাত ধরে লাজুক মুখে বলল, "বাবা!"

"কী?"

"আমার আবার আকাশে উড়ার ইচ্ছে করছে!"

জহুর চোখ কপালে তুলে বলল, "আকাশে উড়ার ইচ্ছে করছে?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"তোর না সারা শরীরে ব্যথা!"

বুলবুল তার পাখাগুলো একটু ছড়িয়ে আবার গুটিয়ে নিয়ে বলল, "ব্যথা কমে গেছে বাবা!"

জহুর কিছুক্ষণ বুলবুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে!"

রাত যখন গভীর হয়ে এল জহুর আবার বুলবুলকে নৌকা করে নিয়ে গেল জনমানবহীন সেই চরে। বুলবুল আবার পাখা ঝাপটিয়ে আকাশে উড়ে গেল—আগের দিন থেকেও অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসে!

এভাবেই শুরু হল। প্রতিরাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে গেছে তখন জহুর বুলবুলকে নৌকা করে নিয়ে গেছে চরে। পুবের আকাশ ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত বুলবুল আকাশে উড়েছে!

AMARBOI.COM

দুই সপ্তাহ পর জহুরের আবার ডাক পড়ল গম বোঝাই বড় একটা নৌকার মাঝি হয়ে সুন্দরবনের গহিনে যাবার জন্যে। জায়গাটা বিপজ্জনক, সবাই যেতে চায় না, তাই কেউ যখন যায় তাকে ভালো মজুরি দেয়া হয়। দুই সপ্তাহ পরিশ্রম করলে চার সপ্তাহ শুয়ে-বসে কাটিয়ে দেয়া যায়।

জহুর যখন বিদায় নিয়ে রওনা দিয়েছে তখন বুলবুল তার পেছনে পেছনে এসেছে। নদীর ঘাটে বুলবুল জহুরের হাত ধরে বলল, "বাবা।"

"বল।"

"এখন আমাকে চরে কে নিয়ে যাবে?"

"তোকে নেয়ার এখন কেউ নেই। আমি না আসা পর্যন্ত তোর আকাশে ওড়াউড়ি বন্ধ।"

"কিন্তু বাবা—"

"কোনো কিন্তু নেই।"

"আমার যদি খুব উড়ার ইচ্ছে করে?"

"ইচ্ছে করলেই হবে না। আমি না আসা পর্যন্ত উড়তে পারবি না।"

বুলবুল অনিচ্ছার ভঙ্গি করে বলল, "ঠিক আছে।"

৩

জহুরদের নৌকাটা চারদিন পর সুন্দরবনের ভেতরে পৌঁছাল। জোয়ারের সময় এটাকে নোঙর করে রেখে শুধু ভাটির সময় দক্ষিণে বেয়ে নেয়া হত। সুন্দরবনের গহিনে নিবিড় অরণ্য, রাত্রিবেলা ঘুমানোর সময় রীতিমতো ভয় করে। বন বিভাগ থেকে একজন আনসার দেয়া হয়েছে, সে একটা পুরোনো বন্দুক নিয়ে পাহারা দেয়। এই বন্দুকটি দিয়ে শেষবার কবে গুলি ছোড়া হয়েছে সেটা কেউ জানে না, বিপদের সময় এটা থেকে গুলি বের হবে কি না সেটা নিয়েও সবার মাঝেই সন্দেহ আছে।

গমের বোঝা নামিয়ে জহুর আর মাঝিমাল্লারা নৌকা নিয়ে আরো গভীরে ঢুকে যায়, বন বিভাগের কিছু গাছের গুঁড়ি তাদের নিয়ে যেতে হবে। জহুর আগে কখনো এত গভীরে আসে নি, এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে সে এই নির্জন অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। নদীর তীরে হরিণের দল পানি খেতে আসে, সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক-সেদিক দেখে চুকচুক করে একটু পানি খেয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ছন্দ তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে গহিন বনে অদৃশ্য হয়ে যায়। গাছের ডালে বানর-শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বানর-মায়েরা বসে থাকে। গাছের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে খেতে অকারণেই তারা তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। নদীর তীরে কাদায় কুমির মুখ হাঁ করে রোদ পোহায়। দেখে মনে হয় বুঝি ঢিলেঢালা প্রাণী কিন্তু মানুষের সাড়া পেলেই বিদ্যুৎগতিতে নদীর পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। গাছে হাজার হাজার পাখি কিচিরমিচির করে ডাকছে। জহুর সবকিছু এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দেখে।

নৌকায় যখন গাছের গুঁড়ি তোলা হচ্ছে তখন জহুর আনসার সদস্যটির সাথে বনের ভেতর হাঁটতে বের হল। মানুষটি কথা বলতে ভালবাসে, জহুর কথা বলে কম কিন্তু ধৈর্য ধরে শুনতে পারে, তাই দুজনের জুটিটি হল চমৎকার। আনসারের সদস্যটা বন্দুকটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "এই যে আমরা হাঁটছি, আপনি ভাবছেন আমাদের কেউ দেখছে না। আসলে এইটা সত্যি না। আমাদের কিন্তু দেখছে।"

"কে দেখছে?"

"কে আবার? মামা।"

জহুর এত দিনে জেনে গেছে সুন্দরবনের বাঘকে সম্মান করে মামা বলা হয়—বাঘকে নাম ধরে ডাকা নিয়ে একটা কুসংস্কার আছে।

সে মাথা নেড়ে বলল, "অ।"

"সব সময় আমাদের চোখে চোখে রাখে। নিঃশব্দে আমাদের পেছনে পেছনে হাঁটে।"

"এখনো হাঁটছে?"

"নিশ্চয়ই হাঁটছে। যাওয়ার সময় দেখবেন পায়ের ছাপ। আমাদের পেছনে পেছনে হেঁটে যাচ্ছে।"

জহুর জিজ্ঞেস করল, "আমাদের খেয়ে ফেলবে না তো?"

"নাহ্! বাঘ মানুষকে খায় না। জঙ্গলে এত মজার মজার খাবার আছে মানুষকে খাবে কেন? মানুষের শরীরে গোশত আর কতটুকু, সবই তো হাড্ডি।"

জহুর এভাবে কখনো চিন্তা করে দেখে নি—সে কোনো কথা বলল না। আনসার কমান্ডার বলল, "জঙ্গলে হাঁটার একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়ম মানতে হয় তা হলে মামা সমস্যা করে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী নিয়ম?"

"বাতাস। বাতাসের উল্টা দিকে হাঁটতে হয়। মামা তো অনেক দূর থেকে ঘ্রাণ পায় তাই মামা ভাবে আমরাও পাই! তাই বাতাসের উল্টা দিকে থাকে, যেন আমরা তাদের ঘ্রাণ না পাই!"

জহুর বলল, "অ।"

আনসার কমান্ডার তার বন্দুক হাতবদল করে বলল, "যারাই সুন্দরবনে আসে তারাই খালি মামা মামা করে। এই জঙ্গলে মামা ছাড়াও অনেক কিছু আছে। নানা রকম প্রাণী আছে। তাদেরকে কেউ দেখতে পায় না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। একরকম গুইসাপ আছে এক মানুষ লম্বা। সাপ আছে হাজারো কিসিমের। নদীতে কুমির কামট আর মাছ। গাছে বানর আর পাখি।"

জহুর বলল, "অ।"

"সমস্যা একটা। তাই মানুষ সুন্দরবনে থাকে না।"

"কী সমস্যা?"

"পানি। খাবার পানি নাই। লোনা পানি।"

"জঙ্গলে পুকুর কাটলেই পারে।"

"সেই পুকুরে কি আর মিষ্টি পানি পাওয়া যায়? সেই পানিও লোনা।"

জহুর বলল, "অ।"

"তবে জঙ্গলে মানুষ থাকে না সেই কথা পুরোপুরি ঠিক না।"

"থাকে নাকি?"

আনসার কমান্ডার বলল, "জঙ্গলের ভেতরে যাদের নাম নিতে নাই তারা তো থাকেই।"

"তারা কারা? ভূত?"

আনসার কমান্ডার বিরক্ত হয়ে বলল, "আহ্ হা! নাম কেন নিলেন?"

"ঠিক আছে আর নিব না।"

"শহরে তো হইচই গোলমাল, সেখানে তো আর তেনারা থাকতে পারেন না, সব জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন। অন্ধকার হলেই শুরু হয় তেনাদের খেলা।"

জহুর হাসি গোপন করে বলে, "অ।"

আনসার কমান্ডার বলল, "তয় আসল মানুষও দেখেছিলাম একজন। বিডিআর কমান্ডার ছিল। দুইটা মার্ডার করে জঙ্গলে চলে এসেছিল। পুলিশ যখন ধরেছে তখন এই লম্বা দাড়ি, দেখে মনে হয় জিন!"

জহুর বলল, "অ।"

"চোখ লাল, শরীরের চামড়া কয়লার মতো কালো।"

"লোনা পানি খেয়ে থাকত?"

"নাহ্। কমান্ডারের মাথায় বিশাল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি। পানির উপরে একটা প্লাস্টিক বিছিয়ে রাখত, সেইখানে যে পানি জমা হত সেইটায় লবণ নাই।"

"আর খাবার খাদ্য?"

আনসার কমান্ডার হা হা করে হেসে বলল, "সুন্দরবনে কি খাবার খাদ্যের অভাব আছে নাকি? গাছে কত ফলমূল কত মধু। বনমোরগ, হরিণ, মাছ!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেই বিডিআর কমান্ডার কি কাঁচা খেত?"

"নাহ্! বিশাল বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি! ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আগুন ধরাত।"

"সেইটা আবার কী?"

"চশমার কাচের মতন, ছোট জিনিস বড় দেখা যায়।"

"সেইটা দিয়ে আগুন ধরানো যায়?"

"হ্যাঁ। সূর্যের আলোতে ধরলেই আগুন জ্বলে।"

সূর্যের আলোতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরা হলে কেন আগুন ধরে সেটা জানার জন্যে জহুরের একটু কৌতূহল ছিল কিন্তু সে আর জিজ্ঞেস করল না।

ঠিক তখন গাছে একটু খচমচ করে শব্দ হল এবং জহুর দেখল বড় ঝাপড়া একটা গাছের ওপর থেকে বিশাল একটা পাখি হঠাৎ ডানা মেলে উড়ে যেতে শুরু করেছে।

আনসার কমান্ডার বলল, "কী আচানক ব্যাপার!"

জহুর জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"কত বড় পাখি দেখেছেন?"

"হ্যাঁ।" জহুর এক ধরনের কৌতূহল নিয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ আনসার কমান্ডার তার বন্দুকটা তুলে পাখির দিকে তাক করল। জহুর অবাক হয়ে বলল, "কী করেন?"

আনসার কমান্ডার কোনো কথা না বলে উড়ন্ত পাখিটার দিকে তার নিশানা ঠিক করতে থাকে। জহুর আবার জিজ্ঞেস করল, "কী করেন?"

ঠিক যখন ট্রিগার টান দেবে তখন জহুর খপ করে বন্দুকটা ধরে একটা হেঁচকা টান দিল। প্রচণ্ড গুলির শব্দে জঙ্গলটা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

আনসার কমান্ডার যেটুকু অবাক হল তার থেকে রাগ হল অনেক বেশি। চিৎকার করে বলল, "কী করলেন আপনি? কী করলেন?"

"পাখিটারে খামোখা গুলি করতে যাচ্ছিলেন—"

"আমার ইচ্ছা। আমি দরকার হলে পাখিরে গুলি করব, দরকার হলে পাখির বাবারে গুলি করব। আপনি কেন আমার হাতিয়ারে হাত দিবেন?"

জহুর মুখ শক্ত করে বলল, "কারণ কিছু নাই, খামোখা কেন আপনি পাখিটাকে মারবেন?"

আনসার কমান্ডার বুকে থাবা দিয়ে বলল, "আমার ইচ্ছা।"

জহুর শীতল গলায় বলল, "কমান্ডার সাহেব, আপনি যখন একা থাকবেন, তখন আপনার ইচ্ছে হলে পাখি কেন হাতিকেও মারতে পারেন। কিন্তু আমি যদি পাশে থাকি তা হলে খামোখা একটা পাখিকে মারতে দিব না।"

"কেন?"

জহুর উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কারণটা ঠিক জানি না।"

আনসার কমান্ডার অবাক হয়ে জহুরের দিকে তাকিয়ে রইল। জহুরের মনে হল সত্যিই কি সে কারণটা জানে না?

বুলবুল বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে। কিছুতেই তার চোখে ঘুম আসে না। সারা শরীরে কেমন যেন এক ধরনের অস্থির ভাব, সে কিছুতেই অস্থিরতার কারণটা বুঝতে পারছে না। যখন জহুর ছিল তখন সে প্রতি রাতে চরে গিয়ে আকাশে উড়েছে, জহুর চলে যাওয়ার পর সে উড়তে পারছে না, কিন্তু তার সারা শরীর উড়ার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে। তার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু ইচ্ছে করছে পাখা দুটি দুই পাশে মেলে দিয়ে ঝাপটাতে থাকে কিন্তু সে ঘরের ভেতরে এটা করতে পারছে না।

বুলবুল খানিকক্ষণ জোর করে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকার চেষ্টা করল, কিন্তু লাভ হল না। খানিকক্ষণ ছটফট করে সে শেষ পর্যন্ত উঠে বসল, তারপর সাবধানে বিছানা থেকে নেমে এল, পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে ছিটকানি খোলার চেষ্টা করল।

আনোয়ারা পাশের খাটেই শুয়ে ছিল, তার ঘুম খুব পাতলা, ছিটকানি খোলার শব্দ শুনেই সে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

"আমি খালা।"

আনোয়ারা উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, "তুই? এত রাতে ছিটকানি খুলে কোথায় যাস।"

বুলবুল বলল, "একটু বাইরে যাব খালা।"

"কেন? পেশাব করবি?'

"না খালা।"

"তা হলে?"

"ঘরের ভেতরে থাকতে পারছি না। একটু বাইরে গিয়ে পাখা ঝাপটাতে হবে খালা।'

আনোয়ারা কী বলবে বুঝতে পারল না। তার পাখা নেই, একজন মানুষের পাখা থাকলে তার কেমন লাগে, তাকে কী করতে হয়, সেটা সে জানে না। সেটা শুধু যে সে জানে না তা নয়, মনে হয় পৃথিবীর কেউই জানে না। তাই বুলবুল যে মাঝরাতে ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে গিয়ে পাখা ঝাপটাতে চাইছে সেটার পেছনে কোনো যুক্তি আছে কি নেই সেটা আনোয়ারা বুঝতে পারে না।

আনোয়ারা বলল, "বাবা বুলবুল, এত রাতে বাইরে বের হবি পাখা ঝাপটানোর জন্যে? যদি কেউ দেখে ফেলে?"

"দেখবে না খালা—" বুলবুল অনুনয় করে বলল, "সবাই এখন ঘুমাচ্ছে। তা ছাড়া বাইরে কুচকুচে অন্ধকার, কেউ দেখতে পাবে না।"

আনোয়ারা মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু! জহুর একশবার করে না করে গেছে সে না আসা পর্যন্ত তোকে যেন উড়তে না দিই!"

"আমি উড়ব না খালা! আমি শুধু পাখা ঝাপটাব!"

"একই কথা।"

"খালা আমাকে একটু বের হতে দাও। এই একটুখানি—"

আনোয়ারা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু তোকে আমি একা বের হতে দিব না। আমি আগে যাব, দেখব কেউ আছে কি না।"

বুলবুল খুব খুশি হয়ে রাজি হল, বলল, "ঠিক আছে।"

তখন সেই নিশুতি রাতে বুলবুলের হাত ধরে আনোয়ারা বের হল। উঠোনে উঁকি দিয়ে দেখল যখন কেউ নেই তখন বুলবুল দুই পাখা ছড়িয়ে দিয়ে সেগুলো ঝাপটাতে থাকে। আনোয়ারা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে—সে কি কখনো ভেবেছিল একজন মানুষের পাখির মতো পাখা হবে? সেই মানুষটিকে সে বুকে ধরে বড় করবে?

বার দুয়েক ডানা ঝাপটিয়ে বুলবুল থেমে যায়—আনোয়ারা বলল, "হয়েছে? এখন ভেতরে আয়।"

বুলবুল বলল, "হয় নি খালা। উঠোনটা কত ছোট দেখেছ? পাখাটা ভালো করে ছাড়াতেই পারছি না। সামনের মাঠটাতে একটু যাই?"

AMARBOI.COM

আনোয়ারা আঁতকে উঠে বলল, "না, বুলবুল না! সর্বনাশ!"

"একটুখানি! এই একটুখানি!"

"সর্বনাশ! কেউ দেখে ফেলবে।"

"কেউ দেখবে না খালা! দেখছ না কেউ নাই? সবাই ঘুমিয়ে আছে।"

"হঠাৎ করে কেউ চলে আসবে!"

"আসবে না খালা! আমি একবার যাব আর আসব।"

আনোয়ারা কিছু বলার আগেই বুলবুল দুই পা ছড়িয়ে উঠোন থেকে বের হয়ে সামনের মাঠে ছুটে যেতে থাকে। আনোয়ারা কাঠ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে বুলবুলের ফিরে আসার জন্যে।

অন্ধকারের মাঝে বুলবুলকে আবছা আবছাভাবে দেখা যায়। সে খোলা মাঠের উপর দিয়ে ডানা মেলে ছুটে যাচ্ছে—হঠাৎ হঠাৎ করে সে ডানা ঝাপটিয়ে একটু উপরে উঠে যাচ্ছে, আবার নেমে আসছে। দেখতে দেখতে বুলবুল মাঠের অন্যপাশে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। আনোয়ারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে এবং একসময় দেখতে পায় বুলবুল ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে আবার ফিরে আসছে। আনোয়ারার বুকের ভেতর পানি ফিরে আসে। বুলবুল কাছে আসতেই সে ফিসফিস করে ডেকে বলল, "আয় এখন! ভেতরে আয়। এক্ষুনি আয়।"

"আর একবার খালা। মাত্র একবার!"

"না।"

"মাত্র একবার। এই শেষ খালা—" বলে বুলবুল পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মাঠের অন্যপাশে ছুটে যেতে থাকে।

আনোয়ারা আবার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারে সে আবছা আবছা দেখতে পায় বুলবুল পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক একই সময় আনোয়ারা টর্চলাইটের আলোর একটা ঝলকানি এবং দুজন মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেল, সাথে সাথে আতঙ্কে তার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল।

আনোয়ারা তার উঠোনের আড়ালে সরে যায়—এখন বুলবুলকে দেখতে না পেলেই হল। সে বিড়বিড় করে বলল, "হে খোদা! হে দয়াময়—বুলবুলকে যেন এই মানুষগুলো দেখতে না পায়। বুলবুল ফিরে আসতে আসতে মানুষগুলো যেন চলে যায়। হে খোদা! হে পরওয়ারদিগার। হে রাহমানুর রাহিম।"

কিন্তু খোদা আনোয়ারার দোয়া শুনল না, কারণ হঠাৎ করে সে মানুষ দুজনের ভয়ার্ত গলার স্বর শুনতে পায়। একজন চমকে উঠে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "এইটা কী?"

দ্বিতীয় জন চাপা গলায় বলল, "হায় খোদা। সর্বনাশ।"

আনোয়ারা দেখল বুলবুল নিশ্চিন্ত মনে ছুটে আসছে। সে জানেও না সামনে অন্ধকারে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—তাদের হাতে একটা টর্চলাইট। মানুষগুলো ভীত এবং আতঙ্কিত। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী হচ্ছে ভীত এবং আতঙ্কিত মানুষ—তারা বুঝে হোক না বুঝে হোক ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে। মানুষগুলো কী করবে আনোয়ারা জানে না। সে এখন চিন্তাও করতে পারছে না।

আনোয়ারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং দেখতে পায় বুলবুল ছুটতে ছুটতে কাছাকাছি এসে হঠাৎ করে মানুষ দুজনকে দেখতে পায়। সাথে সাথে সে দাঁড়িয়ে গেল—অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, মানুষগুলো বোঝার চেষ্টা করছে। ঠিক তখন

মানুষগুলোর একজন টর্চলাইটটা জ্বালিয়ে দিল, তীব্র আলোতে বুলবুলের চোখ ধাঁধিয়ে যায়, সাথে সাথে সে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল! মানুষগুলো হতবাক হয়ে দেখল একজন শিশু পাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

"ইয়া মাবুদ! জিনের বাচ্চা!" বলে একজন মানুষ চিৎকার করে ওঠে।

"ধর! ধর জিনের বাচ্চাকে—" বলে হঠাৎ মানুষগুলো বুলবুলকে ধরার জন্যে ছুটে যেতে থাকে।

বুলবুল হঠাৎ করে যেন বিপদটা টের পেল, সাথে সাথে ঘুরে সে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করে। দুই পাখা সে দুই পাশে মেলে দেয়। বিশাল ডানা ছড়িয়ে সে ছুটতে থাকে, মানুষগুলো ঠিক যখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল তখন সে পাখা ঝাপটিয়ে উপরে উঠে গেল।

মানুষ দুজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পায় বুলবুল পাখা ঝাপটিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। তারা টর্চলাইটের আলোতে দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু ভালো করে কিছু দেখতে পেল না, দেখতে দেখতে বুলবুল টর্চলাইটের আলোর সীমানার বাইরে চলে গেল।

আনোয়ারা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখতে পায় মানুষ দুজনের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে আরো মানুষ লাঠিসোটা নিয়ে হাজির হচ্ছে। লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচি হইচই, দেখতে দেখতে সেখানে বিশাল একটা জটলা শুরু হয়ে গেল। তারা সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে থাকে। আনোয়ারা বুঝতে পারে তার শরীর থরথর করে কাঁপছে।

ভোর রাতে আনোয়ারা দেখল বুলবুল খুব সাবধানে বাসার পেছন দিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। তার চোখে–মুখে আতঙ্ক। আনোয়ারা ছুটে গিয়ে বুলবুলকে জাপটে ধরে বলল, "তুই কোন দিক দিয়ে এসেছিস?"

"পিছনের বড় গাছটার ওপর নেমে লুকিয়ে ছিলাম।"

"কেউ দেখে নাই তো?"

"না খালা।"

"তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে আয়।"

AMARBOI.COM

বুলবুল আনোয়ারার হাত ধরে ঘরে ঢুকল। আনোয়ারা শুকনো গামছা দিয়ে শরীরটা মুছতে মুছতে বলল, "কী সর্বনাশ হয়েছে দেখেছিস? তোকে দেখে ফেলেছে। এখন কী হবে?"

"মনে হয় চিনে নাই খালা, আমি তো মুখ ঢেকে রেখেছিলাম।"

"তুই কেমন করে জানিস চিনে নাই?"

"চিনলে এতক্ষণে সবাই বাড়িতে চলে আসত না?"

আনোয়ারা মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা ঠিক। কেউ বাড়িতে আসে নাই।"

"তারা চিনে নাই। খালি বলছিল জিনের বাচ্চা! জিনের বাচ্চা কেন বলছিল খালা?"

"তোর পাখা দেখে। মানুষের পিঠে কি পাখা থাকে?"

"খালা।"

"উঁ।"

"আমি কি আসলেই জিনের বাচ্চা?"

"ধুর বোকা, তুই কেন জিনের বাচ্চা হবি?"

"তা হলে আমার পাখা কেন আছে?"

"আমি এত কিছু বুঝি না, তুই ঘুমা।" আনোয়ারা একটু ভেবে বলল, "আর শোন।"

"কী খালা।"

"সকালবেলা ঘর থেকে বের হবি না। যদি দেখি লোকজন আসছে আমি তাদের আটকে রাখব, তুই পিছন দরজা দিয়ে বের হয়ে পালিয়ে যাবি।"

"ঠিক আছে খালা।"

আনোয়ারা হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "জহুর যখন আসবে, শুনে কী রাগ করবে!"

জহুর শুনে রাগ করল না, শুনে সে খুব ভয় পেল। ঘটনাটার কথা অবিশ্যি সে আনোয়ারার মুখে শোনে নি। ঘাটে নৌকা থেকে নেমে সে যখন মাত্র তীরে উঠেছে তখনই একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ জহুরকে বলল, "জহুর শুনেছ ঘটনা?"

"কী ঘটনা।"

"সদর থেকে আক্কাস আর জালাল আসছিল। রাত্রিবেলা। তোমার বাড়ির সামনে যে মাঠ সেই মাঠে জিন দেখেছে।"

"জিন?"

"হ্যাঁ। এই বড় বড় দাঁত, চোখের মাঝে আগুন। সাপের মতো লেজ।"

জহুর হাসি গোপন করে বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। সেই মাঝরাত্রে কী হইচই, লাঠিসোঁটা নিয়ে আমরা সবাই বের হয়েছিলাম।"

জহুর বলল, "জিনটাকে ধরেছ?"

"নাহ্ ধরা যায় নি।"

"কেন ধরা গেল না?"

"আকাশে উড়ে গেছে।"

হঠাৎ করে জহুর ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল, কিন্তু বাইরে সে সেটা প্রকাশ হতে দিল না। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, "উড়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে উড়ে গেল?"

"আমি তো নিজের চোখে দেখি নাই। আক্কাস আর জালাল দেখেছে। পাখা বের করে উড়ে চলে গেছে।"

জহুর নিঃশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, "পাখা?"

"হ্যাঁ। পাখা আছে। বড় বড় পাখির মতন পাখা।"

জহুর কিছু বলল না, কিন্তু তার বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ড ধক ধক করতে লাগল। মধ্যবয়স্ক মানুষটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার কী মনে হয় জান জহুর?"

"কী?"

"নবীগঞ্জের পীর সাহেবরে এনে এই চরে একটা খতম পড়ানো দরকার।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "হুঁ।"

খানিকটা সামনে এসে দেখল একটা ছোট জটলা, জহুর দাঁড়িয়ে যায় এবং শুনতে পায় সেখানেও জিনের বাচ্চাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তবে এখানে জিনের বাচ্চার বর্ণনা এত ভয়ঙ্কর নয়, গায়ের রং ধবধবে সাদা, শরীরে একটা সুতাও নেই, মাথায় ছোট ছোট দুইটা শিং। জহুর আরেকটু এগিয়ে যাওয়ার পর আরো একজনের সাথে দেখা হল, সেও জহুরকে

জিনের বাচ্চার গল্প শোনাল, তার ভাষ্য অনুযায়ী জিনের বাচ্চা চিকন গলায় একটা গান গাইছিল। আরবি ভাষার গান।

বাড়ি আসতে আসতে জহুর অনেকগুলো বর্ণনা শুনে এল, প্রত্যেকটা বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন, তবে সবার মাঝে একটা বিষয়ে মিল আছে। যে মূর্তিটি দেখা গেছে তার পাখির মতো বড় দুটি পাখা আছে এবং সে পাখা দুটি ঝাপটিয়ে আকাশে উড়ে গেছে।

বাড়ি এসে জহুর সোজাসুজি আনোয়ারার সাথে দেখা করল। আনোয়ারা ফিসফিস করে বলল, "খবর শুনেছ জহুর?"

জহুর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ। শুনেছি।"

আনোয়ারা গলা নামিয়ে বলল, 'কপাল ভালো কেউ চিনতে পারে নাই। চিনতে পারলে যে কী বিপদ হত!"

জহুর এদিক–সেদিক তাকিয়ে বলল, "চিনতে না পারলে কী হবে আনোয়ারা বুবু। বিপদ যেটা হবার সেটা কিন্তু হয়েছে।"

আনোয়ারা শুকনো মুখে বলল, "কী বিপদ?"

"চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে যে এইখানে কোনো একজন আকাশে ওড়ে। সেই খবর আস্তে আস্তে আরো দূরে যাবে। গ্রামের মানুষ ভাবছে এইটা জিনের বাচ্চা। কিন্তু যারা বুলবুলকে এত দিন ধরে খুঁজছে তারা ঠিকই বুঝবে এইটা জিনের বাচ্চা না। তারা তখন বুলবুলকে ধরে নিতে আসবে।"

"সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ। সর্বনাশ।"

"এখন কী হবে?"

"জানি না। সাবধান থাকতে হবে। খুব সাবধান। এই চরে বাইরের মানুষকে দেখলেই কিন্তু সাবধান।"

আনোয়ারা ভয়ার্ত মুখে দাওয়ায় বসে বলল, "জহুর।"

"বল আনোয়ারা বুবু।"

"তুমি বুলবুলকে একটু বুঝিয়ে বল কী হলে কী করতে হবে, একটু সাবধান করে দিও।"

"দিব।"

"আহারে। সোনা বাচ্চাটা আমার।" আনোয়ারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এত বড় পৃথিবী, কিন্তু তার শান্তিতে থাকার কোনো জায়গা নাই।"

৪

পরের কয়েক সপ্তাহ জহুর খুব দুশ্চিন্তায় কাটাল, যদিও কেউ তার মুখ দেখে সেটা বুঝতে পারল না, সে শান্তভাবে দৈনন্দিন কাজ করে যেতে লাগল। নৌকার মাঝি হিসেবে দূরে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়েছিল, জরুরি কাজ বলে খুবই লোভনীয় পারিশ্রমিক দেয়ার কথা কিন্তু জহুর চর ছেড়ে যেতে রাজি হল না, সে বাড়ির আশপাশে গৃহস্থালি কাজ করে সময় কাটিয়ে দিতে লাগল। জিনের বাচ্চাকে দেখার সেই ঘটনার কথাও ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যায়, একসময় মানুষ সেটার কথা ভুলে যায় এবং পুরো ব্যাপারটাকে অনেকেই আক্কাস এবং

AMARBOI.COM

জালালের একটা ঠাট্টা হিসেবে ধরে নেয়। মাসখানেক কেটে যাওয়ার পর জহুরও খুব ধীরে ধীরে খানিকটা দুশ্চিন্তামুক্ত হতে শুরু করে।

ঠিক এ রকম সময় খুব ভোরে চরের ঘাটে একটা স্পিডবোট এসে থামল এবং সেখান থেকে বেশ কয়েকজন মানুষ তীরে নেমে এল। সবার শেষে যে নেমে এল সে হচ্ছে ডক্টর সেলিম। সে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন শুকনো মানুষকে জিজ্ঞেস করল, "এইটা সেই চর?"

শুকনো মানুষটি বলল, "জি স্যার।"

"এইখানে পাখাওয়ালা বাচ্চাটাকে দেখা গেছে?"

"জি স্যার।"

"বাচ্চাটাকে খুঁজে বের করা হয়েছে?"

"জি স্যার। জহুর নামে একটা মানুষের বাচ্চা—"

"জহুর! হ্যাঁ জহুর, ঠিকই বলেছে—মানুষটার নাম ছিল জহুর। এই জহুরের কাছে বাচ্চাটা থাকে?"

"হ্যাঁ। জহুরকে বাবা ডাকে।"

"বাচ্চাটার পাখা—"

"পাখাটা ঢেকে রাখে মনে হয়। পিঠের দিকে উঁচু হয়ে থাকে, সবাই মনে করে কুঁজ। বাচ্চাকে কুঁজা বুলবুল ডাকে।"

ডক্টর সেলিমের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, মাথা নেড়ে বলে, "চমৎকার! আমার হাত থেকে পালাবে ভেবেছিলে? কোথায় পালাবে সোনার চাঁদ।"

"জি স্যার। এখন আর পালানোর কোনো উপায় নেই।"

ডক্টর সেলিম তার ছোট দলটাকে ডাকে, "শোনো তোমরা সবাই।"

মানুষগুলো ডক্টর সেলিমকে ঘিরে দাঁড়াল। ডক্টর সেলিম বলল, "এইটা খুবই ছোট একটা চর, মানুষজন বেশি নাই। আমরা যে এসেছি সেই খবরটা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে যাবে। খবর ছড়িয়ে গেলেই ঝামেলা, জহুর নামের মানুষটা অসম্ভব ডেঞ্জারাস। কোনো কিছুতে ঘাবড়ায় না—কাজেই সে যদি আমাদের খবর পায় তা হলে বিপদ হতে পারে। তাকে প্রথম আটকাও।"

ঘাড় মোটা একজন মানুষ বলল, "আটকাব।"

"শোনো—আগেরবার বাচ্চাটা আমার হাত ফসকে পালিয়ে গেছে। এইবার যেন কিছুতেই না পালায়। জহুরকে আটকাতে হবে। দরকার হলে গুলি কোরো—পুলিশকে আমি সামলাব।"

ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না।"

"জহুরকে আটকানোর পর খুঁজে বের করো ছেলেটা কোথায় আছে। ধরে নিয়ে আসো এই স্পিডবোটে, কেউ কিছু বোঝার আগে নিয়ে চলে যাব।"

ঘাড় মোটা মানুষটির সাথে সাথে আরো দুজন বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

ডক্টর সেলিম মুখ শক্ত করে বলল, "শোনো। বাচ্চাটাকে জীবন্ত ধরতে হবে। জীবন্ত। মনে থাকবে?"

"মনে থাকবে।"

"কিন্তু যদি তোমরা দেখো তাকে জীবন্ত ধরতে পারছ না, সে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তা হলে তাকে মৃত হলেও ধরতে হবে। বুঝেছ?"

"বুঝেছি। জীবিত অথবা মৃত।"

AMARBOI.COM

"না।" ডক্টর সেলিম মাথা নাড়ল, "জীবিত অথবা মৃত না। জীবিত এবং জীবিত। কিন্তু যদি দেখা যায় কোনোভাবেই তাকে জীবিত ধরা যাচ্ছে না, তা হলে মৃত। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"ঠিক আছে। কাজে লেগে যাও।"

জহুরকে চারজন মানুষ যখন আটক করল তখন সে তার আলকাতরার কৌটা নিয়ে নদীর ঘাটে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার নৌকাটা অনেক দিন থেকে মেরামত করা হয় নি, সে কয়েক দিন আগে টেনে তীরে তুলে এনেছে। এত দিনে সেটা শুকিয়ে গেছে, আজ আলকাতরা দিয়ে লেপ দেয়ার কথা। সে অবিশ্যি বাড়ি থেকে বের হতে পারল না, তার আগেই তাকে আটক করা হল। জহুর প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ করেই দেখল তার সামনে দুজন এবং পেছনে দুজন মানুষ। সে তার পিঠে একটা ধাতব নলের খোঁচা অনুভব করে, শুনতে পায় একজন বলছে, "যদি তুমি কোনো তেড়িবেড়ি করো তা হলে গুলি করে দেব।"

জহুর কীভাবে কীভাবে জানি বুঝে গেল মানুষটা দরকার হলে সত্যিই গুলি করে দেবে, তাই সে নড়ল না। সে হঠাৎ করে তার বুকের মাঝে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে, বুক আগলে সে যে শিশুটিকে বড় করেছে আজকে তার খুব বিপদের দিন। বাচ্চাটি পারবে নিজেকে রক্ষা করতে?

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা কী চাও?"

"তুমি খুব ভালো করে জান, আমরা কী চাই।"

"তোমরা কারা?"

পেছনের মানুষটি তার পেছনে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "তোমার বাবা।"

জহুর বলল, "অ।"

মানুষগুলো জহুরকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল, তারপর একজন জিজ্ঞেস করল, "চিড়িয়াটা কই?"

"বুলবুলের কথা জানতে চাইছ?"

"হ্যাঁ।"

"বুলবুল চিড়িয়া না। সে খুব ভালো একটা ছেলে। আমি তাকে বুকে ধরে মানুষ করেছি।"

মানুষটি হাতের রিভলবারটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তুমি বুকে ধরে মানুষ করেছ না 'ইয়েতে' ধরে মানুষ করেছ, আমরা সেটা জানতে চাই না। আমরা জানতে চাই সে কোথায়?"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে, আগে হোক পরে হোক তারা খোঁজ পেয়ে যাবেই বুলবুল কোথায়। এই রকম সময় সে স্কুলে থাকে। কিন্তু কথাটা সে সরাসরি বলতে চায় না। যদি একটু হইচই হয় একটু গোলাগুলি হয় বুলবুল সেটা শুনতে পেয়ে সতর্ক হতে পারবে। জহুর বলল, "আমি বলব না।"

ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "তুমি বলবে না? তোমার বাবায় বলবে।"

জহুর শীতল চোখে বলল, "ঠিক আছে। তুমি তা হলে আমার বাবাকেই জিজ্ঞেস করো।"

রিভলবার হাতের মানুষটা তার রিভলবারের বাঁট দিয়ে মাথায় মারতে যাচ্ছিল, ঘাড় মোটা মানুষটা তাকে থামাল, বলল, "আগেই মারপিট দরকার নেই। না বলে যাবে কোথায়, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে বাঁকা করতে হবে।"

 www.amarboi.com ~

ঠিক এ রকম সময় একজন মানুষ আনোয়ারাকে টেনে এনে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে বলল, "খবর পাওয়া গেছে।"

"পাওয়া গেছে?"

"হ্যাঁ।" মানুষটা বলল, "আমাদের চিড়িয়া স্কুলে গেছে।"

"চিড়িয়া আবার স্কুলেও পড়ে নাকি?"

"হ্যাঁ। চিড়িয়া লেখাপড়া শিখে জজ ব্যারিস্টার হবে।"

কথাটি যেন অত্যন্ত উঁচু দরের রসিকতা এ রকম ভান করে সবাই হা হা করে হাসতে থাকে। ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "হাসি থামা। এই মেয়েলোকটাকে বেঁধে রাখ। দুজন পাহারায় থাক—অন্যেরা আমার সাথে চল স্কুলে।"

রিভলবার হাতে মানুষটা বলল, "হ্যাঁ, দেরি হয়ে যাচ্ছে। স্যার অপেক্ষা করছেন।"

জহুর জিজ্ঞেস করল, "স্যারটা কে?"

ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "সেটা শুনে তুমি কী করবে?"

"ডক্টর সেলিম?"

হঠাৎ করে ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "চুপ কর। চুপ কর তুমি। তা না হলে খুন করে ফেলব।"

জহুর চুপ করে গেল। আনোয়ারা জহুরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এখন কী হবে জহুর?"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আল্লাহ যেটা ঠিক করে রেখেছে সেটাই হবে।"

ঠিক সেই সময় মালবিকা ছোট স্কুলঘরের তালা খুলে দিয়েছে এবং স্কুলের ছেলেমেয়েরা ভেতরে ঢুকে টানাটানি করে হোগলার মাদুরটা বিছিয়ে দিতে শুরু করেছে। কয়েকজন বইপত্র সামনে রাখতে শুরু করে দিল। লিপি তার ছোট ভাইটাকে মাটিতে বসিয়ে তখন জানালাটা খুলে দেয় এবং বাইরে তাকিয়ে উৎফুল্ল মুখে বলল, "স্কুলে সাহেবরা আসছে।"

যে প্রতিষ্ঠানটা এই স্কুলটি এখানে বসিয়েছে মাঝে মাঝে তাদের কর্মকর্তারা এটা দেখতে আসে, যখনই আসে তখনই তারা বাচ্চাদের জন্যে খাতাপত্র বা গুঁড়োদুধ নিয়ে আসে। কাজেই সাহেবরা স্কুল দেখতে আসছে। সেটা নিঃসন্দেহে সবার জন্যে একটা আনন্দ সংবাদ।

মালবিকা অবাক হয়ে বলল, "নাহ! আজকে তো কারো আসার কথা না!"

"আসছে আপা, এই দেখেন।"

মালবিকা জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল "আরে! মানুষগুলোর হাতে বন্দুক! ব্যাপার কী?"

একটা ছেলের চোখ আনন্দে চকচক করে ওঠে, "মনে হয় পাখি শিকার করতে এসেছে!"

"চল দেখি—" বলে কিছু বলার আগেই বাচ্চাগুলো দৌড়ে বের হয়ে যায়। মালবিকা তাদের থামানোর জন্যে একটু চেষ্টা করল কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, সবাই ছুটতে ছুটতে পাখিশিকারি দেখতে বের হয়ে গেছে। মালবিকা বাচ্চাগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্যে পেছনে পেছনে বের হয়ে গেল।

লিপির পাশে দাঁড়িয়ে বুলবুল বাইরে তাকাল এবং হঠাৎ করে তার বুকটা ধক করে ওঠে। কেউ বলে দেয় নি কিন্তু হঠাৎ করে সে বুঝে গেল এই মানুষগুলো আসলে তাকেই ধরতে আসছে। জহুর কয়েক দিন থেকে তাকে এই বিষয়টা নিয়েই সতর্ক করে আসছিল।

বুলবুল নিচু গলায় লিপিকে বলল, "এই মানুষগুলো পাখি শিকার করতে আসে নাই।"

লিপি জিজ্ঞেস করল, "তা হলে কী শিকার করতে এসেছে?"

"আমাকে।"

"তোকে?" লিপি অবাক হয়ে বলল, "তোকে কেন?"

বুলবুল লিপির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "লিপি! তুই একটা কাজ করতে পারবি?"

"কী কাজ?"

বুলবুল তার শার্টটা ততক্ষণে খুলে ফেলেছে, লিপি অবাক হয়ে দেখল শার্টের নিচে কাপড় দিয়ে তার শরীরটা পেঁচানো—পেছনের দিকে খানিকটা উঁচু হয়ে আছে। বুলবুল বলল, "আমার এই কাপড়টা খুলে দিবি? তাড়াতাড়ি?"

"কেন? কাপড় দিয়ে বেঁধে রেখেছিস কেন?"

"আগে খুলে দে তা হলেই বুঝবি—"

লিপি কাপড়ের বাঁধন ঢিলে করতেই বুলবুল ঘুরে ঘুরে পেঁচানো কাপড় খুলতে থাকে এবং দেখতে দেখতে তার পেছনের পাখা বের হয়ে আসে। লিপি ফ্যালফ্যাল করে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, অনেক কষ্ট করে বলে, "তুই—তুই—"

"হ্যাঁ। লিপি তোকে বলেছিলাম না ছেলে পরীর কথা? আমি ছেলে পরী—"

লিপি আবার বলল, "তুই তুই তুই—"

"হ্যাঁ আমি। ঐ মানুষগুলো আমাকে ধরতে আসছে।"

"তোর পাখা আছে? আসলে তুই কুঁজা না?"

"না আমি কুঁজা না। আমার পাখা আছে।"

"তুই উড়তে পারিস?"

"হ্যাঁ আমি উড়তে পারি। ঐ মানুষগুলো যখন আমাকে ধরতে আসবে তখন আমি উড়ে যাব।"

AMARBOI.COM

"সত্যি?"

"উড়ে কোথায় যাবি।"

"জানি না।"

"আর কোনো দিন আসবি না?"

বুলবুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কেমন করে আসব? এখন তো সবাই জেনে যাবে আমি আসলে মানুষ না।" হঠাৎ করে বুলবুলের মুখটাকে করুণ এবং বিষণ্ন মনে হয়।

লিপি কিছুক্ষণ বুলবুলের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, "তুই তা হলে কী?"

"আমি জানি না। আমি যদি মানুষ হতাম তা হলে কি কেউ কোনো দিন আমাকে ধরে নিতে আসত?"

লিপি অবাক হয়ে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, আস্তে করে তার পাখায় হাত বুলিয়ে বিস্ময়ের গলায় বলল, "কী সুন্দর!"

"সুন্দর?"

"হ্যাঁ। সুন্দর।" লিপি আস্তে আস্তে বলল, "তুই আগে কেন কোনো দিন আমাকে বললি না?"

"যদি সবাই জেনে যেত?"

লিপি মাথা নেড়ে বলল, "আমি কাউকে বলতাম না।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

বুলবুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি বুঝি নাই। যদি বুঝতাম তা হলে বলতাম।"

লিপি আবার মাথা নাড়ল, বলল, "বলতাম না। কাউকে বলতাম না।"

বুলবুল জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে বলল, "মানুষগুলো এসে গেছে।"

"হ্যাঁ।"

"আমি এবারে জানালা দিয়ে বাইরে যাব। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

জানালাটা অনেক উপরে, বুলবুল হাত দিয়ে ধরে যখন ওঠার চেষ্টা করল তখন লিপি তাকে ধাক্কা দিয়ে সাহায্য করল। সে অবাক হয়ে দেখল বুলবুলের শরীরটা পাখির পালকের মতো হালকা।

বুলবুল জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ার সাথে সাথে মানুষগুলো ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। ঘাড় মোটা মানুষটা বলল, "কোথায়? বুলবুল কোথায়?"

লিপি কথার কোনো উত্তর দিল না। তার ছোট ভাইটাকে মাটি থেকে কোলে তুলে নিল। মানুষটা তখন ধমক দিয়ে বলল, "কোথায়?"

লিপি বলল, "নাই।"

"নাই মানে? কোথায় গেছে?"

"আমি জানি না।"

মানুষগুলো অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে লিপির দিকে তাকিয়ে থাকে। একজন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, তারপরেই চিৎকার করে বলল, "বাইরে! বাইরে! কুইক।"

সবাই বাইরে ছুটে যায় এবং সেখানে তারা একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখতে পায়। মাঠের মাঝখানে বুলবুল খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার পেছন থেকে পাখির ডানার মতো দুটি ডানা বের হয়ে এসেছে। বুলবুলের চেহারায় এক ধরনের বিষণ্নতার ছাপ, সে যেন অনেকটা অন্যমনস্কভাবে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষগুলো তাদের বন্দুক উদ্যত করে বুলবুলকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল, বুলবুলকে সেটা নিয়ে খুব চিন্তিত মনে হল না।

মানুষগুলো যখন আরেকটু এগিয়ে আসে তখন বুলবুল হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হয়ে উপরে লাফ দেয় এবং প্রায় সাথে সাথে তার পাখা দুটি ঝাপটা দিয়ে ওঠে।

ভাইকে কোলে নিয়ে লিপি, তার স্কুলের বন্ধুরা, মালবিকা এবং বন্দুক হাতের মানুষগুলো অবাক হয়ে দেখল বিশাল একটা পাখির মতো বুলবুল আকাশে উড়ে যাচ্ছে!

মোটা ঘাড়ের মানুষটা চিৎকার করে বলল, "ধর! ধর!"

তার কথা শুনে মানুষগুলো লাফিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করে কিন্তু ততক্ষণে বুলবুল অনেক উপরে উঠে গেছে। মোটা ঘাড়ের মানুষটা চিৎকার করে বলল, "গুলি কর! গুলি!"

বন্দুক হাতের মানুষটা বন্দুকটা তুলে বুলবুলের দিকে তাক করে। ঠিক যখন সে ট্রিগারটা টেনে ধরবে তখন কোথা থেকে জানি লিপি ছুটে এসে বন্দুক হাতের মানুষটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। প্রচণ্ড গুলির শব্দে পুরো এলাকাটা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে কিন্তু অল্পের জন্যে গুলিটা বুলবুলের গায়ে না লেগে ফস্কে গেল।

একসাথে কয়েকজন এসে লিপিকে ধরে টেনে ছুড়ে ফেলে দেয়, ছোট ভাইটা কোল থেকে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। বন্দুক হাতের মানুষটা আবার আকাশের দিকে তার বন্দুকটা তাক করল তখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা স্কুলের ছেলেগুলো এসে সেই

মানুষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, দ্বিতীয় গুলিটাও তাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ততক্ষণে বুলবুল অনেক দূরে সরে গেছে।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে, পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বিশাল একটা পাখির মতো বুলবুল উড়ে যাচ্ছে। ভোরের সূর্যের আলো পড়ে তার পাখা দুটো চিকচিক করছে।

জহুরের সামনে ডক্টর সেলিম কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড ক্রোধে তার মুখটা খানিকটা বিকৃত হয়ে আছে। সে মাটিতে পা দাপিয়ে বলল, "কোথায় গেছে? বল কোথায় গেছে?"

জহুর খুব বেশি হাসে না। এবারে সে মুখে জোর করে একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আপনার ধারণা আমি আপনাকে বলব সে কোথায় গেছে?"

ডক্টর সেলিম চোখ লাল করে বলল, "তোমাকে আমি খুন করে ফেলব।"

জহুর কষ্ট করে মুখে হাসি ধরে রেখে বলল, "বরং সেইটাই করে ফেলেন! আপনার জন্যে সেইটা কঠিন না, তিন সপ্তাহের বাচ্চাকে যে খুন করতে পারে আমার মতো বুড়া হাবড়াকে খুন করতে তার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না!"

"তুমি ভাবছ আমি মশকরা করছি?'

"না। আমি সেটা ভাবছি না। তবে—"

"তবে কী?"

"চরের মানুষেরা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস। আমাকে খুন করতে চাইলে আরো মানুষের ভিড় হওয়ার আগে করে ফেলেন। তারপর তাড়াতাড়ি পালান। তা না হলে এই চরের মানুষেরা কিন্তু আপনাদের সবাইকে চরের বালুর মাঝে পুঁতে ফেলতে পারে। বাইরের মানুষ খবরও পাবে না।"

ডক্টর সেলিম হঠাৎ করে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে চোখের কোনা দিয়ে তাকায়, সত্যি সত্যি পাথরের মতো মুখ করে মানুষজন একটু দূরে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ডক্টর সেলিম আবার জহুরের দিকে তাকাল, তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "তুমি আমার প্রাইজটা নিয়ে একবার পালিয়েছ! আমার দশ বছর লেগেছে তোমাকে খুঁজে বের করতে! আমি আবার তোমাকে আর তোমার চিড়িয়াকে খুঁজে বের করব।"

"আরো দশ বছর পর?" জহুর আবারো সত্যি সত্যি হেসে ফেলল, বলল, "দশ বছরে আমার ছোট বুলবুল একটা জওয়ান মানুষ হবে। তখন আমাকে আর তাকে দেখে রাখতে হবে না, আমার বুলবুল নিজেই তোমার ঘাড়টা কটাস করে ভেঙে দেবে।"

ডক্টর সেলিম বিস্ফারিত চোখে জহুরের দিকে তাকিয়ে রইল। পাশে দাঁড়ানো মোটা ঘাড়ের মানুষটা রিভলবারের বাঁট উঁচু করে জহুরের মাথায় মারার জন্যে এগিয়ে আসছিল, ডক্টর সেলিম তাকে থামাল। নিচু গলায় বলল, "এখন ঝামেলা কোরো না। ঘাটে চলো।"

নদীর ঘাটে পৌঁছানোর আগেই তারা দেখতে পায় তাদের স্পিডবোটটি দাউদাউ করে জ্বলছে। কিছু মানুষ তাদের বোটটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, পেট্রলের ট্যাঙ্কটা তাদের চোখের সামনেই সশব্দে ফেটে গেল। মাথা ঘুরিয়ে তারা তীরের দিকে তাকাল, দেখল চরের মানুষজন আস্তে আস্তে ঘাটের দিকে আসছে। সবার সামনে হালকা পাতলা ছোট একটা মেয়ে, কোলে ছোট একটা বাচ্চা।

অনেক দূর থেকেই ডক্টর সেলিম ছোট মেয়েটির চোখের প্রবল ঘৃণাটুকু বুঝতে পারে। সে ঘুরে কাঁপা গলায় বলল, "বন্দুকে গুলি আছে তো?"

"আছে।"

"কতগুলো।"

"যথেষ্ট।"

ডক্টর সেলিম দরদর করে ঘামতে থাকে, সে ঠিক বুঝতে পারছিল না ঠিক কতগুলো গুলি হলে সেটাকে যথেষ্ট বলা যাবে।

৫

নৌকাটাকে টেনে উপরে তুলে জহুর চাঁদের আলোতে তীরে উঠে এল। চাপা গলায় ডাকল, "বুলবুল!"

নির্জন চরে তার গলার স্বর অনেক দূর পর্যন্ত ভেসে যায়। কোনো উত্তর না পেয়ে সে আবার ডাকল, এবার আরেকটু গলা উঁচিয়ে, "বুলবুল!"

একটু দূরে বড় একটা ঝাপড়া গাছের ওপর কিছু একটা নড়ে ওঠে, সেখান থেকে অতিকায় একটা পাখির মতো ভেসে ভেসে বুলবুল নামতে থাকে, জহুরের মাথার ওপর দুই পাক ঘুরে সে নিচে নেমে আসে। তারপর ছুটে জহুরের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "বাবা! এসেছ?"

"হ্যাঁ বাবা। এসেছি।"

"এত দেরি করলে কেন?"

"দেরি করি নাই বাবা। আমি এর আগে আসতে পারতাম না। তোকে নিয়ে কত হইচই হয়েছে জানিস? শহর থেকে কত সাংবাদিক এসেছে। টেলিভিশন ক্যামেরা এসেছে। সবাই আমাকে চোখে চোখে রাখছে। তাই আমি ঘর থেকে বের হই নাই। বলেছি তুই কোথায় গেছিস আমি জানি না। যখন সবার উত্তেজনা কমেছে, সবাই চলে গেছে তখন এসেছি।"

"ঐ খারাপ লোকগুলোর কী হয়েছে বাবা?"

জহুর একটু হাসার ভঙ্গি করল, বলল, "গ্রামের মানুষগুলো ধরে যা পিটুনি দিয়েছে সেটা বলার মতো না। স্পিডবোট জ্বালিয়ে দিয়েছে। লিডার কে ছিল জানিস?"

"কে বাবা?"

"তোদের স্কুলের মেয়ে লিপি! এইটুকুন মেয়ে তার কী সাহস! রিভলবার বন্দুক নিয়েও কেউ পালাতে পারে নাই! মনে হয় দুই-চার জনের হাত-পাও ভেঙেছে।" জহুর সুর পাল্টে বলল, "যাই হোক, তোর কোনো সমস্যা হয় নাই তো?"

"না বাবা।"

"আমি তোর জন্যে পানি, শুকনা চিঁড়া আর গুড় রেখে গিয়েছিলাম।"

"জানি বাবা। আমি খুঁজে খুঁজে বের করেছি।"

বুলবুল হেসে যোগ করল, "গুড়ের মাঝে পিঁপড়া ধরেছিল, এ ছাড়া কোনো সমস্যা হয় নাই।"

"কত দিন তুই ভালো করে খাস নাই! আনোয়ারা বুবু তোর জন্যে রান্না করে দিয়েছে। আয় খাবি। খুব খিদে পেয়েছে তাই না?"

"না বাবা খিদে পায় পাই। আমি উড়ে উড়ে গাছের ওপর থেকে ফল ফুল খেতে পারি। পেট ভরে যায়।"

"তা হলে তো ভালো।"

"হ্যাঁ বাবা, তুমি বলেছিলে মনে নাই? আমার একা একা থাকা অভ্যাস করতে হবে। আমি অভ্যাস করেছি।"

জহুর খুব সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলল, "অভ্যাস হচ্ছে?"

"হ্যাঁ বাবা। হচ্ছে।"

"থাকতে পারবি?"

"পারব।"

জহুর বুলবুলকে গভীর মমতায় নিজের কাছে টেনে আনে। মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলে, "বাবা বুলবুল! আমি মানুষকে বিশ্বাস করতে পারি না! তোদের স্কুলের লিপির মতো ছোট মেয়ে আছে যে খুব সহজে তোকে মেনে নেবে। আবার শহরের অনেক বড় বড় অনেক বিখ্যাত, অনেক ক্ষমতাবান মানুষ আছে যারা মেনে নেবে না, যারা তোকে পেলেই ধরে খাঁচায় বন্দি করবে, কেটেকুটে দেখবে। বিদেশে বিক্রি করে দেবে। সেই জন্যে আমি তোকে মানুষের সামনে নিতে চাই না।"

"আমি জানি বাবা। তুমি আমাকে বলেছ।"

জহুর বুলবুলের মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, "আমি অনেক চিন্তা করেছি বাবা। তোর পাখাগুলো যদি কেটে ফেলা হতো—"

বুলবুল মাথা নাড়ল, বলল, "না বাবা! আমি পাখা কেটে মানুষ হতে চাই না বাবা। আমি পাখা নিয়ে পাখি থাকতে চাই।"

জহুর মাথা নাড়ল, বলল, "আমি সেটা বুঝতে পেরেছি। সেই জন্যেই বলেছি, মানুষের মাঝে তোকে রাখা যাবে না। কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে পাখাগুলো আর কত দিন ঢেকে রাখব?"

"হ্যাঁ বাবা, আমার খুব কষ্ট হতো। এখন আমার কোনো কষ্ট হয় না। আমি যখন আকাশে উড়ি আমার কী যে ভালো লাগে!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ বাবা। আমার যখন পাখায় আরো জোর হবে, তখন আমি তোমাকে পিঠে নিয়ে একদিন আকাশে উড়ব। তুমি দেখো—"

জহুর হাসির মতো এক ধরনের শব্দ করল। বলল, "মাথা খারাপ হয়েছে? আমি তা হলে ভয়ে হার্টফেল করেই মরে যাব।"

"কোনো ভয় নেই বাবা—"

"তোর কোনো ভয় নেই। তোর পাখা আছে, তুই উড়তে পারিস। আমার অনেক ভয়!"

"উপর থেকে সবকিছু দেখতে খুব ভালো লাগে। মনে হয় সবকিছু সমান! সবকিছু সুন্দর! আর কী মনে হয় জান?"

"কী?"

"মনে হয় আমার কোনো ভয় নাই। কেউ আমাকে কিছু করতে পারবে না।"

"সেটা তো সত্যি কথা! তুই যদি আকাশে উড়িস তা হলে কে তোকে কী করবে কে তোকে ছুঁবে? কে তোকে ধরবে?"

বুলবুল হাসার মতো একটু শব্দ করল।

নৌকার গলুইয়ে বসে বুলবুল অনেক দিন পরে ভাত খেল। আনোয়ারা অনেক যত্ন করে সবকিছু রেঁধে দিয়েছে, জহুর সেগুলো তুলে তুলে বুলবুলকে খাইয়ে দিল। তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "আমি এখন যাই?"

"যাও বাবা।"

"তুই একলা থাকতে পারবি তো?"

'আমি একলা একলা আছি না?"

"কোথায় ঘুমাস?"

"ঐ যে ঝাপড়া গাছটা দেখছ? সেটার উপর।"

"গাছের উপর?"

"হ্যাঁ, কোনো অসুবিধে হয় না।"

"ভয় লাগে রাতের বেলা?"

বুলবুল ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "কেন বাবা? ভয় কেন লাগবে?"

"তুই এইটুকুন মানুষ, এই চরের মাঝে একা একা—"

"আমি একা থাকি না বাবা?"

"তা হলে তোর সাথে কে থাকে?"

"ঐ গাছটাতে কত পাখি থাকে তুমি জানো?"

"পাখি?"

"হ্যাঁ সত্যিকার পাখি। পাখিরা আমাকে খুব ভালবাসে।"

"ভালবাসে?"

"হ্যাঁ। আমার সাথে উড়ে বেড়ায়। খেলে।"

জহুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কী আশ্চর্য!"

"আসলে আশ্চর্য না, এইটাই স্বাভাবিক বাবা।"

জহুর অবাক হয়ে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে রইল। এইটুকুন ছোট বাচ্চা কী সুন্দর বড় মানুষের মতো কথা বলছে। মনে হচ্ছে কয়েক দিনেই সে বড় হয়ে গেছে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে জহুর বলল, "ঠিক আছে বাবা। আমি তা হলে যাই। এই যে পোঁটলাটা রাখ। কাঁথা কম্বল আছে। খাবার আছে—পানি আছে। এক টুকরা সাবান আছে।"

বুলবুল পোঁটলাটা হাতে নিয়ে বলল, "আমার কিছু লাগবে না বাবা! আমি এমনিতেই ভালো আছি।"

"না লাগলেও সাথে রাখ।"

জহুর নৌকাটা ঠেলে পানিতে নামাতে নামাতে বলল, "বাবা বুলবুল।"

"বলো বাবা।"

"আমি এর পরের বার যখন আসব তখন তোকে নিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে।"

"দুই থেকে তিন সপ্তাহ লাগবে যেতে—সুন্দরবন অনেক দূর।"

"জানি বাবা, তুমি বলেছ।"

"গহিন অরণ্য, সেখানে তুই আর আমি থাকব।"

"হ্যাঁ, বাবা। অনেক মজা হবে।"

"কোনো মানুষ তোকে আর খুঁজে পাবে না।"

"হ্যাঁ। আমি পাখিদের সাথে পাখি হয়ে থাকব।"

জহুর লগি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকাটাকে পানিতে নামিয়ে দেয়। স্রোতের টানে নৌকাটা তরতর করে এগিয়ে যায়। সে পেছনে ফিরে দেখে নদীর তীরে বুলবুল দাঁড়িয়ে আছে। জোছনার আলোতে তাকে কেমন যেন অবাস্তব স্বপ্নের মতো দেখায়।

ঠিক কী কারণ জানা নেই জহুরের বুকটা গভীর বেদনায় ভরে আসে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পর্ব

১

প্রতিদিন সকালে বুলবুলের ঘুম ভাঙে পাখির ডাক শুনে। সেই সূর্য ওঠার আগে পাখিগুলো তার ঘরের চারপাশে ভিড় জমিয়ে কিচিরমিচির করে ডাকতে থাকে। শুধু কিচিরমিচির করে ডেকেই তারা ক্ষান্ত হয় না, ঘরের ভেতর ঢুকে তার শরীরের ওপর চেপে বসে, তিড়িংবিড়িং করে লাফায়, ঠোঁট দিয়ে ঠোকর দেয়। তাকে জাগানোর চেষ্টা করে।

আজকেও যখন ছোট ছোট পাখি তাকে জাগানোর চেষ্টা করল বুলবুল চোখ খুলে তাকাল এবং সাথে সাথে পাখিগুলোর উত্তেজনা বেড়ে যায়, তারা দুই পায়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লাফাতে থাকে, কিচিরমিচির করে ডাকতে থাকে। বুলবুল বিড়বিড় করে বলল, "তোমাদের সমস্যাটা কী? এত কিচিরমিচির করছ কেন?"

বুলবুলকে কথা বলতে দেখে পাখিগুলো আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তারা আরো দ্রুত ছোটাছুটি করতে থাকে। তখন বুলবুল উঠে বসল এবং পাখিগুলোর মাঝে বিশাল একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। তাদের কিচিরমিচির ডাকে তখন সেখানে কান পাতা দায় হয়ে গেল। বুলবুল একবার চোখ কচলায়, হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙে এবং তারপর বিড়বিড় করে বলে, "যেখানে আমি নাই সেখানে পাখিরা কী করে বুঝবে আমাকে?"

পাখিগুলো তার কথার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারে না কিন্তু হালকা সুরটুকু বুঝতে পারে। তারা উড়ে উড়ে তার ঘাড়ে মাথায় হাতে বসে একটানা কিচিরমিচির করতে থাকে। বুলবুল তখন তার ঘর থেকে বের হয়ে গাছের বড় ডালে এসে দাঁড়িয়ে তার পাখা দুটো বিস্তৃত করে দিয়ে একবার ডানা ঝাপটিয়ে বলল, "চল তা হলে, দিনটা শুরু করি।"

বুলবুলের কুচকুচে কালো চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ। সে তার দুটো পাখা ছড়িয়ে দিয়ে গাছের উঁচু ডাল থেকে শূন্যে ঝাঁপ দেয়, নিচে নামতে নামতে হঠাৎ করে সে ডানা ঝাপটিয়ে উপরে উঠতে থাকে, তার সাথে সাথে শত শত নানা আকারের পাখি কিচিরমিচির শব্দ করে উড়তে থাকে। বুলবুল সোজা উড়ে গিয়ে ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করে নিচে নেমে আসতে থাকে, নদীর পানিতে নেমে আসার আগে সে সতর্ক চোখে চারপাশে একবার দেখে নেয়, বনের পশুরা এখানে রাতে পানি খেতে আসে।

পানিতে মুখ ধুয়ে সে সামনে এগিয়ে যায়, তীরের কাদামাটিতে বুনো পশুর পায়ের ছাপ। বেশির ভাগই হরিণ—তার মাঝে আলাদা করে একটা বাঘের পায়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে। একটা বাঘিনী, নূতন বাচ্চা হয়েছে—এই এলাকার আশপাশেই থাকে। নদীর পানিতে ছলাৎ ছলাৎ করে হেঁটে বুলবুল মাছ ধরার খাঁচাটা টেনে পানি থেকে তুলল। মাঝারি আকারের একটা মাছ ছটফট করছে, উপরে তুলতেই ভোরবেলার সূর্যের নরম আলোতে তার শরীরটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকচিক করতে থাকে। বুলবুল মাছটা খাঁচা থেকে বের করে তীরে উঠে আসে, নদীর মাঝামাঝি একটা কুমির পুরোনো গাছের গুঁড়ির মতো ভেসে ছিল, সেটা এবার ধীরে ধীরে তীরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

পাখিগুলো নদীর পানিতে ঝাপটাঝাপটি করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা মাটি খুঁটে খুঁটে কিছু খেতে চেষ্টা করে। বুলবুল ডানা ঝাপটিয়ে উপরে ওঠার সাথে সাথে পাখিগুলোও তার সাথে আবার উড়তে শুরু করে।

বনের মাঝামাঝি ফাঁকা একটা জায়গায় বুলবুল তার আগুনটা জ্বালিয়ে রাখে, উপরের ছাই সরিয়ে সে গনগনে জ্বলন্ত কয়লা বের করে তার ওপর মাছটা বসিয়ে দেয়। মাছটা আধপোড়া না হওয়া পর্যন্ত সে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। পাখিগুলো আশপাশে গাছের ডালে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের কিচিরমিচির শুনতে শুনতে সে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ করে সব পাখি কিচিরমিচির শব্দ করে একসাথে উড়তে শুরু করে, বুলবুল সাথে সাথে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে যায়—কিছু একটা আসছে।

কী আসছে সেটা প্রায় সাথে সাথেই দেখা গেল। জঙ্গলের এই এলাকার বাঘিনীটা খুব ধীরে ধীরে হেঁটে আসছে, তার পেছনে পেছনে তিনটা ছোট ছোট বাঘের বাচ্চা। বাঘিনীটা কাছাকাছি এসে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় ঘরঘর এক ধরনের শব্দ করল, সেই শব্দে কোনো আক্রোশ বা সতর্কবাণী নেই, নেহাতই পরিচিত কোনো প্রাণীর প্রতি এক ধরনের সম্ভাষণ। বাঘিনীটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত বুলবুল সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রয়োজন হলে মুহূর্তের মাঝে ডানা ঝাপটিয়ে সে উপরে উঠে যেতে পারবে, কিন্তু তার প্রয়োজন হল না।

বাঘিনীটা চলে যাওয়ার পর বুলবুল জ্বলন্ত কয়লা থেকে মাছটা বের করে ওপর থেকে পোড়া আঁশ সরিয়ে ভেতরের সেদ্ধ হয়ে থাকা নরম মাছটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকে। সে একা থাকে, দীর্ঘ সাত বছর কেউ তাকে দেখে নি সে জন্যেই কি না কে জানে তার আচার-আচরণে এক ধরনের বন্য ভাব চলে এসেছে।

AMARBOI.COM

জহুর যে কয়দিন বেঁচে ছিল সব সময় তাকে বলেছে, "বুলবুল বাবা, তুই এই জঙ্গলে একা একা থাকবি, তোর আশপাশে কোনো মানুষ থাকবে না। থাকবে বুনো পশু, কিন্তু মনে রাখিস, তোর শরীরে কিন্তু মানুষের রক্ত আছে। তোকে কিন্তু বুনো হওয়া চলবে না।" বুলবুল সে জন্যে সব সময় তার কোমরে এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে রাখে! সাত বছর আগের কাপড়, শতচ্ছিন্ন কিন্তু তবুও কাপড়!

খাওয়া শেষ করে বুলবুল তার আগুনটার মাঝে কিছু শুকনো কাঠ গুঁজে দিল, তারপর সেটা ঢেকে দিয়ে বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে। গহিন অরণ্য কিন্তু সে পুরো এলাকাটাকে একেবারে হাতের তালুর মতো চেনে। প্রত্যেকটা গাছ, প্রত্যেকটা ঝোপঝাড়, লতাগুল্মকে সে একটু একটু করে বড় হতে দেখেছে। বনের পশুগুলোও তার চেনা, সাপ গোসাপ কীটপতঙ্গগুলোও মনে হয় বুঝি পরিচিত।

হাঁটতে হাঁটতে সে উপরে তাকাল, এখানে গাছের ডালে বিশাল একটা মৌচাক। সেখানে মৌমাছির মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কোনো একদিন রাতে এসে সে মৌচাকের খানিকটা ভেঙে নিয়ে যাবে। মধু খেতে তার ভারি ভালো লাগে।

পায়ে হেঁটে বনের মাঝে ঘুরে বেড়াতে তার আবার জহুরের কথা মনে হল, জহুর তাকে বলেছিল, মানুষের শরীর খুব আজব ব্যাপার। এর যেটাকে যত ব্যবহার করা যায় সেটা তত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিশালী হয়। সেই জন্যে তাকে বারবার বলত, তুই কিন্তু শুধু উড়ে বেড়াবি না, তুই হাঁটবি, দৌড়াবি! তা হলে পা শক্ত থাকবে! জহুর বলত, সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করবি মাথা, তা হলে বুদ্ধি বাড়বে। পশু-পাখি বেঁচে থাকে অভ্যাসের কারণে, মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় বুদ্ধি দিয়ে।

বুলবুলের মনে আছে সে জিজ্ঞেস করেছিল, "বাবা, আমি কি মানুষ?"

জহুর এক মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে বলেছিল, "যার শরীরে এক ফোঁটাও মানুষের রক্ত থাকে সেই মানুষ।"

বুলবুল ভেবেছিল সে তখন জিজ্ঞেস করবে, তা হলে আমি কেন মানুষের সাথে থাকতে পারি না? কিন্তু সে সেটা জিজ্ঞেস করে নি। জিজ্ঞেস করলে জহুর কষ্ট পাবে, সে জন্যে জিজ্ঞেস করে নি। সে কখনোই জহুরকে কষ্ট দিতে চায় নি।

বুলবুল হেঁটে হেঁটে খালের কিনারায় এল। জোয়ারের সময় খালটা পানিতে কানায় কানায় ভরে যায়। এখন ভাটির টান এসেছে, খালটার পানি বলতে গেলে নেই। বুলবুল খালের কিনারায় খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে সেখানে কিছু ফুলগাছ লাগিয়েছে—হরিণেরা এসে মাঝে মাঝেই ফুলসহ তার গাছ খেয়ে যায়—বুলবুল অবিশ্যি কিছু মনে করে না। এই জঙ্গলে কোনো কিছুই কারো জন্যে নির্দিষ্ট নয়। সবকিছুই সবার জন্যে। বুলবুল তার ফুলগাছগুলো দেখে আরেকটু সামনে তার বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ দেখতে গেল। জহুর তাকে এটা শিখিয়েছিল। জহুর নাকি শিখেছিল একজন ডাকাতের কাছে। সেই ডাকাত জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল বারো বছর, জঙ্গলে কেমন করে বেঁচে থাকতে হয় সে তার সব কায়দাকানুন জানত।

বুলবুলের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের নিয়মটা খুব সোজা। মাটির মাঝে গর্ত করে তার উপরে একটা প্লাস্টিক বিছিয়ে রাখা। মাটি থেকে যে জলীয় বাষ্প বের হয় সেটা প্লাস্টিকের ওপর একত্র হয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে ছোট একটা পাত্রে জমা হয়। জঙ্গলের বুনো একটা গাছের শক্ত খোল দিয়ে সে বাটি বানিয়েছে। সেই বাটিতে এই পানি জমা হয়। বুলবুল বাটি বের করে ঢকঢক করে পানিটা খেয়ে আবার ঠিক জায়গায় রেখে দেয়। এই বিশুদ্ধ পানি না হলেও তার আজকাল অসুবিধা হয় না, সে নদীর নোনাপানিও খেতে পারে। শুধু নোনাপানি নয়, সে যা কিছু খেতে পারে তার কখনো শরীর খারাপ হয় না। জীবনে তার জ্বর হয় নি, সর্দি কাশি কিছু হয় নি। তার শরীর কেটে গেলেও কখনো ইনফেকশন হয় না। জহুর দেখে দেখে অবাক হয়ে বলত, "আমার কী মনে হয় জানিস?"

"কী বাবা?"

"তোর শরীরটা নিশ্চয়ই অন্য রকম কিছু দিয়ে তৈরি। তাই রোগজীবাণু তোকে ধরে না। তোর অসুখ হয় না।"

বুলবুল বলত, "অসুখ হলে কেমন লাগে বাবা?"

জহুর হাসার চেষ্টা করে বলত, "সেটা জানিস না খুব ভালো কথা। জানার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?"

জহুরের শেষের দিকে খুব অসুখ হত। এই জঙ্গলে তার শরীরটা টিকত না, খুব অসুস্থ হয়ে সে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকত। গভীর রাতে বুলবুলের যখন ঘুম ভাঙত সে দেখত ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে জহুর তার দিকে তাকিয়ে আছে। বুলবুল ঘুম ঘুম গলায় জিজ্ঞেস করত, "কী দেখো বাবা?"

জহুর নিঃশ্বাস ফেলে বলত, "তোকে দেখি।"

"আমাকে কী দেখো?"

"কাজটা ঠিক করলাম কি না সেটা দেখি।"

"কোন কাজটা বাবা?"

"এই যে তোকে ছোটবেলা বাঁচিয়ে তুলেছি। বাঁচিয়ে তুলে কি ভুল করলাম? তোর মায়ের সাথে তোকেও কি চলে যেতে দেয়া উচিত ছিল?"

বুলবুল তখন বলল, "না বাবা। ভুল করো নি।"

"ঠিক বলছিস? তোকে বাঁচিয়ে রেখে শুধু কি কষ্ট দিচ্ছি?"

"না বাবা। মোটেও কষ্ট দাও নি। তুমি খুব ভালো কাজ করেছ।"

"আর এখন? এই জঙ্গলে? একা একা?"

"এটা সবচেয়ে ভালো হয়েছে বাবা। আমি একেবারে স্বাধীনভাবে উড়তে পারি, ঘুরতে পারি!"

জহুর ইতস্তত করে বলত, "তুই যে একা!"

"কে বলেছে একা? এই তো তুমি আছ!"

জহুর নিঃশ্বাস ফেলে বলত, "আমি আর কদিন। আমি টের পাচ্ছি আমার ডাক এসেছে।"

বুলবুল বুঝতে পারে নি সত্যি সত্যি তার ডাক এসেছে। একদিন ভোরবেলা জহুর বলল, "বাবা বুলবুল।"

বুলবুল বলল, "কী বাবা।"

জহুর বলল, "আজকে খুব একটা বিশেষ দিন।"

AMARBOI.COM

"কেন বাবা?"

"আজকে আমি যাব।"

"কোথায় যাবে বাবা?"

জহুর হাসার চেষ্টা করে বলল, "যেখান থেকে ডাক এসেছে, সেখানে।"

বুলবুল চমকে উঠে বলেছিল, "না বাবা।"

জহুর বলেছিল, "হ্যাঁ।" তারপর তার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, "আয় আমাকে সাহায্য কর।"

বুলবুল তখন চোখ মুছে তাকে সাহায্য করেছিল। খালের মাঝে যে নৌকাটা ছিল, জহুর সেই নৌকাটার মাঝে গিয়ে শুয়েছিল। বুলবুলকে বলেছিল, "বাবা নৌকার লগি দিয়ে একটা ধাক্কা দে।"

বুলবুল লগি দিয়ে নৌকাটাকে ধাক্কা দিতেই সেটা খালের মাঝখানে চলে এল। ভাটির টানে সেটা তরতর করে এগুতে থাকে। জহুর চিৎ হয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, "নৌকাটা খাল থেকে যাবে নদীতে, নদী থেকে যাবে সমুদ্রে। সমুদ্রে যেতে যেতে আমি আর থাকব না।"

বুলবুল জহুরের হাত ধরে থাকল, জহুর বলল, "একটু পরে আমি আর কথা বলতে পারব না, তখন তুই চলে যাস বাবা।"

বুলবুল বলল, "না বাবা, আমি যেতে চাই না।"

"তোকে যেতে হবে। কেউ সারা জীবন থাকে না। একদিন তুইও থাকবি না।"

"না বাবা—"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না বলে না বোকা ছেলে। নৌকাটা বেশি দূরে যাবার আগে তুই চলে যাবি। সমুদ্রে জেলে নৌকা থাকে, তোকে পরে দেখে ফেলবে।"

বুলবুল কোনো কথা বলল না। জহুর বলল, "তুই আমাকে মাপ করে দিস বাবা, তোকে আমি সুন্দর একটা জীবন দিতে পারলাম না।"

বুলবুল বলল, "তুমি আমাকে অনেক সুন্দর জীবন দিয়েছ।"

"তুই তো একা একা থাকবি, কিন্তু তাই বলে তুই কিন্তু বন্য হয়ে যাবি না।"

"হব না।"

"তোকে যেন কোনো দিন কোনো মানুষ খুঁজে না পায়। কিন্তু যদি কখনো পেয়ে যায় তা হলে তুই কিন্তু খুব সাহসী মানুষ হবি। খুব ভালো মানুষ হবি। খুব হৃদয়বান মানুষ হবি।"

"হব।"

"হৃদয়বান আর দয়ালু।"

"হব বাবা।"

"কেউ যেন বলতে না পারে জহুর তার ছেলেটাকে জংলি একটা ছেলে বানিয়েছে।"

বুলবুল বলল, "বলবে না বাবা।"

জহুর তখন বুলবুলের হাত ধরে বলল, "তুই এখন যা বাবা।"

বুলবুল চোখ মুছে বলল, "আমি যেতে চাই না।"

"তোকে যেতে হবে। আমি চাই না আমি যখন মারা যাই তখন তুই থাকিস। আমি চাই—"

"কী চাও বাবা?"

"আমি চাই তুই আমাকে জীবন্ত মানুষ হিসেবে মনে রাখিস।"

বুলবুল তখন তার বাবার গলায় বুকে নিজের মুখ স্পর্শ করে বিদায় নিয়ে নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়েছে, তারপর একবারও পেছনে না তাকিয়ে উড়ে গেছে। বুলবুলের এখনো সেই মুহূর্তটির কথা মনে পড়ে। সাত বছর আগের ঘটনা, কিন্তু তার মনে হয় এই সেদিনের ঘটনা।

বুলবুল নদীর তীরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর দুই পাখা বিস্তৃত করে ধীরে ধীরে আকাশে উড়ে যায়। ঘুরে ঘুরে সে উপরে উঠতে থাকে, নিচের বনভূমি ছোট হয়ে আসে, বহু দূরের সমুদ্রতট আবছাভাবে ভেসে ওঠে, বাতাসে এক ধরনের হিমেল স্পর্শ পায়, তবুও সে থামে না, সে উপরে উঠতেই থাকে। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করে মেঘ ভেদ করে সে আকাশে উড়ে যাবে, আকাশের অন্য পাশে কী আছে সে দেখবে।

সন্ধে হওয়ার আগেই সে তার ঘরটাতে ফিরে আসে। বিশাল গাছের ডালগুলোর ওপর তৈরি করা ছবির মতো ঘর। কাঠের মেঝেতে শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি বিছানা। বুলবুল সেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার বাঁশিটা বাজায়। বুনো একটা গাছের নল কেটে সে একটা বাঁশি তৈরি করেছে, ফুঁ দিলে মধুর এক ধরনের শব্দ বের হয়। বুলবুল শুয়ে শুয়ে সেই বাঁশিতে সুর তোলার চেষ্টা করে। প্রচলিত কোনো সুর নয়—অনেকটা কান্নার মতো বিচিত্র এক ধরনের সুর। তার ছোট কাঠের ঘরের ফাঁকফোকরে বসে থাকা পাখিগুলো গুটিসুটি মেরে বসে বসে বুলবুলের বাঁশির সুর শোনে।

ঠিক এভাবে বুলবুলের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন নয়, অত্যন্ত বিচিত্র এবং চমকপ্রদ একটা জীবন। কিন্তু প্রতিটা দিনই ছিল একই রকম বিচিত্র এবং

AMARBOI.COM

একই রকম চমকপ্রদ। বুলবুলের মাঝে মাঝে মনে হত, জীবনটা কি একটু অন্য রকম হতে পারে না?

সে জানত না, সত্যি সত্যি তার জীবনটা একটু অন্য রকম হয়ে যাবে তার নিজের অজান্তেই।

২

গভীর রাতে ইঞ্জিনের একটা চাপা শব্দে বুলবুলের ঘুম ভেঙে গেল। মাঝে মাঝে এ রকম হয়, কোনো একটা ট্রলার, কোনো একটা স্পিডবোট কাছাকাছি কোনো একটা নদী দিয়ে যায়, সে তার ঘরে বসে তার শব্দ শুনতে পায়। বিশাল একটা গাছের একেবারে উপরে তার ঘর। তাই অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে আসে। শব্দগুলো বাড়ে-কমে, তারপর একসময় ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ হতে হতে দূরে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু ইঞ্জিনের এই শব্দটা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল না। শব্দটা বাড়তে থাকে, কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে কাছাকাছি এগিয়ে আসতে থাকে। বুলবুলের একবার মনে হল সে উড়ে গিয়ে দেখে আসে কীসের শব্দ, কোথায় আসছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে তার আর বের হওয়ার ইচ্ছে করল না।

যে ইঞ্জিনের শব্দ শুনে বুলবুলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সেটি আসছিল একটা মাঝারি আকারের লঞ্চ থেকে। লঞ্চটি ভাড়া করেছে পাখি-বিশেষজ্ঞ ডক্টর আশরাফ। সুন্দরবনের পাখি বৈচিত্র্যের একটা পরিসংখ্যান নেয়ার জন্যে সে তার ছোট একটা দল নিয়ে এসেছে। দলের মাঝে বেমানান সদস্যটি হচ্ছে ডক্টর আশরাফের চৌদ্দ বছরের মেয়ে মিথিলা।

গভীর রাতে বুলবুল যখন একটা ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছিল তখন এই লঞ্চের বড় কেবিনটাতে একটা ছোট নাটক অভিনীত হচ্ছিল, নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী ডক্টর আশরাফ আর মিথিলা, বাবা আর মেয়ে।

ডক্টর আশরাফ ক্রুদ্ধ চোখে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলছিল, "তোর হয়েছেটা কী? সারাক্ষণ মুখটা ভোঁতা করে বসে থাকিস?"

মিথিলা বাবার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলল, "আই অ্যাম সরি যে খোদা আমাকে এমন ভোঁতা মুখ দিয়ে জন্ম দিয়েছে।"

"মানুষ ভোঁতা মুখ নিয়ে জন্ম নেয় না। মানুষ মুখ ভোঁতা করে রাখে।"

"আব্বু, আমি এখানে আসতে চাই নি, তুমি আমাকে জোর করে এনেছ। এখন তুমি বলছ আমাকে জোর করে আনন্দ পেতে হবে?"

ডক্টর আশরাফ চোখ কপালে তুলে বলল, "জোর করে? জোর করে কেন হবে? সুন্দরবন হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। পৃথিবীর মানুষ এটাকে একনজর দেখার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হয়ে যায়—"

"আব্বু! তুমি অনেক বড় বৈজ্ঞানিক হতে পার কিন্তু তুমি খুব সোজা সোজা কিছু জিনিস জান না।"

"কী জিনিস জানি না?"

"একা একা কেউ কোনো কিছু উপভোগ করতে পারে না। আমি এখানে একা। একেবারে একা।"

"একা? লঞ্চভর্তি মানুষ। আমার স্টুডেন্ট রিসার্চার—"

"হ্যাঁ, লঞ্চভর্তি মানুষ—তোমার স্টুডেন্ট রিসার্চার সবাই তোমার কথায় ওঠে-বসে। তুমি তাদের বেতন দাও, তারা তোমার চাকরি করে। তোমার রেফারেন্স পেলে তারা বড় ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন পায়। সারাক্ষণ তারা তোমার তোয়াজ করে, তোমাকে খুশি করার জন্যে আমাকেও তোয়াজ করে। এই রকম মানুষদের নিয়ে তুমি খুশি আছ, খুব ভালো কথা। আমাকে খুশি হতে বোলো না।"

ডক্টর আশরাফ কঠিন মুখে বলল, "তোদের সমস্যা কী জানিস? তোরা বেশি বুঝিস।"

"আই অ্যাম সরি আব্বু—কিন্তু আমরা বেশি বুঝি না। আমাদের যেটুকু বোঝার কথা ঠিক ততটুকু বুঝি। কিন্তু তোমাদের সমস্যা কী জানো? তোমরা আমাদের কিছুই বোঝ না। তোমাদের ধারণা তোমরা যেটা বোঝ সেটাই ঠিক আর আমাদের সবাইকেই সেটা বুঝতে হবে।"

"কখন আমি সেটা করেছি?"

"এই যে তুমি ধরেই নিয়েছ, এই লঞ্চে করে এক গাদা মানুষের সাথে এই জঙ্গলে এলে আমার খুব আনন্দ পেতে হবে! আই অ্যাম সরি আব্বু, আমি আনন্দ পাচ্ছি না। কিন্তু তুমি যদি চাও এখন থেকে আমি মুখে আনন্দ আনন্দ একটা ভাব করে রাখব।" কথা শেষ করে মিথিলা তার মুখে একটা কৃত্রিম হাসির ভান করল।

ডক্টর আশরাফের ইচ্ছে করল মেয়ের গালে একটা চড় দিয়ে তার মুখের এই টিটকারির হাসিটি মুছে দেয়। কিন্তু সে অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখল। মিথিলার মা মারা যাওয়ার পর সে তার মেয়েটিকে ঠিক করে মানুষ করতে পারে নি। মেয়েটি উদ্ধত দুর্বিনীত হয়ে বড় হচ্ছে। শুধু যে উদ্ধত আর দুর্বিনীত তা নয়, মিথিলা অসম্ভব আবেগপ্রবণ। অত্যন্ত সহজ সাধারণ কথায় সে রেগে ওঠে, বিচলিত হয়ে যায়। চোখ থেকে পানি বের হয়ে আসে। নিজের জগতের বাইরে যে একটা জগৎ থাকতে পারে সেটা সে জানে না, জানার কোনো আগ্রহও নেই। ডক্টর আশরাফ মাঝে মাঝে তার স্ত্রী সুলতানার ওপর এক ধরনের ক্ষোভ অনুভব করে, কেন এত অল্প বয়সে এ রকম একটি মেয়েকে রেখে মরে গেল? ডক্টর আশরাফ নিজের কাজকর্ম গবেষণা নিয়ে নিজে ব্যস্ত থেকেছে, মেয়েটি কেমন করে বড় হচ্ছে সেটি লক্ষ করে নি। যখন লক্ষ করেছে তখন দেরি হয়ে গেছে। এখন এই মেয়েটিকে কোনো দিন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে বলে মনে হয় না।

রাত্রিবেলা লঞ্চের কেবিনে নিজের ঘরে মিথিলা বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেল। চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ের জগৎটি খুব বিচিত্র, খুব নিঃসঙ্গ এবং একাকী।

পরের দিনটি বুলবুল শুরু করল খুব সতর্কভাবে। আকাশে না উড়ে সে বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে গেল এবং গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখল নদীর মাঝামাঝি একটা লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। বুলবুল বহুদিন লঞ্চ নৌকা কিছু দেখে নি—সে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। লঞ্চের ভেতর মানুষগুলো ব্যস্ত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছে, বুলবুল একসময় দেখল মানুষগুলো একটা নৌকায় করে তীরের দিকে আসছে। নৌকাটা তীরে পৌছানোর আগেই বুলবুল বনের আরো গভীরে সরে যাচ্ছিল, তখন সে দেখতে পেল প্রায় তার বয়সী একটা মেয়ে কেবিন থেকে বের হয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এত দূর থেকে ভালো করে চেহারা দেখা যায় না। কিন্তু তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটির মাঝে এক ধরনের দুঃখী দুঃখী ভাব রয়েছে। বুলবুল এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডক্টর আশরাফের দলটি নদীর তীর ঘেঁষে হেঁটে হেঁটে সারাটি দিন বনের ভেতর ঘুরে বেড়াল। তারা পাখির ছবি তুলল, ভিডিও করল, কাগজে নোট নিল। বাইনোকুলারে তারা দূর থেকে পাখিগুলোকে লক্ষ করল, তাদের সংখ্যা গুনল, পাখির বাসা খুঁজে বের করার চেষ্টা করল, তাদের খাবার পরীক্ষা করে দেখল। মাঝে মাঝেই তারা দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের ভেতর উত্তপ্ত আলোচনা করতে লাগল। দলটার সাথে দুজন মানুষ ছিল রাইফেল নিয়ে, তারা চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল, নদীর তীরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছে, কখন কী ঘটে যায় কেউ বলতে পারে না।

দলটির কেউ অবিশ্যি টের পেল না, দূর থেকে আরো অনেক সতর্ক হয়ে তাদের ওপর চোখ রাখছিল বুলবুল। ডক্টর আশরাফ কিংবা তার দলের অন্য কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত যে এখানে সতের বছরের একটি কিশোর থাকে, দুই পাখা মেলে সে আকাশে উড়ে যেতে পারে তা হলে নিশ্চিতভাবেই তারা তাদের ক্যামেরা নোটবই বাইনোকুলার সবকিছু ছুড়ে ফেলে শুধু তাকে একনজর দেখার জন্যে ছুটে আসত।

বুলবুলের আজকের দিনটি হল খাপছাড়া, একদিকে দূর থেকে এই দলটির ওপর চোখ রাখছে, আবার সুযোগ পেলে নদীর তীরে গিয়ে লঞ্চের পাশে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক কী কারণ জানা নেই লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা উদাসী মেয়েটিকে আরো একনজর দেখার জন্যে তার এক ধরনের কৌতূহল হচ্ছিল। কত দিন সে কোনো মানুষ দেখে না, কত দিন সে কোনো মানুষের সাথে কথা বলে না!

সূর্য ডুবে যাওয়ার অনেক আগেই পাখি পর্যবেক্ষকরা লঞ্চে ফিরে গেল। বুলবুল তখন কিছু একটা খেয়ে নেয়—সারা দিনের উত্তেজনায় তার খাওয়ার কথাই মনে ছিল না। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর সে নদীর তীরে একটা উঁচু গাছে উঠে বসে, লঞ্চটাকে এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, অস্পষ্টভাবে মানুষের কথাবার্তা, হাসাহাসি শোনা যায়।

AMARBOI.COM

রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে লঞ্চের মানুষগুলোর কথাবার্তা কমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত একসময় নীরব হয়ে আসে। বুলবুল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তারপর খুব সাবধানে ডানা ঝাপটিয়ে সে উড়তে থাকে, প্রথমে অনেক দূর দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে আসে, তারপর বৃত্তটা ছোট করে, খুব সাবধানে উড়ে উড়ে সে লঞ্চের ছাদে নামল। কয়েক মুহূর্ত সে চুপচাপ বসে থাকে, যখন নিশ্চিত হল যে কেউ তাকে দেখে ফেলে নি তখন সে খুব সাবধানে ছাদ থেকে তার মাথাটি নিচে দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। ঠিক কী দেখার চেষ্টা করবে নিজেই বুঝতে পারছিল না, তখন সে উত্তেজিত গলার স্বর শুনতে পেল। বুলবুল সরে গিয়ে যে কেবিন থেকে উত্তেজিত স্বর ভেসে আসছে সেখানে উঁকি দিয়ে ডক্টর আশরাফকে দেখতে পেল। ডক্টর আশরাফ হাত নেড়ে বলছে, "আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, একজন মানুষ কিছু না করে বিছানায় শুয়ে কেমন করে দিন কাটাতে পারে।"

বুলবুল শুনতে পেল কেবিনের অন্য পাশ থেকে মিথিলা বলছে, "আমাকে আমার মতো থাকতে দাও আব্বু।"

মিথিলার গলার স্বরে এক ধরনের চাপা ক্ষোভ। বুলবুল একটু সরে গিয়ে মেয়েটিকে দেখার চেষ্টা করল। আজ ভোরে সে এই মেয়েটিকে লঞ্চের রেলিং ধরে বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। ডক্টর আশরাফ কঠিন গলায় বলল, "আমি তো তোকে তোর মতোই থাকতে দিচ্ছি।"

"না আব্বু। তুমি আমাকে আমার মতো থাকতে দিচ্ছ না। তুমি আমাকে বিরক্ত করছ।"

মিথিলার কথা শুনে ডক্টর আশরাফ কেমন যেন ক্ষেপে গেল, চিৎকার করে বলল, "আমি বিরক্ত করছি? যদি শুনতে পাই আমার মহারানী মেয়ে সারা দিন না খেয়ে বিছানায় শুয়ে ছিল, আমি যদি সেই খবর নিতে আসি, তা হলে সেটা বিরক্ত করা হয়?"

"হ্যাঁ আব্বু হয়। তোমার এটা আগে চিন্তা করা উচিত ছিল, আমার যখন খেতে ইচ্ছে করে না, আমি তখন খাই না। বাসায় তুমি সেটা জান না—কারণ তুমি বাসায় থাক না।"

ডক্টর আশরাফ কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না, তারপর থমথমে মুখে বলল, "আমি কোনো ঢং দেখতে চাই না। খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর।"

"আমার খিদে নেই।"

"একজন মানুষ সারা দিন না খেয়ে থাকলে তার খিদে থাকে না কেমন করে?"

"আমি সেটা জানি না। কিন্তু আমার খিদে নেই।"

"আমাকে রাগাবি না, মিথিলা। আমি অনেক সহ্য করেছি।"

"কেন আব্বু? তুমি কী করবে? তুমি কি আমাকে মারবে নাকি?"

"দিন রাত মুখটাকে এমন ভোঁতা করে রাখবি—তোকে তো মারাই উচিত। কখনো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটাকে একবার দেখেছিস?"

মিথিলা ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, "আই অ্যাম সরি আব্বু, আমার চেহারাটা খারাপ। আম্মু তো মরে গেছে—তোমার আর ঝামেলা নাই। তোমার সুন্দরী একজন কলিগকে বিয়ে কর, তোমার বাচ্চাগুলোর চেহারা যেন ভালো হয়।"

"কী বললি? কী বললি তুই?" বলে ডক্টর আশরাফ এগিয়ে গিয়ে তার মেয়ের গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মেরে বলল, "তোর এত বড় সাহস? তুই আমার সাথে এভাবে কথা বলিস?"

মিথিলা প্রস্তুত ছিল না, সে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, কোনোমতে সে উঠে দাঁড়িয়ে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তার বাবার দিকে তাকায়। সে যতটুকু রাগ হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি অবাক হয়েছে। যতটুকু অবাক হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছে। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন এখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। মিথিলা বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে তার বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ফিসফিস করে বলল, "তুমি আমাকে মারতে পারলে আব্বু?"

ডক্টর আশরাফ কোনো কথা না বলে হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মিথিলা এবার ফিসফিস করে বলল, "ঠিক আছে আব্বু। গুড বাই।"

ডক্টর আশরাফ তখনো রাগে কাঁপছিল, সে কেবিন থেকে বের হয়ে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকে সশব্দে তার দরজা বন্ধ করে দিল।

বুলবুল নিজের ভেতরে এক ধরনের অপরাধবোধ অনুভব করে, তার মনে হতে থাকে এভাবে লুকিয়ে বাবা আর মেয়ের এ রকম ব্যক্তিগত একটা ঘটনা তার দেখা উচিত হয় নি। কত দিন সে কোনো মানুষ দেখে না, লুকিয়ে সে তাদের দেখতে এসেছিল। কিন্তু তাই বলে মানুষের এ রকম ব্যবহার? বাবার সাথে মেয়ের? মেয়ের সাথে বাবার?

বুলবুলের মনটা খারাপ হয়ে যায়, সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, ঠিক যখন সে উড়ে যাবে তখন হঠাৎ করে নিচে দরজা খোলার শব্দ হল, বুলবুল তখন মাথা নিচু করে তাকাল। দেখতে পেল মিথিলা তার কেবিন থেকে বের হয়ে এসেছে, ওপর থেকে তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার হাঁটার ভঙ্গিটুকু স্বাভাবিক নয়। অনেকটা অপ্রকৃতিস্থের মতো

সামনে হেঁটে যায়। কয়েক মুহূর্ত রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ সে রেলিংয়ের ওপর উঠে দাঁড়ায়, তারপর কিছু বোঝার আগেই সে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বুলবুল কিছু চিন্তা করার সময় পেল না, সে ঠিক একই গতিতে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং মিথিলা নদীর পানি স্পর্শ করার আগের মুহূর্তে তাকে খপ করে ধরে ফেলল। তারপর তার বিশাল ডানা ঝাপটে সে উড়ে আসে, বৃত্তাকারে ঘুরে সে লঞ্চের ছাদে ফিরে এসে সাবধানে তাকে ছাদে নামিয়ে দিল।

মিথিলার কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে এবং শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারে যে আসলে সে পানিতে ডুবে যায় নি, একেবারে শেষ মুহূর্তে তাকে কেউ ধরে ফেলেছে, তাকে নিরাপদে ছাদে নামিয়ে দিয়েছে। এটা কীভাবে সম্ভব মিথিলা কোনোভাবেই বুঝতে পারছিল না, সে হকচকিত হয়ে তখনো তাকিয়ে ছিল। জোছনার আলোতে সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, সামনে বিস্ময়কর একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়—কারণ সে জোছনার আলোতে স্পষ্ট দেখতে পারছে তার বিশাল দুটি পাখা। মিথিলা কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "তুমি কে?"

বুলবুল কোনো উত্তর দিল না। সে কী উত্তর দেবে? সে কি বলবে, আমার নাম বুলবুল? আমি একই সাথে মানুষ এবং পাখি। আমি এই বনে একা একা উড়ে বেড়াই? সে কেমন করে এই মেয়েটিকে বলবে সে কে?

মিথিলা আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? তুমি কেন আমাকে বাঁচিয়েছ?"

বুলবুল তখনো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। মিথিলা আরেকটু এগিয়ে এসে বুলবুলকে আরেকটু কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করে। তারপর ফিসফিস করে বলে, "তুমি কি মানুষ?"

বুলবুল এবার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি না।"

"তুমি জান না?"

বুলবুল মাথা নাড়ে। "না।"

মিথিলা তার হাতটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বুলবুলকে স্পর্শ করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন আমাকে বাঁচিয়েছ?"

"আমার মা একদিন তোমার মতো পানিতে লাফ দিয়েছিল। তখন একজন তাকে বাঁচিয়েছিল, সেই জন্যে আমি এখনো আছি।" বুলবুল নিচু গলায় বলল, "একদিন তুমিও কারো মা হবে। বেঁচে না থাকলে কেমন করে হবে?"

মিথিলা অবাক হয়ে এই বিস্ময়কর ছায়ামূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। গলার স্বর একজন কম বয়সী কিশোরের মতো। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বলল, "আমাকে বাঁচানোর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।"

বুলবুল কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। মিথিলা নিচু গলায় বলে, "এর পরের বার কি তুমি আমাকে বাঁচাবে?"

বুলবুল হাসির মতো শব্দ করল, বলল, "এর পরের বার তুমি কখনো এটা করবে না। কখনো না।"

"কেন না?"

"তা হলে আমি খুব কষ্ট পাব।"

"কেন তুমি কষ্ট পাবে? তুমি আগে আমাকে কখনো দেখো নাই।"

"বড় হওয়ার পর আমি কোনো মানুষ দেখি নাই। তুমি প্রথম। তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। তুমি যখন চলে যাবে তখন আমি তোমার কথা মনে রাখব।"

ঠিক এ রকম সময় ডক্টর আশরাফ তার কেবিন থেকে বের হয়ে এল, মেয়ের গায়ে হাত তোলার আগের মুহূর্তে তার ভেতর ছিল ভয়ঙ্কর ক্রোধ। এখন ক্রোধের বদলে সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে তীব্র অপরাধবোধ। অভিমানী মেয়ে রাগে-দুঃখে কিছু একটা করে ফেললে কী হবে? সে মেয়ের কেবিনের সামনে গিয়ে ডাকল, "মিথিলা—"

কেবিনের দরজা হাট করে খোলা, ভেতরে কেউ নেই, হঠাৎ করে তার বুকটা ধক করে ওঠে, সে পাগলের মতো বের হয়ে আসে, এদিক-সেদিক তাকিয়ে চিৎকার করে ডাকে, "মিথিলা! মিথিলা-মা।"

লঞ্চের ছাদে বুলবুল হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, মিথিলাকে ফিসফিস করে বলল, "আমি যাই! তুমি আমার কথা কাউকে বোলো না!"

তারপর তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তার বিশাল দুটি ডানা মেলে সে আকাশে উড়ে গেল। মিথিলা অবাক হয়ে দেখল বিশাল একটা পাখির মতো ডানা মেলে একজন আকাশে উড়ে যাচ্ছে, চাঁদের আলোতে তাকে কী বিচিত্রই না দেখাচ্ছে!

নিচে থেকে সে আবার তার বাবার ব্যাকুল গলার আওয়াজ শুনতে পেল, "মিথিলা- মিথিলা—"

মিথিলা লঞ্চের ছাদ থেকে বলল, "বাবা! এই যে আমি।"

"কোথায়?"

"লঞ্চের ছাদে।"

ডক্টর আশরাফ সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে আসে, দেখে জোছনার আলোতে তার মেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল, "মিথিলা মা, তুই এখানে?'

"হ্যাঁ আব্বু।"

"হঠাৎ করে মনে হল তুই তুই—তুই বুঝি—"

"আমি কী?"

"না কিছু না।" ডক্টর আশরাফ মেয়েকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, "আই অ্যাম সরি মা, আমি তোর গায়ে হাত তুলেছি। তুই আমাকে মাপ করে দে।"

মিথিলা বলল, "ছিঃ! আব্বু! তুমি কী বলছ?"

ডক্টর আশরাফ নরম গলায় বলল, "আর কখনো হবে না মা। তোকে আমি কথা দিচ্ছি—"

মিথিলা নিচু গলায় বলল, "আমিও কথা দিচ্ছি।"

"কী কথা দিচ্ছিস?"

"আমি আর কখনো রাগ করব না। মন খারাপ করব না—"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি। আমি খুব বোকা একটা মেয়ে আব্বু। আমি আর বোকা থাকব না আব্বু।"

ডক্টর আশরাফ অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকাল, বলল, "কী হয়েছে তোর মিথিলা?"

"জানি না আব্বু আমার কী হয়েছে। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ আমার কিছু একটা হয়েছে। আমার কী মনে হচ্ছে জান?"

"কী মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে আমি আর ছোট মেয়ে না। মনে হচ্ছে আমি বড় হয়ে গেছি। অনেক বড় হয়ে গেছি।"

ডক্টর আশরাফ অবাক হয়ে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

৩

মিথিলার পরিবর্তনটা পরদিন সবাই লক্ষ করল। সে সকালবেলা সবার আগে কাপড় জামা পরে প্রস্তুত হয়ে গেছে। মাথায় কাপড়ের একটা টুপি, চোখে কালো চশমা। পিঠে একটা ব্যাগ এবং গলায় বাইনোকুলার। নৌকা তীরে এসে নেমে কাদার ভেতর দিয়ে ছপছপ করে হেঁটে সে ডাঙায় উঠে এল। পুরো দলটির পেছনে পেছনে সে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াল, গুনগুন করে একটা ইংরেজি গানের সুর গাইতে গাইতে বাইনোকুলার লাগিয়ে সে সব গাছের ওপর দিয়ে নিজের অজান্তেই কিছু একটা খুঁজে বেড়াতে লাগল।

ডক্টর আশরাফ একটু অবাক হয়ে মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কী দেখিস গাছের ওপর?"

"কিছু না আব্বু। এমনি দেখি।"

"চোখ খোলা রাখলে দেখিস কত কী দেখা যায়।"

মিথিলা হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল, "আমরা যদি উড়তে পারতাম তা হলে কী মজা হত তাই না আব্বু!"

"তোকে কে বলেছে আমরা উড়তে পারি না! প্লেনে হেলিকপ্টারে আমরা উড়ি না!"

মিথিলা মাথা নেড়ে বলল, "না, না, না! আমি ঐ রকম উড়ার মতো বলছি না। সত্যিকার উড়ার কথা বলছি। পাখির মতো উড়ার কথা বলছি!"

"পাখি রয়েছে বিবর্তনের শেষ মাথায়, আমরাও রয়েছি শেষ মাথায়। আমাদের উড়ার কথা থাকলে এতদিনে আমরা পাখি হয়ে যেতাম!"

মিথিলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের যদি পাখা থাকত তা হলে কী মজা হত তাই না?"

ডক্টর আশরাফ হাসল, বলল, "আমাদের যত ওজন আমাদের উড়তে হলে যে পাখা লাগবে, শরীরে সেই পাখা লাগানোর জায়গাই থাকবে না! শুধু পাখাই থাকতে হবে—শরীর আর থাকবে না!"

মিথিলা ভুরু কুঁচকে চিন্তা করে। ডক্টর আশরাফ জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবিস?"

"তা হলে আমাদের শরীরটা হালকা হতে হবে?"

"হ্যাঁ। পাখির যে রকম। হাড়গুলো হালকা, বিশাল ফুসফুস। মেদহীন ছিপছিপে শরীর!"

মিথিলা কোনো কথা বলল না, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বাইনোকুলারটা চোখে লাগিয়ে আবার সে গাছগুলোর ওপর দিয়ে দেখতে লাগল। দূরে কোথাও এক জায়গায় হঠাৎ করে অসংখ্য পাখি কিচিরমিচির করে ডাকতে ডাকতে তাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ডক্টর আশরাফদের দলের লোকজন বিস্মিত হয়ে সেই পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। কোথা থেকে হঠাৎ করে এতগুলো পাখি এসেছে? কোথায় যাচ্ছে?

রাত্রিবেলা অনেক দিন পর মিথিলা সবার সাথে বসে খেলো, গল্পগুজব করল এবং একজন যখন তাকে একটা গান গাইতে বলল সে একটুও সংকোচ না করে একটা ইংরেজি গান গেয়ে শোনাল। ডক্টর আশরাফ এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। এক রাতের মাঝে মেয়েটির মাঝে এ রকম একটা পরিবর্তন হবে কে জানত!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত্রিবেলা যখন সবাই ঘুমিয়ে গেছে তখন মিথিলা খুব সাবধানে তার কেবিন খুলে বের হয়ে এল। কেউ যেন বুঝতে না পারে সেভাবে নিঃশব্দে সে লঞ্চের ছাদে এসে দাঁড়াল। জোছনার আলোতে পুরো বনভূমিটিকে একটি অতিপ্রাকৃত ভূখণ্ডের মতো মনে হয়। অনেক দূর থেকে কোনো একটা বুনো পশু ডাকতে থাকে, এক ধরনের বিষণ্ন করুণ কণ্ঠস্বর মনে হয়, শুনে মিথিলার বুকের মাঝে এক ধরনের কষ্ট হতে থাকে।

মিথিলা লঞ্চের ছাদে হাঁটতে থাকে, তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। কালকের সেই রহস্যময় ডানাওয়ালা কিশোরটি কি আসবে আবার? যখন হেঁটে হেঁটে একসময় সে ক্লান্ত হয়ে গেল, মনে হল আর বুঝি সে আসবে না তখন সে দেখতে পায় আকাশে বৃত্তাকারে কিছু একটা উড়ছে। বিশাল ডানা ঝাপটিয়ে উড়তে উড়তে সেই রহস্যময় ছায়ামূর্তিটি কাছে আসতে থাকে।

মিথিলা দুই হাত উপরে তুলে নাড়তে থাকে, তখন খুব ধীরে ধীরে বুলবুল ডানা মেলে প্রায় নিঃশব্দে নিচে নেমে আসে। মিথিলা কাছে গিয়ে বুলবুলকে স্পর্শ করে বলল, "আমি বুঝেছিলাম তুমি নিশ্চয়ই আসবে!"

বুলবুল বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, "কী সুন্দর জোছনা উঠেছে, আমি তাই উড়তে বের হয়েছি। ভাবলাম তোমাদের লঞ্চটা দেখে যাই। তখন দেখি তুমি ছাদে দাঁড়িয়ে আছ, তাই এসেছি।"

"আমি না হয়ে যদি অন্য কেউ হত?"

"আমি বুঝতে পেরেছি অন্য কেউ না। তোমরা যখন আজ জঙ্গলে গিয়েছিলে আমি তোমাদের সবাইকে দেখেছি!"

"দেখেছ?"

"হ্যাঁ।" মিথিলা হেসে ফেলল, বলল, "আমি বাইনোকুলার দিয়ে তোমাকে সবগুলো গাছের উপর খুঁজেছিলাম।"

বুলবুল মাথা নেড়ে বলল, "তোমরা কখনো খুঁজে আমাকে পাবে না। আমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারি। তোমরা আমাকে দেখবে না, কিন্তু আমি তোমাদের দেখি।"

"কী মজা!"

"শুধু পাখিগুলো মাঝে মাঝে ঝামেলা করে।"

"কী ঝামেলা করে?"

"হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে যায়। ডাকাডাকি করে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়।"

মিথিলা চোখ বড় বড় করে বলল, "ও আচ্ছা! বনের মাঝে হঠাৎ করে অনেকগুলো পাখি উড়ে উড়ে এল—"

"হ্যাঁ। ওগুলো আমার সাথে ছিল। ওরা আমার ঘরে ঘুমায়।"

"তোমার ঘর? তোমার ঘর কোথায়?"

"জঙ্গলে অনেক উঁচু একটা গাছের ওপর আমি ঘর তৈরি করেছি।"

"ইস! কী মজা।"

বুলবুল কোনো কথা বলল না, নির্জন বনভূমিতে উঁচু একটা গাছের উপরে ছোট একটা কাঠের ঘরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত একেবারে একা একা থাকা সত্যিই খুব মজার কি না বুলবুল কখনোই সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে নি। কিন্তু সে কোনো কথা বলল না।

মিথিলা জোছনার আলোতে কিছুক্ষণ বুলবুলের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ইস! তোমার কী মজা তুমি উড়তে পার।"

"তুমি উড়তে চাও?"

"চাই না আবার? এক শ বার উড়তে চাই।"

"তুমি আমার সাথে উড়বে?"

মিথিলা অবাক হয়ে বলল, "উড়ব? তোমার সাথে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে?"

"তুমি আমার পিঠে বসবে, আমি তোমাকে নিয়ে উড়ে যাব।"

"সত্যি? তুমি পারবে?"

মিথিলার চোখ চকচক করে ওঠে, ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"যদি পড়ে যাই?"

বুলবুল হেসে ফেলল, বলল, "পড়বে না। তুমি যখন পড়তে চেয়েছিলে তখনো আমি তোমাকে পড়তে দেই নাই। মনে আছে?"

মিথিলা একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, "মনে আছে।"

"আমি তোমাকে পড়তে দিব না, আর তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখবে।"

"ঠিক আছে।" মিথিলা এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

বুলবুল তার দুই ডানা বিস্তৃত করে একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। মিথিলা পেছন থেকে তার গলা ধরে তার পিঠে ঝুলে পড়ল। বুলবুল জিজ্ঞেস করল, "তুমি ঠিক করে ধরেছ?"

"ধরেছি।"

"ঠিক আছে তা হলে আমরা উড়ছি।"

বুলবুল তার শক্তিশালী ডানা দুটি ঝাপটে সামনে কয়েক পা এগিয়ে পা দিয়ে নিচে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠে পড়ে। মিথিলা শক্ত করে বুলবুলের গলা চেপে ধরে ভয়ের একটা শব্দ করল, প্রথমে বুলবুল খানিকটা নিচে নেমে আসে তারপর খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে। ডানা ঝাপটে বুলবুল মিথিলাকে নিয়ে বনভূমির দিকে উড়ে যায়, গাছের উপর দিয়ে সে আকাশের দিকে এগুতে থাকে, দেখে মনে হয় সে বুঝি সোজা চাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বুলবুল জিজ্ঞেস করল, "তুমি ঠিক আছ?"

মিথিলা বলল, "হ্যাঁ। ঠিক আছি। তুমি?"

"আমিও ঠিক আছি।"

"তুমি কোথায় যাবে বল?"

"তোমার যেখানে ইচ্ছা।"

বুলবুল ডানা ঝাপটে মিথিলাকে আরো উপরে নিয়ে যায়। মিথিলা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে নিচে তাকিয়ে থাকে। জোছনার আলোতে নিচের বনভূমিকে রহস্যময় মনে হয়। ছোট ছোট খাল, নদী বনভূমিকে জড়িয়ে রেখেছে, জোছনার আলোতে সেগুলো চিকচিক করছে। চারপাশ নিস্তব্ধ, এতটুকু শব্দ নেই, তার মাঝে পাশ দিয়ে হঠাৎ একটা রাতজাগা পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। মিথিলা চমকে উঠল, "ওটা কী?"

"আমার বন্ধু।"

"তোমার বন্ধু?"

"হ্যাঁ। মাঝে মাঝে অনেক রাতে আমি যখন আকাশে উড়ি তখন সে আমার সাথে সাথে ওড়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী মজা! সব পাখি তোমার বন্ধু?"

"হ্যাঁ সব পাখি আমার বন্ধু। আমি ওদের দেখেশুনে রাখি। ওরা খুব ভালো। ওরাও আমাকে দেখেশুনে রাখে।"

মিথিলা বুলবুলের গলা জড়িয়ে ধরে তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে নিচে তাকায়। তার ভেতরে অত্যন্ত বিচিত্র এক ধরনের অনুভূতির জন্ম হয়, যে অনুভূতির সাথে তার পরিচয় নেই। সে ফিসফিস করে বলল, "আমার কী মনে হচ্ছে জান?"

"কী?"

"আমার মনে হচ্ছে আমি সারা জীবন এখানে থেকে যাই। আমার কী যে ভালো লাগছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।"

"আমি জানি তুমি এখানে থাকবে না। কেমন করে থাকবে? থাকার কোনো উপায় নাই। আমার থাকতে হয় তাই থাকি। তা না হলে কি আমি থাকতাম? কিন্তু তুমি যে বলেছ তোমার এখানে থেকে যাওয়ার ইচ্ছে করছে, সে জন্যেই আমি খুশি! আমার যখন মন খারাপ হবে তখন আমি তোমার এই কথাটা মনে করব!"

তখন মিথিলা তার মন খারাপের কথা বলল। তার মায়ের কথা বলল, তার মা কেমন করে মারা গেল সেই কথা বলল। তার স্কুলের কথা বলল, তার বন্ধুদের কথা বলল। বুলবুল তার জন্মের কথা বলল, জহুরের কথা বলল, আনোয়ারার কথা বলল। ডক্টর সেলিমের কথা বলল, লিপির কথা বলল। মিথিলা তার খেলার সাথীদের কথা বলল, তারপর গুনগুন করে একটা গান গেয়ে শোনাল।

ধীরে ধীরে যখন পুবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে তখন বুলবুল মিথিলাকে নিয়ে ফিরে আসে। তাকে লঞ্চের ছাদে নামিয়ে দিয়ে সে উড়ে যায়। তার সমস্ত শরীর ক্লান্ত কিন্তু বুকের ভেতর বিচিত্র এক ধরনের অনুভূতি—যার সাথে সে পরিচিত না। যেটা সে কোনোভাবে বুঝতে পারছিল না।

AMARBOI.COM

পরদিন ভোরে ডক্টর আশরাফ নাশতার টেবিলে তার মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে মেয়ের কেবিনে গিয়ে দেখতে পেল সে ঘুমে কাদা হয়ে আছে। ডক্টর আশরাফ ডেকে বলল, "মিথিলা, মা উঠবি না? নাশতা করবি না?"

মিথিলা ঘুমের মাঝে বিড়বিড় করে বলল, "খুব ঘুম পাচ্ছে আব্বু! আমি এখন উঠব না!"

ডক্টর আশরাফ মেয়েকে আর বিরক্ত করল না, সারা রাত ঘুমানোর পরেও কেমন করে একজনের ঘুম পায় সেটা সে বুঝতে পারল না। এই বয়সী মেয়েদের তাদের বাবারা নিশ্চয়ই কখনো বুঝতে পারে না।

রাত্রিবেলা খাবার টেবিলে ডক্টর আশরাফ ঘোষণা করল তাদের এবারকার অভিযান শেষ, পরদিন ভোরে তারা ফিরে যাচ্ছে।

মিথিলা চমকে উঠে বলল, "ফিরে যাচ্ছি?"

"হ্যাঁ।"

"কেন আব্বু? এত তাড়াতাড়ি কেন?"

ডক্টর আশরাফ হেসে ফেলল, বলল, "তাড়াতাড়ি? এই কয়দিন আগেই তুই একেবারে অধৈর্য হয়ে গিয়েছিলি কখন ফিরে যাব! এখন বলছিস তাড়াতাড়ি?"

"হ্যাঁ আব্বু।" মিথিলা ইতস্তত করে বলল, "আগে আমার ভালো লাগছিল না। এখন ভালো লাগছে।"

"ভালো লাগলে ভালো। আমরা আবার আসব।"

"কিন্তু—"

"আরো কয়েক দিন থাক না আব্বু। অন্য কিছু স্টাডি কর।"

"অন্য কী স্টাডি করব?"

"বনে কত কী আছে। গাছপালা সাপ ব্যাঙ গোসাপ—"

ডক্টর আশরাফ হেসে বলল, "আমি তো গাছপালা সাপ ব্যাঙের এক্সপার্ট না। আমি পাখির এক্সপার্ট—"

"তা হলে পাখিই স্টাডি কর!"

এ রকম সময় খাবার টেবিলে একপাশে বসে থাকা চশমা পরা একজন বলল, "স্যার, মিথিলার কথায় একটা যুক্তি আছে।"

"কী যুক্তি?"

"আজকে আমাদের লঞ্চের ছাদে এটা পেয়েছি।" বলে চশমা পরা ছেলেটি ডক্টর আশরাফের দিকে একটা পালক এগিয়ে দেয়। পালকটি কমপক্ষে এক ফুট লম্বা এবং সেটি দেখে একসাথে সবাই বিস্ময়ের একটা শব্দ করল। ডক্টর আশরাফ পালকটি হাতে নিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বলে, "এর অর্থ তোমরা কি জান?"

"কী স্যার?"

"এর অর্থ এই পাখিটির ডানার বিস্তৃতি ছয় থেকে আট মিটার।"

"এটা কী পাখি স্যার?"

"আমি জানি না।"

একজন অবাক হয়ে বলল, "আপনি জানেন না?"

"না। আমার জানামতে এত বড় পাখি পৃথিবীতে নেই।"

"তা হলে এটা কোথা থেকে এল স্যার?"

ডক্টর আশরাফ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি জানি না।"

"আমরা কি এটা নিয়ে একটু স্টাডি করব? এটা খুঁজব?"

"আমরা গত কয়েক দিন যেভাবে স্টাডি করেছি তাতে এই পাখিটার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া উচিত ছিল। যেহেতু পাই নি—"

ডক্টর আশরাফ আবার চুপ করে যায়, চশমা পরা ছেলেটি বলল, "যেহেতু পাই নি?"

"যেহেতু পাই নি তার অর্থ, পাখিটা অনেক বুদ্ধিমান। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে।"

মিথিলা আস্তে আস্তে বলল, "হয়তো এটা পাখি না।"

"এটা পাখি না? এটা তা হলে কী?"

"হয়তো এটা পরী।"

সবার জোরে হেসে ওঠার কথা ছিল, কিন্তু কেউ হেসে উঠল না।

গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে গেছে তখন মিথিলা নিঃশব্দে লঞ্চের ছাদে উঠে এল। চাঁদের আলো খুব বিচ্ছিন্ন, জোছনা রাতে সেটি ঝলমল করতে থাকে কিন্তু একদিন পরেই মনে হয় তার ঔজ্জ্বল্য কমে এসেছে। মিথিলা চাঁদটির দিকে তাকিয়ে থাকে, দুই পাশে গহিন অরণ্য,

সেখানে কোনো শব্দ নেই, কিন্তু তার মাঝে কত বিচিত্র প্রাণী তাদের জীবনকে তাদের নিজেদের মতো করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মিথিলা নিঃশব্দে লঞ্চের ছাদে পায়চারি করতে থাকে। চাঁদটা যখন একটু ঢলে পড়ল তখন সে দেখতে পেল বিশাল একটা পাখির মতো ডানা মেলে বুলবুল লঞ্চটাকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘুরছে। ধীরে ধীরে বৃত্তটিকে ছোট করে নিঃশব্দে বুলবুল লঞ্চের ছাদে নেমে এল।

মিথিলা এগিয়ে গিয়ে বুলবুলের হাত ধরে বলল, "তুমি এত দেরি করে এসেছ?"

বুলবুল ফিসফিস করে বলল, "আমি আরো আগে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু লঞ্চে মানুষজন জেগে আছে, চলাফেরা করছে; তাই দেরি হল। কেউ আমাকে দেখে ফেললে কী বিপদ হবে জান?"

মিথিলা মাথা নেড়ে বলল, "জানি। বিপদ মনে হয় একটু হয়েছে।"

"কী বিপদ?"

"তোমার একটা পালক এইখানে খুঁজে পেয়েছে। সেইটা দেখে সবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সবাই বলছে, এত বড় পালক কোনো পাখির হতে পারে না।"

"সর্বনাশ।"

"হ্যাঁ। তোমাকে খুব সাবধান থাকতে হবে।"

"ঠিকই বলেছ।"

"তোমাকে যদি কেউ দেখে তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

বুলবুল মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ। সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

মিথিলা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা কাল সকালে চলে যাব।"

"চলে যাবে?"

"হ্যাঁ। আমার খুব মন খারাপ হবে।"

বুলবুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমারও।"

মিথিলা বলল, "আমার মনে হচ্ছে কেন তোমার সাথে দেখা হল? দেখা না হলেই তো মন খারাপ হত না।"

বুলবুল মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমার সেটা মনে হচ্ছে না। আমার কী মনে হচ্ছে জান?"

"কী?"

"আমার মনে হচ্ছে আমার কী সৌভাগ্য যে তোমার সাথে দেখা হল, এখন আমি সারা জীবন তোমার কথা মনে রাখতে পারব।" বুলবুল আস্তে আস্তে বলল, "আমি যখন আকাশে উড়ব তখন ভাবব একদিন তোমাকে নিয়ে আমি আকাশে উড়েছিলাম।"

মিথিলা ফিসফিস করে বলল, "আমার আসলে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না।"

বুলবুল কথাটির কোনো উত্তর দিল না, একটু পরে বলল, "তুমি কি আজকে আবার উড়তে চাও?"

"তোমার কোনো কষ্ট হবে না।"

"না। কোনো কষ্ট হবে না।"

"তা হলে চল যাই।"

কিছুক্ষণের ভেতর বুলবুল মিথিলাকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। ঠিক তখন একজন ডক্টর আশরাফের কেবিনে জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছিল। ডক্টর আশরাফ ঘুম থেকে উঠে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আপনি বিশ্বাস করবেন না স্যার। নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবেন না।"

"কী হয়েছে?"

"বিশাল বড় একটা পাখির পালক কোথা থেকে এসেছে আমি জানি।"

"কোথা থেকে।"

"একজন মানুষ, তার পাখির মতন পাখা।"

ডক্টর আশরাফ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। বলল, "কী বলছ?"

"বলছি, একজন মানুষ তার পাখির মতো পাখা।"

"সে কোথায়?"

"মিথিলাকে নিয়ে আকাশে উড়তে গেছে। একটু পরে আসবে।"

"মি–মিথিলাকে নিয়ে? মিথিলাকে?"

"হ্যাঁ স্যার। মানুষটা মিথিলাকে চিনে, দুজন খুব বন্ধু। আমি স্যার তাদের কথা শুনেছি।"

ডক্টর আশরাফ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সবাইকে ডেকে তোলো। এই ক্রিয়েচারটাকে ধরতে হবে। মনে হয় এটা হবে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।"

ঘণ্টা দুয়েক পর যখন মিথিলাকে পিঠে নিয়ে বুলবুল লঞ্চের ছাদে নেমে এল তারা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে নি প্রায় দুই ডজন মানুষ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মিথিলা তার পিঠ থেকে নেমে যখন বুলবুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন একসাথে সবাই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুহূর্তের মাঝেই বুলবুল বুঝে যায় কী হচ্ছে, সে তার শক্তিশালী পাখা দিয়ে আঘাত করে কয়েকজনকে নিচে ফেলে দেয়। পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, কেউ একজন একটা লোহার রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেছে, জ্ঞান হারিয়ে অচেতন হওয়ার আগে সে শুনতে পেল মিথিলা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলছে, "না! না! না!"

মিথিলাকে ডক্টর আশরাফ ধরে রাখতে পারছে না, আরো দুজন মিলে মিথিলাকে আটকে রেখেছে। সে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো চিৎকার করে কাঁদছে, তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

৪

বুলবুলকে পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। শুধু হাত বেঁধেই কেউ নিশ্চিত হতে পারে নি, তাই পা দুটিকেও শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। লঞ্চের ছাদে রেলিংয়ের সাথে তার শরীরটা বেঁধে রাখা হয়েছে। তার সারা দেহ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। সে জানত তাকে যদি ধরে ফেলতে পারে সেটাই হবে তার শেষ, তাই সে প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিল, এতগুলো মানুষের সাথে সে একা কিছুতেই পেরে ওঠে নি। শেষ মুহূর্তে একজন লোহার রড দিয়ে মাথায় মেরে বসেছে, তখন সে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তা না হলে সে হয়তো কোনোভাবে নিজেকে মুক্ত করে উড়ে যেতে পারত। খুব ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। তার চারপাশে কী ঘটছে সে ভালো করে বুঝতে পারছে না। শুনতে পেল কেউ একজন বলল, "জ্ঞান ফিরেছে! স্যারকে ডাকো। স্যারকে ডাকো।"

কিছুক্ষণের মাঝেই ডক্টর আশরাফ লঞ্চের ছাদে চলে এল। বুলবুলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। তাকে ডাকল, "এই।"

বুলবুল চোখ খুলে তাকাল, কোনো কথা বলল না। ডক্টর আশরাফ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

বুলবুল কোনো কথা বলল না। তার কথা বলার ইচ্ছে নেই, তা ছাড়া সে কোথা থেকে এসেছে সেটা সে কাউকে কেমন করে বোঝাবে? ডক্টর আশরাফ আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?"

বুলবুল কোনো উত্তর দিল না। ডক্টর আশরাফ আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী?"

বুলবুল কষ্ট করে চোখ তুলে ডক্টর আশরাফের দিকে তাকাল, তারপর ফিসফিস করে বলল, "আমি জানি না। আপনি বলবেন আমি কী?"

ডক্টর আশরাফ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর উঠে দাঁড়ায়। যারা তার আশপাশে ছিল তাদের লক্ষ করে বলল, "এই ক্রিয়েচারটাকে একটু পরীক্ষা করা দরকার। মেডিকেল পরীক্ষা।"

একজন একটু এগিয়ে এসে বলল, "করেছি স্যার।"

"কী দেখেছ?"

"অনেক ব্লাড লস হয়েছে। মানুষ হলে বলতাম রক্ত দিতে হবে। কিন্তু এটা তো মানুষ না, কী বলব বুঝতে পারছি না। কী ট্রিটমেন্ট করব বুঝতে পারছি না।"

"বেঁচে থাকবে?"

"জানি না স্যার। মাথার পেছনে রড দিয়ে মারা হয়েছে, ব্রেন ইনজুরি হয়েছে কি না বুঝতে পারছি না। মানুষ হলে এতক্ষণে মরে যেত।"

ডক্টর আশরাফ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এই প্রাণীটা মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রাণী। চেষ্টা কর এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে।'

"চেষ্টা করব স্যার।"

"তবে শেষ পর্যন্ত অবশ্য বেঁচে না থাকলে ভালো।"

"কেন স্যার?"

"প্রাণীটার মানুষ অংশটা খুব প্রবল। আমার মেয়েকে মুগ্ধ করে ফেলেছে, বুঝতে পারছ না? যদি তার কথাবার্তা চিন্তাভাবনা মিডিয়াতে চলে আসে সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবাই তখন এটার ইমোশনাল অংশটা নিয়ে কথা বলবে। সায়েন্টিফিক অংশটা চাপা পড়ে যাবে।"

"তা হলে কি স্যার এটাকে মেরে ফেলব?"

"এই মুহূর্তে না। আমাদের ঢাকা ফিরতে ফিরতে এখনো তিন দিন। এর আগে আমরা কাউকে কিছু জানতে দিচ্ছি না। এই তিন দিন নিজেরা এটাকে স্টাডি করি। ঢাকায় ফেরার পর দেখা যাক। কাজেই তোমরা কেউ বিশ্রাম নেবে না, সবাই কাজ কর।"

উৎসাহী বিজ্ঞানীরা মাথা নাড়ল, বলল, "জি স্যার। আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি না।"

"ছবি ভিডিও তোলার আগে রক্ত মুছে নিও। ইনজুরিগুলো যেন দেখা না যায়—প্রাণীটার মাঝে মানুষ মানুষ ভাব থাকায় মুশকিল। কেউ দেখলে অন্য রকম ভাবতে পারে!"

"জি স্যার। এখন মানুষের সমস্যা নিয়ে মানুষেরা যত ভাবে পশুপাখির সমস্যা নিয়ে তার থেকে বেশি ভাবে।"

"ঠিকই বলেছ।"

ঠিক এ রকম সময় মিথিলাকে তার কেবিনে আটকে রাখা হয়েছিল। যে মানুষটি তার জন্যে খাবার এনেছে সে খানিকটা নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে আছে, কারণ মিথিলা পুরো ভাত তরকারি তার মুখের ওপর ছুড়ে মেরেছে। খবর পেয়ে ডক্টর আশরাফ এসেছে। তাকে দেখে মিথিলা অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে বলল, "আব্বু।"

"বলো মিথিলা।"

"এটা কি সত্যি তুমি ওদের বলেছ আমাকে কেবিনের মাঝে তালা মেরে রাখতে?"

ডক্টর আশরাফ বলল, "এটাকে অন্যভাবে নিও না। তোমার ভালোর জন্যে আমরা তোমাকে এখানে আটকে রাখছি।"

"আমার ভালোর জন্যে?" মিথিলা চিৎকার করে বলল, "আমার ভালোর জন্যে?"

"হ্যাঁ। তুমি অত্যন্ত নির্বোধের মতো কিছু কাজ করেছ।"

"কী কাজ করেছি?"

"পাখাওয়ালা এ প্রাণীটার সাথে ওড়ার চেষ্টা করেছ! তুমি কি জান তুমি কত বড় ঝুঁকি নিয়েছিলে?"

"কীসের ঝুঁকি?"

"প্রাণীটা যদি তোমাকে ওপর থেকে ফেলে দিত?"

"ফেলে দিত? আমাকে? কেন আমাকে ফেলে দিবে?"

ডক্টর আশরাফ বলল, "এ রকম ভয়ঙ্কর একটা বন্যপ্রাণী যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তুমি কেমন করে তার পিঠে উঠে আকাশে উড়তে গেলে? তোমার কি বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই?"

"আব্বু! ও মোটেও বন্যপ্রাণী না—"

"আমার সাথে তর্ক করবে না। আমি এই বিষয়গুলো তোমার থেকে অনেক বেশি জানি। তুমি কি জানো সে কত হিংস্রভাবে আমার স্টুডেন্টদের আক্রমণ করেছে? আরেকটু হলে এটা তাদের মেরেই ফেলত।"

"আব্বু! তোমরা ওকে ধরার চেষ্টা করেছ আর সে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে না?"

ডক্টর আশরাফ মাথা নেড়ে বলল, "খুব একটা লাভ হয় নাই। তাকে আমরা ঠিকই ধরেছি।"

"শুধু ধরো নাই তাকে তোমরা মেরেছ।" হঠাৎ করে মিথিলার গলা ভেঙে গেল, বলল, "কেমন আছে এখন?"

"আছে একরকম।"

"বেঁচে আছে, নাকি তোমরা মেরে ফেলেছ?"

"মেরে ফেলব কেন?"

"লোহার রড দিয়ে তোমরা তার মাথায় মেরেছ—"

"আমাদের সেফটির জন্যে। একটা বন্যপ্রাণী আমাদের আক্রমণ করবে আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব?"

মিথিলা একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আমাকে কেবিন থেকে বের হতে দিবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না।"

"ওকে একবার দেখতে দিবে?"

"কোনো প্রশ্নই আসে না।"

"আমাকে বাথরুমেও যেতে দিবে না?"

"সেটা দেব, তবে খুব সাবধানে। দেখতে হবে তুই যেন কোনো পাগলামি না করিস।" একটু থেমে যোগ করল, "আমরা ঢাকা রওনা দিয়ে দিয়েছি, দুই দিনে ঢাকা পৌঁছে যাব, তখন তোর যা ইচ্ছে হয় করিস।"

ডক্টর আশরাফ চলে যাওয়ার পর মিথিলা কেবিনটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করল। লোহার দেয়াল, লোহার দরজা, ভেঙে বের হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। দরজার মাঝে কাচ লাগানো আছে, সেই কাচ ভেঙে ফেলা যাবে। কিন্তু বড়জোর সে তার হাতটা বের করতে পারবে। যদি কোনোভাবে তালার চাবিটা পেতে পারত তা হলে হাত বের করে তালাটা খুলতে পারত। কিন্তু চাবি পাবে কোথায়?

ঠিক তখন তার একটা জিনিস মনে পড়ল, বাথরুমেও তালা দেয়া আছে। ভাড়া করা লঞ্চ, কেবিনের প্যাসেঞ্জারের জন্যে আলাদা বাথরুম রয়েছে। সাধারণ মানুষেরা যেন যেতে না পারে সে জন্যে তালা মারা থাকে, কেবিনের মানুষেরা যাওয়ার সময় চাবি নিয়ে খুলে বাথরুমে যায়। বাথরুমের চাবিটা প্রথমে নিজের কাছে রাখতে হবে, তারপর খুব সাবধানে তার কেবিনের তালাটাকে বাথরুমের তালা দিয়ে পাল্টে দিতে হবে। তারপর যখন কেউ লক্ষ করবে না তখন দরজার কাচ ভেঙে হাত বের করে চাবি দিয়ে তালাটা খুলে ফেলতে হবে, কাজটা সহজ নয় কিন্তু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

কাজেই মিথিলা খুব ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করল। সে এর আগে কখনোই এ রকম কিছু করে নি, আজকে করবে। খুব ঠাণ্ডা মাথায় সে পুরোটা করবে, একটা শেষ চেষ্টা করবে।

রাতের খাবারটা সে আগের বারের মতো মানুষটার মুখে ছুড়ে দিল না। সে খানিকটা খেলো এবং খানিকটা লুকিয়ে রাখল। গভীর রাতে সবাই যখন মোটামুটি ঘুমিয়ে গেছে, তখন সে ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখা ভাত-তরকারি পানির সাথে মিশিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে বমি করার মতো শব্দ করতে থাকে। সাথে সাথে দরজায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ করতে থাকে।

কিছুক্ষণের মাঝেই খবর চলে গেল এবং ডক্টর আশরাফ উদ্বিগ্ন মুখে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে মিথিলা?"

"শরীর খারাপ লাগছে আব্বু। বমি হচ্ছে।"

"বমি হচ্ছে? কেন?"

"জানি না।" বলে আবার সে বমি করার ভঙ্গি করল, মনে হল আবার বমি করে দেবে। ডক্টর আশরাফ তাকে ধরল, মিথিলা দরজার কপাট ধরে বমি করার ভঙ্গি করে দরজায় লাগানো তালাটা সাবধানে খুলে নেয়।

মিথিলা টলতে টলতে হেঁটে বাইরে ঝোলানো বাথরুমের চাবিটা নিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে যায়। ডক্টর আশরাফ বলল, "আমি খুলে দিই।"

মিথিলা বিড়বিড় করে বলল, "আমি পারব।"

সে বাথরুমের তালাটা খুলে হাতে নিয়ে সেখানে তার ঘরের তালাটা ঝুলিয়ে দেয়। বাথরুমের ভেতর ঢুকে সে দরজা বন্ধ করে একটা বড় নিঃশ্বাস নেয়। এখন পর্যন্ত সবকিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিকল্পনামতো হয়েছে। মিথিলার ইচ্ছে করল সে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দেয়। বাথরুমের ভেতর সে কয়েকবার বমি করার শব্দ করল, তারপর পানি ছিটিয়ে হাত-মুখ ধুতে শুরু করল। সে তার স্যুটকেসের চাবিটা নিয়ে এসেছে, সুতলি দিয়ে বাঁধা বাথরুমের চাবিটার জায়গায় স্যুটকেসের চাবিটা লাগিয়ে নেয়। বাথরুমের চাবিটা কোমরে গুঁজে নিয়ে সে বাথরুম থেকে বের হল, বাইরে ডক্টর আশরাফ ঘুমঘুম চোখে দাঁড়িয়ে ছিল, মিথিলাকে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ ঠিক আছে।"

"তা হলে ঘুমিয়ে যা।"

"ঘুম আসছে না। তোমার কাছে ঘুমের ট্যাবলেট আছে?"

"হ্যাঁ, আছে।"

"বেশি করে কয়েকটা দেবে? খেয়ে ঘুমাব।"

"বেশি করে নয়। একটা দিচ্ছি, খেয়ে ঘুমিয়ে যা।"

মিথিলা তখন সুতলিতে বাঁধা স্যুটকেসের চাবিটা বাথরুমের চাবি হিসেবে আগের জায়গায় ঝুলিয়ে দেয়, তারপর নিজের ঘরে ঢোকে, ঢোকার সময় দরজার কড়ায় সে বাথরুমের তালাটা ঝুলিয়ে দিল। তারপর ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

ডক্টর আশরাফ একজন লোককে ডাকিয়ে মিথিলার ঘরটা একটু পরিষ্কার করিয়ে দেয়। তারপর মিথিলার হাতে একটা ট্যাবলেট দিয়ে বলল, "এটা খেয়ে ঘুমিয়ে যা।"

"দুইটা দাও।"

"দুইটা লাগবে না। একটাই যথেষ্ট।"

"না আব্বু। আমাকে দুইটা দাও। আমি মড়ার মতো ঘুমাতে চাই।"

একটু ইতস্তত করে ডক্টর আশরাফ তাকে দুইটা ট্যাবলেট দিল। মিথিলা দুইটা ট্যাবলেট নিয়ে মুখে দিয়ে ঢকঢক করে পানি খেয়ে বলল, "এখন আমি ঘুমাব।"

ডক্টর আশরাফ বলল, "হ্যাঁ, এখন ঘুমিয়ে যা।"

"গুড নাইট আব্বু।" বলে সে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে জিভের নিচে লুকিয়ে রাখা ট্যাবলেট দুটো বের করে ফেলল, কী কুৎসিত গন্ধ, মনে হল এবারে বুঝি সে সত্যি সত্যি বমি করে দেবে।

মিথিলা আরো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করল তারপর সে উঠে বসল। কেউ এখন তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না, সবাই জানে সে দুইটা ঘুমের ট্যাবলেটই খেয়ে মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে। মিথিলা স্যুটকেস থেকে তার একটা টি-শার্ট বের করে হাতে পেঁচিয়ে নিয়ে সাবধানে দরজার কাচে আঘাত করে। দরজার কাচকে সে যতটুকু শক্ত ভেবেছিল সেটা তার থেকে অনেক বেশি শক্ত। কোনো কিছু দিয়ে জোরে আঘাত করে ইচ্ছে করলেই সে কাচটা ভেঙে ফেলতে পারে কিন্তু সে কোনো শব্দ করতে চাচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টার পর কাচে একটা ফাটল তৈরি হল, তখন সে সাবধানে চাপ দিয়ে একটা বড় টুকরো আলাদা করে নেয়। চাপ দিয়ে সাবধানে আরো একটু ভেঙে সে আরো কয়েক টুকরো কাচ সরিয়ে নেয়। এখন মোটামুটিভাবে হাত বের করার মতো জায়গা হয়েছে। চাবিটা নিয়ে সে হাতটা বাইরে বের করে দরজার কড়াতে লাগানো তালাটা খোলার চেষ্টা করে। দুই হাতে যে কাজটি পানির মতো সহজ, এক হাতে সেই কাজটিই প্রায় অসম্ভব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ব্যাপার। তার ভয় করছিল হঠাৎ করে তার হাত থেকে চাবিটা না নিচে পড়ে যায়, তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!

শেষ পর্যন্ত মিথিলা তালার ভেতর চাবি ঢোকাতে পারল এবং একটু চাপ দিতেই তালাটা খুট করে খুলে যায়। মিথিলা দরজার কড়া থেকে তালাটা খুলে নিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি সে শেষ পর্যন্ত মুক্ত হতে যাচ্ছে।

মিথিলা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর খুব সাবধানে দরজা খুলে কেবিন থেকে বের হয়ে আসে। বাইরে আবছা অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই। লঞ্চের ইঞ্জিনের ধক ধক শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। মিথিলা রেলিংয়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। পানি কেটে লঞ্চটা এগিয়ে যাচ্ছে, বাইরে আবছা অন্ধকার। মিথিলা আবার নিজের কেবিনে ঢুকে একটা পানির বোতল আর তার নিজের একটা তোয়ালে নিয়ে খুব সাবধানে বের হয়ে এল। এদিক-সেদিক তাকিয়ে সে এবারে সাবধানে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল ছাদে ওঠার দরজায় কেউ থাকবে, কিন্তু সেখানে কেউ নেই। তার আরো বেশি ভয় হচ্ছিল উপরে কেউ পাহারায় থাকবে কিন্তু ভাগ্য ভালো সেখানেও কেউ নেই।

ছাদের রেলিংয়ে বুলবুলকে বেঁধে রেখেছে। সে মাথা নিচু করে অবসন্নের মতো বসে ছিল, মিথিলা ছুটে গিয়ে তাকে স্পর্শ করতেই সে চোখ খুলে তাকাল, মিথিলাকে দেখে মুহূর্তের মাঝে তার মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে। সে নরম গলায় বলল, "তুমি?"

"হ্যাঁ। আমি। আমাকে আটকে রেখেছিল, কোনোমতে পালিয়ে এসেছি!"

"আমি ভাবি নাই তোমার সাথে আর দেখা হবে।"

"আমিও ভাবি নাই।" মিথিলা তার মাথায় গালে হাত বুলিয়ে বলল, "কেমন আছ তুমি?"

"ভালো ছিলাম না। তুমি এসেছ এখন আমি খুব ভালো আছি।"

মিথিলা বলল, "কেউ এসে পড়ার আগে তোমাকে খুলে দিই।"

বুলবুল কোনো কথা বলল না। মিথিলা তার বাঁধন খুলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। খুব শক্ত করে বেঁধেছিল, মিথিলার খুব কষ্ট হল বাঁধন খুলতে। শেষ পর্যন্ত যখন খুলতে পারল তখন বুলবুল তার দুই হাত আর পায়ে হাত বুলিয়ে হাসার চেষ্টা করল।

মিথিলা টাওয়েলটা ভিজিয়ে তার মুখ থেকে শুকনো রক্ত মুছিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি এখন যাও। কেউ এসে পড়ার আগে তুমি যাও। এক্ষুনি যাও।"

বুলবুল অনেক কষ্ট করে হাসার চেষ্টা করল, বলল, "আমার যাওয়ার ইচ্ছে করছে না।"

মিথিলা তাকে টেনে দাঁড়া করিয়ে দিয়ে বলল, "লক্ষ্মী ছেলে আমার! ইচ্ছা না করলেও তোমাকে যেতে হবে।"

বুলবুল নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল কোনোমতে মিথিলাকে ধরে সামলে নেয়। নিজের পাখা দুটো একবার বিস্তৃত করে দেখে নেয় তারপর সে মিথিলার দিকে তাকাল, বলল, "ঠিক আছে মিথিলা।"

মিথিলা তার দুই হাত এগিয়ে দিয়ে বুলবুলকে গভীর মমতায় আলিঙ্গন করে ছেড়ে দিয়ে বলল, "যাও! তুমি উড়ে যাও।"

বুলবুল কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে মিথিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব ধীরে ধীরে তার দুই চোখ পানিতে ভরে ওঠে। সে ফিসফিস করে বলল, "মিথিলা।"

"বল।"

"তুমি আমাকে মনে রেখো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মনে রাখব। আমি তোমাকে মনে রাখব।"

"আমি তা হলে যাই?"

"যাই বলতে হয় না। বলতে হয় আসি।"

"আমি তা হলে আসি?"

"আস বুলবুল।"

বুলবুল তখন এগিয়ে যেতে থাকে। খুব ধীরে ধীরে তার দুই পাখা বিস্তৃত করে ডানা ঝাপটিয়ে সে উপরে উঠে যায়। মিথিলা দেখতে পায় বিশাল শক্তিশালী দুটি পাখা দুর্বল ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে উপরে তুলে নেয়ার চেষ্টা করছে, অনেক কষ্টে সে উড়ে যাচ্ছে, উড়ে যেতে যেতে সে একবার পেছনে ফিরে তাকাল।

মিথিলা তার মুখে অনেক কষ্টে একটা হাসি ধরে রাখে। হাসি হাসি মুখে সে বুলবুলের দিকে তাকিয়ে তার হাত নাড়ে। বুলবুল আবার মাথা ঘুরিয়ে নিল, তারপর ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যেতে লাগল। খুব ধীরে ধীরে সে দূরে সরে যেতে থাকে, মিলিয়ে যেতে থাকে।

পুবের আকাশে তখন সূর্য উঠছে, দেখে মনে হয় বুলবুল বুঝি ডানা ঝাপটিয়ে ঠিক সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইকারাসের মতো।

মিথিলা তখন তার দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কাঁদল।

AMARBOI.COM

শেষ কথা

মিথিলা তার শিশুসন্তানটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ঘুমাও বাবা আর কত দুষ্টুমি করবে?"

"আগে তুমি গল্প বল, তা হলে ঘুমাব।"

মিথিলা তখন তাকে ডেডিলাসের পুত্র ইকারাসের গল্প বলল। ইকারাস তার ডানা ঝাপটিয়ে কীভাবে সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই গল্পটুকু বলার সময় মিথিলা কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। তার শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

আম্মু কেন এটা করে মিথিলার শিশুপুত্র বুলবুল সেটা কখনো বুঝতে পারে না। বুলবুল শুধু একটা জিনিস জানে—তার আম্মু তাকে খুব ভালবাসে, কারণে-অকারণে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, "বুলবুল! আমার সোনা বুলবুল!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ত নিশি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ পূর্বকথা

তরুণী মা'টি অনেক কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে দোলনায় শুয়ে থাকা শিশুটির দিকে তাকাল। মা'কে দেখে শিশুটির দাঁতহীন মুখে একটি মধুর হাসি ফুটে ওঠে। সে চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং একসাথে দুই হাত দুই পা নাড়তে থাকে, ইঙ্গিতটি খুব স্পষ্ট, সে মায়ের কোলে উঠতে চায়। মায়ের শিশুটিকে কোলে নেওয়ার ক্ষমতা নেই, দুর্বল হাতে শিশুটির মুখ স্পর্শ করে ফিসফিস করে বলল, "বেঁচে থাকিস বাবা। একা হলেও বেঁচে থাকিস।"

শিশুটি মায়ের কথার অর্থ বুঝতে পারল না কিন্তু কথার পেছনের ভালবাসা আর মমতাটুকু অনুভব করতে পারল। সে হঠাৎ করে আরো চঞ্চল হয়ে ওঠে, দুই হাত আর দুই পা ছোড়ার সাথে সাথে মুখ দিয়ে সে এক ধরনের অব্যক্ত অর্থহীন শব্দ করল। মা আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে সে কাশতে শুরু করে এবং কাশির সাথে সাথে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হয়ে আসে। তরুণী মা'টি অনেক কষ্ট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল। তার ঠিক পেছনেই ক্রিনিটি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রিনিটি তৃতীয় মাত্রার একটি রোবট, অনেক দিন থেকে সে এই পরিবারকে দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করে আসছে।

তরুণী মা একটু শক্তি সঞ্চয় করে বলল, "ক্রিনিটি, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। আমি তোমাকে যা বলি তুমি একটু মন দিয়ে শোনো।"

ক্রিনিটি কোনো কথা বলল না, সে জানে মানুষ বেশিরভাগ সময়ই অর্থহীন কথা বলে। মানুষের যে কোনো কথাই তার গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হয়, সেটি আলাদাভাবে তাকে বলার প্রয়োজন নেই। তরুণী মা'টি একটি বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "আমার মনে হয় নিকি বেঁচে যাবে। যে ভাইরাসটি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে মেরে ফেলছে সেটি আমার এই বাচ্চাটিকে মারতে পারে নি। আমার বাচ্চার শরীরে এই ভাইরাসের প্রতিষেধক আছে।"

ক্রিনিটি বলল, "আমার ধারণা সত্যি। এই ভাইরাসের আক্রমণে সবার আগে শিশুরা মারা গেছে। নিকির কিছু হয় নি।"

"আমি আর কিছুক্ষণের মাঝেই মারা যাব ক্রিনিটি। তখন এই নিকিকে দেখার কেউ থাকবে না। কেউ থাকবে না।" তরুণী মা কষ্ট করে একটি কাশির দমক সামলে নিয়ে বলল, "ক্রিনিটি, তখন তোমাকে এই বাচ্চাটাকে দেখতে হবে। যতদিন সে নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে না পারবে ততদিন তাকে তোমার দেখেশুনে রাখতে হবে।"

ক্রিনিটি কোনো কথা বলল না, মানুষ যখন তাকে কোনো আদেশ দেয় তাকে সব সময় সেই আদেশ মানতে হয়। তরুণী মা'টি কিন্তু একটু অস্থির হয়ে উঠল, বলল, "তুমি কথা বলছ না কেন ক্রিনিটি? তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিনিটি বলল, "আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি।"

"তা হলে তুমি আমাকে কথা দাও, তুমি আমার সোনামণি নিকিকে দেখে রাখবে।"

"আমি নিকিকে দেখে রাখব।"

"তুমি আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।"

ক্রিনিটি তার কপোট্রনে একটি অসম বৈদ্যুতিক চাপ অনুভব করল, মানুষ সব সময়ই অর্থহীন কাজ করে। একটি কথা উচ্চারণ করার জন্যে কখনোই কারো গা ছুঁতে হয় না। অন্য সময় হলে সে ব্যাপারটি বোঝানোর চেষ্টা করত কিন্তু এখন সে তার চেষ্টা করল না। কম বয়সী এই তরুণীটি কিছুক্ষণের মাঝেই মারা যাবে, সে কী কথা বলতে চায় সেটি জেনে রাখা প্রয়োজন। ক্রিনিটি তার শীতল হাত দিয়ে তরুণী মা'টির হাত স্পর্শ করে বলল, "আমি তোমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।"

তরুণী মা'টির মুখে তখন অত্যন্ত ক্ষীণ একটি হাসি ফুটে ওঠে। সে একটি বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ক্রিনিটি। অনেক ধন্যবাদ।"

ক্রিনিটি কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। এই তরুণী মা'টির দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারছে খুব দ্রুত তার জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসছে। ছোট শিশুটি দোলনা থেকে আবার তার দুই হাত-পা ছুড়ে একটি অব্যক্ত শব্দ করে তার মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। মা শিশুটির দিকে একনজর তাকিয়ে আবার ঘুরে ক্রিনিটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্রিনিটি। তুমি আমাকে কথা দাও যে তুমি আমার বাচ্চাটিকে ভালবাসা দিয়ে বড় করবে।"

ক্রিনিটি নিচু গলায় বলল, "আমি দুঃখিত। আমার ভেতরে কোনো মানবিক অনুভূতি নেই। কেমন করে ভালবাসতে হয় আমি জানি না।"

তরুণী মেয়েটি হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, "তোমাকে জানতে হবে। সারা পৃথিবীর মাঝে শুধু আমার এই বাচ্চাটা বেঁচে আছে, তাকে মানুষের মতো বড় করতে হবে। তাকে ভালবাসা দিয়ে বড় করতেই হবে।"

পুরোপুরি অর্থহীন একটি কথা, কিন্তু ক্রিনিটি প্রতিবাদ করল না। এই মেয়েটির সাথে এখন যুক্তি দিয়ে কথা বলার সময় পার হয়ে গেছে; এখন কোনো প্রতিবাদ না করে মেয়েটির কথাগুলো শুনতে হবে। অর্থহীন, অযৌক্তিক এবং অবাস্তব হলেও শুনতে হবে।

তরুণী মা'টি দোলনাটি ধরে কয়েকটা বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "ক্রিনিটি তুমি ভালো করে শুনে রাখ। আমার এই বাচ্চাটি যেরকম বেঁচে গেছে সেরকম পৃথিবীতে আর এক-দুটি বাচ্চা বেঁচে গেছে। তুমি আমার বাচ্চাটিকে তাদের কাছে নিয়ে যাবে। বুঝেছ?"

ক্রিনিটি শান্ত গলায় বলল, "বুঝেছি? কিন্তু—"

"আমি কোনো কিন্তু শুনতে চাই না ক্রিনিটি। তুমি যেভাবে পার তাদের খুঁজে বের করবে। আমার বাচ্চাটিকে তাদের কাছে নিয়ে যাবে। এই কথাটি তোমার মনে থাকবে?"

ক্রিনিটি বলল, "মনে থাকবে।"

"তুমি আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি সেটি করবে।"

অত্যন্ত অযৌক্তিক একটি ব্যাপার কিন্তু তবুও ক্রিনিটি তার শীতল ধাতব হাত দিয়ে দ্বিতীয়বার তরুণী মা'টির হাত স্পর্শ করে বলল, "আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে তোমার বাচ্চাটিকে আমি অন্য বাচ্চার কাছে নিয়ে যাব।"

তরুণী মা'টি ক্রিনিটির হাত ধরে বলল, "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ক্রিনিটি। অনেক ধন্যবাদ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিনিটি তার নিষ্পলক চোখে তরুণীটির দিকে তাকিয়েছিল, সে বলল, "তোমাকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছে। আমার মনে হয় উত্তেজিত না হয়ে তোমার বিশ্রাম নেয়া দরকার।"

"তুমি ঠিকই বলেছ ক্রিনিটি, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আমি এখন এখানেই শোব। আমি জানি আমি আর কোনো দিন উঠতে পারব না। তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে?"

"কী সাহায্য?"

"তুমি কি আমার বাচ্চাটিকে আমার বুকের ওপর শুইয়ে দিতে পারবে? আমি আমার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে আমার বাচ্চার মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকতে চাই।"

ক্রিনিটি জানে এই দুর্বল মেয়েটির বুকের ওপর এই দুরন্ত ছটফটে শিশুটিকে শুইয়ে দিলে মেয়েটির অনেক কষ্ট হবে, কোনোভাবেই এই কাজটি করা উচিত হবে না। ক্রিনিটি তার কপোট্রনে একটি প্রবল বৈদ্যুতিক চাপ অনুভব করল কিন্তু সে চাপটিকে উপেক্ষা করে এই অযৌক্তিক কাজটি করল। শিশুটিকে দুই হাতে তুলে মেঝেতে শুয়ে থাকা তরুণীটির বুকে শুইয়ে দিল।

শিশুটির দাঁতহীন মুখে মধুর এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে। সে তার ছোট হাত দুটি দিয়ে তার মায়ের রক্তমাখা ঠোঁট দুটি ধরে আনন্দে হাসতে থাকে। তরুণী মা'টি তার দুই হাতে বাচ্চাটিকে তার বুকের মাঝে শক্ত করে চেপে ধরে রেখে ফিসফিস করে বলল, "সোনা আমার। জাদু আমার। বেঁচে থাকিস বাবা। যেভাবে পারিস বেঁচে থাকিস।"

সন্ধে হওয়ার আগেই তরুণী মা'টি মারা গেল। ছোট শিশুটি সেটি বুঝতে পারল না, সে তার মায়ের চুলগুলো ধরে খেলতেই থাকল।

ক্রিনিটি নিষ্পলক দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে তার কপোট্রনে প্রবল একটি অসম বৈদ্যুতিক চাপ অনুভব করে।

AMARBOI.COM

২

নিকি জানালাটি খুলে বাইরে তাকাল। আকাশ নীল, কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। বাইরে রৌদ্রোজ্জ্বল একটি দিন। নিকি দুই গালে হাত দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ কী মনে করে সে নিজেকে কোনোমতে টেনে জানালার ওপর উঠে বসে।

ক্রিনিটি জিজ্ঞেস করল, "নিকি, তুমি ঠিক কী করতে চাইছ?"

"বাইরে যাব।"

"মানুষ জানালা দিয়ে বাইরে যায় না। মানুষ দরজা খুলে বাইরে যায়।"

"জানালা দিয়ে বাইরে গেলে কী হয়?"

"কিছু হয় না। কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে যেতে হলে তোমাকে লাফিয়ে নামতে হবে। দরজা খুলে বের হতে হলে তুমি হেঁটে হেঁটে বের হতে পারবে।'

নিকি তার দাঁতগুলো বের করে হাসল, বলল, "কিন্তু আমি হেঁটে বের হতে চাই না। আমি লাফিয়ে বের হতে চাই। আমার লাফাতে খুব ভালো লাগে।"

"আমি সেটি লক্ষ করেছি। আজকাল বেশিরভাগ সময়ই তুমি লাফাতে পছন্দ কর।"

"আমি এখনো মিক্কুর মতো লাফাতে পারি না।"

"তুমি কখনোই মিক্কুর মতো লাফাতে পারবে না। মিক্কু হচ্ছে বানর আর তুমি মানুষ।"

নিকি একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমিও যদি বানর হতাম তা হলে খুব মজা হত, তাই না ক্রিনিটি?"

ক্রিনিটি তার কপোট্রনে একটি চাপ অনুভব করে। চাপটি কমিয়ে সে বলল, "না। তুমি বানর হলে বেশি মজা হত না।"

নিকি মাথা নেড়ে বলল, "হত।"

"হত না।"

"কেন হত না?"

"কারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তা বানরের বুদ্ধিমত্তা থেকে বেশি। যার বুদ্ধিমত্তা যত বেশি সে তত বেশি উপায়ে মজা করতে পারে।"

নিকি মুখ সুচালো করে কিছুক্ষণ ক্রিনিটির দিকে তাকিয়ে রইল তারপর জিজ্ঞেস করল, "বুদ্ধিমত্তা কী?"

"তোমার চারপাশে যা কিছু আছে সেটি দেখে বোঝার ক্ষমতা এবং সেটিকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা।"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "আমার কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই।"

"কে বলেছে নেই?"

"আমি জানি।"

"কেমন করে জান?"

"এই যে তুমি কঠিন কঠিন জিনিস বলেছ আমি সেগুলো করতে পারি না। বুঝি না।"

"তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝবে।"

"আমি বুঝতে চাই না।"

"তা হলে তুমি কী করতে চাও?"

"আমি মিক্কুর সাথে এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফ দিতে চাই।"

"যাদের বুদ্ধিমত্তা আছে তাদের শুধু এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফ দিয়ে জীবন কাটাতে হয় না। তাদের আরো বড় কাজ করতে হয়।"

নিকি কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, "আমার বুদ্ধিমত্তা ভালো লাগে না।"

ক্রিনিটি কোনো কথা না বলে নিকির দিকে তাকিয়ে রইল। নিকি ক্রিনিটির দৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে বের হবার ঠিক আগের মুহূর্তে ক্রিনিটি বলল, "নিকি।"

"বল।"

"তুমি ঘরের বাইরে যাচ্ছ কিন্তু তোমার শরীরে কোনো কাপড় নেই।"

"আজকে অনেক সুন্দর রোদ। বাইরে ঠাণ্ডা নেই তাই আমার কাপড় পরারও কোনো দরকার নেই।"

ক্রিনিটি কৃত্রিমভাবে তার গলার স্বরটি একটুখানি গভীর এবং থমথমে করে নিয়ে বলল, "মানুষ শুধুমাত্র শীত থেকে বাঁচার জন্যে কাপড় পরে না। মানুষ হচ্ছে একটি সভ্য প্রাণী। মানুষকে সব সময় কাপড় পরতে হয়।"

নিকি বলল, "কিন্তু মিক্কু তো কাপড় পরে না।"

"মিক্কু মোটেও সভ্য প্রাণী নয়। মিক্কু একটি বানর।"

"কিকি কাপড় পরে না।"

"কিকি একটি পাখি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকির চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "তুমি কোনো কাপড় পর না।"

"আমি একটি যন্ত্র। যন্ত্রদের কাপড় পরতে হয় না। তুমি মানুষ তোমাকে কাপড় পরতে হবে। সব সময় অন্তত পক্ষে কোমর থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ঢেকে একটি কাপড় পরতে হবে।"

নিকি যুক্তিতর্কে সুবিধে করতে না পেরে অন্য পথে গেল। মুখ শক্ত করে বলল, "আমি মানুষ হতে চাই না।"

ক্রিনিটি বলল, "না চাইলেও কিছু করার নেই, তুমি এখন অন্য কিছু হতে পারবে না। তোমাকে মানুষ হয়েই থাকতে হবে।"

নিকি মুখ শক্ত করে বলল, "কেন মানুষ হলে কাপড় পরতে হবে?"

"মানুষ সভ্য প্রাণী। যখন তোমার সাথে অন্য মানুষের দেখা হবে তখন তোমার শরীরে কাপড় না থাকলে তারা তোমাকে অসভ্য ভাববে।"

নিকি সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে সেরকম ভঙ্গি করে বলল, "ঠিক আছে। যদি আমার সাথে কখনো অন্য মানুষের দেখা হয় তখন আমি দৌড় দিয়ে কাপড় পরে নেব।"

ক্রিনিটি বলল, "না। কাপড় পরা একটি অভ্যাসের ব্যাপার। যার সেই অভ্যাস নেই সে কখনো দৌড়ে কাপড় পরতে পারবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা কী জান?"

'কী?"

"মানুষের সাথে কোনো দিন দেখা হোক বা না হোক তোমাকে কাপড় পরে থাকতে হবে।"

নিকি মুখ গোঁজ করে বলল, "কেন?"

"তোমার মা আমাকে তোমার দায়িত্ব দিয়ে গেছে। আমাকে বলেছে আমি যেন তোমাকে দেখেশুনে রেখে বড় করি। সেজন্যে আমার তোমাকে ঠিক করে বড় করতে হবে। সভ্য মানুষের মতো বড় করতে হবে।"

নিকি এবার দুর্বল হয়ে পড়ল। তার মা'কে সে খুব ভালবাসে। ক্রিনিটির কাছে তার মায়ের যে হলোগ্রাফিক ছবি আছে সে মুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে, অনেকবার সে তার মা'কে ধরতে গিয়ে দেখেছে সেটি সত্যি নয়। তার খুব ইচ্ছে করে একদিন সে ধরতে গিয়ে দেখবে সেটি সত্য তখন তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করবে। ক্রিনিটি তাকে বলেছে যে এটি কখনো হবে না, তবুও সে আশা করে আছে যে কোনো একদিন হয়তো এটি হয়ে যাবে।

নিকি ঘরের ভেতর ফিরে গেল, এক টুকরো কাপড় নিয়ে সেটি তার কোমরে বেঁধে নিল, তারপর ক্রিনিটিকে বলল, "এখন আমি বাইরে যাই?"

"যাও।"

নিকি দরজা খুলে বাইরে যেতেই কঁক কঁক শব্দ করে একটি পাখি তার দিকে উড়ে আসে, তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে সেটি তার ঘাড়ে বসার চেষ্টা করতে থাকে। নিকি তার হাতটি বাড়িয়ে দিতেই পাখিটি সেখানে বসে নিকির দিকে তাকিয়ে আবার কঁক কঁক শব্দ করে ডাকল। নিকি পাখিটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, "আমি মোটেও দেরি করতে চাই নি। ক্রিনিটি আমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছে।"

পাখিটির গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, চোখ দুটি লাল, সে ডানা ঝাপটিয়ে আবার কঁক কঁক শব্দ করল। নিকি বলল, "উঁহু। ক্রিনিটি মোটেও দুষ্টু নয়। ক্রিনিটি হচ্ছে রোবট। রোবটেরা অন্যরকম হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিকি নিকির কথা বুঝে ফেলেছে সেরকম ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে আবার শব্দ করে আকাশে উড়ে গেল, নিকি তখন তার পিছু পিছু ছুটতে থাকে। এটি তাদের একরকম খেলা, প্রতিদিনই সে কিকির পেছনে ছুটে যায়, সারা দিন বনে–বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। দিনের শেষে কিকি তাকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে যায়।

কিকির পেছনে পেছনে ছুটে ছুটে নিকি বনের ভেতর একটি হ্রদের তীরে এসে দাঁড়াল। সেখানে অনেকগুলো বুনো পশু পানি খাচ্ছে, নিকিকে একনজর দেখে তারা আবার পানি খেতে থাকে।

একটি বড় ঝাপড়া গাছের ডালে হঠাৎ একটি হুটোপুটি শোনা যায় সেদিকে না তাকিয়ে নিকি বুঝতে পারে এটি মিক্কু, ছোট একটি বানরের বাচ্চা, তার সাথে খেলতে এসেছে। নিকি ইচ্ছে করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল, আর মিক্কু গাছের উপর থেকে তার উপর লাফিয়ে পড়ল, তাল সামলাতে না পেরে নিকি নিচে পড়ে যায়, মিক্কু তখন তার শরীরের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকে। নিকি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসে হিহি করে হাসতে থাকে আর মিক্কু তখন নিকিকে ঘিরে লাফাতে থাকে। নিকি মিক্কুর পেটে খোঁচা দিয়ে বলল, "মিক্কু, তোমার বুদ্ধিমত্তা আছে?"

মিক্কু কিচিমিচি শব্দ করে একটি লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে উঠে বসে তারপর সেখান থেকে নেমে তার কাপড়টা টানতে থাকে। নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "না। এই কাপড়টা খোলা যাবে না। আমার মা বলেছে আমাকে সব সময় কাপড় পরে থাকতে হবে।"

মিক্কু কথাটা বোঝার মতো ভঙ্গি করল, নিকি তখন মিক্কুকে কাছে টেনে এনে বলল, "তুমি বানর। আমি মানুষ। বানরের বুদ্ধিমত্তা নেই, মানুষের আছে। বুদ্ধিবৃত্তি কী জান?"

মিক্কু মাথা নাড়ল। নিকি বলল, "আমিও জানি না। ক্রিনিটি আমাকে বলেছে আমি বুঝি নি। তুমিও বুঝবে না। বোঝার দরকার নেই। চল আমরা খেলি।"

মিক্কু কথাটা বুঝতে পেরে ছুটতে শুরু করে, তার পিছু পিছু নিকি। ছুটতে ছুটতে তারা বালুবেলায় আছড়ে পড়ে, গড়াগড়ি খেতে থাকে। তাদের মাথার উপর দিয়ে অনেকগুলো পাখি উড়তে থাকে, কিচিমিচি শব্দ করে তারা নিকির আশপাশে নেমে এসে খেলায় যোগ দেয়। নিকি হাত বাড়িয়ে পাখিগুলো ধরার চেষ্টা করে—একটি–দুটি ধরা দেয় অন্যগুলো সরে গিয়ে আবার তার কাছে ছুটে আসে।

বেলা গড়িয়ে এলে নিকি নরম বালুর ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকে। শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় তার চোখে ঘুম নেমে আসে। সে পরম শান্তিতে বালুতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কাছাকাছি একটি গাছে বসে কিকি তার দিকে নজর রাখে, একটু দূরে একটি গাছে মিক্কু পা দুলিয়ে বসে থাকে।

ঠিক তখন নিঃশব্দে একটি চিতাবাঘ হেঁটে হেঁটে আসে। হ্রদের পানিতে পা ভিজিয়ে সে চুকচুক করে পানি খায়। তাকে দেখে হরিণের পাল সরে গেল, বুনো পাখিরা কর্কশ শব্দ করে উড়ে গেল।

চিতাবাঘটি মাথা তুলে তাকাল, একটু গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করল এবং হঠাৎ করে নিকিকে দেখতে পেল। সাথে সাথে সেটি সতর্ক পদক্ষেপে নিকির দিকে এগুতে থাকে। কাছাকাছি এসে সেটি গুড়ি মেরে বসে তারপর বিদ্যুৎগতিতে নিকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাছের ডালে বসে কিকি আর মিক্কু তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে সাথে সাথে।

নিকি চমকে উঠে চিতাবাঘটির দিকে তাকাল এবং মুহূর্তে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে চিতাবাঘটির গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "দুষ্টু! দুষ্টু চিতা! তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিতাবাঘটি মুখ দিয়ে ঠেলে নিকিকে নিচে ফেলে দিয়ে পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। নিকি উঠে দাঁড়িয়ে চিতাবাঘটির গলা জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ ঘষে বলল, "কোথায় ছিলে তুমি? কোথায়?"

চিতাবাঘটি তার বুকের ভেতর থেকে ঘরঘর করে শব্দ করে, বন্ধুর সাথে ভাব বিনিময়ের গভীর ভালবাসার এক ধরনের শব্দ।

ক্রিনিটি নিকির প্লেটে একটু খাবার তুলে দিয়ে বলল, "তোমার এখন বাড়ন্ত শরীর। এখন তোমাকে খুব হিসেব করে খেতে হবে। মানুষের শরীর তো আর যন্ত্র নয় যে একটি ব্যাটারি লাগিয়ে দিলাম আর সেটি চলতে থাকল। মানুষকে খেতে হয় খুব হিসেব করে।"

নিকি এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে সুপে ভিজিয়ে খেতে খেতে বলল, "হিসেব করে না খেলে কী হয়?"

"শরীর দুর্বল হয়ে যায়। শরীরে রোগজীবাণু বাসা বাঁধে।"

"তুমি বলেছ আমার শরীরে কোনো রোগজীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না। সেই জন্যে সবাই মরে গেছে কিন্তু আমি বেঁচে গেছি।"

"হ্যাঁ। সেটি সত্যি। কিন্তু রোগজীবাণুর কি শেষ আছে। পৃথিবীতে কত রকম রোগজীবাণু আছে তুমি জান?"

নিকি মাথা নাড়ল, "না জানি না। জানতেও চাই না।"

"না জানলে হবে না। মানুষকে সবকিছু জানতে হয়।"

"আমি তোমাকে বলেছি আমি মোটেও মানুষ হতে চাই না।"

"না চাইলেও লাভ নেই। তোমার মানুষ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।" ক্রিনিটি তার প্লেটে একটু খাবার তুলে দিয়ে বলল, "এইটুকু শেষ করে ফেল। তা হলে তোমার খাওয়াটা সঠিক হবে।"

নিকি খাবারগুলো হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, "ঠিক আছে, আমি খেতে পারি কিন্তু এক শর্তে।"

"কী শর্ত?"

"তুমি আমাকে আজকে গণিত পড়াতে পারবে না।"

"তুমি এখন বড় হচ্ছ। প্রতিদিন তোমাকে কিছু না কিছু পড়তে হবে। মানুষকে অনেক কিছু জানতে হয়।"

নিকি মাথা নাড়াল, বলল, "না ক্রিনিটি আমি আজকে কিছু পড়তে চাই না।"

"তা হলে কী করতে চাও?"

নিকি লাজুক মুখে বলল, "আমি আমার মা'কে দেখতে চাই।"

ক্রিনিটি কয়েক মুহূর্ত নিকির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "ঠিক আছে।"

একটু পরেই দেখা গেল নিকি দুই গালে হাত দিয়ে বসে আছে, সামনের শূন্য জায়গাটিতে তার মা কথা বলছেন। হলোগ্রাফিক ছবি, দেখে মনে হয় জীবন্ত—কিন্তু নিকি জানে এটি জীবন্ত নয়। সে অনেকবার তার মা'কে ধরার চেষ্টা করেছে, ধরতে পারে নি। যতবার ধরতে গিয়েছে দেখেছে সেখানে কিছু নেই।

নিকি ঘুমিয়ে যাবার পর ক্রিনিটি তাকে একটি পাতলা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়। গলায় ঝোলানো মাদুলিটি খুলে নিয়ে সে ক্রিস্টাল রিডারের সামনে বসে। মাদুলিটির ভেতর থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট ক্রিস্টালটা বের করে সে ক্রিস্টাল রিডারের ভেতর ঢুকিয়ে সেদিকে তাকায়। আজ সারা দিন নিকি কী কী করেছে সব এখানে রেকর্ড করা আছে।

ক্রিনিটি খানিকক্ষণ দৃশ্যগুলো দেখে তারপর ছোট একটি মাইক্রোফোন কাছে টেনে এনে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করে। রোবটের একঘেয়ে যান্ত্রিক স্বরে ক্রিনিটি বলে, "আমি ক্রিনিটি। নিকি নামের মানবশিশুটির দায়িত্বে আছি। আমার দৈনন্দিন দায়িত্ব হিসেবে আজকের দিনের ঘটনাগুলো ভিডি মাধ্যমে উপস্থাপন করছি।

"আমি তৃতীয় মাত্রার রোবট। আমার পক্ষে এই দায়িত্ব নেয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু অন্য কোনো উপায় না থাকার কারণে আমি দায়িত্বটি নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল সেই সিদ্ধান্তগুলো সঠিক সিদ্ধান্ত কি না আমি সেটি এখনো জানি না। নিকির মা আমাকে বলেছিল আমি যেন ভালবাসা দিয়ে নিকিকে বড় করি। আমি তৃতীয় মাত্রার রোবট, ভালবাসা বিষয়টি কী আমি জানি না। একজন মা যখন তার সন্তানের সাথে কথা বলার সময় কিছু অর্থহীন শব্দ করে, কিছু অর্থহীন কাজকর্ম করে সেগুলো সম্ভবত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। আমি সেই শব্দগুলো উচ্চারণ এবং সেই কাজকর্মগুলো করার চেষ্টা করে দেখেছি সেগুলো প্রকৃত অর্থেই অর্থহীন এবং হাস্যকর কাজকর্মে পরিণত হয়েছে। কাজেই আমি সেই বিষয়টি পরিত্যাগ করেছি।

"আমার মনে হয়েছে আশপাশে কোনো মানুষ না থাকলেও অনেক পশুপাখি আছে এবং সেইসব পশুপাখিদের মাঝে এক ধরনের ভালবাসা আছে। মানুষ অনেক সময়ই পশুপাখিকে পোষ মানিয়েছে এবং তাদের সাথে এক ধরনের ভালবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তাই আমি খুব সতর্কভাবে নিকির সাথে কিছু পশুপাখির সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করেছি। কাজটি আমাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করতে হয়েছে, প্রয়োজনে যেন তাকে ঘিরে একটি শক্তি বলয় তৈরি হয় এবং কোনো পশু যেন তার ক্ষতি করতে না পারে, গোড়াতে আমি সেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছি। আমি এক মুহূর্তের জন্যেও নিকির প্রাণের ওপর কোনো ঝুঁকি আনি নি। এখনো আমি তাকে সতর্কভাবে রক্ষা করি। তার গলার মাদুলিটি একটি শক্তিশালী ট্র্যাকিওশান। মূল তথ্যকেন্দ্রের সাথে এটি যোগাযোগ রাখে এবং তাকে রক্ষা করে।

"বনের কিছু পশুপাখির সাথে নিকির এক ধরনের গভীর ভালবাসার সম্পর্ক হয়েছে এবং আমার ধারণা নিকি ভালবাসা গ্রহণ করতে এবং প্রদান করতে শিখেছে। নিকির মা আমাকে প্রথম যে দায়িত্বটি দিয়েছিল আমি সেটি পালন করতে পেরেছি।

"নিকির মায়ের দ্বিতীয় দায়িত্বটি অনেক কঠিন। সারা পৃথিবী খুঁজে আমার দেখতে হবে আর কোথাও কোনো মানুষ বেঁচে আছে কি না। যদি বেঁচে থাকে তা হলে তার কাছে নিকিকে নিয়ে যেতে হবে। আমি সে জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এখন তার বয়স মাত্র সাত বছর কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তা দশ থেকে বারো বছরের বালকের মতো। তাই তাকে নিয়ে আমি বের হতে পারি। আমার ধারণা নিকি এখন এই ব্যাপারটির মুখোমুখি হতে পারবে।

"ভূমিকা পর্ব শেষ হয়েছে। আমি এখন আজকের সারা দিনের সংক্ষিপ্ত দিনলিপি সংরক্ষণ করতে চাই। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর নিকি শরীরে কাপড় রাখা নিয়ে একটি প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করে। বিষয়টিকে আমার গুরুত্ব নিয়ে দেখতে হয়..."

ক্রিনিটি তার একঘেয়ে যান্ত্রিক গলায় দিনলিপিটি সংরক্ষণ করে যায়। নিকির মা মারা যাবার পর থেকে প্রতিদিন সে এটি করে আসছে।

৩

নিকি জিজ্ঞেস করল, "ক্রিনিটি তুমি কী করছ?"

ক্রিনিটি টার্মিনালের সাথে একটি বড় তার জুড়ে দিয়ে উপরের স্ক্রুটা লাগাতে লাগাতে বলল, "আমি এই বাইভার্বালটি ঠিক করছি।"

"তুমি কেন এটি ঠিক করছ?"

"আমরা ঘুরতে বের হব।"

নিকির চোখে–মুখে আনন্দের ছাপ পড়ল, "আমরা কোথায় ঘুরতে বের হব ক্রিনিটি?"

"নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় নয়। আমরা আসলে ঘুরে ঘুরে দেখব। কোথাও তোমার মতো মানুষ খুঁজে পাই কি না।"

এবারে নিকির মুখে দুশ্চিন্তার একটি ছাপ পড়ল, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার মতো মানুষ।"

"হ্যাঁ, তোমার মতো মানুষ।"

"সে মানুষের সাথে দেখা হলে আমি তাকে কী বলব ক্রিনিটি?"

"তোমার সেটি নিয়ে ভাবনা করতে হবে না। তোমার যেটি বলতে ইচ্ছে হয় সেটিই বলবে।"

"তখন সেই মানুষটি কী বলবে ক্রিনিটি?"

"সেই মানুষটিও তখন তার যেটি ইচ্ছে হয় সেটি বলবে।"

"আমি তোমার সাথে যেভাবে কথা বলি সেভাবে কথা বলব?"

"তার চাইতে অনেক সুন্দর করে কথা বলবে। আমি হচ্ছি মাত্র তৃতীয় মাত্রার রোবট— আমি সত্যিকার মানুষের মতো কথা বলতে পারি না। আমি শুধু তোমার সাথে তথ্য বিনিময় করি।"

"সত্যিকার মানুষ কেমন করে কথা বলে ক্রিনিটি?"

"সেটি অনেক বিচিত্র। কথা বলার সময় তার হাত নাড়ে, মাথা নাড়ে। চোখ দিয়ে তাকায়, গলার স্বর কখনো উঁচু করে, কখনো নিচু করে। একটি সাধারণ কথা বলার জন্যেও অনেক কিছু করে। আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা মুখ ফুটে বলে না। একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলে।"

নিকিকে এবারে খুব দুশ্চিন্তিত দেখায়। খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "ক্রিনিটি।"

"বল।"

"আমি তো চোখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা বুঝতে পারি না।"

"তোমার সেটি নিয়ে ভাবনা করতে হবে না। তুমি যদি কখনো কোনো মানুষের দেখা পাও তা হলে দেখবে তুমি বুঝতে পারছ।"

"আর যদি না পারি?"

"পারবে। যদি না পার তা হলে তুমি শিখে নেবে।"

"ক্রিনিটি।"

"বল।"

"আমি কিন্তু শিখতে পারি না। মিক্কু কী সুন্দর একটি গাছের ডাল ধরে লাফ দিয়ে আরেকটি ডাল ধরে ফেলে। আমি অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছি, শিখতে পারছি না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিনিটি ঘুরে নিকির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি সেটি অনেক চেষ্টা করেও শিখতে পারবে না। মিকু হচ্ছে বানর, তুমি মানুষ। মানুষ চেষ্টা করলেও বানর হতে পারে না। মানুষের অন্য মানুষ থেকে শিখতে হয়, বানর থেকে শিখতে হয় না।"

নিকি বলল, "ও।"

ক্রিনিটি বাইভার্বালের নিচে গিয়ে একটি গোলাকার ফুটোর ভিতরে উঁকি দেয়, সেখান থেকে জংধরা একটি রিং খুলে নূতন একটি রিং লাগাতে শুরু করে। ঠিক তখন তার মাথার উপর দিয়ে কিকি উড়ে এসে বাইভার্বালের একটি হ্যান্ডেলে বসে কর্কশ স্বরে কঁ কঁ করে ডাকল।

নিকি বলল, "কিকি আমরা ঘুরতে বের হব। তুমি আমাদের সাথে যাবে?"

কিকি কী বুঝল কে জানে, নিচু স্বরে আবার কঁ কঁ করে শব্দ করল। নিকি ক্রিনিটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্রিনিটি।"

"বল।"

"কিকি আমাদের সাথে ঘুরতে যেতে পারবে?"

"যেতে চাইলে যাবে। তবে—"

"তবে কী?"

"কিকি হচ্ছে কাক জাতীয় পাখি। পাখিদের মাঝে সবচেয়ে বুদ্ধিমান। এরা দল বেঁধে থাকে, আর দলের সবাইকে ছেড়ে সে আসলে যেতে পারবে না।"

"কেন যেতে পারবে না।"

"সব পশু–পাখিদের নিজেদের নিয়ম আছে। পাখিরা থাকে দল বেঁধে। বাঘ থাকে একা একা।"

নিকি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কিকি তার দলের পাখি থেকে আমাকে বেশি ভালবাসে। তাই না কিকি?"

কিকি মাথা নেড়ে বলল, "কঁ কঁ।"

ক্রিনিটি নিকির কথা শুনে তার দিকে ঘুরে তাকাল, সে এই মাত্র তার কথায় ভালবাসা শব্দটি ব্যবহার করেছে এবং মনে হয় ঠিকভাবেই ব্যবহার করেছে। নিকির মা তাকে দায়িত্ব দিয়েছিল ভালবাসা দিয়ে বড় করতে—তার নিজের ভালবাসা অনুভব করার ক্ষমতা নেই তারপরেও এই ছেলেটিকে সে মনে হয় ভালবাসার ব্যাপারটি বোঝাতে পেরেছে। ক্রিনিটি দেখল নিকি কালো রঙের পাখিটিকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে তাকে আদর করতে থাকে।

ক্রিনিটি যখন বাইভার্বালের সামনে বড় বড় দুটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র স্ক্রু দিয়ে লাগানো শুরু করেছে তখন নিকি জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কী ক্রিনিটি।"

"এগুলো হচ্ছে অস্ত্র।"

"অস্ত্র দিয়ে কী করে?"

"অস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে।"

নিকি অবাক হয়ে বলল, "ধ্বংস করে? কেমন করে ধ্বংস করে?"

"এর মাঝে বিস্ফোরক রয়েছে। যখন ট্রিগার টানা হয় তখন বিস্ফোরকগুলো ছুটে যায়, যেখানে সেটি আঘাত করে সেখানে বিস্ফোরণ হয়ে সব ধ্বংস হয়ে যায়।"

নিকি চোখ বড় বড় করে ক্রিনিটির দিকে তাকিয়ে রইল তারপর ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু ক্রিনিটি—"

"কিন্তু কী?"

"তুমি কেন এই বাইভার্বালে অস্ত্র লাগাচ্ছ? তুমি কাকে ধ্বংস করতে চাও?"

"আমি কাউকে ধ্বংস করতে চাই না। কিন্তু সব সময় একটু সতর্ক থাকতে হয়। এই বনে সব পশুপাখি তোমার বন্ধু। কিন্তু অন্য কোথাও অন্য পশুপাখি তোমার বন্ধু নাও হতে পারে। তারা তোমাকে আক্রমণ করে বসতে পারে—"

নিকি মুখ শক্ত করে বলল, "না। কখনো কোনো পশুপাখি আমাকে আক্রমণ করবে না। আমি পশুপাখি ভালবাসি। পশুপাখিও আমাকে ভালবাসে।"

ক্রিনিটি বলল, "সেটি সত্যি কথা। কিন্তু আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। তুমি হচ্ছ একমাত্র জীবিত মানুষ—তোমার যেন কোনো ক্ষতি না হয় সেটি আমাকে সব সময় লক্ষ রাখতে হয়।"

"তুমি বেশি বেশি লক্ষ রাখ।"

"তা ছাড়া আমরা যখন ঘুরতে বের হব তখন আরো অনেক কিছুর সাথে আমাদের দেখা হবে। তাদের থেকেও বিপদ হতে পারে।"

নিকি একটু চিন্তিত সুরে বলল, "কার সাথে দেখা হতে পারে?"

"রোবটদের সাথে।"

নিকি এবারে শব্দ করে হেসে ফেলল। রোবট বলতে সে শুধু ক্রিনিটিকে বোঝে, ক্রিনিটি বা ক্রিনিটির মতো কারো কাছ থেকে কোনো বিপদ হতে পারে সেটি এত অবাস্তব একটি বিষয় যে সেটি কল্পনা করে নিকি না হেসে পারল না। নিকি হাসতে হাসতে বলল, "ক্রিনিটি, তুমি বলেছ যে রোবটদের তৈরি করা হয়েছে মানুষদের সেবা করার জন্যে। একটি রোবট কখনো কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। চেষ্টা করলেও পারে না।"

"সেটি সত্যি কথা। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"একসময় পৃথিবীতে মানুষ ছিল তখন রোবটদের জন্যে এই নিয়ম ছিল। এখন তো পৃথিবীতে মানুষ নাই তাই রোবটদের মাঝে এই নিয়মগুলো আছে কি না সেটি তো জানি না। এখন এই পৃথিবীতে আছে শুধু রোবট তারা কী করছে কে জানে।"

নিকি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "রোবটদের এখন কোনো কাজ নেই তাই তারা মনে হয় অনেক মজা করছে।"

ক্রিনিটি বলল, "সব রোবট মজা করতে পারে না।"

"কেন ক্রিনিটি? কেন সব রোবট মজা করতে পারে না?"

"মজা করার জন্যে বুদ্ধিমত্তা থাকতে হয়। সব রোবটের বুদ্ধিমত্তা নেই। যাদের মানুষের সমান বুদ্ধিমত্তা তারা মজা করতে পারে।"

"তুমি কি মজা করতে পার?"

"না। আমি পারি না। আমি তৃতীয় মাত্রার রোবট। আমার বুদ্ধিমত্তা মানুষ থেকে কম। চতুর্থ মাত্রার রোবটের বুদ্ধিমত্তা মানুষের বুদ্ধিমত্তার সমান।"

"আর পঞ্চম মাত্রা?"

"পঞ্চম মাত্রার রোবট পৃথিবীতে তৈরি হয় নি।"

"কেন তৈরি হয় নি?"

"পঞ্চম মাত্রার রোবটের বুদ্ধিমত্তা হবে মানুষ থেকে বেশি সেই জন্যে কখনো পঞ্চম

AMARBOI.COM

মাত্রার রোবট তৈরি করা হয় নি। পৃথিবীর মানুষ নিজের থেকে বুদ্ধিমান রোবট তৈরি করতে চায় নি।"

নিকি কিছুক্ষণ ক্রিনিটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ক্রিনিটি।"

"বল।"

"আমার মনে হয় তুমি যদিও তৃতীয় মাত্রার রোবট কিন্তু তুমি ইচ্ছা করলে মজা করতে পারবে।"

ক্রিনিটি তার কপোট্রনে এক ধরনের চাপ অনুভব করল, সে চাপটুকু কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে বলল, "তুমি তাই মনে কর?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কী রকম মজা করার কথা ভাবছ?"

"বনে একটি গাছে একটু হলুদ একটু লাল রঙের ফল পাওয়া যায় সেটি খেতে খুব মজা। তুমি সেটি খেয়ে দেখতে পার।"

"মানুষ হচ্ছে স্তন্যপায়ী প্রাণী তার শরীরে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থাকতে হয়। সেইজন্যে মানুষকে একটু পরপর খেতে হয়। আমি রোবট, আমার শরীরে একটি ব্যাটারি লাগানো আছে, আমাকে খেতে হয় না।"

নিকি বলল, "আমি জানি। কিন্তু আমার মনে হয় এই ফলটি তবু তোমার খেয়ে দেখা উচিত। এই ফলটি খেলে তোমার যেটি মনে হবে সেটি হচ্ছে মজা।"

ক্রিনিটি কোনো উত্তর না দিয়ে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দুটি লাগানো শেষ করে তার লেজার আলোটি পরীক্ষা করল।

নিকি বলল, "গাছের উপর থেকে হ্রদের পানিতে লাফ দিলেও অনেক মজা হয়।"

ক্রিনিটি বলল, "আমার ধাতব শরীর পানিতে ভেসে থাকতে পারে না।"

নিকি বলল, "ডুবে থাকলে আরো বেশি মজা। পানিতে লাল রঙের কাঁকড়া থাকে। সেগুলো দেখা যায়।"

ক্রিনিটি কোনো কথা বলল না। সে তৃতীয় মাত্রার রোবট হয়েও এই মানবশিশুটির সাথে কথা বলতে পারে, কিন্তু অনেক সময়ই আবিষ্কার করে সে কোনো একটি কথার উত্তরে যৌক্তিক কোনো কথা বলতে পারছে না। তখন সে চুপ করে থাকে।

নিকির হাতে বসে থাকা পাখিটি একটু চঞ্চল হয়ে আকাশের দিকে তাকাল তারপর চাপা স্বরে ডাকল, "কঁ কঁ।"

নিকি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে চল।"

ক্রিনিটি বলল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"কিকি আকাশে উড়বে। আমি ওর পিছু পিছু দৌড়াব।"

"ও।"

"আমার মনে হয় পাখিরা মানুষ থেকে বেশি মজা করতে পারে।"

কথাটি সত্য নয়, শুদ্ধ করে নিকিকে সেটি বলা উচিত ছিল, কিন্তু ক্রিনিটি কোনো কিছু বলল না। দীর্ঘদিন নিকির সাথে থেকে ক্রিনিটি কিছু জিনিস করতে শিখেছে। নিকিকে সে প্রায় সময়েই যুক্তিহীন বা অতিরঞ্জিত কথা বলতে দেয়। ক্রিনিটি জানে কারণে-অকারণে মানুষ অযৌক্তিক কথা বলে। মানুষকে অযৌক্তিক কথা বলতে না দিলে কিংবা অযৌক্তিক কাজ না করতে দিলে তারা মনে হয় পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে পারবে না।

কিকির পেছনে পেছনে নিকি ছুটতে থাকে। কিকি উড়তে উড়তে আবার নিকির কাছে ফিরে আসে, নিকি তাকে ধরার চেষ্টা করে কিকি শেষ মুহূর্তে উড়ে সরে যায়, এটি দুজনের মাঝে একরকম খেলা। নিকি বারকয়েক চেষ্টা করে কিকিকে ধরে আনন্দে হিহি করে হাসতে থাকে। ক্রিনিটি তার কাজ থামিয়ে নিকিকে লক্ষ করে, নিকিকে বড় করতে গিয়ে সে মানুষের অনেক কিছুই বুঝতে শিখেছে, কিন্তু হাসির ব্যাপারটি সে এখনো ধরতে পারে নি। মানুষ কেমন করে হাসে সেই ব্যাপারটি তার কাছে এখনো দুর্বোধ্য। সে যদি তিন মাত্রার রোবট না হয়ে চার মাত্রার রোবট হত তা হলে সে হয়তো এটি বুঝতে পারত, তিন মাত্রার রোবট হিসেবে সে কখনোই এটি জানতে পারবে না।

নিকি কিকির শরীরে হাত বুলিয়ে বলল, "ক্রিনিটি বলেছে তুমি নাকি সামাজিক প্রাণী।"

কিকি মাথা নেড়ে বলল, "কঁ কঁ।"

"সামাজিক প্রাণী কথাটার মানে বুঝেছ? যারা দল বেঁধে থাকে তাদেরকে বলে সামাজিক প্রাণী। তুমিও কি দল বেঁধে থাক?"

কিকি মাথা নেড়ে বলল, "কঁ কঁ।"

"আমি তোমাকে কখনো দল বেঁধে থাকতে দেখি নি।"

কিকি আবার মাথা নেড়ে বলল, "কঁ কঁ।"

বিকেলবেলা ক্রিনিটি যখন বাইভার্বালটির কাজ শেষ করে ইঞ্জিনটি প্রথমবার চালু করেছে তখন সে একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেল। বনভূমির আকাশ কালো করে হাজার হাজার পাখি কর্কশ শব্দ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। বনভূমির সামনে খোলা জায়গাটিতে নিকি দুই হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আনন্দে চিৎকার করছে আর হাজার হাজার পাখি তাকে ঘিরে ঘুরছে আর ঘুরছে।

AMARBOI.COM

নিকি ঘুমিয়ে যাবার পর ক্রিনিটি তার শরীরটি একটি পাতলা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর তার গলায় মাদুলিটি খুলে নিয়ে সে ক্রিস্টাল রিডারের সামনে বসে। মাইক্রোফোনটি টেনে নিচু গলায় দিনলিপিটি রেকর্ড করতে শুরু করে :

"পৃথিবী থেকে সব মানুষের মৃত্যু হবার পর মূল তথ্যকেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে গেছে, এই এলাকার যোগাযোগটিও বিচ্ছিন্ন। আমি তাই কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছি না। আমি বিচ্ছিন্নভাবে স্মরণ করতে পারি, কোনো একটি মানবশিশু যদি কোনো পশুপাখি দ্বারা লালিত-পালিত হয় তা হলে সে সেই পশুপাখির কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। নেকড়ে বাঘ দিয়ে লালিত কিছু শিশু নেকড়ে বাঘের মতো চার পায়ে ছুটতে পারত, বুনো কুকুর দ্বারা লালিত শিশু কুকুরের কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। ওরাংওটাং দিয়ে পালিত শিশু গাছে ওরাংওটাংয়ের মতো ছুটে বেড়াতে পারত।

"নিকি খুব শৈশব থেকে এই বনের কিছু পশুপাখির সাথে বড় হয়েছে। আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি বলে পশুপাখির প্রবৃত্তি তার মাঝে গড়ে ওঠে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে নিকি পশুপাখির সাথে কোনো একটি উপায়ে তথ্য বিনিময় করতে পারে।

"আমি আজকে নিকিকে বলেছি কিকি কাক জাতীয় প্রাণী এবং কাক জাতীয় প্রাণীরা দল বেঁধে থাকে। নিকি বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কিকিকে তার প্রমাণ দেখাতে বলেছে। কিকি তার প্রমাণ হিসেবে বনভূমির সকল পাখিকে তার সামনে হাজির করেছে। আমি দেখেছি হাজার হাজার পাখি নিকিকে ঘিরে ঘুরছে। নিকি পাখি বা অন্যান্য প্রাণীর সাথে

কীভাবে তথ্য বিনিময় করে সেটি আমি এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি নি। তৃতীয় মাত্রার রোবট হিসেবে আমার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, আমি হয়তো কখনোই বিষয়টি বুঝতে পারব না।

"আমি বাইভার্বালটি প্রস্তুত করেছি। খুব দ্রুত আমি নিকিকে নিয়ে বের হব। মানুষ যখন বেঁচেছিল আমি তখন তাদের মুখে এই বনভূমিটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যোগাযোগের নেটওয়ার্কের বাইরে। পৃথিবীতে কোনো মানুষ জীবিত আছে কি না সেটি বের করতে হলে আমাকে সভ্যতার আরো কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত হতে হবে।

"নিকির দৈনন্দিন কার্যাবলির মাঝে আজকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাইভার্বালের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে তার প্রথম বাস্তব ধারণা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে..."

ক্রিনিটি তার নিখুঁত ইলেকট্রনিক মেমোরি থেকে নিকির সারা দিনের প্রতিটি ঘটনার খুঁটিনাটি ক্রিস্টাল রিডারে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে।

৪

ক্রিনিটি নিকির কোমরে বেল্ট বেঁধে সেটি বাইভার্বালের কন্ট্রোল প্যানেলের একটি হুকের সাথে লাগিয়ে দিল। নিকি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন বেল্ট দিয়ে বেঁধে নিলে?"

"তোমার নিরাপত্তার জন্যে। তুমি তো আগে কখনো বাইভার্বালে ওঠ নি তাই হঠাৎ করে যদি পড়ে যাও সে জন্যে।"

"আমি মোটেও পড়ে যাব না।"

"আমি জানি তুমি পড়ে যাবে না। কিন্তু তুমি জান তোমার ব্যাপারে আমি কখনো কোনো ঝুঁকি নেব না। তুমি যখন বাইভার্বাল চালানো শিখে যাবে তখন নিরাপত্তার এই ব্যাপারগুলো দরকার হবে না।"

"আমি কি এটি চালাতে পারব?"

"অবশ্যই পারবে। পৃথিবীতে যখন মানুষ বেঁচে ছিল তখন অবিশ্যি কখনোই তোমার বয়সী একটি শিশুকে কেউ বাইভার্বাল চালাতে দিত না।"

"কেন দিত না?"

"প্রয়োজন হত না। সেজন্যে দিত না। তখন ছোট শিশুদের কোনোরকম দায়িত্ব ছিল না। তারা শুধু মজা করত।"

"আমারও কোনো দায়িত্ব নাই।" নিকি গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি শুধু মজা করি।"

"না।" ক্রিনিটি তার গলার স্বরে খানিকটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে বলল, "তোমার অনেক দায়িত্ব। তুমি এর মাঝে কাপড় পরা শিখে গেছ। এখন তোমাকে এই বাইভার্বাল চালানো শিখতে হবে। তোমাকে যোগাযোগ মডিউল ব্যবহার করা শিখতে হবে। তোমাকে মনে হয় একটু-আধটু অস্ত্র ব্যবহার করা শিখতে হবে। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"আমরা যদি সত্যি সত্যি কোনো মানুষের দেখা পেয়ে যাই তা হলে আমি সেখানে কোনো কথা বলতে পারব না। আমি তৃতীয় মাত্রার রোবট, মানুষের সাথে কথা বলার যোগ্যতা আমার নেই। তোমাকে তার সাথে কথা বলতে হবে।"

"আমি তার সাথে কী কথা বলব?"

"সেটা যখন সময় হবে তখন তুমি ভেবে বের করে ফেলতে পারবে। এখন চল সকাল থাকতে থাকতে আমরা রওনা দিই।"

বাইভার্বালটির কাছাকাছি একটি পাখি বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ করছে। কাছাকাছি আরেকটি গাছে নানা বয়সী বানর। ক্রিনিটি বলল, "নিকি, তুমি তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নাও।"

"কেন বিদায় নেব ক্রিনিটি? আমি কি মরে যাব?"

"না। মরে যাবে না। কিন্তু যখন কোনো মানুষ অন্যদের কাছ থেকে চলে যায় তখন বিদায় নেয়।"

নিকির মুখটা হঠাৎ ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। সে নিচু গলায় বলল, "আমি চলে যেতে চাই না। আমি এখানে থাকতে চাই।"

ক্রিনিটি তার কপোট্রনে এক ধরনের চাপ অনুভব করে, সে চাপটি কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল তারপর ঘুরে নিকির দিকে তাকিয়ে বলল, "নিকি, তুমি সারা জীবন এখানে থাকতে পারবে না। তোমাকে এখন যেতে হবে, অন্য মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে।"

"আমি যেতে চাই না। আমি অন্য মানুষ খুঁজে বের করতে চাই না।"

"তোমার মা আমাকে বলেছে আমি যেন অন্য মানুষকে খুঁজে বের করে তোমাকে তাদের কাছে নিয়ে যাই। তোমাকে যেতে হবে নিকি।"

মায়ের কথা বলা হলে নিকি কখনো অবাধ্য হয় না। এবারেও হল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে আমি যাব। কিন্তু আগে বল তুমি আমাকে আবার এখানে নিয়ে আসবে।"

"তুমি যদি চাও তা হলে আমি আবার তোমাকে এখানে নিয়ে আসব। কিন্তু কিছু দিনের মাঝেই তুমি নিজেই বড় মানুষের মতো হয়ে যাবে। তুমি তখন একা একা এখানে ফিরে আসতে পারবে।"

"আমি বড় মানুষের মতো হতে চাই না। আমি ছোট থাকতে চাই।"

ক্রিনিটি এই কথাটির উত্তর দিল না—বলল, "তুমি তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নাও, বাইভার্বাল চালু করা হলে তার ইঞ্জিনের শব্দে তারা ভয় পেয়ে চলে যেতে পারে।"

নিকি তখন মাথা ঘুরিয়ে গাছের ওপর চুপ করে বসে থাকা পশুপাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল, বলল, "বিদায় কিকি। বিদায় মিকু। বিদায় সবাই।"

কিকি এবং মিকু নিচু স্বরে এক ধরনের শব্দ করল কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাইভার্বালের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল এবং তার তীব্র শব্দে তাদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। বাইভার্বালটি একটি ঝাঁকুনি দিয়ে মাটি থেকে এক মিটারের মতো উপরে উঠে গেল এবং আবার একটি ঝাঁকুনি দিয়ে সেটি সামনের দিকে ছুটে যেতে শুরু করে। নিকি মাথা ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকাল, অনেকগুলো পাখি কর্কশ শব্দ করে উড়ছে, তার মাঝে কোনো একটা কিকি। দূরে একটি গাছে এক ধরনের উত্তেজনা দেখা যায়। সেখানে নিশ্চয়ই মিকু এই মুহূর্তে গাছের একটি ডাল ধরে তার ভাষায় চিৎকার করছে। নিকি চাপা স্বরে বলল, "আমি ফিরে আসব। আমি আবার ফিরে আসব। আসবই আসব।"

নিকি অবাক হয়ে লক্ষ করল তার চোখে কেন জানি পানি চলে এসেছে। ব্যাপারটি সে বুঝতে পারল না।

AMARBOI.COM

ক্রিনিটি বলল, "নিকি। তুমি প্রথমে লক্ষ কর আমি কেমন করে বাইভার্বালটি চালাই, তারপর আমি তোমাকে চালাতে দেব।"

"আমি লক্ষ করছি ক্রিনিটি। কিন্তু তুমি কিছুই করছ না।"

"তুমি ভুল বল নি। আমি আসলে কিছুই করছি না—এই বাইভার্বালগুলোর ভেতরে যে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে সেটি নিজে থেকেই সবকিছু করতে পারে। আমি শুধু কন্ট্রোল প্যানেলে চোখ রাখছি আর স্টিয়ারিং হুইলটা ধরে রেখেছি।"

নিকি কন্ট্রোল প্যানেলটির দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "এখানে কী দেখা যায়?"

"সামনে কী আছে সেটি দেখা যায়।"

"আমি তো কিছু বুঝি না। এখানে তো শুধু লাল নীল কিছু রঙ।"

"তোমাকে এটি শিখতে হবে। রঙগুলো দেখাচ্ছে তাপমাত্রা। আকৃতিগুলো দেখে কী দিয়ে তৈরি সেটি বোঝা যায়। কত দূরে সেটি আছে সেটিও বোঝা যায়।" ক্রিনিটি ছোট একটি বিন্দুকে দেখিয়ে বলল, "যেমন এটি হচ্ছে একটি প্রাণী। সম্ভবত হরিণ।"

"কেমন করে বুঝলে?"

"অভিজ্ঞতা থেকে। আমি আগে বাইভার্বাল চালিয়েছি।"

নিকি দেখল ক্রিনিটির অনুমান সত্যি, বাইভার্বালটি যখন কাছে এসেছে তখন দেখা গেল একটি গাছের কাছাকাছি একটি বড় হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। হরিণটি বাইভার্বালটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, ইঞ্জিনটির শব্দ স্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সেটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে গেল।

নিকি বাইভার্বালের রেলিংটি ধরে বাইরে তাকিয়ে থাকে। বনভূমিটি পার হয়ে তারা বিশাল একটা জলাভূমিতে চলে এল। জলাভূমিটি পার হওয়ার পর শুকনো পাহাড়ি এলাকা শুরু হল। এখানে তারা কিছু বিধ্বস্ত বাড়িঘর দেখতে পায়, গাছপালা এবং লতাগুল্ম সেই বাড়িগুলোকে ঢেকে ফেলেছে, কোথাও কোনো প্রাণীর চিহ্ন নেই। ক্রিনিটি তার বাইভার্বালটি নিয়ে খুব নিচে দিয়ে বাড়িঘরগুলোর উপর দিয়ে উড়ে গেল, বাইভার্বালের ইঞ্জিনের শব্দে সচকিত হয়ে কিছু পাখি কিছু বুনো প্রাণী এদিক-সেদিক ছুটে গিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ করতে থাকে।

AMARBOI.COM

সারা দিন তারা বাইভার্বালে করে মাটির কাছাকাছি দিয়ে উড়ে যেতে থাকে। যতদূর চোখ যায় ধ্বংসস্তূপের মতো ছোট ছোট বাড়িঘর। গাছপালা ঝোপঝাড় আর লতাগুল্মে ঢাকা। ঝড়বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত। শ্যাওলায় ঢাকা। দেখে দেখে নিকি একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

সন্ধেবেলা ক্রিনিটি একটি বাড়ির সামনে তার বাইভার্বালটি থামাল। নিকি জিজ্ঞেস করল, "এখানে কেন থেমেছ ক্রিনিটি?"

"আমরা রাতে এখানে থাকব। তুমি ঘুমাবে। আমি একটু কাজ করব।"

"কী কাজ?"

"আমি নেটওয়ার্কের ভেতর ঢুকতে চাইছি। মানুষের নেটওয়ার্ক যদি নাও থাকে রোবটদের নেটওয়ার্ক থাকার কথা।"

নিকি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "আমরা তা হলে মানুষদের খুঁজে পাব না? শুধু রোবটদের খুঁজে পাব?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এখনো সেটি আমরা জানি না নিকি। যদি রোবটদের নেটওয়ার্কটি খুঁজে পাই তা হলে সেখানে সব রকম খোঁজ পাব। মানুষ আছে কি নেই সেটিও আমরা জানতে পারব।"

"ও।"

বাইভার্বালটি থামার পর নিকি লাফিয়ে সেটি থেকে নেমে এল। বড় বাসাটির দিকে তাকিয়ে সে যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেল ক্রিনিটি তখন তাকে থামাল, বলল, "নিকি, দাঁড়াও।"

"কী হল?"

"তুমি একা একা এখানে ঢুকো না।"

"কেন ক্রিনিটি?"

"বহু বছর এখানে কেউ থাকে না। ভেতরে কী আছে আমরা জানি না। হয়তো এমন কিছু আছে যেটি দেখে তোমার খারাপ লাগবে। হয়তো কোনো বুনো পশু, বিষাক্ত সাপ—"

"আমি বুনো পশু আর বিষাক্ত সাপকে ভয় পাই না।"

"কিন্তু তারা তোমাকে দেখে ভয় পেতে পারে। কেউ যখন ভয় পায় তখন তারা খুব অদ্ভুত কাজ করে ফেলতে পারে।"

ক্রিনিটি বাইভার্বাল থেকে কিছু যন্ত্রপাতি আর একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকল। ঘরের ভেতর আলো জ্বালিয়ে এদিক-সেদিক দেখল। ঘরের মাঝখানে একটি আলট্রাসনিক বিপার বসিয়ে অপেক্ষা করল। নিকি লক্ষ করল ঘরের ভেতর থেকে কিছু পোকামাকড়, ছোট ছোট প্রাণী ছুটে বেরিয়ে যেতে থাকে। ক্রিনিটি তার ফটোসেলের চোখ দিয়ে চারদিকে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিয়ে বলল, "নিকি, তুমি এখন ভেতরে আসতে পার।"

নিকি বাসাটির ভেতরে ঢুকল। বহু বছর এখানে কোনো মানুষের পা পড়ে নি, তারপরেও বাসাটি সাজানো গোছানো। ক্রিনিটির সাথে সে বাসাটির ভেতর ঘুরে দেখে, উপর তলায় দুটি ছোট ঘরে দুটি ছোট বিছানা। এখানে নিশ্চয়ই দুটি ছোট শিশু ঘুমাত। ঘরের দেয়ালে শিশুগুলোর ছবি টাঙানো, হাসিখুশি দুটি বাচ্চা।

নিকি বাচ্চাগুলোর ছবি দেখে বুকের ভেতর এক ধরনের ব্যথা অনুভব করে। সারা পৃথিবীর এরকম লক্ষ লক্ষ শিশু বেঁচেছিল, এখন কেউ নেই। সে একা এখন এই নির্জন পৃথিবীতে মানুষ খোঁজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে জানে না যদি একসাথে অনেকগুলো মানুষ থাকে তা হলে কীভাবে কথা বলতে হয়। কী করতে হয়। সত্যি সত্যি যদি কোনো মানুষের সাথে দেখা হয়ে যায় তা হলে সে কী করবে? তার সাথে কী কথা বলবে?

রাতে ঘুমানোর সময় ক্রিনিটি উপর তলায় ছোট একটি বাচ্চার বিছানা গুছিয়ে নিকিকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিল। কিছুক্ষণ পর সে তাকে একবার দেখতে এসে আবিষ্কার করল নিকি বিছানা থেকে চাদরটা নিয়ে মেঝেতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে। যে বিছানাটি অন্য একজন শিশুর সেখানে সে শুতে চাইছে না। কেন নিকি বিছানায় শুতে চাইছে না ক্রিনিটি সে বিষয়টা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করল না। মানুষের অনেক বিষয় সে বুঝতে পারে না, সে বোঝার চেষ্টাও করে না, বিষয়টি মেনে নেয়।

ক্রিনিটি নিকির শরীরটি চাদর দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিয়ে তার গলার মাদুলিটি খুলে নিচে নেমে আসে। ক্রিস্টাল রিডারে দিনলিপি রেকর্ড করে সে তার যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে বসল। যখন পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে ছিল তখন বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের পুরো স্পেকট্রামটা ব্যস্ত ছিল, অসংখ্য সিগন্যাল আনাগোনা করত। এখন পুরো স্পেকট্রামটি আশ্চর্যরকম নীরব। ক্রিনিটি একটু একটু করে বিশ্লেষণ করতে করতে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির

একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অত্যন্ত দুর্বল একটি সিগন্যাল আবিষ্কার করল। সে দীর্ঘ সময় সেটিকে বিশ্লেষণ করে, এখান থেকে উত্তর–পশ্চিম দিকে শ'খানেক কিলোমিটার দূর থেকে সেটি আসছে। কাছাকাছি গেলে হয়তো উৎসটা খুঁজে বের করা যাবে।

ক্রিনিটি বাকি রাতটুকু বাইভার্বালকে আরেকটি দীর্ঘ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত করে কাটিয়ে দিল। মানুষের মতো রোবটকে ঘুমাতে হয় না, রোবটকে বিশ্রামও নিতে হয় না। ক্রিনিটি তাই দিনরাত একটানা কাজ করতে পারে। যখন পৃথিবীর মূল তথ্যকেন্দ্র চালু ছিল তখন সে ব্যাপারটি বোঝার জন্যে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করেছে, ব্যাপারটি সে বুঝতে পারে নি। ঘুম বিষয়টি তার বোঝার ক্ষমতার বাইরে। স্বপ্ন বলে মানুষের ঘুম সম্পর্কিত আরো একটি বিষয়ের কথা সে শুনেছে, সেটি কী ক্রিনিটি তা অনুমান পর্যন্ত করতে পারে না।

ভোরবেলা নিকিকে নিয়ে ক্রিনিটি আবার রওনা দিয়ে দেয়। কোন দিকে যেতে হবে সেটি মোটামুটিভাবে জানে তাই ক্রিনিটি নিকিকে মাঝে মাঝেই বাইভার্বালটি চালাতে দিচ্ছে। আগে হোক পরে হোক নিকিকে এই ধরনের কাজগুলো শিখতেই হবে। যে শিশুটি পৃথিবীর একমাত্র জীবিত মানুষ তার দায়িত্ব অনেক বড়, তাকে সেভাবে গড়ে নিতে হবে।

উত্তর–পশ্চিমে যেতে যেতে হঠাৎ করে তারা একটি রাস্তা আবিষ্কার করল, কংক্রিটের রাস্তা অব্যবহারের কারণে জঙ্গালে ঢাকা পড়ে আছে। নিকি এই রাস্তা ধরে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নিল। ডানপাশে একটি নীল হ্রদ আবিষ্কার করে নিকি অকারণেই পুরো হ্রদটি একবার ঘুরে এল। ক্রিনিটি নিকিকে বাধা দিল না, বাইভার্বালটি আবার যখন পথের উপর উঠে এল তখন ক্রিনিটি বলল, "নিকি, তুমি বাইভার্বালটি ডান দিকে ঘুরিয়ে নাও।"

"কেন?"

"সামনে আমি এক ধরনের সিগন্যাল দেখেছি।"

"কোথা থেকে আসছে সিগন্যালটি?"

"আমি এখনো জানি না। কাছে গেলে বুঝতে পারব।"

নিকি বাইভার্বালটিকে ডান দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে অল্প কিছুদূর এগিয়ে যেতেই কন্ট্রোল প্যানেলে দুটি ছোট ছোট বিন্দু ফুটে ওঠে। নিকি বলল, "ক্রিনিটি, এই দেখ সামনে আরো দুটি হরিণ।"

ক্রিনিটি মাথা নাড়াল, বলল, "না এগুলো হরিণ না।"

"এগুলো তা হলে কী?"

"আমার মনে হয়, এগুলো রোবট।"

"রোবট?"

"হ্যাঁ। এটির শরীর ধাতব। এটি নড়ছে।"

"কী মজা!" নিকির মুখে হাসি ফুটে উঠল, "তোমার সাথে তোমার রোবট বন্ধুদের দেখা হবে।"

নিকির কথা শেষ হবার আগেই কর্কশ গুলির শব্দ শোনা গেল এবং বাইভার্বালের সামনে বায়ুনিরোধক স্বচ্ছ কাচের একটি অংশ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। নিকি বিদ্যুৎগতিতে নিচু হয়ে চিৎকার করে উঠল, "কী হয়েছে?"

ক্রিনিটি বলল, "গুলি করছে।"

AMARBOI.COM

"কে গুলি করছে?"

"রোবটগুলো।"

"কেন গুলি করছে রোবটগুলো?"

"মনে করছে আমরা তাদের এলাকায় বেআইনিভাবে ঢুকে পড়েছি।" ক্রিনিটির গলার স্বরে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই, খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল, "তুমি নিচু হয়ে থাক। তোমার শরীরে যেন গুলি না লাগে।"

"তুমিও নিচু হয়ে যাও ক্রিনিটি।"

"আমি রোবটগুলোর সাথে যোগাযোগ করছি।"

ক্রিনিটির কথা শেষ হবার আগে দ্বিতীয়বার কর্কশ শব্দ করে এক ঝাঁক গুলি ছুটে এল, বাইভার্বালের বায়ুনিরোধক যেটুকু কাচ বাকি রয়ে গিয়েছিল সেটুকুও এবার উড়ে গেল। নিকি চিৎকার করে বলল, "ক্রিনিটি বসে পড়!"

ক্রিনিটি বসে পড়ল না বরং মাথা উঁচু করে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ করে বাইভার্বালটি ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে পড়ে এবং চোখের পলকে চারদিক দিয়ে অনেকগুলো বীভৎস ধরনের রোবট বাইভার্বালটিকে ঘিরে ধরে। তাদের হাতে বিকট-দর্শন স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। বাইভার্বালটি থামার সাথে সাথে রোবটগুলো একসাথে তাদের অস্ত্রগুলো উঁচু করে চারদিক থেকে তাদের দিকে তাক করে ধরল।

নিকি চাপা গলায় বলল, "বোকা! কী বোকা!"

একটি রোবট মাটিতে পা ঠুকে বলে, "বোকা কে বলেছে আমাদের?"

নিকি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি।"

"তুমি? তুমি কেন আমাদের বোকা বলেছ?"

"তোমরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অস্ত্র তাক করেছ। এখন সবাই যদি গুলি কর তা হলে একজন আরেকজনকে মেরে ফেলবে।"

রোবটগুলো বেশ কয়েক সেকেন্ড কোনো কথা বলল না, তারপর সবাই একসাথে তাদের অস্ত্র নামিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল। শেষে একটি রোবট জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

"আমার নাম নিকি।"

"তুমি কত মাত্রার রোবট? সিস্টেম কত ধাপের?"

"আমি রোবট না।"

"তা হলে তুমি কী?"

"আমি মানুষ।"

সাথে সাথে রোবটগুলোর মাঝে ভয়ংকর এক ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে গেল। তারা একে অপরকে ধাক্কা দিতে থাকে, কথা বলতে থাকে, একবার অস্ত্র উপরে তুলে তারপর নামিয়ে আনে এবং সেগুলো ঝাঁকাতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যায় তখন ক্রিনিটি হাত তুলে বলল, "তোমরা থাম।"

রোবটগুলো সাথে সাথে থেমে যায়। একটি রোবট মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে নিকিকে দেখিয়ে বলল, "এই যন্ত্রটি আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।"

ক্রিনিটি বলল, "নিকি যন্ত্র নয়। নিকি আসলেই মানুষ।"

রোবটটা আবার মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "পৃথিবীতে কোনো মানুষ বেঁচে নেই। সব মানুষ মরে গেছে।"

দ্বিতীয় একটি রোবট বলল, "মরে গেছে।"

তখন অন্য সবগুলো রোবট হল্লা করতে শুরু করল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে শুরু করল, "মরে গেছে। মরে গেছে।"

নিকি অবাক হয়ে এই বীভৎস দর্শন রোবটগুলোকে দেখে, তাদের এই বিচিত্র ব্যবহার দেখে সে হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল।

সাথে সাথে সবগুলো রোবট হঠাৎ পাথরের মতো জমে যায়। সবগুলো রোবট তাদের ফটোসেলের চোখ দিয়ে নিকির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারা অস্ত্রগুলো নামিয়ে নেয় তারপর একে অন্যের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করে, "হেসেছে।"

"এটি নিশ্চিতভাবে হাসি। অন্যকিছু নয়।"

"অন্যকিছু নয়।"

"শুধুমাত্র মানুষ হাসতে পারে।"

"মানুষ শুধুমাত্র মানুষ।"

"তার অর্থ এই বস্তুটি একটি মানুষ।"

"সত্যিকারের মানুষ।"

"আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমরা সত্যিকারের একটি মানুষকে দেখতে পাচ্ছি।"

"সৌভাগ্যবান। অনেক সৌভাগ্যবান।"

"আমাদেরকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছিল। সকল মানুষ মারা যায় নি।"

"মারা যায় নি।"

"বস্তুটি একটি মানুষ। আমি মানুষটিকে স্পর্শ করে দেখতে চাই।"

"স্পর্শ করতে চাই। আমার তথ্যকেন্দ্রে তথ্য রয়েছে মানুষের শরীরে তাপমাত্রা নির্দিষ্ট। এটি স্থির থাকে।"

"চামড়া কোমল এবং খানিকটা আর্দ্র।"

"এদের চোখ অত্যন্ত সংবেদনশীল।"

"সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এদের মস্তিষ্ক। দশ বিলিয়ন নিউরন।"

আলোচনা এভাবে হয়তো আরো দীর্ঘ সময় ধরে চলত কিন্তু ক্রিনিটি হাত তুলে তাদের থামাল। বলল, "তোমাদের অনুমান সত্যি। আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই শিশুটি একটি সত্যিকারের মানবশিশু। আমি তৃতীয় মাত্রার একটি রোবট। আমার প্রাতিষ্ঠানিক নাম ক্রিনিটি।"

সামনে উপস্থিত রোবটগুলো একসাথে কথা বলতে শুরু করে, "আমরা দ্বিতীয় মাত্রার রোবট। আমাদের নাম নেই, শুধু সংখ্যা দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বাইনারিতে আমার সংখ্যাসূচক শূন্য এক শূন্য শূন্য এক..."

ক্রিনিটি আবার তাদের থামাল, বলল, "তোমাদের সংখ্যা সূচক বলার প্রয়োজন নেই। আমরা যে কাজে এসেছি তোমরা আমাদের সে কাজে সাহায্য কর।"

"অবশ্যই অবশ্যই আমরা সাহায্য করব। আমাদের যেটুকু ক্ষমতা আছে তা পুরোটুকু দিয়ে আমরা সাহায্য করব।"

"পৃথিবীর মানুষের মৃত্যু হবার পর তাদের নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে গেছে। আমরা কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারছি না। আমরা খোঁজ করছি অন্য কোনো নেটওয়ার্ক চালু আছে কি না। যদি চালু থাকে তা হলে আমরা কিছু তথ্য পেতে চাই।"

"আমাদের একটি নেটওয়ার্ক আছে। আমরা সেই নেটওয়ার্ক থেকে কিছু তথ্য পেতে

AMARBOI.COM

পারি। মানুষের মৃত্যুর পর তথ্যের গুরুত্ব কমে গেছে। আমাদের দায়িত্ব নিয়ে আদেশ–নির্দেশ আর পাঠানো হয় না। আমরা সেই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করি না।"

ক্রিনিটি বলল, "আমি সেই নেটওয়ার্কটি ব্যবহার করে একটু তথ্য সংগ্রহ করতে চাই।"

বীভৎস দর্শন একটি রোবট বলল, "চল, আমাদের সাথে চল। আমাদের কন্ট্রোল রুমে নেটওয়ার্ক সংযোগ আছে।"

নিকি বলল, "আমি কন্ট্রোল রুমে যেতে চাই না। নেটওয়ার্ক দেখতে চাই না।"

ক্রিনিটি জিজ্ঞেস করল, "তা হলে তুমি কী করতে চাও?"

"আমি জায়গাটি ঘুরে ঘুরে দেখতে চাই।"

"এটি অপরিচিত জায়গা। তোমার যদি কোনো বিপদ হয়?"

মাঝারি আকারের বিদঘুটে একটি রোবট বলল, "আমি মহামান্য নিকিকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রদান করব।"

সাথে সাথে আরো কয়েকটি রোবট বলল, "আমরাও মানবসন্তান মহামান্য নিকিকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দিতে পারি।"

ক্রিনিটি বলল, "তা হলে আমরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যেতে পারি। কয়েকজন আমার সাথে এস, অন্যেরা নিকির সাথে থাক।"

বীভৎস রোবটটি বলল, "ঠিক আছে।"

বিশাল একটি বিল্ডিংয়ের পাশে একটি কৃত্রিম হ্রদ। হ্রদটি ঘিরে বড় বড় গাছ। সেই গাছে পাখি কিচিরমিচির করছে। নিকি মাথা তুলে পাখিগুলোকে দেখার চেষ্টা করল।

AMARBOI.COM

একটি রোবট বলল, "মহামান্য নিকি, পাখিগুলোর চেঁচামেচি কি আপনাকে বিরক্ত করছে? আমি তা হলে এই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে পাখিগুলোকে শেষ করে দিতে পারি।"

নিকি আঁতকে উঠে বলল, "না, না, না! খবরদার পাখিগুলোর কখনো কোনো ক্ষতি করবে না।"

"আপনার ইচ্ছা মহামান্য নিকি। আপনি যেটি বলবেন সেটিই আমরা মেনে নেব।"

নিকি হিহি করে হেসে বলল, "আর আমাকে মহামান্য নিকি বলে ডেকো না! যখন আমাকে তোমরা মহামান্য বলে ডাকো তখন আমার যা হাসি পায় সেটি বলার মতো না। হাসতে হাসতে আমার পেট ব্যথা হয়ে যায়।"

রোবটটি বিড়বিড় করে বলল, "হাসি এবং ব্যথা এই দুটিই একটি মানবিক প্রক্রিয়া। আমরা এই প্রক্রিয়াগুলো বুঝি না!"

নিকি গম্ভীর হয়ে বলল, "ভাগ্যিস ক্রিনিটি এখানে নেই। সে থাকলে বলত তোমাদের বুদ্ধিমত্তা কম! ক্রিনিটি সারাক্ষণ আমাকে শুধু বুদ্ধিমত্তা বোঝানোর চেষ্টা করে।"

রোবটগুলো কোনো কথা বলল না। নিকি বলল, "আমার কী মনে হয় জানো?"

"কী?"

"ক্রিনিটির নিজেরই বুদ্ধিমত্তা কম।"

রোবটগুলো এবারেও কোনো কথা বলল না। নিকি বলল, "তবে ক্রিনিটির মনটি খুব ভালো। সে আমাকে খুব ভালবাসে।"

৫

রোবটগুলো বাইভার্বালটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ক্রিনিটি ইঞ্জিনটিকে চালু করার সাথে সাথে তারা অস্ত্র উপরে তুলে চিৎকার করে বলল, "জয়, মহামান্য নিকির জয়।"

নিকি হাসিমুখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিদায়! আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে।"

রোবটগুলো গম্ভীর মুখে বলল, "মহামান্য নিকি দীর্ঘজীবী হোন।"

বাইভার্বালটি মাটি থেকে মিটার খানেক উপরে উঠে একটু কাত হয়ে ঘুরে গিয়ে ছুটে যেতে শুরু করে। নিকি মাথা ঘুরিয়ে দেখল রোবটগুলো তাদের অস্ত্র উপরে তুলে আবার চিৎকার করে বলল, "জয়, মহামান্য নিকির জয়।"

নিকি ক্রিনিটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্রিনিটি, এরা আমাকে সব সময় মহামান্য নিকি কেন বলে?"

"তাদের কপোট্রনে এটি ইলেকট্রনিকভাবে গেঁথে দেয়া আছে পাকাপাকিভাবে। সব সময় তাদের মানুষকে সম্মান করতে হয়।"

"সব রোবটরাই কী এরকম?"

"না। এটি করা আছে শুধু দ্বিতীয় আর প্রথম মাত্রার রোবটে।"

"তোমার মাঝে নেই?"

"আমার মাঝে ওদের মতো হার্ডওয়্যার করা নেই। অন্যভাবে আছে। সিস্টেমে রাখা আছে। আমরাও মানুষকে গুরুত্ব দিই।"

"আর চতুর্থ মাত্রার রোবট?"

"তারাও মানুষকে গুরুত্ব দেয় কিন্তু তাদের কপোট্রনের দক্ষতা মানুষের মস্তিষ্কের সমান। তাই তারা সমান সমানভাবে গুরুত্ব দেয়।"

"আর পঞ্চম মাত্রার রোবট?"

"পৃথিবীতে পঞ্চম মাত্রার রোবট নেই।"

"কেন নেই?"

"তৈরি করা হয় নি। আমি তোমাকে বলেছি তাদের বুদ্ধিমত্তা মানুষের বুদ্ধিমত্তা থেকে অনেক বেশি হবে তাই ইচ্ছে করে তৈরি করা হয় নি। আমার কি মনে হয় জানো?"

"কী?"

"পঞ্চম মাত্রার রোবট মানুষকে মনে হয় সম্মান করবে না। তাদের বুদ্ধিমত্তা যদি মানুষ থেকে বেশি হয় তা হলে তাদের সম্মান করার দরকারও নেই। তুমি কি মিক্কুকে সম্মান কর?"

নিকি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "কিন্তু আমি তো মিক্কুকে অনেক ভালবাসি। পঞ্চম মাত্রার রোবট মানুষকে ভালবাসবে না?"

"মনে হয় ভালবাসবে। মানুষকে ভালবাসতে হয়।"

ক্রিনিটি বাইভার্বালটিকে একটি হ্রদের কাছাকাছি নিয়ে এল, হ্রদের তীর ঘেঁষে বাইভার্বালটি গর্জন করে ছুটে যেতে থাকে। বাইভার্বালের শব্দ শুনে অসংখ্য পাখি সচকিত হয়ে উড়ে যেতে থাকে। নিকি পাখিগুলোকে দেখতে দেখতে ক্রিনিটিকে জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ক্রিনিটি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একটি রোবোনগরীতে।"

"রোবোনগরী কী?"

"পৃথিবীর সব মানুষ মরে যাবার পরে রোবটেরা পৃথিবীর দায়িত্ব নিয়েছে। তারা নগর তৈরি করেছে। সেই নগরকে বলে রোবোনগরী।"

"সেখানে কি আছে ক্রিনিটি?"

"আমি এখনো জানি না। এখানে রোবটদের যে নেটওয়ার্ক আছে সেই নেটওয়ার্কে একটু খোঁজ নিয়েছি। মানুষের শহরে যা যা থাকার কথা মনে হয় তার সবই আছে। সিনেমা হল, আর্ট গ্যালারি, মিউজিক হল, স্টেডিয়াম, দোকানপাট।"

"সবকিছু রোবটদের জন্যে?"

"হ্যাঁ। সবকিছু রোবটদের জন্যে।"

"সেখানে কি আমার মতো কোনো মানুষ আছে?"

"এখনো জানি না। গেলে বুঝতে পারব। আমার মনে হয় নাই। গেলে খোঁজ পাব, অন্য কোনো রোবোনগরীতে আছে কি নাই। যতক্ষণ না পাই আমরা খুঁজতে থাকব।"

"তোমার কী মনে হয় ক্রিনিটি, আমরা কি খুঁজে পাব?"

"আমার মনে হয় পাব। তুমি যেরকম বেঁচে গিয়েছ সেরকম নিশ্চয়ই আরো কেউ বেঁচে গিয়েছে। তারা নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে।"

নিকি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আরেকজন মানুষের সাথে দেখা হলে আমি তাকে কী বলব?"

"আমি তোমাকে বলেছি তোমার সেটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তুমি তখন নিজেই বুঝতে পারবে কী বলতে হবে।"

"কী মজা হবে তখন, তাই না ক্রিনিটি?"

ক্রিনিটি মজা শব্দটি অনুভব করতে পারে না, কিন্তু সে সেটি নিকিকে বুঝতে দিল না।

সন্ধেবেলা রোবোনগরী পৌঁছানোর অনেক আগেই বাইভার্বালের মনিটরে তার উপস্থিতি ধরা পড়ল। সেখানে অনেকগুলো বিন্দু বিন্দু আলো এবং বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বিচ্ছুরণ দেখা গেল। নিকি সেদিকে তাকিয়ে বলল, "অনেক হইচই হচ্ছে। তাই না ক্রিনিটি?"

"হ্যাঁ।"

"সেখানে রোবটগুলো কয় মাত্রার?"

"বেশিরভাগই চার মাত্রার। হয়তো কিছু তিন মাত্রার।"

"তারা আমাকে দেখলে কী করবে?"

"আমি এখনো জানি না। সেজন্যে আমি সাবধান থাকতে চাইছি।"

"কীভাবে তুমি সাবধান থাকবে?"

"তোমাকে আমি আগেই নিয়ে যাব না। আমি নিজে গিয়ে আগে দেখে আসি।"

"আমাকে কোথায় রেখে যাবে?"

"তোমার জন্যে একটি নিরাপদ আশ্রয় বের করে সেখানে রেখে যাব।"

"আমি একা একা থাকব?"

"হ্যাঁ।"

"আমার একা থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

ক্রিনিটি তার কপোট্রনে মৃদু চাপ অনুভব করল। সে চাপটি কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করল, "তা হলে তুমি কী করতে চাও?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি তোমার সাথে যেতে চাই।"

"তোমাকে দেখলেই রোবোনগরীতে বিশাল উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। সেটি ভালো হবে না খারাপ হবে আমি তা এখনো অনুমান করতে পারছি না। আমি তোমাকে নিয়ে কখনো কোনো ঝুঁকি নেব না।"

"ঠিক আছে আমি তা হলে লুকিয়ে থাকব।"

"কোথায় লুকিয়ে থাকবে?"

"এই বাইভার্বালের পিছনে যে বাক্সটা আছে তার ভেতরে। তা হলে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।"

ক্রিনিটি বলল, বাক্সটি বেশি বড় না, তুমি কি আরাম করে থাকতে পারবে?"

"হ্যাঁ পারব। আমি গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে যাব। তুমি কোনো চিন্তা কোরো না।"

"ঠিক আছে।" ক্রিনিটি বলল, "আমার মনে হয়, এটি একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে।"

কাজেই বাইভার্বালটি থামিয়ে তার পেছনের বাক্সে বেশ খানিকটা জায়গা করে নিয়ে ক্রিনিটি সেখানে নিকিকে শুইয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, "তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো?"

"না। এখানে খুব আরামে ঘুমানো যাবে। এখন থেকে প্রত্যেক দিন আমি এখানেই ঘুমাব।"

"ঠিক আছে, তুমি ঘুমাও। আমি বাইভার্বালটিকে নিয়ে রোবোনগরীতে ঢুকি।"

রোবোনগরের গেটে দুটি ভয়ংকর দর্শন রোবট ক্রিনিটির বাইভার্বালটিকে থামাল। একজন জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই কিম্ভূতকিমাকার জঞ্জাল নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?"

"এটি কিম্ভূতকিমাকার জঞ্জাল নয়। এটি বাইভার্বাল।"

"এটি এত পুরোনো যে এটাকে জঞ্জাল বলা যায়। যাই হোক তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"আমি রোবোনগরীর ভেতরে যেতে চাই।"

"তোমার কি লাইসেন্স আছে?"

"না। আমার লাইসেন্স নেই। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। আমি আগে কখনো রোবোনগরীতে যাই নি।"

"সেটি আমি তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার কপোট্রন থেকে এখনো প্রাচীন কোডিং রেডিয়েট করছে।"

"আমি কী করতে পারি?"

"আমি তোমাকে সাময়িক একটি লাইসেন্স দিচ্ছি, চব্বিশ ঘণ্টার। এর মাঝে তোমাকে স্থায়ী লাইসেন্স করাতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

রোবটটি তার কিছু যন্ত্রপাতিতে চাপ দিতেই ক্রিনিটি তার কপোট্রনে কিছু তথ্যের অনুপ্রবেশ টের পেল। সে কপোট্রনটিকে দ্রুত ফায়ারওয়াল দিয়ে ঢেকে ফেলে। তার কপোট্রনে তথ্য ঢুকে গেলে সমস্যা নেই, কিন্তু কোনোভাবে সেখান থেকে তথ্য বের করে নিলে তারা নিকির তথ্য জেনে নেবে।

ভয়ংকর দর্শন রোবটটি বলল, "যাও। তোমার এই লক্কড়ঝক্কড় বাইভার্বালটি নির্দিষ্ট জায়গায় পার্ক করে নিও। আমরা কোডিং দিয়ে দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার কাছে কি কোনো ইউনিট আছে?"

"না নেই।"

রোবটটি শিস দেয়ার মতো শব্দ করে বলল, "তা হলে তুমি স্ফূর্তি করবে কেমন করে। রোবোনগরীতে এসেছ স্ফূর্তি না করে চলে যাবে?"

"আমি তৃতীয় মাত্রার রোবট। আমার ভেতরে স্ফূর্তি করার মডিউল নেই!"

"রোবোনগরীতে সস্তায় এই মডিউল লাগানো হচ্ছে। লাগিয়ে নিয়ে স্ফূর্তি করতে পারবে। সত্যি কোনো ইউনিট নেই।"

"না। তবে—"

"তবে কী?"

"আমি একটি মানুষ পরিবারের গৃহস্থালি রোবট হিসেবে কাজ করতাম। সেই পরিবারের অব্যবহৃত কিছু ইউনিট আমার কাছে আছে। খুবই কম।"

"বল কী? এটি তো সোনার খনি।"

"সোনার খনি?"

"হ্যাঁ। মানুষের হাতের স্পর্শ পাওয়া ইউনিট রীতিমতো মূল্যবান বস্তু। এর একটি বিক্রি করেই তুমি বড়লোক হয়ে যাবে। মানুষের যে কোনো কিছু খুবই মূল্যবান।"

ক্রিনিটি নিজের কপোট্রনে এক ধরনের চাপ অনুভব করল, সে চাপটি কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর বলল, "মানুষের যে কোনো কিছুই মূল্যবান?"

"হ্যাঁ। মানুষের চুল। নখ। ব্যবহারী কাপড়। এমনকি মানুষের আসল ভিডিও অনেক ইউনিটে বিক্রি হয়। তোমার কাছে কি কিছু আছে?"

"আমি গৃহস্থালি রোবট হিসেবে কাজ করেছি, কাজেই আমার কাছে কিছু আছে।"

"চমৎকার। বিক্রি করে তুমি রাতারাতি ধনী হয়ে যাবে। কপোট্রনের আপগ্রেড করে চার মাত্রায় চলে যেতে পারবে। নূতন পৃথিবী উপভোগ কর।"

ক্রিনিটি বলল, "আমি চেষ্টা করব।"

রোবট দুটি সুইচ টিপে দিতেই ঘরঘর শব্দ করে গেটটা খুলে যায়, ক্রিনিটি তার বাইভার্বালটি নিয়ে রোবোনগরীর ভেতর ঢুকল।

রাস্তায় নানা আকারের বাইভার্বাল, আধুনিক এবং স্বয়ংক্রিয়। সেগুলোর তুলনায় তার নিজের বাইভার্বালটি রীতিমতো হাস্যকর একটি যন্ত্র। চতুর্থ মাত্রার কিছু রোবট মাথা ঘুরিয়ে সেটি দেখছে। ক্রিনিটি অনুমান করতে পারে হাসার ক্ষমতা থাকা এই রোবটগুলো নিশ্চয়ই তার বাইভার্বালটিকে দেখে মনে মনে হাসছে।

বাইভার্বালটি নির্দিষ্ট জায়গায় পার্ক করে ক্রিনিটি পেছনে বাক্সের ভেতরে উঁকি দিল, নিচু গলায় ডাকল, "নিকি।"

নিকি ফিসফিস করে বলল, "বল ক্রিনিটি।"

"তুমি বলেছিলে ঘুমাবে।"

"ঘুম পাচ্ছে না।"

"না পেলেও চুপ করে শুয়ে থাক। আমি শহরটা ঘুরে দেখে একটু খোঁজখবর নিয়ে চলে আসব।"

"ঠিক আছে।"

ক্রিনিটি এদিক-সেদিক তাকায়, তার ইলেকট্রনিক সিগন্যাল বিস্তৃত করে। আশপাশে কেউ তাদের লক্ষ করছে না বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর সে হাঁটতে থাকে। দুটো রাস্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরেই দেখা যায় সেখানে বিশাল উত্তেজনা। উজ্জ্বল আলো এবং নানা আকারের রোবটের অনেক ভিড়। তাদের হইচই চেঁচামেচিতে জায়গাটি মুখরিত হয়ে আছে।

ক্রিনিটি সতর্কভাবে হাঁটতে থাকে। সে টের পায় তার কপোট্রনে অনেক তথ্য জোর করে ঢোকার চেষ্টা করছে, বিষয়টিতে সে অভ্যস্ত নয় তাই ফায়ারওয়াল দিয়ে সে নিজের কপোট্রনে একটি নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে রাখে। আশপাশের ঘরগুলো থেকে তাকে রোবটগুলো ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। সংগীতের একটি দোকান থেকে একটি রোবট বলল, "এই যে রূপবান! আমার ঘরে এস কিনিস্কির নবম সিম্ফোনি শুনে যাও। আজকে ছাড় দিয়েছি, মাত্র আট ইউনিটে পেয়ে যাবে।"

ক্রিনিটি বলল, "আমি তৃতীয় মাত্রার রোবট। সঙ্গীত উপভোগ করার ক্ষমতা নেই।"

"তাতে কী। কিনে নিয়ে যাও যখন চতুর্থ মাত্রার কপোট্রন বসাবে তখন উপভোগ করবে।"

"চতুর্থ মাত্রার কপোট্রনে আপগ্রেড করার মতো ইউনিট আমার কাছে এখন নেই।"

"এখন নেই তো কী হয়েছে? ভবিষ্যতে হবে।"

"ভবিষ্যতে যখন হবে তখন আমি বিবেচনা করব।"

সংগীতের দোকানের রোবটটি হতাশার মতো শব্দ করে বলল, "এই জন্যে তৃতীয় মাত্রার রোবটকে বলে জংধরা জঞ্জাল।"

ক্রিনিটি তাচ্ছিল্যটুকু উপেক্ষা করে এগিয়ে যায়। সামনে একটি ঘরের বাইরে অনেক ধরনের উজ্জ্বল আলো জ্বলছে এবং নিভছে। বাইরে উজ্জ্বল রঙের দুটি রোবট একই সাথে ঠিক একইভাবে তাদের যান্ত্রিক হাত নেড়ে কথা বলছে, "এস, আনন্দের ভুবনে এস। কপোট্রনে সঠিক তরঙ্গ উপস্থাপনের মাধ্যমে মস্তিষ্কের আনন্দ। সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ বিনোদন, চলে এস। চলে এস সবাই।"

অনেক রোবট সেখানে ঢুকছে। ক্রিনিটি কয়েক মুহূর্ত ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

ভয়ংকর ধরনের কিছু অস্ত্রের দোকান, কোল্ড ফিউসান ব্যাটারির একটি দোকান, তারপর কপোট্রন আপগ্রেডের অনেকগুলো দোকান পার হয়ে ক্রিনিটি আরো এগিয়ে যায়। বাইভার্বালের বড় একটি দোকান সে ঘুরে ঘুরে দেখল, নূতন নূতন ইঞ্জিনগুলো চমকপ্রদ। তার বাইভার্বালটি নিয়ে নগররক্ষী রোবটগুলো যে তামাশা করেছে তার একটি কারণ আছে।

বাইভার্বালের দোকান থেকে সে নানা ধরনের বিনোদনের আরো কয়েকটি ঘর পার হয়ে একটি চিড়িয়াখানা দেখতে পেল। অনেক ধরনের পশু সেখানে রাখা আছে। এরপরে একটি আর্ট গ্যালারি এবং কয়েকটি থিয়েটার। তার ঠিক মুখোমুখি একটি বড় হলঘরের সামনে সে দাঁড়িয়ে গেল। এতক্ষণ ধরে সে যেটি খুঁজছে ঠিক সেটি পেয়ে গেছে, হলঘরের উপরে নানা রঙের আলোর ঝলকানি, সেখানে বড় বড় করে লেখা, "বিস্ময়কর মানবশিশু। দর্শনি দশ ইউনিট।"

ক্রিনিটি তার পুরোনো ইউনিট পরিবর্তন করে অনেকগুলো নূতন ইউনিট পেয়ে গেল। সেখান থেকে দশ ইউনিট ব্যবহার করে সে হলঘরে ঢুকে যায়। ভেতরে আবছা অন্ধকার, অনেকগুলো রোবট সেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। সামনে একটি বড় স্টেজ, সেখানে চতুর্থ মাত্রার ছিমছাম একটি রোবট কথা বলছে, "বন্ধুগণ পৃথিবীর বিস্ময় হচ্ছে মানবশিশু। তোমাদের সামনে এখনই উপস্থিত হবে সেই বিস্ময়কর মানবশিশু, তোমরা তাকে দেখবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সাথে কথা বলবে, তার গান শুনবে। মাত্র দশ ইউনিটের বিনিময়ে আর কোথাও এই বিনোদন তোমরা খুঁজে পাবে না।"

একটি বিচিত্র শব্দ হতে থাকে এবং পেছনের পর্দাটি ধীরে ধীরে সরে গেল, দেখা গেল মঞ্চের মাঝখানে একটি ছোট টুল। সেখানে তিন-চার বছরের ছোট একটি শিশু বসে আছে। মঞ্চে তীব্র আলো, সেই আলোতে শিশুটি বড় বড় চোখ খুলে রোবটগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।

ছিমছাম রোবটটি তার গলায় কৃত্রিম একটি আনন্দের ভান ফুটিয়ে নিয়ে বলল, "এই মানবশিশুটির নাম লিশুয়া, তার জন্ম দক্ষিণের সমুদ্রতীরে। ভাইরাসের কারণে তার পরিবারের সবাই মৃত্যুবরণ করলেও রহস্যময়ভাবে সে বেঁচে যায়। তাই না লিশুয়া?"

লিশুয়া নামের শিশুটি মাথা নাড়ল। ছিমছাম রোবটটি বলল, "লিশুয়া মানুষের কণ্ঠে কথা বলে শোনাবে—গান গেয়ে শোনাবে। নাচবে, খেলা দেখাবে।"

উপস্থিত রোবটগুলোর একজন তখন বলল, "হাসি দেখতে চাই। হাসি"

অন্য রোবটগুলো প্রতিধ্বনি করল, বলল, "হাসি। হাসি।"

ছিমছাম রোবটটি ইতস্তত করে বলল, "লিশুয়া একা একা বড় হয়েছে, তাই সে হাসতে ভুলে গেছে। তাই না লিশুয়া?"

লিশুয়া মাথা নাড়াল। ছিমছাম রোবটটি বলল, "তারপরও সে তোমাদের সামনে হাসার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার আগে সে তোমাদের সাথে কথা বলবে। তোমরা প্রশ্ন কর, লিশুয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে। তাই না লিশুয়া?"

লিশুয়া মাথা নাড়াল এবং ক্রিনিটি বুঝতে পারল লিশুয়া আসলে সত্যিকারের মানবশিশু নয়। এটি জোড়াতালি দিয়ে মানবশিশুর মতো তৈরি করা একটি নিচু শ্রেণীর রোবট। ক্রিনিটি তখন রোবটদের ভিড় ঠেলে বের হয়ে যেতে শুরু করে।

ছিমছাম রোবটটি বলল, "এই যে! এই যে রূপবান! তুমি চলে যাচ্ছ কেন?"

ক্রিনিটি বলল, "এটি সত্যিকার মানবশিশু নয়।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি জানি। কারণ আমি একটি গৃহস্থালি রোবট। আমি মানবশিশু দেখেছি।"

ছিমছাম রোবটটি বলল, "অন্তত লিশুয়ার একটি গান শুনে যাও।"

"সত্যিকারের মানবশিশু হলে নিশ্চয়ই শুনতাম।"

"মাত্র দশ ইউনিটে সত্যিকারের মানবশিশুর গান শোনা যায় না।"

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি রোবট বলল, "লক্ষ ইউনিটেও তুমি সত্যিকারের মানবশিশুর গান শুনতে পারবে না। তার কারণ পৃথিবীতে কোনো মানবশিশু নেই।"

জরাজীর্ণ একটি রোবট নিচু গলায় বলল, "আছে।"

তার কথায় অন্য রোবটেরা কোনো গুরুত্ব দিল না, শুধু ক্রিনিটি রোবটটির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "কোথায় আছে?"

"জাতীয় গবেষণাগারে। একটি মেয়েশিশু আছে।"

"তুমি কেমন করে জান?"

জরাজীর্ণ রোবটটি আরো নিচু গলায় বলল, "আমি কেমন করে জানি তুমি কেন সেটি জানতে চাইছ?"

ক্রিনিটি বলল, "আমি তৃতীয় মাত্রার রোবট। আমার বুদ্ধিমত্তা নিম্নস্তরের। আমি নিজে থেকে একটি তথ্যের সত্য-মিথ্যা বুঝতে পারি না। আমাকে যাচাই-বাছাই করতে হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোবটটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্রিনিটির দিকে তাকাল। ক্রিনিটি বুঝতে পারল সেটি তার কপোট্রনে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছে। ক্রিনিটি ফায়ারওয়ালটি উজ্জীবিত করে রেখে তাকে তার কপোট্রনের ভেতর ঢুকতে দিল না।

রোবটটি এক ধরনের যান্ত্রিক শব্দ করে বলল, "যে নিজের কপোট্রনকে ফায়ারওয়াল দিয়ে ঢেকে রাখে আমি তাকে বিশ্বাস করি না। তুমি নিশ্চয়ই নিরাপত্তা বাহিনীর একজন গুপ্তচর।"

ক্রিনিটি বলল, "না। আমি গুপ্তচর না।"

জরাজীর্ণ রোবটটি গলা উঁচিয়ে বলল, "গুপ্তচর। গুপ্তচর।"

হঠাৎ করে রোবটদের মাঝে একটি হল্লা শুরু হয়ে গেল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা ছিমছাম রোবটটা হাত তুলে বলল, "থাম। সবাই থাম। কী হয়েছে এখানে?"

"নিরাপত্তা বাহিনীর একটি গুপ্তচর এখানে ঢুকে গেছে।"

ক্রিনিটি বলল, "না। আমি গুপ্তচর না।"

"তা হলে তোমার কপোট্রন ফায়ারওয়াল দিয়ে ঢেকে রেখেছ কেন?"

"আমি আমার তথ্য সবাইকে দিতে চাই না।"

রোবটগুলো আবার হল্লা করতে শুরু করল। মঞ্চে দাঁড়ানো ছিমছাম রোবটটি বলল, "চুপ কর। তোমরা সবাই চুপ কর। তা না হলে আমি জ্যামার সিগন্যাল দিয়ে সবার কপোট্রন জ্যাম করে দেব।"

কিছু কিছু রোবট তখন একটু শান্ত হয়। ক্রিনিটি রোবটদের ভিড় ঠেলে বের হয়ে যেতে থাকে। জরাজীর্ণ রোবটটি বলল, "তুমি কেন চলে যাচ্ছ?"

"এখানে থাকার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি সত্যিকার মানবশিশু খুঁজছি। এটি সত্যিকার মানবশিশু নয়।"

"তুমি সত্যিকার মানবশিশু দিয়ে কী করবে?"

"আমি গৃহস্থালি রোবট। আমি সব সময় সত্যিকার মানব এবং সত্যিকার মানবশিশুর সাথে কাজ করেছি। কৃত্রিম মানব এবং কৃত্রিম মানবশিশুতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।"

"বুঝতে পেরেছি।"

"কী বুঝতে পেরেছ?"

"তোমার কপোট্রনে মানবশিশু নিয়ে অনেক তথ্য আছে। সে জন্যে তুমি তোমার কপোট্রন ফায়ারওয়াল দিয়ে আড়াল করে রেখেছ।"

ক্রিনিটি তার কপোট্রনে প্রবল এক ধরনের চাপ অনুভব করে, কিন্তু জরাজীর্ণ রোবটের পরের কথায় তার চাপ দ্রুত কমে আসে। জরাজীর্ণ রোবটটি বলল, "আমি এখন বুঝতে পেরেছি তুমি কেন তোমার কপোট্রনটি ফায়ারওয়াল দিয়ে আড়াল করে রেখেছ। সত্যিকারের মানবশিশুর তথ্য অনেক ইউনিটে বিক্রি হয়। এই তথ্যগুলো সবাইকে জানতে দিও না।"

ক্রিনিটি বলল, "দেব না।"

"দেখেশুনে বিক্রি কোরো।"

"করব।"

"তৃতীয় মাত্রার রোবট হিসেবে তোমার বুদ্ধিমত্তা খারাপ নয়। কিছু ইউনিট পেলে কপোট্রনটি চার মাত্রায় আপগ্রেড করে নিও।"

"করে নেব।"

"ভালো কোম্পানি থেকে কপোট্রন কিনবে। কপো-কবট কোম্পানিটা ভালো। রক্ষণাবেক্ষণের ভালো প্যাকেজ আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ঠিক আছে।"

জরাজীর্ণ রোবটটা উপদেশ দিয়ে আরো কিছু একটি বলতে যাচ্ছিল, ক্রিনিটি তার আগেই জিজ্ঞেস করল, "তুমি বলেছ জাতীয় গবেষণাগারে একটি মেয়েশিশু আছে।"

"হ্যাঁ বলেছি।"

"জাতীয় গবেষণাগারটি কোথায়?"

"নূতন রোবোনগরী ইস্পানাতে।"

"সেটি কোথায়?"

"বেশি দূরে নয়, এখান থেকে সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার পশ্চিমে। নেটওয়ার্কে ইস্পানার অবস্থান দেয়া আছে। বাইভার্বালে কো-অর্ডিনেট ঢুকিয়ে নিও।"

"ঢুকিয়ে নেব।"

জরাজীর্ণ রোবটটি আরো কিছু একটি বলতে চাইছিল কিন্তু ঠিক তখন মঞ্চের কৃত্রিম মানবশিশুটি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে হাত-পা নেড়ে তীক্ষ্ণ গলায় গান গাইতে শুরু করে। ক্রিনিটির সঙ্গীত অনুভব করার ক্ষমতা নেই তাই সে বুঝতে পারল না সেটি ভালো না খারাপ। সে অবিশ্যি তার চেষ্টাও করল না, রোবটদের ভিড় ঠেলে বের হয়ে এল।

রোবোনগরীর রাজপথ ধরে হেঁটে ক্রিনিটি তার বাইভার্বালের কাছে ফিরে এল। জায়গাটি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং নিরিবিলি। ক্রিনিটি এদিক-সেদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল আশপাশে কেউ নেই তখন সে বাইভার্বালের পেছনে গিয়ে ছোট বাক্সটি সাবধানে খুলে উঁকি দেয়, সেখানে নিকির ঘুমিয়ে থাকার কথা। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই।

ক্রিনিটি তৃতীয় মাত্রার রোবট তার বিচলিত অথবা আতঙ্কিত হওয়ার ক্ষমতা নেই। তাই সে বিচলিত অথবা আতঙ্কিত হল না। বাইভার্বালের সামনে লাগানো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি খুলে নিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের ওপরে রেখে বিড়বিড় করে বলল, "এখন মনে হচ্ছে অস্ত্র নিয়ে আসার সিদ্ধান্তটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল।"

AMARBOI.COM

৬

ক্রিনিটি চলে যাবার পর নিকি ছোট খুপরির মতো বাক্সের ভেতর ঘুমানোর চেষ্টা করল। তার চোখে সহজে ঘুম নেমে এল না, যখনই তার চোখে একটু ঘুম নেমে আসছিল ঠিক তখনই কাছাকাছি রোবোনগরীর কোনো এলাকা থেকে বিচিত্র এক ধরনের হল্লার শব্দে সে পুরোপুরি জেগে উঠতে থাকল।

শেষ পর্যন্ত সে হাল ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি উঠে বসে এবং বাক্সের ডালাটা একটু খুলে বাইরে উঁকি দেয়। বাইরে আবছা অন্ধকার। দূর থেকে রঙিন আলোর ছটা এসে মাঝে মাঝে জায়গাটি একটু আলোকিত করে দিচ্ছে। আশপাশে কেউ নেই, শুধু বাইভার্বালগুলো সারি সারি সাজানো। নিকি কিছুক্ষণ চারদিকে লক্ষ করে, যখন সে দেখল কোথাও কেউ নেই তখন সে সাবধানে বাক্সের ভেতর থেকে বের হয়ে এল। নিকি কিছুক্ষণ বাইভার্বালের মেঝেতে বসে রইল তারপর সে সেখান থেকে নেমে এল। কাছাকাছি অনেকগুলো বাইভার্বাল, নিকি হেঁটে হেঁটে কাছাকাছি বাইভার্বালটার কাছে দাঁড়ায়। আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না তারপরেও বোঝা যায় তাদের বাইভার্বাল থেকে এটি অনেক বেশি সুন্দর, অনেক চকচকে। নিকি হাত দিয়ে স্পর্শ করল, বাইভার্বালের আবরণটি মসৃণ

এবং শীতল। নিকি হেঁটে হেঁটে পাশের বাইভার্বালের কাছে গেল, সেটিকেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখল। পরের বাইভার্বালটির কাছে গিয়ে সে হতবাক হয়ে যায়। এই বাইভার্বালটি অনেক বড়, পেছন দিকে বড় বড় দুটি জেট, ওপরে একটি পাখা। সামনে অনেকগুলো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। আবছা অন্ধকারে বাইভার্বালটিকে একটা বিশাল দৈত্যের মতো দেখায়। নিকি কাছে গিয়ে বাইভার্বালটিকে স্পর্শ করল।

সাথে সাথে একটি ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে যায়। বাইভার্বালটি জীবন্ত প্রাণীর মতো ঝটকা দিয়ে নড়ে ওঠে, তীব্র আলোতে চারদিকে ঝলসে ওঠে আর তীক্ষ্ণ অ্যালার্মের শব্দে চারদিক সচকিত হয়ে ওঠে। নিকি ভয় পেয়ে লাফিয়ে সরে আসে, বাইভার্বাল থেকে অনেকগুলো সার্চ লাইট তার দিকে ঘুরে আসে, তীব্র আলোতে নিকির চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

নিকি দুই হাতে চোখ ঢেকে ছুটতে থাকে, কোথায় কোন দিকে যাচ্ছে সে বুঝতে পারছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত তীব্র অ্যালার্ম আর আলোর ঝলকানি হতে থাকল ততক্ষণ সে ছুটতে থাকল। যখন অ্যালার্মের শব্দ শেষ পর্যন্ত কমে এল নিকি তখন থামল এবং তাকিয়ে দেখল সে একটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। দূরে আলো জ্বলছে এবং সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে নানা আকারের কিছু রোবট ইতস্তত হাঁটছে।

নিকি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। সে তার এলাকায় জঙ্গলের প্রতিটি গাছকে চিনত, এখানে সে কিছুই চেনে না। ক্রিনিটি ফিরে এসে তাকে খুঁজে না পেলে কী করবে সে জানে না। ক্রিনিটি বলেছিল বাইভার্বালের বাক্সটায় শুয়ে ঘুমাতে, নিকি তার কথা শোনে নি, কাজটা মোটেও ভালো হয় নি। নিকির মনে হল সে কেঁদে ফেলবে কিন্তু সে কাঁদল না। ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে একটু শান্ত করে সে যেদিক থেকে হেঁটে এসেছে সেদিকে হেঁটে যেতে শুরু করল।

খানিক দূর হেঁটে নিকি বুঝতে পারল সে ভুল দিকে চলে এসেছে। রাস্তায় অনেকগুলো দোকান এবং সেই দোকানের আশপাশে বেশ কিছু রোবট। একটি রোবট তার পাশ দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে লম্বা পা ফেলে হেঁটে হেঁটে চলে গেল। রোবটটি তাকে দেখেছে কি না নিকি বুঝতে পারল না। নিকি আবার ঘুরে উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে। খানিকটা নির্জন জায়গা পার হয়ে সে একটি দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল। তখন কোন দিকে যাওয়া উচিত সে বুঝতে পারছিল না। যখন সে ডানে-বামে তাকাচ্ছে তখন দেখতে পেল দুটি রোবট লম্বা পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

রোবট দুটি কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল, তাদের সবুজ ফটোসেলগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল। ধাতব গলায় একটি রোবট জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ।"

নিকি কিছু বলার আগেই অন্য রোবটটা বলল, "খেলনা। নিশ্চয়ই খেলনা। দেখছ না কত ছোট?"

প্রথম রোবটটা বলল, "কিন্তু কোনো রেডিয়েশন নাই। বৈদ্যুতিক সিগন্যাল ছাড়া কেমন করে চলছে?"

"খুব ভালো করে সিল করেছে। দামি খেলনা।"

প্রথম রোবটটা আরো একটু কাছে এসে বলল, "তুমি কে?"

নিকি বলল, "আমি নিকি।"

রোবট দুটি কেমন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। প্রথম রোবটটা বলল, "শব্দের কম্পাঙ্ক ষোল থেকে শুরু করে পঁচিশ কিলো হার্টজ পর্যন্ত গিয়েছে। অপূর্ব সুষম উপস্থাপন!"

"সত্যিকারের মানবশিশুর মতো।"

"নিশ্চয়ই অত্যন্ত দামি খেলনা। ভালো কোম্পানির তৈরি।"

দ্বিতীয় রোবটটি বলল, "কোন কোম্পানির তৈরি?"

"পিঠে কোম্পানির লোগো আছে নিশ্চয়ই।"

দ্বিতীয় রোবটটি তখন খপ করে নিকিকে ধরে ফেলল, এবং সাথে সাথে ছেড়ে দিল। প্রথম রোবটটি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"এর ত্বকটি পলিমারের নয়। জৈবিক পদার্থ। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত। গঠন অবিশ্বাস্য।"

প্রথম রোবটটি বলল, "ব্যাটারিটা খুলে পরীক্ষা করে দেখা যাক।"

"কানের নিচে সুইচ থাকে। আগে সুইচটি অফ করে নাও।"

প্রথম রোবটটা এবারে নিকিকে ধরার চেষ্টা করল, নিকি তখন ছিটকে পেছনে সরে এল। রোবটটা থমকে গিয়ে বলল, "একটি খেলনার জন্য এটি যথেষ্ট ক্ষিপ্র!"

নিকি একটি দৌড় দেবার চেষ্টা করল কিন্তু তার আগেই রোবটটি তাকে ধরে ফেলেছে। নিকি প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও আমাকে।"

রোবটটি তাকে ছাড়ল না। শক্ত করে ধরে কানের নিচে সুইচ খোঁজার চেষ্টা করতে থাকল।

সেখানে কিছু না পেয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে ব্যাটারি প্যাক খুঁজতে লাগল। সেখানেও কিছু পেল না, তখন রোবটটি থেমে গেল। নিকির হাতটি শক্ত করে ধরে রেখে বলল, "অবিশ্বাস্য। এটি অবিশ্বাস্য।"

দ্বিতীয় রোবটটি বলল, "কী অবিশ্বাস্য?"

"এর কোনো ব্যাটারি প্যাক নেই।"

"তার মানে?"

"তার মানে এটি একটি জৈবিক প্রাণী। এটি একটি জীবন্ত মানবশিশু।"

"জীবন্ত মানবশিশু?"

"হ্যাঁ।"

প্রথম রোবটটি এদিক-সেদিক তাকাল, তারপর বলল, "এই মুহূর্তে আমাদের কপোট্রন ফায়ারওয়ালে আড়াল করে নিতে হবে যেন আর কেউ খোঁজ না পায়।"

"হ্যাঁ। আড়াল করে নিতে হবে।"

দুটি রোবটই তাদের কপোট্রন ফায়ারওয়ালে আড়াল করে রোবটদের নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল। তারপর নিচু হয়ে বসে নিকিকে পরীক্ষা করতে থাকে।

নিকি ছটফট করে নিজেকে মুক্ত করে নেয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, "ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে।"

প্রথম রোবটটি বলল, "তোমাকে আমরা ছাড়ব না। তুমি সত্যিকারের মানবশিশু। পৃথিবীতে সত্যিকারের মানবশিশু নেই। তোমাকে কিছুতেই ছাড়া যাবে না।"

"কেন ছাড়া যাবে না।"

"তার কারণ তুমি পৃথিবীতে এখন অমূল্য সম্পদ।"

দ্বিতীয় রোবটটি উঠে দাঁড়াল, চারদিকে একবার তাকাল তারপর বলল, "আমরা এই মানবশিশুটিকে নিয়ে কী করব?"

"অনেক কিছু করতে পারি। বিজ্ঞান একাডেমিতে বিক্রয় করতে পারি। থিয়েটারে দেখাতে পারি। শরীরের অংশ কেটে কেটে বিক্রয় করতে পারি। আমাদের অফুরন্ত সুযোগ।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমরা দুজন সুযোগটা কীভাবে গ্রহণ করব?"

প্রথম রোবট বলল, "সেটি কোনো সমস্যা হবার কথা নয়।"

"কেন?"

"তার কারণ আমি আমার কপোট্রনে কিছু দিন আগে ভিগা মডিউল লাগিয়েছি।"

"ভিগা মডিউল? এটি বেআইনি। সম্পূর্ণ বেআইনি। কেউ তার কপোট্রনে ভিগা মডিউল লাগালে তাকে ধ্বংস করে দিতে হয়।"

"সেটি আমি জানি।"

"তা হলে কেন লাগিয়েছ?"

"ভিগা মডিউল কপোট্রনের নৈতিক ব্যাপারগুলো অচল করে বড় বড় অপরাধ করার ব্যবস্থা করে দেয়। আমি যে কোনো অনৈতিক কাজ করতে পারি। অপরাধ করতে পারি।"

দ্বিতীয় রোবটটি একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সেটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "কিন্তু সেটি অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী খবর পেলে তোমাকে সাথে সাথে ধ্বংস করে দেবে।"

"আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কেমন করে খবর পাবে? আমি কাউকে এই তথ্যটি দিই নি।"

"এই যে আমাকে দিলে।"

"আমি তোমাকে দিয়েছি কারণ আমি তোমাকে এক্ষুনি ধ্বংস করে দেব। এই মানবশিশুর মালিকানায় আমি কাউকে কোনো অংশ দিতে চাই না।"

রোবটটি কথা শেষ করার আগেই তার শরীরের ভেতর থেকে একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বের করে দ্বিতীয় রোবটটির মাথা লক্ষ করে গুলি করল। একটি ছোট বিস্ফোরণের মতো শব্দ হল এবং দ্বিতীয় রোবটটি কয়েকবার দুলে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথম রোবটটি সেটিকে পরীক্ষা করে অস্ত্রটি আবার তার শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে নেয়।

নিকি নিজেকে মুক্ত করার জন্যে আরেকবার চেষ্টা করে চিৎকার করে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও।"

"আমি তোমাকে ছাড়ব না। তোমাকে আমি নিয়ে যাব।"

"আমি তোমার সাথে যাব না।"

"সেটি কোনো সমস্যা নয়। আমি তোমাকে জোর করেই নিয়ে যাব। কিন্তু সারাক্ষণ তুমি যদি চিৎকার করতে থাক তা হলে অনেক সমস্যা হতে পারে। নিরাপত্তা বাহিনী এসে গেলে অনেক ঝামেলা হবে।"

নিকি চিৎকার করে বলল, "আমি চিৎকার করব।"

রোবটটি গম্ভীর গলায় বলল, "আমি তোমাকে তার সুযোগ দেব না। মানবশিশুর ঘাড়ে জোরে আঘাত করলে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনের বাধার কারণে সে অচেতন হয়ে পড়ে। আমি তোমাকে অচেতন করে নিয়ে যাব।"

নিকি নিজেকে ছুটিয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "না। না—আমাকে ছেড়ে দাও।"

"তবে কত জোরে আঘাত করতে হয় আমি জানি না। একটু জোরে আঘাত করলে মস্তিষ্কের রক্তবাহী ধমনি ছিঁড়ে যেতে পারে। মেরুদণ্ড ভেঙে যেতে পারে। আমি তারপরেও সেই ঝুঁকি নেব। ঘটনাক্রমে তুমি মরে গেলেও তোমার দেহটি থাকবে। সেটিও অনেক মূল্যবান।"

রোবটটি নিকিকে তার একটি ধাতব হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখে এবং অন্য হাতটি দিয়ে আঘাত করার জন্যে হাতটি উপরে তোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক তখন তার পেছনে একটি বাইভার্বাল এসে থামল আর সেখান থেকে ক্রিনিটি তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি হাতে নিয়ে নেমে আসে। রোবটটি কিছু একটা বুঝতে পেরে হাতটি স্থির রেখে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। ক্রিনিটি সাথে সাথে তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটির ট্রিগার টেনে ধরে এবং একটি বিস্ফোরণের শব্দের সাথে সাথে রোবটটির পুরো মাথাটি ভস্মীভূত হয়ে উড়ে যায়। তীব্র উত্তাপের একটি হলকায় সাথে সাথে ঝাঁজালো একটি গন্ধে পুরো এলাকাটি ভরে গেল। রোবটটি কয়েকবার দুলে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

নিকি ঝটকা দিয়ে নিজের হাত–পা টেনে ধরতেই রোবটের অ্যাঙ্গেলগুলো খুলে যায়, নিজেকে মুক্ত করে সে ক্রিনিটির দিকে ছুটে গিয়ে বলল, "ক্রিনিটি! তুমি এসেছ!"

"হ্যাঁ। আমি এসেছি। তাড়াতাড়ি বাইভার্বালে উঠে পড়।"

"উঠছি ক্রিনিটি।"

"বিস্ফোরণের শব্দে অন্য রোবট এসে পড়বে। তখন আমাকে আরো রোবটের কপোট্রন ভস্মীভূত করতে হতে পারে। আমি এখন সেটি করতে চাই না।"

নিকি বাইভার্বালে উঠে ক্রিনিটিকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি কি আমার ওপরে রাগ করেছ ক্রিনিটি?"

ক্রিনিটি বলল, "আমি তৃতীয় মাত্রার রোবট। আমার রাগ করার ক্ষমতা নেই নিকি। যদি থাকত তা হলে হয়তো রাগ করতাম।"

"আমি তোমাকে বলছি ক্রিনিটি, আমি আর কক্ষনো তোমার কথার অবাধ্য হব না।"

"তুমি যখন আরেকটু বড় হবে, তখন তুমি তোমার নিজের দায়িত্ব নিতে পারবে। তখন তোমার আমার কথা শোনার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এখন আমার কথাগুলো শোনা তোমার নিরাপত্তার জন্যে ভালো।"

ক্রিনিটি বাইভার্বালটা মাটি থেকে একটু উপরে তুলে সেটিকে উড়িয়ে নিতে থাকে। নিকি জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কোথায় যাব ক্রিনিটি।"

"প্রথমে এই শহর থেকে বেরিয়ে যাব।"

"তারপর?"

"তারপর যাব ইস্পানা নামের নগরে।"

"সেখানে কী আছে?"

"শুনেছি সেখানে একজন মানবশিশু আছে।"

নিকি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ক্রিনিটির দিকে তাকাল। বলল, "মানবশিশু? আমার মতো?"

"হ্যাঁ, তোমার মতো।"

"তার সাথে দেখা হলে আমি কী বলব ক্রিনিটি?"

"সেটি নিয়ে এই মুহূর্তে তোমার চিন্তা করতে হবে না। তুমি বরং এখন বাক্সটার ভেতর ঢুকে যাও। আমি চাই না আর কোনো রোবট তোমাকে দেখুক।"

"ঠিক আছে ক্রিনিটি।"

নিকি চলন্ত বাইভার্বালেই গুড়ি মেরে পেছনে গিয়ে বাক্সটার ভেতর ঢুকে গেল।

গভীর রাতে একটি হ্রদের পাশে ক্রিনিটি তার বাইভার্বালটি নামিয়ে আনে। খাবারের কৌটা খুলে কিছু খাবার বের করে সেগুলো একটু গরম করে সে নিকির কাছে নিয়ে যায়। বাইভার্বালের পেছনের বাক্সটি খুলে ক্রিনিটি আবিষ্কার করল নিকি গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে। ক্রিনিটি নিচু গলায় তাকে ডাকল। নিকি ঘুমের মাঝে অস্পষ্ট একটি শব্দ করে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ক্রিনিটি কিছুক্ষণ খাবারগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তারপর নিচু হয়ে নিকির গলা থেকে মাদুলিটি খুলে বাইভার্বালের মেঝেতে বসে পড়ে। মাদুলির ভেতর থেকে ছোট ক্রিস্টালটা বের করে সে ক্রিস্টাল রিডারে ঢুকিয়ে একটি মাইক্রোফোন টেনে নেয়। রোবটের একঘেয়ে যান্ত্রিক গলার স্বরে সে বলতে থাকে, "রোবোনগরীর প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটি ছিল যথেষ্ট উত্তেজনাময়। মানবশিশু নিয়ে রোবটসমাজের অস্বাভাবিক এক ধরনের আগ্রহ রয়েছে। নিকি যখন রোবোনগরীতে হারিয়ে গিয়েছিল তখন সে দুটি চতুর্থ মাত্রার রোবটের কবলে পড়ে। তাদের একটি ছিল অপরাধকর্মে পারদশী। নিকির গলায় মাদুলির আকারে যে ট্রাকিওশানটি রয়েছে সেটির কারণে আমি তাকে খুঁজে পাই। তাকে রক্ষা করার জন্যে আমি কোনো ঝুঁকি নিই নি। অপরাধ করতে পারদর্শী রোবটের কপোট্রনটি সে কারণে আমার ধ্বংস করে দিতে হয়।

"আমি আশা করছি নিকির কথা এই রোবট দুটির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে নি। আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি রোবটদের মাঝে নিকির উপস্থিতি মোটেও নিরাপদ নয়। ইস্পানা নগরে যে মানবশিশুটি রয়েছে বলে শুনেছি তার সাথে দেখা করার প্রক্রিয়াটি হবে অনেক বিপজ্জনক।

"আজকের দিনটির মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল..."

ক্রিনিটি নিখুঁতভাবে পুরো দিনলিপিটি লিপিবদ্ধ করতে থাকে।

৭

AMARBOI.COM

নিকি বাইভার্বালের বাক্সের ভেতর থেকে গুড়ি মেরে বের হয়ে এল। চারপাশে বড় বড় গাছ, তার মাঝে একটি হ্রদ। হ্রদের অন্য পাশে দূরে একটি উঁচু বিল্ডিং। বিল্ডিংয়ের চারপাশে উঁচু পাথরের দেয়াল। নিকি জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় এসেছি ক্রিনিটি?"

ক্রিনিটি বলল, "এটি ইস্পানা নগর।"

"যেখানে আরেকজন মানুষের বাচ্চা আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় আছে মানুষের বাচ্চাটি?"

"ঐ যে বিল্ডিংটা দেখছ, সেখানে!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। এই বিল্ডিংটি হচ্ছে জাতীয় গবেষণাগার।"

নিকি বাইভার্বাল থেকে নেমে দূরে বিল্ডিংটির দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরে জিজ্ঞেস করল, "আমরা বিল্ডিংয়ের ভেতর কখন যাব?"

ক্রিনিটি তার কপোট্রনে এক ধরনের চাপ অনুভব করে। সে চাপটি কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে বলল, "সেটি এখনো ঠিক করা হয় নি।"

"কেন ঠিক করা হয় নি?"

"তার কারণ রোবটরা যদি তোমাকে দেখে তা হলে তোমাকে ধরে ফেলবে। কখনো বের হতে দেবে না। তাই ভেতরে যদি যেতে হয় তা হলে আমাদের যেতে হবে গোপনে।"

"গোপনে?"

"হ্যাঁ। এমনভাবে যেতে হবে যেন কেউ জানতে না পারে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেটি কেমন করে হবে?"

ক্রিনিটি বলল, "আমি এখনো জানি না। আমাদের এই জাতীয় গবেষণাগার নিয়ে প্রথমে সব রকম তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।"

"কেমন করে করবে?"

"সেটি এখনো জানি না।"

"যখন তুমি সব রকম তথ্য সংগ্রহ করবে, তখন তুমি কী করবে ক্রিনিটি?"

"আমি সেটি এখনো জানি না।"

নিকি এবারে খুকখুক করে একটু হাসল। ক্রিনিটি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন হাসছ?"

"আমি তোমাকে যেটিই জিজ্ঞেস করি তুমি তার উত্তরে বল আমি সেটি এখনো জানি না!"

ক্রিনিটি বলল, "কোনো কিছু না জানার মাঝে হাস্যকর কিছু নেই। তোমাকে নিয়ে আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না।"

"আমার খুব ভেতরে গিয়ে মানুষের বাচ্চাটিকে দেখতে ইচ্ছে করছে।"

"কিন্তু তোমাকে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।"

"আমার অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে না।"

ক্রিনিটি নিকির দিকে তাকিয়ে বলল, "তার পরেও তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ আমি বাইভার্বালটিকে এই বনের মাঝে নামিয়েছি। কেউ যেন আমাদের দেখতে না পারে সেজন্যে। তুমি এই মুহূর্তে বাইরে খোলা জায়গায় বের হয়ো না।"

"কেন ক্রিনিটি?"

"খোলা জায়গায় বের হলে তোমাকে দেখে ফেলতে পারে।"

"ও।"

"বিল্ডিংটায় চারপাশে দেয়ালের ওপরে ইলেকট্রিক তার লাগানো আছে। কেউ যেন দেয়াল টপকাতে না পারে সেজন্যে।"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "ও।"

"আমি নিশ্চিত সেখানে লেজার লাইট আছে। নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে। কোনো কিছু স্পর্শ করলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে।"

নিকি এবারে জোরে জোরে মাথা নাড়ল, রোবোনগরীতে একটি বাইভার্বাল শুধুমাত্র ছোঁয়ার সাথে সাথে কী বিকট স্বরে অ্যালার্ম বেজে উঠেছিল সেটি তার এখনো মনে আছে।

ক্রিনিটি বলল, "আমি ইতোমধ্যে আমার নেটওয়ার্ক চালু করেছি। রোবটদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছি। ভেতরের ম্যাপটা পেয়ে গেলে বুঝতে পারব। মানবশিশু কোথায় থাকে সেটিও অনুমান করতে হবে।"

"আমি তা হলে কী করব?"

"তুমিও বিষয়টি নিয়ে চিন্তা কর। আমরা রোবটেরা শুধুমাত্র যুক্তিপূর্ণ সমাধান বের করি। মানুষ মাঝে মাঝে অযৌক্তিক এবং অবাস্তব সমাধান বের করে ফেলে।"

নিকি গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

ক্রিনিটি সারা দিন নানা ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকল। নিকি প্রথমে কিছুক্ষণ তার পাশে থেকে সে কী করছে বোঝার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুক্ষণের মাঝেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। তখন সে বনের ভেতর ইতস্তত ঘুরতে শুরু করে। পৃথিবীর সব মানুষ মরে গিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু অন্যসব প্রাণী, পোকামাকড়, পাখি, সরীসৃপ সবকিছু বেঁচে আছে। তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে নিকির খুব ভালো লাগে। সে অনেকক্ষণ একটি গুবরে পোকাকে মাটির ভেতর ঢুকে যেতে দেখল। একটি ছোট মাকড়সাকে খুব ধৈর্য ধরে একটি জাল তৈরি করতে দেখল। একটি প্রজাপতির পেছনে পেছনে সে অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াল। তারপর সে ধবধবে সাদা পুতুলের মতো একটি খরগোশের বাচ্চাকে দেখে তার সাথে ভাব করার চেষ্টা করল।

খরগোশের বাচ্চাটি সতর্ক দৃষ্টিতে নিকিকে লক্ষ করে, তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারবে কি না সেটি বুঝতে পারছিল না বলে একটু কাছাকাছি যেতেই ছোট ছোট কয়েকটি লাফ দিয়ে সেটি একটু দূরে সরে যাচ্ছিল। খরগোশটার পিছু পিছু নিকি অনেক দূর চলে এল, হঠাৎ করে আবিষ্কার করল সামনে টলটলে পানি। সে একটি খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সামনে একটি হ্রদ। হ্রদের উপর দিয়ে খাড়া দেয়াল উপরে উঠে গেছে। ক্রিনিটি বলেছিল সে যেন খোলা জায়গায় না যায়, খরগোশের পিছু পিছু সে ঠিক খোলা জায়গায় চলে এসেছে।

নিকি কী করবে বুঝতে পারল না। ক্রিনিটি তাকে খোলা জায়গায় আসতে নিষেধ করেছে সত্যি কিন্তু আবার তাকে ভেতরে ঢোকার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাও করতে বলেছে। কাজেই বিল্ডিং ঘিরে তৈরি করা উঁচু দেয়ালটার এত কাছাকাছি যখন চলেই এসেছে তখন আরেকটু কাছে গিয়ে দেয়ালটা ভালো করে দেখে আসা মনে হয় খুব অন্যায় হবে না।

নিকি তখন হ্রদের তীর ঘেঁষে দেয়ালটার দিকে ছুটে যেতে থাকে। দেয়ালটার কাছাকাছি এসে সে থেমে গেল। সতর্কভাবে এদিক-সেদিক তাকিয়ে দেখল তাকে কেউ দেখে ফেলেছে কি না। কেউ তাকে দেখে নি, চারপাশে এক ধরনের সুনসান নীরবতা।

নিকি দেয়ালটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল, শক্ত পাথরের উঁচু দেয়াল। উপরে ধাতব জাল দিয়ে ঘেরা, ক্রিনিটি বলেছে কেউ যেন সেদিক দিয়ে যেতে না পারে সেজন্যে সেখানে উঁচু ভোল্টেজের বিদ্যুৎ রয়েছে। নিকি দেয়ালটা স্পর্শ করে হ্রদের দিকে এগিয়ে গেল। টলটলে হ্রদের পানিতে দেয়ালটা ডুবে রয়েছে। নিকি সেদিক দিয়ে তাকিয়ে থাকে, মাঝখানে হ্রদের পানি যেখানে গভীর সেখানে দেয়ালটাও কি অনেক গভীর থেকে শুরু হয়েছে?

নিকি কিছুক্ষণ দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে থাকে, দেয়ালের ওপর দিয়ে কেউ যেতে পারবে না, কিন্তু নিচে দিয়ে কি যাওয়া যাবে না? এমন কি হতে পারে হ্রদের পানির যেখানে দেয়ালটা উঠে এসেছে সেখানে বড় বড় গর্ত রয়েছে? কেউ ইচ্ছে করলে সেদিক দিয়ে ঢুকে যেতে পারবে? নিকি নিজে নিজে বিষয়টা চিন্তা করে, তারপর বড় মানুষের মতো গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়াল। ক্রিনিটিকে বলতে হবে কোনো একটি যন্ত্র দিয়ে হ্রদের নিচে পরীক্ষা করে দেখতে। ক্রিনিটিকে সে কখনো পানিতে নামাতে পারে নি। রোবটের ধাতব দেহ নাকি পানিতে ভেসে থাকতে পারে না—শুধু তাই না সার্কিটে পানি ঢুকে গেলে নাকি অনেক বড় সমস্যা হয় তাই কেউ পানির কাছে আসতে চায় না।

নিকি হ্রদের তীর ধরে একটি দৌড় দিতে গিয়ে থেমে গেল। ইচ্ছে করলে সে নিজেই তো হ্রদের পানিতে ডুব দিয়ে নিচে নেমে দেখতে পারে, ক্রিনিটির যন্ত্রপাতির জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হবে না। নিকি দুএক মুহূর্ত ভাবল, তারপর হ্রদের পানিতে নেমে এল।

হ্রদের কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে তার শরীরটা কাঁটা দিয়ে ওঠে, নিকি এক লাফে পানি থেকে উঠে আসতে চাইছিল কিন্তু সে উঠে এল না। নিকি জানে পানিতে নামলে সব সময় প্রথমে শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, একটু পর শরীর সেই ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। নিকি দাঁতে দাঁত চেপে আরো গভীর পানিতে নামতে থাকে। পায়ের নিচে শ্যাওলা ঢাকা পিচ্ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নুড়িপাথর। নিকি সাবধানে দেয়ালটা ধরে আরো গভীরে নেমে যায়। নিকি জানে ধীরে ধীরে শীতল পানিতে নামা থেকে এক ঝটকায় নেমে পড়া সহজ। তাই সে আর দেরি না করে মাথা নিচু করে পানিতে ডুবে যায়। তীক্ষ্ণ কনকনে শীতে তার সারা শরীর শিউরে ওঠে। নিকি সেটা সহ্য করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পানির নিচে নেমে যেতে থাকে। দেয়ালটি স্পর্শ করে দেখে, শ্যাওলা ঢাকা পিচ্ছিল দেয়ালটি বৈচিত্র্যহীন। পানির নিচে সবকিছুকেই ঝাপসা দেখায়, মনে হয় দেয়ালটি হ্রদের গভীরে নেমে গেছে।

যতক্ষণ বুকের মাঝে বাতাস আটকে রাখতে পারল নিকি দেয়ালটি পরীক্ষা করে দেখল তারপর ভুশ করে ভেসে উঠল। কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে তার শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠছে। নিকি পানি থেকে উঠে পড়তে চাইল—কিন্তু কী মনে করে আরো একবার সে পানিতে ডুব দেয়। দেয়ালটা স্পর্শ করে আরো গভীরে নেমে পড়ে। নিচে অন্ধকার ভালো করে কিছু দেখা যায় না—হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ সে একটি ফাঁকা জায়গা আবিষ্কার করে—নিকির মনে হয় দেয়ালটার মাঝখানে একটি গর্ত। নিকি গর্তটা ভালো করে পরীক্ষা করতে পারল না তার আগেই তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। নিকি ভুশ করে আবার উপরে উঠে আসে। বড় করে একটি নিঃশ্বাস নিয়ে আবার সে ডুব দিল, দ্রুত নিচে নেমে এসে সে গর্তটি পরীক্ষা করে, ছোট একটি গর্ত দেয়ালের অন্যপাশে চলে গেছে, নিকি ভেতর দিয়ে যেতে পারবে কি না পরীক্ষা করার জন্যে তার মাথাটা ঢোকাল, চওড়া দেয়ালের অন্যপাশে মাথাটা বের করে সে উপরে তাকায়। পানির নিচে সবকিছু আবছা দেখায়। তার মাঝে সে ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পেল। ইচ্ছে করলেই সে এখন দেয়ালে ঘেরা জাতীয় গবেষণাগারের এলাকার ভেতরে ভেসে উঠতে পারে।

নিকি ভেসে ওঠার চেষ্টা করল না, সেখানে কী আছে সে জানে না, হঠাৎ করে এদিকে ভেসে উঠলে বিপদে পড়ে যেতে পারে। নিকি আবার পিছন দিকে ফিরে যেতে গিয়ে আবিষ্কার করল সে ছোট গর্তটার মাঝে আটকে গিয়েছে, বের হতে পারছে না। হঠাৎ করে সে আতঙ্ক অনুভব করে, প্রাণপণে সে নিজেকে ছোটানোর চেষ্টা করল, কী করছে বুঝতে না পেরেই সে ছটফট করে সামনের দিকেই বের হয়ে এল। অল্প একটু বাতাসের জন্যে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছিল, নিকি দুই পা দিয়ে দেয়ালটা ধাক্কা দিয়ে উপরে ভেসে ওঠে, তারপর বুক ভরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নেয়।

নিকি এবার ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ধক ধক করে শব্দ করছে। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে সে নিজেকে একটু শান্ত করল। দূরে জাতীয় গবেষণাগারের বিল্ডিংটি দেখা যাচ্ছে। ভেতরে বড় একটি খোলা জায়গা সেখানে ছোট-বড় অনেকগুলো গাছ। নিকি চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, কোথাও অস্ত্র হাতে কোনো রোবট দাঁড়িয়ে নেই। সে বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা বের করে দিয়ে দেয়ালটা ধরে পানিতে ভেসে থাকে। তার এই মুহূর্তে বের হয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু নিকি বের হল না, বিস্ময় নিয়ে সে এদিক-সেদিক তাকাল, তারপর ভেসে ভেসে তীরে উঠে এল। পানি থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটেই সে খানিক দূর এগিয়ে যায়। একটি গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে সে জাতীয় গবেষণাগারের বিল্ডিংটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। ক্রিনিটির কথা যদি সত্যি হয় তা হলে এখানে ঠিক তার মতো একজন মানবশিশু আছে। সেই মানবশিশুটির সাথে কি তার দেখা হবে? যদি সত্যি দেখা হয় তা হলে দুজন কী নিয়ে কথা বলবে?

ঠিক এরকম সময় তার পেছন থেকে কে যেন খুব স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকি পাথরের মতো জমে গেল, প্রথমে মনে হল সে এক ছুটে পানিতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে কিন্তু সে তা করল না। খুব ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকাল, দেখল তার পেছনে কয়েক হাত দূরে একজন দাঁড়িয়ে আছে। যে দাঁড়িয়ে আছে সে রোবট নয়, সে তার মতো মানুষ। তার থেকে একটু বড়, চুলগুলো লম্বা এবং কুচকুচে কালো। শরীরে হালকা সবুজ রঙের একটি কাপড়।

মানুষটি আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?" গলার স্বরটি ভারি সুন্দর। শুনলে আরো শুনতে ইচ্ছে করে।

নিকি কাঁপা গলায় বলল, "আমি নিকি।"

"নিকি?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি রোবট?"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমি রোবট না।"

"তুমি তা হলে কী?"

"আমি মানবশিশু।"

নিকি দেখল তার মতো দেখতে মানুষটির মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, হাসি হাসি মুখে বলল, "মিথ্যা কথা বোলো না। পৃথিবীতে কোনো মানুষ নেই। সব মানুষ মরে গেছে।"

নিকি বলল, "তা হলে তুমি কেমন করে বেঁচে আছ?"

"সেটি কেউ জানে না। আমি কীভাবে কীভাবে জানি বেঁচে গেছি।"

"তুমি যেরকম কীভাবে কীভাবে বেঁচে গেছ আমিও সেরকম কীভাবে কীভাবে বেঁচে গেছি।"

ছোট মানুষটি জিজ্ঞেস করল, "সত্যি?"

"সত্যি।"

"পৃথিবীতে শুধু সত্যিকারের মানুষেরা হাসতে পারে। তুমি কি হাসতে পার?"

"পারি।"

"হাস দেখি।"

নিকি গম্ভীর মুখে বলল, "এমনি এমনি কেউ হাসতে পারে না। হাসির কোনো কারণ ঘটলে মানুষ হাসতে পারে।"

নিকি থেকে একটু বড় আর ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা কালো চুলের ছোট মানুষটি মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি এটি ঠিকই বলেছ। রোবটেরা যখন আমাকে নিয়ে গবেষণা করে তখন মাঝে মাঝে আমাকে বলে তুমি একটু হাস। আমি তাদেরকে বলি মানুষ ইচ্ছে করলেই হাসতে পারে না। তারা আমার কথা বিশ্বাস করে না।"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "রোবটদের কোনো কোনো দিক দিয়ে অনেক বুদ্ধি আবার কোনো কোনো দিক দিয়ে তারা অনেক বোকা।"

মানুষটি কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "তুমি সত্যি সত্যি একজন মানুষ?"

"হ্যাঁ।"

"কী আশ্চর্য! তুমি একজন মানুষ আবার আমি একজন মানুষ। কীভাবে কীভাবে আমাদের দেখা হয়ে গেল। তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকি বলল, "মোটেও কীভাবে কীভাবে আমাদের দেখা হয় নি। তোমাকে খুঁজে বের করতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।"

মানুষটি অবাক হয়ে বলল, "তোমরা আমাকে খুঁজে বের করেছ?"

"আমি আর ক্রিনিটি।"

"ক্রিনিটি কে?"

"ক্রিনিটি আমাকে দেখেশুনে রাখে। একটি রোবট—আমার বন্ধু। সে আমাকে খুব ভালবাসে।"

ছোট মানুষটি না সূচকভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "রোবট কাউকে ভালবাসতে পারে না। ভালবাসার জন্যে হরমোন দরকার হয়। রোবটদের কোনো হরমোন নেই। শুধু মানুষের হরমোন আছে।"

"তুমি কেমন করে জান?"

"আমি জানি। আমি পড়েছি। ছেলেদের একরকম মেয়েদের অন্যরকম।" ছোট মানুষটি এবারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিকিকে লক্ষ করল তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি ছেলে না মেয়ে?"

"আমি ছেলে। তুমি?"

"আমি মেয়ে। আমার বয়স এগার। তোমার বয়স কত?"

নিকি বলল, "আমার বয়স সাত।"

এগার বছরের মেয়েটি বলল, "তুমি যখন বড় হবে তখন আমি আর তুমি বিয়ে করতে পারি। তখন আমাদের ছেলেমেয়ে হবে।"

"বিয়ে কেমন করে হয়?"

"সেটি আমি এখনো জানি না। আমি বিয়ে করার জন্যে একটি ছেলে পাব কখনো ভাবি নি তাই সেটি নিয়ে পড়াশোনা করি নি।"

"ও।"

মেয়েটি কিছুক্ষণ নিকির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?"

"যদি পৃথিবীতে তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ না থাকে তা হলে তো করতেই হবে।"

মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "তা হলে অনেক মজা হবে। তুমি আর আমি এখানে থাকতে পারব।"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "আমি এখানে থাকতে চাই না।"

"কেন?"

"আমি এই জায়গাটা চিনি না।"

"কয়েক দিন থাকলেই তুমি চিনে নেবে।"

"এখানে রোবটরা আমাকে নিয়ে গবেষণা করবে। আমার সেটি ভালো লাগে না।"

মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "সেটি মোটেও খারাপ না। রোবটেরা আমাকে নিয়ে গবেষণা করে, আমি জানি। মাঝে মাঝে আমি ইচ্ছে করে ভুল কথা বলে দিই তখন তাদের কপোট্রন উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। খুব মজা হয় তখন।"

নিকি চারদিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু এটির চারদিকে দেয়াল। আমি দেয়াল দিয়ে ঘিরে থাকা জায়গায় থাকতে পারব না। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে।"

নিকির কথা শুনে মনে হল মেয়েটি একটু অবাক হল। বলল, "কেন, নিঃশ্বাস কেন বন্ধ হবে? দেয়াল দিয়ে ঘেরা বলে জায়গাটা খুব নিরাপদ। বন্য পশু আসতে পারে না। কপোট্রন বিগড়ে গেছে এরকম রোবটও আসতে পারে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

নিকি বলল, "সেটি আমি জানি না। কিন্তু খোলা জায়গায় থাকলে অনেক মজা। যেখানে খুশি যাওয়া যায়। যা খুশি করা যায়।"

"যদি কোনো বিপদ হয়?"

"হলে হবে।"

মেয়েটি কেমন যেন বিভ্রান্তির মাঝে পড়ে গেল। বলল, "কিন্তু এখানে থাকলে কোনো বিপদ নেই। কোনো কিছু নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তোমাকে খেতে দেবে। তোমাকে বই পড়তে দেবে। আনন্দ করতে দেবে। যদি তোমার অসুখ হয় তা হলে চিকিৎসা করবে।"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "কিন্তু এর মাঝে কোনো আনন্দ নেই।"

"তা হলে তুমি কী করতে চাও?"

"তুমি আমার সাথে চল, আমরা দুজন মিলে থাকব। আমি যেখানে থাকি সেটি খুব সুন্দর জায়গা। খুব ভালো জায়গা। সেখানে কিকি আছে, মিক্কু আছে আরো অনেকে আছে। আমরা তাদের সঙ্গে খেলব। আনন্দ করব।"

"কিকি কে? মিক্কু কে?"

"কিকি হচ্ছে পাখি। আর মিক্কু বানর।"

"তুমি বনের পশুপাখির সাথে খেল? তারা তোমাকে আক্রমণ করে না?"

নিকি খুক করে হেসে ফেলল, বলল, "কেন বনের পশু আমাকে আক্রমণ করবে? বনের পশুরা আমার বন্ধু। তারা কখনো আমাকে আক্রমণ করে না।"

মেয়েটি খুব অবাক হয়ে নিকির দিকে তাকিয়ে রইল। ইতস্তত করে বলল, "বন্ধু, বনের পশুরা তোমার বন্ধু?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আমাকে যে সবাই বলেছে বাইরের পৃথিবীতে আমার নিরাপদে থাকার কোনো উপায় নেই?"

"মিথ্যা কথা।"

ঠিক এরকম সময় দূর থেকে ঘণ্টা বাজার মতো একটি শব্দ হল। মেয়েটি তখন বলল, "ঐ যে ঘণ্টা বাজছে।"

"কীসের ঘণ্টা?"

"আমার ফিরে যাবার ঘণ্টা। এখন আমার ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে। তারপর বিকেলের নাশতা খেয়ে লেখাপড়া করতে হবে।"

নিকি একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "ও।"

"তুমি কি আমার সাথে যাবে? আমার মনে হয় তোমাকে পেলে রোবটরা খুব খুশি হবে।"

নিকি মাথা নাড়ল। বলল, "না, আমি যাব না।"

"তা হলে আমি যাই। আমার যেতে দেরি হলে—" মেয়েটি থেমে গেল।

"তোমার যেতে দেরি হলে কী হবে?"

মেয়েটির মুখটি কেমন যেন ম্লান হয়ে যায়, সেখানে কেমন যেন ভয়ের ছাপ পড়ে। সে মাথা নেড়ে বলল, "না। কিছু না।"

মেয়েটি বলল, "আমি এখন যাই?"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "যাও।"

AMARBOI.COM

মেয়েটি যখন মাথা নিচু করে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছিল তখন সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিকির মনে হল এই মেয়েটি আসলে খুব দুঃখী একটি মেয়ে। কেন মেয়েটা দুঃখী সেটি সে বুঝতে পারল না। কিন্তু অকারণে তার মনটাও কেমন জানি দুঃখ দুঃখ হয়ে গেল।

নিকি অন্যমনস্কভাবে হ্রদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে—তখন হঠাৎ তার মনে হল মেয়েটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করা হয় নি।

৮

ক্রিনিটি জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটি তোমাকে কী জিজ্ঞেস করেছে?"

"আমি তাকে বিয়ে করব কি না।"

"তুমি কী বলেছ?"

"আমি রাজি হয়েছি।"

ক্রিনিটি তার কপোট্রনে এক ধরনের চাপ অনুভব করে। সে চাপটি কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর বলল, "তুমি মেয়েটির নাম জান না, কিন্তু তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছ?"

"সারা পৃথিবীতে যদি শুধু আমরা দুজন থাকি তা হলে আমাদের দুজনকে বিয়ে করতে হবে না?"

"সম্ভবত তোমার কথা সত্যি।"

"তা হলে তুমি আমার কথা শুনে এত অবাক হচ্ছ কেন?"

"আমি মোটেও অবাক হচ্ছি না। আমি তৃতীয় মাত্রার রোবট, আমার অবাক হবার ক্ষমতা নেই। আমি শুধু নিশ্চিতভাবে তোমাদের ভেতরে কী কথাবার্তা হয়েছে সেটি জানতে চেয়েছি।"

"আমি সেটি তোমাকে বলেছি।"

"হ্যাঁ বলেছ।"

নিকি গম্ভীর মুখে বলল, "তা হলে কি তুমি আমাকে বলবে বিয়ে মানে কী?"

"পৃথিবীতে যখন মানুষেরা বেঁচে ছিল তখন একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একসাথে থাকার পরিকল্পনা করত। তাদের দুজনের একসাথে থাকা শুরু করার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াটার নাম বিয়ে।"

নিকি বিষয়টা ঠিক পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল না, তারপরেও সে এটি বুঝে ফেলার ভান করে বলল, "তা হলে আমার মা কি বিয়ে করেছিল?"

"হ্যাঁ করেছিল। তোমার বাবার সাথে তোমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তোমার বাবা তোমার মা'কে ছেড়ে চলে যায়। তোমার মা তখন উষ্ণ অঞ্চলের এই ছোট দ্বীপটিতে চলে যায়। গৃহস্থালি কাজের সাহায্যের জন্যে আমাকে নিয়ে আসে।"

নিকি ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না, বলল, "আমার বাবা কেন আমার মা'কে ছেড়ে চলে গিয়েছিল? এটি অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার।"

ক্রিনিটি বলল, "মানুষ অত্যন্ত বিচিত্র একটি প্রাণী, আমি সেটি ব্যাখ্যা করতে পারব না। আমি কখনো তাদের চরিত্র ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি না।"

"কিন্তু কেন আমার বাবা আমার মা'কে ছেড়ে চলে গেল?"

"আমি তোমাকে বলেছি সেটি ব্যাখ্যা করতে পারব না। মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত জটিল, সেটি কীভাবে কাজ করে আমাদের মতো তৃতীয় মাত্রার রোবট সেটি অনুমান পর্যন্ত করতে পারি না। দুজন মানুষ যখন পাশাপাশি থাকে তখন তাদের পরস্পরের পছন্দ অপছন্দ অত্যন্ত সূক্ষ্ম একটি পর্যায়ে চলে যায়। সেটি অত্যন্ত ভঙ্গুর, অত্যন্ত নাজুক, অত্যন্ত সংবেদনশীল।"

নিকি ক্রিনিটির কথাগুলো বুঝতে পারল না। খানিকক্ষণ কিছু একটি ভেবে বলল, "আমি আর ওই মেয়েটা যদি বিয়ে করি তা হলে আমি কি কখনো তাকে ছেড়ে চলে যাব?"

"সেটি এই মুহূর্তে বলা খুব কঠিন। আমি তোমাকে বলেছি মানুষ অত্যন্ত জটিল একটি প্রাণী।"

নিকি কিছুক্ষণ ক্রিনিটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্রিনিটি।"

"বল।"

"তুমি তো মানুষ নও। তুমি হচ্ছ রোবট।"

"হ্যাঁ, আমি রোবট।"

"তার মানে তুমি মানুষের মতো জটিল নও?"

"না, আমি মানুষের মতো জটিল না।"

নিকি এবারে ক্রিনিটিকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তা হলে তুমি কোনো দিন আমাকে ছেড়ে চলে যেও না।"

ক্রিনিটি কপোট্রনে প্রবল চাপ অনুভব করে। এই শিশুটির মা যেরকম অযৌক্তিক কথা বলত এই শিশুটিও সেরকম অযৌক্তিক কথা বলতে শুরু করেছে। ক্রিনিটি কী বলবে বুঝতে পারল না। নিকি ক্রিনিটিকে আরো জোরে চেপে ধরে বলল, "বল। বল আর কোনো দিন আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না।"

ক্রিনিটি বলল, "আমি তোমাকে কোনো দিন ছেড়ে চলে যাব না।"

AMARBOI.COM

অন্ধকার নেমে আসার পর নিকি বাইভার্বালের এক কোনায় গুটিসুটি মেরে বসে একটি ছোট কৌটা থেকে খাবার খেতে খেতে বলল, "এই কৌটার খাবারগুলো খেতে একেবারেই ভালো না।"

ক্রিনিটি বলল, "আমি খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। কৌটার খাবার সম্ভবত তোমাদের ভাষায় বিস্বাদ। কিন্তু তবুও তুমি জোর করে খেয়ে ফেল। তুমি তোমার শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট আর ভিটামিন এখান থেকে পেয়ে যাবে।"

"মনে আছে আমরা কী সুন্দর বাইরে আগুন জ্বালিয়ে সেখানে খাবারগুলো ঝলসে ঝলসে গরম করে খেতাম?"

ক্রিনিটি বলল, "হ্যাঁ। মনে আছে। কিন্তু এখানে আমরা বাইরে আগুন জ্বালাতে চাই না। আমাদেরকে কেউ দেখে ফেললে আমরা বিপদে পড়ে যাব।"

"আমরা যখন আমাদের জায়গায় ফিরে যাব তখন আমরা আবার আগুন জ্বালিয়ে খেতে পারব। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের সাথে তখন ঐ মেয়েটিও থাকবে?"

"হ্যাঁ।"

"সে যদি আমাদের সাথে যেতে না চায়?"

"তাকে রাজি করাতে হবে।"

"সে যদি রাজি না হতে চায়?"

"তাকে বোঝাতে হবে।"

"সে যদি বুঝতে না চায়?"

"তা হলে কী করতে হবে আমি এখনো জানি না।"

নিকি একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি যখনই তোমাকে কিছু একটি জিজ্ঞেস করি তখন তুমি বল যে তুমি কিছু জান না।"

"আমি দুঃখিত নিকি। আমি তৃতীয় মাত্রার একটি রোবট। আমার কপোট্রনের ক্ষমতা খুবই সীমিত। আমি সব সমস্যার সমাধান করতে পারি না।"

নিকি ক্রিনিটিকে স্পর্শ করে বলল, "তুমি সেটি নিয়ে মন খারাপ কোরো না—তোমার কপোট্রনের ক্ষমতা কম হলে কী হবে, তুমি আসলে সেটি দিয়েই সবকিছু করতে পার।"

"আমাকে সবকিছু করার জন্যে তৈরি করা হয় নি, আমাকে তৈরি করা হয়েছে শুধু তোমাকে সাহায্য করার জন্যে। বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে।"

"তুমি সব সময় আমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করে এসেছ। মনে নেই যখন রোবোনগরীতে দুটি রোবট আমাকে ধরে ফেলেছিল তখন তুমি আমাকে রক্ষা করেছিলে?"

"হ্যাঁ মনে আছে। কিন্তু কাজটি আমার জন্যে আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে যাচ্ছে।"

"কেন ক্রিনিটি?'

"কারণ তুমি নিজে নিজে অনেক সময় অনেকগুলো কাজ কর যেটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যেটি খুবই বিপজ্জনক। তুমি হয়তো না বুঝে করে ফেল, কিংবা হয়তো মানুষ সব সময় এরকম করে। তখন আমার কিছু করার থাকে না।"

"ক্রিনিটি, আমি কখন সেটি করেছি?"

"তুমি যখন হ্রদে ডুব দিয়ে দেয়ালের গর্ত দিয়ে অন্য পাশে চলে যাবার চেষ্টা করেছিলে, সেটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ। গর্তের মাঝে তুমি আটকে গিয়েছিলে। যদি সেখান থেকে ছুটে আসতে তোমার আর একটুও দেরি হত তা হলেই তোমাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না।"

নিকি কোনো কথা না বলে একটু অপরাধীর মতো মুখ করে ক্রিনিটির দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রিনিটি বলল, "আমি তোমাকে বলেছি সতর্ক থাকার জন্যে কিন্তু আমার ধারণা তুমি আবার বিচিত্র কিছু করে ফেলবে। কাজেই তোমাকে কিছু ব্যাপার শিখিয়ে দিই।"

নিকির চোখ আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে জিজ্ঞেস করল, "কী শিখিয়ে দেবে?"

ক্রিনিটি ছোট একটা ব্যাগ টেনে নিয়ে বলল, "এই যে ব্যাগটা দেখছ এর মাঝে বেঁচে থাকার কিছু সরঞ্জাম আছে।" হাত দিয়ে ভেতর থেকে প্রথমে যেটি বের করল সেটি হচ্ছে একটি চাকু। সেটি দেখিয়ে বলল, "এটি হচ্ছে একটি চাকু, এর আটটা ব্লেড। প্রত্যেকটা ব্লেড দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করা যায় কিন্তু সেটি ব্যবহার করা জানতে হয়। আমি তোমাকে এখন এটা দেখাচ্ছি, কিন্তু আশা করছি ব্যবহার করতে শেখার আগে তুমি এটিতে হাত দেবে না।"

নিকি বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়ল। ক্রিনিটি আবার ব্যাগের ভেতর হাত দিয়ে ছোট একটি টিউব বের করে বলল, "এই ব্যাগের ভেতর এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ংকর একটি জিনিস।"

নিকি জানতে চাইল, "কী জিনিস।"

"এটি একটি ইনফ্রারেড লেজার। মানুষ খালি চোখে এর আলো দেখতে পায় না, আমরা পারি। এই লেজারের ঠিক মাথায় ইনফ্রারেড আলোটা ফোকাস হয়। সেটি এত তীব্র যে এটি দিয়ে দুই ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের প্লেট কেটে ফেলা যায়। তবে ছোট নিউক্লিয়ার ব্যাটারি চার্জ চলে গেলেই এটির কাজ শেষ।" ক্রিনিটি তার সামনে লেজারটিকে রেখে বলল, "আশা করছি তুমি এখনো এটি ব্যবহার করার চেষ্টা করবে না। একটু ভুলভাবে ব্যবহার করলেই ভয়ংকর বিপদ ঘটতে পারে।"

ক্রিনিটি আবার ব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাল। এবারে ছোট অ্যালুমিনিয়ামের একটি স্ট্রিপ বের করে, তার মাঝে ছোট ছোট অনেকগুলো হলুদ রঙের ট্যাবলেট লাগানো। ক্রিনিটি স্ট্রিপটি দেখিয়ে বলল, "এর প্রত্যেকটি ট্যাবলেট এক পেট পরিচ্ছন্ন খাওয়া। তোমার যদি কখনো খেতে হয় পুরোটা খাবে না। অর্ধেকটা খাবে। কারণ পুরোটা একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের খাবার তোমার জন্যে অনেক বেশি। বুঝেছ?"

নিকি মাথা নেড়ে জানাল যে সে বুঝেছে। ক্রিনিটি আবার তার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ছোট বোতামের মতো একটি যন্ত্র বের করে আনল, নিকিকে দেখিয়ে বলল, "এটি হচ্ছে একটি কিপার। কেউ হারিয়ে গেলে এর সুইচটা অন করে দেয় তখন এর ভেতর থেকে নির্দিষ্ট সময় পরপর একটি শক্তিশালী সিগন্যাল বের হয়। তবে এখন আমরা গোপনে কাজ করছি এখন আমাদের এটার প্রয়োজন নেই। ভুলেও এর সুইচটা অন করবে না তা হলে সবাই বুঝে যাবে আমরা কোথায় আছি।"

নিকি বলল, "ঠিক আছে।"

ক্রিনিটি আবার তার ব্যাগে হাত দিয়ে একটি ছোট সিলিন্ডারের মতো টিউব বের করল। বলল, "এর ভেতরে রয়েছে প্রায় দুই কিলোমিটার কার্বন ফাইবার। অসম্ভব শক্ত ফাইবার দুইশ থেকে তিনশ কেজি কিছু একটি ঝোলালেও এটি ছিঁড়বে না। এক মাথায় রয়েছে ইলেকট্রোম্যাগনেট, স্টিল যা লোহার সাথে আটকে দেওয়া যায়। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি কিন্তু তুমি এখনো এটি ব্যবহার করার জন্যে প্রস্তুত হও নি। বুঝেছ?"

নিকি বলল, "বুঝেছি।"

ক্রিনিটি আবার তার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটি প্যাকেট বের করল, নিকিকে দেখিয়ে বলল, "এটি কী তুমি কি বলতে পারবে?"

নিকি প্যাকেটটা পরীক্ষা করে বলল, "এর ভেতরে খুব ছোট ছোট অনেকগুলো বল। মনে হয় একটি বল খেলে পেট ভরে পানি খাওয়া হয়ে যাবে।"

"কাছাকাছি বলেছ। এর মাঝে আসলে বাতাস ভরা আছে। মুখে দিয়ে দাঁতে কামড় দিয়ে এটি ভাঙলে ভেতর থেকে নিঃশ্বাস নেবার মতো বাতাস বের হয়ে আসে। আটাত্তর ভাগ নাইট্রোজেন বাইশ ভাগ অক্সিজেন। পানিতে ডুবে থাকতে হলে এটি কাজে লাগে। এটিও ব্যবহার করার আগে একটু শিখতে হয়। পানির নিচে নিঃশ্বাস নিতে হলে নাকটা বন্ধ রাখতে হয়।"

নিকির হাত থেকে ছোট প্যাকেটটা নিয়ে সামনে সাজিয়ে রেখে ক্রিনিটি আবার তার ব্যাগে হাত ঢোকাল, এবার তার হাতে উঠে এল লাল রঙের চতুষ্কোণ একটি ছোট যন্ত্র। তার একপাশে একটি ডায়াল। ক্রিনিটি চতুষ্কোণ বাক্সটা হাত দিয়ে ধরে বলল, "এটি তোমাকে কখনোই স্পর্শ করতে দেওয়া হবে না। কাজেই এটি আমি আগেই সরিয়ে রাখি।"

নিকি বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু তুমি আমাকে আগে বল এটি কী?"

ক্রিনিটি বলল, "এটি হচ্ছে ভয়ংকর একটি বিস্ফোরক। সাথে একটি টাইমার লাগানো আছে। কেউ ইচ্ছে করলে টাইমারটি একটি সময়ের জন্যে সেট করে এই বিস্ফোরকটি কোনো জায়গায় রেখে আসতে পারে। নির্দিষ্ট সময় পরে বিস্ফোরকটিতে বিস্ফোরণ ঘটবে।" ক্রিনিটি বিস্ফোরকটি সাবধানে সামলে রেখে বলল, "এটি অত্যন্ত ভয়ংকর একটি বিস্ফোরক, তুমি কখনোই এটিতে হাত দেবে না।"

ক্রিনিটি কিছু একটা বের করার জন্যে আবার ব্যাগে হাত দিল, তখন নিকি বলল, "ক্রিনিটি তুমি জীবন রক্ষা করার এই ব্যাগটা থেকে অনেক কিছু বের করে আমাকে দেখিয়েছ কিন্তু আমাকে বলছ কোনোটাই আমি ব্যবহার করতে পারব না।"

"হ্যাঁ। বেশিরভাগ।"

"তা হলে কেন আমাকে দেখাচ্ছ?"

"তোমার যেন ধারণা থাকে সে জন্যে। মানুষ অসম্ভব বুদ্ধিমান, তারা কখন কোন তথ্য কীভাবে কাজে লাগাবে সেটি আগে থেকে আমি অনুমান করতে পারি না।"

ক্রিনিটি আবার ব্যাগের ভেতর থেকে একটি ছোট কৌটা বের করে কথা বলতে শুরু করে। নিকি অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, ছোট একটি ব্যাগ যেটি কোমরে বেঁধে রাখা যায় সেখানে নানা ধরনের ওষুধ রয়েছে, যোগাযোগ করার যন্ত্র আছে, আগুন জ্বালানোর রাসায়নিক আছে, উজ্জ্বল আলো জ্বালানোর টর্চ লাইট আছে, প্রচণ্ড শীতে শরীর গরম রাখার পাতলা ফিনফিনে কম্বল আছে, আগুনের ভেতর দিয়ে ছুটে যাবার আগে শরীরে লাগানোর তাপ নিরোধক মলম আছে, দূরে দেখার জন্যে শক্তিশালী বাইনোকুলার আছে, অন্ধকারে দেখার জন্যে গগলস আছে, নিজের অবস্থান জানার জন্যে রিসিভার আছে, নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হবার জন্যে যোগাযোগ মডিউল আছে—এককথায় বেঁচে থাকার জন্যে যা যা প্রয়োজন তার সবই এখানে আছে।

সবকিছু দেখিয়ে ক্রিনিটি যখন আবার সবকিছু ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রাখছিল তখন নিকি বলল, "ক্রিনিটি।"

"বল।"

"আমি কখন এই ব্যাগটি ব্যবহার করতে পারব?"

"এই ব্যাগের নির্দেশিকাতে লেখা আছে আঠার বছর বয়সের আগে এটি ব্যবহার করার অনুমতি নেই।"

"কিন্তু আমার বয়স মাত্র সাত।"

"কিন্তু তুমি যেহেতু একা একা আছ, তোমাকে অনেক কিছু নিজে নিজে করতে হয়। তুমি অনেক কিছু জান যেটি তোমার বয়সী পৃথিবীর বাচ্চা জানত না। তোমার মানসিক বয়স আসলে সাত থেকে অনেক বেশি।"

নিকি বড় বড় চোখ করে বলল, "তা হলে আমি কি এই ব্যাগটা ব্যবহার করতে পারব?"

ক্রিনিটি বলল, "আমি জেনেশুনে তোমাকে এটি ব্যবহার করতে দিতে পারি না। কারণ এর মাঝে এমন সব জিনিসপত্র আছে যেটি ব্যবহার করতে গিয়ে একটি ভুল করে ফেললে তুমি এবং তোমার আশপাশে অনেক কিছু ভস্মীভূত হয়ে যাবে।"

"কিন্তু তুমি যদি না জান?"

"তখন আমার কিছু করার নেই।"

কাজেই পরের দিন নিকি ক্রিনিটিকে না জানিয়ে জীবন রক্ষাকারী ব্যাগটি নিয়ে হ্রদের তীরে হাজির হল। হ্রদের পানিতে ডুব দিয়ে দেয়ালের ফুটো দিয়ে অন্য পাশে হাজির হয়। গতকাল যেখানে মেয়েটির সাথে দেখা হয়েছিল ঠিক সেখানে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। মেয়েটি নিশ্চয়ই দেখা করতে আসবে।

কিন্তু মেয়েটি দেখা করতে এল না। প্রথমে নিকির সেটি নিয়ে এক ধরনের ছেলেমানুষি রাগ হল, তারপর হল অভিমান। যখন আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসতে থাকে তখন তার ভেতরে এক ধরনের দুশ্চিন্তা দানা বাঁধে। নিকি তখন তার ব্যাগ থেকে বাইনোকুলারটা বের করে দূরের বিল্ডিংটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে, সে মোটেও ভাবে নি এত বড় একটি বিল্ডিংয়ের ভেতর মেয়েটিকে দেখতে পাবে কিন্তু সে চারতলার একটি জানালায় মেয়েটিকে দেখতে পেল। মেয়েটি জানালার শিক ধরে এদিকে তাকিয়ে আছে। নিকি জানে এত দূর থেকে মেয়েটি তাকে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু তবুও তার মনে হল মেয়েটি বুঝি সোজাসুজি তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির মুখে এমন একটি বিষাদের ছায়া যে সেটি দেখে নিকি গভীর এক ধরনের দুঃখ অনুভব করল। তার চোখে পানি চলে আসে, সে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে ফিসফিস করে বলল, "তুমি মন খারাপ কোরো না, আমি এসে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব।"

বাইনোকুলারে মানুষটিকে অনেক কাছে দেখায় কিন্তু সত্যিকার মানুষটি কথা শোনার জন্যে কাছে চলে আসে না, তারপরেও কেন যেন মনে হল, মেয়েটি তার কথা শুনতে পেয়েছে এবং এক ধরনের আশা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিকি বাইনোকুলারটা নামিয়ে কীভাবে মেয়েটির কাছে যাবে সেটি নিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করল, কিন্তু সে খুব ভালোভাবে কোনো পরিকল্পনা করতে পারল না। তাই সে সব সময় যা করে এবারেও সেটিই করল, কোনো কিছু পরিকল্পনা না করেই সাবধানে বিল্ডিংয়ের দিকে এগুতে থাকল। তাকে যদি কেউ দেখে ফেলে তখন কী হবে সেটি নিয়ে সে খুব দুশ্চিন্তা করল না। খুব বড় ধরনের বিপদ হয়ে গেলে ক্রিনিটি এসে তাকে উদ্ধার করে ফেলবে এই ধরনের একটি ভাবনা সব সময় তার মাথায় খেলা করে।

মেয়েটিকে যেখানে দেখেছিল তার নিচে এসে দাঁড়িয়ে নিকি বিল্ডিংটি পরীক্ষা করে। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না তাই সে চোখে নাইট গগলসটা পরে নেয়। সাথে সাথে চারদিক প্রায় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল কিন্তু তারপরেও দৃশ্যটি কেমন যেন অবাস্তব দেখায়। খালি চোখে যেসব জিনিস অস্পষ্ট এই গগলসে সেগুলো অনেক সময় স্পষ্ট। নিকি কিছুক্ষণ চোখে গগলস পরে এদিক-সেদিক তাকায় এবং ধীরে ধীরে একটু অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

বিল্ডিংটিতে অনেক ধরনের কারুকাজ এবং সে কারণে নানা ধরনের ছোট-বড় খাঁজ। নিকি ইচ্ছে করলে চোখ বন্ধ করে এই খাঁজগুলো ধরে ধরে উপরে উঠে যেতে পারবে। মিক্কুর সাথে প্রতিযোগিতা করে সে কতবার মোটা মোটা গাছের প্রায় মসৃণ কাণ্ড ধরে গাছের উপরে উঠে গেছে। নিকি তাই দেরি করল না, সুদৃশ্য বিল্ডিংটির দেয়াল ধরে প্রায় খামচে খামচে উপরে উঠে গেল। যে জানালাটির শিক ধরে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল তার কার্নিশে দাঁড়িয়ে সে ভেতরে উঁকি দেয়। ঘরের মাঝে একটি বিছানা সেই বিছানায় মেয়েটি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মেয়েটি ঘুমিয়ে নেই, কারণ মাঝে মাঝেই মেয়েটির শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিকি বুঝতে পারল মেয়েটি আসলে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকি কী করবে ঠিক বুঝতে পারল না, খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সে জানালার কাচে টোকা দেয়। মেয়েটি শুনতে পেল বলে মনে হল না তখন নিকি দ্বিতীয়বার টোকা দিল, আগের থেকে একটু জোরে। এবারে মেয়েটি শুনতে পেয়ে উঠে বসে এদিক–সেদিক তাকাল। নিকি তখন আবার জানালায় টোকা দিল। এবার মেয়েটি জানালার দিকে তাকাল এবং নিকিকে দেখতে পেল এবং মনে হল সে বুঝি সাথে সাথে পাথরের মতো জমে গেছে। তার নিচের ঠোঁট দুটি কয়েকবার নড়ে ওঠে কিন্তু গলা থেকে কোনো শব্দ বের হয় না।

নিকি চোখ থেকে তার বিদঘুটে গগলসটা খুলে নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল, কেউ তার কথা শুনে ফেলতে পারে তাই সে মুখে কোনো শব্দ করল না। মেয়েটির কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে যে নিকি সত্যি সত্যি জানালার বাইরে কার্নিশে দাঁড়িয়ে আছে, যখন শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে পারল তখন সে প্রায় ছুটে জানালার কাছে এসে হাজির হয়। জানালার শিকগুলোর ভেতর থেকে হাত বের করে তাকে ধরার চেষ্টা করে। উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করে বলল, "তুমি? তুমি কীভাবে এখানে এসেছ? তুমি পড়ে যাবে এখান থেকে। সর্বনাশ!"

নিকি বলল, "আমি পড়ব না।"

মেয়েটি বলল, "কেমন করে উঠেছ এখানে?"

"দেয়াল বেয়ে বেয়ে।"

"দেয়াল বেয়ে বেয়ে কেমন করে উঠেছ? এটি হতে পারে না।"

"পারে। আমি পারি।"

মেয়েটি কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে নিকির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ফিসফিস করে বলল, "তুমি কেন এসেছ?"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি হ্রদের পারে যাবে। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।"

"আমি যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে বের হতে দেয় নি। আমাকে ঘরে আটকে রেখেছে।"

"ঘরে আটকে রেখেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

মেয়েটি নিচের দিকে তাকিয়ে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি তোমার কথা বলি নি সেজন্যে।"

নিকি অবাক হয়ে বলল, "আমার কথা?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কী কথা?"

"প্রত্যেক দিন ওরা আমার সাথে কথা বলে। সারা দিন কী হয়েছে জানতে চায়। কালকে আমার সাথে যখন কথা বলেছে তখন আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি কী করেছি। তোমার সাথে দেখা হয়েছে আমি সেটি বলতে চাই নি—আমি চুপ থেকেছি।"

"তারপর।"

"তখন তারা সন্দেহ করেছে। আরো বেশি করে জানতে চেয়েছে। আমি তখন রেগে গিয়ে বলেছি আমি বলব না। তখন তারাও রেগে গিয়েছে।"

নিকি অবাক হয়ে বলল, "রেগে গিয়েছে? ক্রিনিটি কখনো রেগে যায় না। রোবটরা রাগতে পারে না।"

AMARBOI.COM

মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "পারে। আমি যাদের কথা বলছি তারা রেগে যেতে পারে। তারা যখন রেগে যায় তখন তারা আমাকে—আমাকে—" মেয়েটি কথা বন্ধ করে হঠাৎ থেমে গেল।

"তোমাকে কী?"

মেয়েটি মাথা নিচু করে বলল, "আমি সেটি বলতে চাই না।"

নিকি জিজ্ঞেস করতে চাইল, কেন তুমি বলতে চাও না? কিন্তু কী ভেবে সে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুমি আমার সাথে যাবে?"

"আমি?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে?"

"তুমি বল যাবে কি না—তা হলে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।"

মেয়েটি জানালার বাইরে কার্নিশে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট এই শিশুটির দিকে তাকিয়ে রইল, তার সাথে এই ছেলেটির খুব বড় একটি পার্থক্য রয়েছে। সে কেমন যেন দুর্বল, তার মাঝে ভয়, অনিশ্চয়তা, সে একটি ছেলেমানুষের মতো। আর এই ছেলেটার মাঝে কী আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস, কোনো কিছুতেই তার ভয় নেই, যেন সে একটা বড় মানুষ। মেয়েটি আস্তে আস্তে বলল, "হ্যাঁ, যেতে তো চাই। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"কেমন করে যাব? যদি যেতে না পারি, যদি ধরে ফেলে—"

"সেটি নিয়ে তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। চিন্তা কোরো না।"

"কেন? সব সময় সবকিছু নিয়ে চিন্তা করতে হয়। ভাবতে হয়। একটি সিদ্ধান্ত নেবার আগে তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলো বিবেচনা করতে হয়।"

"না।" নিকি মাথা নেড়ে বলল, "করতে হয় না। যেটি করার দরকার সেটি করে ফেলতে হয়। যদি খুব বেশি চিন্তা কর তা হলে তুমি কিছুই করতে পারবে না।"

"আর যদি বিপদ হয়?"

নিকি মুখ শক্ত করে বলল, "হবে না।"

"যদি হয়?"

"যদি হয় তা হলে ক্রিনিটি আমাদের উদ্ধার করবে।"

"ক্রিনিটি?"

"হ্যাঁ ক্রিনিটি। ক্রিনিটি আমাকে খুব ভালবাসে। সে যেভাবে সম্ভব সেভাবে আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে।"

মেয়েটি কিছুক্ষণ নিকির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "রোবটরা ভালবাসতে পারে না।"

"কিন্তু ক্রিনিটি পারে।"

"কেমন করে পারে?"

"আমি ক্রিনিটিকে ভালবাসি তাই ক্রিনিটিও আমাকে ভালবাসে।"

মেয়েটি একটু অবাক হয়ে নিকির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আমাকে তুমি কোন দিন নিয়ে যাবে?"

নিকি অবাক হয়ে বলল, "কোন দিন মানে? তোমাকে এক্ষুনি নিয়ে যাব।"

মেয়েটা আরো বেশি অবাক হল, বলল, "এক্ষুনি?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে? আমি কেমন করে বের হব? দরজায় রোবট পাহারা দিচ্ছে, সিঁড়িতে ইলেকট্রনিক সিকিউরিটি। গেটে বড় বড় তালা—"

নিকি হাসল, বলল, "কে বলেছে তুমি দরজা দিয়ে বের হবে?"

"তা হলে কোন দিক দিয়ে বের হব?"

"এই জানালা দিয়ে।"

"জানালা দিয়ে? এই জানালায় এই মোটা লোহার শিক—"

"আমি এক্ষুনি কেটে ফেলব। আমার কাছে ইনফ্রারেড লেজার আছে।" নিকি কথা বলতে বলতে তার ব্যাগ থেকে ইনফ্রারেড লেজারটা বের করে বলল, "এর মাঝে নিউক্লিয়ার ব্যাটারি। যতক্ষণ ব্যাটারির চার্জ থাকে ততক্ষণ পুরু ইস্পাত কেটে ফেলা যায়।"

মেয়েটি জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকাল, তারপর শুকনো মুখে বলল, "আমি নিচে নামব কেমন করে? আমি তো তোমার মতো দেয়াল বেয়ে উঠতে পারি না।"

নিকি বলল, "সেটি নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। তোমাকে আমার মতো দেয়াল বেয়ে নামতে হবে না। আমার কাছে কার্বন ফাইবার আছে!"

"সেটি কী?"

"আমি তোমাকে দেখাব। এখন তুমি সামনে থেকে সরে যাও। আমি আগে কখনো এই ইনফ্রারেড লেজার ব্যবহার করি নি, উল্টাপাল্টা কিছু না হয়ে যায়।"

মেয়েটি সামনে থেকে সরে গেল, নিকি তখন জানালার শিকটাকে স্পর্শ করে লেজারের বোতামে চাপ দিল। সে একটি সূক্ষ্ম কম্পন অনুভব করে আর জানালার শিকটা দেখতে দেখতে কেটে যায়। যেখানে কাটা হয়েছে সেই অংশটা প্রচণ্ড উত্তাপে টকটকে লাল হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

নিকি বলল, "এখন উপরে কেটে ফেলব তা হলেই বের হয়ে আসতে পারবে।"

নিকি এক হাতে লোহার রডটা ধরে রেখে অন্য হাতে উপরের অংশটা কেটে ফেলে, তারপর ভারী রডটা কার্নিশে নামিয়ে রেখে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। মেয়েটি একটু বিস্ময় নিয়ে নিকির দিকে তাকিয়ে ছিল, আস্তে আস্তে বলল, "সাত বছরের বাচ্চা হিসেবে তুমি অনেক কিছু করতে পার।"

নিকি বলল, "ক্রিনিটি বলেছে আমার মানসিক বয়স নাকি অনেক বেশি।"

মেয়েটি বলল, "আমার বয়স এগার কিন্তু আমি কিছুই পারি না।"

"তুমি যখন আমাদের সাথে যাবে তখন তুমিও সবকিছু শিখে যাবে।"

মেয়েটি জানালার কাটা অংশটি দিয়ে নিচে তাকাল, বলল, "আমি কিছুতেই এদিক দিয়ে নামতে পারব না।"

নিকি বলল, "তোমাকে পারতে হবে না, তুমি চুপচাপ বসে থাকবে। আমি তোমাকে নামিয়ে দেব।"

"আমার ভয় করে।" মেয়েটি ফ্যাকাসে মুখে বলল, "আমার খুব ভয় করে।"

নিকি বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই।"

"আছে। আমার খুব ভয় করে, আমি বের হতে পারব না। কিছুতেই পারব না।"

নিকি একটু অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর নিচু গলায় বলল, "তুমি একটি জিনিস জান?"

"কী?"

"আমি এখনো তোমার নাম জানি না।"

"নাম? আমার?"

"হ্যাঁ।"

"রোবটেরা আমাকে মানবশিশু ডাকে।"

"কিন্তু মানবশিশু তো কারো নাম হতে পারে না। তোমার সত্যি নাম কী?"

"তথ্যকেন্দ্রে দেখেছি আমার নাম ত্রিপি। কিন্তু কেউ কখনো আমাকে এই নামে ডাকে নি।"

"আমি ডাকব।" নিকি ডাকল, "ত্রিপি।"

ত্রিপি একটু অবাক হয়ে নিকির দিকে তাকিয়ে রইল। নিকি তখন আবার ডাকল, "ত্রিপি।"

ত্রিপি এবার কিছু বলল না, নিকির দিকে তাকিয়ে রইল।

নিকি হেসে বলল, "ত্রিপি, কেউ ডাকলে উত্তর দিতে হয়। তুমি উত্তর দাও।"

ত্রিপি থতমত খেয়ে বলল, "ও আচ্ছা। হ্যাঁ।"

নিকি বলল, "ত্রিপি, তুমি বলছ তোমার ভয় করছে। কিন্তু আমি বলছি তোমার কোনো ভয় নেই।"

ত্রিপি নিকির দিকে তাকিয়ে রইল। নিকি তার ব্যাগ থেকে কার্বন ফাইবারের রিলটা বের করে। একটি স্ট্র্যাপ দিয়ে সেটা ত্রিপির শরীরের সাথে বেঁধে নেয়, তারপর কার্বন ফাইবারের হুকটা স্ট্র্যাপের সাথে লাগিয়ে ত্রিপিকে বলল, "এখন তুমি নাম।"

"নামব? আমি?"

"হ্যাঁ। আমি উপর থেকে তোমাকে আস্তে আস্তে নামাব।"

"সর্বনাশ! আমার ভয় করে।"

"ভয়ের কিছু নেই। আর যদি ভয় করে তা হলে তুমি চোখ বন্ধ করে থাক। যখন তোমার পায়ের নিচে তুমি মাটি পাবে তখন চোখ খুলবে। ঠিক আছে?"

ত্রিপি রাজি হল। নিকি কার্বন ফাইবারটা একটি রডে কয়েকবার পেঁচিয়ে নেয় তারপর আস্তে আস্তে ত্রিপিকে নিচে নামিয়ে আনে। যখন ত্রিপি শক্ত মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন সে কার্বন ফাইবারের রিলটা গুটিয়ে নেয়। তারপর এদিক-সেদিক তাকিয়ে সাবধানে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। ত্রিপি নিঃশ্বাস বন্ধ করে উপরের দিকে তাকিয়ে ছিল তার চারপাশে যা ঘটছে সে এখনো সেটি বিশ্বাস করতে পারছে না।

নিকি নিচে নেমে এসে ত্রিপির হাত ধরে বলল, "চল যাই।"

ত্রিপি বলল, "চল।"

দুজন ছুটতে ছুটতে হ্রদের তীরে হাজির হয়। ছোটাছুটি করা ত্রিপির অভ্যেস নেই, সে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে, নিচে নেমে বলল, "এখন কী করব?"

"এই হ্রদে ডুব দিতে হবে। হ্রদের নিচে একটি গর্ত আছে সেটি দিয়ে বের হতে হবে।"

"আমি—আমি পারব না।"

"পারবে। তোমার কিছুই করতে হবে না—আমি তোমাকে নিয়ে যাব।" নিকি তার ব্যাগ থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট স্বচ্ছ গোলক বের করে ত্রিপির হাতে দিয়ে বলল, "এগুলো তোমার মুখে রাখ। যখনই নিঃশ্বাস নিতে হবে দাঁত দিয়ে একটি ভেঙে নেবে। সাথে সাথে নিঃশ্বাস নেবার বাতাস পেয়ে যাবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি। শুধু নিঃশ্বাস নেবার সময় হাত দিয়ে নাকটা বন্ধ করে রাখবে।"

"ঠিক আছে।"

"হ্রদের পানিটা মনে হবে খুব ঠাণ্ডা কিন্তু দেখবে একটু পরেই অভ্যাস হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে।"

"গর্তটি একটু ছোট, কষ্ট করে বের হতে হবে। তুমি ভয় পেয়ো না আমি তোমাকে ঠেলে বের করে দেব।"

"ঠিক আছে।"

হ্রদের নিচে দেয়ালের ছোট গর্তের ভেতর থেকে বের হওয়া নিয়ে নিকির একটু দুশ্চিন্তা ছিল, কিন্তু দেখা গেল দুজনে সহজেই বের হয়ে এল। দুজন যখন পানির উপরে বের হয়ে এল ঠিক তখন শক্ত হাতে কেউ তাদের ধরে ফেলে, কিছু বোঝার আগেই তাদেরকে একটি বাইভার্বালে তুলে ফেলে এবং মৃদু গর্জন করে বাইভার্বালটা উড়ে যেতে শুরু করে।

ত্রিপি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, বলল, "ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে।"

ত্রিপি শুনতে পেল রোবটটি তার ধাতব কণ্ঠস্বরে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই মেয়ে, আমি ক্রিনিটি।"

৯

ক্রিনিটি বলল, "তোমরা দুজন সাবধানে থেকো। আমি বাইভার্বালটিকে দ্রুত উড়িয়ে নিয়ে সরে যাব।"

নিকি জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"আমরা তাড়াতাড়ি সরে যেতে চাই। যখন তারা বুঝতে পারবে তুমি এই মেয়েটাকে নিয়ে চলে এসেছ তখন তারা আমাদের খুঁজতে বের হবে।"

"আমার মনে হয় খুঁজতে বের হবে না।"

"কেন?"

নিকি ইতস্তত করে বলল, "মনে আছে তুমি যখন জীবন রক্ষাকারী ব্যাগটি আমাকে দেখাচ্ছিলে তখন—"

"তখন কী?"

"তখন তুমি আমাকে একটি বিস্ফোরক দেখিয়েছিলে? যেটি আমার ছোঁয়াও নিষেধ?"

"হ্যাঁ। সেই বিস্ফোরকটার কী হয়েছে?"

"আমি সেটি ছুঁয়েছি। টাইমারটা সেট করে ত্রিপির ঘরে রেখে এসেছি।"

ক্রিনিটি বলল, "টাইমারটা কতক্ষণের জন্যে সেট করেছ?"

"পনের মিনিট। আমার মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে এটি বিস্ফোরিত হবে।"

নিকির কথা শেষ হবার আগেই একটি আলোর ঝলকানি মুহূর্তের জন্যে চারদিক আলোকিত করে দেয়, প্রায় সাথে সাথেই দূর থেকে একটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে আসে। নিকি শিস দেবার মতো শব্দ করে বলল, "দেখেছ? জাতীয় গবেষণাগারের অর্ধেকটা উড়ে গেছে!"

ক্রিনিটি বলল, "হ্যাঁ। সাত বছরের একটি মানবশিশু এটি ঘটিয়েছে সেটি মনে হয় সাধারণের কাছে কখনো বিশ্বাসযোগ্য হবে না।"

AMARBOI.COM

ত্রিপি বলল, "নিকির বয়স সাত হলেও তার কাজকর্ম বড় মানুষের মতো।"

নিকি বিড়বিড় করে বলল, "আমি বড় মানুষের মতো হতে চাই না। আমি ছোট মানুষ থাকতে চাই।"

ক্রিনিটি সারা রাত বাইভার্বালটি চালিয়ে নিয়ে গেল, ভোর রাতে সেটিকে একটি শহরতলিতে থামায়। পুরো শহরতলিটি পরিত্যক্ত, বাড়িঘর বিবর্ণ, গাছপালা ঝোপঝাড়ে ঢেকে আছে। তার মাঝামাঝি খানিকটা ফাঁকা জায়গার মাঝে সে বাইভার্বালটি নামিয়ে আনে। তারা দিনটা বিশ্রাম নিয়ে রাতে আবার রওনা দেবে।

ক্রিনিটি কিছু গাছের আড়ালে ঘাসের ওপর বিছানা তৈরি করে তাদের খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়ার কথা বলল কিন্তু নিকি আর ত্রিপি দুজনেই আবিষ্কার করল তাদের চোখে ঘুম আসছে না। তখন দুজনেই বুনো গাছগাছালিতে ঢেকে যাওয়া এই শহরতলিটি দেখতে বের হল। একসময় এখানে মানুষ থাকত ছোট বাচ্চারা ছোটাছুটি করত এখন কেউ নেই, নির্জন গা ছমছমে একটি পরিবেশ, দেখে নিকি আর ত্রিপি দুজনেই বুকের ভেতর এক ধরনের হাহাকার অনুভব করে। হাঁটতে হাঁটতে ত্রিপি একটি ছোট বাসার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। নিকি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"এই রকম একটি বাসায় আমি থাকতাম।"

"তোমার মনে আছে?"

"একটু একটু মনে আছে।"

"তোমার বাবা-মায়ের কথা মনে আছে?"

ত্রিপি কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল, তারপর বলল, "মাঝে মাঝে আমি একজন মহিলাকে স্বপ্নে দেখি, স্বপ্নে আমাকে আদর করে, মনে হয় সেই মহিলাটিই আমার মা।"

"তার কথা তোমার মনে নেই?"

"না। শুধু আবছাভাবে একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। আমি মায়ের হাঁটুর ওপর বসে আছি, মা তার চেয়ারে আস্তে আস্তে দুলছে আর গান গাইছে। এটি সত্যি না আমার কল্পনা আমি জানি না।"

নিকি কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না, দুই জন পাশাপাশি কিছুদূর হেঁটে যায়। ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "তোমার মায়ের কথা তো তুমি জান না?"

"আমার জানার কথা না। কিন্তু আমি জানি।"

"কীভাবে জান?"

"ক্রিনিটির কাছে আমার মায়ের হলোগ্রাফিক ভিডিও আছে, সে মাঝে মাঝে আমাকে সেটি দেখতে দেয়। সেখানে আমার মা'কে আমি দেখেছি। আমার মা সেখানে যখন কথা বলে তখন মনে হয় সত্যি সত্যি আমার মা আমার সাথে কথা বলছে।"

ত্রিপি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি তোমার সাথে কথা বলছি। একটি সত্যিকার মানুষ! তোমার হয় নিকি?"

"হয়। কেন জান?"

"কেন?"

"আমার মা মারা যাবার আগে ক্রিনিটিকে বলে গিয়েছিল যে মানুষেরা বেঁচে আছে, সারা পৃথিবী খুঁজে খুঁজে তাদেরকে বের করতে হবে। আমাকে তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। সে জন্যে আমি সব সময়ই জানতাম আমার অন্য মানুষের সাথে দেখা হবে। তাদের সাথে প্রথম দেখা হলে আমি তাদেরকে কী বলব সেটি অনেকবার মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম।"

"যখন আমার সাথে দেখা হয়েছিল তখন কি তুমি সেটি বলেছিলে?"

নিকি মাথা নাড়ল। বলল, "না। তোমার সাথে যখন আমার দেখা হয়েছে তখন আমার সবকিছু উলটপালট হয়ে গিয়েছিল—আমি কী বলব কী করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।"

ত্রিপি বলল, "পৃথিবীতে কি আরো মানুষ আছে?"

"জানি না। মনে হয় আছে।"

"তাদের সবাইকে কি আমরা খুঁজে বের করতে পারব।"

নিকি গম্ভীর সুরে বলল, "মনে হয় পারব?"

"রোবটরা আমাদের করতে দেবে?"

নিকিকে খানিকটা দুশ্চিন্তিত দেখায়। সে মাথা চুলকে বলল, "সেটি হচ্ছে মুশকিল। আমি ভেবেছিলাম রোবটরা আমাদের সাহায্য করে। এখন দেখি ঠিক তার উল্টো—রোবটরা আমাদেরকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করে।"

ত্রিপি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "যদি আমরা একজন বড় মানুষ পেতাম তা হলে ভালো হত তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে বড় মানুষটি সবকিছু আরো ভালো করে করতে পারত। আমরা তো কখনো মানুষ দেখি নি, তারা কী করে কীভাবে চিন্তা করে কীভাবে কাজ করে কিছু জানি না।"

"ঠিক বলেছ।"

একটু পর দেখা গেল বিবর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি জনপদের একপ্রান্তে একটি গাছের গুঁড়িতে দুটি শিশু বসে আছে। তারা শিশুর মতো বড় হয় নি, তারা খুব আশ্চর্য একটি জগতের মানুষ। তাদের ভবিষ্যতে কী আছে তারা জানে না—তাদের ভবিষ্যৎ আছে কি না সেটিও তারা জানে না।

AMARBOI.COM

অন্ধকার হয়ে যাবার পর বাইভার্বালে করে তারা আবার রওনা দেয়। ভোররাতে তারা বিশ্রাম নিতে থামে। পরদিন সূর্য ওঠার পর আবার তারা রওনা দেয়। বিস্তীর্ণ জনপদ পার হয়ে বিশাল জলাভূমির উপর দিয়ে উড়ে উড়ে শেষ পর্যন্ত তারা তাদের এলাকায় ফিরে আসে। বাইভার্বালটি যখন তাদের পরিচিত খোলা জায়গাটিতে থামল তখন নিকি বাইভার্বাল থেকে লাফ দিয়ে নেমে ত্রিপির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এখানে থাকি।"

ত্রিপি চারদিক দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে। দীর্ঘ সাত বছর সে যেখানে বড় হয়েছে তার সাথে এই এলাকার কোনো মিল নেই। তার জীবনের বেশিরভাগ কেটেছে বদ্ধ চার দেয়ালের ভেতর। যখন বাইরে গিয়েছে সেটাও ছিল দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এখানে চারদিক খোলামেলা। ত্রিপি সাবধানে বাইভার্বাল থেকে নেমে আসে। নিকি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে পেছনের গাছগুলোকে দেখিয়ে বলল, "ঐ যে বনটা দেখছ সেখানে আমার বন্ধুরা থাকে।"

"তোমার পশুপাখি বন্ধু?"

"হ্যাঁ।"

"তারা এখন কোথায়?"

"বনের ভেতর কোথাও আছে। আমরা গিয়ে খুঁজে বের করব।"

ক্রিনিটি বলল, "আমরা অনেক দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। তোমাদের খানিকটা বিশ্রাম নেয়া দরকার।"

নিকি বলল, "আমরা মোটেও ক্লান্ত নই ক্রিনিটি।"

"আমি জানি তোমরা ক্লান্ত নও। কিন্তু আমি বহুদিন থেকে তোমাকে বড় করেছি তোমার শরীরের জৈব অংশটুকু সম্পর্কে আমি তোমার চাইতে বেশি জানি।"

নিকি বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ ক্রিনিটি?"

আমি বলছি যে, "তোমরা দুজন একটু বিশ্রাম নাও, সম্ভব হলে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। ঘুম থেকে উঠে উষ্ণ পানিতে স্নান করে নূতন পরিচ্ছন্ন কাপড় পর। খাবার টেবিলে বসে গরম ধূমায়িত কিছু খাবার খাও তা হলে তোমাদের মনে হবে তোমরা এক ধরনের নূতন জীবন শুরু করতে যাচ্ছ।"

নিকি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে ক্রিনিটি।"

ক্রিনিটি বলল, "তা ছাড়া তুমি এখন একা নও। তোমার সাথে আছে ত্রিপি। তুমি একভাবে বড় হয়েছ, ত্রিপি সম্পূর্ণ অন্যভাবে বড় হয়েছে। তুমি যদি জোর করে তোমার জীবনযাত্রার পদ্ধতি ত্রিপির ওপর চাপিয়ে দাও সেটি তার পছন্দ নাও হতে পারে।"

"তা হলে আমি কী করব?"

"যেটিই করতে চাও ধীরে ধীরে কর। নূতন পরিবেশে ত্রিপিকে মানিয়ে নিতে দাও।"

নিকি কিছুক্ষণ চিন্তা করল তারপর বলল, "ঠিক আছে ক্রিনিটি। আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ।"

ক্রিনিটি বলল, "আমি মানুষ না হতে পারি, কিন্তু মানুষ কীভাবে চিন্তা করে আমি সেটি অনেক সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছি।"

শেষ পর্যন্ত নিকি যখন ত্রিপিকে নিয়ে বের হতে গিয়েছে তখন ক্রিনিটি তাদের দুজনকে থামাল। বলল, "তোমরা একটু দাঁড়াও।"

নিকি জানতে চাইল, "কেন ক্রিনিটি?"

"নিকি, তোমার গলায় একটি মাদুলি আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"কেন আছে বল দেখি?"

"এটি আমার জন্যে সৌভাগ্য বয়ে আনে। আমাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে।"

ক্রিনিটি বলল, "ঠিক বলেছ। এখন যেহেতু ত্রিপিও তোমার সাথে থাকবে তার সৌভাগ্যের জন্যে তাকেও একটি মাদুলি দেওয়া দরকার। তাকেও যেন বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে।"

ত্রিপি একটু অবাক হয়ে বলল, "প্রাচীনকালে মানুষ এগুলো বিশ্বাস করত, তাদের শরীরে জাদুমন্ত্র দেওয়া মাদুলি থাকত! তুমিও কি জাদুমন্ত্র জান ক্রিনিটি?"

"না। আমি জাদুমন্ত্র জানি না।" ক্রিনিটি একটি মাদুলি ত্রিপির গলায় ঝুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "এই মাদুলিটির মাঝে কোনো জাদুমন্ত্র নেই। কিন্তু কিছু জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আছে। পথেঘাটে তোমাদের কোনো বিপদ-আপদ হলে আমি খবর পাব। তোমাদের রক্ষা করার জন্যে ব্যবস্থা নিতে পারব।"

নিকি বলল, "সেটিই হচ্ছে জাদুমন্ত্র।"

ক্রিনিটি বলল, "তুমি ইচ্ছে করলে বিষয়টিকে সেভাবে দেখতে পার।" তারপর সে ত্রিপিকে লক্ষ করে বলল, "ত্রিপি, তুমি এই মাদুলিটি গলা থেকে খুলবে না!"

ত্রিপি মাদুলিটি ভালো করে দেখে বলল, "এটি কী সুন্দর! আমি কখনো এটি গলা থেকে খুলব না।"

"আর নিকি, তুমি মনে রেখ ত্রিপি এখানে নূতন এসেছে। এখানকার সবকিছু তার অপরিচিত। তাকে তুমি দেখেশুনে রাখবে। তাকে কোনো অপরিচিত পরিবেশে ঠেলে দেবে না।"

"ঠিক আছে ক্রিনিটি।"

"তাকে নিয়ে কোনোরকম বিপজ্জনক কাজ করবে না।"

"করব না।"

"কোনো রকম ঝুঁকি নেবে না।"

"নেব না ক্রিনিটি।"

"তা হলে যাও, আর অন্ধকার হবার আগে ফিরে এস।"

নিকি বলল, "ফিরে আসব। তুমি কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না।"

বনের ভেতর ঢোকার সাথে সাথেই একটি গাছের ডালে হঠাৎ করে প্রচণ্ড হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল। ত্রিপি ভয় পেয়ে নিকিকে আঁকড়ে ধরে বলল, "ওটা কী?"

নিকি হেসে বলল, "মিক্কু! আমার বন্ধু।"

নিকির সাথে ত্রিপিকে দেখে মিক্কু বিশেষ উত্তেজিত হয়ে পড়ল, সে কাছে না এসে গাছের ডালে বসে সেটি ঝাঁকাতে লাগল। নিকি বলল, "মিক্কু, তোমার কোনো ভয় নেই। এটি হচ্ছে ত্রিপি। ত্রিপি আমার মতো একজন মানুষ। আমার বন্ধু।"

মিক্কু ডাল ঝাঁকানো বন্ধ করে একবার একটু কাছে এসে খুব মনোযোগ দিয়ে ত্রিপিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। নিকি হাত বাড়িয়ে বলল, "এস। আমার কাছে এস।"

মিক্কু এবারে লাফ দিয়ে গাছের ডাল থেকে নিকির ঘাড়ে এসে বসে। ত্রিপি অবাক হয়ে বলল, "তুমি বানরের সাথে কথা বলতে পার?"

নিকি একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "একটু একটু পারি।"

"কেমন করে পার?"

"আমি জানি না। অনেক ছোট থাকতে আমি তো এদের সাথে সাথে বড় হয়েছি, তাই আমি ওদের বুঝতে পারি ওরাও আমাকে বুঝতে পারে।"

"কী আশ্চর্য!"

"মোটেও আশ্চর্য না। তুমি পারবে।"

ত্রিপি মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু। পারব না।"

"পারবে। চেষ্টা করলেই পারবে।"

ত্রিপি নিকির ঘাড়ে বসে থাকা মিক্কুকে দেখল, তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, "আমার কাছে এস মিক্কু।"

মিক্কু মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু একটি শব্দ করল। নিকি মাথা নেড়ে বলল, "না মিক্কু, ত্রিপি মোটেও তোমাকে মারবে না! ত্রিপি তোমাকে আদর করবে। যাও, ত্রিপির কাছে যাও।"

মিক্কু আরো একবার আপত্তি করল। নিকি তখন মুখ কঠিন করে বলল, "যাও বলছি, না হলে আমি তোমার সাথে খেলব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিক্কু এবারে খুব অনিচ্ছার সাথে এবং খুব সতর্কভাবে ত্রিপির কাছে গেল। ত্রিপির ঘাড়ে বসে সে তার চুলগুলো একবার শুঁকে দেখল। গলায় ঝোলানো মাদুলিটি নাড়াচাড়া করল তারপর একটু কামড় দিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর তার কানটা ধরে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করল, ত্রিপির সুড়সুড়ি লাগছিল, সে হিহি করে হাসতে শুরু করে।

নিকি বলল, "ত্রিপি, তোমার কোনো ভয় নেই। মিক্কু সবাইকে এভাবে পরীক্ষা করে দেখে।"

"আমি মোটেও ভয় পাচ্ছি না, আমার সুড়সুড়ি লাগছে।" সে হাত বাড়িয়ে মিক্কুকে ঘাড় থেকে নামিয়ে কোলে নেয় তারপর আদর করে বুকে চেপে ধরে, মিক্কু আদরটা উপভোগ করে তার মাথাটা বুকে লাগিয়ে রাখল।

নিকি বলল, "এই দেখ! মিক্কুর সাথে তোমার ভাব হয়ে গেছে।"

ত্রিপি মিক্কুর মুখে হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, "আমি সব সময় ভাবতাম বনের পশুপাখি অনেক হিংস্র হয়।"

নিকি বলল, "তুমি যদি হিংস্র হও তা হলে তারাও হিংস্র হবে।"

"আমি মোটেও হিংস্র হব না।"

মিক্কুকে কোলে নিয়ে দুজনে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ কাছাকাছি একটি গাছের উপর থেকে হুটোপুটির একটা শব্দ শোনা গেল, মিক্কু উত্তেজিতভাবে মুখ তুলে তাকায় তারপর বিচিত্র ভঙ্গিতে চিৎকার করতে করতে ত্রিপির কোল থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে গাছের উপর উঠে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়!

ত্রিপি অবাক হয়ে বলল, "কী হল? কী হল ওর?"

নিকি হিহি করে হেসে বলল, "ওদের একদল আরেক দলের গাছ দখল করবে। সে জন্যে সবাই মিলে মারামারি করতে যাচ্ছে।"

"মারামারি? এই ছোট বানরের বাচ্চা মারামারি করবে?"

"ওটা ওদের এক ধরনের খেলা।"

"কী বিচিত্র খেলা!"

"হ্যাঁ।" নিকি গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। খুবই বিচিত্র। কিন্তু খুবই সোজা।"

নিকি ত্রিপিকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হ্রদের তীরে বালুকাবেলায় হাজির হয়। সামনে নীল হ্রদের পানিতে সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। খোলা আকাশ সেখানে সাদা মেঘ। ত্রিপি সেদিকে তাকিয়ে বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে বলল, "কী সুন্দর!"

নিকি কিছু বলল না। ত্রিপি বলল, "নিকি! তোমার কাছে এটা সুন্দর লাগছে না?"

নিকি মাথা নাড়ল, "লাগছে আসলে আমি তো সব সময় এটা দেখি তাই। এখন আলাদা করে চোখে পড়ে না।"

"আমি তো বেশিরভাগ সময় থাকতাম একটা ঘরের ভেতর। আমার চারপাশে ছিল ভয়ংকর ভয়ংকর রোবট আর যন্ত্রপাতি। শুধু বিকেলবেলা আমি কিছুক্ষণের জন্যে বের হতাম। সারা দিন অপেক্ষা করতাম কখন বিকেল হবে!"

নিকি বলল, "এখন তোমার আর অপেক্ষা করতে হবে না। তোমার ইচ্ছে করলে দিন-রাত বাইরে থাকতে পারবে। তোমার ঘরের ভেতরেই ঢুকতে হবে না।"

"হ্যাঁ। কী মজা!"

ঠিক তখন গাছের উপর দিয়ে একটা কালো পাখি কঁ কঁ করে ডাকতে ডাকতে উড়ে এল। নিকি উপরে তাকায়, তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, হাত নেড়ে বলে, "কিকি!"

পাখিটা তার মাথার উপর উড়তে থাকে, নিচে নেমে আসে না। নিকি ডাকল, "এস কিকি। এস।"

কিকি উড়তে উড়তে ডাকল, "কঁ কঁ।"

নিকি বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই। এ হচ্ছে ত্রিপি। ত্রিপি আমার বন্ধু।"

কিকি আবার ডাকল, "কঁ কঁ।"

নিকি বলল, "এস কিকি। এস।"

কালো পাখিটা তখন উড়ে এসে নিকির হাতে বসল। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, লাল চোখ। ঠোঁটগুলো শক্ত এবং ধারালো। ত্রিপি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকে, ফিসফিস করে বলে, "আমি কখনো এত কাছ থেকে কোনো পাখি দেখি নি!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। দেখে মনে হচ্ছে এটা খুব শক্তিশালী পাখি। ঠোঁট দিয়ে ঠোকর দিয়ে লোহার পাতকে ফুটো করে ফেলতে পারবে!"

"হ্যাঁ। কিকি খুবই শক্তিশালী পাখি।"

"আমি কি কিকিকে ছুঁয়ে দেখতে পারি?"

"দেখ।"

ত্রিপি হাত বাড়াতেই কিকি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যেতে চেষ্টা করল, নিকি তখন তার গায়ে হাত দিয়ে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই কিকি। ত্রিপি তোমাকে একটু আদর করবে।"

নিকির কথায় আশ্বস্ত হয়ে কিকি একটু শান্ত হল, ত্রিপি যখন তার গায়ে হাত দিল তখন সে সতর্কভাবে একটু ডানা ঝাপটাল কিন্তু উড়ে গেল না। ত্রিপি বলল, "ইস কী মসৃণ এর শরীরটা!"

"হ্যাঁ। আকাশে উড়তে হয় তো সেজন্যে পাখিদের পালক খুব মসৃণ থাকে।"

কিকি বলল, "কঁ কঁ।"

ত্রিপি নিকিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি সব সময় পাখিদের সাথে কথা বলতে পার?"

"না। সব পাখিদের সাথে পারি না। কিকির সাথে একটু একটু পারি।"

"ইস! কী মজা!"

"তুমি আরেকটা মজার জিনিস দেখতে চাও?"

"দেখাও।"

নিকি তখন কিকির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল। কিকি তার লাল চোখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একবার নিকিকে দেখে বলল, "কঁ কঁ।" তারপর ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল।

ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী বলেছ কিকিকে?"

নিকি উত্তর না দিয়ে একটু হেসে বলল, "এক্ষুনি দেখবে।"

কিছুক্ষণের মাঝে বনের গাছ থেকে কালো পাখি ডাকতে ডাকতে উড়ে আসতে থাকে। দেখতে দেখতে হাজার হাজার পাখি কঁ কঁ করে ডাকতে ডাকতে তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়তে থাকে। ত্রিপি অবাক হয়ে পাখিগুলোকে দেখতে থাকে, নিকিকে জিজ্ঞেস করে, "কী হচ্ছে নিকি? কী হচ্ছে?"

"সব পাখি এসেছে তোমাকে তাদের দেশে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য!"

"আমাকে?"

AMARBOI.COM

"হ্যাঁ, তোমাকে।"

ত্রিপি তখন ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠল, দুই হাত তুলে নাড়তে নাড়তে বলল, "তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ; অনেক অনেক ধন্যবাদ।"

পাখিগুলো কী বুঝল কে জানে, তাদের দুজনকে ঘিরে উড়তে থাকে। উড়তে উড়তে নিচে নেমে আসে তারপর আবার উপরে উঠে যায়। নিকি আর ত্রিপি দুই হাত তুলে পাখিদের সাথে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। অর্থহীন নাচ—কিন্তু তার মাঝে আনন্দের এতটুকু ঘাটতি নেই।

১০

ভোরবেলা নিকি আর ত্রিপি খুব ব্যস্তভাবে বের হয়ে যাচ্ছিল, অনেকগুলো টারমিনালের সামনে ক্রিনিটিকে বসে থাকতে দেখে তারা থেমে গেল। নিকি জিজ্ঞেস করল, "ক্রিনিটি তুমি কী করছ?"

"নেটওয়ার্কে যেসব তথ্য ব্রডকাস্ট করা হচ্ছে সেগুলো দেখছি।"

ত্রিপি বলল, "এই কাজটার মাঝে কোনো আনন্দ নেই, তাই না?"

ক্রিনিটি মনিটরের উপর থেকে চোখ না তুলে বলল, "আমার মাঝে আনন্দ অনুভব করার কোনো ক্ষমতা নেই, তাই আমি জানি না।"

"আমাদের সাথে চল, আজকে আমরা অনেক মজা করব।"

ক্রিনিটি এবারে চোখ তুলে তাকাল, তারপর বলল, "তোমরা কী মজা করবে?"

"আমরা একটা ভেলা তৈরি করব, তারপর হ্রদের মাঝে সেই ভেলা ভাসাব।"

"আমার যদি দুশ্চিন্তা করার ক্ষমতা থাকত তা হলে এখন নিশ্চয়ই তোমাদের ভেলা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতাম।"

ত্রিপি হিহি করে হাসল, বলল, "এটা খুব ভালো যে তুমি দুশ্চিন্তা করতে পার না।"

নিকি বলল, "তুমি চল আমাদের সাথে। আমরা কী করি দেখবে।"

"তোমরা কী কর সেটা দেখার জন্যে আমাকে তোমাদের সাথে যেতে হয় না। তোমাদের গলায় যে মাদুলি ঝুলিয়ে রেখেছি সেগুলো পঞ্চম প্রজন্মের ট্রাকিওশান। সেগুলো দিয়ে আমি যেখানে ইচ্ছে সেখানে বসে তোমাদের ওপর নজর রাখতে পারি।"

ত্রিপি বলল, "কিন্তু আমরা তো তোমার ওপর নজর রাখতে পারি না। তুমি আমাদের সাথে চল, তা হলে আমরাও তোমার ওপর নজর রাখতে পারব।"

ক্রিনিটি বলল, "আমি এখন যেতে চাই না। নেটওয়ার্কে আমি একটা তথ্যকে ব্রডকাস্ট হতে দেখছি। তথ্যটা সত্যি হলে গুরুত্বপূর্ণ। আমি তথ্যটাকে বিশ্লেষণ করতে চাই।"

"এটি কী তথ্য?"

"আমি তথ্যটা সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হতে পারছি না তাই এই মুহূর্তে তোমাদের কিছু বলছি না। যখন নিশ্চিত হব তখন তোমাদের বলব।"

"ঠিক আছে।" বলে নিকি আর ত্রিপি বের হয়ে গেল। তারা আজ খুব ব্যস্ত।

রাত্রিবেলা খেতে বসে নিকি বলল, "ক্রিনিটি আজকে আমার যে খিদে পেয়েছে যে, মনে হচ্ছে আস্ত একটা ঘোড়া খেয়ে ফেলব।"

AMARBOI.COM

ক্রিনিটি বলল, "তুমি কখনো ঘোড়া দেখ নি। তাই একটা আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলার অর্থ কী তোমার জানার কথা নয়।"

নিকি বলল, "আমি প্রাচীন সাহিত্যে দেখেছি, সেখানকার চরিত্রগুলো বেশি খিদে লাগলে বলে আমি আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলব।"

ক্রিনিটি বলল, "এটি একটি অযৌক্তিক কথা। একজন মানুষ কখনোই একটা আস্ত ঘোড়া খেতে পারে না।"

"না পারলে নাই। কিন্তু আমি বলব। বলতে খুব মজা হয়।"

ত্রিপি খেতে খেতে ছোট একটা বিষম খেল, এক ঢোক পানি খেয়ে ক্রিনিটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি সকালে বলেছিলে যে তুমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখেছ। সেটা কি আমাদের বলবে?"

"হ্যাঁ বলব।"

"বল।"

"আমার মনে হয় তোমরা খাওয়া শেষ করে আমার কাছে আস। আমি মনিটরে সরাসরি দেখাই, তোমরা তা হলে বিষয়টা ভালো বুঝতে পারবে।"

দুজনেই তাড়াতাড়ি খেয়ে ক্রিনিটির সাথে মনিটরের সামনে গিয়ে বসে। ক্রিনিটি কয়েকটা সুইচ স্পর্শ করতেই হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে একটা ত্রিমাত্রিক ছবি ভেসে ওঠে। সাথে নিচু স্বরে একটি কোমল সুর। ক্রিনিটি বলল, "এই নির্দিষ্ট চ্যানেলে কিছুক্ষণ পরপর একটা বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছে?"

"কে প্রচার করছে?"

"একজন মানুষ।"

"মানুষ?" নিকি ও ত্রিপি দুজনে একসাথে চমকে চিৎকার করে ওঠে।

"হ্যাঁ, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে একজন মানুষ।"

"কী বলছে মানুষটি?"

"তোমরা এক্ষুনি নিজেরাই সেটা শুনতে পাবে।"

নিকি দুই হাত উপরে তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "তুমি এত বড় একটা খবর আমাকে এত পরে দিচ্ছ?"

"পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে আমি খবরটি তোমাদের দিতে চাচ্ছিলাম না। যদি এটি কোনো একটি রোবটের ষড়যন্ত্র হয়?"

"রোবটের ষড়যন্ত্র?" নিকি অবাক হয়ে বলল, "রোবটের ষড়যন্ত্র?"

"হ্যাঁ। সে জন্যে আমাকে নিশ্চিত হতে হয়েছে যে এটি কোনো রোবট নয়।"

"তুমি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছ? কী বলেছে মানুষটা?"

ক্রিনিটি উত্তর দেবার আগেই ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "মানুষটা কত বড়? কী বলেছে মানুষটা?"

"ছেলে না মেয়ে? কোথায় থাকে?"

নিকি এবং ত্রিপির আরো প্রশ্ন ছিল কিন্তু ঠিক তখন হলোগ্রাফিক স্ক্রিনটা এক মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হয়ে আবার আলোকিত হয়ে ওঠে এবং কিছু বোঝার আগেই দেখতে পেল ঠিক তাদের সামনে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটি হলোগ্রাফিক স্ক্রিনের একটা ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি কিন্তু সেটি এত জীবন্ত যে নিকি এবং ত্রিপির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

AMARBOI.COM

মানুষটির সোনালি চুল এবং নীল চোখ। নিকি আর ত্রিপি আগে সত্যিকারের মানুষ দেখে নি, তারপরও তারা বুঝতে পারল মানুষটি খুব সুদর্শন। মানুষটি চারদিক একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখল, তারপর ভরাট গলায় বলল, "আমার নাম ফ্লিকাস। আমি একজন মানুষ আমার বয়স চৌত্রিশ। ভয়ংকর ভাইরাস আক্রমণে পৃথিবীর সব মানুষ মারা গিয়েছে কিন্তু প্রকৃতির কোনো এক বিচিত্র খেয়ালে আমি মারা যাই নি। আমি বেঁচে গিয়েছি, যেহেতু আমি বেঁচে গিয়েছি আমি মোটামুটিভাবে নিশ্চিত আমার মতো আরো কিছু মানুষ বেঁচে গিয়েছে। তাদের সংখ্যা হয়তো খুবই কম, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই আছে।"

মানুষটি একটি নিঃশ্বাস নেয় এবং হঠাৎ করে তার মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে। সে নিচু গলায় বলে, "আমি ভেবেছিলাম যারা বেঁচে আছে তারা নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজে বের করবে, আমি সেজন্যে অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু কেউ আমাদের খুঁজে বের করতে এল না। তখন আমার মনে হল তা হলে সত্যিই কি সারা পৃথিবীতে শুধু আমি একা বেঁচে আছি? আর কেউ বেঁচে নেই? কেউ বেঁচে নেই?

"তখন আমি ঠিক করেছি যে আমি নিজেই সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে খুঁজব। খুঁজে দেখব আর কোথাও বেঁচে থাকা মানুষকে খুঁজে পাই কি না। আমি প্রযুক্তির মানুষ নই। নিবিড় একটি গ্রামের একটি কফি হাউজে আমি গান গাইতাম, প্রযুক্তির কিছু আমি জানি না। তারপরেও আমি একটু একটু করে শিখেছি, পৃথিবীর পরিত্যক্ত নেটওয়ার্কে প্রবেশ করেছি এবং সারা পৃথিবীতে এই তথ্যটি ব্রডকাস্ট করছি।

"যদি কোনো মানুষ এই মুহূর্তে আমার কথাগুলো শোনে আমি তাকে শুভেচ্ছা জানাই, ভালবাসা জানাই।" ফ্লিকাস হাসিমুখে বলল, "আমি তাকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই যে পৃথিবীতে আমরা পুরোপুরি একা নই, নিঃসঙ্গ নই। তোমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাক আমার সাথে যোগাযোগ কর। আমরা সবাই মিলে আবার নূতন পৃথিবীর জন্ম দেব। মানুষের কলকাকলিতে এই পৃথিবী আবার মুখরিত হয়ে উঠবে।"

হলোগ্রাফিক স্ক্রিন থেকে মানুষের ছবিটা হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। নিকি আর ত্রিপি লাফিয়ে উঠে আনন্দে চিৎকার করে ক্রিনিটিকে জড়িয়ে ধরে লাফাতে থাকে। ক্রিনিটি তাদের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটি একটু কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর বলল, "আশা করছি ফ্লিকাস সত্যিকারের মানুষ, এটি কোনো কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি নয়।"

নিকি বলল, "কী বলছ ক্রিনিটি? ফ্লিকাস কেন কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি হবে? তুমি দেখছ না সে আমাদের মতো মানুষ? কী সুন্দর করে হাসতে পারে তুমি দেখ নি?"

ক্রিনিটি বলল, "আমি সত্যিকার বা কৃত্রিম কোনো হাসিই বুঝতে পারি না, তাই আমি ফ্লিকাসের বক্তব্যটি টুরিন টেস্ট করেছি।"

"সেটি কী?"

"কোনো বক্তব্য সত্যিকারের মানুষের না কৃত্রিম রোবটের সেটি বোঝার একটি পরীক্ষা।"

"তুমি পরীক্ষা করে কী দেখেছ?"

"আমি দেখেছি যে ফ্লিকাস সত্যিকারের মানুষ। কিংবা—"

"কিংবা কী?"

"মানুষ থেকেও বুদ্ধিমান কোনো প্রাণী।"

ত্রিপি হেসে বলল, "মানুষ থেকে বুদ্ধিমান হতে পারে শুধু একটি মাত্র প্রাণী।"

"সেটি কী?"

"সেটি হচ্ছে আরেকজন মানুষ!" বলে ত্রিপি হিহি করে হাসতে থাকে।

নিকি বুক থেকে আটকে থাকা একটা বড় নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "ক্রিনিটি, আমরা কখন ফ্লিকাসের কাছে যাব?"

"তার সাথে আগে যোগাযোগ করে নিই। তারপর রওনা দেব।"

"সে কতদূর থাকে ক্রিনিটি?"

"বেশ অনেক দূর। আমাদের ভালো একটা বাইভার্বাল দরকার তা না হলে যেতে অনেক দিন লাগবে।"

"তুমি তা হলে আরেকটা বাইভার্বাল ঠিক কর ক্রিনিটি।"

"করব।"

"ঠিক করলেই আমরা যাব।"

"ঠিক আছে।"

নিকি ত্রিপির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা যখন যাব তখন আমাদের মতো পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে হয়তো আরো অনেক বাচ্চা চলে আসবে।"

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই আসবে। রোবটেরা যদি আটকে না রাখে তা হলে নিশ্চয়ই চলে আসবে।"

নিকি ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমার কী মনে হয় ত্রিপি, রোবটেরা কি সত্যিই আরো বাচ্চাদের আটকে রেখেছে?"

"রাখতেও তো পারে। আমাকে যেরকম রেখেছিল।"

"তা হলে তো অনেক ঝামেলা হবে। তাই না ত্রিপি?"

"হলে হবে। ফ্লিকাস সব ঝামেলা দূর করে দেবে।"

নিকি মাথা দুলিয়ে হাসল, বলল, "ঠিকই বলেছ। ফ্লিকাস সব ঝামেলা দূর করে দেবে।"

ত্রিপি বলল, "ফ্লিকাস দেখতে কী সুন্দর, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আরো যেসব বাচ্চারা আসবে তারাও নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর হবে, তাই না নিকি?"

নিকি মাথা নাড়ল, তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, "অন্য বাচ্চারা আরো সুন্দর হোক আর যাই হোক তুমি কিন্তু অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। আমি আর তুমিই কিন্তু বিয়ে করব। ঠিক আছে?"

ত্রিপি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

ক্রিনিটি বাইভার্বালটি ঠিক করল, ফ্লিকাসের সাথে যোগাযোগ করল তারপর তার সাথে দেখা করার জন্যে রওনা দিল। নিকি আর ত্রিপি বাইভার্বালের রেলিং ধরে আনন্দে চিৎকার করে গান গাইতে লাগল। দুজন আগে কখনো গান গায় নি, গান গাওয়া বলে যে একটা ব্যাপার থাকতে পারে সেটাও তারা জানত না, কিন্তু তারপরও তাদের গান গাইতে কোনো সমস্যা হল না।

সারা দিন সারা রাত তারা বাইভার্বাল চালিয়ে গেল। ফ্লিকাস ক্রিনিটিকে যে ঠিকানা দিয়েছে সেখানে তারা যখন পৌঁছাল তখন দুপুর হয়ে গেছে। গাছগাছালি ঢাকা ছোট একটা বাসা। বাসার বাইরে দুই জন রোবট পাহারা দিচ্ছে, তারা হাত তুলে বাইভার্বালটিকে থামাল। একজন রোবট জিজ্ঞেস করল, "কী চাই?"

ক্রিনিটি বলল, "আমরা মহামান্য ফ্লিকাসের সাথে দেখা করতে এসেছি।"

"তোমরা কারা?"

"আমি একজন তৃতীয় মাত্রার রোবট। আমাকে ক্রিনিটি নামে পরিচয় দেওয়া হয়। আমার সাথে দুজন মানবশিশু আছে।"

একটি রোবট অন্য রোবটের দিকে তাকিয়ে বলল, "পৃথিবীতে মানবশিশু বলে কিছু নেই। সব মরে গেছে।"

নিকি কঠিন মুখে বলল, "সবাই মরে নি। আমরা বেঁচে আছি।"

"তোমরা সত্যিকারের মানবশিশু?"

"হ্যাঁ। ফ্লিকাস আমাদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছে আমরা তার সাথে দেখা করতে এসেছি।"

রোবটটি এক ধরনের ঘোলা চোখে তাদের দুজনকে দেখল তারপর বলল, "ঠিক আছে, তোমরা গেটে অপেক্ষা কর। আমরা খোঁজ নিই।"

নিকি ভাবছিল একটা রোবট ভেতরে গিয়ে খোঁজ নেবে কিন্তু তার দরকার হল না। গেটে দাঁড়িয়ে থেকেই কোনো একভাবে খোঁজ নিয়ে নিল তারপর ওদের বলল, "তোমরা ভেতরে যাও, মহামান্য ফ্লিকাস তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

ক্রিনিটি মাটির কাছাকাছি রেখে বাইভার্বালটি বাসার সামনে হাজির করল এবং প্রায় সাথে সাথেই দরজা খুলে ফ্লিকাস বের হয়ে এল। হলোগ্রাফিক স্ক্রিনে তাকে যেটুকু সুদর্শন দেখা গিয়েছিল সে তার থেকে অনেক বেশি সুদর্শন। দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে নিকি আর ত্রিপির দিকে ছুটে যায়, দুজনকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে বলল, "মানুষের পৃথিবীতে তোমাদের আমন্ত্রণ। নিকি আর ত্রিপি তোমাদের জন্যে আমার ভালবাসা আর ভালবাসা।"

এভাবে কেউ আমন্ত্রণ জানালে কী বলতে হয় নিকি আর ত্রিপি কেউই জানে না। তাই দুজনেই হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্লিকাস বলল, "তোমরা অনেক দূর থেকে এসেছ। এখন দ্রুতগামী ট্রেন নেই, জেট নেই, মহাকাশযানও নেই, তোমরা এসেছ সেই আদিম বাইভার্বালে করে। তোমাদের নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয়েছে?"

এবারে নিকি বলল, "না আমাদের কোনো কষ্ট হয় নি।"

ত্রিপি বলল, "আমরা গান গাইতে গাইতে এসেছি।"

"কী মজা! পৃথিবীর সব মানুষকে যখন আমরা একত্র করব তখন প্রথম কাজটি হবে একটা গানের কনসার্ট। কী বল?"

ত্রিপি হাততালি দিয়ে বলল, "কী মজা হবে তখন!"

ফ্লিকাস বলল, "তোমরা হাত-মুখ ধুয়ে কিছু একটা খেয়ে নাও। তোমাদের জন্য আমি কিছু জৈবিক খাবার তৈরি করে রেখেছি।"

নিকি জিজ্ঞেস করল, "অন্য মানবশিশুরা কি এসে পৌঁছেছে?"

"না, তারা এখনো পৌঁছায় নি। কেউ কেউ রওনা দিয়েছে, কেউ কেউ রওনা দেবে।"

ত্রিপি জানতে চাইল, "সব মিলিয়ে কত জন মানবশিশু আছে পৃথিবীতে?"

"কমপক্ষে দুইশ। আরো বেশিও হতে পারে।"

"আমরা সবাই মিলে এক জায়গায় থাকব?"

ফ্লিকাস হাসল, বলল, "অবশ্যই। সারা পৃথিবী খুঁজে আমরা সবচেয়ে সুন্দর জায়গাটা খুঁজে বের করব। একপাশে পাহাড় অন্যপাশে হ্রদ, মাঝখানে থাকবে সবুজ বন। আমরা বাচ্চাদের জন্যে চমৎকার একটা স্কুল বানাব—সেখানে বাচ্চারা হইচই করে পড়বে।

ছোটাছুটি করবে, খেলবে, হ্রদে সাঁতার কাটবে। যখন অন্ধকার হয়ে আসবে আমরা তখন কোথাও একটা আগুন জ্বালাব, সেটাকে ঘিরে আমরা বসব। একজন গিটার বাজাতে বাজাতে গান গাইবে—" কথা বলতে বলতে ফ্রিকাসের চোখে যেন স্বপ্নের ছোঁয়া লাগে। দেখে মনে হয় সে যেন তার চোখের সামনে পুরো দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছে।

নিকি দাঁত বের করে হাসল। বলল, "কী মজা হবে? তাই না?"

"হ্যাঁ অনেক মজা হবে।" হঠাৎ ফ্রিকাসের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা যে শুধু মজা করব তা কিন্তু নয়। আমাদের ওপর তখন থাকবে অনেক বড় দায়িত্ব। অনেক অনেক বড় দায়িত্ব।"

ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "কী দায়িত্ব?"

"মানুষের দায়িত্ব। পৃথিবীর দায়িত্ব। আমাদের সারা পৃথিবীর দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা যে কয়জন মানুষ আছি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাদের দিয়েই আস্তে আস্তে সারা পৃথিবী একসময় মানুষে ভরে উঠবে। ভবিষ্যতের যে পৃথিবী হবে আমরাই হব তার স্থপতি। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে যে মানুষ থাকবে আমরা হব তার পূর্বপুরুষ!"

ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "আর রোবট? রোবটদের কী হবে?"

"রোবটেরাও থাকবে। মানুষকে সাহায্য করার জন্যে রোবটেরা আগেও ছিল, এখনো থাকবে।"

ত্রিপি ভুরু কুঁচকে বলল, "কিন্তু অনেক জায়গায় রোবটেরা সবাই মিলে মানবশিশুকে আটকে রেখেছে।"

"একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।" ফ্রিকাস কঠিন গলায় বলল, "রোবটরা কখনো মানবশিশুকে আটকে রাখতে পারবে না। আমরা সবাই যখন একত্র হব তখন রোবটরা কখনো মানুষের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সাহস পাবে না। মানুষের বুদ্ধিমত্তা রোবটদের বুদ্ধিমত্তা থেকে অনেক বেশি, রোবটেরা কখনোই মানুষের সাথে পারবে না।"

www.amarboi.com

নিকি জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু যদি তারা পঞ্চম মাত্রার রোবট তৈরি করে?"

"পঞ্চম মাত্রার রোবট?" ফ্রিকাসকে একটু চিন্তিত দেখায়, সে ভুরু কুঁচকে বলল, "পঞ্চম মাত্রার রোবট তৈরি করলে আমাদের একটু সতর্ক হতে হবে, তার কারণ পঞ্চম মাত্রার রোবট মানুষ থেকে বেশি বুদ্ধিমান। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা—" ফ্রিকাস কথা শেষ না করে থেমে গেল।

নিকি জিজ্ঞেস করল, "তার চেয়ে বড় কথা কী?"

"তার চেয়ে বড় কথা পঞ্চম মাত্রার রোবটদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার একটা জগৎ আছে। তারা তাদের মতো করে ভাবে। তাদের যদি মনে হয় পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজন নেই, তারাই পৃথিবীকে এগিয়ে নেবে তা হলে তারা পৃথিবী থেকে সব মানুষকে সরিয়ে দিতে পারে।"

নিকির মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল, বলল, "সর্বনাশ! তা হলে কী হবে?"

ফ্রিকাস সহৃদয়ভাবে হাসল, বলল, "তুমি কেন ধরে নিচ্ছ পঞ্চম মাত্রার রোবট তৈরি হয়ে যাচ্ছে! সেটা কি সহজ কাজ নাকি?"

ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "পঞ্চম মাত্রার রোবট দেখতে কেমন হবে?"

ফ্রিকাস মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি না। এখন পর্যন্ত সব রোবট তৈরি হয়েছে মানুষের অনুকরণে, তাদের হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে, চোখ আছে। যেহেতু মানুষ অনেক উন্নত তাই শরীরের ডিজাইনটা হয়েছে মানুষের মতো। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"যখন পঞ্চম মাত্রার রোবট তৈরি হবে তখন তারা হবে মানুষ থেকেও উন্নত। তাই তখন তাদের শরীর মানুষের মতো হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের কাছে যে ডিজাইনটা বেশি কাজের মনে হবে সেভাবে তৈরি করবে। হয়তো—"

"হয়তো কী?"

"মানুষের মতো সামনে দুটি চোখ না থেকে সামনে-পেছনে, ডানে-বামে চোখ থাকবে। দুই পা না থেকে তিনটি কিংবা চারটি পা থাকবে—"

নিকি বলল, "হয়তো মাকড়সার মতো আটটি পা থাকবে—"

ফ্লিকাস আবার মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ, হয়তো আটটি পা থাকবে। শুঁড়ের মতো আঙুল, মস্তিষ্কটি হয়তো শুধু মাথায় না থেকে সারা শরীরে থাকবে। পৃথিবীর নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবার জন্যে এন্টেনা থাকবে। হয়তো অন্ধকারে দেখতে পারবে, হয়তো আঙুলের ডগা দিয়ে তীব্র রেডিয়েশন বের হবে। হয়তো—"

ত্রিপি বলল, "থাক থাক! পঞ্চম মাত্রার রোবটের চেহারার কথা শুনেই আমার গা কেমন কেমন করছে।"

ফ্লিকাস বলল, "ঠিকই বলেছ। শুধু শুধু পঞ্চম মাত্রার রোবটের চেহারা কল্পনা করে লাভ নেই। পঞ্চম মাত্রার রোবট খুব সোজা ব্যাপার নয়। সত্যিই যদি তৈরি হয় তখন দুশ্চিন্তা করা যাবে।"

নিকি বলল, "আমরা এত দুশ্চিন্তা করতে পারব না। যদি দুশ্চিন্তা করতে হয় সেটা করবে তুমি।"

ফ্লিকাস হাসার ভঙ্গি করে বলল, "ঠিক আছে। তোমাকে আর কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। সব দুশ্চিন্তা করব আমি।"

AMARBOI.COM

১১

ফ্লিকাস নিকি আর ত্রিপিকে ঘুম থেকে তুলল, উত্তেজিত গলায় বলল, "এক্ষুনি উঠে যাও। সাংঘাতিক একটা ব্যাপার ঘটেছে।"

"কী ব্যাপার?" নিকি চোখ কচলে বলল, "আরো মানুষ চলে এসেছে?"

"না। তার থেকেও সাংঘাতিক ব্যাপার।"

নিকি আর ত্রিপি তাদের বিছানায় উঠে বসল, "কী সাংঘাতিক ব্যাপার?"

"বলছি, শোনো।" ফ্লিকাস একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "তোমরা তো জান আমি পৃথিবীর সব মানুষকে একত্র করার চেষ্টা করছি। সে জন্যে আমি সারাক্ষণ নেটওয়ার্ক বল, ডাটাবেস বল, আর্কাইভ বল সবকিছু ঘেঁটে ঘেঁটে দেখছি। ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি কী পেয়েছি জান?"

"কী?"

"তোমরা শুনলে বিশ্বাস করবে না।"

নিকি আর ত্রিপি উত্তেজিত মুখে বলল, "আমাদের বল—দেখি বিশ্বাস করি কি না!"

"মানুষের খনি!"

"মানুষের খনি?"

"হ্যাঁ।"

"মানুষের খনি কেমন করে হয়?"

ফ্লিকাস চোখ বড় বড় করে বলল, "পৃথিবীর মানুষ অসম্ভব বুদ্ধিমান। এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা তারা অনুমান করেছিল। তাই তারা মাটির নিচে দুর্ভেদ্য একটা গহ্বরের মাঝে হিমঘরে অনেক মানুষকে শীতল করে রেখে দিয়েছে। যদি কখনো এরকম হয় যে পৃথিবীর সব মানুষ মরে গেছে তা হলে তাদের বাঁচিয়ে তোলা হবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি।" ফ্লিকাস সুন্দর করে হাসল।

"আমরা এখন এই মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে তুলব?"

"হ্যাঁ।"

ত্রিপি ভয়ে ভয়ে বলল, "তারা অন্যদের মতো মরে যাবে না তো?"

ফ্লিকাস মাথা নাড়ল, "না, মারা যাবে না। যে ভাইরাসের কারণে এটা ঘটেছে সেটা শেষ হয়ে গেছে। আর আসতে পারবে না। আমি খোঁজ নিয়েছি।"

নিকি চোখ বড় বড় করে বলল, "তা হলে আমরা একসাথে অনেক মানুষ পাব?"

"হ্যাঁ পাব?"

"সব কি বড় মানুষ?"

"না। তোমাদের মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও আছে।"

"সত্যি?" নিকি আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

"আমরা কখন তাদের জাগিয়ে তুলব?"

ফ্লিকাস বলল, "আমার আর দেরি করার ইচ্ছা করছে না। আমরা এক্ষুনি যাব, এক্ষুনি জাগিয়ে তুলতে শুরু করব।"

ত্রিপি হাততালি দিয়ে বলল, "কী মজা! কী মজা!"

কিছুক্ষণের ভেতর তারা রওনা দিয়ে দেয়। ফ্লিকাস নিকি আর ত্রিপিকে তার নিজের বাইভার্বালে তুলে নিতে চাইছিল কিন্তু ক্রিনিটি তাদের আলাদা যেতে দিল না। ফ্লিকাস প্রথমে একটু আপত্তি করতে চাইছিল। তৃতীয় মাত্রার একটি রোবট দুজন মানবশিশুর দায়িত্ব নিচ্ছে সেটা সে ঠিক মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু নিকি আর ত্রিপি তাকে আশ্বস্ত করল, ক্রিনিটি তৃতীয় মাত্রার একটি রোবট হতে পারে কিন্তু তাদের কাছে ক্রিনিটি একটা আপনজনের মতো।

বাইভার্বালে করে তাদের দীর্ঘ সময় যেতে হল। শেষ পর্যন্ত তারা একটা পাহাড়ের কাছাকাছি হাজির হল। বাইভার্বাল বেশ কিছু ঘোরাপথে উড়ে উপরে একটা পাথুরে জায়গায় হাজির হয়। ফ্লিকাস বাইভার্বাল থেকে নেমে তার মনিটর পরীক্ষা করে হেঁটে হেঁটে একটা খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে। সে নিচু হয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করে, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "এটাই সেই জায়গা।"

নিকি অবাক হয়ে বলল, "কোথায়? কিছু তো নাই।"

"এখানে একটি গোপন দরজা আছে, এটি খুলতে হবে।"

"কোথায় গোপন দরজা?"

"এস খুঁজে দেখি।"

সবাই মিলে খুঁজতে খুঁজতে সত্যি তারা একটি ধাতব রিং খুঁজে পেয়ে যায়। উপর থেকে

ধুলোবালি সরিয়ে রিংটা ধরে টান দিতেই ঘরঘর শব্দ করে চৌকোনা একটা জায়গা খুলে গেল। সেখানে আবছা অন্ধকার, দেখা যাচ্ছে একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে।

ফ্লিকাস বলল, "আমাদের এখন নিচে নামতে হবে। সাবধানে নেমো সবাই। আগে আমি নেমে যাই।"

ফ্লিকাসের পিছু পিছু নিকি, নিকির পেছনে ত্রিপি আর সবার শেষে ক্রিনিটি সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। সিঁড়িটা ঘুরে ঘুরে অনেক নিচে নেমে গেছে। আস্তে আস্তে জায়গাটা অন্ধকার এবং শীতল হয়ে আসে। যখন মনে হচ্ছিল নিচে নামা বুঝি কখনো শেষ হবে না তখন হঠাৎ করে তারা একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেল। নিচে পাথরের মেঝে এবং নিচু ছাদ। কান পেতে থাকলে একটা কম্পন অনুভব করা যায়, বোঝা যায় আশপাশে কোথাও গুমগুম করে একটি ইঞ্জিন চলছে।

ওরা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন খুব ধীরে ধীরে সেখানে একটি ঘোলাটে আলো জ্বলে ওঠে। ভেতরে পাথরের কারুকাজ করা দেয়াল এবং সামনে মেঝে থেকে খানিকটা উঁচুতে একটি গোলাকার বেদি। হঠাৎ করে দেখা গেল সেখানে সাদা কাপড় পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সবাই প্রথমে চমকে ওঠে তারপর বুঝতে পারে মেয়েটি সত্যি নয় একটি হলোগ্রাফিক ছবি।

মেয়েটি চারদিকে একবার তাকাল, তারপর বলল, "আমাদের এই ব্যালকনিতে কিছু দর্শকের উপস্থিতি অনুভব করে আমি তাদের কিছু তথ্য দেওয়ার জন্যে উপস্থিত হয়েছি। এটি একটি অত্যন্ত গোপন স্থাপনা, এখানে কোনোভাবেই কারো উপস্থিত হওয়ার কথা নয়। এটি অত্যন্ত দুর্ভেদ্য একটি স্থাপনা। নিউক্লিয়ার বোমা দিয়েও এটা ভেদ করা সম্ভব নয়। এখানে যে মানুষদের হিমঘরে শীতল করে রাখা হয়েছে তারা ঠিক সময়মতো হিমঘর থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে আসবেন। বাইরের কোনো মানুষ প্রাণী বা যন্ত্রের এখানে এসে সেই প্রক্রিয়াটি প্রভাবান্বিত করার কথা নয়। তারপরও যারা নিজের দায়িত্বে এখানে উপস্থিত হয়েছে আমি তাদের বক্তব্য শুনতে আগ্রহী।"

ফ্লিকাস বলল, "পৃথিবীতে প্রায় সব মানুষ একটা ভাইরাসের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। যে অল্প কয়জন বেঁচে আছে তাদের বড় সংখ্যক হচ্ছে শিশু। তাদের যথাযথভাবে লালন করার জন্যে আমাদের এই মুহূর্তে কিছু বড় মানুষ প্রয়োজন।"

"এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সিস্টেম পৃথিবীর এই দুর্ভাগ্যজনিত পরিণতি সম্পর্কে অবহিত। হিমঘরের মানুষকে দ্রুত জাগিয়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।"

ফ্লিকাস জানতে চাইল, "তারা কবে জেগে উঠবে? কবে বের হয়ে আসবে?"

"এখন থেকে তেত্রিশ দিন পর। তার পরের ব্যাচটি বাহান্ন দিন পর।"

"কোনোভাবেই কি জাগিয়ে তোলার প্রক্রিয়াটি আরেকটু ত্বরান্বিত করা যায় না। আমাদের মানুষের খুব প্রয়োজন।"

"স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়। যদি এর চাইতে তাড়াতাড়ি জাগিয়ে তুলতে হয় তা হলে সেটি ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে করতে হবে।"

"আমরা ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে এটি করতে প্রস্তুত।"

"এটি করতে পারবে শুধুমাত্র সত্যিকারের মানুষ। কোনো রোবট বা কোনো যন্ত্রকে এটি করতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।"

"আমি তোমাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি আমাদের সাথে রোবট থাকলেও যারা মানুষ তারাই দায়িত্ব নেবে।"

"চমৎকার।" মেয়েটি হাসিমুখে বলল, "আমি এখন এখান থেকে চলে যাচ্ছি। যে বা যারা ভেতরে যেতে চায় তাদের একে একে এখানে উপস্থিত হতে অনুরোধ করছি। বিদায়।"

সাদা কাপড় পরা মেয়েটি যেভাবে এখানে হঠাৎ করে উপস্থিত হয়েছিল ঠিক সেভাবে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিকি ফ্লিকাসের দিকে তাকিয়ে বলল, "ফ্লিকাস, তুমি এখন যাও।"

ফ্লিকাস মাথা নাড়ল, বলল, "না। তোমরা দুজন ভেতরে যাও।"

নিকি অবাক হয়ে বলল, "আমরা দুজন?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"বাইরে একজন পাহারা দেয়া দরকার।"

"বাইরে ক্রিনিটি পাহারা দিতে পারবে।"

ফ্লিকাস কঠোর মুখে বলল, "আমি কোনো রোবটকে বিশ্বাস করি না। আমি বাইরে পাহারা দিচ্ছি। তুমি আর ত্রিপি ভেতরে গিয়ে ভেতরের মানুষগুলোকে জাগিয়ে তোলো। মানুষগুলো জেগে উঠে আমাকে দেখে যতটুকু আনন্দ পাবে, তার চাইতে অনেক বেশি আনন্দ পাবে তোমাদের মতো দুজন ফুটফুটে শিশুকে দেখে।"

নিকি অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু—কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে কীভাবে শীতল মানুষগুলোকে জাগিয়ে তুলতে হবে আমরা তার কিছুই জানি না।"

ফ্লিকাস বলল, "জানার প্রয়োজনও নেই। আমি কাজটি সহজ করার জন্যে কয়েকশ মাইক্রো মডিউল এনেছি। মডিউলগুলো প্রোগ্রাম করা আছে। মানুষগুলো একেকটা ক্যাপসুলের ভেতরে আছে। তোমরা এই মাইক্রো মডিউলগুলো একেকটা ক্যাপসুলের গায়ে লাগিয়ে দেবে।"

"আর কিছু করতে হবে না?"

"না। মাইক্রো মডিউলগুলো নিজে নিজে ক্যাপসুলগুলোকে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে জাগিয়ে তুলবে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে আমরা শুধু মাইক্রো মডিউলগুলো একটা একটা করে ক্যাপসুলের গায়ে লাগিয়ে দেব? আর কিছু না?"

ফ্লিকাস হেসে বলল, "হ্যাঁ, আর কিছু না।"

"এই মাইক্রো মডিউলগুলো ক্যাপসুলগুলোকে নিজে নিজে প্রোগ্রাম করে নেবে?"

"হ্যাঁ।"

নিকি মাথা নেড়ে বলল, "তা হলে ঠিক আছে। তা হলে আমরাই পারব। তাই না ত্রিপি?"

ত্রিপি বলল, "হ্যাঁ। অনেক মজা হবে। একটা একটা ক্যাপসুল থেকে যখন মানুষগুলো বের হয়ে আসবে তখন তারা আমাদের দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

নিকি বলল, "আমরা বলব, আমাদের পৃথিবীতে স্বা-গ-ত-ম।"

কিংবা "সু-স্বা-গ-ত-ম!"

ফ্লিকাস বলল, "দেরি কোরো না। বেদির ওপর দাঁড়িয়ে যাও। এই যে মাইক্রো মডিউলের প্যাকেট। সাথে রাখ।"

নিকি আর ত্রিপি ফ্লিকাসের হাত থেকে মাইক্রো মডিউলের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বেদির ওপর দাঁড়াল, প্রায় সাথে সাথেই উপর থেকে দুটি হেলমেট নেমে আসে। দুজনে হেলমেট দুটি মাথায় পরল। প্রায় সাথে সাথেই তারা একটি ভোঁতা শব্দ শুনতে পায়। হঠাৎ করে তারা এক ধরনের কম্পন অনুভব করে এবং চোখের সামনে বিচিত্র এক ধরনের আলো খেলা করতে থাকে। নিকি অবাক হয়ে আবিষ্কার করে সেই শৈশবের কিছু স্মৃতি তার মনে পড়ে যায়, স্মৃতিগুলো আবার মিলিয়ে গিয়ে নূতন স্মৃতি ভেসে আসে। এভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকে। তখন তারা হঠাৎ কেমন জানি বিষণ্ন অনুভব করে। বিষণ্ন অনুভূতিটি আস্তে আস্তে আনন্দে রূপ নেয় তারপর হঠাৎ করে তাদের মনটি ফাঁকা হয়ে যায়।

তখন দুজনেই স্পষ্ট শুনতে পেল কেউ তাদের বলছে, "ট্রাইকিনিওলাল ইন্টারফেস দিয়ে তোমাদের মস্তিষ্ক স্ক্যান করা হয়েছে। তোমরা মানবশিশু। তোমাদের মস্তিষ্কে মানবসমাজ নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক বা ক্ষতিকর পরিকল্পনা নেই। তোমাদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হল। দেয়ালের সবুজ বাতিটি স্পর্শ কর।"

নিকি সবুজ বাতিটি স্পর্শ করার সাথে সাথে ঘরঘর করে ভারী দেয়ালটি খুলে গেল। নিকি আর ত্রিপি সাবধানে ভেতরে পা দেয়, কয়েক পা অগ্রসর হতেই পেছনের দরজাটি শব্দ করে বন্ধ হয়ে সামনের দরজাটি খুলে গেল। এভাবে কয়েকটি দরজা পার হয়ে তারা ভেতরে এসে ঢুকল। ভেতরে খুব ঠাণ্ডা, দুজনে হাত ঘষে একটু উষ্ণ হওয়ার চেষ্টা করে। সামনে বিশাল একটি হলঘর, সেখানে সারি সারি ক্যাপসুল সাজানো। ক্যাপসুলগুলোর ওপর বাতি জ্বলছে। মাথার কাছে ডায়াল সেখানে কিছু সংখ্যার পরিবর্তন হচ্ছে। ভেতরে এক ধরনের চাপা যান্ত্রিক গুঞ্জন।

নিকি ফিসফিস করে বলল, "প্রত্যেকটির ভেতরে একজন মানুষ!"

"জীবন্ত মানুষ।"

"হ্যাঁ।" নিকি ফিসফিস করে বলল, "মানুষগুলো এক্ষুনি জেগে উঠবে, কী মজা!"

ত্রিপি বলল, "মাইক্রো মডিউলগুলো বের কর।"

"হ্যাঁ বের করছি।" নিকি ব্যাগ খুলে ভেতরে হাত দিয়ে কয়েকটা মাইক্রো মডিউল বের করে নিয়ে সেগুলোর দিকে তাকায় এবং হঠাৎ করে তার সারা শরীর আতঙ্কে জমে যায়। ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে নিকি?"

নিকি বিস্ফারিত চোখে মাইক্রো মডিউলটির দিকে তাকিয়ে থাকে—এটি আসলে একটি বিস্ফোরক। জীবন রক্ষাকারী ব্যাগে অন্য অনেক যন্ত্রের সাথে ঠিক এরকম বিস্ফোরক ছিল, ক্রিনিটি তাকে এর ব্যবহার শেখাতে চায় নি। সে জোর করে শিখেছিল। জাতীয় গবেষণাগারে ত্রিপির ঘরে সে এরকম একটি বিস্ফোরক রেখে এসেছিল।

ত্রিপি আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে নিকি? কথা বলছ না কেন?"

নিকি ত্রিপির দিকে তাকিয়ে বলল, "এগুলো মাইক্রো মডিউল নয়। এগুলো টাইমার দেওয়া বিস্ফোরক।"

"বিস্ফোরক? বিস্ফোরক কেন?"

"ফ্লিকাস আসলে সবগুলো মানুষকে মারতে চায়।"

"সবগুলো মানুষকে মারতে চায়? ফ্লিকাস?"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। দেখছ না সব ক্যাপসুলে একটা করে বিস্ফোরক লাগাতে বলেছে। বিস্ফোরকগুলো একসাথে ফাটবে। একসাথে প্রত্যেকটা মানুষ মারা যাবে।"

"সর্বনাশ! ফ্লিকাস কেন সবগুলো মানুষকে মারতে চায়? মানুষ হয়ে মানুষকে কেন মারতে চায়?"

"তার মানে ফ্লিকাস আসলে মানুষ না।"

"ফ্লিকাস তা হলে কী?"

"মনে হয় পঞ্চম মাত্রার রোবট।"

"রোবট?" ত্রিপি চোখ বড় বড় করে বলল, "ফ্লিকাস একজন রোবট?"

"হ্যাঁ। দেখ নি সে নিজে ভেতরে ঢোকে নি। আমাদের পাঠিয়েছে। রোবটদের এখানে ঢোকা নিষিদ্ধ।"

ত্রিপি মাথা নাড়ল, বলল, "কী সর্বনাশ! এখন কী করব?"

"প্রথমে এই বিস্ফোরকগুলোর টাইমার রিসেট করতে হবে যেন কিছুক্ষণ পর নিজে থেকে ফেটে না যায়।"

ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "তুমি জান কেমন করে করতে হয়?"

"জানি, খুব সোজা। পেছনে সবুজ বোতামটা টিপে ধর দেখবে সামনের সময়টা অদৃশ্য হয়ে যাবে। তার মানে টাইমার আর কাজ করছে না।"

"ঠিক আছে। তা হলে দাও একটা একটা করে সবগুলো টাইমার রিসেট করে ফেলি।"

দুজনে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে প্রত্যেকটা বিস্ফোরকের টাইমার রিসেট করে নিল। একটিও যদি রিসেট করতে ভুলে যায়, তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওরা কয়েকবার করে দেখে নিশ্চিত হয়ে নেয়। সবগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে নিকি উঠে দাঁড়ায়। ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "এখন কী করব?"

"বের হয়ে যাই।"

"ফ্লিকাসকে কী বলব?"

"আমি জানি না।"

"আমার মনে হয় মিথ্যে কথা বলতে হবে। সত্যি কথা বললে আমাদের বিপদ হবে।"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। সত্যি কথা বলা যাবে না। কিন্তু কী বলব?"

"আমরা বলব যে আমরা ক্যাপসুলে মাইক্রো মডিউলগুলো লাগিয়ে দিয়েছি।"

"হ্যাঁ। ভাব দেখাব আমরা যেন বুঝতে পারি নি এগুলো মাইক্রো মডিউল না, এগুলো আসলে বিস্ফোরক।"

"হ্যাঁ।" ত্রিপি মাথা নেড়ে বলল, "আমরা বের হয়ে কোনো কথা না বলে সোজা বাইভার্বালে উঠে চলে যাব।"

"হ্যাঁ। আমরা ফ্লিকাসের সাথে কোনো কথা বলব না।" নিকি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এখন কি বের হব?"

"হ্যাঁ।" ত্রিপি বলল, "চল বের হই।"

নিকি ফ্যাকাসে মুখে বলল, "আমার ভয় করছে। ফ্লিকাস যদি এখানকার সব মানুষকে মেরে ফেলতে চায় তা হলে সে তো আমাদেরও মেরে ফেলতে চেষ্টা করবে।"

"ঠিকই বলেছ।"

"কিন্তু আমরা তো ভেতরে বসে থাকতে পারব না। আমাদের তো বের হতে হবে।"

"হ্যাঁ বের হতে হবে।" নিকি কিছুক্ষণ চিন্তা করল তারপর নিচু হয়ে প্যাকেট থেকে কয়েকটা বিস্ফোরক নিয়ে নিল।

ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করছ?"

"কয়েকটা বিস্ফোরক নিচ্ছি।"

"কেন?'

"জানি না। যদি কোনো কাজে লাগে সেজন্যে।"

ত্রিপি ভীত চোখে নিকির দিকে তাকিয়ে রইল। নিকি কঠিন মুখে বলল, "ফ্লিকাসকে আমি এমনি এমনি ছেড়ে দেব না।"

নিকি আর ত্রিপি দরজা ঠেলে বের হয়ে দেখল, দরজার ঠিক সামনে ফ্লিকাস দাঁড়িয়ে আছে। তারা ভয়ে ভয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। ফ্লিকাস ভুরু কুঁচকে বলল, "তোমরা বের হয়ে এসেছ কেন?"

নিকি কী বলবে বুঝতে পারল না, ইতস্তত করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ করে চমৎকার একটা উত্তর পেয়ে গেল, "ভেতরে খুব ঠাণ্ডা। জমে যাচ্ছিলাম।"

ফ্লিকাস বলল, "হিমঘর তো ঠাণ্ডা হবেই।"

"সেজন্যে বাইরে এসেছি।"

ত্রিপিও মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। সেজন্যে বাইরে চলে এসেছি।"

"সবগুলো মাইক্রো মডিউল ক্যাপসুলগুলোতে লাগিয়েছ?"

"হ্যাঁ লাগিয়েছি।"

"সবগুলোতে?"

"হ্যাঁ।"

ফ্লিকাসের মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, নিকির মনে হল হাসিটা খুব ভয়ংকর। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি হাসছ কেন?"

AMARBOI.COM

"আনন্দে।"

"কীসের আনন্দে?"

"মানুষের নাকি খুব বুদ্ধি। কেউ নাকি তাদের হারাতে পারে না। আমি হারিয়েছি।"

ফ্লিকাস কী বলতে চাইছে দুজনেই বুঝে গেল, তারা দুজনেই হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্লিকাস বলল, "তোমরা হচ্ছ নিষ্পাপ শিশু! আমি এই নিষ্পাপ শিশুদের ব্যবহার করে মানুষের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ঘাঁটির প্রত্যেকটি মানুষকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেছি।"

ফ্লিকাস বলল, "আমি জানি তোমরা বিষয়টি বুঝতে চাইছ। বিষয়টি খুবই সোজা। তোমরা ক্যাপসুলে যে মাইক্রো মডিউলগুলো লাগিয়েছ আসলে তার প্রত্যেকটা হচ্ছে একটা করে টাইমার লাগানো বিস্ফোরক।"

নিকি আর ত্রিপি একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, কোনো কথা বলল না। ফ্লিকাস বলল, "টাইমারে তিরিশ মিনিট সময় সেট করা আছে। আর তিরিশ মিনিট পর ভেতরের প্রতিটি ক্যাপসুলে একটা করে বিস্ফোরণ হবে। একটি করে বিস্ফোরণের অর্থ একটি করে মানুষ।" ফ্লিকাস হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল। নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর এক ধরনের হাসি।

ফ্লিকাস একটু এগিয়ে এসে অনেকটা আদরের ভঙ্গিতে নিকির চিবুক স্পর্শ করে বলল, "এখন রয়ে গেলে তোমরা দুজন। যাদের আমার খুঁজে বের করতে হয় নি যারা নিজেরা

এসে আমার হাতে ধরা দিয়েছে। তোমরা মনে হয় এখন আমাকে আর বিশ্বাস করবে না—কিন্তু আসলেই তোমাদের জন্য আমার এক ধরনের মায়া হয়েছে।"

ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমাদের কী করবে?"

"অবশ্যই মেরে ফেলব। কিন্তু এখানে নয়। বাইরে।" ফ্লিকাস বলল, "এই জায়গাটি আমার পছন্দ নয়। এখানে মানুষ মানুষ গন্ধ, মানুষের গন্ধ আমার একেবারে ভালো লাগে না।"

একপাশে ক্রিনিটি দাঁড়িয়ে ছিল, সে এবারে এগিয়ে এসে বলল, "আমি এদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছি। তুমি কিছুতেই এদের ক্ষতি করতে পারবে না। আমি কিছুতেই—"

ক্রিনিটি কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে থেমে গেল, নিকি আর ত্রিপি দেখল, ক্রিনিটির সারা শরীরে অদম্য একটা খিঁচুনির মতো শুরু হয়েছে, সে কথা বলতে পারছে না এবং থরথর করে কাঁপছে। ফ্লিকাস হা হা করে হেসে বলল, "তিন মাত্রার রোবট এসে আমাকে বলছে আমি কী করতে পারব আর কী করতে পারব না! এর চাইতে বড় রসিকতা কী হতে পারে? আমি মুহূর্তের মাঝে তার পুরো সিস্টেম ওভারলোড করে দিতে পারি। দেখেছ?"

নিকি আর ত্রিপি কিছু বলল না। ফ্লিকাস বলল, "চল আমরা বাইরে যাই। এই বদ্ধ ঘর আর ভালো লাগছে না। আমি মানুষ নই, কিন্তু আমার অনেক কিছু মানুষের মতো। যখন আমরা পৃথিবীর শেষ মানুষটিকেও শেষ করে দেব তখন আমাদের আর এই হাস্যকর মানুষের রূপ নিয়ে থাকতে হবে না। মানুষের মতো ভাবতে হবে না। মানুষের মতো কথা বলতে হবে না।"

নিকি অনেকক্ষণ পর এবারে কথা বলল, "তুমি মানুষ না, তুমি পঞ্চম মাত্রার রোবট। তাই না?"

"সেটা তুমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ?"

"না। আমি আগেই বুঝেছি।"

"যথেষ্ট আগে বোঝ নি। তা হলে এত সহজে আমার পরিকল্পনার অংশ হতে না। যাই হোক বাইরে চল। ভেতরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।"

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে নিকি পকেটে হাত দিয়ে পকেটের টাইমারটিতে সময় সেট করে নিল। বিস্ফোরকটি এখন মিনিট পনেরর মাঝে বিস্ফোরিত হবে। এই বিস্ফোরকটি এখন ফ্লিকাসের শরীরের কোথাও লাগিয়ে দিতে হবে। ফ্লিকাস ঢিলেঢালা একটি পোশাক পরেছে, সেখানে অনেকগুলো পকেট, কোনো একটি পকেটে রেখে দিতে পারলেই আর কোনো চিন্তা নেই। কাজটি সহজ নয় কিন্তু নিকি চেষ্টা করবে।

প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সে হঠাৎ ইচ্ছে করে পা পিছলে পড়ে গেল, সিঁড়ি দিয়ে যখন নিচে পড়ে যাচ্ছে তখন ফ্লিকাস তাকে থামাল। নিচু হয়ে তাকে ধরে যখন টেনে সোজা করছিল তখন সে হাত-পা ছুড়ে মুক্ত হবার অভিনয় করার সময় হাঁটুর কাছে পকেটে বিস্ফোরকটি রেখে দিল। নিকি ভেবেছিল ফ্লিকাস বুঝে ফেলবে কিন্তু ফ্লিকাস বুঝতে পারল না।

উপরে এসে ফ্লিকাস অলস পায়ে হেঁটে হেঁটে পাহাড়ের এক কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে সামনে নীলাভ পাহাড়ের মাথায় সাদা বরফের চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "আমার আসলে সত্যিকার একটা প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করার ইচ্ছা করছে। তোমাদের মতন অবুঝ দুটি শিশুকে খুন করার মাঝে কোনো গৌরব নেই, কোনো আনন্দ নেই। আমার মনে হচ্ছে আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে দুটো ফড়িংকে পিষে ফেলছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

নিকি বলল, "তুমি আমাদের কখন মারবে?"

ফ্লিকাস একটু অবাক হয়ে নিকির দিকে তাকাল, বলল, "তোমার কণ্ঠস্বরে ভয় নেই কেন? কণ্ঠস্বরে এক ধরনের উপহাস। কেন?"

নিকি ঠোঁট উল্টে বলল, "তোমার বুদ্ধি মানুষ থেকে অনেক বেশি, তুমি বল।"

ফ্লিকাস বিড়বিড় করে বলল, "একটু আগেও তোমার ভেতরে ভয় ছিল, আতঙ্ক ছিল, এখন নেই। কেন নেই? কী হয়েছে? বল আমাকে?"

নিকি বলল, "ঠিক আছে, আমি বলব, কিন্তু তার আগে আমি ত্রিপির সাথে একটু কথা বলতে চাই।"

ফ্লিকাস কিছুক্ষণ শীতল চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "ঠিক আছে বল।"

"আমি লুকিয়ে কথা বলতে চাই, তুমি যেন শুনতে না পার। দেখতে না পার।"

"ঠিক আছে।"

"আমি আর ত্রিপি ঐ পাথরটার আড়ালে গিয়ে কথা বলতে পারি?"

ফ্লিকাস কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে যাও।"

নিকি ত্রিপির হাত ধরে বড় একটা পাথরের আড়ালে নিয়ে গেল। ত্রিপি জিজ্ঞেস করল, "তুমি আমাকে কী বলবে?"

"আমি কিছুই বলব না।"

"তা হলে এখানে কেন এনেছ?"

"আমি ফ্লিকাসের পকেটে একটি বিস্ফোরক রেখে এসেছি, সেটি এক্ষুনি ফাটবে। সেটি যখন ফাটবে তখন যে বিস্ফোরণ হবে সেটির ঝাপটা থেকে বাঁচার জন্যে এর পেছনে দাঁড়িয়েছি।"

ত্রিপি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে নিকির দিকে তাকিয়ে রইল, বলল, "সত্যি?"

"সত্যি।"

"এন্ড্রোমিডার কসম?"

"এন্ড্রোমিডার কসম।"

"মহাকালের কসম?"

"মহাকালের কসম।"

"আমরা আসলে মরব না?"

"আমরা আসলে মরব না। ফ্লিকাস এক্ষুনি উড়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে।"

নিকি আর ত্রিপি হঠাৎ করে ফ্লিকাসের গলার স্বর শুনতে পেল, "তোমাদের কথা শেষ হয়েছে?"

নিকি মাথা তুলে দাঁড়াল, পাথরের আড়াল থেকে বলল, "হ্যাঁ শেষ হয়েছে।"

"এখন আমাকে বলবে, তোমার কণ্ঠস্বরে কোনো ভয় নেই কেন? মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তোমার এত সাহস কেন?"

"বলব?"

ফ্লিকাস বলল, "বল।"

"দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে মাইক্রো মডিউল যে আসলে টাইমার লাগানো বিস্ফোরক আমরা সেটি জানতাম। তাই আমরা ভেতরে বসে সবগুলো বিস্ফোরককে বিকল করে এসেছি। কোনো ক্যাপসুলে সেগুলো লাগাই নি।"

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্লিকাসের চোখ দুটি ধক করে জ্বলে উঠল, বলল, "কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ। সত্যি বলছি। আমরা বিস্ফোরকগুলো ভেতরে রেখে এসেছি। সেগুলো নিজে থেকে ফাটবে না, তাই কোনো ভয় নেই। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমরা দুটি বিস্ফোরক নিয়ে এসেছি। একটিতে টাইম সেট করে সেটি তোমার পকেটে রাখা হয়েছে। মনে আছে একটু আগে আমি সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়েছিলাম? আসলে সেটি ছিল অভিনয়। যখন হাত–পা ছুড়ছিলাম তখন এক ফাঁকে সেটি তোমার কোনো একটি পকেটে রাখা হয়েছে। তুমি ইচ্ছে করলে সেটি খুঁজে বের করতে পার। তুমি এটি খুঁজে বের করার আগেই সেটি ফাটবে। বিশ্বাস কর।"

ফ্লিকাস অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে নিকির দিকে তাকিয়ে রইল। নিকি বলল, "তুমি বল? পৃথিবীতে কে বেশি বুদ্ধিমান? মানুষ নাকি পঞ্চম মাত্রার রোবট? নিকি নাকি ফ্লিকাস? কে ফড়িংকে পিষে মারছে? তুমি নাকি আমি?"

নিকির কথা শেষ হবার আগে একটি ভয়ংকর বিস্ফোরণে ফ্লিকাস ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তার আগেই নিকি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গেছে, সে অনুভব করল একটি বাতাসের ঝাপটা ফ্লিকাসের ছিন্নভিন্ন দেহ তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছে। একমুহূর্ত পরে নিকি সাবধানে মাথা বের করল, এদিক–সেদিক তাকাল তারপর পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। বাতাসে পোড়া একটা গন্ধ, যেখানে ফ্লিকাস দাঁড়িয়েছিল সেখানে কালো পোড়া বিস্ফোরণের চিহ্ন। চারদিকে ছিন্নভিন্ন যন্ত্রপাতির চিহ্ন, ফ্লিকাসের শরীরের অংশ।

হঠাৎ ত্রিপি চিৎকার করে উঠল, "নিকি!"

"কী হয়েছে?'

"দেখ!" ত্রিপি হাত তুলে দেখাল, নিকি সেদিকে তাকায়। ফ্লিকাসের পোড়া মাথাটি একটা পাথরে আটকে পড়ে আছে, সেটি এখনো নড়ছে। নিকি এগিয়ে গেল, পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সেটিকে নিচে ফেলে দিতেই ফ্লিকাস চোখ খুলে তাকাল। নিকি ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে আসে। গলা থেকে কিছু তার টিউব বের হয়ে এসেছে। সেখান থেকে সাদা কষের মতো কিছু একটা ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছে! তার সোনালি চুল জায়গায় জায়গায় পুড়ে গেছে। মুখের চামড়া উঠে ভেতর থেকে ধাতব কাঠামো বের হয়ে আসছে। নিকি আর ত্রিপিকে দেখে সেই ছিন্ন মাথাটি খলখল করে হাসল, খসখসে গলায় বলল, "তুই ভেবেছিস তুই আমার কাছ থেকে মুক্তি পাবি? পাবি না।"

নিকি সাবধানে এগিয়ে গেল। উবু হয়ে নিচে পড়ে থাকা মাথাটির দিকে তাকাল, বলল, "কী বললে?"

"তোকে হত্যা করার জন্যে যদি আমার নরকেও যেতে হয়, আমি যাব!"

"তুমি? তোমার এই কাটা মাথা?"

"আমি পঞ্চম মাত্রার রোবট! তুই আমাকে এখনো চিনিস নি। তুই এখনো আমার ক্ষমতার পরিচয় পাস নি!"

নিকি ত্রিপির মুখের দিকে তাকাল, বলল, "ত্রিপি এই কাটা মাথাটা কী বলছে? সে আমাকে কেমন করে হত্যা করবে?"

ত্রিপি মাথা নাড়ল, বলল, "আমি জানি না।"

নিকি বলল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু সত্যি সত্যি যেন এই কাটা মাথা হয়েই তুমি আমাকে কামড়ে ধরতে না পার তার ব্যবস্থা করছি!" নিকি তার পকেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে দ্বিতীয় বিস্ফোরকটি বের করে বলল, "এই যে বিস্ফোরকটি দেখছ আমি সেটি তোমার মুখের মাঝে ছেড়ে দেব। তিরিশ সেকেন্ডের মাঝে সেটি বিস্ফোরিত হবে! তোমার এই কাটা মাথাটা আর থাকবে না, সেটাও তখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমি দেখি তখন তুমি কেমন করে আমাকে ধরতে আস!"

ফ্লিকাসের কাটা মাথাটি আবার খলখল করে হাসতে থাকে! নিকি তার মাঝে বিস্ফোরকটি তার মুখে গুঁজে দিয়ে ত্রিপিকে নিয়ে বড় একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মাঝে প্রচণ্ড একটি বিস্ফোরণে পুরো এলাকাটি কেঁপে ওঠে। ফ্লিকাসের খলখল করে হাসির শব্দ হঠাৎ করে থেমে গেল। চারপাশে তখন অত্যন্ত বিচিত্র একটা নৈঃশব্দ্য।

নিকি ত্রিপির হাত ধরে বলল, "চল এখন ক্রিনিটিকে নিয়ে আসি। এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক হয়েছে।"

ত্রিপি বলল, "চল।"

১২

হ্রদের তীরে অনেকগুলো ছোট–বড় পাথর সাজানো। নিকি আর ত্রিপি পাথরগুলোর পাশ দিয়ে গুনতে গুনতে হেঁটে যায়। নিকি গোনা শেষ করে বলল, "আঠারটা।"

নিকির কথা শুনে ত্রিপি হি হি করে হাসল। নিকি বলল, "কী হল তুমি হাসছ কেন?"

"তুমি এমন করে বলছ যেন তুমি জান না যে এখানে আঠারটি পাথর আছে। যেন তুমি আবিষ্কার করেছ এখানে আঠারটি পাথর!"

"জানি তাতে কী হয়েছে? জানা থাকলে কি গোনা যায় না? একশবার গোনা যায়!"

ত্রিপি মাথা নাড়ল, বলল, "সেটা ঠিক। জানা থাকলেও একশবার গোনা যায়।"

"এখন আমরা আঠার নম্বর পাথরটি হ্রদের পানিতে ফেলে দেব, তখন এখানে পাথর হবে সতেরটি! তার মানে—"

"তার মানে আর সতের দিন পর পাহাড়ের গহ্বর থেকে ঘুম ভেঙে মানুষেরা বের হয়ে আসবে।"

নিকি হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছ!" তারপর সে নিচু হয়ে ভারী পাথরটা গড়িয়ে গড়িয়ে হ্রদের দিকে নিয়ে যায়। হ্রদের তীর থেকে সেটাকে ধাক্কা দিতেই পাথরটা ঝপাং করে পানিতে পড়ে হারিয়ে গেল।

ফ্লিকাসের সাথে তারা যখন পাহাড়ের গহ্বরে গিয়েছিল তখন তারা জেনে এসেছিল যে সেখান থেকে তেত্রিশ দিন পর মানুষদের প্রথম ব্যাচটি জেগে উঠবে। তারা তাদের এলাকায় ফিরে এসে তেত্রিশটা নানা আকারের ছোট–বড় পাথর সাজিয়ে রেখেছে। প্রত্যেক দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর দুজন হেঁটে হেঁটে হ্রদের তীরে আসে, তারপর একটা পাথরকে গড়িয়ে গড়িয়ে হ্রদের পানিতে ফেলে দিয়ে আসে। যার অর্থ তাদের অপেক্ষার দিন আরো একটি কমেছে।

নিকি পাথরগুলোর চারপাশে ঘুরে এসে বলল, "আর মাত্র সতের দিন। তারপর আমাদের সাথে থাকবে আরো শত শত মানুষ।"

ত্রিপি মাথা নাড়ল, "শত শত সত্যিকার মানুষ।"

"আমাদের দেখে তারা কী বলবে বলে মনে হয়?"

"মনে হয় একটু অবাক হবে।"

নিকি বলল, "আমাদের সেদিন সুন্দর কাপড় পরে থাকা উচিত। ক্রিনিটি বলেছে সভ্য মানুষেরা সুন্দর কাপড় পরে।"

"আমরা কোথায় পাব সুন্দর কাপড়?"

"ক্রিনিটিকে বলব তৈরি করে দিতে।"

ত্রিপি মাথা নাড়ল, বলল, "শুধু সুন্দর করে কাপড় পরলেই হবে না। আমাদের সুন্দর করে কথাও বলতে হবে। সুন্দর করে ব্যবহার করতে হবে।"

"হ্যাঁ। ক্রিনিটি বলেছে আমরা যখন তাদের সাথে খেতে বসব তখন গপগপ করে খেলে হবে না। একটু একটু করে খেতে হবে। সভ্য মানুষেরা একটু একটু করে খায়।"

ত্রিপি বলল, "আমাদের নখ কেটে ছোট করতে হবে। শুধু অসভ্য মানুষের বড় বড় নখ হয়।"

"হ্যাঁ। চুলগুলো ভালো করে ধুয়ে আঁচড়াতে হবে। সভ্য মানুষের কখনো উসকোখুসকো চুল থাকে না।"

নিকি আর ত্রিপি সভ্য মানুষের আর কী কী থাকতে হয় কী কী থাকতে হয় না সেগুলো আলোচনা করতে করতে হ্রদের বালুকাবেলায় হাঁটতে থাকে। একটা গাছের উঁচু ডালে তখন মিক্কু বসে নিকি আর ত্রিপির দিকে তাকিয়েছিল। তার হাতে একটা রসালো ফল, সেটা কামড়ে কামড়ে খেতে খেতে অস্পষ্ট একটা শব্দ করল। নিকি আর ত্রিপি তখনো শুনতে পায় নি, কিন্তু মিক্কু শুনতে পেয়েছে অনেক দূর থেকে একটা বাইভার্বাল আসছে।

নিকি আর ত্রিপি যখন হ্রদের এক কোনায় একটা বড় গাছের গুঁড়ির কাছে এসে পৌঁছেছে তখন তারা বাইভার্বালের চাপা গর্জনটি শুনতে পেল, তারা অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকায় আর ঠিক তখন দেখতে পায় কুচকুচে কালো একটা বাইভার্বাল আকাশ দিয়ে উড়ে আসছে। বাইভার্বালটি অতিকায় একটা পাখির মতো তাদের মাথার উপর দিয়ে একবার উড়ে যায় তারপর গর্জন করে ধুলো উড়িয়ে কাছাকাছি নেমে আসে।

নিকি আর ত্রিপি বিস্ফারিত চোখে বাইভার্বালটির দিকে তাকিয়ে থাকে, অবাক হয়ে দেখে তার দরজা খুলে সোনালি চুল আর নীল চোখের একজন মানুষ নেমে আসছে। মানুষটি সুদর্শন এবং হাতে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। মানুষটি তাদের দিকে কয়েক পা হেঁটে এসে থেমে গেল, জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ নিকি? ত্রিপি?"

নিকি আর ত্রিপি দুজনেই মানুষটিকে চিনতে পারল, মানুষটি ফ্লিকাস। যে মানুষটিকে তারা বিস্ফোরক দিয়ে মাত্র কিছু দিন আগে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

ফ্লিকাস হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি অবহেলার ভঙ্গিতে হাত বদল করে বলল, "মনে আছে নিকি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে খুঁজে বের করতে যদি আমাকে নরকেও যেতে হয় আমি সেখানে যাব? আমি এসেছি।"

নিকি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু–কিন্তু–"

"আমি বুঝতে পারছি, তুমি কী জানতে চাইছ! তুমি জানতে চাইছ আমাকে বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবার পরও আমি কীভাবে ফিরে এসেছি। তাই না?"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"তুমি ভুলে গিয়েছিলে আমি হচ্ছি পঞ্চম মাত্রার রোবট। পঞ্চম মাত্রার রোবট পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যান্ত্রিক আবিষ্কার। প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় উদাহরণ। কেউ এত বড় একটা জিনিস মাত্র একটি তৈরি করে না। কমপক্ষে দুটি তৈরি করে। তাই পৃথিবীতে ফ্লিকাস

একজন ছিল না, ছিল দুজন। তুমি যখন প্রথম জনকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলে তখন তার কপোট্রনের সকল তথ্য দ্বিতীয় ফ্লিকাসের কপোট্রনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই ফ্লিকাসের শরীরটা ধ্বংস হয়েছে কিন্তু ফ্লিকাস ধ্বংস হয় নি। বুঝেছ?"

নিকি হতচকিতভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

ফ্লিকাস হ্রদের নরম বালুকাবেলায় অন্যমনস্কভাবে কয়েক পা হেঁটে গাছের বড় একটা গুঁড়িতে বসে। এক ধরনের বিষণ্ন গলায় বলে, "বুঝলে নিকি আর ত্রিপি। আমি খুব নিঃসঙ্গ প্রাণী। আমি জানি তোমরা আমাকে প্রাণী হিসেবে মেনে নেবে না, তোমরা বলবে আমি একটা যন্ত্র। কিন্তু আমি আসলে একটা প্রাণী। সত্যিকারের প্রাণী থেকেও আমি বেশি প্রাণী বুঝেছ?"

ফ্লিকাস অস্ত্রটি হাত বদল করে বলল, "আমাকে ডিজাইন করতে পাঁচ বছর সময় লেগেছে। যখন দেখেছে পৃথিবীতে আর মানুষ নেই, তখন পৃথিবীর দায়িত্ব নেবার জন্যে আমাদের প্রজন্মকে ডিজাইন করা হয়েছে। মানুষের যে সীমাবদ্ধতা ছিল আমাদের সেই সীমাবদ্ধতা নেই। সেই সীমাবদ্ধতা কী জান?"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"মানুষের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে তাদের অযৌক্তিক ভালবাসা। যেখানে ভালবাসার কারণে তাদের ক্ষতি হতে পারে সেখানেও তারা ভালবাসে। মানুষ মানুষকে ভালবাসে, যন্ত্রকে ভালবাসে। বনের পশুকে ভালবাসে, কীটপতঙ্গকে ভালবাসে এমনকি গাছের পাতাকেও ভালবাসে।"

নিকি জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কাউকে ভালবাস না?"

ফ্লিকাস কঠিন চোখে নিকির দিকে তাকাল, বলল, "অবশ্যই ভালবাসি। আমাদের কপোট্রনের তুলনায় তোমাদের মস্তিষ্ক হচ্ছে একটা ছেলেমানুষি খেলনা। তোমাদের যেটুকু ভালবাসার ক্ষমতা, আমাদের ভালবাসা তার থেকে হাজার গুণ বেশি! কিন্তু আমাদের ভেতর অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর ভালবাসা নেই।"

নিকি কোনো কথা বলল না। ফ্লিকাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "শুধু ভালবাসা নয়—আমাদের কপোট্রনে অনেক নূতন নূতন অনুভূতি আছে যেটা তোমাদের নেই।"

নিকি জিজ্ঞেস করল, "সেগুলো কী?"

"তোমাদের বললে তোমরা সেগুলো বুঝবে না।"

"কেন বুঝব না?"

"তুমি কি একটা পিঁপড়াকে বিশুদ্ধ সিম্ফোনি শুনতে কেমন লাগে সেটি বোঝাতে পারবে?"

নিকি মাথা নাড়ল। বলল, "না।"

"এটাও সেরকম।"

নিকি বলল, "ও।"

"আমি জানি তোমরা বাচ্চা মানুষ, আমার কথা বুঝবে না। তবু বলি—আমার কেন জানি কথা বলতে ইচ্ছে করছে। যেমন মনে কর ভালবাসা এবং ঘৃণা। তোমাদের কাছে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার তাই না?"

নিকি অনিশ্চিতের মতো বলল, "হ্যাঁ।"

"যেটাকে তুমি ভালবাস সেটাকে তুমি ঘৃণা করতে পার না। কিন্তু আমরা পারি। আমরা কোনো কিছুকে ভালবাসতে পারি। কোনো কিছুকে ঘৃণা করতে পারি। আবার কোনো

কিছুকে একই সাথে ঘৃণাও করতে পারি ভালবাসতেও পারি। দুটিই সমান সমান। দুটিই তীব্র।"

ত্রিপি জানতে চাইল, "সেটার নাম কী?"

"তোমাদের ভাষায় এর কোনো নাম নেই, আমরা বলি রিভাল। রিভালের মতো আরেকটা অনুভূতির নাম হচ্ছে যিগ্ধা।"

"যিগ্ধা? সেটা কী"

"কোনো কোনো মানুষের মাঝে সেটা থাকে। মানুষ সেটাকে মনে করে অপরাধ। আমাদের কাছে এটা অপরাধ না। এটা আমাদের কাছে খুবই স্বাভাবিক একটা অনুভূতি।"

নিকি কিংবা ত্রিপি কোনো কথা বলল না। ফ্লিকাস একটু চুপ করে থেকে বলল, "এই অনুভূতিটা হচ্ছে অন্য কাউকে যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পাওয়া। আমাদের ভেতর সেটা আছে। আমাদের যখন প্রয়োজন হয় তখন আমরা অন্যকে যন্ত্রণা দিতে পারি, দিয়ে তীব্র আনন্দ পেতে পারি। আমি এখানে এসেছি যিগ্ধা উপভোগ করতে।"

নিকি এবং ত্রিপি শিউরে উঠল, কিন্তু কিছু বলল না, ফ্লিকাসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ফ্লিকাস গাছের গুঁড়ি থেকে উঠে এসে কয়েক পা হ্রদের দিকে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ হ্রদের পানির দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর আবার নিকি আর ত্রিপির দিকে ফিরে আসে। কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে, আস্তে আস্তে নরম, প্রায় বিষণ্ন গলায় বলল, "নিকি তুমি একজন অসাধারণ মানবশিশু। আমার মতন একজন পঞ্চম মাত্রার রোবটকে তুমি হত্যা করেছ! আমাদের ইতিহাসে সব সময় তোমার নাম লেখা থাকবে। তুমি যে নিষ্ঠুরতায় আমাকে হত্যা করেছ আমাকে তার সমান নিষ্ঠুরতায় তোমাকে হত্যা করতে হবে। যতক্ষণ সেটা না করব পঞ্চম মাত্রার রোবটদের সম্মান ফিরে আসবে না।" ফ্লিকাস নিকির দিকে তাকিয়ে বলল, "নিকি! সারা পৃথিবীতে কি কেউ আছে যে তোমাকে আর তোমার এই বান্ধবীকে এখন রক্ষা করতে পারবে?"

নিকি কোনো কথা বলল না। ফ্লিকাস বলল, "নেই! পাহাড়ের গহ্বরের মানুষগুলো জেগে উঠবে সতের দিন পর। আমি তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় ধ্বংস করতে পারি নি, কিন্তু জেগে ওঠার পর ধ্বংস করব! সেই মানুষগুলো তোমাদের রক্ষা করতে আসতে পারবে না। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে মানুষগুলো আছে তাদের মতো অসহায় জীব এই সৃষ্টিজগতে নেই! তাদের অনেকে বড় হয়েছে বনের পশুর মতো, তাদের কোনো অনুভূতি নেই, কোনো ভাষা নেই। আমি খুঁজে বের করে তাদের একজন একজন করে হত্যা করব। এখন তারা হয়তো কেউ কেউ বেঁচে আছে কিন্তু তারা তোমাদের বাঁচানোর জন্যে আসতে পারবে না। তা হলে এই মুহূর্তে তোমাদের কে বাঁচাতে আসবে? কে?"

"ক্রিনিটি।"

"হ্যাঁ। ক্রিনিটি।" ফ্লিকাস মাথা নাড়ল। "তোমাদের গলায় মাদুলি ঝোলানো আছে সেটি আসলে একটি পঞ্চম মাত্রার ট্রাকিওশান। সে যেই মুহূর্তে জানতে পেরেছে আমি এসেছি সেই মুহূর্তে কিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসছে। তার ভেতরে কোনো অনুভূতি নেই। সে তৃতীয় মাত্রার তুচ্ছ একটা রোবট। তার ভেতরে ভালবাসা নেই, স্নেহ মমতা নেই, রিভাল নেই, যিগ্ধা নেই। আছে শুধু কিছু বাঁধাধরা নিয়ম। সেই নিয়ম পালন করার জন্যে সে ছুটে আসছে। আমি ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে তাকে বিকল করে বনের মাঝখানে দাঁড়া করিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু আমি তাকে আসতে দিয়েছি। কেন তাকে আমি আসতে দিয়েছি তোমরা জান?"

নিকি আর ত্রিপি মাথা নাড়ল, বলল, "না, জানি না।"

"আমি তাকে আসতে দিয়েছি কারণ, আমি চাই সে এখানে থাকুক। যখন আমি তোমাদের হত্যা করব তখন সে এই পুরো দৃশ্যটা দেখুক। তার কপোট্রনে সেটা জমা থাকুক, সেখান থেকে পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক। বুঝেছ?"

নিকি আর ত্রিপি মাথা নেড়ে বলল, তারা বুঝেছে।

ফ্লিকাস তার হাতের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটির ম্যাগাজিনটা একবার খুলে আবার লাগিয়ে পরীক্ষা করল। তার লেজার সংকেতটি একবার জ্বালিয়ে দেখল তারপর বলল, "বুঝেছ নিকি, তুমি আমাদের অনেক বড় ক্ষতি করেছ। এতটুকু একজন মানুষ হয়ে পঞ্চম মাত্রার রোবটের এত বড় ক্ষতি করা সম্ভব আমি বিশ্বাস করি নি। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে হয়েছে। পাহাড়ের গহ্বরের মানুষগুলো জেগে ওঠার আগেই আমার মেরে ফেলার কথা ছিল—তোমার জন্য পারি নি। এত ছোট বাচ্চা মাইক্রো মডিউল আর বিস্ফোরকের পার্থক্যটুকু জানে সেটি আমাদের জানা ছিল না।

"এখন মানুষগুলোকে মারতে হবে গহ্বর থেকে বের হবার সময়। কাজটি কঠিন নয় কিন্তু কাজটি পরিচ্ছন্নও নয়। আমরা অপরিচ্ছন্ন কাজ করতে চাই না—তোমার জন্যে করতে হচ্ছে। শুধুমাত্র তোমার জন্যে।"

ফ্লিকাস একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "শুধু যে গহ্বরের ভেতরের মানুষগুলোকে মারতে দাও নি তা নয়, তুমি আমাকেও ধ্বংস করেছ! ওরে মূর্খ মানবশিশু, তুমি জান তুমি কত বড় ক্ষতি করেছ? জানার কথা নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান প্রযুক্তির আবিষ্কারটি তুমি এভাবে ধ্বংস করে দিলে? কেন?"

নিকি বলল, "তুমি কেন সব মানুষকে হত্যা কর?"

"বিবর্তনের কারণে একসময় মানুষ পৃথিবীর দায়িত্ব নিয়েছিল। এখন মানুষ নেই, এখন আমাদের পৃথিবীর দায়িত্ব নিতে হবে। যে দু–চার জন মানুষ আছে তারা এক ধরনের যন্ত্রণা—তাই আমরা তাদের হত্যা করছি। এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। যে সবল সে টিকে থাকবে, তার টিকে থাকার জন্যে অন্যদের সরে যেতে হবে। এটাই বিবর্তন।"

ঠিক এরকম সময় বনের ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে ক্রিনিটি এসে হাজির হল, তার হাতের অস্ত্রটি দোলাতে দোলাতে বলল, "না, না তুমি কিছুতেই নিকি আর ত্রিপির ক্ষতি করতে পারবে না।"

ফ্লিকাস এক ধরনের কৌতুকের ভঙ্গি করে বলল, "আমি তাদের ক্ষতি করব না, তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব।"

ক্রিনিটি দুই হাত বিস্তৃত করে বলল, "না, তুমি সেটা করতে পারবে না। আমি তোমাকে সেটা করতে দেব না।"

ফ্লিকাস হা হা করে হাসল, বলল, "তৃতীয় মাত্রার একটি রোবট পঞ্চম মাত্রার একটি রোবটকে হুমকি দিচ্ছে? পৃথিবীতে এর চাইতে বড় রসিকতা কি কিছু হতে পারে?"

ক্রিনিটি বলল, "নিকির মা আমার হাতে নিকিকে তুলে দিয়েছিল, আমাকে বলেছিল তাকে দেখেশুনে রাখতে—"

ফ্লিকাস তার হাতের অস্ত্রটি ক্রিনিটির দিকে তাক করে ট্রিগার টেনে ধরে, প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দে ক্রিনিটির যন্ত্রসহ হাতটি ভস্মীভূত হয়ে উড়ে যায়। বিস্ফোরণের ঝাপটায় ক্রিনিটি বালুকাবেলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। নিকি আর ত্রিপি ক্রিনিটির কাছে ছুটে যাচ্ছিল তখন ফ্লিকাসের যন্ত্রটি আবার গর্জে ওঠে এবং সাথে সাথে ক্রিনিটি মাটিতে আছড়ে পড়ল।

তার পায়ের পাতা উড়ে গিয়ে সেখান থেকে পোড়া তার টিউব আর যন্ত্রপাতি বের হয়ে এসেছে। ক্রিনিটি মাটি থেকে ওঠার চেষ্টা করতে করতে একবার নিকির দিকে তাকাল, বলল, "নিকি, আমি মনে হয় তোমাকে উদ্ধার করতে পারব না।"

ফ্লিকাস মাথা নাড়ল, বলল, "না। তুমি পারবে না। আমি ইচ্ছে করলেই তোমার পুরো সিস্টেম বিকল করে দিতে পারি কিন্তু করি নি। আমি চাই তুমি পরের দৃশ্যটি দেখ।"

নিকি ক্রিনিটির কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তোমার ব্যথা লাগছে ক্রিনিটি?"

"না আমার ব্যথা লাগছে না। আমার ব্যথা লাগার ক্ষমতা নেই। শুধু আমার সার্কিটে চাপ পড়ছে তাই সেটা জোর করে চালু করে রাখতে হচ্ছে কতক্ষণ রাখতে পারব আমি জানি না।"

নিকির চোখে হঠাৎ পানি এসে গেল, সে ক্রিনিটির শরীরে হাত বুলিয়ে বলল, "আমি দুঃখিত ক্রিনিটি। আমি খুবই দুঃখিত। আমার জন্যে তোমার এত কষ্ট হচ্ছে—"

ঠিক তখন কঁ কঁ করে ডাকতে ডাকতে কিকি মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। নিকি উপরে তাকাল, বলল, "কিকি আমাদের খুব বিপদ। খুব বড় বিপদ। এই লোকটা ক্রিনিটিকে মেরে ফেলছে।"

কিকি কঁ কঁ করে ডাকতে ডাকতে বনভূমির দিকে উড়ে গেল।

ফ্লিকাস মুখে এক ধরনের কৌতুকের হাসি নিয়ে পুরো দৃশ্যটি দেখছিল, সে এবারে হা হা করে হেসে বলল, "চমৎকার একটি নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে! তৃতীয় মাত্রার একটি রোবট আহত এবং তার জন্যে সমবেদনায় মানবশিশুর চোখে অশ্রুজল! শুধু তাই নয়, সে এই দুঃখের কাহিনীটা বলছে কালো কুৎসিত একটা পাখিকে।" ফ্লিকাস হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেলে, দেখতে দেখতে তার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, সে হিংস্র চোখে নিকির দিকে তাকিয়ে বলল, "নিকি, বল এই পৃথিবীটা কার? রোবটের না মানুষের? তোমার না আমার?"

"আমার।"

"যদি তোমার হয় তা হলে কে তোমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে?"

নিকি কোনো কথা বলল না, স্থির চোখে ফ্লিকাসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্লিকাস খুব ধীরে ধীরে তার অস্ত্রটি উপরে তুলে ধরে সেটি নিকির বুকের দিকে তাক করে হিস হিস করে বলল, "কে তোমাকে রক্ষা করবে নিকি? ত্রিপি? কে তোমাদের রক্ষা করবে?"

নিকি কোনো কথা বলল না। ফ্লিকাস শীতল গলায় বলল, "আমার কথার উত্তর দাও, যদি এই পৃথিবীটা তোমার হয় তা হলে এই পৃথিবীর কে তোমাকে রক্ষা করতে আসবে? কে?"

খুব ধীরে ধীরে নিকির মুখে হাসি ফুটে উঠল, সে নিচু গলায় বলল, "আমার বন্ধুরা।"

ফ্লিকাস অবাক হয়ে বলল, "তোমার বন্ধুরা? তারা কোথায়?"

"আসছে। তারা আসছে।"

"কোথা থেকে আসছে?"

"তাকিয়ে দেখ।"

ফ্লিকাস তাকাল, দেখল বনভূমির উপর থেকে পাখি উড়ে আসছে। একটি দুটি পাখি নয়, হাজার হাজার পাখি লক্ষ লক্ষ পাখি। তাদের লাল চোখ। ধারালো ঠোঁট। তারা তাদের শক্তিশালী পাখা বাতাসে ঝাপটা দিতে দিতে উড়ে আসছে। তারা স্থির নিশ্চিত জানে তাদের কী করতে হবে। তাদের ভেতরে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

ফ্লিকাস হতবুদ্ধির মতো তার অস্ত্রটি পাখির দিকে তুলে ধরল, একবার ট্রিগার টেনে ধরার জন্যে দুর্বলভাবে চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই লক্ষ লক্ষ পাখি ফ্লিকাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের তীক্ষ্ণ ধারালো ঠোঁট দিয়ে তারা ফ্লিকাসের চোখে, মুখে, দেহে আঘাতের পর আঘাত করতে শুরু করেছে।

ফ্লিকাস একটা আর্তনাদ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাখি তাকে ঘিরে রইল, আঘাতের পর আঘাত করে তাকে মাটি থেকে উঠতে দিল না। ফ্লিকাসের কাতর আর্তনাদ পাখিদের তীক্ষ্ণ চিৎকারে চাপা পড়ে গেল।

পাখিগুলো যখন উড়ে গেল তখন নিকি আর ত্রিপি এগিয়ে যায়। ছিন্নভিন্ন কিছু দুমড়ে মুচড়ে থাকা ধাতব যন্ত্রপাতির অবশিষ্টাংশ ছাড়া আর কিছু নেই। নিকি ভয়ে ভয়ে এদিক-সেদিক তাকাল, তার মনে হল হঠাৎ করে ফ্লিকাসের ছিন্ন মাথা বুঝি খলখল করে হেসে উঠবে। কিন্তু কেউ খলখল করে হেসে উঠল না।

নিকি ত্রিপির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। ত্রিপি তাকে জাপটে ধরে বলল, "নিকি আমরা বেঁচে গেছি।"

"হ্যাঁ। পৃথিবীতে আমরা থাকব।"

তাদের মাথার উপর দিয়ে কিকি কঁ কঁ শব্দ করে উড়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে তার ঘাড়ের ওপর বসল। নিকি আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "কিকি যখন সব মানুষেরা আসবে তখন আমি তাদের বলব তোমাকে আর তোমার পাখির দলকে মেডেল দিতে।"

কিকি বলল, "কঁ কঁ।"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "না বোকা। মেডেল খাবার জিনিস না।"

AMARBOI.COM

কিকি উড়ে যাবার পর নিকি ক্রিনিটির কাছে গিয়ে বসে, তার দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যাওয়া হাত-পায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "ক্রিনিটি তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আমি আর ত্রিপি গিয়ে বাইভার্বালটি নিয়ে আসছি। তোমাকে নিয়ে যাব। তোমাকে আবার আমরা নতুনের মতো করে ফেলব।"

১৩ শেষ কথা

বিশাল কালো টেবিলের একপাশে মাঝবয়সী একজন মহিলা বসে আছেন, তার সামনে একটা ক্রিস্টাল রিডার। তার কাছাকাছি আরো বেশ কিছু নানা বয়সী মানুষ। টেবিলের অন্যপাশে নিকি চুপ করে বসে আছে।

মাঝবয়সী মহিলা হাত দিয়ে তার চুলগুলোকে পেছনে সরিয়ে বলল, "নিকি। ক্রিনিটি নামে যে রোবটটি তোমার দেখাশোনা করত সে তার দিনলিপি আমাদের দিয়েছে। তোমাকে কীভাবে বড় করা হয়েছে তার সব খুঁটিনাটি সেখানে আছে। বিশেষ করে পঞ্চম মাত্রার রোবটের ষড়যন্ত্র তুমি যেভাবে বানচাল করেছ, যেভাবে তাদের ধ্বংস করে পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করেছ সেই বিষয়গুলো আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। তোমার চিন্তাভাবনার ধরন, কাজের প্রকৃতি, বাস্তব বুদ্ধি, ধৈর্য এবং সাহস দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি।"

নিকি চুপ করে কথাগুলো শুনল, কোনো উত্তর দিল না। মাঝবয়সী মহিলা চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই জান পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হিমঘরে লুকিয়ে রাখা মানুষদের জাগিয়ে তোলা শুরু হয়েছে। দেখতে দেখতে আমরা কয়েক হাজার মানুষের একটা সম্প্রদায় হয়ে যাব। এই মানুষদের জীবন পদ্ধতি পরিচালনার জন্যে আমাদের একটা সুপ্রিম কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজন। সেখানে এগার জন সদস্য থাকবে, আমরা তোমাকে তার একজন সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিতে চাই। যদিও তোমার বয়স মাত্র সাত কিন্তু আমরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছি যে তোমার মানসিক পরিপক্বতা আমাদের সমান সমান। আশা করছি তুমি আমাদের জন্যে এই দায়িত্বটি পালন করবে।"

নিকি বলল, "আমি?"

মহিলাটি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "হ্যাঁ তুমি। পৃথিবীতে মানুষকে ঠিকভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা কি নিউক্লিয়ার শক্তি ব্যবহার করব না নবায়নশীল শক্তির দিকে যাব। মহাকাশ গবেষণায় কতটুকু শক্তি দেব, শিক্ষা কীভাবে হবে, পরিবেশের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে—সব ব্যাপারে তোমার মতামত নিতে হবে। তোমাকে পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা দেওয়া হবে। তুমি সব ধরনের সহযোগিতা, বাসভবন—"

নিকি মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, "তোমাদের সাহায্য করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমি তো খুব ব্যস্ত, তাই তোমাদের সময় দিতে পারব না।"

মধ্যবয়স্কা মহিলাটি ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি কী নিয়ে ব্যস্ত?"

"হ্রদের উপরে একটা গাছ থাকে আমরা একটা মোটা দড়ি ঝুলিয়েছি, সেই দড়ি ধরে ঝুল খেয়ে আমরা পানিতে লাফ দিই। ভারি মজা হয় তখন। আগে তো শুধু আমি আর ত্রিপি ছিলাম—এখন আমাদের সাথে কুশ, টিশান, রিহা, ক্রন, নুশা, রিশ, ক্রিপাল এরা সবাই আছে। এখন আরো অনেক বেশি মজা হয়। সে জন্যে খুব ব্যস্ত।"

মধ্যবয়স্কা মহিলাটি বিস্ফারিত চোখে নিকির দিকে তাকিয়ে রইল, আস্তে আস্তে বলল, "গাছ থেকে দড়ি—"

নিকি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। মাঝে মাঝে খুব ঝামেলা হয়। কুশ হচ্ছে অসম্ভব দুষ্টু, সেদিন রিহাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিয়েছে। অনেক রকম সমস্যা।"

"অনেক রকম সমস্যা?"

"হ্যাঁ। সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

মধ্যবয়স্কা মহিলা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ নিকি, আমি বুঝতে পারছি তুমি খুবই ব্যস্ত এবং তোমাকে অনেক ধরনের সমস্যার সমাধান করতে হয়। আমরা তা হলে তোমাকে আটকে রাখব না।"

নিকি লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে বলল, "আমি কি তা হলে যেতে পারি?"

"হ্যাঁ। তুমি যেতে পার।"

নিকি বলল, তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। তারপর কেউ কিছু বোঝার আগে দরজা খুলে ছুটে বের হয়ে গেল। ঘরের সবাই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, দেখল সাত বছরের একটা শিশু মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে সে তার শার্ট খুলে হাতে ধরে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে চিৎকার করে করে নাড়ছে, তার সজীব দেহ সূর্যের আলোতে চকচক করছে।

ঘরের ভেতর বসে থাকা মানুষগুলো একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মতো একটু হাসল। কমবয়সী একজন বলল, "আমরা মনে হয় এখনো বেঁচে থাকার অর্থ কী সেটা বুঝে উঠতে পারি নি।"

মধ্যবয়স্কা মহিলাটি বলল, "না। বুঝে উঠতে পারি নি।"

"এই ছেলেটা পেরেছে।"

"হ্যাঁ। এই ছেলেটা পেরেছে।"

ক্রিনিটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে একটা উঁচু টিবির উপর দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে থাকে। হ্রদের উপর একটা গাছ থেকে মোটা একটা দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে ঝুলে ঝুলে অনেকগুলো শিশু পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এত দূর থেকেও তাদের আনন্দ ধ্বনি স্পষ্ট শোনা যায়।

ক্রিনিটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিশুগুলোকে দেখে। একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার কোনো অর্থ নেই। কিন্তু ক্রিনিটি সরে যেতে পারে না, সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে। বিশেষ করে যখন নিকির একটা উল্লাস ধ্বনি শুনতে পায় তার ভেতরে কোনো একটা কিছু ঘটে যায়।

কী ঘটে সে বুঝতে পারে না। সম্ভবত তার কপোট্রনে কোনো এক ধরনের ক্রটি ঘটেছে।

নিকি বলে এই ক্রটির নাম হচ্ছে ভালবাসা। নিকি নেহাত ছেলেমানুষ, শুধু তার মুখ থেকেই এরকম পুরোপুরি যুক্তিহীন, অর্থহীন, হাস্যকর এবং ছেলেমানুষি কথা শোনা সম্ভব।

শুধু তার মুখ থেকেই।

AMARBOI.COM

প্রতিজ্ঞা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

সিঁড়ি দিয়ে বেশ কয়েকটা মেয়ে হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে নেমে আসছে, রাফি একটু সরে গিয়ে তাদের জায়গা করে দিল। মেয়েগুলো রাফিকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে হাসতে হাসতে নিচে নেমে গেল, তাকে ভালো করে লক্ষও করল না। লক্ষ করার কথা নয়—সে আজ প্রথম এই ডিপার্টমেন্টে লেকচারার হিসেবে যোগ দিতে এসেছে, মাত্র ডিগ্রি শেষ করেছে, তার চেহারায় এখনো একটা ছাত্র-ছাত্র ভাব, তাই তাকে ছেলেমেয়েরা আলাদাভাবে লক্ষ করবে, সেটা সে আশাও করে না। দোতলায় উঠে করিডর ধরে সে হাঁটতে থাকে, ছেলেমেয়েরা ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গল্পগুজব করছে, সাহসী একটা মেয়ে নির্বিকারভাবে রেলিংয়ে পা তুলে বসে আছে। তাকে কেউ চেনে না, তাই কেউ তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিল না, রাফি ছেলেমেয়েদের মাঝখানে জায়গা করে করে সামনের দিকে হেঁটে যায়।

করিডরের শেষ মাথায় হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টের রুম। দরজাটা খোলা, রাফি পর্দা সরিয়ে মাথা ঢুকিয়ে একনজর দেখল। বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলে পা তুলে দিয়ে প্রফেসর জাহিদ হাসান তাঁর চেয়ারে আধা শোয়া হয়ে একটা বই দেখছেন। রাফি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "আসতে পারি, স্যার?"

AMARBOI.COM

প্রফেসর জাহিদ হাসান চোখের কোনা দিয়ে তাকে দেখে আবার বইয়ের পাতায় চোখ ফিরিয়ে বললেন, "আসো।"

রাফি বুঝতে পারল, প্রফেসর জাহিদ হাসান তাকে চিনতে পারেন নি। সে এগিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "স্যার, আমি রাফি আহমেদ।"

প্রফেসর জাহিদ হাসান বই থেকে চোখ না তুলে বললেন, "বলো রাফি আহমেদ, কী দরকার?"

"স্যার, আমি এই ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে এসেছি।"

প্রফেসর হাসান হঠাৎ করে তাকে চিনতে পারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি টেবিল থেকে পা নামালেন এবং খুব একটা মজা হয়েছে, সে রকম ভঙ্গি করে বললেন, "আই অ্যাম সরি, রাফি! আমি ভেবেছি, তুমি একজন ছাত্র!"

রাফি মুখে একটু হাসি-হাসি ভাব ধরে রাখল। প্রফেসর জাহিদ হাসান হঠাৎ ব্যস্ত হওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, "বসো, বসো রাফি, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

রাফি সামনের চেয়ারটায় বসে। চোখের কোনা দিয়ে প্রফেসর জাহিদ হাসানের অফিস ঘরটি দেখে। বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটি কাগজপত্র, বই-খাতায় বোঝাই, সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই। শুধু যে টেবিলে বই-খাতা, কাগজপত্র তা নয়, প্রায় সব চেয়ারেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই, খাতাপত্র রয়েছে। পাশে ছোট একটা টেবিলে একটা কম্পিউটার, পুরোনো সিআরটি মনিটর। চারপাশে শেলফ এবং সেখানে নানা রকম বই। শেলফের ওপর কিছু কাপ, শিল্ড আর ক্রেস্ট। ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা দৌড়ঝাঁপ করে সম্ভবত এগুলো পেয়েছে।

প্রফেসর জাহিদ হাসান বললেন, "তুমি কখন এসেছ? কোনো সমস্যা হয় নি তো?"

"সকালে পৌঁছেছি। কোনো সমস্যা হয় নি।"

"কোথায় উঠেছ?"

"গেস্ট হাউসে।"

"গুড।" প্রফেসর হাসান গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, "জাহানারা, জাহানারা।"

পাশের অফিস ঘর থেকে হালকা-পাতলা একটা মেয়ে হাতে কিছু কাগজপত্র নিয়ে ঢুকে বলল, "জি স্যার।"

"এই হচ্ছে রাফি আহমেদ। আমাদের নূতন টিচার। তুমি এর জয়েনিং লেটারটা রেডি কর।"

"জি স্যার।"

"আর রাফি, তুমি জাহানারাকে চিনে রাখো। কাগজে-কলমে আমি এই ডিপার্টমেন্টের হেড, আসলে ডিপার্টমেন্ট চালায় জাহানারা। ও যেদিন চাকরি ছেড়ে চলে যাবে, আমিও সেদিন চাকরি ছেড়ে চলে যাব।"

জাহানারা নামের হালকা-পাতলা মেয়েটি বলল, "স্যার, আপনি যেদিন চাকরি ছেড়ে চলে যাবেন, আমিও সেদিন চাকরি ছেড়ে চলে যাব।"

"গুড। তা হলে আমিও আছি, তুমিও আছ।" প্রফেসর জাহিদ হাসান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো, তোমার সঙ্গে অন্য সবার পরিচয় করিয়ে দিই।"

রাফি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

প্রফেসর হাসান তার অফিস থেকে বের হয়ে করিডর ধরে হাঁটতে থাকেন, একটু আগে যে ছেলেমেয়েগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে কথা বলছিল, তারা এবার তাদের গলা নামিয়ে ফেলল। তারা হাত তুলে প্রফেসর হাসানকে সালাম দেয় এবং দুই পাশে সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দেয়। যে সাহসী মেয়েটি রেলিংয়ের ওপর নির্বিকারভাবে বসেছিল, সেও তড়াক করে লাফ দিয়ে নিচে নেমে মুখে একটা শিশুসুলভ নিরীহ ভাব ফুটিয়ে তোলে। প্রফেসর হাসান একটা ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন, ঘরের চার কোনায় চারটা ডেস্ক, তিনটিতে যে তিনজন বসেছিল, তারা তাকে দেখে দাঁড়িয়ে যায়। দুজন ছেলে এবং একজন মেয়ে, এরাও শিক্ষক, এবং এদেরও দেখে শিক্ষক মনে হয় না, চেহারায় একটা ছাত্র-ছাত্র ভাব রয়ে গেছে। প্রফেসর জাহিদ হাসান বললেন, "এই যে, এ হচ্ছে রাফি আহমেদ। আমাদের নূতন কলিগ!"

"ও!" বলে তিনজনই তাদের ডেস্ক থেকে বের হয়ে কাছাকাছি চলে আসে। প্রফেসর হাসান পরিচয় করিয়ে দিলেন, "এ হচ্ছে কবির, এ হচ্ছে রানা আর এ হচ্ছে সোহানা। এর বাড়ি সিলেট, তাই নিজের নামটাও ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না। বলে সুহানা।"

সোহানা নামের মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, "স্যার, আমি ঠিকই সোহানা উচ্চারণ করতে পারি। কিন্তু আমার নাম সোহানা না, আমার নামই সুহানা! তা ছাড়া আমার বাড়ি সিলেট না, আমার বাড়ি নেত্রকোনা।"

প্রফেসর হাসান হাসলেন। বললেন, "আমি জানি। একটু ঠাট্টা করলাম।" তারপর রাফির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, "এরা তিনজনই আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট। নিজের

বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার হয়েছে তো, তাই এদের ভেতর হালকা একটু মাস্তানি ভাব আছে, তাই এদের একটু তোয়াজ কোরো, না হলে এরা কিন্তু তোমার জীবন বরবাদ করে দেবে।"

কবির নামের ছেলেটি বলল, "স্যার, মাত্র এসেছে, আর আপনি আমাদের মাস্তান-টাস্তান কত কিছু বলে দিলেন!"

প্রফেসর হাসান হাসলেন, "ডন্ট ওরি। রাফি খুব স্মার্ট ছেলে, শুধু শুধু আমি তাকে টিচার হিসেবে নিই নি। সে ঠিকই বুঝে নেবে, আসলেই তোমরা মাস্তান হলে আমি তোমাদের মাস্তান হিসেবে পরিচয় করাতাম না। ঠিক কি না?"

রাফি কী বলবে বুঝতে না পেরে হাসিমুখ করে মাথা নাড়ল। সে টের পেতে শুরু করেছে, তার বুকের ভেতর ভারটা আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। নূতন জায়গায় প্রথমবার কাজ করতে এসে কীভাবে সবকিছু সামলে নেবে, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল, সেই দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে উবে যেতে শুরু করেছে। ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের মধ্যে খুব সহজ একটা সম্পর্ক আছে, সেটা সে বুঝতে শুরু করেছে।

এ রকম সময় দরজার পর্দা সরিয়ে আরেকজন মাথা ঢোকাল, কবির নামের ছেলেটি তাকে ডাকল, "স্যার আসেন, আমাদের নূতন টিচার জয়েন করেছে।"

পর্দা সরিয়ে বিষণ্ন চেহারার একটা মানুষ ভেতরে এসে ঢোকে। রাফির কাছাকাছি এসে বলে, "তুমি তা হলে আমাদের নূতন টিচার? গুড। আইসিটি কনফারেন্সে তুমি নিউরাল কম্পিউটারের ওপর একটা পেপার দিয়েছিলে?"

রাফি মাথা নাড়াল। বলল, "জি স্যার।"

"ভালো পেপার, পালিশ-টালিশ করলে ভালো জার্নালে পাবলিশ হয়ে যাবে। কাজটা কে করেছিল? তুমি, না তোমার স্যার?"

"আইডিয়াটা স্যার দিয়েছিলেন, কাজটা আমার। আর প্রথম যে আইডিয়াটা ছিল, সেখান থেকে অনেক চেঞ্জ হয়েছে।"

"তা-ই হয়। তা-ই হওয়ার কথা।"

প্রফেসর জাহিদ হাসান বললেন, "ইনি হচ্ছেন ডক্টর রাশেদ। আমাদের নূতন ইউনিভার্সিটি, সিনিয়র টিচারের খুব অভাব। ষোলজন টিচারের মধ্যে মাত্র আটজন ডক্টরেট। রাশেদ হচ্ছেন সেই আটজনের একজন।"

রাফি বলল, "জানি স্যার। যখন ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম, তখন সব খোঁজখবর নিয়েছিলাম।"

"গুড। তা হলে তো ভালো।"

রাশেদ জিজ্ঞেস করল, "একে কোথায় বসতে দেবেন, স্যার?"

"তোমরা বলো।"

রানা নামের ছেলেটি বলল, "মহাজন পট্টিতে সোহেলের রুমটা খালি আছে।"

"মহাজন পট্টিতে পাঠাবে?"

মহাজন পট্টি শুনে রাফির চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার একটু ছায়া পড়ল, সেটা দেখে বিষণ্ন চেহারার রাশেদ হেসে ফেলল, হাসলেও মানুষটির চেহারা থেকে বিষণ্নভাব দূর হয় না। হাসতে হাসতে বলল, "মহাজন পট্টি শুনে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তিনতলায় যে এক্সটেনশন হয়েছে, সেখানে করিডরটা সরু, তাই সবাই নাম দিয়েছে মহাজন পট্টি।"

এবার রাফিও একটু হাসল, বলল, "ও আচ্ছা। আমাদের হোস্টেলেও একটা উইংয়ের নাম ছিল শাঁখারী পট্টি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এ রকম সময় দরজার পর্দা সরিয়ে জাহানারা উঁকি দেয়, "স্যার, আপনাকে ভিসি স্যার খুঁজছেন। ফোনে আছেন।"

"আসছি।" প্রফেসর হাসান কম বয়সী ছেলেমেয়ে তিনজনকে বললেন, "তোমরা রাফিকে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। ওর অফিসটাও দেখিয়ে দাও। আর রাশেদ, তুমি একটু আসো আমার সঙ্গে।"

প্রফেসর হাসান রাশেদকে নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর কবির, রানা আর সোহানা তাদের ডেস্কের সামনে রাখা চেয়ারগুলো ঘুরিয়ে নিয়ে বসে, রাফির দিকেও একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, "বসো রাফি।"

রাফি চেয়ারটায় বসে চোখের কোনাটি দিয়ে ঘরটি লক্ষ করল, এই বয়সী চারজন ছেলেমেয়ে এ রকম একটা ঘরে বসলে ঘরটির যে রকম দুরবস্থা হওয়ার কথা ছিল তা হয় নি। বেশ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন। একজনের ডেস্কে একটা ল্যাপটপ, অন্য তিনটিতে এলসিডি মনিটর। পেছনে স্টিলের আলমারি, দেয়ালে খবরের কাগজের ফ্রি ক্যালেন্ডার স্কচটেপ দিয়ে লাগানো।

কবির রাফির দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার তোমার কথা বলছিলেন, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বহুদিন বাইরের কাউকে নেওয়া হয় নি। এবার তোমাকে নেওয়া হল।"

রানা জিজ্ঞেস করল, "তুমি এ রকম হাইফাই ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের ভাঙাচোরা ইউনিভার্সিটিতে চলে এলে, ব্যাপারটা কী?"

রাফি মাথা নাড়ল, "আমাদের ইউনিভার্সিটি মোটেও হাইফাই ইউনিভার্সিটি না। আর আপনাদের ইউনিভার্সিটিও মোটেই ভাঙাচোরা ইউনিভার্সিটি না! তা ছাড়া বাইরে আপনাদের ইউনিভার্সিটি, বিশেষ করে আপনাদের ডিপার্টমেন্টের একটা আলাদা সুনাম আছে।"

সুহানা বলল, "জাহিদ স্যারের জন্য।"

রাফি বলল, "জাহিদ স্যারকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।"

সুহানা মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ, স্যার খুব সুইট।"

"স্যার যেভাবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আর আপনারা যেভাবে স্যারের সঙ্গে কথা বলছেন, আমার ইউনিভার্সিটিতে আমরা সেটা কল্পনাও করতে পারব না। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে গাদা গাদা সব প্রফেসর। কেউ কোনো কাজ করে না, কিন্তু সবার সিরিয়াস ইগো প্রবলেম।"

রানা বলল, "একেকটা ইউনিভার্সিটির একেক রকম কালচার। আমাদের ইউনিভার্সিটি তো নূতন, তাই এখনো এ রকম আছে, দেখতে দেখতে ইগো প্রবলেম শুরু হয়ে যাবে। যাই হোক, তুমি কোথায় উঠেছ?"

"গেস্ট হাউসে।"

"কোথায় থাকবে, কী করবে, কিছু ঠিক করেছ?"

"না। এখনো ঠিক করি নি। আপনাদের একটু হেল্প নিতে হবে।"

"নো প্রবলেম।"

কবির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল। বলল, "আমার একটা ক্লাস আছে। রানা, তুই রাফিকে তার অফিসটা দেখিয়ে দিস।"

সুহানা বলল, "অফিসটা খালি দেখিয়ে দিলেই হবে নাকি? সোহেল অফিসটা কীভাবে রেখে গেছে, জানিস? আমাকে যেতে হবে।"

কবির হা হা করে হাসল। বলল, "ঠিকই বলেছিস। ভুলেই গেছিলাম যে সোহেলটা একটা আস্ত খবিশ ছিল!"

রানা বলল, "ওই অফিসে আধখাওয়া পিৎজা থেকে শুরু করে মড়া ইন্দুর—সবকিছু পাওয়া যাবে!"

সুহানা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি অফিস থেকে চাবি নিয়ে আসি।"

রানা বলল, "আমি দেখি, গৌতমকে পাই নাকি। ঘরটা একটু পরিষ্কার করতে হবে।"

কবির ক্লাস নিতে গেল, সুহানা গেল অফিসের চাবি আনতে আর রানা বের হয়ে গেল গৌতম নামের মানুষটিকে খুঁজে বের করতে, সম্ভবত এই বিল্ডিংয়ের ঝাড়ুদার। রাফি উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। একটু দূরে এক সারি কৃষ্ণচূড়া গাছ, গাছের নিচে অনেকগুলো টংঘর, সেখানে ছেলেমেয়েরা আড্ডা মারছে, চা খাচ্ছে। রাফি অন্যমনস্কভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা ব্যাপার আবিষ্কার করল। সে যে ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছে, সেখানে সবাই অন্য রকম—কাউকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হলে প্রথমেই সে চেষ্টা করবে কোনো একটা অজুহাত দিয়ে সেটা থেকে বের হয়ে আসতে। সবার ভেতর যে হাবাগোবা, শেষ পর্যন্ত তার ঘাড়ে সেই দায়িত্বটা পড়ে এবং খুবই বিরস মুখে সে সেই কাজটা করে। কোথাও কোনো আনন্দ নেই। এখানে অন্য রকম। কবির রানাকে বলল অফিসটা দেখিয়ে দিতে। সুহানা নিজে থেকে বলল তাকেও যেতে হবে। রানা তখন গেল ঝাড়ুদার খুঁজতে। খুবই ছোট ছোট কাজ কিন্তু এই ছোট ছোট কাজগুলো দিয়েই মনে হয় মানুষের জীবনটা অন্যরকম হয়ে যায়।

মহাজন পট্টিতে সোহেল নামের খবিশ ধরনের ছেলেটির অফিসটিকে যত নোংরা হিসেবে ধারণা দেওয়া হয়েছিল, সেটি মোটেও তত নোংরা নয়। টেবিলে এবং ফ্লোরে অনেক কাগজ ছড়ানো। ড্রয়ারে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ময়লা একটা দুই টাকার নোট এবং নাদুসনুদুস একটি মেয়ের সঙ্গে সোহেলের একটা ছবি ছিল। সেটা নিয়েই সুহানা এবং রানা নানা রকম টিপ্পনী কাটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটি পরিষ্কার হয়ে গেল এবং গৌতম নামের মানুষটি ঝাড়ু দিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করে নেওয়ার পর সেটি রীতিমতো তকতকে হয়ে ওঠে। সুহানা একটি পুরোনো টাওয়েল দিয়ে ডেস্কটি মুছে একটি রিভলভিং চেয়ার টেনে নিয়ে বলল, "নাও, বসো।"

রাফি বসতে বসতে বলল, "আমাকে কী ক্লাস নিতে হবে, জানেন?"

"কোয়ান্টাম মেকানিকস!"

"সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কিছু নেই, ইনট্রোডাক্টরি ক্লাস। এই ব্যাচের পোলাপানগুলো ভালো। আগ্রহ আছে।"

"ক্লাসের রুটিন কোথায় পাব, বলতে পারবেন?"

সুহানা বলল, "আমাদের সঙ্গে আপনি আপনি করার দরকার নেই, আমরা একই ব্যাচের!"

"থ্যাংক ইউ। ক্লাসের রুটিন কোথায় পাব, বলতে পারবে?"

"অফিসে আছে, জাহানারা আপু এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমার জন্য সবকিছু রেডি করে ফেলেছে। শি ইজ এ সুপার লেডি!"

"হ্যাঁ। জাহিদ স্যারও বলছিলেন।"

রানা বলল, "তা হলে চলো, তোমাকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিই।"

"হ্যাঁ।" সুহানা হেসে বলল, "বাথরুমগুলো কোথায়, কোন টয়লেটের দরজা ভাঙা, মেয়েদের কমনরুম কোথায়!"

রানা বলল, "তার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবগুলো কোথায়, অন্য টিচাররা কে কোথায় বসে!"

"এবং কোন কোন টিচার থেকে সাবধানে থাকতে হবে!"

রানা অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে বলল, "এবং কেন সাবধানে থাকতে হবে?"

ডায়াসের ওপর দাঁড়িয়ে রাফি সামনে বসে থাকা জনাপঞ্চাশেক ছাত্রছাত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু নার্ভাস অনুভব করে। এই মাত্র প্রফেসর জাহিদ হাসান তাকে ক্লাসের সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছেন। প্রথম দিন জয়েন করে দুই ঘণ্টার মধ্যেই তাকে জীবনের প্রথম ক্লাস নিতে হবে, সে বুঝতে পারে নি। প্রফেসর জাহিদ হাসান অবিশ্যি তাকে ক্লাস নিতে বলেন নি, তার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একটু পরিচিত হতে বলেছেন। রাফি জীবনে কখনো কোনো ক্লাস নেয় নি। কাজেই প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আর তাদের ক্লাস নেওয়ার মধ্যে তার কাছে খুব বড় কোনো পার্থক্য নেই! সে তার গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলল, "এটা আমার জীবনের প্রথম ক্লাস। আজকের এই ঘটনার কথা তোমরা সবাই ভুলে যাবে কিন্তু আমি কোনো দিন ভুলব না।"

দুষ্টু টাইপের একটা মেয়ে বলল, "স্যার, এখন আপনার কেমন লাগছে?"

"সত্যি কথা বলব?"

এবার অনেকেই বলল, "জি স্যার, বলেন।"

"আমার খুব নার্ভাস লাগছে।"

ক্লাসে ছোট একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। দয়ালু চেহারার একটা ছেলে বলল, "নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই, স্যার।"

"থ্যাংকু। কিন্তু তুমি যদি কোনো দিন স্যার হও, তখন তুমি যদি কোনো দিন ছেলেমেয়েভর্তি ক্লাসে দাঁড়িয়ে লেকচার দেওয়ার চেষ্টা কর, তখন তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবে!"

আবার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা শব্দ করে হেসে উঠল। হাসির একটা গুণ আছে, মানুষ খুব সহজেই সহজ হয়ে যায়। রাফিও অনেকটা সহজ হয়ে গেল। বলল, "আজ যেহেতু একেবারে প্রথম দিন, তাই আজ ঠিক পড়াব না, কীভাবে পড়াব বরং সেটা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলি।"

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা উৎসুক দৃষ্টিতে রাফির দিকে তাকিয়ে একটু নড়েচড়ে বসল। রাফি বলল, "আমি তোমাদের যে কোর্সটা নেব, সেটার নাম ইনট্রোডাকশন টু কোয়ান্টাম মেকানিকস। আমি যখন এই কোর্সটা প্রথম নিই, তখন যে স্যার এই কোর্সটা আমাদের পড়িয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বুড়ো এবং বদমেজাজি। এখন আমার সন্দেহ হয়, আমার সেই স্যার মনে হয় বিষয়টা কোনো দিন নিজেও বোঝেন নি। শুধু কিছু ইকুয়েশন মুখস্থ করে রেখেছিলেন। ক্লাসে এসে বোর্ডে সেগুলো লিখতেন। আমরা সেগুলো খাতায় লিখতাম। ক্লাসে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ ছিল না!"

রাফি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পরের সেমিস্টারে যে ম্যাডাম এই কোর্সটা নিলেন, তিনি ছিলেন কম বয়সী এবং হাসিখুশি। তাকে কোনো প্রশ্ন করলে তিনি এত নার্ভাস হয়ে যেতেন যে আমাদের মায়া হত। তাই আমরা কোনো দিন তাকে প্রশ্ন করি নি। সেমিস্টারের

AMARBOI.COM

শেষে ম্যাডাম দশটা প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিতেন, তার থেকে পরীক্ষায় ছয়টা প্রশ্ন আসত! সে জন্য সবাই সেই ম্যাডামকে খুব ভালবাসত।"

সামনে বসে থাকা দুষ্টু টাইপের মেয়েটি বলল, "এ রকম স্যার–ম্যাডামকে আমরাও খুব ভালবাসি!"

তার কথা শুনে ক্লাসের সবাই হেসে ওঠে। রাফিও হেসে বলল, "আমি জানি, এ রকম স্যার–ম্যাডামকে ছেলেমেয়েরা খুব ভালবাসে। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, আমি এই সাবজেক্টটা কোনো ভালো টিচারের কাছে পড়তে পারি নি! কাজেই কীভাবে ভালো করে এই সাবজেক্টটা পড়তে হয়, আমি জানি না। তবে আমি একটা জিনিস জানি!" রাফি একটু থেমে সারা ক্লাসের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, "কেউ বলতে পারবে, আমি কী জানি?"

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা বলতে পারল না। রাফি বলল, "কীভাবে এই সাবজেক্টটা পড়ানো উচিত নয়, আমি সেটা জানি!"

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আবার হেসে উঠল। রাফি বলল, "কাজেই আমি নিজে নিজে যেভাবে এটা শিখেছি, আমি তোমাদের সেভাবে শিখাব। ঠিক আছে?"

ক্লাসের সবাই মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক আছে।" রাফি সারা ক্লাসে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "তবে এ ব্যাপারে একটা বড় সমস্যা আছে। সমস্যাটা কী, জান?"

ছেলেমেয়েরা মাথা নেড়ে জানাল, তারা জানে না। রাফি বলল, "আমি মাত্র পাস করে এসেছি। কাজেই আমি কিন্তু খুব বেশি জানার সুযোগ পাই নি। তোমরাও আর দুই–তিন বছর পর আমার জায়গায় আসবে! আমার নলেজ"—রাফি দুই আঙুল দিয়ে ছোট একটা গ্যাপ দেখিয়ে বলল, "তোমাদের নলেজ থেকে বড়জোর দুই ইঞ্চি বেশি! কাজেই তোমরা যখন দুই ইঞ্চি শিখে ফেলবে, তখন আমাকেও দুই ইঞ্চি শিখে আবার তোমাদের ওপর দুই ইঞ্চি যেতে হবে। তার মানে বুঝেছ?"

ছেলেমেয়েরা মাথা নাড়ল। বলল, বোঝে নি।

"তার মানে, তোমাদের লেখাপড়া করে যতটুকু পরিশ্রম করতে হবে, আমাকেও সব সময় তার সমান না হলেও তার থেকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। সব সময় দুই ইঞ্চি ওপরে থাকতে হবে!"

রাফির কথাগুলো ছেলেমেয়েরা বেশ সহজেই গ্রহণ করল বলে মনে হল। রাফি টেবিলে হেলান দিয়ে বলল, "কাজটা ঠিক হল কি না, বুঝতে পারলাম না।"

ছেলেমেয়েরা জানতে চাইল, "কোন কাজটা, স্যার?"

"এই যে আমি বললাম, দুই ইঞ্চির কথা! এর ফল আমার জন্য খুব ডেঞ্জারাস হতে পারে।"

"কী ডেঞ্জারাস, স্যার?"

"আমার নাম হয়ে যেতে পারে দুই ইঞ্চি স্যার!"

সারা ক্লাস আবার একসঙ্গে হেসে ওঠে। রাফি হাসি থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারপর বলে, "আজ যেহেতু প্রথম দিন, আমি তাই কোয়ান্টাম মেকানিকস নিয়ে কিছু বলব না। শুধু কোয়ান্টাম মেকানিকস যারা বের করেছেন, সেই বিজ্ঞানীদের নিয়ে কয়েকটা গল্প বলি। ঠিক আছে?"

সবাই মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল। রাফি তখন আইনস্টাইনের গল্প বলল, নীল বোরের গল্প বলল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাকে লুকিয়ে সরিয়ে নেওয়ার সময় তার বিশাল মস্তিষ্ক নিয়ে কী সমস্যা হয়েছিল, তা বলল, শর্ডিংগারের গল্প বলল, ডিরাকের বিখ্যাত নিগেটিভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৫১৭ www.amarboi.com ~

মাছের গল্প বলল এবং শেষ করল বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর গল্প দিয়ে। এগুলো তার প্রিয় গল্প, সে বলল আগ্রহ নিয়ে। সব মানুষেরই গল্প নিয়ে কৌতূহল থাকে, তাই পুরো ক্লাস গল্পগুলো শুনল মনোযোগ দিয়ে। যেখানে হাসার কথা, সেখানে তারা হাসল; যেখানে ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা, সেখানে তারা ক্রুদ্ধ হল; আবার যেখানে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার কথা, সেখানে তারা ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিকেলে রাফি তার অফিস ঘরে যখন কাগজপত্র বের করে গুছিয়ে রাখছিল, তখন দরজা খুলে কবির তার মাথা ঢোকাল। বলল, "চলো, চা খেয়ে আসি।"

"চা?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"টঙে।"

"চলো।"

অফিস ঘরে তালা মেরে রাফি বের হয়ে আসে। কবির বলল, "যখন আমরা ছাত্র ছিলাম, তখন এই টঙে চা খেতাম। মাস্টার হওয়ার পরও অভ্যাসটা ছাড়তে পারি নি। এখন আমাদের দেখাদেখি অনেক টিচারই আসে, ছাত্ররা খুব বিরক্ত হয়।"

"হওয়ারই কথা!"

করিডরের গোড়ায় বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে, সবাই তাদের সমবয়সী। রাফি তাদের মধ্যে সুহানা আর রানাকে চিনতে পারল। কবির অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, "এ হচ্ছে রাফি। আমাদের ডিপার্টমেন্টে নূতন জয়েন করেছে।"

AMARBOI.COM

সুহানা রাফির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "রাফি, আজ তুমি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের কী বলেছ?"

"কেন, কী হয়েছে?"

"তারা খুব ইমপ্রেসড।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে বুঝলে?"

সুহানা হাসল। বলল, "আমাকে বলেছে।"

"কী বলেছে?"

"ছাত্রীরা বলেছে, তুমি নাকি খুব কিউট!"

রানা মুখভঙ্গি করে বলল, "হুম্! সাবধান রাফি। ছাত্রীরা যখন বলে কিউট, তখন সাবধানে থাকতে হয়।"

সবাই মিলে হেঁটে হেঁটে টঙের দিকে যেতে থাকে। পাশাপাশি অনেকগুলো টং। রানা খানিকটা ধারাবিবরণী দেওয়ার মতো করে বলল, "এই যে টংগুলো দেখছ, তার মধ্যে প্রথম যে টংটা দেখছ, সেখানে কখনো যাবে না।"

"কেন?"

"এটা যে চালায়, সে হচ্ছে জামাতি। এইখানে রড-কিরিচ এগুলো লুকিয়ে রাখা হয়। যখন হল অ্যাটাক করে, তখন এখান থেকে সাপ্লাই দেওয়া হয়।"

"ইন্টারেস্টিং!"

"পরের টংগুলোতে যেতে পার। সেকেন্ড টং খুব ভালো পেঁয়াজু ভাজে। থার্ড টঙের রং-চা ফার্স্ট ক্লাস। ফোর্থ টঙে গরম জিলাপি পাবে। আমরা সাধারণত এই জিলাপি খেতে যাই। তুমি জিলাপি খাও তো?"

"হ্যাঁ, খাই।"

কম বয়সী লেকচারাররা দল বেঁধে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেসব ছাত্রছাত্রী সেখানে বসেছিল, তারা উঠে একটু পেছনে সরে গেল। যে মানুষটি জিলাপি ভাজছে, সে গলা উঁচিয়ে বলল, "এই শারমিন, স্যারদের বেঞ্চ মুছে দে।"

বেঞ্চগুলো মোছার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটি এক ধরনের তোষামোদ। শারমিন নামের মেয়েটি একটা ন্যাকড়া দিয়ে বেঞ্চগুলো মুছে দিল। মেয়েটির বয়স বারো কিংবা তেরো—মায়াকাড়া চেহারা, এই বয়সে মেয়েদের চেহারায় এক ধরনের লাবণ্য আসতে শুরু করে।

কম বয়সী লেকচারাররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে, প্লেটে করে গরম জিলাপি আনা হয়। সবাই খেতে খেতে গল্প করে।

হঠাৎ রানা বলে, "ওই যে সমীর যাচ্ছে। ডাকো সমীরকে।" একজন গলা উঁচিয়ে ডাকল, "সমীর! জিলাপি খেয়ে যাও।"

সমীর অন্যদের সমবয়সী, উসকোখুসকো চুল এবং মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রানা গলা নামিয়ে বলল, "সমীর হচ্ছে আমাদের মধ্যে হার্ডকোর সায়েন্টিস্ট। বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের। ভাইরাস আর ব্যাক্টেরিয়া ছাড়া কোনো কথা বলে না।"

রানার কথা সত্যি প্রমাণ করার জন্যই কি না কে জানে, সমীর এসেই বলল, "তোরা আজকের খবরের কাগজ দেখেছিস?"

রানা জানতে চাইল, "কেন, কী হয়েছে?"

"খুব বাজে একটা ভাইরাস ডিটেক্ট করেছে। ইনফ্যাক্ট, এটা ভাইরাস না প্রিওন, তা এখনো সিওর না।"

"প্রিওনটা কী জিনিস?"

কবির বলল, "থাক থাক! এখন প্রিওন-ফ্রিওনের কথা থাক। জিলাপি খা। গরম জিলাপি খেলে সব ভাইরাস শেষ হয়ে যাবে।"

"ঠাট্টা নয়, খুব ডেঞ্জারাস।"

সমীর খুব গম্ভীর মুখে বলল, "সরাসরি ব্রেনকে অ্যাফেক্ট করে। আমাদের দেশের জন্য ব্যাড নিউজ।"

"কেন, আমাদের দেশের জন্য ব্যাড নিউজ কেন?"

"কোনো রকম প্রটেকশন নেই। কোনোভাবে ইনফেক্টেড একজন আসতে পারলেই এপিডেমিক শুরু হয়ে যাবে।"

কবির বলল, "থাক থাক, পৃথিবীর সব ভাইরাসের জন্য তোর দুশ্চিন্তা করতে হবে না, অন্যদেরও একটু দুশ্চিন্তা করতে দে। তুই জিলাপি খা।"

সমীর খুব দুশ্চিন্তিত মুখে জিলাপি খেতে থাকে। সবাই উঠে পড়ার সময় কবির জিলাপি তৈরি করতে থাকা মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কত হয়েছে?"

মানুষটা কিছু বলার আগেই শারমিন নামের মেয়েটি বলল, "একেক জনের তেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।"

সুহানা জিজ্ঞেস করল, "সব মিলিয়ে কত?"

AMARBOI.COM

"চুরানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।"

"আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

কবির বলল, "তুই কেন দিবি?"

"আজ আমাদের নূতন কলিগ এসেছে, তার সম্মানে।"

রানা বলল, "আর আমরা এতদিন থেকে আছি, আমাদের কোনো সম্মান নেই?"

"সম্মান দেখানোর মতো এখনো কোনো কারণ খুঁজে পাই নি!" সুহানা তার ব্যাগ থেকে এক শ টাকার একটা নোট বের করে শারমিনের হাতে দিয়ে বলল, "নাও। বাকিটা তোমার।" মেয়েটির মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে।

সবাই মিলে যখন ওরা হেঁটে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে, তখন সুহানা রাফিকে বলল, "শারমিন মেয়েটাকে দেখেছ?"

"হ্যাঁ। কী হয়েছে?"

"কত বিল হয়েছে জানতে চাইলে সে একটা আজগুবি সংখ্যা বলে দেয়। কেন বলে, কে জানে!"

রাফি অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। টঙের কাছে গাছের ওপর একটা কাগজে জিলাপি, শিঙাড়া, বিস্কুট এবং চায়ের দাম লেখা আছে। সে ভেবেছিল, বিলটা দিয়ে দেবে, তাই মনে মনে হিসাব করছিল, কত হয়েছে। সবাই মিলে যা খেয়েছে, সেটা হিসাব করলে সত্যিই চুরানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা হয়। সাতজনের মধ্যে ভাগ করলে সেটা আসলেই মাথাপিছু তেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা হয়। শারমিন আজগুবি কিছু বলে নি, নিখুঁত হিসাব করেছে।

রাফি তখনো জানত না, এই বাচ্চা মেয়েটির কারণে আর কিছুদিনের মধ্যেই তার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটবে।

AMARBOI.COM

২

নুরুল ইসলাম টেবিলে বল পয়েন্ট কলমটা অন্যমনস্কভাবে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, "ঈশিতা।"

বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের অন্য পাশে বসে থাকা ঈশিতা বলল, "বলেন।"

"বিকেলটা ফ্রি রেখো।"

"কেন?"

"তোমাকে এনডেভারের অফিসে যেতে হবে।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

নুরুল ইসলাম দেশের জনপ্রিয় একটা পত্রিকার সম্পাদক, পত্রিকা কীভাবে চালাতে হয়, সেটা খুব ভালো জানেন কি না, সেটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে কিন্তু ব্যবসা জানেন কি না, সেটা নিয়ে কেউ সন্দেহ করে না। টেলিফোন কোম্পানির ওপর কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বের হওয়ার পর থেকে কোম্পানিগুলো তার পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেয়। কৃতজ্ঞতাবশত, নুরুল ইসলামও তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বন্ধ রেখেছেন। এ মুহূর্তে তার

পত্রিকায় ব্যাংকগুলো নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বের হচ্ছে। তিনি ব্যাংকের জিএমদের কাছ থেকে ফোন পেতে শুরু করেছেন, মনে হচ্ছে তাদের থেকেও নিয়মিত বিজ্ঞাপন আসতে হবে। নুরুল ইসলাম ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এনডেভারের সিইওর একটা ইন্টারভিউ নিতে হবে।"

ঈশিতা বলল, "সেটা বুঝেছি, কিন্তু আমি কেন? আরো সিনিয়র রিপোর্টাররা আছেন।"

"তিনটা কারণ। প্রথম কারণ হচ্ছে, তুমি ভালো ইংরেজি জান। শুদ্ধ বিদেশি অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলতে পার। বিদেশিদের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য এ রকম রিপোর্টার দরকার। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, এনডেভার একটা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি। তাদের কী প্রশ্ন করতে হয়, সেগুলো সিনিয়র সাংবাদিকেরা জানে না, তোমরা জান। তৃতীয় কারণটা বলা যাবে না। যদি বলি, তা হলে নারীবাদী সংগঠনগুলো আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।"

ঈশিতা হেসে ফেলল, "তার মানে তিনটা কারণের মধ্যে তৃতীয় কারণটাই ইম্পরট্যান্ট! অন্যগুলো এমনি এমনি বলেছেন। তাই না?"

"সবগুলোই ইম্পরট্যান্ট।" নুরুল ইসলাম হাসার ভঙ্গি করে বললেন, "এনডেভার দেশে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। পৃথিবীর একটা জায়ান্ট কম্পিউটার কোম্পানি। কাজেই যত্ন করে ওদের ইন্টারভিউ নেবে।"

"যত্ন করে?"

"হ্যাঁ। মানে বুঝেছ তো? ঘাঁটাবে না। এরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিশাল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। একটা সময় ছিল, যখন এসব কোম্পানিকে গালাগাল করা ছিল ফ্যাশন। এখন হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগ। এখন এদের তোষামোদ করা হচ্ছে ফ্যাশন!"

"তার মানে এদের তোষামোদ করে আসব?"

"না। আমি সেটা বলছি না। তোষামোদ করবে না, কিন্তু কথা বলবে একটা পজিটিভ ভঙ্গিতে। এদের ঘাঁটাবে না, বিরক্ত করবে না। ওদের সঙ্গে পজিটিভভাবে কী বলা যায়, জেনে আসবে।"

"যদি পজিটিভ কিছু না পাই, তবুও—"

নুরুল ইসলাম আবার হাসির ভঙ্গি করলেন। বললেন, "আগে থেকে কেন সেটা ধরে নিচ্ছ, গিয়ে দেখো।"

ঈশিতা যখন নুরুল ইসলামের অফিস থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে বললেন, "আর শোনো, বিদেশিরা সময় নিয়ে খুবই খুঁতখুঁতে। পাঁচটায় সময় দিয়েছে, তুমি ঠিক পাঁচটার সময় হাজির হবে, এক মিনিট আগেও না, এক মিনিট পরেও না। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"যারা পাঁচ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করতে পারে, তারা এই দেশের একটা পত্রিকাকে অনেক টাকার বিজ্ঞাপন দিতে পারে!"

ঈশিতা নুরুল ইসলামের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। খবরের কাগজ আসলে খবরের জন্য নয়, খবরের কাগজ এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সেটা নিয়ে একসময় তর্কবিতর্ক করা যেত, ইদানীং সেটাও করা যায় না।

নুরুল ইসলামের কথামতো কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময় ঈশিতা এনডেভারের অফিসে এসে হাজির হয়েছে। কাজটা খুব সহজ হয় নি, ট্রাফিক জ্যামের কারণে কেউ আজকাল ঠিক

সময়ে ঠিক জায়গায় যেতে পারে না। ঈশিতা মোটরসাইকেল চালিয়ে যায় বলে সে মোটামুটি ঠিক সময়ে পৌঁছে যেতে পারে, তার পরও আজ সে ঝুঁকি নেয় নি। অনেক আগে রওনা দিয়ে অনেক আগে পৌঁছে গেছে। বাড়তি সময়টা কাটাতে তার রীতিমতো কষ্ট হয়েছে। মোটরসাইকেলে ঘোরাফেরা করা শার্টপ্যান্ট পরে থাকা মেয়েদের নিয়ে সবারই এক ধরনের কৌতূহল। দামি ক্যামেরাটা থাকায় একটু সুবিধে, সাংবাদিক হিসেবে মেনে নেয়। প্রয়োজন না থাকলেও সে এদিক-সেদিক তাকিয়ে খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে ছবি তুলে নেয়, লোকজন তখন তাকে একটু সমীহ করে। ডিজিটাল ক্যামেরা, আজকাল ছবি তুলতে এক পয়সাও খরচ হয় না।

ঈশিতা অবিশ্যি তার এত দামি ক্যামেরাটা নিয়ে ভেতরে যেতে পারল না, গেটের সিকিউরিটির মানুষটি একটা টোকেন দিয়ে ক্যামেরাটা রেখে দিল, যাওয়ার সময় ফেরত দেবে। ঈশিতাকে বলল, এনডেভারের অফিসের ভেতরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। ক্যামেরাটা প্রায় জোর করে রেখে দেওয়ার সময়ই ঈশিতার মেজাজটা একটু খিঁচে ছিল, ভেতরে গিয়ে ওয়েটিং রুমে যখন টানা কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করতে হল, তখন তার মেজাজ আরো একটু খারাপ হল। শেষ পর্যন্ত যখন তার অফিসের ভেতর ডাক পড়েছে, তখন সে ভেতরে ভেতরে তেতে আছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সে অবিশ্যি বেশ অবাক হয়ে যায়—অফিস বলতেই যে রকম চোখের সামনে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি আঁটা চেয়ার, ফাইল কেবিনেট, কম্পিউটারের ছবি ভেসে ওঠে, এখানে সে রকম কিছু নেই। চৌদ্দতলায় এক পাশে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত কাচের দেয়াল দিয়ে বহু দূর দেখা যায়। ঈশিতা একটু অবাক হয়ে লক্ষ করল, যদিও এলাকাটি শহরের মোটামুটি দরিদ্র এলাকা কিন্তু এত ওপর থেকে দেখলে সেটি বোঝা যায় না। এই দেশে অনেক গাছ, মনে হয় গভীর মমতায় সেই গাছগুলো দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখে। ঘরের অন্যপাশে দেয়ালে সারি সারি ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি। এক ঘরে এতগুলো টিভি কেন, কে জানে। প্রত্যেকটা টিভিতেই নিঃশব্দে কিছু একটা চলছে। মেঝেটিতে ধবধবে সাদা টাইল এবং কুচকুচে কালো কিছু ফার্নিচার। যে ইন্টেরিওর ডেকোরেটর ঘরটিকে সাজিয়েছে, তার রুচিবোধ আধুনিক এবং তীব্র।

কাচের দেয়ালের সামনে একজন বিদেশি মানুষ দাঁড়িয়েছিল, ঈশিতার পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল এবং এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ঈশিটা?"

ঈশিতা ইংরেজিতে বলল, "আসলে ঈশিতা। কিন্তু তুমি যেহেতু "ত" এবং "ট" আলাদাভাবে শুনতে পাও না বা উচ্চারণ করতে পার না, এতেই চলে যাবে।"

মানুষটা কেমন যেন অবাক হল, শুধু অবাক নয়, মনে হল কেমন যেন একটু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। কেউ তার ভুল ধরিয়ে দেবে, সে মনে হয় এই ব্যাপারটায় অভ্যস্ত নয়। বলল, "তুমি বলতে চাইছ "ট" উচ্চারণটি দুই রকম? কী আশ্চর্য! আমি এতদিন এই দেশে আছি, কেউ আমাকে এটা বলেনি!"

ঈশিতা বলল, "প্রয়োজন হয় নি। কিংবা তোমার মুখে এই উচ্চারণটিই হয়তো সবাই পছন্দ করে।"

মানুষটা ঈশিতাকে নিয়ে একটা চেয়ারে বসায়। চেয়ারের সামনে একটি টেবিল, টেবিলের অন্য পাশে আরেকটি চেয়ারে বসে বলল, "বলো, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?"

ঈশিতা বলল, "বব লাস্কি, আমাকে পাঠানো হয়েছে, তোমার একটি ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য। তোমরা এই দেশে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করতে যাচ্ছ। কাজেই আমরা তোমাদের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।"

বব লাস্কি চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "আমরা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারার। সাদা ভাষায় তোমরা কম্পিউটার বলতে যা বোঝাও, সেই কম্পিউটার না। আমরা বিশেষ কাজ মাথায় রেখে কম্পিউটার তৈরি করি। এক ধরনের সুপার কম্পিউটার। আর্কিটেকচার সম্পূর্ণ আলাদা, নিউরাল নেটওয়ার্ক—"

ঈশিতা ইতস্তত করে বব লাস্কিকে থামিয়ে বলল, "আমি গত বিশ মিনিট তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ডেস্কে রাখা কাগজপত্র থেকে এগুলো জেনে গেছি। আমি আসলে তোমার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু জানতে চাই।"

বব লাস্কির মুখ কঠিন হয়ে উঠল, ঈশিতা মোটামুটি স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানিয়ে দিয়েছে, তুমি আমাকে বাইরে বিশ মিনিট অপেক্ষা করিয়েছ। এই মানুষটি এটিও পছন্দ করে নি, স্বাভাবিক ভদ্রতা দাবি করে এখন সে এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে। বব লাস্কি দুঃখ প্রকাশ করল না। বলল, "তুমি আমার কাছে সুনির্দিষ্ট কী জানতে চাও?"

"বাংলাদেশে কেন?"

বব লাস্কি সরু চোখে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইল। নিউরাল নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের কাজ করার উপযোগী সুপার কম্পিউটার তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ যে সঠিক দেশ নয়, সেটা বোঝার জন্য খুব বেশি চালাক-চতুর হতে হয় না। কাজেই ঈশিতার প্রশ্নটা এমন কোনো দুর্বোধ্য প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু বব লাস্কি ভান করল, প্রশ্নটা বুঝতে পারে নি। বলল, "আমি তোমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারি নি।"

"ট্রপিক্যাল ডিজিজ গবেষণার জন্য বাংলাদেশ চমৎকার একটি দেশ হতে পারে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং কিংবা নারীর ক্ষমতায়নের জন্যও এটা চমৎকার জায়গা। জাহাজশিল্প কিংবা ফুড প্রসেসিংও হতে পারে। কিন্তু সুপার কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং? বাংলাদেশে? কেন? কীভাবে?"

বব লাস্কি এবার খুব হিসাব করে কথার উত্তর দিল। বলল, "তোমার দেশে এক শ পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষ, সারা পৃথিবীর সব মানুষের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। মানুষের বুদ্ধিমত্তা পৃথিবীতে সমানভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের দেশে অসংখ্য মেধাবী ছেলেমেয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বের হওয়া এই ছেলেমেয়েগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে চাই। তাদের নিয়ে নিউরাল নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারের বিশ্বমানের গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করতে চাই।"

ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "আমিও ঠিক এটা ভেবেছিলাম। কিন্তু—"

"কিন্তু?"

"তোমরা এখানে আছ এক বছর থেকে বেশি সময়, রেকর্ড টাইমে চৌদ্দতলা এই বিশাল বিল্ডিং তৈরি করেছ, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই দেশের কোনো ছেলে বা মেয়েকে নিয়োগ দাও নি।"

বব লাস্কির মুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়, শীতল গলায় বলে, "নিয়োগ দেওয়ার সময় শেষ হয়ে যায়নি।"

"সম্ভবত।" ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "আমার আরেকটা প্রশ্ন। তোমাদের এই বিশাল বিল্ডিংটা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারের ল্যাবরেটরির মতো না। এটা অনেকটা হাসপাতালের মতো। কারণ কী?"

"তুমি কেমন করে জান? সিকিউরিটির কারণে বাইরের কেউ এখানে ঢুকতে পারে না। তোমাকেও নিশ্চয়ই ঢুকতে দেওয়া হয় নি। একটা বিল্ডিংকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার

WWW.AMARBOI.COM

কথা নয়, এটা হাসপাতাল, না ক্যাসিনো! তোমার কেন ধারণা হল, এটা হাসপাতালের মতো?"

ঈশিতা বলল, "আমাকে যখন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়, তখন সেখানে যাওয়ার আগে আমি খুব ভালো করে হোমওয়ার্ক করে আসার চেষ্টা করি। এবার সময় বেশি পাই নি, তাই হোমওয়ার্কটা শেষ করতে পারি নি, যেটুকু পেরেছি, তাতে মনে হয়েছে—"

বব লাস্কি মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার হোমওয়ার্ক ঠিক হয় নি, ভুল হয়েছে।"

"অসম্পূর্ণ বলতে পার, কিন্তু ভুল বলাটা ঠিক হবে না। আমি কীভাবে হোমওয়ার্কটা করার চেষ্টা করেছি, শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে।"

"কীভাবে করেছ?"

"যে কন্ট্রাক্টর তোমার বিল্ডিংটা তৈরি করেছে, তার সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, এই বিল্ডিংয়ের একটা ফিচার হচ্ছে অক্সিজেনের লাইন। শুধু হাসপাতালে ঘরে ঘরে অক্সিজেন সাপ্লাই দিতে হয়! সে জন্য অনুমান করেছি—"

"তোমার অনুমান ভুল।" বব লাস্কি অনেক চেষ্টা করেও তার গলার স্বরে ক্রোধটাকে লুকিয়ে রাখতে পারল না, হিংস্র গলায় বলল, "কন্ট্রাক্টরের এসব কথা বলা হচ্ছে সম্পূর্ণ অনুচিত এবং বেআইনি। আমাদের দেশ হলে সে পুরোপুরি ফেঁসে যেত।"

ঈশিতা বব লাস্কির মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা পুরোপুরি উপভোগ করতে শুরু করে। মুখের হাসিটা আরো একটু বিস্তৃত করে বলল, "শুধু কন্ট্রাক্টর নয়, কাস্টমসে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তোমাদের এই বিল্ডিংয়ে কনটেইনার বোঝাই মেডিকেল ইকুইপমেন্ট আসছে। দামি দামি ইকুইপমেন্ট। এই দেশের সবচেয়ে বড় হাসপাতালও যে ইকুইপমেন্ট আনার কথা চিন্তাও করতে পারে না, তোমরা সেই ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছ। কেন?"

বব লাস্কি অনেকক্ষণ শীতল চোখে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি তোমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বাধ্য নই। তুমি আমার কাছে যে বিষয়গুলো জানতে চাইছ, সেই জিনিসগুলো তোমার জিজ্ঞাসা করার কথা নয়। পৃথিবীর যে কোনো সভ্য দেশ হলে—"

ঈশিতার মাথায় রক্ত উঠে গেল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, "সভ্যতার কথা থাক। আমি তোমার সঙ্গে সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে আসি নি। সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে হলে আমি কখনোই একজন আমেরিকান কম্পিউটার বিক্রেতার কাছে যাব না। অন্য কোথাও যাব।"

ঈশিতা বুঝে গেল, এটি হচ্ছে বেল্টের নিচে আঘাত। এই আঘাতের পর ইন্টারভিউ চলার কথা নয়; এবং সত্যি সত্যি আর চলল না। বব লাস্কি উঠে দাঁড়াল। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, তুমি এখন বিদায় হও।

ঈশিতাও উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলতে তুলতে বলল, "বাংলাদেশে গত কিছুদিনে অসাধারণ দুটি ব্যাপার ঘটেছে, একটা হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন। এই দেশে এখন সরকার যে কোনো তথ্য দিতে বাধ্য। আমাদের মতো সাংবাদিকদের ভারি মজা। এখন পুলিশ বলো, কাস্টমস বলো, সবার কাছ থেকে খবর বের করতে পারি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। না বুঝে এই দেশের মানুষ এখন ভয়ংকর ভয়ংকর খবর ইন্টারনেটে দিয়ে রাখে!"

বব লাস্কি কিছু বলল না। ঈশিতা হেঁটে বের হয়ে যেতে যেতে বলল, "তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কেন ডিভোর্স হয়েছে, সেটাও—"

বব লাস্কি চিৎকার করে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

"জানতাম না। এখন জানলাম।" ঈশিতা মিষ্টি করে হাসে, "সাংবাদিকেরা অনেক অপ্রয়োজনীয় তথ্য জানে। শুধু শুধু!"

মোটরসাইকেলটা চালিয়ে ঈশিতা যখন তার অফিসে ফিরে আসছে, তখন সে বুঝতে পারল, কাজটা ভালো হল না। সম্পাদক নুরুল ইসলাম বারবার করে বলে দিয়েছেন, এদের ঘাঁটাবে না, বিরক্ত করবে না। দরকার হলে তোষামোদ করবে। অথচ সে ঠিক উল্টো কাজটা করে আসছে। বব লাস্কিকে ঘাঁটিয়েছে, বিরক্ত করেছে, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করেছে, ভয় দেখিয়েছে, অপমান করেছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে টিটকারি মেরেছে। সে এইটুকুন পুঁচকে একটা মেয়ে, কেন তার মাথায় এ রকম দুর্বুদ্ধি হল? চাকরিটা মনে হয় গেল।

রাত এগারোটার সময় ঈশিতা নুরুল ইসলামের টেলিফোন পেল। তিনি হিমশীতল গলায় বললেন, "ঈশিতা, তুমি কোথায়?"

ঈশিতা মেয়েদের একটা হোস্টেলে থাকে। সে বলল, "হোস্টেলে।"

"হোস্টেলটা কোথায়?"

"মণিপুরী পাড়ায়।"

"তোমার একটু অফিসে আসতে হবে।"

ঈশিতা একটু অবাক হয়ে বলল, "এখন?"

"কেন? সমস্যা আছে?"

"না, নেই।"

"গাড়ি পাঠাব?"

ঈশিতা বলল, "না, গাড়ি পাঠাতে হবে না। আমি আসছি। পনের মিনিটে পৌঁছে যাব।"

ঈশিতা টেলিফোন রেখে দিচ্ছিল। তখন নুরুল ইসলাম বললেন, "আর শোনো—"

"বলুন।"

"আজকের অ্যাসাইনমেন্টের কাজ কোথায় করছ?"

"আমার ল্যাপটপে।"

"ল্যাপটপটা নিয়ে এসো। যদি কোনো কাগজে নোট নিয়ে থাক, তা হলে কাগজগুলোও নিয়ে এসো। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

রাত এগারটায় রাস্তাঘাট ফাঁকা, ঈশিতা কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মোটরসাইকেলে খবরের কাগজের অফিসে পৌঁছে গেল। পনের মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যেত, কয়েক মিনিট দেরি হল। সে মেয়েদের যে হোস্টেলে থাকে, তার কিছু নিয়মকানুন আছে। এত রাতে কেন বের হচ্ছে, সেগুলো দারোয়ান আর সুপারকে বোঝাতে তার কিছু বাড়তি সময় লেগেছে।

খবরের কাগজের অফিস ভোরবেলা ঢিলেঢালাভাবে শুরু হয়, রাতের দিকে সেটা রীতিমতো জমজমাট থাকে। রাত গভীর হওয়ার পর সেটা আবার ফাঁকা হতে শুরু করে। ঈশিতা যখন অফিসে পৌঁছেছে, তখন সেটা ফাঁকা হতে শুরু করেছে। নুরুল ইসলামের

AMARBOI.COM

অফিস তিনতলায়, লিফটে করে উঠে করিডর ধরে তার অফিসে যেতে যেতে সে দেখতে পেল, তার অফিসে দুজন মানুষ বসে আছে।

দরজা খুলে মাথা ঢুকিয়ে ঈশিতা বলল, "আসব?"

"এসো।" নুরুল ইসলাম একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "বসো।"

ঈশিতা ল্যাপটপটা টেবিলে রেখে চেয়ারটায় বসে। সাধারণ সামাজিক নিয়মে এখন নুরুল ইসলামের এই দুজন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন না, চুপচাপ বসে রইলেন। মানুষ দুজন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইল। একজন মধ্যবয়স্ক, অন্যজনের বয়স একটু কম। দুজনেই হাস্যকর এক ধরনের সাফারি কোট পরে আছে। এই পোশাকটি কে আবিষ্কার করেছে, আর বাংলাদেশের মানুষ কেন এটি পরে, বিষয়টি ঈশিতা কখনোই ভালো করে বুঝতে পারে নি। মানুষ দুজনের চুল ছোট করে ছাঁটা, পেটা শরীর, মুখে এক ধরনের কাঠিন্য।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে নুরুল ইসলামের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে ডেকেছেন!"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "আসলে আমরা ডাকিয়েছি।"

ঈশিতা এবার ঘুরে মানুষটির দিকে তাকাল। মানুষটি বলল, "বাংলাদেশে কত দিন থেকে ক্রসফায়ারে মানুষ মারা হচ্ছে, আপনি জানেন?"

ঈশিতা প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠল। ইতস্তত করে বলল, "সব মিলিয়ে বছর দশেক হবে।"

"কত মানুষকে মারা হয়েছে?"

"কয়েক হাজার।"

"আমাদের সংবিধান কি এই মার্ডারকে অ্যালাও করে?"

"না।"

"এটা নিয়ে কি পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে? হিউম্যান রাইটস গ্রুপ কি চেঁচামেচি করেছে?

"হ্যাঁ, করেছে।"

"কোনো লাভ হয়েছে?"

ঈশিতা বলল, "না, হয় নি।"

"তার মানে কী আপনি জানেন?"

ঈশিতা দুর্বল গলায় বলল, "না, জানি না।"

"তার মানে হচ্ছে, পৃথিবীর সব দেশে আইন মানার প্রয়োজন হয় না, সে রকম একটা বাহিনী থাকে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তারা দ্রুত ডিসিশন নিতে পারে। দ্রুত সেই ডিসিশন কার্যকর করতে পারে।"

"মানে মানুষ মার্ডার করতে পারে?"

"আরো অনেক কিছু করতে পারে।"

ঈশিতা জিব দিয়ে তার শুকনো ঠোঁটটা ভিজিয়ে বলল, "আপনারা গভীর রাতে ডেকে এনে আমাকে এসব বলছেন কেন? আপনারা কারা?"

মানুষটা এবার ঈশিতার দিকে তাকিয়ে হাসার মতো ভঙ্গি করল এবং ঈশিতা তখন বুঝতে পারল, এই মানুষটি আসলে ভয়ংকর একটি মানুষ। মানুষটি তার কালচে জিবটা বের

করে ওপরের ঠোঁটটা চেটে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "শোনো মেয়ে, এখন আসল কথায় চলে আসি।" মানুষটি এতক্ষণ আপনি করে কথা বলছিল, এখন তুমিতে নেমে এসেছে— "আমাদের কেউ প্রশ্ন করে না, দরকার হলে আমরা প্রশ্ন করি। বুঝেছ?"

ঈশিতা কথা না বলে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটি বলল, "কাজেই আমি কে, কী করি, কেন এসেছি, জানতে চেয়ো না। ঠিক আছে?"

ঈশিতা মাথা নাড়ল, "না, ঠিক নেই।"

মানুষটা এবার শব্দ করে হেসে ফেলল। বলল, "বিষয়টা ঠিক আছে কি নেই, সেটা তুমি খুব সহজে পরীক্ষা করে দেখতে পার। তুমি যদি চাও, আমরা তোমাকে এখন তুলে নেব, ভোর রাতে মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সিতে ফেলে যাব। একটু সুস্থ হয়ে তুমি পুলিশে কেস করার চেষ্টা করবে। তুমি দেখবে যে পুলিশ তোমার কেস নিচ্ছে না। খুব বেশি হলে পত্রপত্রিকায় একটু লেখালেখি করাতে পারবে কিন্তু দেখবে তার পরও কিছুই করতে পারবে না। চ্যালেঞ্জটা নিতে চাও?"

ঈশিতা মাথা নেড়ে জানাল, সে নিতে চায় না।

মানুষ বলল, "গুড।" টেবিলে ল্যাপটপটা দেখিয়ে বলল, "এটা তোমার?"

"হ্যাঁ।"

"এনডেভারের ওপর যে রিপোর্টটা লিখছ, সেটা এখানে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কাগজগুলো?"

"এই ব্যাগটাতেই আছে।"

"গুড।" মানুষটি ব্যাগসহ ল্যাপটপটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "আমি এটা নিতে এসেছি।"

ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "নিতে এসেছেন? আমার ল্যাপটপ?"

"হ্যাঁ। তোমার এডিটর সাহেবকে বলব দরকার হলে তোমাকে আরেকটা ল্যাপটপ কিনে দিতে।"

মানুষ দুজন উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে হেঁটে যেতে যেতে মধ্যবয়স্ক মানুষটি দাঁড়িয়ে যায়। ঘুরে নুরুল ইসলাম আর ঈশিতা দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরো একটা কথা। এনডেভার নিয়ে যদি তোমরা বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখাও, তা হলে"—কথা শেষ না করে সে হাত দিয়ে গলায় পোচ দেওয়ার ভঙ্গি করল।

মানুষ দুজন ভারী জুতোর শব্দ তুলে করিডর ধরে হেঁটে চলে গেল। লোকগুলো চোখের আড়াল হওয়ার পর ঈশিতা হতবাক হয়ে বলল, "মগের মুল্লুক? আমার ল্যাপটপটা নিয়ে চলে গেল?"

নুরুল ইসলাম নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ল্যাপটপ! শোনো ঈশিতা, খুব অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে।"

"অল্পের ওপর দিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"এরা কারা?"

নুরুল ইসলাম ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "জিজ্ঞেস কোরো না।"

"এনডেভারের সঙ্গে এদের কী সম্পর্ক।"

"এনডেভারের নাম মুখেও আনবে না।"

ঈশিতা ইতস্তত করে বলল, "আজকে এনডেভারের সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে, আপনি শুনতে চান?"

নুরুল ইসলামের মুখে আতঙ্ক এসে ভর করল, "না, শুনতে চাই না। এনডেভার নিয়ে কী লিখতে হবে, তার একটা রিপোর্ট দিয়ে গেছে।"

"সেটা কোথায়?"

নুরুল ইসলাম টেবিলের ওপর থেকে একটি কাগজ হাতে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলেন। ঈশিতা কয়েক লাইন পড়ে নুরুল ইসলামের কাছে ফিরিয়ে দিল। বিশ্বের সেরা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারার বাংলাদেশের প্রতিভাবান তরুণদের সমন্বয়ে কীভাবে ভবিষ্যতের নিউরাল কম্পিউটার গড়ে তুলবে, তার আকর্ষণীয় একটি বর্ণনা আছে। একটি বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের কী ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে এবং সেই দায়বদ্ধতার কারণে তারা এই দেশের দুস্থ শিশুদের স্বাস্থ্যশিক্ষা আর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কী কী কাজ করেছে, তার একটি বিশাল বর্ণনা আছে। ঠিক কী কারণ, জানা নেই। ঈশিতা তার একটি কথাও বিশ্বাস করল না।

গভীর রাতে ঈশিতা যখন অফিস থেকে বের হয়ে নিজের মোটরসাইকেলে উঠেছে, সে টের পেল দূরে একটি গাড়ির হেড লাইট জ্বলে উঠেছে। যখন রাস্তায় নেমেছে, তখন দেখতে পেল, গাড়িটি একটি দূরত্ব রেখে তার পেছনে পেছনে আসছে।

গাড়িটা কিছুই করল না। শুধু তার পেছনে পেছনে হোস্টেল পর্যন্ত এল, যখন সে ভেতরে ঢুকে গেল, গাড়িটা কিছুক্ষণ বাসার সামনে অপেক্ষা করে চলে গেল।

এরা কারা, ঈশিতা জানে না। কিন্তু এদের কাজকর্মে কোনো গোপনীয়তা নেই, কোনো লুকোছাপা নেই। এরা কাউকে ভয় পায় না। এই দেশে তাদের জন্য কোনো আইন নেই।

AMARBOI.COM

৩

টঙে বসে চা খেতে খেতে রাফি শারমিনকে লক্ষ করে। যারা চা খেতে আসছে, সে কাপে করে তাদের চা দিয়ে আসছে। প্লেটে করে শিঙাড়া, জিলাপি, বিস্কুট দিচ্ছে। চা খাওয়ার পর কাপ–পিরিচ নিয়ে আসছে, বিল দেওয়ার সময় হলে সে নিখুঁতভাবে কার কত টাকা বিল দিতে হবে, বলে দিচ্ছে। একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কার কত টাকা বিল হচ্ছে, সে কেমন করে মনে রাখছে, কে জানে।

রাফির কাপ–পিরিচ নেওয়ার সময় সে জিজ্ঞেস করল, "আমার কত বিল হয়েছে?"

শারমিন একটু চিন্তা না করে বলল, "সতের টাকা।"

"ঠিক করে হিসাব করেছ?"

শারমিন লাজুক মুখে মাথা নাড়ল। শারমিনের বাবা একটি গ্যাসের স্টোভে কড়াইয়ে জিলাপি ভাজছিল, রাফির দিকে তাকিয়ে বলল, "শারমিন হিসাবে ভুল করে না।"

"ভেরি গুড।" রাফি পকেট থেকে একটি বিশ টাকার নোট বের করে শারমিনের হাতে দিয়ে বলল, "বাকিটা তোমার।"

মেয়েটির মুখে হাসি ফুটে উঠল। এই দেশের মানুষ এখনো মুখ ফুটে ধন্যবাদ বলা শুরু করে নি। যখন ধন্যবাদ বলার কথা, তখন সেটা মুখের হাসি দিয়ে বোঝাতে হয়।

শারমিনের বাবা গরম জিলাপি কড়াই থেকে তুলে চিনির সিরায় ডুবাতে ডুবাতে বলল, "আমার শারমিন যে কোনো হিসাব মাথার মাঝে করে ফেলতে পারে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

রাফি শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যি পার?"

শারমিন ঘাড় নেড়ে জানাল, সে পারে। রাফি বলল, "বলো দেখি, সতেরকে তের দিয়ে গুণ করলে কত হয়?"

শারমিন একটু হকচকিয়ে গেল, ইতস্তত করে বলল, "জানি না।"

"তা হলে যে বললে সব হিসাব মাথার মাঝে করে ফেলতে পার?"

শারমিনের বাবা বলল, "আসলে আমার এই টঙে চা-নাশতার হিসাব করতে পারে। যোগ-বিয়োগ পারে না।"

রাফি একটু অবাক হয়ে বলল, "যোগ-বিয়োগ পারে না, কিন্তু চা-নাশতার হিসাব করতে পারে! ঠিক আছে, তা হলে চা-নাশতার হিসাবই করতে দিই।" রাফি শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা বিস্কুট কত?"

শারমিন বলল, "এক টাকা।"

"সতের জন এসেছে বিস্কুট খেতে। একজন তেরটা করে বিস্কুট খেয়েছে। কত টাকা বিল হবে, বলো?"

শারমিন কোনো চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে বলল, "দুই শ একুশ টাকা।"

রাফি মনে মনে হিসাব করে দেখল, ঠিকই বলেছে। শারমিন ঠিকই গুণ করতে পারে। কিন্তু গুণ বলতে কী বোঝায়, সে জানে না। রাফি জিজ্ঞেস করল, "যদি তেতাল্লিশ জন লোক এসে সবাই তেতাল্লিশটা করে বিস্কুট খায়, তা হলে কত টাকার বিস্কুট খাবে?"

শারমিন বলল, "আঠার শ উনপঞ্চাশ টাকা।"

রাফিকে এবার কাগজে লিখে হিসাব করে দেখতে হল, শারমিন ঠিক বলেছে কি না। অনুমান করেছিল সঠিক হবে এবং দেখা গেল সত্যিই সঠিক হয়েছে। রাফি এবার একটু অবাক হতে শুরু করেছে, মেয়েটি কত পর্যন্ত যেতে পারে, তার দেখার ইচ্ছে হল। জিজ্ঞেস করল, "নয় শ বিরাশি জন এসে সবাই সাত শ একুশটি করে বিস্কুট খেয়েছে। বলো দেখি কত টাকার বিস্কুট খেয়েছে?"

"সত্তুর শ শ আশি শ বাইশ টাকা।"

শারমিনের উত্তরটা বিচিত্র, রাফি আবার জিজ্ঞেস করল, "কী বললে?"

"সত্তুর শ শ, আশি শ বাইশ টাকা।"

রাফি কথাটা বুঝতে পারল না, কিন্তু তার পরও সে কাগজে লিখে ফেলল। তারপর নয় শ বিরাশিকে সাত শ একুশ দিয়ে গুণ করতে শুরু করে। কয়েক মিনিট পর উত্তর বের হল, সাত লাখ আট হাজার বাইশ। শারমিন সাত লাখকে বলেছে সত্তুর শ শ আর আট হাজারকে বলেছে আশি শ। অন্যরকমভাবে বলেছে কিন্তু ভুল বলে নি। রাফি অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে দেখল, মেয়েটি মুখে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। রাফি জিজ্ঞেস করল, "হাসো কেন?"

"কেউ যদি সাত শ একুশটা বিস্কুট খায়, তা হলে তার পেট ফেটে যাবে!"

শারমিনের কথা শুনে রাফিও হেসে ফেলল। শারমিন ভুল বলে নি, সাত শ একুশটা বিস্কুট খেলে সত্যিই পেট ফেটে যাওয়ারই কথা। এই মুহূর্তে রাফি অবিশ্যি সেটা নিয়ে মাথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘামাল না। মেয়েটি কত পর্যন্ত হিসাব করতে পারে, সেটা সে দেখতে চাইল। বলল, "পেট ফাটলে ফাটুক, সেটা নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। তুমি আমাকে বলো, যদি দুই হাজার তিন শ বাইশ জন এসে সবাই সাত হাজার নয় শ আটচল্লিশটা করে বিস্কুট খায়, তা হলে কত টাকা বিল হবে?"

শারমিনকে একটু ইতস্তত করতে দেখা গেল, বলল, "দুই হাজার? হাজার মানে কী?"

রাফি বুঝতে পারল, মেয়েটি এর আগে কখনো হাজার কথাটি ব্যবহার করে নি। তার দৈনন্দিন হিসাব কখনোই কয়েক শয়ের বেশি যায় না। তাই সে হাজার শব্দটি ব্যবহার না করে জিজ্ঞেস করল, "তেইশ শ বাইশ জন সবাই ঊনাশি শ আটচল্লিশটা করে বিস্কুট খেয়েছে, কত টাকা বিল?"

শারমিন এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলল, "আঠার শ শ শ পঁয়তাল্লিশ শ শ বাহান্ন শ ছাপ্পান্ন।"

রাফিকে এবারে তার পকেট থেকে মোবাইল টেলিফোন বের করে সেখানে ক্যালকুলেটরে হিসাব করে দেখতে হল, শারমিন তার এক থেকে এক শ পর্যন্ত সংখ্যার জ্ঞান নিয়ে উত্তরটা নিখুঁতভাবে বলেছে। অবিশ্বাস্য। সে অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে রইল, জিজ্ঞেস করল, "তুমি এইভাবে কত পর্যন্ত পার?"

"কত পর্যন্ত?" শারমিন ইতস্তত করে বলল, "যত পর্যন্ত দরকার।"

ঠিক আছে, "বলো দেখি, বত্রিশ হাজার চুয়ান্ন শ সাতষট্টি জন মানুষ এসে সবাই নয় হাজার আট শ তেরটা করে বিস্কুট খেয়েছে" প্রশ্নটা শেষ করার আগেই তার মনে পড়ল, মেয়েটি হাজার শব্দটা জানে না। কাজেই হাজার শব্দটা ব্যবহার না করে কীভাবে বলা যায়, চিন্তা করছিল। তার আগেই শুনতে পেল শারমিন বলছে, "তিন হাজার হাজার হাজার এক শ তিরানব্বই হাজার হাজার আট শ পঁচানব্বই হাজার নয় শ আটাশি টাকা।"

রাফি ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি না এক্ষুনি বললে, হাজার জান না?"

"এখন জানি।"

"কেমন করে জানলে?"

"এই যে আপনি প্রথমে বললেন, দুই হাজার তিন শ বাইশ, তারপর সেটাকে বললেন তেইশ শ বাইশ। তার মানে দশ শ হচ্ছে হাজার।"

রাফি শারমিনের দিকে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটি শুধু যে মাথার মধ্যে গুণ করতে পারে তা-ই নয়, নিজে নিজে শিখেও নিতে পারে। শারমিন যে সংখ্যাটা বলেছে, রাফি সেটা কাগজে লিখে নিল। তার মোবাইল টেলিফোনের ক্যালকুলেটরে সেটা সঠিকভাবে দেখাতে পারবে না। তার ক্যালকুলেটর নয় অঙ্কের বেশি দেখাতে পারে না। অন্যভাবে গুণটা করে দেখতে হবে, কিন্তু রাফির কোনো সন্দেহ রইল না যে সংখ্যাটি সঠিক। যে বিষয়টা বিস্ময়কর সেটা হচ্ছে, মাথার মধ্যে হিসাব করতে এই মেয়েটি এক মুহূর্তও সময় নিচ্ছে না। প্রত্যেকবারই সঠিকভাবে বলে দিচ্ছে।

রাফি শারমিনের হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?" শারমিন কোনো কথা না বলে বিব্রতভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, প্রশ্নের উত্তর দিল তার বাবা। বলল, "লেখাপড়া করে না।"

রাফি হতবাক হয়ে বলল, "লেখাপড়া করে না?"

"না। আমি কম চেষ্টা করি নাই। করতে চায় না।"

রাফি হিসাব মেলাতে পারল না, যে মানুষ অবলীলায় যে কোনো সংখ্যার সঙ্গে অন্য যে

কোনো সংখ্যা গুণ করে ফেলতে পারে, সে লেখাপড়া করতে চাইবে না কেন? রাফি শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি লেখাপড়া করতে চাও না?"

শারমিন কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রাফি লক্ষ করল, তার মুখে লজ্জা এবং বেদনার ছাপ। রাফি গলার স্বর নরম করে বলল, "করতে চাও না?"

শারমিন অস্পষ্ট স্বরে বলল, "চাই। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

এবারও রাফির প্রশ্নের উত্তর দিল শারমিনের বাবা। বলল, "ওর কথা আর বলবেন না। যখন পড়তে যায় তখন নাকি বইয়ের লেখা উল্টা হয়ে যায়—তারপর নাকি নড়েচড়ে লাফায়, সে নাকি পড়তে পারে না।"

রাফি চোখ বড় বড় করে বলল, "ডিসলেক্সিয়া!"

শারমিন আর তার বাবা দুজনই রাফির দিকে তাকাল। বাবা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন?"

"ডিসলেক্সিয়া। যাদের ডিসলেক্সিয়া থাকে, তাদের এ রকম হয়, লেখাপড়া করতে পারে না। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষ আছে, যারা খুবই স্মার্ট কিন্তু লেখাপড়া জানে না।"

শারমিন রাফির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই রোগের চিকিৎসা নাই?"

"এটা তো রোগ না, এটা হচ্ছে ব্রেনের এক ধরনের সমস্যা। বিদেশে বাচ্চাদের ডিসলেক্সিয়া থাকলে তাদের স্পেশাল স্কুল থাকে। আমাদের দেশে সেরকম কিছু নেই, বাবা-মা, মাস্টাররা মনে করে, বাচ্চাটা দুষ্টু, পড়ায় মনোযোগ নেই, বকাঝকা করে মারধর করে।"

শারমিন নিচু গলায় বলল, "স্কুলেও আমাকে অনেক মারত।"

শারমিনের বাবা অপরাধীর মতো বলল, "আমিও কত মেরেছি।"

রাফি বলল, "মারধর ইজ নো সলিউশন। শারমিনের কোনো দোষ নেই। বেচারি পারে না। ওর ডিসলেক্সিয়া।"

শারমিন রাফির কাছে এসে আবার জিজ্ঞেস করল, "বিদেশে এই রোগের চিকিৎসা আছে?"

মেয়েটির গলার স্বরে এক ধরনের ব্যাকুলতা। রাফির খুব মায়া হল, নরম গলায় বলল, "এটা রোগ না, তাই এর চিকিৎসা নেই। কিন্তু যেহেতু এটা একটা সমস্যা, তাই এই সমস্যাটাকে বাইপাস করার উপায় নিশ্চয়ই বের করেছে। যারা অন্ধ, তারাও তো লেখাপড়া করে, তা হলে তুমি পারবে না কেন?"

শারমিন ফিসফিস করে, শোনা যায় না, এ রকম স্বরে বলল, "স্যার, আমার খুব লেখাপড়া করার ইচ্ছা।"

রাফি বলল, "নিশ্চয়ই তুমি লেখাপড়া করবে। আমি দেখব।"

রাফি টং থেকে উঠে আসার সময় লক্ষ করল, আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের বেশ কয়েকজন শারমিনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একজন উচ্চ স্বরে জিজ্ঞেস করছে, "বল দেখি, তিন শ বাইশকে সাত শ নয় দিয়ে গুণ করলে কত হয়?"

রাফি হেঁটে চলে গেল বলে শারমিন কী বলল, সেটা ঠিক শুনতে পারল না। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে এই বাচ্চা মেয়েটির জন্য একটি সমস্যা হতে পারে।

দুই দিন পর রাফি সমস্যার মাত্রাটা টের পেল। নিজের অফিস ঘরে গভীর মনোযোগ দিয়ে ক্লাস লেকচার ঠিক করছে, তখন দরজায় একজন মানুষের ছায়া পড়েছে। রাফি মাথা তুলে

তাকিয়ে দেখে লুঙ্গি পরা আধবুড়ো একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। রাফি জিজ্ঞেস করল, "কে? আমার কাছে?"

"জি।"

"আসেন।"

মানুষটা কুণ্ঠিতভাবে ভেতরে এসে ঢোকে। রাফির কাছে মানুষটিকে চেনা চেনা মনে হয়, কিন্তু সে ঠিক চিনতে পারে না। তখন মানুষটি নিজেই পরিচয় দিল। বলল, "স্যার, আমি শারমিনের বাবা।"

"ও আচ্ছা! হ্যাঁ, বসেন।" রাফি নিজেই অবাক হয়ে যায়, সে কেমন করে শারমিনের বাবাকে চিনতে পারল না। এর আগেও এ রকম ব্যাপার ঘটেছে, যে মানুষটিকে যেখানে দেখার কথা, সেখানে দেখলে কখনোই চিনতে ভুল হয় না। কিন্তু যেখানে থাকার কথা নয়, সেখানে দেখলে চট করে চিনতে পারে না।

শারমিনের বাবা বসল না। কাঁচুমাচু মুখে বলল, "স্যার, বড় বিপদে পড়েছি।"

"কী বিপদ!"

"শারমিনকে নিয়ে বিপদ।"

রাফি ভুরু কুঁচকে বলল, "শারমিনকে নিয়ে?"

"জি স্যার।" বিপদটা কী সেটা না বলে মানুষটি বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

রাফি বলল, "বলেন, শুনি।"

শারমিনের বাবা একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "অনেক খুঁজে আপনার কাছে এসেছি। আপনি স্যার নূতন এসেছেন, সবাই চিনে না, সে জন্যে খুঁজে বের করতে সময় লেগেছে।"

"হ্যাঁ, আমি নূতন এসেছি।"

"স্যার, মনে আছে, আপনি সেদিন শারমিনকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন? শারমিন তার উত্তর দিল।"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"তখন অনেক ছাত্রছাত্রী দাঁড়িয়েছিল, তারা ব্যাপারটা দেখেছে। এখন তারা শারমিনকে আর কোনো কাজ করতে দেয় না। বলতে গেলে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তাকে জ্বালায়।"

"জ্বালায়?"

"জি স্যার।"

রাফি জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে জ্বালায়?"

"সারাক্ষণ তাকে জিজ্ঞেস করে, গুণ দিলে কত হয়, যোগ দিলে কত হয়—এসব। ত্যক্তবিরক্ত হয়ে যাচ্ছে।"

রাফি একটু হাসল, বলল, "এইটা দুনিয়ার নিয়ম। যে যেটা পারে তাকে সবাই সেটা করতে বলে। যে গান গাইতে পারে তাকে সবাই গান গাইতে বলে। যে হাত দেখতে পারে তাকে দেখলে সবাই হাত বাড়িয়ে দেয়! শারমিনকে একটু সহ্য করতে হবে।"

"সেইটা সমস্যা না।"

রাফি একটু অবাক হয়ে বলল, "তা হলে কোনটা সমস্যা?"

শারমিনের বাবা একটু ইতস্তত করে বলল, "স্যার, আপনাকে কীভাবে বলি বুঝতে পারছি না। জানাজানি হলে আমার বিপদও হতে পারে—"

রাফির কাছে এবার ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হতে থাকে। সে মানুষটির দিকে খানিকটা বিস্ময় এবং অনেকখানি কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে। মানুষটি একবার মাথা চুলকালো,

তারপর গাল চুলকালো, তারপর নিচু গলায় বলল, "স্যার, আমরা যে এই টংঘরগুলো চালাই সেই জন্য আমাদের নিয়মিত চাঁদা দিতে হয়।"

"চাঁদা? কাকে চাঁদা দিতে হয়?"

"ছাত্রনেতাদের। তারা এসে যখন খুশি ফাও খায়, আবার দৈনিক চাঁদা নেয়।"

"কী আশ্চর্য!"

"না স্যার, এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নাই। এইটাই নিয়ম যখন যেই দল ক্ষমতায়, তখন সেই দলকে চাঁদা দিই। সেইটা সমস্যা না। সেইটা আমরা সবাই মেনে নিয়েছি।"

"তা হলে সমস্যাটা কী?"

শারমিনের বাবা আরেকটু এগিয়ে এসে এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "ক্যাম্পাসে এখন যে সবচেয়ে বড় ছাত্রনেতা, তার নাম হান্নান। অনেক বড় মাস্তান, সবাই ডাকে ভোটকা হান্নান।"

"কী করেছে ভোটকা হান্নান?"

"সেই দিন আমার টংয়ে এসে আমারে জিজ্ঞেস করে, এই, তোর মেয়ে নাকি অঙ্কের এক্সপার্ট। আমি বললাম, সেইটা তো জানি না, তাকে যোগ-বিয়োগ করতে দিলে করতে পারে। তখন ভোটকা হান্নান শারমিনকে টেস্ট করল। যেটাই গুণ দিতে বলে শারমিন করে দেয়। তখন, তখন—" মানুষটি হঠাৎ কথা বন্ধ করে থেমে গেল।

"তখন কী?"

"ভোটকা হান্নান এখন শারমিনরে তুলে নিতে চায়।"

"তুলে নিতে চায়?" রাফি তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বলল, "তুলে নিতে চায় মানে কী?"

"শারমিনরে নাকি ঢাকায় নিয়ে যাবে, টেলিভিশনে দেখাবে।" শারমিনের বাবা একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। বলল, "স্যার, আপনি যদি আমারে বলতেন শারমিনরে ঢাকায় টেলিভিশনে নিবেন, স্যার আমি তা হলে খুশি হয়ে রাজি হতাম। আপনি সেদিন মেয়েটারে বলেছেন, তাকে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। মেয়েটা কী খুশি! বাড়িতে গিয়ে তার মাকে কতবার সেই কথাটা বলেছে। স্যার, আপনাদের ওপর ভরসা করে আমরা থাকি। তাই বলে ভোটকা হান্নান? সে কেন আমার এই ছোট মেয়েটার দিকে নজর দিবে?"

রাফি মাথা নাড়ল। বলল, "না না, এটা তো হতেই পারে না। আমি দেখি কী করা যায়।"

"কিন্তু স্যার ভোটকা হান্নান যদি জানে আমি আপনার কাছে নালিশ দিয়েছি, তা হলে স্যার আমার লাশ পড়ে যাবে স্যার।"

"তা হলে কেমন করে হবে? আমি যদি ইউনিভার্সিটির প্রক্টর বা কাউকে বলতে যাই—"

"না না স্যার, সর্বনাশ! কাউরে বলা যাবে না।"

"তা হলে?"

"স্যার, আপনি বলেছিলেন না শারমিনের একটা ব্যারাম আছে। কঠিন ব্যারাম—ডিস্টিমিস্টি না কী যেন নাম।"

"ব্যারাম নয়, একটা ডিজঅর্ডার, ডিসলেক্সিয়া।"

"জি স্যার। আমি ভোটকা হান্নানকে সেটা বলেছি। আমি বলেছি, আপনি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। আপনার পারমিশন ছাড়া শারমিনকে কোথাও নেওয়া যাবে না।"

"গুড।" রাফি হাসি হাসি মুখে বলল, "ভেরি গুড। বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছেন।"

www.amarboi.com

"ভোটকা হান্নান যদি আপনার কাছে আসে, আপনি তারে বলবেন, শারমিনকে কোথাও নেওয়া ঠিক হবে না।"

"ঠিক আছে বলব। আপনি চিন্তা করবেন না।"

শারমিনের বাবা চলে যাওয়ার পরও রাফি চুপচাপ তার ডেস্কে বসে রইল। এই দেশে সাধারণ মানুষের জীবনটা বড় কঠিন।

মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার পর ডিপার্টমেন্টের সব শিক্ষক তাদের সাপ্তাহিক মিটিং করতে বসে। এই মঙ্গলবার মিটিংটা শুরু করার পর দেখা গেল আলোচনা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নেই। রাশেদ স্যার সুযোগ পেলেই জটিল একটি গবেষণার বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করবেন বলে কম বয়সী লেকচারাররা একটার পর একটা হালকা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে শুরু করল। প্রফেসর হাসান সেই বিষয়গুলো সমান উৎসাহে আলোচনা করতে থাকলেন। একসময় রাফির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তারপর রাফি তোমার ক্লাস কেমন চলছে?"

রাফি বলল, "ভালো স্যার।"

সুহানা বলল, "ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভীষণ পপুলার। বিশেষ করে ছাত্রীদের মধ্যে।"

সব শিক্ষক শব্দ করে এক ধরনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। প্রফেসর হাসান ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী ব্যাপার? একজন ইয়ং হ্যান্ডসাম মানুষকে তার ছাত্রীরা পছন্দ করছে—তাতে তোমরা এত হিংসা করছ কেন?"

রানা বলল, "না স্যার, আমরা মোটেও হিংসা করছি না—শুধু একটু সতর্ক করে দিতে চাইছি।"

"কী নিয়ে সতর্ক করবে?"

"ওদের হাইফাই ইউনিভার্সিটির ছাত্রীরা লেখাপড়া ছাড়া কিছু বোঝে না—সবাই হচ্ছে লেবদু টাইপের। আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের অসম্ভব তেজ!"

কবির বলল, "সুহানাকে দেখলেই বোঝা যায়!"

সুহানা প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই প্রফেসর হাসান রাফিকে জিজ্ঞেস করলেন, "নূতন জায়গা, নূতন পরিবেশ, তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো? আমি খোঁজ নিতেও পারছি না—"

"না স্যার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সবাই খুব হেল্পফুল। ক্লাসও খুব ইন্টারেস্টিং, ক্লাসের বাইরেও খুব ইন্টারেস্টিং।"

সুহানা জানতে চাইল, "ক্লাসের বাইরে ইন্টারেস্টিং কী হল?"

রাফি বলল, "আমরা যে টংয়ে চা খেতে যাই, সেখানে শারমিন নামের একটা ছোট মেয়ে আছে। সেই মেয়েটা যে কোনো ডিজিটের সংখ্যা দিয়ে যে কোনো ডিজিটের সংখ্যা গুণ করে ফেলতে পারে। আমার মোবাইলে যে ক্যালকুলেটর আছে সেটা নয় ডিজিটের—আমি সেটা দিয়ে টেস্ট করেছি।"

রাশেদ বললেন, "নয় ডিজিট তো অনেক।"

রাফি বলল, "হ্যাঁ। আমরা দুই ডিজিটের সংখ্যাকে কষ্ট করে পারি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েটার এক মুহূর্ত দেরি হয় না—তাকে কিছু করতে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়।"

রানা বলল, "আশ্চর্য তো! আমাদের শারমিন? টংয়ের শারমিন?"

"হ্যাঁ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুহানা বলল, "আমরা চা-শিঙাড়া খেলেই সে বিল বলে দেয়। আমি মনে করতাম, বানিয়ে বানিয়ে বলছে।"

রাফি বলল, "ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েটার কোনো ফরমাল লেখাপড়া নেই। এক শ পর্যন্ত গুনতে পারে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ—এসবের কনসেপ্ট নেই। এমনি গুণ করতে বললে পারে না—একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়। এতজন মানুষ এতগুলো বিস্কুট খেয়েছে, বিল কত হবে—এভাবে!"

রাশেদ মাথা নাড়লেন, বললেন, "মোস্ট ইন্টারেস্টিং!"

রাফি বলল, "আমি লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম। ওর বাবা বলল, শারমিন লেখাপড়া করতে পারে না। কথা শুনে মনে হল ডিসলেক্সিয়া।"

সুহানা জিজ্ঞেস করল, "ডিসলেক্সিয়া কী?"

রাফি ইতস্তত করে বলল, "এক ধরনের লারনিং ডিজঅর্ডার। কাগজের লেখা মনে হয় উল্টে গেছে।"

প্রফেসর হাসান মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ। আসলে আমরা যে লেখাপড়া করি, এটা কিন্তু খুবই নূতন একটা ব্যাপার—হয়তো মাত্র কয়েক শ বছরের ব্যাপার। আদিম মানুষ লেখাপড়া করত না। কাজেই বলতে পার আমাদের অনেকের ব্রেন সেটার জন্য রেডি হয় নি—সেটা হচ্ছে ডিসলেক্সিয়া। আমরা যে রকম লেখা পড়তে পারি, অর্থাৎ আমাদের ব্রেন যেভাবে একটা গ্রাফিক সিম্বলকে ইন্টারপ্রেট করতে পারে, ডিসলেক্টিক মানুষেরা পারে না।"

সুহানা জানতে চাইল, "এর চিকিৎসা নেই স্যার?"

"ঠিক চিকিৎসা নেই, তবে এটাকে মেনে নিয়ে মানুষজন অন্যভাবে লিখতে-পড়তে শেখে। এর সঙ্গে আইকিউয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক স্মার্ট মানুষ আছে, যাদের ডিসলেক্সিয়া। আমার ধারণা, বাদশাহ আকবরের ডিসলেক্সিয়া ছিল!"

"কেন স্যার?"

"আকবর খুব স্মার্ট মানুষ ছিল, কিন্তু লেখাপড়া শেখে নি! মনে হয়, শিখতে পারে নি ডিসলেক্সিয়ার কারণে।"

রাফি জিজ্ঞেস করল, "ডিসলেক্সিয়া হলে কীভাবে লেখাপড়া করে?"

"আমি ঠিক জানি না। অনেক দিন আগে টেলিভিশনে একটা প্রোগ্রাম দেখেছিলাম। একদল রিসার্চারের ধারণা, সাদার ওপরে কালো লেখাটা হচ্ছে সমস্যা। সাদার বদলে লাল কাগজে লিখলেই অনেক ডিসলেক্টিক মানুষ পড়তে পারে। যদি লাল কাচের চশমা পরে কিংবা লাল আলোতে চেষ্টা করে, তা হলে অনেকেই নাকি পড়তে পারে।"

রাফি অবাক হয়ে বলল, "ইন্টারেস্টিং!"

প্রফেসর হাসান বললেন, "তবে টেলিভিশনের সব কথা বিশ্বাস করতে নেই। বেশিরভাগই ভুয়া।"

কবির বলল, "কিন্তু শারমিনের নয় ডিজিটের সংখ্যা গুণ করার ক্ষমতাটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং! আমাদের এত দিন ধরে চা খাওয়াচ্ছে আমরা জানি না, আর রাফি এসে এক দিনে বের করে ফেলল।"

সুহানা বলল, "তোদের গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।"

"আমি একা কেন, তোদেরও গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।"

"ঠিকই বলেছিস, আমাদের সবার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।"

প্রফেসর হাসান বললেন, "মরতে চাইলে মরো, কিন্তু তার আগে সবাই নিজের নিজের পরীক্ষার খাতা দেখে কমিটির কাছে জমা দেবে।"

রানা বলল, "স্যার, আপনার জন্য আমরা শান্তিতে মরতেও পারব না?"

"না। পারবে না।"

সুহানা বলল, "শারমিন মেয়েটির যদি ডিসলেক্সিয়া না থাকত তা হলে অনেক বড় ম্যাথমেটিশিয়ান হতে পারত?"

প্রফেসর হাসান বললেন, "নো নো! ডোন্ট গেট ইট রং। মাথার ভেতরে বড় বড় গুণ করে ফেলার ক্ষমতা আর ম্যাথমেটিশিয়ান হওয়া এক জিনিস না। এক শ টাকার ক্যালকুলেটরও বড় বড় গুণ করতে পারে। তার মানে এই না যে এক শ টাকার ক্যালকুলেটর খুব বড় ম্যাথমেটিশিয়ান!"

"তার মানে এই গিফটার কোনো গুরুত্ব নেই?"

"যদি শুধু বড় বড় গুণ করতে পারে আর কিছু পারে না, তা হলে সে রকম গুরুত্ব নেই। ইন্টারেস্টিং কিন্তু সে রকম গুরুত্বপূর্ণ না। মাঝে মধ্যেই এ রকম মানুষ পাওয়া যায়। কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার আগে এ রকম মানুষ খুব ইউজফুল ছিল। গাউস তার জীবনে এ রকম মানুষকে ব্যবহার করে অনেক ক্যালকুলেশন করেছেন।"

রাশেদ বললেন, "অনেক অটিস্টিক স্যাভেন্ট আছে যারা এ রকম পারে। আর কিছু পারে না, কিন্তু এ রকম ক্যালকুলেশন করতে পারে। পাইয়ের মান কয়েক শ ডিজিট পর্যন্ত বের করে ফেলতে পারে!"

"তাই?" সুহানার কেমন যেন মন খারাপ হল। বলল, "আমি আরো ভাবছিলাম শারমিন এখন ফেমাস হয়ে যাবে। এত কিউট একটা মেয়ে কত কষ্ট করে, তার টাকা-পয়সার সমস্যা মিটে যাবে।"

প্রফেসর হাসান বললেন, "সেটা হয়তো হতে পারে। আজকালকার টিভি চ্যানেলগুলো যদি খবর পায়, তা হলে তাকে নিয়ে প্রোগ্রাম শুরু করে দেবে—কিন্তু ইন দ্য লং রান ব্যাপারটা ভালো হয় না। ছোট বাচ্চাদের ফেমাস বানানো ঠিক না। ক্ষতি হয়।"

রাফির মুখ নিশপিশ করছিল ভোটকা হান্নানের কথা বলার জন্য, কিন্তু সে বলল না। শারমিনের বাবা খুব করে বলে দিয়েছে সে যেন কাউকে না বলে। তবে বিষয়টি নিয়ে প্রফেসর হাসানের সঙ্গে কথা বলা যায়—এই মানুষটি অনেক কিছু জানেন। তাকে বললে মনে হয় ঠিক ঠিক সাহায্য করতে পারবেন। ইউনিভার্সিটিতে নূতন এসেই সে ভোটকা হান্নানদের সঙ্গে ঝামেলা করতে চায় না।

মিটিং শেষে যখন সবাই চলে গেল, তখন রাফি প্রফেসর হাসানের কাছে গিয়ে বলল, "স্যার আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

প্রফেসর হাসান বললেন, "নিরিবিলি?"

"জি স্যার। নিরিবিলি।"

"বল।"

"কথাটা শারমিন নামের মেয়েটিকে নিয়ে।"

প্রফেসর হাসান বললেন, "কী কথা?"

"আমি যখন শারমিনের গুণ করার ক্ষমতাটা টেস্ট করছি, তখন আশপাশে অনেক ছাত্রছাত্রী ছিল, তারা ব্যাপারটা জেনে গেছে।"

"তারা এখন মেয়েটাকে জ্বালাচ্ছে?"

"তা একটু জ্বালাচ্ছে, কিন্তু সেটা সমস্যা না। সমস্যা অন্য জায়গায়।"

"কোন জায়গায়?"

"একটা মাস্তান ছাত্রনেতা শারমিনকে তুলে নিতে চাচ্ছে।"

প্রফেসর হাসান ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "শারমিনের বয়স কত?"

"দশ–এগার হবে।"

"এত ছোট মেয়েকে তুলে নিতে চাচ্ছে কেন?"

"তাকে টিভি চ্যানেলে নিয়ে যাবে।"

প্রফেসর হাসান হতাশার ভঙ্গি করে মাথা নাড়লেন, বললেন, "মাস্তানের নাম কী?"

রাফি বলল, "তার বাবা কাউকে বলতে না করেছেন, সেই জন্য সবার সামনে বলি নি। নাম হান্নান। সবাই ডাকে ভোটকা হান্নান।"

"কখনো নাম শুনি নি যাই হোক মেয়ের বাবাকে বলো চিন্তা না করতে। উই উইল টেক কেয়ার।"

"আপনাকে হয়তো কিছু করতে হবে না, শারমিনের বাবা হান্নানকে বুঝিয়েছে শারমিনের খুব কঠিন অসুখ। অসুখের নাম ডিসলেক্সিয়া। আমি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। কাজেই আমি অনুমতি না দিলে তাকে কোথাও নেওয়া যাবে না।"

প্রফেসর হাসান হাসলেন, "ভালোই বলেছে। স্মার্ট ম্যান।"

"কাজেই মনে হয় আমার কাছে ওই মাস্তান আসবে। আমি বোঝানোর চেষ্টা করব। আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।"

"ভালো করেছ। দরকার হলে আমি দেখব। ওই মাস্তানদের কোনো পাত্তা দেবে না।"

রাফি মাথা নাড়ল। বলল, "না স্যার পাত্তা দেব না।"

AMARBOI.COM

পরদিন সকালে রাফি ইন্টারনেটে ডিসলেক্সিয়া নিয়ে পড়াশোনা করছে, অবাক হয়ে দেখল আইনস্টাইন, পাবলো পিকাসো, টমাস এডিসন থেকে শুরু করে ওয়াল্ট ডিজনি, টম ক্রুজ— সবাই নাকি ডিসলেক্সিক! মনে হচ্ছে ডিসলেক্সিয়া না হওয়া পর্যন্ত কোনো সৃজনশীল কাজ করা যায় না।

ঠিক এ রকম সময় দরজা থেকে নাকি গলার স্বরে কে যেন বলল, "আসতে পারি?"

রাফি তাকিয়ে দেখে অসম্ভব শুকনো একজন ছেলে, টেলিভিশনে এইডসের রোগীদের অনেকটা এ রকম দেখায়। গাল ভাঙা এবং কোটরাগত চোখ, তবে মাথায় বাহারি চুল। রাফি বলল, "আসো।"

ছেলেটি ভেতরে ঢুকে বলল, "আপনার সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি।"

"তুমি কে?"

ছেলেটি একটু থতমত খেয়ে বলল, "আমার নাম হান্নান।"

"তুমি কি আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছাত্র?"

"না। আমি ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের। ফোর্থ ইয়ার সেকেন্ড সেমিস্টার।"

"কী ব্যাপার। বলো।"

"আমাকে চিনেছেন স্যার? ক্যাম্পাসে সবাই আমাকে চিনে।"

"আমি নূতন এসেছি সবাইকে চিনি না।"

"আমি তো স্যার ছাত্র সংগঠন করি, আমাকে অনেকে ভোটকা হান্নান বলে।"

রাফি এবার কষ্ট করে তার বিস্ময় গোপন করল। বলল, "ও আচ্ছা। তোমাকে ভোটকা হান্নান ডাকে?"

ছেলেটি একটু হাসল, তার প্রয়োজনের চাইতে বেশি দাঁত, দাঁতের রং হলুদ, মাঢ়ীর রং কালো। বলল, "জি স্যার।"

"নামটা ঠিক হয় নি।"

"জানি স্যার।"

"কী বলবে বলো।"

ভোটকা হান্নান কীভাবে কথাটা শুরু করবে, রাফি সেটা শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

ভোটকা হান্নান গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "আমাদের যে টংগুলো আছে সেখানে মাহতাবের একটা টং আছে। খুবই গরিব স্যার, আমরা হেল্প করার জন্য এই টংটা বানিয়ে দিয়েছি।"

রাফি বলল, "ভেরি গুড।"

"মাহতাবের ছোট মেয়ে তার বাবাকে সাহায্য করে, আমরাও দেখেশুনে রাখি। সেই মেয়ে নাকি বড় বড় গুণ মুখে মুখে করে ফেলে। আমি ভাবলাম, মেয়েটাকে একটু সাহায্য করি।"

ভোটকা হান্নান তার মুখে একটা গাম্ভীর্য ধরে রেখে বলল, "ঢাকায় টিভি চ্যানেল, পত্রিকার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমি ভাবছি কয়েকটা চ্যানেলে প্রোগ্রাম করিয়ে—"

রাফি এবার তাকে থামাল। বলল, "দেখো হান্নান, ওই মেয়েটা যে এভাবে গিফটেড সেটা কেউ জানত না। আমি বের করেছি। আমি আরো একটা জিনিস বের করেছি, সেটা হচ্ছে মেয়েটা সিরিয়াসলি ডিসলেক্টিক। ওই মেয়েটার সাহায্য দরকার, রেডিও-টেলিভিশনে তার এক্সপোজারের কোনো দরকার নেই।"

"কিন্তু স্যার যদি টেলিভিশনে দেখিয়ে সাহায্য চাওয়া যায়—"

"ছিঃ! সাহায্য চাইবে কেন? সাহায্য মানে তো ভিক্ষা, এই বাচ্চা মেয়ে ভিক্ষা করবে কেন?"

ভোটকা হান্নান একটু থতমত খেয়ে গেল। টাকা-পয়সা তার কাছে সব সময়ই অমূল্য জিনিস, সেটা চাঁদাবাজি করেই আসুক আর ভিক্ষে করেই আসুক, সেটাকে কেউ এভাবে ছিঃ বলে উড়িয়ে দিতে পারে, আগে বুঝতে পারে নি। সে আবার চেষ্টা করল। বলল, "টেলিভিশনে দেখালে একটা পরিচিতি হবে—"

রাফি এবার একটু কঠিন মুখ করে বলল, "দেখো হান্নান, তুমি আমার কাছে কেন এসেছ জানি না। আমি এই ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে জুনিয়র টিচার, এক সপ্তাহও হয় নি জয়েন করেছি। এই মেয়েটিকে নিয়ে তুমি টিভিতে যাবে, না সিনেমাতে যাবে সেটা নিয়ে আমার সাথে কথা বলার দরকার থাকার কথা নয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে যে কারণে তুমি তাকে টিভিতে নিতে চাচ্ছ, সেই কারণটা আমি বের করেছি। কাজেই আমার একটু দায়-দায়িত্ব এসে পড়েছে। বুঝেছ?"

"জি স্যার, কিন্তু—"

"আমার কথা আগে শেষ করি।" রাফি মুখ আরো কঠিন করে বলল, "আমি এই মেয়ের গার্ডিয়ান না, কিন্তু যে গার্ডিয়ান তাকে বলো, যদি সে মেয়ের ভালো চায়, যেন কোনোভাবেই তাকে রেডিও-টেলিভিশনে না পাঠায়।"

"কিন্তু স্যার, আমি অলরেডি চ্যানেলে, খবরের কাগজে যোগাযোগ করেছি, তারা রাজি হয়েছে।"

"আবার যোগাযোগ কর। করে বলো সম্ভব নয়।"

ভোটকা হান্নান এবার তার নিজের মুখটা কঠিন করে বলল, "না স্যার, আমি সেটা করব না। যেহেতু কথা দিয়েছি, কথা রাখতে হবে স্যার।"

"ভেরি গুড। কিন্তু তুমি আমার কাছে কেন এসেছ? যদি জোর করে এই মেয়েকে তুলে নিতে চাও, সেটা তোমার ব্যাপার। বাচ্চা মেয়ে গার্ডিয়ানের অনুমতি ছাড়া তুলে নিয়ে স্টেট শিশু অপহরণের মামলায় পড়ে যাবে।"

ভোটকা হান্নান তার কালো মাঢ়ী এবং দুই প্রস্থ হলুদ দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার সাহস কেউ করবে না! আপনি নূতন এসেছেন তাই জানেন না। এমনি এমনি আমার নাম ভোটকা হান্নান হয় নি।"

"ঠিক আছে ভোটকা হান্নান। তুমি যেটা করতে চাও কর। আমি আমাদের হেডকে জানাব। স্যার যদি চান প্রক্টর, ভিসি, পুলিশকে জানাবেন। তুমি তোমারটা করবে, আমি আমারটা করব।"

ভোটকা হান্নানকে এবার একটু দুর্বল দেখাল, মাথা চুলকে বলল, "আমি ভাবলাম গরিব ফ্যামিলি সাহায্য করি। আপনি দেখি উল্টা কথা বলছেন।"

"এটা উল্টা কথা না, এটা সোজা কথা। ছোট বাচ্চাকে ছোট বাচ্চাদের মতো থাকতে দিতে হয়। টেলিভিশনে টানাটানি করতে হয় না।"

"কিন্তু স্যার অলরেডি মোবাইল করে দিয়েছি।"

"আবার মোবাইল করে দাও। যাও।"

ভোটকা হান্নানকে কেমন জানি মনমরা দেখাল। সে তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বের হয়ে গেল।

AMARBOI.COM

৪

অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর বাকের ঈশিতাকে বলল, "এই যে নাও, এই চিঠিগুলো তোমার জন্য।"

ঈশিতা বলল, "থাক, আমি এমনিতেই বেশ আছি, তোমার চিঠি না হলেও চলবে!"

বাকের প্রত্যেক দিন চিঠিগুলো থেকে উদ্ভট চিঠিগুলো আলাদা করে ঈশিতাকে পড়তে দেয়। সারা দেশ থেকে বিচিত্র বিচিত্র চিঠি আসে, কারো জিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো গ্রামে মানুষখেকো বিচিত্র প্রাণী, কেউ কবর দেওয়ার পর জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে, কারো গ্রামে দুই মাথাওয়ালা বাছুর জন্ম দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাকের বলল, "পড়ে দেখো। আজকের চিঠিতে তুমি পাবে মাত্র দশ হাজার টাকার মনুষ্যরূপী কম্পিউটার।"

"মনুষ্যরূপী কম্পিউটার?" এবার ঈশিতা একটু কৌতূহল দেখাল, "কোথায়, দেখি?"

বাকের একটা খাম ঈশিতার দিকে এগিয়ে দিল। ঈশিতা চিঠি খুলে পড়ে। হান্নান নামের একজন লিখেছে—তাকে মাত্র দশ হাজার টাকা দিলেই সে খবরের কাগজে "মানুষ কম্পিউটারের" সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দেবে। এই মানুষ কম্পিউটারের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে, সে বারো বছরের বালিকা, চোখের পলকে যে কোনো সংখ্যার সঙ্গে

অন্য যে কোনো সংখ্যা গুণ করে ফেলতে পারে। চিঠির নিচে একটা মোবাইল ফোনের নম্বর দেওয়া আছে।

বাকের জিজ্ঞেস করল, "কী? মাত্র দশ হাজার টাকায় মানুষ কম্পিউটার কিনতে চাও? কোন অপারেটিং সিস্টেম দেবে বলেছে?"

ঈশিতা হাসল। বলল, "না হার্ড ড্রাইভের সাইজ কিংবা অপারেটিং সিস্টেম কিছুই দেওয়া নেই। তার পরও হয়তো আমি ফোন করতাম, কিন্তু এই দশ লাইনের চিঠিতে প্রায় দুই ডজন বানান ভুল। যে চিড়িয়া দন্ত্যস দিয়ে মানুষ বানান করে তাকে সিরিয়াসলি নেওয়া ঠিক না।"

তারপরও ঈশিতা হান্নান নামের মানুষটির টেলিফোন নম্বরটা টুকে রাখল। কিছু দিন আগে এনডেভারের সঙ্গে তার সেই অভিজ্ঞতার পর থেকে যে কয়েকটা বিষয় নিয়ে তার কৌতূহল হয়েছে, তার একটা হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক। বিষয়টা নিয়ে সে কিছুই জানত না। গত কিছু দিন থেকে সে পড়াশোনা করার চেষ্টা করছে। সে জার্নালিজমের ছাত্রী। বিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার—এসব খুঁটিনাটি বিষয় ভালো বোঝে না। কী পড়াশোনা করবে, বুঝতে পারছে না। তাই ইন্টারনেট থেকে কিছু জিনিসপত্র ডাউনলোড করে পড়ার চেষ্টা করছে। ইন্টারনেটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে ঠিক যে বিষয়টা জানতে চায় সেটা ছাড়া সেখানে অন্য সবকিছু আছে। যদি ঠিক সেই বিষয়টা পেয়েও যায়, তা হলে সেটা হয় এমন দুর্বোধ্যভাবে লেখা আছে, যা পড়ে মাথামুণ্ডু কিছু বোঝার উপায় নেই, কিংবা হাস্যকর ছেলেমানুষিভাবে লেখা যে সেটা পড়ে পুরো বিষয়টা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা হয়ে যায়। তার প্রয়োজন একজন মানুষের যে এটি সম্পর্কে জানে এবং যে তাকে একটু সময় দেবে। ঈশিতার বয়স বেশি না, সেজেগুজে থাকলে তাকে মনে হয় বেশ ভালোই দেখায়, যদিও সে কখনোই সেজেগুজে থাকে না। কাজেই যাদের একটু সময় দেওয়া দরকার, দেখা যায় তারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় দিচ্ছে এবং সময়টা দিচ্ছে ভুল জায়গায়!

ঈশিতা যদিও বলেছিল, দন্ত্যস দিয়ে মানুষ বানান করা হান্নান নামের সেই মানুষটিকে সিরিয়াসলি নেওয়া ঠিক না। তারপরও বিকেলের দিকে সে তাকে ফোন করল। যে ফোন ধরল, তার গলার স্বর আনুনাসিক, মনে হল মানুষটির সর্দি হয়েছে। ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "আমি কি হান্নান সাহেবের সঙ্গে কথা বলছি?"

"জি। কথা বলছি।"

"আমরা আপনার একটা চিঠি পেয়েছি। আপনি বলেছেন আপনি একজন মানুষ কম্পিউটারকে চেনেন, আপনাকে দশ হাজার টাকা দিলে আপনি তার সঙ্গে ইন্টারভিউ করার ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"জি বলেছিলাম। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"একটা সমস্যা হয়েছে।"

"কী সমস্যা?"

"সেটা শুনে লাভ নাই। আপনি বুঝবেন না। সোজা কথায় দশ হাজার টাকায় হবে না। মেয়েটার বাপ বেঁকে বসেছে।"

ঈশিতা খুব মিষ্টি করে বলল, "আসলে আমি কিন্তু একবারও বলি নি যে আমরা টাকা দিয়ে এই খবরটা পেতে যাচ্ছি। নীতিগতভাবে আমরা টাকা দিয়ে খবর কিনি না। মেয়েটার বাবা যদি রাজি না থাকেন তা হলে তো কিছু করার নেই।"

"আসলে মেয়ের বাপ মহা ধুরন্ধর।"

ঈশিতা হঠাৎ করে প্রশ্ন করল, "আপনি কী করেন?"

"আমি? আমি স্টুডেন্ট। ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। কেন?"

"না না, এমনি জানতে চাইছি। কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়েন?"

ছেলেটি ইউনিভার্সিটির নাম বলল, মনে হল একটু অহংকারের সঙ্গেই। মফস্বল শহরের ছোট ইউনিভার্সিটি, সেটা নিয়ে এই হাবাগোবা ছেলেটির এত অহংকার কেন কে জানে। ঈশিতা তার সাংবাদিকসুলভ কায়দায় শেষ চেষ্টা করল। সে জানে রথী মহারথী থেকে শুরু করে খুব সাধারণ মানুষ, সবারই পত্রিকায় ছবি ওঠানোর শখ থাকে। তাই সে বলল, "আমরা টাকা দিয়ে কোনো খবর কিনতে পারব না, কিন্তু আপনি যদি এমনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন রিপোর্টিং করার সময় আপনার ছবি রেফারেন্স হিসেবে দিতে পারি।"

এই কথাটায় ম্যাজিকের মতো কাজ হল। টেলিফোনের অন্য পাশে হান্নান নামের ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনি যখন এভাবে বলছেন, দেখি চেষ্টা করে। সমস্যা হয়েছে একজন চ্যাংড়া টিচার নিয়ে।"

"কী হয়েছে এই চ্যাংড়া টিচারের?"

"এই হ্যানো ত্যানো বড় বড় কথা! বাচ্চা মেয়ে, তাকে রেডিও-টেলিভিশনে নেওয়া ঠিক না—এই সব বড় বড় বোলচাল।"

"আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন—" ঈশিতা বলল, "আমি আপনার চ্যাংড়া টিচারকে ম্যানেজ করে নেব।"

AMARBOI.COM

রাফি লেকচার তৈরি করতে করতে মুখ তুলে দেখে দরজায় ফতুয়া এবং জিন্স পরা তেজি ধরনের একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির কাঁধ থেকে বিশাল একটা ক্যামেরা ঝুলছে। মেয়েটি ঈশিতা এবং রাফি ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারে নি সে তাকে "ম্যানেজ" করতে ঢাকা থেকে চলে এসেছে। রাফি থতমত খেয়ে বলল, "আমার কাছে?"

"আপনি কি রাফি?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আপনার কাছে।" ঈশিতা ভেতরে ঢুকল, একটা চেয়ার টেনে বসল, ক্যামেরাটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, "আমার নাম ঈশিতা। আমি একটা পত্রিকায় কাজ করি। ঢাকা থেকে এসেছি।"

রাফি ঈশিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঈশিতা হাসিমুখ করে বলল, "পত্রিকার মানুষকে অনেকে ভয় পায়। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

রাফি বলল, "না, আমি ভয় পাচ্ছি না। আমি মাকড়সা ছাড়া আর কিছু ভয় পাই না।"

"বলতেই হবে আপনি খুব সাহসী মানুষ। আমি তেলাপোকা, জোঁক, কেঁচো, সাপ এবং অন্য যে কোনো পিছলে জিনিস যেটা নড়ে সেটাকে ভয় পাই।"

রাফি হাসার ভঙ্গি করে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করল, সে কেন তার কাছে এসেছে। ঢাকা থেকে একজন সাংবাদিকের তার কাছে চলে আসার খুব বেশি কারণ থাকার কথা নয়—সম্ভবত কোনোভাবে শারমিনের খোঁজ পেয়েছে।

ঈশিতা হঠাৎ মাথাটা একটু এগিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "আমি আসলে আপনাকে ম্যানেজ করতে এসেছি!"

"ম্যানেজ করতে?" রাফি চোখ বড় বড় করে বলল, "আমাকে?"

"হ্যাঁ। আপনাদের একজন ছাত্রের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে, নাম হান্নান। সে আমাকে বলেছে, আপনাকে যদি আমি কোনোভাবে ম্যানেজ করতে পারি, তা হলে সে আমাকে একটা মানুষ কম্পিউটার দেখাবে!"

"আমাকে ম্যানেজ করলে?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে ম্যানেজ করবেন, ঠিক করেছেন?"

"এখনো করি নি। সেই জন্য আগে আপনাকে একটু দেখতে চেয়েছিলাম!"

"দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। এখন মনে হচ্ছে আসলে ম্যানেজ করার দরকার নেই। হয়তো ম্যানেজ না হয়েই আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন।"

"কী সাহায্য?"

ঈশিতা কয়েক মুহূর্ত কিছু একটা ভাবল, তারপর বলল, "আমি জার্নালিজম পড়েছি। কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি, ই-মেইল পাঠাতে পারি, গুগলে সার্চ দিতে পারি, ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতে পারি কিন্তু কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে, তার কিছু জানি না। জানার দরকারও ছিল না, কোনো উৎসাহও ছিল না। কিন্তু—"

"কিন্তু?"

"কিন্তু এখন আমার হঠাৎ খুব জানার দরকার, কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে। বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে, ইন্টারনেটে ঠেলাঠেলি করে কিছু একটা হয়তো জানতে পারতাম—কিন্তু তাতে সমস্যা হচ্ছে যে আমি তখন ঠিক জিনিসটা শিখতে পারতাম না। আমার মনে হল, যদি কেউ আমাকে একটু বলে দিত তা হলে আমি জিনিসটা ঠিক করে বুঝতে পারতাম।"

রাফি ইতস্তত করে বলল, "কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে, সেটা আমার কাছ থেকে জানার জন্য আপনি ঢাকা থেকে চলে এসেছেন? আজকাল কত বই, কত কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, কত কম্পিউটার সেন্টার—"

"হ্যাঁ। আছে, কিন্তু তারা যে কম্পিউটার নিয়ে কথা বলে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটার। আমার জানার দরকার নিউরাল কম্পিউটার।"

রাফি এবার তার চেয়ারে হেলান দিয়ে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করল, "নিউরাল কম্পিউটার?"

"হ্যাঁ।" ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "বইপত্র, ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করে আমি যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে, মানুষের ব্রেন আমাদের ল্যাপটপের মতো কাজ করে না—ল্যাপটপ হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটার। মানুষের ব্রেনের মধ্যে আছে নিউরন, সেটা দিয়ে তৈরি হয়েছে নিউরাল নেটওয়ার্ক। নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে কেউ কম্পিউটার তৈরি করলে সেটা হবে নিউরাল কম্পিউটার। ঠিক বলছি?"

রাফি মাথা নাড়ল। ঈশিতা বলল, "অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী হতে পারে। উল্টাপাল্টা কিছু বললে থামাবেন। আমি আপনার কাছে এসেছি দুটি কারণে। এক. গত আইসিটি আইটি কনফারেন্সে আপনি নিউরাল নেটওয়ার্কের ওপর একটা পেপার দিয়েছেন। পেপারটা আমি পড়েছি, একটা লাইন দূরে থাকুক, একটা শব্দও বুঝি নি।"

রাফি বলল, "সরি।"

ঈশিতা বলল, "আপনার সরি হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেই পেপারটা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি নিউরাল কম্পিউটারে এক্সপার্ট।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি মোটেও এক্সপার্ট না।"

"যখন কারো লেখার একটা শব্দও বোঝা যায় না, তখন সে হচ্ছে এক্সপার্ট। আপনি অবশ্যই এক্সপার্ট। যাই হোক—" ঈশিতা রাফিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, "আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটির হান্নান নামে একটা ছেলে আমাকে বলেছে, এখানে একজন মেয়ে হচ্ছে মানুষ কম্পিউটার! আপনি নিশ্চয়ই সেই মেয়েটাকে চেনেন। নিশ্চয়ই জানেন মেয়েটা কেমন করে কম্পিউটার। গবেষণা করার একটা মানুষ কম্পিউটার আপনার কাছে আছে, যেটা অন্য কারো কাছে নেই। আমি আপনার কাছে জানতে চাই, মেয়েটা কেমন করে এটা করে!"

ঈশিতা তার টানা বক্তব্য শেষ করে চেয়ারে হেলান দিল। রাফি কিছুক্ষণ ঈশিতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এত জিনিস থাকতে আপনি এই জিনিস পত্রিকায় লিখতে এত ব্যস্ত হলেন কেন?"

ঈশিতা বলল, "আমি মোটেও এটা নিয়ে পত্রিকায় আর্টিকেল লিখতে ব্যস্ত হই নি।"

"তা হলে?"

"আমি এটা জানতে চাই।"

"কেন?"

ঈশিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সেটা আমি আপনাকে বলতে পারব না। খুব যদি চাপাচাপি করেন তা হলে আমি বানিয়ে বানিয়ে কিছু একটা বলে দেব—আপনি টেরও পাবেন না যে আমি মিথ্যে কথা বলছি। আমি খুব সরল মুখ করে সিরিয়াস ব্লাফ দিতে পারি।"

রাফি হেসে বলল, "আপনাকে ব্লাফ দিতে হবে না। আমি চাপাচাপি করব না! তবে আপনি যেসব জিনিস জানতে চাইছেন, আমি যে তার সবকিছু জানি, তা না। শুধু যে জানি না, তা না। অনেক কিছু আছে যেগুলো আমি কেন, পৃথিবীর কেউই জানে না।"

"কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সেগুলো জানতে চাইছেন, চাইছেন না?"

"তা চাইছি।"

"আমার অনুরোধ, আপনি যদি কিছু জানেন সেটা আমাকে কষ্ট করে একটু বুঝিয়ে দেবেন। আর কিছু না।"

রাফি বলল, "ঠিক আছে। যদি আপনারা এই বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া না করেন, তা হলে আমার কোনো সমস্যা নেই।"

"কথা দিচ্ছি টানাহ্যাঁচড়া করব না।"

"তা হলে ঠিক আছে।"

ঈশিতা বলল, "ভেরি গুড। আমি তা হলে এখন উঠি।"

"কোথায় যাবেন?"

"হান্নান নামক ছেলেটার সঙ্গে একটু কথা বলি। তাকে খুশি করার জন্য দু-চারটা ছবি তুলতে হবে।" ঈশিতা চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বলল, "এই হান্নান খুব করিতকর্মা ছেলে হতে পারে, কিন্তু তার বাংলা বানানের জ্ঞান ভালো না। দন্ত্যস দিয়ে মানুষ লিখে।"

রাফি হাসল, "নেতা মানুষ বানান দিয়ে কী করবে?"

ঈশিতা ভুরু কুঁচকে বলল, "নেতা নাকি?"

"হ্যাঁ। সিরিয়াস নেতা।"

"তা হলে একটু সাবধানে ডিল করতে হবে।"

ঈশিতা তার ক্যামেরা ঘাড়ে ঝুলিয়ে যখন বের হয়ে যাচ্ছে, তখন রাফি একটু ইতস্তত করে বলল, "আজ বিকেলে আপনার কী প্রোগ্রাম?"

"কোনো প্রোগ্রাম নেই।"

"পাঁচটার দিকে ছাত্রদের বাসটা চলে যাওয়ার পর ক্যাম্পাস একটু ফাঁকা হয়। আমি ঠিক করেছিলাম তখন আপনার কম্পিউটার মেয়েটাকে নিয়ে একটু বসব। চাইলে তখন আপনিও আমার সাথে থাকতে পারেন।"

"অবশ্যই থাকব। একশবার থাকব।"

"তা হলে আপনি সাড়ে পাঁচটার দিকে চলে আসবেন আমার রুমে।"

"আসব।"

"শুধু একটা কন্ডিশন—"

ঈশিতা বলল, "মেয়েটাকে নিয়ে কোনো রিপোর্ট করা যাবে না!"

"হ্যাঁ।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। আমি রিপোর্ট করব না।"

বিকেল বেলা রাফি তার ঘর থেকে ঈশিতাকে নিয়ে বের হল। বের হওয়ার আগে সে টেবিল থেকে একটা বই নিয়ে নেয়—ক্লাস ওয়ানের বর্ণমালা শেখার বই।

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "এই বইটি কেন?"

আপনাকে যে মেয়েটির কাছে নিয়ে যাচ্ছি সেই মেয়েটি বিশাল বিশাল সংখ্যাকে মুহূর্তের মধ্যে গুণ করে ফেলতে পারে, কিন্তু একটা অক্ষরও পড়তে পারে না!

ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। মেয়েটার ডিসলেক্সিয়া।"

"ডিসলেক্সিয়া?" ঈশিতা মাথা নেড়ে বলল, "আমি এটার কথা শুনেছি। আজকাল দুষ্টু বাচ্চাদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেই বলা হয় ডিসলেক্সিয়া, না হয় এডিডি—অ্যাটেনশন ডেফিশিয়েন্সি ডিজঅর্ডার। তারপর কিছু বোঝার আগেই প্রোজাক প্রেসক্রিপশন করে দেয়। দেখতে দেখতে চটপটে একটা বাচ্চা কেমন যেন ভেজিটেবলের মতো হয়ে যায়।"

রাফি বলল, "আমি যে মেয়েটার কাছে নিচ্ছি সে মোটেও দুষ্টু নয়, অ্যাটেনশনেরও সমস্যা নেই। মেয়েটা হচ্ছে একেবারে ক্ল্যাসিক কেস অব ডিসলেক্সিয়া। মেয়েটা সে জন্য পড়তে শেখে নি। আমি এই বইটা নিয়ে যাচ্ছি তাকে একটু টেস্ট করার জন্য!"

ঈশিতা মাথা নেড়ে বলল, "ইন্টারেস্টিং।"

টংয়ের কাছে গিয়ে রাফি দেখল সেখানে খুব ভিড়। জিলাপি ভাজা হচ্ছে এবং অনেকে সেই জিলাপি খাচ্ছে। শারমিন প্লেটে করে জিলাপি দিচ্ছে, চা দিচ্ছে এবং কার কত বিল হয়েছে, সেটা জানিয়ে দিচ্ছে। রাফি ঈশিতাকে গলা নামিয়ে বলল, "এই হচ্ছে সেই মেয়ে, নাম শারমিন।"

"কী সুইট মেয়েটা।"

"হ্যাঁ, অনেক সুইট।"

রাফিকে দেখে শারমিনের বাবা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শারমিনকে বলল, "স্যারের জন্য বেঞ্চটা মুছে দে তাড়াতাড়ি।"

রাফি বলল, "বেঞ্চ মুছতে হবে না। বরং শারমিনকে আমার কাছে পাঠান পাঁচ মিনিটের জন্য।"

"জি স্যার! জি স্যার।" বাবা আরো ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শারমিনকে বলল, "দেখ দেখি স্যার কী বলেন।"

শারমিন সঙ্গে সঙ্গে তার ফ্রকে হাত মুছে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "জি স্যার।"

রাফি বলল, "আমি তোমার একটা জিনিস একটু টেস্ট করতে চাই। তুমি একটু আমার সঙ্গে আসো, আমরা ওই পাশে গিয়ে বসি।"

রাফি ঈশিতাকে নিয়ে টংয়ের কাছে বড় একটা গাছের পাশে বসল। শারমিন বসল তাদের সামনে, তার চোখেমুখে এক ধরনের উত্তেজনা।

রাফি তার বইটা বের করে বলল, "আমি একটা বই নিয়ে এসেছি, দেখি তুমি এটা পড়তে পার কি না।"

শারমিনের মুখটা কেমন যেন কালো হয়ে গেল, সে ফিসফিস করে বলল, "আমি তো পড়তে পারি না স্যার।"

"আমি জানি। আমি দেখতে চাই তুমি কতটুকু পার।"

"একটুও পারি না।"

"ঠিক আছে। তোমাকে পড়তে হবে না, তুমি আমাকে বলো তুমি কী দেখো।" রাফি বইয়ের একটা পৃষ্ঠা খুলে বলল, "এখানে কী আছে বলো।"

শারমিনের মুখটা কেমন জানি শুকনো হয়ে যায়, জিব দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে বলল, "কয়েকটা আঁকাবাঁকা দাগ নড়ছে।"

ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "নড়ছে?"

শারমিন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"কেমন করে নড়ছে?"

"ডানে–বাঁয়ে। মাঝে মধ্যে উল্টে যায়।"

ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য।"

রাফি বলল, "মোটেও আশ্চর্য না। এটা হচ্ছে ডিসলেক্সিয়ার লক্ষণ।"

ঈশিতা বলল, "হতে পারে, কিন্তু তবুও আশ্চর্য।"

AMARBOI.COM

রাফি এবার বইয়ের ভেতর থেকে লাল রঙের একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক বের করে বইয়ের পৃষ্ঠার ওপর রেখে বলল, "শারমিন। এখন কী দেখা যাচ্ছে?"

শারমিনকে দেখে মনে হল কেউ তাকে বুঝি ইলেকট্রিক শক দিয়েছে, তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। নিঃশ্বাস আটকে আসে, সে কাঁপা গলায় বলে, "নড়ছে না, এখন আর নড়ছে না! আমি এখন পড়তে পারি! পড়তে পারি!"

রাফি বলল, "তুমি যে অক্ষরটা দেখছ সেটা হচ্ছে পেটকাটা মূর্ধন্যষ!

"এইটা পেটকাটা মূর্ধন্যষ? আমি কতবার শুনেছি এইটার কথা, কতবার দেখার চেষ্টা করেছি, দেখতে পারি নি!"

রাফি শারমিনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "এখন মনে হয় তুমি দেখতে পারবে, পড়তেও পারবে।"

ঈশিতা বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কী হচ্ছে।"

রাফি বলল, "একটা অনেক বড় ব্যাপার ঘটেছে—আমরা মনে হয় শারমিনের ডিসলেক্সিয়ার সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি!"

"কীভাবে? এই লাল প্লাস্টিক দিয়ে?"

"হ্যাঁ।" রাফি মাথা নাড়ল, "আমাদের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর হাসান এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্ধতিটার কথা বলেছিলেন। অনেক সময় দেখা গেছে, সাদার ওপর কালো লেখাটা হচ্ছে সমস্যা। লাল রঙের ওপর কালো লেখা হলে সমস্যা থাকে না। আমি ঠিক বিশ্বাস করি নি কাজ করবে! তবু ভাবলাম চেষ্টা করে দেখি। ভাগ্যিস চেষ্টা করেছিলাম, দেখাই যাচ্ছে কাজ করেছে।"

শারমিন তখন লাল প্লাস্টিকটা দিয়ে বইয়ের প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা পরীক্ষা করে দেখছে, উত্তেজনায় তার মুখ চকচক করছে। মনে হচ্ছে সে বুঝি সাত রাজার ধন পেয়ে গেছে। ব্যাপারটা সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, একটু অসতর্ক হলেই হঠাৎ করে আবার বুঝি অক্ষরগুলো জীবন্ত পোকামাকড়ের মতো নড়তে শুরু করবে!

রাফি বলল, "শারমিন এখন তুমি পড়তে পারবে।"

শারমিন একটা অক্ষর দেখিয়ে বলল, "এগুলো কী অক্ষর?"

ঈশিতা উত্তর দিল, "বলল, প্রথমটা ক, তার পরেরটা হচ্ছে ল, তার পরেরটা হচ্ছে ম। তিনটা মিলে হচ্ছে কলম।"

শারমিন তার পরের শব্দটার দিকে আঙুল দিয়ে বলল, "তার মানে এটা হচ্ছে কমল?"

"ভেরি গুড। হ্যাঁ এটা হচ্ছে কমল। তার পরের শব্দটা হচ্ছে কমলা। ল–এর পর আকার থাকায় এটা হচ্ছে লা।"

শারমিন বইয়ে লেখা শব্দগুলো দেখিয়ে বলতে থাকে, "তার মানে এটা কাল? এটা লাল? এটা কলা? এটা কামাল? এটা মাকাল? এটা কালাম? এটা মালা? এটা কম? এটা মাল? এটা কাম? এটা মালা?"

ঈশিতা হেসে ফেলল। বলল, "আস্তে আস্তে! তিনটা অক্ষর আর আকার দিয়েই এত কিছু পড়ে ফেলতে পারছ, সবগুলো শিখে ফেললে কী হবে?"

রাফি বলল, "হ্যাঁ, এই বইটা ভারি চমৎকার, তিনটা অক্ষর আর আকার দিয়েই অনেক শব্দ শিখিয়ে দেয়!"

ঈশিতা বলল, "আমার ধারণা, পুরো ক্রেডিট বইটার না! আমাদের শারমিনকেও একটু ক্রেডিট দিতে হবে।"

"সে তো দিচ্ছিই!"

শারমিন লোভাতুর দৃষ্টিতে অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। ঈশিতা তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি নাকি চোখের পলকে অনেক বড় বড় গুণ করে ফেলতে পার?"

শারমিন লাজুক মুখে মাথা নাড়ল। ঈশিতা বলল, "বলো দেখি তেহাত্তরকে সাতানব্বই দিয়ে গুণ করলে কত হয়?"

শারমিন বলল, "সাত হাজার একাশি।"

ঈশিতা রাফির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক হয়েছে?"

রাফি বলল, "শারমিন যখন বলেছে, নিশ্চয়ই ঠিক হয়েছে।"

ঈশিতা শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কেমন করে এটা কর?"

শারমিন মাথা নাড়ল, বলল "জানি না। আমি চিন্তা করলেই উত্তরটা জেনে যাই।"

"চিন্তা করলেই জেনে যাও?"

"হ্যাঁ। মনে হয় যেন দেখতে পাই।"

"দেখতে পাও? সংখ্যা দেখতে পাও?"

শারমিন লাজুক মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "আমি তো লেখাপড়া জানি না, তাই কোন সংখ্যা দেখতে কেমন সেইটা জানি না! আমি নিজের মতন দেখি—কোনোটা গোল, কোনোটা লম্বা, কোনোটা চিকন, সেগুলো নড়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কী আশ্চর্য!

শারমিন কিছু না বলে তার বর্ণমালার বই আর লাল প্লাস্টিকটা বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এর মধ্যে কোনটা আশ্চর্য সে এখনো বুঝতে পারছে না। রাফি বলল, "তুমি বলছ তুমি চিন্তা করলেই উত্তরটা জেনে যাও। তুমি কী চিন্তা কর?"

"গুণফলটা কী হবে সেটা চিন্তা করি।"

"তুমি মাথার মধ্যে গুণ কর না?"

"না। কেমন করে গুণ করতে হয় আমি জানি না।"

রাফি ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখলেন ব্যাপারটা? শারমিন কেমন করে গুণ করতে হয় জানে না, কিন্তু গুণ না করেই যে কোনো দুটি সংখ্যার গুণফল বের করে ফেলে!"

"কেমন করে? আমি যদি জানতাম!"

রাফি কথা বলতে বলতে টংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে হঠাৎ করে অনেকেই চলে এসেছে, শারমিনের বাবা একা সামাল দিতে পারছে না। রাফি শারমিনকে বলল, "তুমি এখন যাও। তোমার আব্বুকে সাহায্য কর।"

শারমিন তার বুকে চেপে রাখা বর্ণমালার বই আর লাল প্লাস্টিকটা দেখিয়ে বলল, "এই বইটা?"

"তোমার জন্য। তুমি নিয়ে যাও। বাসায় গিয়ে পড়ো। কাউকে বলো একটু দেখিয়ে দিতে। ঠিক আছে?"

শারমিন মাথা নাড়ল, মুখে কিছু বলল না, কিন্তু তার চোখমুখ কৃতজ্ঞতায় ঝলমল করে উঠল। রাফি আগেও দেখেছে, এ দেশে মানুষেরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে "ধন্যবাদ" কথাটি উচ্চারণ করা শেখে নি, তাই চোখেমুখে সেটা প্রকাশ করতে হয়।

শারমিনের পিছু পিছু টংয়ে এসে রাফি দেখল, সেখানে একটা ছোটখাটো উত্তেজনা। উত্তেজনার কেন্দ্রস্থল সমীর—বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের লেকচারার। রাফি গলা নামিয়ে ঈশিতাকে বলল, "ওই যে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা ছেলেটাকে দেখছেন, সে হচ্ছে সমীর। কঠিন সায়েন্টিস্ট। সব সময় ব্যাক্টেরিয়া আর ভাইরাস নিয়ে কথা বলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে!"

ঈশিতা বলল, "ইন্টারেস্টিং!"

"হ্যাঁ। খুবই ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। চলেন গিয়ে শুনি আজকে কী নিয়ে কথা বলছে!"

রাফি ঈশিতাকে নিয়ে এগিয়ে গেল, টংয়ের বেঞ্চে সমীর বসে আছে। সে হাত নেড়ে কথা বলছে এবং তাকে ঘিরে একটু জটলা। সবার মুখেই এক ধরনের হাসি, কেউ সেটা গোপন করার চেষ্টা করছে, কেউ করছে না। সমীর গলা উঁচিয়ে বলল, "তোমরা হাসছ? আমার কথা শুনে তোমরা হাসছ?"

একজন তার মুখের হাসিকে আরো বিস্তৃত করে বলল, "কে বলল আমি হাসছি? মোটেই হাসছি না।"

"তোমরা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? তোমরা ভাবছ, আমি শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছি?"

আরেকজন বলল, "না সমীর! আমরা মোটেও সেটা ভাবছি না। আমরা সবাই জানি তুমি খুবই সিরিয়াস মানুষ।"

সমীর বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে তোমরা আজকের খবরের কাগজ দেখো। টিঅ্যান্ডটি বস্তি থেকে দশটা বাচ্চাকে মেডিকেলে নিয়েছে—পাঁচজনের ব্রেন হেমারেজ। একজন অলরেডি ডেড। একজন ডিপ কোমায়। ডু ইউ থিংক—এগুলো এমনি এমনি হচ্ছে?"

রাফি জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে হচ্ছে?"

"ভাইরাস অ্যাটাক। আমি বলেছিলাম খুব খারাপ একটা ভাইরাস এসেছে। আমাদের দেশের জন্য ডেঞ্জারাস। যে সিম্পটমগুলো পড়েছি সেগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে। কেউ নজর দিচ্ছে না। মিডিয়ার অনেক সিরিয়াসলি নেওয়া দরকার।"

রাফি ঈশিতাকে দেখিয়ে বলল, "সমীর, এর নাম ঈশিতা। খবরের কাগজের লোক। ওকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও—খবরের কাগজে ফাটাফাটি রিপোর্টিং করে দেবে।"

সমীর ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনি সাংবাদিক?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আপনারা চুপচাপ বসে আছেন কেন? কেউ কিছু বোঝার আগেই তো সব সাফ হয়ে যাবে। কী ডেঞ্জারাস ভাইরাস আপনি জানেন?"

ঈশিতা ইতস্তত করে বলল, "আমরা কী করব?"

"সত্যি কথাটা জানাবেন। সবাইকে বলবেন বাংলাদেশ এখন ভীষণ একটা বিপদের মধ্যে আছে। টিঅ্যান্ডটি বস্তির বাচ্চাগুলো কোনো র‍্যান্ডম অসুখে অসুস্থ হয় নি। তারা সেই ভাইরাসে ইনফেক্টেড। এ মুহূর্তে যদি কোয়ারেন্টাইন করে প্রটেকশন না দেওয়া হয়, সর্বনাশ হয়ে যাবে!"

ঈশিতা তার পকেট থেকে একটা নোট বই বের করে বলল, "ভাইরাসটার নাম কী?"

"এখনো ফরমাল নাম দেয় নি। এটাকে বলছে এফটি টুয়েন্টি সিক্স। আপনাকে আমি ওয়েব লিংক দিতে পারি, সব ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন।"

"ভেরি গুড। আমি কি আপনাকে রেফারেন্স দিয়ে রিপোর্ট করতে পারি?"

সমীর হা হা করে হাসল। সে যে হাসতে পারে সেটা অনেকেই জানত না, তাই আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকেই একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। সমীর যেভাবে হাসিটা হঠাৎ করে শুরু করেছিল, ঠিক সেভাবে হঠাৎ করে থামিয়ে বলল, "আমি মফস্বলের একটা ইউনিভার্সিটির ফালতু একটা লেকচারার। আমার রেফারেন্স দিয়ে কী লাভ? কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? আমার কলিগরাই বিশ্বাস করছে না, আর দেশের পাবলিক বিশ্বাস করবে?"

ঈশিতা বলল, "বিশ্বাস করা না করা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না! আপনি যখন প্রথম এই কথাটা বলছেন, সেটা ডকুমেন্টেড থাকুক। যদি দেখা যায় আসলেই আপনার আশঙ্কা সত্যি, তা হলে আপনার ক্রেডিবিলিটি এস্টাবলিশড হবে!"

সমীর মুখ গম্ভীর করে বলল, "ঠিক আছে!"

ঈশিতা ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে বলল, "আপনার কয়েকটি ছবি তুলি?"

"তুলবেন? তোলেন।"

সমীরকে ঘিরে দাঁড়ানো সবাই তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে লাগল এবং তার মধ্যে ঈশিতা তার ক্যামেরা দিয়ে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলল। ছবি তোলা শেষ করে ঈশিতা তার নোট বই নিয়ে সমীরের পাশে বসে তার সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা বলে। এতদিন পর সত্যিকারের একজন শ্রোতা পেয়ে সমীর টানা কথা বলে যেতে থাকে। তাকে দেখে মনে হয়, সে বুঝি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও একটু বিরতি দেবে না!

দুইদিন পর খবরের কাগজে সমীরের ভাইরাস এফটি টুয়েন্টি সিক্সের ওপর বিশাল প্রতিবেদন বের হল। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় সমীরের ছবি। ঈশিতা খুব গুছিয়ে রিপোর্টিং

করেছে, সারা দিন সমীরের কাছে টেলিফোন এল, বিকেলের দিকে একটা টেলিভিশন চ্যানেল পর্যন্ত চলে এল।

পরদিন ভোরে রাফি ক্লাসে যাওয়ার জন্য তার লেকচার ঠিক করছে, তখন সমীর এসে হাজির। তার উসকোখুসকো চুল, চোখের নিচে কালি এবং শুকনো মুখ। রাফি অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে সমীর?"

সমীর জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করে নিচু গলায় বলল, "দরজাটা বন্ধ করি?"

"দরজা বন্ধ করবে?" রাফি কারণটা জানতে চাইতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলল, "কর।"

সমীর দরজা বন্ধ করে রাফির খুব কাছাকাছি এসে বসে ভাঙা গলায় বলল, "আমি খুব বিপদে পড়েছি।"

"কী বিপদ?"

"গতকাল একটি টুয়েন্টি সিক্সের খবর বের হয়েছে—"

"হ্যাঁ দেখেছি। চমৎকার রিপোর্টিং—"

"চমৎকারের খেতা পুড়ি।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"রাত এগারটার সময় আমার বাসায় দুজন লোক এসেছে। লম্বা-চওড়া, চুল ছোট করে ছাঁটা। একজন মাঝবয়সী, আরেকজন একটু কম। দুজনেরই সাফারি কোট। এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এই বাসায় আর কে থাকে? আমি বললাম, আর কেউ থাকে না। তখন লোকগুলো দুইটা চেয়ারে বসল। একজন পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে টেবিলে রাখল।"

রাফি চমকে উঠে বলল, "পিস্তল?"

"হ্যাঁ। আরেকজন আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আমার ঘাড়ে একটা হাত দিয়ে বলল, "মালাউনের বাচ্চা, তুমি তোমার বাপের দেশে না গিয়ে এই দেশে পড়ে আছ কেন?"

"আমি বললাম, এইটাই আমার বাপদাদা চৌদ্দগুষ্টির দেশ। তখন লোকটা রিভলবারটা হাতে নিয়ে আমার কপালে ধরে বলল, এইটা যদি তোমার বাপের দেশ হয় তা হলে এই দেশের নিয়ম মেনে চলতে হবে। আমি বললাম, এই দেশের নিয়ম কী? লোকটা বলল, বেদরকারি কথা বলবা না। আমি বললাম, বেদরকারি কথাটা কী? লোকটা বলল, ভাইরাসের কথাটা হচ্ছে বেদরকারি, ফালতু কথা। খামোখা মানুষকে ভয় দেখানোর কথা।"

সমীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার তখন ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তবু সাহস করে বললাম, এটা ফালতু কথা না। এটা খুবই ডেঞ্জারাস কথা। লোকটা তখন রিভলবারের নল দিয়ে আমার মাথায় একটা বাড়ি দিয়ে বলল, চোপ ব্যাটা মালাউন। আমি যদি বলি এটা ফালতু, তা হলে এটা ফালতু। বুঝেছিস?"

কথাগুলো বলতে বলতে সমীরের মুখ শক্ত হয়ে যায়। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তখন আমার মাথার মগজে রক্ত উঠে গেল। আমি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, গেট আউট। গেট আউট আমার বাসা থেকে। লোক দুইটা তখন কেমন যেন হকচকিয়ে গেল, ওরা বুঝতে পারে নাই আমি এইভাবে রেগে উঠব। ওরা ভেবেছে আমাকে ভয় দেখালে আমি ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকব।"

রাফি একটু ঝুঁকে বলল, "তারপর কী হল?"

"লোক দুইটা তখন উঠে দাঁড়াল, যেইটা একটু বয়স্ক সেইটা বলল, শোনো ছেলে। এই

ভাইরাস নিয়ে যদি আর একটা কথা বলো তা হলে তোমার লাশ পড়ে যাবে। খোদার কসম।"

"তুমি কী বললে?"

"আমি বললাম, আমার যদি বলার ইচ্ছা করে তা হলে আমি একশবার বলব। তোমার যদি ক্ষমতা থাকে লাশ ফেলে দেওয়ার, লাশ ফেলে দিয়ো। আমি ভয় পাই না।! যদিও বলেছি ভয় পাই না—কিন্তু আসলে ভয়ে আমার হার্টফেল করার অবস্থা! মনে হয় অনেক জোরে চিৎকার করেছি। পাশের ফ্ল্যাট থেকে তখন কবির ভাই এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছ কেন?

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম, কবির ভাই ঢুকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? লোকটা ততক্ষণে রিভলবারটা লুকিয়ে ফেলেছে। সে বলল, কিছু হয় নাই। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কবির ভাই জানতে চাইল, কী ব্যাপার। আমি কিছু বললাম না। কবির ভাই তখন আমাকে ঘাঁটাল না।"

সমীর কিছুক্ষণ মুখ শক্ত করে রেখে বলল, "সকালবেলা তোমার কাছে এলাম, আমার সেই ঈশিতা মেয়েটার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। তোমার সঙ্গেও বলি। কী করব বুঝতে পারছি না।"

"এরা কারা?"

"জানি না। রাতে বাসার সামনে বিশাল একটা গাড়িতে অনেকক্ষণ বসে থাকল। কোনো লুকোছাপা নেই, মনে হয় সরকারি লোক।"

"সরকারি লোক এ রকম করবে কেন? তোমাকে মালাউন ডাকবে কেন?"

সমীর হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমাদের অনেকেই মালাউন ডাকে, তোমরা সেটা জানো না! যাই হোক, ঈশিতার নম্বরটা দাও, না হলে ফোন করে আমাকে লাগিয়ে দাও।"

রাফি ঈশিতাকে ফোন করল, সেখানে একটা ইংরেজি গান রিংটোন। কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। কিছুক্ষণের ভেতর একটা অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন এল, ফোন ধরতেই ঈশিতার গলা শোনা গেল, "রাফি?"

"হ্যাঁ। এখানে একটা ব্যাপার ঘটেছে।"

"জানি।"

"জানো?"

"হ্যাঁ। আমি আমার ফোনে ধরি নি। এটা ট্যাপ করছে। অন্য নম্বর থেকে ফোন করছি। সমীর কেমন আছে?"

"সমীরের কথাই বলছিলাম। কাল রাতে দুজন লোক—"

"জানি। ওরা অসম্ভব ডেঞ্জারাস, আমি ফোনে সবকিছু বলতে পারব না। সমীরকে বোলো সাবধানে থাকতে। আজকে ভাইরাসের ওপর ফলোআপ নিউজ থাকার কথা ছিল, আমরা ড্রপ করেছি। সমীরকে বোলো কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলতে।"

"সমীর এখানে আছে, তুমি কথা বলো।"

সমীর কিছুক্ষণ ঈশিতার সঙ্গে কথা বলল। বেশিরভাগ সময় অবিশ্যি কথা শুনল, হুঁ হাঁ করল, নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ফোনটা রাফির হাতে ফিরিয়ে দিল। রাফি ফোনটা কানে লাগিয়ে বলল, "ঈশিতা।"

"হ্যাঁ। বলো।"

"এখন অন্য ঝামেলা শুরু হয়ে গেল, তাই বলার জন্য ঠিক সময় কি না বুঝতে পারছি না। মনে আছে, তুমি নিউরাল কম্পিউটার নিয়ে জানতে চাইছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ফ্যান্টাস্টিক রিসোর্স পেয়েছি। তুমি বিশ্বাস করবে না। পৃথিবীর সেরা নিউরাল কম্পিউটার ফার্ম বাংলাদেশে অফিস খুলেছে। কোম্পানির নাম এনডেভার, টঙ্গীতে অফিস। ওয়েবসাইটটা চমৎকার ফ্রেন্ডলি। ওদের অফিসে গেলে—"

ঈশিতা বলল, "রাফি।"

গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। রাফি থতমত খেয়ে থেমে গেল। ঈশিতা ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমি এনডেভারে গিয়েছিলাম। সে জন্যই নিউরাল কম্পিউটার সম্পর্কে জানতে চাইছি। যে দুজন লোক সমীরকে ভয় দেখিয়েছে, সেই দুজন আমাকেও ভয় দেখিয়েছে, আমি যেন এনডেভারের ওপর রিপোর্টিং না করি।"

"কেন?"

"জানি না। শুধু এটুকু জেনে রাখো, টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে যারা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তাদের সবার চিকিৎসা করছে এনডেভার।"

"সত্যি? কেন?"

"আমারও সেই একই প্রশ্ন। কেন?"

"কোথায় চিকিৎসা হচ্ছে?"

"ওদের বিল্ডিংয়ে।"

রাফি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওদের বিল্ডিংয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে?"

"হ্যাঁ। সেখানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

"কেন?"

"জানি না। শুধু মনে হচ্ছে, এনডেভার আগে থেকে জানত, এখানে এফটি টুয়েন্টি সিক্সের ইনফেকশন হবে!"

রাফি অবাক হয়ে বলল, "কেমন করে জানত?"

"শুধু একভাবে সম্ভব।"

"কীভাবে?"

"যদি নিজেরাই সেই ভাইরাসটা ছড়িয়ে থাকে।"

"কী বলছ?"

ঈশিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "রাফি তুমি আমাকে কথা দাও, আমি যে কথাগুলো বলেছি, তুমি সেগুলো কাউকে বলবে না।"

রাফি বলল, "বলব না।"

"আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।"

"টেলিফোনে গা ছোঁয়া যায় না।"

"জানি। তাতে কিছু আসে যায় না, প্রতিজ্ঞা কর।"

"করলাম।"

"যদি দেখো আমাকে মেরে ফেলেছে, তা হলে তুমি কোথা থেকে অগ্রসর হবে, সেটা জানিয়ে রাখলাম।"

"তোমাকে মেরে ফেলবে কেন?"

"বলি নি মেরে ফেলবে, বলেছি যদি মেরে ফেলে।"

AMARBOI.COM

"যদির কথাটি কেন আসছে?"

"জানি না, রাফি।"

রাফি হঠাৎ করে একটা অশুভ আশঙ্কা অনুভব করে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সাবধানে থেকো ঈশিতা।"

রাফির হঠাৎ মনে পড়ল, সে ঈশিতার সঙ্গে আপনি করে কথা বলত। কখন কীভাবে সেটা তুমি হয়ে গেছে, জানে না। ঈশিতাও সেটা লক্ষ করেছে বলে মনে হল না। সেও খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, "চিন্তা কোরো না রাফি। আমি সাবধানে থাকব।"

৫

ঈশিতা অবিশ্যি মোটেই সাবধানে থাকল না। সে পরদিন তার ক্যামেরা নিয়ে টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে হাজির হল। মুখে কাপড়ের একটা মাস্ক লাগিয়ে নিয়েছিল এবং আশা করতে লাগল এনডেভারের লোকজন যেন তাকে না চেনে।

সেখানে আরো কয়েকজন সাংবাদিক ছিল, তারাও মুখে মাস্ক লাগিয়েছে। তারা লাগিয়েছে অন্য কারণে, ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে। বড় একটা টেলিভিশন ক্যামেরা ঘাড়ে নিয়ে একজন গজগজ করতে করতে ঈশিতাকে বলল, "ক্যামেরাম্যানের চাকরির খেতা পুড়ি।"

ঈশিতা বলল, "কেন, কী হয়েছে?"

"কোনো দিন টেলিভিশনে আমাদের চেহারা দেখায়? দেখায় না।"

"কেন দেখাবে? দেখানোর কথা না। আর দেখাবে না জেনেই তো চাকরিটা নিয়েছেন।"

"সেটা সত্যি। কিন্তু তাই বলে জীবনের সিকিউরিটি দেবে না? অজায়গা কুজায়গায় পাঠিয়ে দেয়, একশবার বলে দেয়, তোমার জান গেলে যাক, ক্যামেরার যেন ক্ষতি না হয়।"

ঈশিতা কিছু না বলে একটু হাসল, মুখের মাঝে মাস্ক লাগানো, তাই সেই হাসিটা ক্যামেরাম্যান অবিশ্যি দেখতে পেল না। ক্যামেরাম্যান বলল, "এখানে প্লেগ নাকি এইডস—কী সমাচার কিছু জানি না। পাঠিয়ে দিল, ফুটেজ নিতে হবে। এখন যদি মারা যাই?"

ঈশিতা বলল, "ভয় নাই, মারা যাবেন না। এটা পানিবাহিত, আপনার মুখের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কিছু খাবেন না। বাসায় গিয়ে সাবান দিয়ে গোসল করে নেবেন।"

"ব্যাটা জীবাণু জানে তো যে সে পানিবাহিত? তার শুধু মুখ দিয়ে যাওয়ার কথা? যদি মাইন্ড চেঞ্জ করে বাতাসবাহিত হয়ে নাক দিয়ে ঢুকে যায়?"

ঈশিতা আবার একটু হাসল, কিন্তু ক্যামেরাম্যান হাসিটা দেখতে পাবে না বলে মুখে বলল, "না, এই ভাইরাস মাইন্ড চেঞ্জ করবে না। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।"

কথা বলতে বলতে ঈশিতা একটু দূরে তাকিয়ে ছিল। বস্তির ছোট রাস্তাটার কাছাকাছি অনেক অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাম্বুলেন্সের ওপর লালবাতি জ্বলছে ও নিভছে। লালবাতি জ্বলা আর নেভার কথাটা কে প্রথম চিন্তা করে বের করেছিল কে জানে, কিন্তু এই জ্বলা ও নেভা বাতিগুলো নিঃসন্দেহে পুরো এলাকায় একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। ঈশিতা দূর থেকে লক্ষ করে, ধবধবে সাদা পোশাক পরা মানুষজন স্ট্রেচারে করে নানা বয়সী মানুষকে আনছে। আত্মীয়স্বজন তাদের ঘিরে থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু কেউ তাদের কাছে আসতে দিচ্ছে না।

অ্যাম্বুলেন্সগুলো বিশেষভাবে তৈরি। একসঙ্গে বেশ কয়েকটা স্ট্রেচার সেখানে ঢোকানো যায়। স্ট্রেচারগুলো ঢোকানোর পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। একটা একটা অ্যাম্বুলেন্স যখন ছেড়ে দিতে শুরু করেছে, তখন হঠাৎ করে খানিকটা উত্তেজনা দেখা গেল। মনে হল, উত্তপ্ত গলায় কথাকাটাকাটি হচ্ছে। একজন মহিলার কাতর গলার স্বর আর্তনাদের মতো শোনা যেতে থাকে। সাদা কাপড় পরা মানুষগুলোকে বস্তির মানুষেরা ঘিরে ফেলেছে এবং তার ভেতর থেকে একজন মহিলার কান্না শোনা যেতে থাকে।

ক্যামেরাম্যান তার ক্যামেরা নিয়ে সেদিকেই ছুটে যায়। ঈশিতা দেখল, কয়েকজন মানুষ তাকে থামানোর চেষ্টা করছে। ভিড় একটু বেড়ে যাওয়ার পর ঈশিতাও মানুষজনের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাছাকাছি এগিয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্সের কাছাকাছি একজন মাঝবয়সী মহিলা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চিৎকার করছে এবং কয়েকজন তাকে থামানোর চেষ্টা করছে। মহিলাটি কী বলছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। ঈশিতা তাই তার পাশের মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ভাই?"

"হাজেরার ছেলেরে খুঁজে পাচ্ছে না।"

"হাজেরা?" ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "এই মহিলা হচ্ছেন হাজেরা?"

"হ।"

"কেন খুঁজে পাচ্ছে না?"

"গত পরশু অ্যাম্বুলেন্সে করে নিছিল। এখন কুনোখানে নাই।"

"তাই নাকি?"

"হ। হাজেরা তো তাই বইলছে।"

বিষয়টা শোনার পর ঘটনাটা বোঝা ঈশিতার জন্য সহজ হল। সে দেখল, হাজেরা নামের মহিলাটা প্রায় বাঘের মতো সাদা পোশাক পরা মানুষগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর চিৎকার করে বলছে, "কই? আমার ছেলে কই? তুমরা পরশু দিন নিয়া গেছ।"

সাদা পোশাক পরা মাঝবয়সী একজন মানুষ বলল, "আমরা কেমন করে বলব তোমার ছেলে কোথায়?"

"পরশু দিন এই অ্যাম্বুলেন্সে করে নিছ।"

"নিয়ে থাকলে হাসপাতালে আছে।"

"নাই। আমি গিয়ে দেখেছি। অন্যরা আছে, কিন্তু আমার ছেলে নাই।"

"তা হলে অন্য কোথাও আছে।"

"আমি সব জায়গা খুঁজছি। মেডিকেল গেছি, কোথাও নাই।"

"না থাকলে আমরা কী করব?"

"তোমরা নিয়েছ, কোথায় নিয়েছ বলো।" হাজেরা নামের মহিলাটা চিৎকার করে উঠল, "কোথায় নিয়েছ? কোথায়?"

ঠিক এ রকম সময় কয়েকজন পুলিশ এগিয়ে এল। তারা রাইফেলের বাঁট দিয়ে ধাক্কা মেরে সবাইকে সরিয়ে দেয়, চিৎকার করে বলে, "সরে যাও। সবাই সরে যাও। অ্যাম্বুলেন্সগুলোকে যেতে দাও।"

সাদা পোশাক পরা মানুষগুলো ঝটপট অ্যাম্বুলেন্সে উঠে পড়ে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাইরেন বাজাতে বাজাতে সেগুলো চলতে শুরু করে। হাজেরা অ্যাম্বুলেন্সের পেছন পেছন ছুটে যেতে চেষ্টা করল। দুজন পুলিশ তাকে থামাল।

হাজেরা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো চিৎকার করতে থাকে। তখন একজন পুলিশ প্রচণ্ড

জোরে তাকে ধমক দেয়, "পেয়েছটা কী? মাতলামির জায়গা পাও না? সরকারি কাজে ডিস্টার্ব কর?"

হাজেরা আকুল হয়ে কেঁদে বলল, "আমার ছেলে—"

"তোমার ছেলে? তোমার ছেলের খোঁজ রাখবে তুমি।"

"আমার ছেলেকে—"

"মাস্তানি গুণ্ডামি করে তোমার ছেলে কী করেছে, সেই খোঁজ রাখতে পার না।"

"মাস্তানি গুণ্ডামি করে নাই—"

"খবরদার। আর একটা কথা বলেছ কি সরাসরি চুয়ান্ন ধারায় বুক করে দেব।" পুলিশদের একজন তখন উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "কী হচ্ছে? তামাশা দেখছ? যাও, সবাই যাও। নিজের নিজের কাজে যাও।"

মানুষগুলো তখন সরে যেতে থাকে।

ঈশিতা একটু দূরে সরে গিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে। যখন মানুষগুলো সরে ভিড়টা হালকা হয়ে আসে, তখন সে নিঃশব্দে হাজেরার কাছে গিয়ে বলল, "এই যে শুনেন।"

হাজেরা ঘুরে তাকাল, চোখের দৃষ্টি শূন্য। ঈশিতা বলল, "আমি একজন সাংবাদিক। আপনার কথা শুনেছি আমি। আমাকে কি একেবারে ঠিক করে বলতে পারবেন, কবে, কখন, কোন অ্যাম্বুলেন্সে আপনার ছেলেকে নিয়েছে? সঙ্গে আর কে ছিল? অ্যাম্বুলেন্সের মানুষগুলোর চেহারা কী রকম?"

হাজেরা কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর অনেকটা হিংস্র গলায় বলল, "পরশু দিন দুপুরবেলা। একটা না হয় দুইটা বাজে। অনেক অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে পিছনের অ্যাম্বুলেন্সে তুলেছে। একজন বিদেশি ছিল। সাদা চামড়া নীল চোখ।"

AMARBOI.COM

"আপনার ছেলের নাম কী?"

"মকবুল।"

"বয়স?"

"বারো।"

"আপনার কাছে মকবুলের ছবি আছে?"

"বাসায় আছে।"

"আমাকে একটু দেখাতে পারবেন?"

"আসেন আমার সাথে।"

ঈশিতা হাজেরার সঙ্গে তার বাড়িতে গেল। ঘুপচি গলির পাশে গায়ে গায়ে লাগানো চালাঘর। তার একটা তালা খুলে হাজেরা ভেতরে ঢুকে একটু পর বের হয়ে আসে। স্টুডিওতে তোলা ছবি, দশ–বারো বছরের শুকনো একটা ছেলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে স্ক্রিনে আঁকা নদী–গাছ–পাখি এবং একটি প্রাসাদের দৃশ্য। ঈশিতা বলল, "আমি এটার একটা ছবি তুলে নিই?"

হাজেরা মাথা নাড়ল। ঈশিতা তার ক্যামেরা দিয়ে মকবুলের ছবিটার একটা ছবি তুলে নেয়। ছবিটা হাজেরাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার ছেলে অসুস্থ হল কেমন করে, জানেন?"

"না। জানি না।"

"গত এক সপ্তাহে আপনার ছেলে কি অস্বাভাবিক কিছু করেছে?"

"না। করে নাই।"

"কিছু খেয়েছে?"

"না, খায় নাই।"

"কোনো ওষুধ—"

"এনজিওর আপারা সব বাচ্চাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ভাইটামিন খেতে দিল—"

ঈশিতা চমকে ওঠে। "ভাইটামিন?"

"হ্যাঁ।"

"আছে সেই ভাইটামিন?"

"আছে।"

"দেখাবেন আমাকে?"

হাজেরা আবার ভেতরে ঢুকে একটা ভিটামিনের শিশি নিয়ে ফিরে আসে। ঈশিতা শিশিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। বিদেশি দামি ভাইটামিন। ক্যামেরা বের করে সে ভাইটামিনের শিশিটার ছবি তুলে ফেরত দিয়ে বলল, "এর ভেতর থেকে আমি একটা ভাইটামিনের ট্যাবলেট নিতে পারি?"

"নেন।"

ঈশিতা শিশি খুলে একটা ভাইটামিনের ক্যাপসুল বের করে কাগজে মুড়ে পকেটে রেখে জিজ্ঞেস করল, "এই ক্যাপসুল ছাড়া মকবুল আর কিছু খেয়েছে?"

"ছোট মানুষ, সব সময়ই তো এইটা সেইটা খায়। বাদাম, আমড়া, আচার—"

"অন্য কিছু? এনজিওর আপারা কি আর কিছু খেতে দিয়েছিল?"

হাজেরা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "দিতে পারে। মনে নাই।"

"কোন এনজিও, জানেন?"

"না, জানি না।"

ঈশিতা বলল, "ঠিক আছে, তা হলে আমি আসি।"

হাজেরা ভাঙা গলায় বলল, "আমি কি মকবুলরে খুঁজে পামু?"

"পাবেন। নিশ্চয়ই পাবেন। আস্ত একজন মানুষ তো আর হারিয়ে যেতে পারে না। আমিও খোঁজ নেব। কোনো খোঁজ পেলে আমি আপনাকে জানাব।"

"আল্লাহ আপনার ভালো করুক।"

ঈশিতা চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এল। বলল, "আর শোনেন।"

"জে।"

"মকবুলের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি খুব বেশি মানুষকে কিছু বলবেন না।"

"কেন?"

"আমি জানি না। কিন্তু, কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমার কেন জানি মনে হয়, এ বিষয়টা নিয়ে আপনি যত হইচই করবেন, আপনার ওপর তত বড় একটা বিপদ আসবে।"

হাজেরা তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, "আপনি কেন এ কথা বলছেন?"

ঈশিতা বলল, "আমি জানি না। ঠিক করে জানি না। কিন্তু—" ঈশিতা তার বাক্যটা শেষ করতে পারল না।

ঈশিতা ঘুপচি গলি দিয়ে বের হতে হতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, গলির মুখে সাফারি কোট

AMARBOI.COM

পরা কঠোর চেহারার দুজন মানুষ। এই মানুষগুলোকে সে আগে দেখেছে, এরাই তাদের অফিসে এসেছিল। এরা এখন কাউকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করছে। কী জিজ্ঞেস করছে ঈশিতা বুঝে গেল। এরা হাজেরার বাসাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ঈশিতা দ্রুত পাশের গলিতে ঢুকে যায়। মানুষ দুজন এখানে তাকে দেখতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, তার আর হাজেরার দুজনেরই।

ঈশিতা বাকি দিনটুকু খোঁজখবর নিয়ে কাটাল। হাজেরার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে মকবুলকে এনডেভারের ভেতরেই নেওয়া হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সগুলো সারি বেঁধে এনডেভারে ঢুকেছে, কোনোটা অন্য কোথাও যায় নি। কাজেই মকবুল নিশ্চয়ই এনডেভারের ভেতরই আছে। অন্য সবার মেডিকেল রিপোর্ট দিয়েছে, মকবুলের রিপোর্ট নেই। শুধু যে রিপোর্ট নেই তা নয়, তার কোনো হদিসই নেই।

যাদের রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ বিপদমুক্ত—কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে তাদের শরীরে এই ভাইরাসের প্রতিষেধক আছে, ভাইরাসের আক্রমণের পর প্রথম কয়েক দিন জ্বর, মাথাব্যথা এ রকম খানিকটা উপসর্গ দেখা গেছে। তারপর নিজে নিজেই সেরে উঠতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় ভাগের মস্তিষ্কে এক ধরনের প্রদাহ শুরু হয়েছে, সেটা কতটুকু গুরুতর হবে, কেউ জানে না। যারা আক্রান্ত হয়েছে, তারা অমানুষিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে। শুধু তা-ই নয়, নানা ধরনের বিভ্রমে ভুগছে। তাদের বেশিরভাগকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাখা হয়েছে। ভাইরাসের কোনো সহজ চিকিৎসা নেই বলে সবাই অপেক্ষা করছে—শরীর নিজে থেকে যদি সেরে ওঠে তার অপেক্ষায়। তৃতীয় ভাগের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ—তারা সবাই গভীর কোমায়। এই গভীর কোমা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে কি পারবে না, কেউ জানে না।

AMARBOI.COM

ঈশিতা পরদিন হাজেরার সাথে দেখা করতে গেল। বস্তির ভেতরে ঢোকার আগেই সে অনুমান করে সেখানে কিছু একটা হয়েছে। হাজেরার ঘরের কাছাকাছি এসে বুঝতে পারল যেটা হয়েছে সেটা হাজেরাকে নিয়ে। তার ঘরের সামনে পুলিশ এবং অনেক মানুষের ভিড়। পুলিশ মানুষগুলোকে সরিয়ে রেখেছে এবং কয়েকজন ধরাধরি করে হাজেরার মৃতদেহটি বের করে আনছে। গত রাতে সে বিষ খেয়ে মারা গেছে।

ঈশিতা কোনো কৌতূহল দেখাল না, কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে তার ভেতরটা আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে আছে। তাকে কেউ বলে দেয় নি, কিন্তু সে জানে হাজেরা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে নি, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ঈশিতা এটিও জানে, হতদরিদ্র হাজেরার ঘর থেকে খোয়া যাওয়ার মতো মূল্যবান কিছু নেই, কিন্তু তার পরও সেখান থেকে অন্তত একটি জিনিস নিশ্চয়ই খোয়া গেছে। সেটা হচ্ছে হাজেরার ছেলে মকবুলের একটি ফটো।

বেশিরভাগ মানুষই লক্ষ করে নি, পরদিন বেশ কয়েকটি খবরের কাগজে হাজেরার মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছিল। তার মাদকাসক্ত ছেলে মকবুলের দৌরাত্ম্যে নিরুপায় হয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। মকবুল বাড়ি থেকে পালিয়েছে অনেক দিন, সে কথাটিও খবরে লেখা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সে অপরাধী চক্রের সঙ্গে জড়িত। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে। কোথাও লেখা নেই, মকবুলের বয়স মাত্র বারো। কোথাও লেখা নেই, সে ছিল হাসিখুশি শিশু, মায়ের আদরের ধন।

দেশের প্রায় সব মানুষই লক্ষ করেছিল, সে রকম আরো একটি খবর সেদিন খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য নূতন একটি এলগরিদম এনডেভার প্রথমবারের মতো পরীক্ষা করে দেখেছে। তাদের নিউরাল কম্পিউটারে সেই এলগরিদম একটি মাইলফলক সৃষ্টি করেছে। এনডেভার খুব গর্ব করে বলেছে বাংলাদেশের মানুষ শুনে খুব আনন্দ পাবে যে এই মাইলফলকটি স্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশে, এই নিউরাল কম্পিউটারটিও তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। এনডেভার বাংলাদেশের জনগণ, তাদের মেধাবী জনগোষ্ঠী এবং সরকারের আন্তরিক সহযোগিতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

ঈশিতা খবরের কাগজের দুটি খবরের দিকেই দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল। সে বুঝতে পারল, তার ভেতর একটা অসহ্য ক্রোধ পাক খেয়ে উঠছে। অসহায় ক্রোধ, তাই সেটি ছিল ভয়ংকর।

মানুষটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ঈশিতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি কী করব?"

"আপনি আপনার টিমের সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাবেন।"

মানুষটা কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "আ-আমি, আমার টিমের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ।"

মানুষটা বলল, "আমি আপনাকে চিনি না, জানি না, আপনি আমাদের এমপ্লয়ি না, অথচ আপনাকে আমি টিমের সঙ্গে নিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ। আমি সেটাই অনুরোধ করছি।" ঈশিতা জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমার অনুরোধ রাখা, না-রাখা আপনার ইচ্ছা।"

মানুষটা কিছুক্ষণ ঈশিতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনার অনুরোধটা যে বেআইনি, আপনি সেটা জানেন?"

"জানি।"

"আপনি কি কখনো কাউকে ছিনতাই করতে বলেছেন? চুরি, ডাকাতি কিংবা মার্ডার করতে?"

"না, বলি নি।"

"কিন্তু আমাকে একটা বড় ধরনের অপরাধ করতে বলেছেন। এর কারণে আমার চাকরি চলে যেতে পারে। আমার কোম্পানির লালবাতি জ্বলতে পারে কিংবা—" মানুষটি তার বাক্য শেষ না করেই থেমে গেল।

ঈশিতা বলল, "কিংবা—"

"আমি যদি পুলিশ-র‍্যাবকে খবর দিই, আপনি বড় ধরনের আইনি ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন।"

ঈশিতা হাসির ভঙ্গি করল। বলল, "আপনি খবর দেবেন না।" মানুষটি অবাক হয়ে বলল, "আমি খবর দেব না?"

"না। আপনি যদি সবকিছু শোনেন, তা হলে আপনি কখনোই পুলিশ আর র‍্যাবকে খবর দেবেন না।"

মানুষটা বলল, "শুনি আপনার সবকিছু।"

ঈশিতা আর পকেট থেকে মকবুলের ছবিটি বের করে মানুষটির হাতে দিয়ে বলল, "এই ছেলেটাকে দেখে আপনার কী মনে হয়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটা ছবিটি দেখে বলল, "একটা ছেলে। গরিব ঘরের ছেলে। বয়স নয়-দশ বছর।"

"কারেক্ট। তবে ছেলেটার বয়স বারো। টিঅ্যান্ডটি বস্তিতে ভাইরাস অ্যাটাকে যারা অসুস্থ হয়েছিল, তার মধ্যে এই ছেলেটাও ছিল। এনডেভারের অ্যাম্বুলেন্স তাকে নিয়ে গেছে। কিন্তু—"

"কিন্তু?"

"ছেলেটা উধাও হয়ে গেছে। তার মা হাজেরা বেগম সেটা নিয়ে হইচই করেছিল। তার ফল হয়েছে এইটা—" ঈশিতা এবার হাজেরার মৃত্যুসংবাদ ছাপা হওয়া খবরের কাগজের কাটিংটা দিল।

মানুষটা খবরের কাগজটা পড়ে মুখ তুলে বলল, "আত্মহত্যা করেছে?"

"না। মহিলাটাকে মেরে ফেলেছে।"

"আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমি জানি। সন্তানকে নিয়ে ব্যাকুল কোনো মা আত্মহত্যা করে না। তা ছাড়া আমি সেখানে দুজন মানুষকে দেখেছি, যারা অবলীলায় মানুষ খুন করতে পারে বলে নিজে আমাকে জানিয়েছে।"

মানুষটাকে এবার কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়। মাথা নেড়ে বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"পারার কথা নয়। আমি অনেক দিন থেকে লেগে আছি, তাই এখন একটু একটু বুঝতে শুরু করেছি।" ঈশিতা মুখ শক্ত করে বলল, "মকবুল নামের ছেলেটা এনডেভারের ভেতরেই আছে বলে আমার ধারণা। সেখানে কেউ ঢুকতে পারে না, আপনারা ছাড়া।"

"আমরা শুধু অক্সিজেন সাপ্লাইটা দেখি। আমাদের কোম্পানির দায়িত্ব অক্সিজেন সাপ্লাই ঠিক রাখা, আর কিছু না।"

"সেটাই দরকার। অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের শেষে থাকে একজন মানুষ। আমি শুধু জানতে চাই, সেই মানুষগুলোর মধ্যে মকবুল নামের ছেলেটা আছে কি না। আর কিছু না।"

মানুষটা নিঃশব্দে মকবুলের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশিতা বলল, "ঠিক আছে, আপনি যদি আমাকে আপনাদের টিমের সঙ্গে নিতে না চান, তা হলে অন্তত আমাকে এটুকু সাহায্য করেন। আপনি ভেতর থেকে এটুকু খবর এনে দেন যে মকবুল ভেতরেই আছে। বেঁচে আছে।"

মানুষটা কোনো কথা না বলে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশিতা তার পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে মানুষটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে এটা আমার কার্ড। আমার ফোন নম্বর, ই-মেইল, ওয়েবসাইট সব দেওয়া আছে। যদি আপনি কিছু জানতে পারেন আর যদি আমাকে জানাতে চান, তা হলে জানাতে পারেন।"

ঈশিতা উঠে দাঁড়িয়ে যখন চলে যেতে শুরু করেছে, তখন মানুষটি বলল, "আমি শুধু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না।"

"কোন ব্যাপার?"

"আপনার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তা হলে এটা অসম্ভব বিপজ্জনক একটা ব্যাপার। খবর চেপে রাখার জন্য মানুষ মানুষকে মেরে ফেলে। অথচ আপনি আমার কাছে এসে সবকিছু বলে দিলেন। কোনো রাখঢাক নেই। আপনি আমাকে বিশ্বাস করে বসে আছেন?"

ঈশিতা মাথা নাড়ল, বলল, "জি, করেছি।"

"কেন? এত বড় একটা ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিশ্বাস করলেন কেন?"

"আমি সাংবাদিক মানুষ। আমার কাজই হচ্ছে খোঁজখবর নেওয়া। আমি খোঁজখবর নিয়ে এসেছিলাম। আপনার বাবা ষাটের দশকে বামপন্থী রাজনীতি করতেন। মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আপনি মাজু বাঙালি ছদ্মনামে কবিতা লেখেন। কবিতাগুলো এখনো একটু কাঁচা কিন্তু বিষয়বস্তু খাঁটি। দেশের জন্য ভালবাসা, দেশের মানুষের জন্য ভালবাসা। আমি জানি, আপনি আর যা-ই করেন, কখনো দেশের মানুষের সঙ্গে বেইমানি করবেন না।"

মানুষটা ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আর আমি কেমন করে বুঝতে পারব, আপনি আসলে কারো সঙ্গে বেইমানি করছেন না?"

"আমার চোখের দিকে তাকাবেন, তা হলেই বুঝবেন। মানুষকে কোথাও না কোথাও অন্য মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়।"

ঈশিতা চলে যেতে যেতে আবার থামল। বলল, "মকবুলের ছবিটা আপনার কাছেই থাকুক। কিন্তু এ ছবিটা আপনার কাছে আছে, সেটা জানাজানি হলে আপনার বিপদ হতে পারে।"

মাজু বাঙালি ছদ্মনামে কবিতা লেখে যে মানুষটি, সে কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে মকবুলের ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইল।

দুদিন পর ঈশিতা একটা টেলিফোন পেল, ভারী গলায় একজন জানতে চাইল, "ঈশিতা?"

"কথা বলছি।"

"আমি মাজহার।" গলার স্বরটা পরিচিত, কিন্তু ঈশিতা ঠিক চিনতে পারল না। তখন মানুষটি তার পরিচয় আরেকটু বিস্তৃত করল। বলল, "আপনি আমাকে মাজু বাঙালি হিসেবে জানেন। কবি মাজু বাঙালি। কবি অংশটা দুর্বল, বাঙালি অংশটা শক্ত।"

ঈশিতা উত্তেজিত গলায় বলল, "আপনি? কী আশ্চর্য! কোনো খবর আছে?"

"আছে। ছেলেটা বেঁচে আছে।"

"বেঁচে আছে?"

"হ্যাঁ। তবে এই বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। যন্ত্রপাতি দিয়ে বেঁচে থাকা।"

"আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

ঈশিতা বলল, "ব্যস। এর বেশি টেলিফোনে বলার দরকার নেই। আমার টেলিফোন ট্যাপ করছে বলে মনে হয়। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে শুনে নেব।"

"ঠিক আছে।"

ঈশিতা টেলিফোন লাইন কেটে দিল।

৬

রাফি তার ক্লাস লেকচার ঠিক করছে, তখন সে শুনল চিকন গলায় একজন বলল, "আসতে পারি, স্যার?"

রাফি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, শারমিন অনেকগুলো বই বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রাফি বলল, "এসো শারমিন।"

শারমিন ভেতরে এসে বইগুলো টেবিলে রেখে বলল, "আপনার বইগুলো।"

"সব পড়া শেষ?"

শারমিন মাথা নাড়ল, বলল, "জি।"

শারমিন পড়া শেখার পর রাফি তাকে বই সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করছে। মেয়েটির পড়ার জন্য সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। রাফি তাল সামলাতে পারছে না। লাইব্রেরিতে অনেক বই, কিন্তু মেয়েটির বয়স কম, তাই সব বই দিতে পারছে না। রাফি বইগুলো ড্রয়ারে রাখতে রাখতে বলল, "ভেরি গুড শারমিন। আমি এর আগে কাউকে এত তাড়াতাড়ি বই পড়তে দেখি নি।"

শারমিন হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। রাফি বলল, "তুমি সত্যি সত্যি পড়ছ, নাকি আমাকে বোকা বানাচ্ছ?"

"সত্যি সত্যি পড়ছি।"

"ভেরি গুড।"

"আমাকে তো কেউ পড়তে শেখায় নি, তাই নিজের মতো করে পড়ি। সেজন্য মনে হয় তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।"

"নিজের মতো করে? সেটা কী রকম?"

"একটা একটা শব্দ না পড়ে একসঙ্গে পুরো পৃষ্ঠা।"

"একসঙ্গে পুরো পৃষ্ঠা?"

শারমিন মাথা নাড়ল। রাফি অবাক হয়ে বলল, "কী বলছ তুমি? সেটা কীভাবে সম্ভব?"

শারমিন লাজুক মুখে বলল, "আমি পারি।"

"দেখি।" রাফি একটা বই শারমিনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "পড়ো দেখি।"

শারমিন বইটা হাতে নিয়ে একটার পর একটা পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকে। রাফি বলল, "পড়ো।"

AMARBOI.COM

"পড়ছি তো।"

"পড়ছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি যে কয় পৃষ্ঠা উল্টেছ, সেই কয় পৃষ্ঠা পড়ে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ।"

রাফি বইটা হাতে নিয়ে বলল, "বলো দেখি, কী লেখা আছে প্রথম পৃষ্ঠায়।"

শারমিন পুরো পৃষ্ঠাটা অবিকল বলে গেল, দাঁড়ি-কমাসহ। রাফি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমি তোমাকে নিয়ে কী করব জানি না শারমিন!"

"আমাকে নিয়ে কিছু করতে হবে না। খালি আমাকে প্রতিদিন পড়ার জন্য কয়েকটা করে বই দিবেন।"

"দিব, নিশ্চয়ই দিব।"

শারমিন কথা বলতে বলতে চোখের কোনা দিয়ে রাফির টেবিলে রাখা কম্পিউটার মনিটরটা দেখছিল, শেষ পর্যন্ত সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলল, "স্যার, আপনার টেবিলের এইটা কি কম্পিউটার?"

"হ্যাঁ। এইটা কম্পিউটার।" রাফি মনিটরটা দেখিয়ে বলল, "এইটা হচ্ছে মনিটর। এখানে দেখা যায়। আসল কম্পিউটারটা নিচে। আর এইটা হচ্ছে কি-বোর্ড আর মাউস।"

শারমিন চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ সবকিছু দেখল। তারপর ইতস্তত করে বলল, "কম্পিউটার দিয়ে কীভাবে কাজ করে, আমাকে একদিন দেখাবেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই দেখাব। কিন্তু তুমি নিজেই তো একটা কম্পিউটার, তুমি এই কম্পিউটার দেখে কী করবে?"

শারমিন কোনো কথা না বলে একটু হাসার ভঙ্গি করল। রাফি বলল, "আমি তোমাকে ইচ্ছে করলে এখনই দেখাতে পারি—বাচ্চাকাচ্চাদের যেভাবে দেখাই। তোমাকে বলতে পারি, এটা দিয়ে টাইপ করে, এটা দিয়ে ছবি আঁকে, এটা দিয়ে গেম খেলে—এ রকম। কিন্তু তুমি হচ্ছ একটা প্রডিজি। তুমি হচ্ছ সুপার ডুপার জিনিয়াস। তোমাকে তো এভাবে দেখালে হবে না, ঠিক করে দেখাতে হবে। তার জন্য তোমার একটু ইংরেজি শিখতে হবে। জানো ইংরেজি?"

"একটু একটু। বাংলা কম্পিউটার নাই?"

"একেবারে নাই বলা যাবে না, কিন্তু তোমার জন্য দরকার আসল খাঁটি কম্পিউটার। বই দিয়ে তুমি যে খেলা দেখিয়েছ, এখন কম্পিউটার দিয়ে না জানি কী দেখাবে!"

"আমাকে কখন দেখাবেন?"

"আমার তো এখন একটা ক্লাস আছে। ক্লাসটা নিয়ে এসে তোমাকে দেখাই?"

শারমিনের মুখে আনন্দের একটা ছাপ পড়ল। বলল, "আমি ততক্ষণ এখানে বসে থাকি?"

"বসে থেকে কী করবে?"

"কিছু করব না। আমি কিছু ছোঁব না। শুধু তাকিয়ে থাকব।"

রাফি হেসে ফেলল। বলল, "শুধু তাকিয়ে থাকতে হবে না। তুমি একটু ছুঁতেও পার। এই যে এটা হচ্ছে মাউস, এটা নাড়াচাড়া করে একটু টেপাটেপি করতে পার।"

"কিছু নষ্ট হয়ে যাবে না তো?"

"সেটা নির্ভর করে তুমি কী টেপাটেপি করছ তার ওপর। হ্যাঁ, তুমি চাইলে আমার বারোটা বাজিয়ে দিতে পার।"

"তা হলে আমি কিছু ধরব না।"

রাফি বলল, "ভয় নেই। ধরো। টেপাটেপি করো। আমি দেখি, এক ঘণ্টায় তুমি এই কম্পিউটার থেকে কী বের করতে পার।"

শারমিনের মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল। বলল, "আপনি রাগ হবেন না তো?"

"না, রাগ হব না। আমার সবকিছু ব্যাকআপ থাকে, আমি মাঝে মধ্যে মানুষকেও বিশ্বাস করি, কিন্তু কম্পিউটারকে বিশ্বাস করি না।"

এক ঘণ্টা পর রাফি এসে দেখে, শারমিন আরএসএ সাইটে ঢুকে একশ ডিজিটের একটা কম্পোজিট সংখ্যাকে দুটি উৎপাদকে ভাগ করে বসে আছে। রাফিকে দেখে লাজুক মুখে হেসে বলল, "এখানে ইংরেজিতে কী লিখেছে, বুঝতে পারছি না।"

রাফি পড়ে বলল, "এই সাইট থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছে, তুমি যে কম্পোজিট সংখ্যাকে ফ্যাক্টরাইজ করেছ সেটা যদি দশ বছর আগে করতে তা হলে তুমি এক হাজার ডলার পুরস্কার পেতে!"

শারমিন অবাক হয়ে বলল, "এ-ক-হা-জা-র ডলার?"

রাফির অবাক হওয়ার ক্ষমতাও নেই, সে নিঃশ্বাস আটকে বলল, "এক হাজার না দশ হাজার ডলার সেটা নিয়ে আমার এতটুকু কৌতূহল নেই। আমি জানতে চাই তুমি এক ঘণ্টার মধ্যে কেমন করে ব্রাউজিং করে একেবারে তোমার উপযুক্ত একটা সাইটে ঢুকেছ—"

"ঢুকতে পারি নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পেরেছ। ঢুকে ফ্যান্টরাইজ করেছ।"

"আমি অন্য একটা জায়গায় ঢুকতে চেয়েছিলাম। ঢুকতে দেয় নি, বলে পাসওয়ার্ড লাগবে। আমি যদি আন্দাজ করে পাসওয়ার্ড দিই তা হলে ঢুকতে দেবে?"

"আন্দাজ করে পাসওয়ার্ড দেওয়া যায় না। পাসওয়ার্ড জানতে হয়।"

"কিন্তু—" শারমিনকে একটু বিভ্রান্ত দেখায়, "আমি কয়েক জায়গায় আন্দাজে পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকে গেছি!"

রাফি চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললে? কী বললে তুমি? আন্দাজে পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকে গেছ?"

শারমিন ভয়ে ভয়ে বলল, "কেন স্যার? এটা করা কি ভুল?"

"টেকনিক্যালি ইয়েস। অন্যের পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকে যাওয়া বেআইনি কাজ। রিয়েলিস্টিক্যালি এটা অসম্ভব। তুমি কেমন করে করলে?"

শারমিন শুকনো মুখে বলল, "এখন কি কোনো বিপদ হবে?"

"সেটা নির্ভর করছে তুমি কোন কোন সাইটে ঢুকে কী কী করেছ তার ওপর।"

"আমি কিছু করি নি। শুধু ঢুকেছি আর বের হয়েছি। হবে কোনো বিপদ?"

রাফি হেসে বলল, "না, কোনো বিপদ হবে না। আর যদি হয় সেটা তোমার হবে না। সেটা হবে আমার!"

"আমি স্যার বুঝতে পারি নি। আমি ভেবেছি—"

"শারমিন, তোমার ব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের এখন একটু সাবধান হওয়ার ব্যাপার আছে। তুমি আসলে এখনো টের পাও নি তুমি কী। যদি বাইরের মানুষ খবর পায় তা হলে তোমাকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। কাজেই এখন আমরা খুব সতর্ক হয়ে যাব। তুমি কাউকে কিছু বলবে না।"

শারমিন ভয়ে ভয়ে বলল, "বলব না।"

"প্রথমে আমার একটু আন্দাজ করতে হবে তোমার আসল ক্ষমতা কতটুকু। পারব কি না জানি না, কিন্তু চেষ্টা করব।"

শারমিন কোনো কথা না বলে ভীত চোখে রাফির দিকে তাকিয়ে রইল। রাফি বলল, "রামানুজন নামে একজন খুব বড় ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন, তার কোনো ফর্মাল এডুকেশান ছিল না। হার্ডি নামে আরেকজন বড় ম্যাথমেটিশিয়ানের সঙ্গে যখন রামানুজনের দেখা হল, তখন হার্ডি খুব বিপদে পড়েছিলেন।"

"কী বিপদ?"

"তাকে কতটুকু কী শেখাবেন সেটা নিয়ে বিপদ। কোনো কিছু জোর করে শেখাতে গিয়ে যদি রামানুজনের স্বাভাবিক প্রতিভার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, সেই বিপদ। তোমাকে নিয়ে আমারও সেই একই অবস্থা—তোমাকে কতটুকু শেখাব? কী শেখাব?"

শারমিন নিচু গলায় বলল, "আমাকে কিছু শেখাতে হবে না, শুধু আমার জন্য প্রত্যেক দিন কয়েকটা বই দেবেন।"

"হ্যাঁ। বই তো দেবই। কিন্তু তোমার ক্ষমতাটা একটু তো ব্যবহারও করতে হবে।" রাফি চিন্তিতভাবে তার গাল ঘষতে ঘষতে বলল, "তবে আজকে তুমি কম্পিউটারে যে খেলা দেখিয়েছ, তাতে মনে হচ্ছে তোমার ক্ষমতাটা পুরোপুরি বোঝা আমার সাধ্যে নেই।"

শারমিন ভয়ে ভয়ে রাফির দিকে তাকিয়ে রইল। রাফি গম্ভীর মুখে বলল, "তবে তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ তো, তোমার যে এ রকম ক্ষমতা আছে সেটা তুমি কাউকে বলবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"বলব না।"

"তোমার আব্বুকেও বলবে না।"

"বলব না।"

"আম্মুকে না, ভাইবোন কাউকে না।"

"আম্মুকে না। ভাইবোনকে না।"

"স্কুলের টিচার, বন্ধুবান্ধব কাউকে বলবে না।"

"বলব না, কাউকে বলব না।"

"গুড।"

শারমিন দাঁড়িয়ে বলল, "আমি তা হলে এখন যাই?"

"যাও। শারমিন, আবার দেখা হবে।"

শারমিন শুকনো মুখে বের হয়ে গেল। সে বুঝতে পারছে তার অস্বাভাবিক একটা ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেই ক্ষমতাটা তার জন্য ভালো হল, না খারাপ হল সেটা এখন আর সে বুঝতে পারছে না।

রাত সাড়ে এগারটার দিকে রাফির একটা টেলিফোন এল। অপরিচিত নম্বর। এত রাতে কে ফোন করেছে ভাবতে ভাবতে রাফি টেলিফোন ধরল, "হ্যালো।"

"রাফি? আমি ঈশিতা। এত রাতে ফোন করলাম কিছু মনে কোরো না।"

"মনে করার কী আছে? যতক্ষণ জেগে আছি, ফোন ধরা সমস্যা নয়। ঘুমিয়ে পড়লে অন্য কথা। কী ব্যাপার? তোমার নিজের ফোন কী হল? কোথা থেকে ফোন করছ?"

"আমার ফোন ট্যাপ করছে, তাই ওটা ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছি। ওই ফোন থেকে যাকে ফোন করি, তার বারোটা বেজে যায়।"

"কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

"প্রত্যেক দিন একটা করে নূতন সিম জোগাড় করি, কয়েকবার ব্যবহার করে ফেলে দিই! এখন বুঝতে পারছি জঙ্গিদের এতগুলো করে সিম থাকে কেন!"

রাফি ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি তো আমাকে চিন্তার মধ্যে ফেলে দিলে!"

"চিন্তারই ব্যাপার। যাই হোক, কদিন থেকে খুব চাপের মধ্যে আছি—কারো সঙ্গে কথা বলে একটু হালকা হওয়ার ইচ্ছে করছিল। সেই জন্য তোমাকে ফোন করেছি। একটু কথা বলি তোমার সঙ্গে?"

"বলো।"

"শারমিন কেমন আছে?"

"ভালো। আমরা শুধু তার ম্যাথ ক্যাপাবিলিটি দেখেছি। কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে দিলে সে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। না বুঝে সে ওয়েবসাইট হ্যাক করে ফেলতে পারে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। কীভাবে করে সেটা একটা মিস্ট্রি। যাই হোক, তোমার কথা শুনি। তুমি কী নিয়ে এত চাপের মধ্যে আছ?"

ঈশিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ, আমার মনে হয় তোমাদের মতো কয়েকজনকে বিষয়টা বলে রাখা ভালো। আমার যদি কিছু হয় তা হলে তোমরা যেন জানো তোমাদের কী করতে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তোমার কিছু একটা হবে কেন? কী হবে?"

"বলছি। তোমাকে এনডেভারের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?"

"হ্যাঁ মনে আছে।"

"তোমাদের বায়োকেমিস্ট্রির টিচার সমীরের এফটি টুয়েন্টি সিক্স ভাইরাসের কথা মনে আছে?"

রাফি বলল, "মনে আছে।"

"টিঅ্যান্ডটি বস্তিতে সেই ভাইরাসের এপিডেমিক হল মনে আছে?"

"হ্যাঁ, মনে আছে। এনডেভারে তাদের চিকিৎসা হচ্ছে।"

"আমার হাইপোথিসিস এ রকম। এনডেভার যে নিউরাল কম্পিউটারের কথা বলে, সেটা আসলে ভাঁওতাবাজি। তারা নিউরাল কম্পিউটার তৈরি করে সত্যিকারের মানুষ দিয়ে। মানুষের ব্রেনে তারা কিছু একটা করে তাকে কম্পিউটার হিসেবে ব্যবহার করে।"

রাফি বলল, "ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কিন্তু বলতে থাক।"

"কাজেই এনডেভারের হাইফাই মাইক্রোপ্রসেসর মেমোরির দরকার নেই। তাদের দরকার মানুষ। মানুষের ব্রেন। তাই তারা এসেছে বাংলাদেশে। তাদের ধারণা, এই দেশের গরিব মানুষের ব্রেন তারা ব্যবহার করতে পারবে। তারা শুরুও করেছে।"

রাফি বলল, "তোমার ধারণা এফটি টুয়েন্টি সিক্স ভাইরাসটা এনডেভার ছড়িয়েছে?"

"এক্সাক্টলি। যারা এফেক্টেড হয়েছে তাদের চিকিৎসার নাম করে নিজেদের বিল্ডিংয়ে নিয়ে গেছে। কাউকে কাউকে ভালো বলে ছেড়ে দিচ্ছে। কাউকে কাউকে রেখে দিচ্ছে।"

"রেখে দিচ্ছে মানে? বস্তির মানুষ গরিব থাকতে পারে, তাই বলে নিজের ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজনকে রেখে দেবে? মারাও যদি যায় তা হলেও তো ডেডবডি এনে জানাজা পড়াবে।"

ঈশিতা বলল, "সেটা সত্যি। আর এ রকম একটা ব্যাপার দিয়েই আমি নিশ্চিত হয়েছি।"

"কীভাবে।"

"একজন মহিলার বাচ্চার কোনো খোঁজ নেই। মহিলা বলছে এনডেভারের অ্যাম্বুলেন্স তাকে নিয়ে গেছে। কিন্তু রোগীর লিস্টে তার নাম নেই। মহিলা যখন চেঁচামেচি শুরু করেছে, তখন তাকে মেরে ফেলল।"

"কী বললে?" রাফি আর্তনাদ করে বলল, "মেরে ফেলল?"

"হ্যাঁ। পত্রিকায় খবর এসেছে সুইসাইড, কিন্তু আমি জানি এটা মার্ডার। আমার কাছে বাচ্চার একটা ছবি আছে। মহিলা মারা যাওয়ার আগে তার কাছ থেকে নিয়েছি। আমি খোঁজ নিয়ে কনফার্মড হয়েছি, বাচ্চাটা ভেতরে আছে। ডিপ কোমায়—কিন্তু বেঁচে আছে।"

"তুমি কেমন করে কনফার্মড হলে?"

"সেটা অনেক লম্বা স্টোরি। তোমার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হলে সেটা বলব! খুবই ইন্টারেস্টিং স্টোরি।"

রাফি বলল, "ঈশিতা। আমি তোমাকে যতই দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি!"

ঈশিতা হাসল, বলল, "তুমি আর আমাকে কখন দেখেছ? বলো, যতই শুনছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে, যতই শুনছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাই হোক ঈশিতা, ডু ইউ নো—"

"নো হোয়াট?"

AMARBOI.COM

"এখন আমার মনে হচ্ছে তোমার হাইপোথিসিস সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার কারণ—"

"কারণ?"

"টিঅ্যান্ডটি বস্তিতে বাচ্চাদের ভাইরাস ইনফেকশনের পর যখন তাদের এনডেভারে নিয়ে গেছে, তার পরপরই একটা প্রেস রিলিজ দিয়েছে। সেই প্রেস রিলিজে—"

ঈশিতা রাফিকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বলল, "আমি তোমাকে সেই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম। তারা এনাউন্স করেছে নিউরাল কম্পিউটারে তারা একটা মাইলফলক অতিক্রম করেছে। কীভাবে করেছে বুঝতে পারছ তো?"

"মানুষের ব্রেনের ভেতরে কিছু একটা করে?"

"হ্যাঁ। যাদের ধরে নিয়েছে তাদের প্রথমবার ব্যবহার করেছে। সাকসেসফুল এক্সপেরিমেন্ট!"

রাফি লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এখন তোমার কী প্ল্যান?"

"এনডেভারকে ধরিয়ে দেওয়া।"

"কীভাবে ধরাবে?"

"জানি না। কেউ আমার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। তার কারণ সবই আমার স্পেকুলেশন, না হয় শোনা কথা। আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। সারা দেশে এনডেভারের গুড উইল খুব উঁচুতে। কেউ যদি এনডেভারের বিরুদ্ধে একটা কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ তাকে ক্রিমিনাল হিসেবে ধরে নেবে। সবচেয়ে বড় কথা—"

"কী সবচেয়ে বড় কথা?"

"এনডেভার টাকা দিয়ে অনেক বড় বড় লোককে কিনে নিয়েছে। ইন্টেলিজেন্সের লোকজন তাদের পক্ষে কাজ করছে। আমি কাউকে সন্দেহের কথাটা বলতেও পারব না। বলামাত্রই আমাকে খুন করে ফেলবে।"

রাফি তার গাল ঘষতে ঘষতে বলল, "তা হলে?"

"আমার প্রমাণ দরকার। প্রমাণ। প্রমাণের জন্য আমার এনডেভারের ভেতরে ঢোকা দরকার। নিজের চোখে সবকিছু দেখা দরকার। ফটো তোলা দরকার, ভিডিও করা দরকার।"

"তুমি কেমন করে এনডেভারের ভেতরে ঢুকবে?"

"জানি না। এর থেকে বাঘের খাঁচায় ঢোকা বেশি সহজ আর বেশি নিরাপদ।"

"সেটা ঠিকই বলেছ।"

"যাই হোক রাফি, আমি টেলিফোনটা রাখি। তোমার সঙ্গে কথা বলে বুকটা একটু হালকা হল। তুমি চিন্তা করে আমাকে একটু আইডিয়া দাও। ওপরের দিকে তোমার যদি লাইনঘাট থাকে আমাকে জানিও।"

রাফি বলল, "সরি ঈশিতা। ওপরের দিকে আমার কোনো লাইনঘাট নেই।"

"তা হলে চিন্তা করে একটা আইডিয়া দাও।"

"ঠিক আছে।"

"বাই রাফি।"

"বাই ঈশিতা। ভালো থেকো।"

টুক করে লাইনটা কেটে গেল।

রাফি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। সে টের পাচ্ছিল তার শরীরের ভেতর এক ধরনের ক্রোধ পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। এনডেভারের মতো একটা প্রতিষ্ঠান এই দেশে এসেছে মানুষের মস্তিষ্কের জন্য, তারা কেটেকুটে ইলেকট্রনিক ইমপ্লান্ট বসিয়ে এক ধরনের নিউরাল কম্পিউটার তৈরি করবে। কিন্তু সেই কথাটা তারা কাউকে জানাতেও পারবে না, এটি কী রকম কথা?

রাফি ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার এই ছোট বাসাটার সামনে এক চিলতে বারান্দা আছে, সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা যায়। রাফি দেখল, আকাশে মেঘ এবং সেই মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ খেলা করছে। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে এবং সেখান থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে তার শরীরকে শীতল করে দিল। ঠিক তখন তার শারমিনের কথা মনে পড়ল! শারমিনকে ঠিক করে ব্যবহার করতে পারলে সে নিশ্চয়ই এনডেভারের ডেটাবেসে ঢুকে সব তথ্য বের করে আনতে পারবে! ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে অসম্ভব, কিন্তু শারমিনের পক্ষে এটি সম্ভব হতে পারে। সারা পৃথিবীতে মনে হয় শুধু এই বাচ্চা মেয়েটিই এই অসম্ভব কাজটি করতে পারবে। রাফির মনে হল যে এক্ষুনি ফোন করে সে ঈশিতাকে কথাটা বলে, কিন্তু ঘড়ি দেখে সে শেষ পর্যন্ত ফোন করল না। তা ছাড়া ঈশিতা তার টেলিফোন নিয়ে যে রকম ভয়ভীতি দেখিয়েছে এভাবে হুট করে ফোন করা হয়তো ঠিকও হবে না। কাল পরশু উইকএন্ড, ইউনিভার্সিটি বন্ধ, কাজেই শারমিনকে নিয়ে সে এনডেভারের সাইটটাকে হ্যাক করার চেষ্টা করবে! যদি সত্যি সত্যি করতে পারে তা হলে ঈশিতার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ভোরবেলা তার শারমিনের বাসাটি খুঁজে বের করতে হবে—কাজটি খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়।

রাফির মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই উত্তেজিত হয়েছিল। কারণ, সারা রাত সে এনডেভারের ওয়েবসাইট স্বপ্নে দেখল। তার ভেতরে গোলকধাঁধার মতো একটা জায়গায় শারমিন আর সে আটকা পড়ে গেছে; বের হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু বের হতে পারছে না। সে শুনতে পাচ্ছে, ঈশিতা চিৎকার করছে, কিন্তু সে তার কাছে যেতে পারছে না। বারবার চেষ্টা করছে, কিন্তু অদৃশ্য একটা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দ্রুত নাশতা করে রাফি বের হয়ে পড়ে। ক্যাম্পাসের দারোয়ানদের জিজ্ঞেস করতেই তারা শারমিনের বাসার ঠিকানা বলে দিল। রাফি রিকশা করে সেখানে হাজির হল। ছোট টিনের ছাপরা ঘর। কাছাকাছি অনেক বাসা, বাইরে ছোট ছোট বাচ্চারা ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে খেলছে। শারমিনের কথা জিজ্ঞেস করতেই একজন রাফিকে তাদের বাসায় নিয়ে গেল।

শারমিন তার মায়ের সঙ্গে কলতলায় বসে থালা-বাসন ধুচ্ছিল। রাফিকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আনন্দে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, "স্যার! আপনি এসেছেন।"

রাফি বলল, "হ্যাঁ, আমি এসেছি।" শারমিন তার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, "মা, যে স্যার আমাকে লাল রঙের চশমা দিয়ে পড়ালেখা করতে শিখিয়েছেন, ইনিই হচ্ছেন সেই স্যার।"

মা শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে হাসিমুখে বললেন, "আপনার লেখাপড়া শেখা মেয়ে এখন দিনরাত খালি পড়ে আর পড়ে। সংসারের কোনো কাজ করতে চায় না।"

রাফি ঠিক বুঝতে পারল না এই মহিলার কি তার মেয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কি না! সে হাসি হাসি মুখ করে বলল, "ভালো তো! যত পড়বে তত শিখবে!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বললেন, "আমরা গরিব ঘরের মানুষ। আমাদের এত লেখাপড়ার দরকার কী!"

রাফি বলল, "কী বলেন আপনি? শারমিন কত ব্রাইট একটা মেয়ে, আপনি জানেন, দেখবেন, সে কত বড় হবে!"

রাফির গলার স্বর শুনে ভেতর থেকে শারমিনের বাবা বের হয়ে এল, খুব ব্যস্ত হয়ে ভেতর থেকে একটা কাঠের চেয়ার টেনে এনে তাকে বসতে দিল। রাফি চেয়ারে বসে বলল, "আমি একটা কাজে এসেছি।"

"বলেন, কী কাজ।"

"কম্পিউটারে আমার কিছু কাজ ছিল, আমি সেখানে শারমিনের একটু হেল্প নিতে চাই।"

বাবা হেসে ফেলল। বলল, "শারমিন আপনাকে সাহায্য করতে পারবে? ও তো জীবনে কম্পিউটার দেখেই নাই।"

রাফি বলল, "সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তাকে যতটুকু শেখাতে হবে, আমি সেটা শেখাব।"

বাবা শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মেয়ে তো আপনার কাছে যাওয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া। আপনি প্রথম তার ক্ষমতাটা বের করেছেন—আপনি তার ব্রেনের সমস্যা দূর করে লেখাপড়া করতে শিখিয়েছেন, আপনি তাকে বইপত্র পড়তে দিচ্ছেন, সেদিন আপনি আপনার কম্পিউটার তাকে ব্যবহার করতে দিলেন—সবই তো আপনিই করেছেন। এই মেয়ে যতখানি আমার, ততখানি আপনার।"

"গুড। আপনার মেয়ের ব্রেনটাকে আমি আজকে আর কালকে একটু ব্যবহার করব!"

"কোনো সমস্যা নাই।"

রাফি বলল, "শুধু একটা ব্যাপার।"

"কী ব্যাপার?"

"আমি যে শারমিনকে দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছি, আপনি সেগুলো কাউকে বলবেন না।"

শারমিনের বাবা বলল, "মাথা খারাপ! ভোটকা হান্নানের পর আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। আমি কাউকে কিছু বলি না।"

"হ্যাঁ, বলার দরকার নেই।"

রাফি তখন তখনই শারমিনকে নিয়ে বের হতে চাইছিল, কিন্তু তাকে চা খেতে হল এবং একটু পায়েস খেতে হল। পায়েস রাফির প্রিয় খাবার নয়, গরিব মানুষের ঘরের পায়েসও ভালো হয় না, কিন্তু রাফি অবাক হয়ে দেখল, পায়েসটা চমৎকার।

রিকশায় উঠে রাফি শারমিনকে বলল, "আমি তোমাকে এখন যে কথাগুলো বলব, তুমি সে কথাগুলো কাউকে বলবে না।"

শারমিন মুখ শক্ত করে বাধ্য মেয়ের মতো বলল, "বলব না।"

"তুমি ছোট একটি মেয়ে, কিন্তু এখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব বড় মানুষের মতো। বুঝেছ?"

শারমিন মাথা নাড়ল। রাফি বলল, "আমাদের দেশে এনডেভার নামে একটা কম্পিউটারের কোম্পানি এসেছে বিশেষ এক ধরনের কম্পিউটার বানানোর জন্য। মানুষের ব্রেন যেভাবে কাজ করে, এই কম্পিউটারগুলো সেভাবে কাজ করবে। কিন্তু এরা কম্পিউটার না বানিয়ে কী করছে, জানো?"

"কী?"

AMARBOI.COM

"সত্যি সত্যি মানুষকে ধরে নিয়ে তাদের ব্রেন দিয়ে কম্পিউটার বানাচ্ছে।"

শারমিন চমকে উঠে বলল, "সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ, সর্বনাশ!" রাফি বলল, "ঢাকা থেকে একজন সাংবাদিক আপা এসেছিল, মনে আছে তোমার?"

"হ্যাঁ, ঈশিতা আপু।"

"সেই ঈশিতা আপু এই জিনিসটা জানতে পেরেছে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, জানো?"

"কী?"

"সেটা কোনোভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছে না। আর প্রমাণ করা না গেলে এনডেভারকে ধরা যাচ্ছে না। আর এনডেভারকে ধরা না গেলে তারা এ দেশে বসে গরিব মানুষের বাচ্চাকাচ্চাকে ধরে ধরে তাদের ব্রেনকে ব্যবহার করবে। বুঝছ?"

শারমিন মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি।"

"এখন আমি তোমাকে কেন নিয়ে এসেছি, বুঝেছ?"

শারমিন মাথা নাড়ল, বলল, "না, বুঝি নাই।"

"তুমি এনডেভারের ওয়েবসাইটে ঢুকবে। তখন আমরা সেখান থেকে এনডেভারের সব তথ্য বের করে আনব।"

"আমি পারব?"

"হ্যাঁ, পারবে। আমি তোমাকে বলে দেব, কী করতে হবে। একটা ওয়েবসাইটে ঢুকতে হলে কিছু বেআইনি কাজ করতে হয়। আমরা সেই বেআইনি কাজ করব, কেউ জানবে না সেটা তুমি করেছ। যদি জানতেও পারে, সেটা হবে আমার কম্পিউটার। কাজেই দোষ হলে সেটা হবে আমার। তোমার কোনো ভয় নাই।"

শারমিন হেসে বলল, "আমার কথা জানলেও ক্ষতি নাই! আমি ভয় পাই না।"

"তারপরও তোমাকে এই ঝামেলা থেকে দূরে রাখব। মাঝে মাঝে কিছু জটিল সমস্যা থাকবে, তোমাকে তার সমাধান করে দিতে হবে।"

"কী রকম সমস্যা?"

"তুমি এর মধ্যে এগুলো করেছ। বড় একটা সংখ্যাকে দুটি উৎপাদকে বের করা। কিংবা একটা পাসওয়ার্ডকে গোপন করে রাখা আছে, সেটা বের করা। এ রকম কাজ—অন্য যে কোনো মানুষের জন্য সেটা অসম্ভব, কিন্তু আমার ধারণা, তুমি পারবে।"

ছুটির দিন বলে ইউনিভার্সিটিতে মানুষজন খুব বেশি নাই। রাফি শারমিনকে নিয়ে তাদের নেটওয়ার্কিং ল্যাবে ঢুকল। বিকেলের দিকে এই ল্যাবে কাজ করার জন্য কিছু ছাত্র আসে, এখন কেউ নেই। কেউ আসার আগে রাফি এনডেভারের ওয়েবসাইটটা হ্যাক করে ফেলতে চায়।

শারমিনকে বিষয়টা বোঝাতে খুব বেশি সময় লাগল না। কোথা থেকে হ্যাক করছে, যেন জানতে না পারে, সেজন্য আইপি অ্যাড্রেসটাকে একটু পরে পরে বানোয়াট আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে পাল্টে দিতে হচ্ছিল। সিকিউরিটি অসম্ভব কঠিন। একবার মনে হচ্ছিল বুঝি, ডেটাবেসে ঢোকাই যাবে না, কিন্তু শারমিন কীভাবে জানি ঢুকে গেল। সেখানে সিকিউরিটির নানা পর্যায়ের এনক্রিপটেড সংখ্যাগুলো পাওয়া গেল। শারমিন সেগুলো নিয়ে কাজ করতে থাকে। একটা সুপার কম্পিউটার কয়েক মাস চেষ্টা করে যেটা বের করতে পারত, শারমিন ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেটা করে ফেলল। শারমিন যদিও রাফিকে কিছু বলল না, কিন্তু রাফি বুঝতে পারল, তার অসম্ভব পরিশ্রম হয়েছে। সে যখন কম্পিউটার মনিটরে দীর্ঘ সংখ্যাগুলোর

দিকে একদৃষ্টে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে, তখন তাকে দেখে মনে হয়, সে বুঝি অন্য জগতের মানুষ। তার চোখমুখ কঠিন হয়ে যায়, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয় এবং কখনো কখনো দুই হাত দিয়ে তার মাথা চেপে ধরে রাখে। রাফির ভয় হয়, এই অমানুষিক একটা কাজ করতে গিয়ে তার মাথার ভেতরে রক্তের কোনো ধমনি না ছিঁড়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত এনক্রিপশনটা ভেঙে শারমিন বলল, "স্যার, এই যে এটা করেছি। দেখেছেন, হয়েছে কি না?"

"দেখছি। তুমি একটু রেস্ট নাও।"

"আগে দেখেন, যদি হয়ে থাকে তা হলে রেস্ট নেব।"

রাফি কাঁপা হাতে দুই শ পঞ্চাশ ঘর লম্বা একটা সংখ্যা খুব সাবধানে প্রবেশ করাল। কয়েক মুহূর্তের জন্য কম্পিউটার মনিটরটি স্থির হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ করে তার সামনে এটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। রাফি নিঃশ্বাস বন্ধ করে কি-বোর্ডে দু-একটি অক্ষর লিখে পরীক্ষা করে। শারমিন উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, "হয়েছে?"

"হ্যাঁ, হয়েছে।" রাফি শারমিনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "চমৎকার শারমিন। ফ্যান্টাস্টিক।" রাফি দেখল, শারমিনের মাথাটা আগুনের মতো গরম হয়ে আছে, কী আশ্চর্য!

শারমিন দুর্বল গলায় বলল, "আমি একটু বিশ্রাম নিই?"

"নাও।"

রাফির কথা শেষ হওয়ার আগেই শারমিন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। রাফি শারমিনকে ধরে ল্যাবের পেছনে রাখা সোফায় শুইয়ে দিল। তারপর নিঃশব্দে সে নিজে এনডেভারের ডেটাবেসে ঘুরে বেড়াল। অত্যন্ত জটিল একটি সিস্টেম। প্রতিটি মানুষের সব তথ্য রয়েছে। কোন মানুষের কতটুকু সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স, তা ঠিক করে দেওয়া আছে। পুরো বিল্ডিংটি অসংখ্য সিসি ক্যামেরা দিয়ে নজরে রাখা হয়েছে। ইচ্ছে করলে সে যে কোনো কিছু দেখতে পারে। রাফি ইচ্ছে করলে এখন যেটা ইচ্ছে সেটা পরিবর্তন করে দিতে পারে, কিন্তু সে কোনো কিছু স্পর্শ করল না। এনডেভারের কেউ যেন বুঝতে না পারে, সে ভেতরে ঢুকেছিল, সে জন্য তার কোনো চিহ্ন না রেখে সে আবার বের হয়ে এল।

www.amarboi.com

শারমিন ঘণ্টা খানেক পর হঠাৎ করে জেগে উঠে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকে। তাকে দেখে মনে হয়, সে বুঝতে পারছে না, সে কোথায়। রাফি বলল, "কী হল, শারমিন, তোমার ঘুম ভাঙল?"

শারমিন লাজুক মুখে বলল, "হায় খোদা! আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?"

"প্রায় এক ঘণ্টা।"

"এক ঘণ্টা! স্যার, আপনি আমাকে জাগিয়ে দিলেন না কেন?"

রাফি বলল, "তোমার ঘুমটার দরকার ছিল। মানুষের ব্রেন কীভাবে কাজ করে, এখনো মানুষ জানে না। আর তোমার মতো ব্রেন সম্পর্কে তো আরো কিছু জানে না। তুমি যখন ওই অসাধ্য কাজটা করেছ, তখন তোমার ব্রেনে খুব চাপ পড়েছে। তাই ঘুমটার দরকার ছিল।"

শারমিন কিছু বলল না, মাথা নাড়ল। রাফি বলল, "আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তা হলে তোমার অসম্ভব খিদে পাওয়ার কথা।"

শারমিন আবার মাথা নাড়ল। রাফি বলল, "আমার আগেই বিষয়টা খেয়াল করা উচিত ছিল। তোমার জন্য কিছু খাবার আনা উচিত ছিল।"

শারমিন বলল, "না না। লাগবে না। আমি বাসায় গিয়ে খাব।"

"বাসায় গিয়ে নিশ্চয়ই খাবে। তার আগে চলো, আমি আর তুমি অন্য কিছু খাই। আজ তো ছুটির দিন, ক্যাম্পাসে ক্যানটিন বন্ধ। বাইরে গিয়ে খেতে হবে। বলো শারমিন, তুমি কী খেতে চাও। তুমি যত বড় কাজ করে দিয়েছ, তোমাকে ফাইভ স্টার হোটেলে নিয়ে খাওয়ানো উচিত!"

শারমিন বলল, "কাজ হয়েছে, স্যার?"

"তুমি এনডেভারে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছ, এখন কাজ হবে। কঠিন কাজটা শেষ। এখন বাকি শুধু ছোট ছোট কাজ। সেখানেও তোমাকে লাগবে। কালকে আবার বসব। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

শারমিনকে নিয়ে একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খেতে খেতে রাফি ঈশিতাকে ফোন করল। ঈশিতা ফোন ধরল না। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে অন্য একটা নাম্বার থেকে তাকে ফোন করল। রাফি বলল, "ঈশিতা, তুমি কোথায়?"

"অফিসে।"

"তুমি এই মুহূর্তে এখানে চলে আসো।"

"এই মুহূর্তে তো পারব না। আসতে আসতে কাল ভোর হয়ে যাবে।" রাফি বলল, "ঠিক আছে। কাল ভোরের ভেতর আসো।"

"কেন, বলবে?"

"না। শুধু জেনে রাখো, তোমার সমস্যার সমাধান হয়েছে।"

"আমি আসছি।"

ঈশিতা খুট করে লাইন কেটে দিল।

AMARBOI.COM

৭

নেটওয়ার্কিং ল্যাবের এক কোনায় রাফি ঈশিতা আর শারমিনকে নিয়ে বসেছে। এটি একটা রিসার্চ ল্যাব, যে কোনো মুহূর্তে কোনো একজন শিক্ষক বা ছাত্র চলে আসতে পারে। কেউ এলেই তারা সৌজন্য দেখানোর জন্য তাদের কাছে আসবে, কথা বলবে। ছুটির ভোরবেলায় ঢাকার একজন সাংবাদিক এবং বাচ্চা একটা মেয়েকে নিয়ে রাফি কী করছে, সেটা জানার জন্য হালকা কৌতূহল দেখাবে। তখন তাদের কী বলা হবে, সেটা আগে থেকে ঠিক করে রাখা আছে। ডিসলেক্সিয়া আছে, এ রকম বাচ্চাকাচ্চাদের লেখাপড়া নিয়ে ঈশিতা একটা রিপোর্টিং করবে এবং তার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখা হচ্ছে। তাদের বলা হবে, পদ্ধতিগুলো কাজ করে কি না, সেগুলো সরাসরি শারমিনকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হচ্ছে—বিষয়টা বিশ্বাসযোগ্য করানোর জন্য এ ধরনের বেশ কিছু ওয়েবসাইট খুলে রাখা হয়েছে এবং কিছু কাগজও প্রিন্ট করে রাখা আছে। এই ল্যাবে না বসে তারা দরজা বন্ধ করে রাফির অফিসে বসতে পারত, কিন্তু রাফি বড় ব্যান্ড উইথ নিশ্চিত করার জন্য এই ল্যাবে বসেছে।

ল্যাবের ভেতরে এখনো অন্য কোনো শিক্ষক বা ছাত্র আসে নি, তাই তারা মোটামুটি কোনো বাড়তি ঝামেলা ছাড়াই কাজ করতে পারছে। রাফি এইমাত্র ঈশিতাকে এনডেভারের পুরো সাইটটা দেখিয়েছে, যারা কাজকর্ম করে, তাদের নানা ধরনের তথ্যে চোখ বুলিয়ে

তারা এখন হাসপাতালের বিভিন্ন ঘরে রোগীদের প্রোফাইল দেখছিল। দোতলাটি মূল হাসপাতাল, তিন তলার কিছু ঘরে বিশেষ কয়েকজন রোগী। তাদের সারা শরীর নানা ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। মুখে মাস্ক, অক্সিজেন টিউব, মাথার চুল কামানো, সেখানে নানা ধরনের টিউব ও মনিটর। চারপাশে নানা আকারের স্ক্রিনে নানা ধরনের তরঙ্গ এবং সংখ্যা জ্বলজ্বল করছে। ঈশিতা নিঃশ্বাস আটকে বলল, "এদের ভেতর একজন নিশ্চয়ই মকবুল নামের হারিয়ে যাওয়া ছেলেটি।"

"তোমার ছবির সঙ্গে চেহারা মিলছে?"

ঈশিতা হাতের ছবিটার সঙ্গে চেহারা মেলানোর চেষ্টা করে বলল, "বলা মুশকিল। ছবিতে বাচ্চাটা হাসিখুশি। মাথা ভরা চুল। এখানে মাথা কামানো। খুলির ভেতর থেকে যন্ত্রপাতি টিউব বের হয়ে আসছে। মুখের ভেতর পাইপ, নাকের ভেতর পাইপ, মুখের বেশিরভাগ মাস্ক দিয়ে ঢাকা। চোখ-মুখ ফুলে আছে—ভয়ংকর দৃশ্য। মেলানো অসম্ভব।"

"তা হলে কী করবে?"

"এর নাম-ঠিকানা বের করতে পারবে?"

রাফি বলল, "নাম-ঠিকানা নেই, শুধু নম্বর দিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে করেই নাম-ঠিকানা রাখছে না।"

"এই রোগীগুলোর ভিডিও নামানো যাবে?"

"যাবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে।"

"কী?"

"যেই মুহূর্তে ভিডিওগুলো নামাব, তাদের সিস্টেম কিন্তু সতর্ক হয়ে যাবে। কাজেই নূতন করে প্রোটেকশন দিয়ে আমাদের বের করে দিতে পারে।"

"তা হলে তো মুশকিল।"

রাফি বলল, "যখন তুমি একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত হবে কোনটা নামাতে হবে, তখন আমরা ডাউনলোড শুরু করব।"

ঈশিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত হতে পারছি না। যদি সশরীরে ভেতরে ঢুকতে পারতাম, তা হলে হতো।"

শারমিন এতক্ষণ চুপ করে বসে তাদের কথা শুনছিল। এবার ইতস্তত করে বলল, "ঈশিতা আপু তো ইচ্ছা করলে ভেতরে ঢুকতে পারে।"

রাফি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে?"

"যারা যারা এই বিল্ডিংয়ে ঢুকতে পারে, তাদের সবার ফটো আছে, নাম-ঠিকানা আছে। আমরা সেখানে ঈশিতা আপুর ফটো, নাম-ঠিকানা ঢুকিয়ে দিই। তা হলেই তো আপু ওই কোম্পানির একজন হয়ে যাবে!"

ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "এটা সম্ভব?"

রাফি মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ, সম্ভব।"

"সত্যি?"

"সত্যি। তবে এখানে অন্য ঝামেলা আছে।"

"কী ঝামেলা?"

"এটা তো হাই সিকিউরিটি অফিস, এখানে তো শুধু ছবি আর আইডি কার্ডের ওপর ভরসা করে নেই। এরা নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু চেক করে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট হতে পারে।"

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি চেক করে বের করতে পারবে?"

"অবশ্যই।" রাফি কম্পিউটার মনিটরে ঝুঁকে কি-বোর্ডে দ্রুত টাইপ করতে থাকে। একটু পরে হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্! হবে না।"

"কী হবে না?"

"তোমাকে ওদের ডেটাবেসে ঢুকিয়ে দিলেও লাভ নেই। ওরা সিকিউরিটির জন্য প্রত্যেক এমপ্লয়ির ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর রেটিনা চেক করে।"

"রেটিনা?" ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "রেটিনা কীভাবে চেক করে?"

"ছোট অপটিক্যাল ডিভাইস সরাসরি চোখের ভেতর দেখে রেটিনার একটা স্ক্যান করে। প্রত্যেক মানুষের রেটিনার ছবি আলাদা ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতন।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। তুমি যদি বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকতেও পার, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে পারবে না। রেটিনা স্ক্যান করে দরজা খোলাতে হয়।"

ঈশিতা হতাশার ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, "তা হলে ধরা না পড়ে আমার ঢোকার উপায় নেই!"

রাফি মাথা নেড়ে বলল, "আই এম সরি ঈশিতা, নেই।"

শারমিন আবার ইতস্তত করে বলল, "স্যার, একটা কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"প্রোগ্রামের যেখানে রেটিনাটা মিলিয়ে দেখে, সেখানে যদি আমরা বদলে দিই?"

"কী বদলে দেবে, শারমিন?"

"রেটিনার ছবি না মিললেও প্রোগ্রামটা বলবে, মিলেছে!"

রাফি কয়েক মুহূর্ত শারমিনের দিকে তাকিয়ে থেকে তার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক, শারমিন! অবশ্যই আমরা এটা করতে পারি। কোডিং লেভেলে মেনিপুলেশন, কিন্তু তুমি থাকতে আমাদের ভয় কিসের?"

ঈশিতা একবার রাফির দিকে আরেকবার শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? তোমরা আমাকে সশরীরে এনডেভারের ভেতর ঢোকাতে পারছ?"

রাফি বলল, "মনে হয় পারছি।"

"গুড।"

"কিন্তু শেষবার ভেবে দেখো ঈশিতা, তুমি আসলেই ভেতরে ঢুকতে চাও কি না।"

"চাই।"

"যদি কোনো বিপদ হয়?"

"দেখো রাফি, আমার জীবন এখন মোটামুটি বরবাদ হয়ে গেছে। আমি কিছুই করতে পারছি না—আমার পেছনে ফেউ লেগে আছে। টেলিফোনে কথা বলতে পারি না, ঘর থেকে বের হতে পারি না। আমার ধারণা, আমাকে কোনো একদিন মেরেই ফেলবে। পত্রিকায় কয়েক দিন লেখালেখি হবে, তারপর সবাই সবকিছু ভুলে যাবে। আমি আর পারছি না—আমি এটার শেষ দেখতে চাই। আমাকে একবার ভেতরে ঢুকতে দাও, বাকি দায়-দায়িত্ব আমার।"

রাফি কিছুক্ষণ ঈশিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিক আছে ঈশিতা, আমরা তোমাকে এনডেভারের অফিসে ঢুকিয়ে দেব।"

এরপর রাফি আর শারমিন কাজে লেগে যায়। দুপুরের ভেতরেই কাজ শেষ হয়ে যেত, কিন্তু বিকেল পর্যন্ত লেগে গেল, কারণ, দুপুরের পরই এই ল্যাবের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করল এবং রাফিকে ঈশিতা আর শারমিনের পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে

তাদের খোঁজখবর নিল। সবাইকে খুশি করার জন্য রাফিকে ডিসলেক্সিয়ার ওপর অনেক তথ্য নামাতে হল, প্রিন্ট করতে হল এবং আলোচনা করতে হল। তারপরও শেষ পর্যন্ত রাফি আর শারমিন মিলে সিকিউরিটি সফটওয়্যারের কোডিং পাল্টে দিল। এনডেভারের সিকিউরিটি সিস্টেম সত্যি সত্যি সবার রেটিনা স্ক্যান করবে, সেটি মিলিয়েও দেখবে, কিন্তু সেটি না মিললেও কোনো আপত্তি না করে দরজা খুলে দেবে। তিনজন বসে বসে সিকিউরিটির পুরো ব্যাপারটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখল। ঈশিতাকে ডেটাবেসে ঢোকানোর পর তাকে একটি এমপ্লয়ি নম্বর দেওয়া হল। রাফি সেই এমপ্লয়ি নম্বর ব্যবহার করে তার ছবি আর এনডেভারের লোগো দিয়ে একটি আইডি কার্ড ডিজাইন করে দিল। একটা প্লাস্টিক আইডি কার্ডের ওপর সেটা ছাপিয়ে নিতে হবে। এই আইডি কার্ডগুলো শুধু সৌন্দর্যের জন্য, এনডেভার তার সিকিউরিটি ব্যবস্থার জন্য এর ওপর নির্ভর করে নেই।

সব কাজ শেষ করে রাফি বিকেলে ঈশিতাকে বাসে তুলে দিয়ে আসে। বাস ছেড়ে দেওয়ার আগে ঈশিতা ফিসফিস করে বলল, "আমার জন্য দোয়া কোরো, রাফি।"

রাফি নরম গলায় বলল, "আমি সব সময়ই তোমার জন্য দোয়া করি।"

ঈশিতা এনডেভারে ঢোকার জন্য সকালের দিকের সময়টা বেছে নিল। এফটি টুয়েন্টি সিক্স ভাইরাসের রোগীদের দেখার জন্য তাদের আত্মীয়স্বজনদের সকালবেলা ঢুকতে দেওয়া হয়, তখন খানিকটা ভিড় থাকে। সে ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল, মোটামুটি আধুনিক পোশাক পরে এসেছে, চুলগুলো একটু ফাঁপিয়ে এনেছে, ঠোঁটে উজ্জ্বল লাল রঙের লিপস্টিক। তার ঘাড় থেকে একটা ব্যাগ ঝুলছে, সেখানে মোবাইল টেলিফোন আর ক্যামেরা। ঈশিতা ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে শেষ মুহূর্তে ডান দিকে সরে গেল—এনডেভারের নিয়মিত কর্মচারীরা এখানে গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকে। গতকাল রাফির নেটওয়ার্কিং ল্যাবে কম্পিউটারের সামনে বসে পুরো প্রক্রিয়াটি অনেকবার দেখে মুখস্থ করে রেখেছে।

ভারী লোহার দরজার সামনে একটা ছোট মডিউল, সেখানে নিউমেরিক কি-প্যাড, সবাই এমপ্লয়ি নম্বরটি প্রবেশ করায়। ঈশিতাকে গতকাল রাফি আর শারমিন মিলে একটি এমপ্লয়ি নম্বর দিয়েছে—এখন প্রথমবার সে এটি প্রবেশ করাবে। সবকিছু যদি ঠিকভাবে করা হয়ে থাকে, সত্যি সত্যি যদি সিকিউরিটির মূল ডেটাবেসে তার এমপ্লয়ি নম্বরটি ঢোকানো হয়ে থাকে, তা হলে সে যখন তার নম্বরটি প্রবেশ করাবে, তখন দরজাটি খুলে যাবে। যদি ব্যাপারটি ঠিকভাবে করা না হয়ে থাকে, তা হলে কী হবে, সে জানে না। সম্ভবত কর্কশ স্বরে অ্যালার্ম বেজে উঠবে এবং গেটের কাছে কাচের ঘরে বসে থাকা সিকিউরিটির মানুষটি তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি নিয়ে ছুটে আসবে। ঈশিতা কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করাল। তারপর সাবধানে ছয় সংখ্যার এমপ্লয়ি নম্বরটি প্রবেশ করাল, কোনো অ্যালার্ম বেজে উঠল না এবং খুট করে দরজাটি খুলে গেল। ঈশিতা বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাসটি সাবধানে বের করে দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। এখানে একটা ছোট করিডরের মতো রয়েছে, যাদের সর্বোচ্চ সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স রয়েছে, তারা ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকবে, অন্যরা বাঁ দিকে। ঈশিতা ডান দিকে এগিয়ে গেল, একজন বিদেশি মানুষ তার আগে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে আঙুলের ছাপ, তারপর চোখের রেটিনা স্ক্যান করিয়ে মানুষটি দরজা খুলে ঢুকে যাওয়ার পর ঈশিতা এগিয়ে গেল। কাচের প্লেটে তার দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল রাখার পর একটা সবুজ আলো ঝলসে উঠল। এবার তার রেটিনা স্ক্যান করাতে হবে নির্দিষ্ট জায়গায় থুতনি রেখে, ঈশিতা ছোট একটি লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকায়। মুহূর্তের জন্য সে একটা লাল আলোর ঝলকানি দেখতে পেল। ঈশিতা নিঃশব্দে

দাঁড়িয়ে থাকে, রাফি আর শারমিন মিলে সবকিছু ঠিকভাবে করে রাখলে এখন দরজাটা খুলে যাওয়ার কথা। দরজা খুলল না এবং হঠাৎ করে ঈশিতার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। যদি সত্যি সত্যি দরজা না খোলে, তার কী অবস্থা হবে, সে চিন্তাও করতে চায় না। খুব সাবধানে সে দরজাটাতে একটু চাপ দিল, দরজাটা খুলল না। ভেতরে কোথায় একটা যান্ত্রিক শব্দ হল এবং তখন হঠাৎ করে দরজাটা খুলে গেল। ঈশিতা বুক থেকে নিঃশ্বাসটা বের করে ফিসফিস করে বলল, "থ্যাংকু, রাফি। থ্যাংকু শারমিন।" তারপর সে হেঁটে ভেতরে ঢুকে গেল।

সামনে লম্বা আলোকোজ্জ্বল করিডর। করিডরের শেষ মাথায় দুজন বিদেশি মানুষ কথা বলছে। ঈশিতা এই মুহূর্তে কারো সামনে পড়তে চায় না, তাই একটু এগিয়ে ডান দিকে ঢুকে গেল। সারি সারি ঘর, একেবারে শেষে বাথরুম। ঈশিতা বাথরুমে ঢুকে যায়। বাথরুমে কেউ নেই, সে ঝকঝকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে, তার মুখে আতঙ্কের একটা ছাপ। ঈশিতা মুখ থেকে আতঙ্কের ছাপটি সরিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে ফিসফিস করে বলল, "ভয় নেই ঈশিতা! তুমি পারবে! নিশ্চয়ই পারবে।"

গতকাল রাফির ল্যাবে বসে পুরো বিল্ডিংটার কোথায় কী আছে, জানার চেষ্টা করেছিল। যদি ঠিকভাবে বুঝে থাকে, তা হলে সে এখন একতলার উত্তর দিকে আছে। সামনের করিডর ধরে হেঁটে পূর্ব দিকে গেলে সে একটি লিফট পাবে। লিফটের পাশে সিঁড়ি। সে লিফট কিংবা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতে পারবে। তিনতলায় সারি সারি ঘরে রোগীদের রাখা আছে, যেখানে বাইরের কেউ যেতে পারে না। ঈশিতার সেখানে যেতে হবে। বুক থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস বের করে সে বাথরুম থেকে বের হয়।

ঈশিতা করিডর ধরে হাঁটতে থাকে, করিডরে একজন বিদেশি মানুষ আসছিল, তার চোখের দিকে না তাকিয়ে সে পাশ কাটিয়ে হেঁটে যায়। হেঁটে যেতে যেতে সে বুঝতে পারে, মানুষটি তাকে চোখের কোনা দিয়ে দেখছে। কেন দেখছে, কে জানে, কিছু একটা কি সন্দেহ করছে?

ঈশিতার অনুমান সঠিক, সে খানিকদূর হেঁটে লিফট এবং লিফটের পাশে সিঁড়িটি পেয়ে গেল। ঈশিতা লিফটে ওঠার ঝুঁকি নিল না, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। তিনতলায় এসে সে করিডর ধরে হাঁটতে থাকে। পাশাপাশি অনেক রুম। প্রতিটি রুমের সামনে ছোট একটা নিউমেরিক কি–প্যাড। সে তার এমপ্লয়ি নম্বর ঢুকিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে। কোনো একটা ফাঁকা ঘরে সে ঢুকতে চায়, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়, ভেতরে কী আছে। করিডরের অন্য পাশ থেকে দুজন মানুষ কথা বলতে বলতে আসছে। ঈশিতা তাদের সামনে পড়তে চাইল না। তাই ঠিক কাছাকাছি যে রুমটি ছিল, তার দরজার নিউমেরিক কি–প্যাডে এমপ্লয়ি নম্বরটা ঢুকিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

এক পা সামনে এগিয়ে সে নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে যায়। ঘরটিতে অনেক মানুষ, সবাই বিদেশি। ঘরবোঝাই যন্ত্রপাতি। তারা সেই যন্ত্রপাতির সামনে ঝুঁকে কাজ করছে। ঘরের এক কোনায় শুকনো একটি শিশু অচেতন হয়ে আছে। তার মাথা থেকে অনেক টিউব বের হয়ে এসেছে। ঈশিতাকে ঢুকতে দেখে সবাই মাথা তুলে তাকাল, তাদের চোখেমুখে বিস্ময়। একজন মানুষ অবাক হয়ে ইংরেজিতে বলল, "তুমি কে? এখানে কেন এসেছ?"

ঈশিতা বুঝতে পারল, সে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু সে হাল ছেড়ে দেবে না, চেষ্টা করে যাবে। মুখে সপ্রতিভ ভাবটা ধরে রেখে এক পা এগিয়ে বলল, "তুমি আমাকে এটা জিজ্ঞেস করছ কেন? আমি তো তোমাকে এই প্রশ্নটা করছি না!"

মানুষটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না, মানে। এটা হাই সিকিউরিটি রুম, এখানে আমরা কয়েকজন ছাড়া আর কারো ঢোকার কথা নয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশিতা বলল, "এতদিন কথা ছিল না। এখন কথা হয়েছে।" এবার সে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমার নাম রাইসা সুলতানা, আমি সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট।"

মানুষটা যন্ত্রের মতো বলল, "পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।"

মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, এ রকম একজন মানুষ বলল, "তুমি এখানে কেন?"

ঈশিতা দ্রুত চিন্তা করতে থাকে। খুব বিশ্বাসযোগ্য একটা উত্তর দিতে হবে। তা হলে তাদের সন্দেহটা কিছুক্ষণের জন্য হলেও থামিয়ে রাখা যাবে। কোথায় যেন পড়েছিল সে, মিথ্যা কথা বলতে হয় সত্যের খুব কাছাকাছি। তাকে এখন সেটাই করতে হবে। ঈশিতা সেভাবে শুরু করল, "তোমরা জানো, এখানে কী হচ্ছে, তার কিছু কিছু বাইরে জানাজানি হয়েছে? কিছু সাংবাদিক সন্দেহ করতে শুরু করেছে?"

মানুষগুলো থতমত খেয়ে গেল। একজন বিড়বিড় করে বলল, "হ্যাঁ, আমরা শুনেছি। কেউ কেউ নাকি সন্দেহ করেছে।"

"তোমরা জানো, একটা কেস গোপন রাখার জন্য লোকাল সিকিউরিটি একটা খুব বড় ক্রাইম করেছে।"

"কী রকম ক্রাইম?"

"মার্ডার।"

নীল চোখের একজন মানুষ শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে বলল, "বড় একটা কাজে এ রকম কিছু হয়।"

ঈশিতা বলল, "অবশ্যই হয়। কিন্তু আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। এ দেশের মিডিয়া খুব ডেঞ্জারাস। কোনো কিছু ধরলে ছাড়ে না।"

"আমরা ভেবেছিলাম, টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা আছে।"

"এই পদ্ধতি ভালো না। তখন সবাই আরো বেশি জানতে চায়। মুখ বন্ধ করার রেট দেখতে দেখতে আকাশছোঁয়া হয়ে যায়।"

মানুষগুলো নিচু গলায় নিজেদের ভেতর কথা বলতে থাকে। আপাতত কিছুক্ষণের জন্য তাদের থামানো গেছে। ঈশিতা এবার একটু বেশি সাহসী হয়ে উঠল। বলল, "আমি তোমাদের কাজে ডিস্টার্ব করব না—যে জন্য এসেছি, সেটা শেষ করে চলে যাই।"

"কী জন্য এসেছ?"

"আমি বাচ্চাটার একটা ছবি নিতে এসেছি।"

মানুষগুলো চমকে উঠল, "ছবি? ছবি নেবে কেন?"

"দেখব, এটা মিডিয়াকে দেওয়া যায় কি না।"

মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? আমরা একটা বাচ্চার ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট লাগিয়ে স্টিমুলেশান দিচ্ছি, সেই ছবি তুমি মিডিয়াকে দেবে?"

ঈশিতা সহৃদয়ভাবে হাসল। বলল, "তোমার ভয় নেই। আমি মোটেও বলি নি মিডিয়াকে দেব। আমি বলেছি মিডিয়াকে দেওয়া যায় কি না, সেটা দেখব।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "এই পুরো প্রজেক্টের গোড়ার কথা হচ্ছে গোপনীয়তা, আর তুমি বলছ, এর ছবি মিডিয়াকে দেওয়া যায় কি না, ভাবছ?"

"হুবহু এই ছবি দেওয়া হবে না। এটাকে টাচআপ করা হবে—ফটোশপ দিয়ে মাথার টিউব সরানো হবে, মোটেও বলা হবে না যে আমরা তার ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট বসিয়েছি। আমরা বলব, এই ছেলেটিকে আমরা বাঁচানোর চেষ্টা করছি।"

একজন মানুষ বলল, "না, না। এই আইডিয়াটা ভালো না।"

ঈশিতা তার মুখের হাসি বিস্তৃত করে বলল, "এই আইডিয়াটা ভালো না খারাপ, সেটা নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না। তার জন্য প্রফেশনালরা আছে। স্পর্শকাতর বিষয় কীভাবে পাবলিককে খাওয়াতে হয়, তার জন্য সোশ্যাল সাইকোলজি নামে নূতন ডিসিপ্লিন তৈরি হয়েছে।"

মানুষগুলো কোনো কথা না বলে স্থিরদৃষ্টিতে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশিতা তার ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে বিছানায় শুয়ে থাকা অসহায় শিশুটির কয়েকটা ছবি তোলে। ছবি তোলা শেষ করে সে ক্যামেরাটা বন্ধ না করে ভিডিও মোডে নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখে। এখন সে যে দিকেই ঘুরবে, ক্যামেরা ভিডিও করে নেবে। এই মানুষগুলোর ভেতরে কোনো সন্দেহ না জাগিয়ে সে যতটুকু সম্ভব তাদের ছবি তুলে নিতে চায়।

ঈশিতা মানুষগুলোর দিকে ঘুরে বলল, "তোমরা তোমাদের কাজ কর। কী মনে হয়, তোমরা কি আরেকটা মাইলফলক দিতে পারবে?"

"এটা কী বলছ, আমরা আরো দুইটা মাইলফলক করে ফেলেছি, সেগুলো কাউকে জানাতে পারছি না।"

"ছেলেটা বেঁচে থাকবে?"

"সেটাই তো মুশকিল। শরীরের সব মেজর অর্গান ফেল করতে শুরু করেছে। কোনোভাবে আর চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আরো একটা বড় ব্রেক থ্রু হবে।"

ঈশিতার ভেতরটা কেমন যেন শিউরে উঠল। বাইরে সে প্রকাশ করল না। সহজ গলায় বলল, "আমার সব সময়ই একটা জিনিস নিয়ে কৌতূহল, আমি সাইকোলজি পড়েছি, কিন্তু টেক্সট বুকে এগুলো থাকে না। যখন তোমরা ছেলেটার ব্রেনটাকে হাই স্টিমুলেশান দিয়ে ব্যবহার কর, তখন ছেলেটা কি কিছু অনুভব করে?"

নীল চোখের মানুষটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "আমরা জানি না। মনে হয়, তার অনুভূতিটা হয় কোনো একটা স্বপ্ন দেখার মতো।"

এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি যে মানুষটি, সে মোটা গলায় বলল, "স্বপ্ন নয়, বলা উচিত দুঃস্বপ্ন। বাচ্চাটা কী রকম ছটফট করে, দেখেছ? আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওর কষ্ট হয়।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি হাত নাড়িয়ে বলল, "আমরা ওসব নিয়ে কথা না বললাম।"

ঈশিতা বলল, "হ্যাঁ, কথা না বললাম।" সে দরজার দিকে এগোতে এগোতে থেমে গিয়ে বলল, "তোমাদের যদি আমার কাছে কোনো প্রশ্ন থাকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। আমি সিস্টেমে আছি।"

দাড়ি-গোঁফওয়ালা মানুষটি বলল, "এক সেকেন্ড রাইসা, আমি একটু দেখে নিই। তুমি কিছু মনে কোরো না, এই ঘরে তোমার উপস্থিতি আমাদের জন্য খুব বড় একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।"

ঈশিতা সহৃদয়ভাবে হাসল। বলল, "আমি কিছু মনে করব না। তুমি সিস্টেমে আমার প্রোফাইল দেখে নিশ্চিত হয়ে নাও যে আমি তোমাদের একজন। আমি পুলিশ বাহিনীর একজন সিক্রেট এজেন্ট না।"

মানুষটা কম্পিউটারের স্ক্রিনে ঈশিতার ছবি, নাম-পরিচয় বের করে এনে একনজর দেখে মাথা নাড়ল। বলল, "থ্যাংকু রাইসা। তুমি তোমার কাজ কর।"

ঈশিতা ঘর থেকে বের হয়ে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার ক্যামেরায় যেটুকু তথ্য আছে, সেটা এদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ছেলেটির ছবি থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওই মানুষগুলোর ভিডিও। ঘরের ভেতর যথেষ্ট আলো ছিল, ভিডিওটা খারাপ হওয়ার কথা নয়। যন্ত্রপাতির একটা শব্দ থাকলেও কথাবার্তা ভালোভাবে রেকর্ড হয়ে যাওয়ার কথা। এখন তাকে এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে করিডর ধরে ডান দিকে।

ঈশিতা দ্রুত হাঁটতে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে করিডর ধরে হেঁটে দরজার কাছে পৌঁছায়। ঢোকার সময় আঙুলের ছাপ, চোখের রেটিনা স্ক্যান করে ঢুকতে হয়েছিল। বের হওয়া খুব সহজ, দরজার নব ঘোরালেই দরজা খুলে যাবে। ঈশিতা নব ঘুরিয়ে দরজাটা খুলতেই চমকে উঠল। দরজার অন্য পাশে বব লাস্কি দাঁড়িয়ে আছে।

ঈশিতা বব লাস্কিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যাচ্ছিল। বব লাস্কি তাকে থামাল, "এই যে তুমি, শোনো।"

ঈশিতা দাঁড়াল। বব লাস্কি বলল, "তুমি কে?"

"আমি রাইসা সুলতানা। একজন নূতন এমপ্লয়ি।"

"সেটা অবিশ্যি দেখতে পাচ্ছি। এনডেভার থেকে বের হতে চাইলে আগে সেখানে ঢুকতে হয়। আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম এমপ্লয়ি ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেবে না। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের এমপ্লয়ি।"

ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। আমি কি এখন যেতে পারি? ছোট একটা ইমার্জেন্সি ছিল।"

"তুমি অবশ্যই যাবে রাইসা সুলতানা। কিন্তু আমাকে এক সেকেন্ড সময় দাও। এখানে যাদের নেওয়া হয়েছে, আমি তাদের সবার ইন্টারভিউ নিয়েছি। সবার চেহারা আমি মনে রেখেছি। তোমার চেহারাও আমার মনে আছে, তোমাকেও আমি দেখেছি। কিন্তু খুব আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো?"

ঈশিতার শরীর শীতল হয়ে আসতে থাকে। চেষ্টা করে বলল, "কী?"

"তোমাকে আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে দেখি নি। তোমাকে আমি দেখেছি আমার অফিসে। আমি তোমার ইন্টারভিউ নিই নি, তুমি আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলে।"

ঈশিতা স্থির চোখে বব লাস্কির দিকে তাকাল। সে ধরা পড়ে গেছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সে ধরা পড়ে গেছে। বব লাস্কি নিচু গলায় বলল, "রাইসা সুলতানা কিংবা যেটি তোমার আসল নাম—তুমি কি আমার সঙ্গে একটু ভেতরে আসবে? এটি একটি ভদ্রতার কথা, কারণ তুমি যদি আসতে না চাও, তোমাকে জোর করে নেওয়া হবে। ওই দেখো দুজন সিকিউরিটি আমার ইঙ্গিতের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।"

ঈশিতা খুব সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

৮

বড় কালো একটা টেবিলের এক মাথায় ঈশিতা বসে আছে। অন্য মাথায় বসেছে বব লাস্কি। ঈশিতার ঠিক পেছনে দুজন পাহাড়ের মতো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, একজন ধবধবে সাদা, অন্যজন কুচকুচে কালো। টেবিলের দুই পাশে বেশ কিছু মানুষ, সবাই বিদেশি। ঈশিতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের অনেককেই চিনতে পারল, একটু আগে সে তাদের ধোঁকা দিয়ে ছবি এবং ভিডিও তুলে এনেছিল। মানুষগুলো এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে আছে।

বব লাস্কি একটু সামনে ঝুঁকে বলল, "বলো মেয়ে, তুমি কেমন করে এনডেভারে ঢুকেছ?"

ঈশিতা কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "বব, সে এখানকার এমপ্লয়ি। তার সর্বোচ্চ সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে। সে সেন্ট্রাল দরজা দিয়ে হেঁটে ঢুকে গেছে।"

বব লাস্কি বলল, "এটুকু আমিও জানি। কিন্তু সমস্যা হল, সে এখানকার এমপ্লয়ি না। আমরা তাকে এখানে চাকরি দিই নি, সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স তো দূরের কথা।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল বলল, "আমি নিজের চোখে দেখেছি, তার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে।"

"আমি সেটাই জানতে চাচ্ছি, কেমন করে আমাদের সিস্টেম তাকে এত বড় ক্লিয়ারেন্স দিল। কে দিল?"

টেবিলের এক কোনায় একজন একটা ল্যাপটপে ঝুঁকে কাজ করছিল। সে বলল, "আমাদের কেউ দেয় নি, স্যার। আমি পুরো সিস্টেম চেক করেছি।"

বব লাস্কি টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "তা হলে কে দিয়েছে?"

মানুষটা ল্যাপটপে আরো ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমাকে দুই মিনিট সময় দেন, স্যার। আমি সিস্টেমের পুরো লগ বের করে আনছি। ঠিক কীভাবে সে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পেয়েছে, আমি বের করে ফেলছি।"

বব লাস্কি এবার ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আমার রেকর্ড থেকে বের করে দেখেছি, তোমার নাম হচ্ছে ঈশিতা। তুমি আমার ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলে।"

ঈশিতা কোনো কথা বলল না। বব লাস্কি বলল, "এনডেভার একটা প্রাইভেট কোম্পানি। এখানে বাইরের কেউ ঢোকার কথা নয়। তুমি এখানে ঢুকে পুরোপুরি বেআইনি কাজ করেছ।"

ঈশিতা এই প্রথমবার মুখ খুলল। বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যিই যদি আমি বেআইনি কাজ করে থাকি, আমাকে পুলিশে দাও। আরো ভালো হয়, যদি পুলিশকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

বব লাস্কি বলল, "তুমি খুব ভালো করে জানো, আমরা তোমাকে পুলিশে দেব না। তোমাদের দেশের আইনকানুনের ওপর ভরসা করে আমরা এখানে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান শুরু করি নি। যেটুকু আইনের সাহায্য দরকার, সেটুকু আমরা ডলার দিয়ে কিনে নিয়েছি, ক্যাশ ডলার।"

ঈশিতা জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমাকে এই তথ্যটুকু দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, মিস্টার লাস্কি।"

"তোমাকে এই তথ্যটা দিচ্ছি, কারণ এটা কোনো দিন তোমার ভেতর থেকে বের হবে না।"

ঈশিতার বুক কেঁপে উঠল, মুখে সেটা সে প্রকাশ হতে দিল না। জিজ্ঞেস করল, "কেন বের হবে না?"

"কারণ, তুমি বলে এই পৃথিবীতে কারো অস্তিত্ব থাকবে না।"

"তুমি আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছ?"

বব লাস্কি বলল, "হুমকি নয়, আমি তোমাকে জানাচ্ছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশিতা টেবিলের দুই দিকে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই অনেক বড় বিজ্ঞানী কিংবা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ম্যাথমেটিশিয়ান। পৃথিবীর সেরা সেরা জার্নালে নিশ্চয়ই তোমাদের গবেষণা পেপার ছাপা হয়েছে। অথচ তোমরা চুপচাপ বসে দেখছ, এই মানুষটি আমাকে খুন করে ফেলার কথা বলছে। তোমাদের কারো ভেতর এটা নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই?"

নীল চোখের মানুষটি শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "মেয়ে, তুমি ব্যাপারটাকে কেন ড্রামাটিক করার চেষ্টা করছ, কোনো লাভ নেই। হিরোশিমার ওপর যখন এনোলা গে থেকে পৃথিবীর প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা হয়েছিল, তখন সেই পাইলটদের হাত একটুও কাঁপে নি। তারা এক মুহূর্তে এক লাখ লোক মেরেছিল, কিন্তু তাদের কারো মনে হয় নি, তারা হত্যাকারী। বিশ্বযুদ্ধ শেষ করার জন্য সেই হত্যাকাণ্ডের দরকার ছিল। এখানেও তা-ই।"

ঈশিতা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বলল, "এখানেও তা-ই?"

"হ্যাঁ। পৃথিবীর সভ্যতা আর কম্পিউটার এখন সমার্থক। মাইক্রোপ্রসেসরের ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে এক জায়গায় থেমে যাচ্ছে, কোয়ান্টাম মেকানিকস বলছে, আর ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব নয়। অথচ আমাদের মানুষের মস্তিষ্ক এসব কম্পিউটার থেকে হাজার-লক্ষ গুণ শক্তিশালী। আমরা সেটাকে যন্ত্রপাতির সঙ্গে জুড়ে দিতে শিখি নি। যখন জুড়ে দিতে পারব, তখন পৃথিবী থেকে কনভেনশনাল কম্পিউটার উঠে যাবে। এই কম্পিউটারের তুলনায় সেটা হয়ে যাবে একটা খেলনা।"

বব লাস্কি বলল, "জর্জ, তুমি কেন শুধু শুধু এই মেয়েটার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করছ।"

জর্জ নামের নীল চোখের মানুষটি বলল, "সময় নষ্ট করছি, কারণ এই মেয়ে আমাদের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, মানুষের ভবিষ্যৎ সভ্যতার জন্য যে গবেষণার দরকার, আমরা সেই গবেষণা করছি। পৃথিবীর মানুষ সেই গবেষণার কথা শুনতে এখনো প্রস্তুত হয় নি, সে জন্য আমরা থেমে থাকব না—"

জর্জ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ল্যাপটপ হাতে মানুষটি একটা আর্তচিৎকারের মতো শব্দ করল। বব লাস্কি বলল, "কী হয়েছে?"

মানুষটা ভাঙা গলায় বলল, "আমি এটা বিশ্বাস করি না।"

"তুমি কী বিশ্বাস কর না?"

"এখানে যেটা ঘটেছে।"

"এখানে কী ঘটেছে?"

"গতকাল সকাল নয়টা তিরিশ মিনিটে কেউ আমাদের সিস্টেমে ঢুকেছে। ডেটাবেস থেকে এনক্রিপটেড পাসওয়ার্ড ডাউনলোড করেছে নয়টা সাতান্ন মিনিটে। দশটা বিয়াল্লিশ মিনিটে পাসওয়ার্ডকে ডিক্রিপ্ট করে সিস্টেম ব্রেক করেছে।"

টেবিলের চারপাশের সব মানুষ পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল। মনে হল, ঘরের মধ্যে একটা বজ্রপাত হয়েছে। বব লাস্কি অনেক কষ্ট করে বলল, "কী, কী বললে? আমাদের এনক্রিপশান ডিকোড করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আ-আ-আমাদের এনক্রিপশন?"

"হ্যাঁ।"

"এক ঘণ্টার কম সময়ে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ।"

"কোন পদ্ধতিতে? কোন কম্পিউটার ব্যবহার করেছে?"

ল্যাপটপের মানুষটি দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ করল। তারপর বলল, "কোনো পদ্ধতি নয়, সরাসরি। কোনো একজন মানুষ কি-বোর্ডে একটা একটা সংখ্যা টাইপ করেছে।"

বব লাস্কি এখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "কোনো একজন মানুষ? এক ঘণ্টার ভেতর আমাদের এনক্রিপশন ভেঙেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা হাফ বিলিয়ন ডলার দিয়ে যেটা তৈরি করিয়েছি? যেটা সারা পৃথিবীতে ব্যবহার করে?"

"হ্যাঁ। কোনো একজন মানুষ সেটা ভেঙেছে।"

বব লাস্কি একবার ঈশিতার দিকে তাকাল, তারপর টেবিলের চারপাশে বসে থাকা মানুষগুলোকে বলল, "আমরা যে নিউরাল কম্পিউটার তৈরি করার চেষ্টা করছি, তার থেকে লক্ষ-কোটি গুণ ক্ষমতার মানুষ আছে?"

ল্যাপটপের সামনে বসে থাকা মানুষটি বলল, "একবার সিস্টেমে ঢোকার পর তারা এই মেয়েটির পুরো তথ্য ডেটাবেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

"আঙুলের ছাপ আর রেটিনা স্ক্যানিং?"

"ওভার রাইট করে দিয়েছে।"

"তার মানে?"

"তার মানে, আমাদের এনডেভার এখন কারো আঙুলের ছাপ আর রেটিনা চেক করে না। সবাইকেই ঢুকতে দিচ্ছে!"

বব লাস্কি নিজের মাথা চেপে ধরে বলল, "ও মাই গড!"

ল্যাপটপের সামনে বসে থাকা মানুষটি বলল, "আমাদের এনডেভার আর একটা ফাস্টফুডের দোকানের সিকিউরিটি এখন একই সমান!"

বব লাস্কি তার মাথা চাপড়ে দ্বিতীয়বার বলল, "ও মাই গড!"

নীল চোখের সুদর্শন মানুষটি বলল, "বব, তোমার এত বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বলতে পার, আমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ একটা সুযোগ পেয়েছি।"

"কী সুযোগ?"

"এ দেশে একজন মানুষ আছে, যার মস্তিষ্ক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুপার কম্পিউটার থেকে বেশি ক্ষমতাশালী। আমরা যে নিউরাল কম্পিউটার তৈরি করতে চাইছি, তার থেকে লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী। কাজেই আমাদের কাজ এখন পানির মতো সোজা।"

"কী রকম?"

"ওই মানুষটাকে ধরে আনো। আমরা তার ব্রেন স্ক্যান করি। তারপর সেটা উপস্থাপন করি।"

বব লাস্কি নীল চোখের মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, "তার মানে, আমাদের এনডেভারের এই সেটআপের দরকার নেই?"

"না, আমাদের ওই মানুষটি দরকার। জীবিত হলে সবচেয়ে ভালো। জীবিত পাওয়া না গেলে মৃত। মৃত পুরো শরীরটা পাওয়া না গেলেও ক্ষতি নেই। শুধু মস্তিষ্কটা হলেই হবে। লিকুইড নাইট্রোজেনে ফ্রিজ করে হেড অফিসে পাঠিয়ে দাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বব লাস্কি ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়ে, তুমি আমাদের বলো, এই মানুষটা কে? কোথায় আছে?"

ঈশিতা শব্দ করে হেসে উঠল, তাকে হাসির ভান করতে হল না, সে সত্যি সত্যি হাসতে পারল। হাসতে হাসতে বলল, "মানবসভ্যতার যুগান্তকারী পরিবর্তনের জন্য তুমি মনুষ্যরূপী নিউরাল কম্পিউটার চাইবে, আর সাথে সাথে পেয়ে যাবে? এ দেশের মানুষ এত সহজ?"

বব লাস্কি হিংস্র গলায় বলল, "বলো, সেই মানুষটা কে?"

ঈশিতার হাসি আরো বিস্তৃত হল। বলল, "তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর যে তুমি চোখ রাঙিয়ে ধমক দেবে, আর আমি ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলে দেব?"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "একে দুই সিসি ক্রিপোনাল পুশ কর। সবকিছু বলে দেবে—"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "দুই সিসি নয়, চার সিসি দাও, তা হলে সবকিছু বলে দিয়ে ব্রেন ডেড হয়ে থাকবে।"

বব লাস্কি বলল, "দাঁড়াও। ক্রিপোনাল দেওয়ার আগে আমি আমাদের লোকাল সিকিউরিটিকে ডাকি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের ভেতর দুজন মানুষ এসে ঢুকল। একজন মধ্যবয়স্ক, অন্যজন একটু কম বয়সী। চুল ছোট করে ছাঁটা এবং পরনে ধূসর সাফারি কোট। ঈশিতা তাদের চিনতে পারে এবং ওই দুজনও তাকে চিনতে পারে। ঈশিতা তাদের প্রথম দেখেছে তার পত্রিকার সম্পাদক নুরুল ইসলামের অফিসে। সমীরকেও এরা হুমকি দিয়ে এসেছে। হাজেরা যেদিন মারা যায়, সেদিন তার বাড়ির কাছে এই দুজনকে দেখেছিল ঈশিতা।

বব লাস্কি বলল, "তোমাদের জরুরি কাজে ডেকে এনেছি। আমাদের এনডেভারে মেজর সিস্টেম ফেল করেছে। কোনো একজন মানুষ সিস্টেমে হ্যাক করেছে। এই মেয়েটা জানে, কিন্তু সে বলছে না।"

"মুখ থেকে কথা বের করতে হবে?" মানুষটির মুখে তৈলাক্ত এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, "আমাকে আধঘণ্টা সময় দাও, আর এই মেয়েটাকে দাও। নিরিবিলি—"

বব লাস্কি বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি তোমাদের টর্চার করার জন্য ডাকি নি। আমি জানতে চাইছি, তোমরা কি কোনো মানুষের কথা জানো, যে খুব দ্রুত হিসাব করতে পারে কম্পিউটারের মতো?"

"হ্যাঁ, জানি। সমীর ছোকরাটাকে টাইট দিতে যে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছি। ছোট একটা মেয়ে আছে, যে মুখে মুখে গুণ-ভাগ করে দেয়।"

বব লাস্কি টেবিলে একটা ঘুষি দিয়ে বলে, "ইউরেকা! পেয়ে গেছি।"

ঈশিতাকে দেখিয়ে বলল, "এই সাংবাদিক মেয়েটা সেখানে ছিল। ওই মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে।"

বব লাস্কি উত্তেজিত মুখে বলল, "আমাদের ওই মেয়েটা দরকার। যেভাবে সম্ভব।"

"কত দিনের মধ্যে দরকার?"

"কত দিন নয়, বলো কত মিনিট।"

"কত মিনিট?"

"হ্যাঁ। এয়ারপোর্টে যাও। আমাদের হেলিকপ্টার নিয়ে ফ্লাই কর, দুই ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে এসো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"গোপনে?"

"অবশ্যই গোপনে।" বব লাস্কি বিরক্ত মুখে বলল, "তোমাদের মিডিয়া হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মিডিয়া। একটা কিছু পেলে তার পেছনে লেগে থাকে।"

"ঠিক আছে।"

"চেষ্টা কোরো জীবিত আনতে।"

"সম্ভব না হলে ডেডবডি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ডেডবডি হলে ডিকম্পোজ করা যাবে না। ফ্রিজ করে আনতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

মানুষ দুজন যখন বের হয়ে যাচ্ছিল, তখন ঈশিতা তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নিচু গলায় বলল, "আপনারা কি দরকার হলে আপনাদের মায়েদেরও বিক্রি করে দেন?"

"এ কথা কেন বলছ?"

"যে নিজের দেশকে বিক্রি করতে পারে, সে নিশ্চয়ই নিজের মাকেও বিক্রি করে দিতে পারে, সে জন্য বলছি।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটির মুখ যেন ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেল। সে ঈশিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমি আমার দেশ বিক্রি করছি না। আমি তোমার দেশ বিক্রি করছি।"

"আপনার দেশ কোনটি?"

"আমার দেশ নাই। একাত্তরে আমি আমার দেশ হারিয়েছি। বুঝেছ?"

ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "বুঝেছি।" সে আসলেই অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে।

AMARBOI.COM

রাফি ঘড়ির দিকে তাকাল, প্রায় দুইটা বাজে। ঈশিতার সঙ্গে কথা ছিল, সে এনডেভার থেকে বের হয়েই তাকে ফোন করবে। এখনো ফোন করে নি, তার মানে ঈশিতা এখনো এনডেভার থেকে বের হতে পারে নি। সে নিজে থেকে বের না হলে ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে গিয়ে আটকা পড়ে থাকলে বিপদের কথা। রাফি কী করবে, এখনো বুঝতে পারছে না। যদি কোনো খোঁজ না পায়, তা হলে শারমিনকে নিয়ে আবার কম্পিউটারে বসতে হবে। আবার এনডেভারের ভেতর ঢুকতে হবে।

ঠিক তখনই তার ফোনটা বাজল। আশা করছিল, ঈশিতার ফোন হবে, কিন্তু দেখা গেল ফোনটা সমীরের। রাফি ফোন ধরে বলল, "হ্যালো, সমীর।"

সমীর উত্তেজিত গলায় বলল, "রাফি, তোমার মনে আছে, দুজন মোষের মতো মানুষ আমাকে ভয় দেখিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"সেই মানুষ দুটিকে ক্যাম্পাসে দেখেছি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। একটা সাদা রঙের পাজেরো থেকে নেমেছে।"

"নেমে কী করছে?"

"আমি দূর থেকে দেখলাম, মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে টংগুলোর দিকে যাচ্ছে।"

"সর্বনাশ।"

সমীর বলল, "হ্যাঁ, সর্বনাশ। বদমাইশ দুটো কেন এসেছে বলে মনে হয়?"

"যেহেতু টংগুলোর দিকে এগোচ্ছে, তার মানে, নিশ্চয়ই শারমিনের খোঁজে যাচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কেন? শারমিনের খোঁজে কেন? শারমিন কী করেছে?"

রাফি বলল, "এখনো বুঝতে পারছি না। দেখি, কী করা যায়।"

রাফি ফোন শেষ করে ঘর থেকে বের হল। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় ঠেলে সে টংয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

শারমিনের বাবা রাফিকে দেখে এগিয়ে এল। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আসেন, স্যার। বসেন।"

"শারমিন কোথায়?"

"ঢাকা থেকে দুজন স্যার আসছেন। তাঁরা শারমিনের সঙ্গে একটু কথা বলতে নিয়ে গেছেন।"

রাফি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কোথায় নিয়ে গেছে?"

"এই তো এখানে কোনো এক জায়গায়। মনে হয় ক্যানটিনে।"

রাফি ছটফট করে বলল, "আপনি আপনার মেয়েকে দুজন অপরিচিত মানুষের সঙ্গে ছেড়ে দিলেন?"

রাফির অস্থিরতাটুকু শারমিনের বাবার ভেতরে সঞ্চারিত হল। মানুষটি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কেন, স্যার? কোনো সমস্যা? দেখলাম, বয়স্ক ভদ্রলোক মানুষ। আমার সঙ্গে খুব ভদ্রলোকের মতো কথা বলল—"

রাফি বাধা দিয়ে বলল, "শারমিন? শারমিন যেতে চাইল?"

"না। যেতে চাচ্ছিল না। বলছিল, আগে আপনার সঙ্গে কথা বলবে। তখন ভদ্রলোক দুজন বলল, ঠিক আছে। আপনার কাছেও নিয়ে যাবে। তখন—"

রাফি কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল না, দূরে তাকিয়ে দেখল, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যের কাছে একটা সাদা পাজেরো দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয়, ওটাতে করেই এসেছে। যদি কোনোভাবে শারমিনকে টেনে তুলে ফেলে, তা হলেই আর তাকে খুঁজে পাবে না। মানুষগুলোর যে রকম বর্ণনা শুনেছে, তাতে সে নিশ্চিত, তাদের কাছে অস্ত্র আছে, বাধা দিলে গুলি করে বের হয়ে যাবে। রাফি অনুভব করে, তার পিঠ দিয়ে একটা শীতল ঘাম বইতে শুরু করেছে। ঠিক তখন তার ভোটকা হান্নানের কথা মনে পড়ল, সম্ভবত সে-ই এখন তাকে রক্ষা করতে পারবে।

রাফি ফোন বের করে ভোটকা হান্নানের নম্বরে ডায়াল করল। একটা আধুনিক ইংরেজি গান শোনা গেল এবং হঠাৎ করে গানটি থেমে গিয়ে ভোটকা হান্নানের গলার স্বর শোনা গেল, "আস্সালামু আলাইকুম, স্যার।"

"হান্নান, তুমি কোথায়?"

"মুক্তিযুদ্ধ চত্বরে। কেন, স্যার?"

"কী করছ?"

"সংগঠনের একটা ছোট বিষয় নিয়ে একটা ঝামেলা—"

রাফি কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি একটু সাহায্য করতে পারবে? খুব জরুরি—"

"পারব, স্যার। কী করতে হবে, বলেন।"

রাফি বলল, "না শুনেই বলে দিলে পারবে?"

"আপনি তো আর আমাকে এমন কিছু বলবেন না, যেটা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। করা সম্ভব হলে কেন পারব না? কী করতে হবে, বলেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যটার কাছে একটা সাদা পাজেরো আছে, দেখেছ?"

"দেখেছি, স্যার।"

"ওই পাজেরোয় করে দুজন মানুষ এসেছে শারমিনকে তুলে নিতে। তোমরা শারমিনকে বাঁচাও।"

"মানুষ দুজন কে?"

"জানি না। অসম্ভব ক্ষমতাশালী। আর্মড। যে কোনো মানুষ খুন করার পারমিশন আছে।"

"মানুষগুলো কই?"

"শারমিনকে নিয়ে বের হয়েছে। ক্যাম্পাসে কোথাও আছে। মনে হয় ক্যানটিনের দিকে গিয়েছে।"

"ঠিক আছে, স্যার। আমরা ব্যবস্থা করছি। শারমিনকে আপনার কাছে দিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ, দিয়ে যেতে পার। আর শোনো, মানুষগুলো কিন্তু আর্মড এবং অসম্ভব ডেঞ্জারাস।"

"আপনি চিন্তা করবেন না।"

টেলিফোন লাইনটা কেটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাফি দূর থেকে একটা স্লোগান শুনল, "জ্বালো জ্বালো—আগুন জ্বালো।"

দেখতে দেখতে একটা ছোট জঙ্গি মিছিল বের হয়ে গেল। মিছিলের সামনে শুকনো লিকলিকে হান্নান, পেছন ফিরে গলা উঁচিয়ে স্লোগান ধরছে, অন্যেরা তার উত্তর দিচ্ছে। দূর থেকে সব স্লোগান শোনা যাচ্ছে না, "অ্যাকশান অ্যাকশান, ডাইরেক্ট অ্যাকশান" এবং "প্রশাসনের গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে" এই দুটি স্লোগান সে বুঝতে পারল। মিছিলটা খুব বড় নয়। মুক্তিযুদ্ধ চত্বরের আশপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে, কখনোই সাদা পাজেরো থেকে বেশি দূরে সরে যাচ্ছে না।

রাফি দূর থেকে লক্ষ করে, হঠাৎ মিছিলটি মুক্তিযুদ্ধ চত্বর থেকে বের হয়ে রাস্তায় উঠে আসে, কারণটাও সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে। রাস্তা ধরে সাফারি কোট পরা দুজন মানুষ হেঁটে আসছে; একজন শারমিনের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে, শারমিনের চোখে-মুখে এক ধরনের অসহায় আতঙ্ক। মানুষ দুজন শারমিনকে নিয়ে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে মিছিলটিকে চলে যাওয়ার জন্য জায়গা দিল। মিছিলটি কিন্তু চলে না গিয়ে একেবারে হুড়মুড় করে মানুষ দুজনের ওপর গিয়ে পড়ল। একটা জটলা, জটলার মাঝে হুটোপুটি হচ্ছে, চিৎকার-হইচই-চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। রাফির মনে হল, ভেতরে মারপিট শুরু হয়েছে। সে একটু এগিয়ে যাবে কি না ভাবছিল, ঠিক তখন দেখল ভিড়ের মাঝখান থেকে ভোটকা হান্নান শারমিনের হাত ধরে বের হয়ে তাকে নিয়ে ছুটছে।

যেভাবে মারামারি শুরু হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই সেটা শেষ হয়ে গেল। ছাত্রদের দলটি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর রাফি মানুষ দুটিকে দেখতে পায়, শার্টের বোতাম ছেঁড়া, বিধ্বস্ত চেহারা। একজন মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বারবার তার বগলে, পেটের কাছে হাত দিয়ে কিছু একটা খুঁজছে। তার কিছু একটা হারিয়ে গেছে।

রাফি অফিসে এসে দেখল, ভোটকা হান্নান একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। কাছাকাছি আরেকটা চেয়ারে শারমিন মুখ কালো করে বসে আছে। রাফিকে দেখে হান্নান উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিল, তার মুখে এগাল-ওগাল জোড়া হাসি। হাসিকে আরো বিস্তৃত হতে দিয়ে বলল, "স্যার, আপনার শারমিনকে নিয়ে এসেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ, দেখেছি। থ্যাংকু।"
"যখন যেটা দরকার হয়, বলবেন স্যার।"
"হ্যাঁ, বলব।"
"আপনি তা হলে শারমিনকে দেখবেন, স্যার।"
"হ্যাঁ, দেখব।"
"আমি তা হলে যাই?"
"আমাকে আরেকটু সাহায্য করতে পারবে?"
"কী সাহায্য, স্যার?"
"দশ–বারো বছরের ছেলের জন্য একটা প্যান্ট আর শার্ট কিনে দিতে পারবে?"
হান্নান বলল, "ঠিক আছে, স্যার।"
হান্নান যখন চলে যাচ্ছিল, তখন রাফি তাকে ডাকল। বলল, "হান্নান, আরো একটা জিনিস।"
"কী জিনিস?"
"ওই লোকগুলোকে দেখে মনে হল, তাদের কিছু একটা হারিয়ে গেছে।"
হান্নানের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। বলল, "আপনাদের ওই সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এগুলো আমাদের ব্যাপার।"
"তোমাদের ব্যাপার?"
"জি, স্যার। আজকে বিশাল বিজনেস হল। থ্যাংকু স্যার।"
রাফি কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "ইউ আর ওয়েলকাম।" কথাটি বলে তার নিজেকে কেমন জানি বোকা বোকা মনে হতে থাকে।
হান্নান চলে যাওয়ার পর শারমিন রাফির কাছে এসে বলল, "স্যার, আমার খুব ভয় করছে।"
রাফি বলল, "তোমার ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন আর ভয় নেই।"
"কেন ভয় নেই, স্যার? ওরা যদি আবার আসে?"
"আসলে আসবে। আমি আছি না?"
"স্যার।"
"বলো, শারমিন।"
"ওই লোক দুটি খুব খারাপ।"
"তুমি কেমন করে জানো?"
"আমাকে বলেছে, আমাকে নাকি কেটে আমার ব্রেন নিয়ে যাবে।" রাফি কিছু বলল না। শারমিন বলল, "কেন আমার ব্রেন নিয়ে যেতে চায়? কারা আমার ব্রেন নিয়ে যেতে চায়?"
"আমি জানি না, শারমিন।"
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শারমিন নিচু গলায় বলল, "স্যার।"
"বলো।"
"আমার খুব ভয় করছে, স্যার।"
রাফির শারমিনের জন্য খুব মায়া হল। সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "শোনো, শারমিন। আমি তোমার কাছে আছি। কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সত্যি, স্যার?"

"হ্যাঁ, সত্যি।"

এই প্রথমবার শারমিনের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। মেয়েটি রাফির কথা বিশ্বাস করেছে।

ইউনিভার্সিটির গেটে সাদা পাজেরোটি নিয়ে মানুষ দুটি অপেক্ষা করছিল। রাফি তাদের সামনে দিয়েই শারমিনকে নিয়ে বের হয়ে এল, মানুষ দুটি টেরও পেল না। টের পাওয়ার কথাও না। কারণ রাফি শারমিনের চুল ছোট করে ছেলেদের মতো করে কাটিয়েছে। একটা হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরিয়েছে, পায়ে সাদা টেনিস শু—তাকে দেখাচ্ছে ঠিক একজন বাচ্চা ছেলের মতো। রাফি সরাসরি রেলস্টেশনে চলে এসে ট্রেনের টিকিট কিনে ট্রেনে উঠেছে। আজ রাতেই সে ঢাকা পৌঁছাতে চায়। ঈশিতার ফোন পায় নি সত্যি, কিন্তু মাজু বাঙালি নামের একজন মানুষ তাকে ফোন করে বলেছে, সে তার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে চায়। রাফি তাই ঢাকা রওনা দিয়েছে। শারমিনকে রেখে যেতে সাহস পায় নি—তার বাবাও খুব ভয় পেয়েছে। নিজের কাছে রাখার চেয়ে শারমিনকে রাফির কাছে রাখাই তার বেশি নিরাপদ মনে হয়েছে। শারমিন তাই রাফির সঙ্গে ঢাকা যাচ্ছে—তার নাম অবিশ্যি এখন শারমিন নয়, আপাতত তাকে শামীম বলে ডাকা হচ্ছে।

গভীর রাতে শারমিন যখন রাফির ঘাড়ে মাথা রেখে ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠিক তখন এনডেভারের ভেতর বব লাস্কি সাফারি স্যুট পরা মানুষ দুজনের সঙ্গে কথা বলছে। মানুষ দুজন হেলিকপ্টারে করে রাতের মধ্যেই ফিরে এসেছে। বব লাস্কি তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "কী বললে? মেয়েটাকে তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি মাথা নাড়ে। "হ্যাঁ, শুধু মেয়েটাকে না, আমার রিভলবারটাও।"

"তোমার রিভলবারটাও?"

"হ্যাঁ। ছাত্রগুলো ভয়ংকর বদ। কীভাবে খবর পেল, বুঝতে পারলাম না।"

বব লাস্কি হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কিন্তু তোমরা মেয়েটাকে না নিয়ে ফিরে এসেছ কেন?"

"মেয়েটা এখন সেখানে নেই।"

"তা হলে এখন কোথায়?"

"আমরা খোঁজ নিচ্ছি, পেয়ে যাব।"

"কেমন করে পাবে?"

"রাফি নামের ছেলেটাও নাই। নিশ্চয়ই দুজন একসঙ্গে আছে।"

"তোমাকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম।"

"চব্বিশ ঘণ্টা অনেক সময়। শুধু একটা ব্যাপার—"

"কী ব্যাপার?"

"এই চব্বিশ ঘণ্টা ঈশিতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রাফিকে ধরার জন্য তার সাহায্য লাগতে পারে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু মনে রেখো, চব্বিশ ঘণ্টার এক মিনিট বেশি নয়।"

ঈশিতা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আয়ু পেয়ে গেল। একটা ছোট ঘরে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে সে যখন রাত কাটাচ্ছিল, সে তার কিছুই জানতে পারল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

বাসাটা খুঁজে বের করে বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল, মনে হল দরজার ওপাশেই যেন মাজু বাঙালি রাফির জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। রাফি শারমিনের হাত ধরে ভেতরে ঢোকে, ছোটখাটো একটা অ্যাপার্টমেন্ট, এখানে শুধু পুরুষ মানুষ থাকে, সেটি একনজর তাকালেই বোঝা যায়।

মাজু বাঙালি বলল, "আমার নাম মাজহার। আমি যখন কবিতা লিখি, তখন নাম লিখি মাজু বাঙালি।"

"ইন্টারেস্টিং নাম। আমি রাফি আহমেদ। আমার সঙ্গে যে বাচ্চা ছেলেটা আছে, তার নাম হচ্ছে শামীম।"

"আহা, বেচারা! সারা রাত জার্নি করে কাহিল হয়ে গেছে।"

রাফি মাজহারের দিকে তাকাল, ঈশিতার ব্যাপার নিয়ে কথা বলার জন্য এসেছে, সে নিশ্চয়ই সবকিছু জানে। তাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করা যায়। তাকে শারমিনের পরিচয়টা দিয়ে রাখা ভালো। রাফি বলল, "ঈশিতা কি আপনাকে শারমিন নামের একটা মেয়ের কথা বলেছিল?"

"হ্যাঁ, বলেছিল। মানুষ কম্পিউটার। অসাধারণ জিনিয়াস।"

"হ্যাঁ। আমাদের শামীম আসলে সেই অসাধারণ জিনিয়াস মানুষ কম্পিউটার শারমিন। তার ওপর হামলা হচ্ছে, তাই তাকে ছেলে সাজিয়ে এনেছি। সুন্দর লম্বা চুল ছিল, আমি কেটে কেটে ছোট করেছি। চুল কাটা এত কঠিন, বুঝতে পারি নি।"

মাজহার ভালো করে শারমিনের দিকে তাকাল। অবাক হয়ে বলল, "তুমিই তা হলে সেই মেয়ে?"

শারমিন কোনো কথা না বলে একটু মাথা নাড়ল। মাজহার বলল, "তোমাকে দেখে খুব টায়ার্ড মনে হচ্ছে। তুমি বাথরুমে একটু হাত-মুখ ধুয়ে ওই সোফায় কয়েক মিনিট শুয়ে নাও। আমি রাফি সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলে একসঙ্গে নাশতা করব।"

শারমিন আবার মাথা নেড়ে ভেতরে গেল। মাজহার রাফির দিকে তাকায় এবং হঠাৎ করে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। সে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি না, ঈশিতা মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে কি না।"

রাফি কিছু বলল না, কী বলবে বুঝতে পারছিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার এখন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। আমি যদি তাকে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা না করে দিতাম, তা হলে এই সর্বনাশ হতো না।"

মাজহার বলল, "হতো। অন্য কোনোভাবে হতো। মেয়েটাকে আমি খুব কম সময়ের জন্য দেখেছি, কিন্তু যেটুকু দেখেছি, তাতেই বুঝতে পেরেছি, এর জীবনটাই হচ্ছে বিপজ্জনক। আপনি নিজেকে অপরাধী ভাববেন না। আমি লিখে দিতে পারি, সে নিজেই ভেতরে ঢুকতে চেয়েছে, আপনি তাকে নিষেধ করেছেন।"

"সেটা সত্যি।"

দুজনে সোফায় গিয়ে বসে এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কী বলবে, সেটা যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। মাজহার হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, "আমি পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখেছি। আপনার সঙ্গে একটু শেয়ার করি। ঈশিতা ইজ রাইট—এনডেভার শুধু যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দেশে এফটি টুয়েন্টি সিক্স ভাইরাস ছড়িয়েছে তা নয়, তারা চিকিৎসার নাম করে অসুস্থ মানুষগুলোর ব্রেন নিজেদের কাজে ব্যবহার করেছে। আমরা সেটা জানি কিন্তু সেই নিয়ে থানা পুলিশ করতে পারছি না। আপনি তাদের সিস্টেমে ঢুকেছেন, নিজের চোখে দেখেছেন কিন্তু সেই কথাটা কাউকে বলা যাচ্ছে না, কারণ আপনি ঢুকেছেন বেআইনিভাবে। আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, উল্টো আপনি বিপদে পড়ে যাবেন। শারমিন বিপদে পড়ে যাবে। তা ছাড়া এ দেশে এনডেভারের অনেক সুনাম, মিডিয়া এনডেভারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাদের সম্পর্কে একটা খারাপ কথা কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। এনডেভার ভয়ংকর অন্যায় করতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমরা ছোটখাটো বেআইনি কাজও করতে পারব না।"

মাজহার রাফির দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, রাফি কী ভাবছে। রাফি বলল, "আমরা যেটা করেছি, তাদের পাসওয়ার্ড ভেঙে সিস্টেমে ঢুকেছি, সেটা বেআইনি হতে পারে, কিন্তু পুরো বিষয়টা সবাই জানতে পারলে সেটাকে কেউ অনৈতিক বলবে না। পৃথিবীতে অনেকবার এ রকম হয়েছে, কোনো একজন সাংবাদিক একটা অনেক বড় অন্যায়-অবিচার প্রকাশ করে দিয়েছে। সে জন্য জেলও খেটেছে, কিন্তু সারা জীবন মাথা উঁচু করে থেকেছে।"

"কিন্তু আমাদের সময় খুব কম। ঈশিতাকে এর মাঝে মেরে ফেলেছে কি না, আমি জানি না। যদি মেরে ফেলে না থাকে তা হলে যেভাবে হোক ভেতরে পুলিশ-র‍্যাব-সাংবাদিক পাঠাতে হবে।"

"কীভাবে পাঠাবেন?"

"আমি ওদের বিল্ডিংয়ে বিশাল একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে চাই।"

"বিস্ফোরণ? বিল্ডিংয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

"ওদের বিল্ডিংয়ের অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব আমার। আজকে ওখানে সাপ্লাই নিয়ে যাব। ওদের যে রুমে কোনো মানুষ থাকে না, শুধু যন্ত্রপাতি, সেসব রুমে আমি অক্সিজেন লিক করিয়ে দেব।"

রাফি মাজহারকে বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু অক্সিজেন দিয়ে তো বিস্ফোরণ হয় না। সেটা জ্বলতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু বিস্ফোরণের জন্য এক্সপ্লোসিভ কিছু দরকার—"

মাজহার মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ, সে জন্য আমি অক্সিজেন লেখা সিলিন্ডারে করে মিথেনও নিয়ে যাব। ঘরের ভেতরে একেবারে সঠিক অনুপাতে মিথেন অক্সিজেন লিক করিয়ে দেব।"

"তার পরেও তো একটা স্পার্ক দরকার—"

"আমি যেসব ঘরে লিক করাব, সেখানে ভারী ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি রয়েছে, বন্ধ হচ্ছে, চালু হচ্ছে, সেখানে স্পার্ক কোনো ব্যাপার নয়। আমি যেহেতু অক্সিজেন সাপ্লাই নিয়ে কাজ করি, আমাকে সবার আগে শেখানো হয়েছে নিরাপত্তা। সেফটি। আমি নিরাপত্তার যা যা শিখেছি, তার সব কটি আজকে ভায়োলেট করাব।"

রাফি মাথা নাড়ল, "আপনি মনে হচ্ছে পুরোটা চিন্তা করে দেখেছেন।"

"হ্যাঁ, করেছি। কিন্তু আমার মনে হল, আরো একজনের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা একটু শেয়ার করা দরকার। সে জন্য আপনাকে ডেকেছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"থ্যাংকু।"

"আপনার যদি কোনো আইডিয়া থাকে, বলেন।"

রাফি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "না, এই মুহূর্তে আমার কোনো আইডিয়া নেই। শুধু একটি ব্যাপার—"

"কী?"

"আমরা সব সময়ই বলছি, এনডেভার এ দেশের পুলিশ-র‍্যাব—সবাইকে কিনে রেখেছে। কিন্তু এটা তো হতে পারে না যে এখানে কোনো ভালো মানুষ, সৎ মানুষ নেই। যাকে কেনা সম্ভব না।"

"নিশ্চয়ই আছে। সব জায়গায় থাকে। সেই জন্যই দেশটি চলছে।"

"কাজেই আমাদের চেষ্টা করা উচিত। আমি তাই ভাবছি, আমি শারমিনকে নিয়ে যাব। চেষ্টা করব, একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে দেখা করার জন্য। যদি দেখা করতে পারি, তা হলে চেষ্টা করব তাকে বোঝাতে। যদি বোঝাতে না-ও পারি, তা হলে অন্তত একটা জিডি করিয়ে আসব।"

"গুড আইডিয়া।" মাজহার মাথা নাড়ল।

"আপনার এখান থেকে বের হয়ে আমি থানায় চলে যাব।"

"ঠিক আছে।" মাজহার বলল, "এখন আপনি বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে আসেন। নাশতা করি।"

রাফি আর শারমিন যখন মাজহারের বাসায় নাশতা করছিল, ঠিক তখন ঈশিতার ছোট ঘরটি খুলে একজন মানুষ তার জন্য নাশতা নিয়ে আসে। তাকে সারা রাত যে ঘরে আটকে রেখেছে, সেই ঘরটি ছোট এবং আধুনিক। সঙ্গে খুব ছোট এবং অসম্ভব পরিষ্কার একটি বাথরুমও আছে কিন্তু আর কিছু নেই। সে ঘরের কোনায় বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে আধো ঘুম আধো জাগ্রত অবস্থায় রাত কাটিয়েছে।

AMARBOI.COM

মানুষটা নাশতার ট্রে-টি মেঝেতে রেখে কোনো কথা না বলে দরজা খুলে বের হয়ে গেল। বাইরে থেকে দরজায় আবার তালা মেরে দিয়েছে, সে তার শব্দটাও ভেতরে বসে শুনতে পেল। নাশতার জন্য তাকে যে খাবারগুলো দিয়েছে, সেগুলো খুব চমৎকার করে সাজানো। এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস। দুই স্লাইস রুটি, মাখন, জেলি, ডিম পোচ, কলা, আপেল, এক গ্লাস দুধ আর পানির বোতল। ঈশিতা সকালে নাশতা করতে পারে না—অনেক দিন সে শুধু একটা টোস্ট বিস্কুট কিংবা একমুঠো মুড়ি খেয়ে দিন শুরু করে। ঈশিতা ভেবেছিল, সে নাশতা করতে পারবে না। কিন্তু দেখা গেল, তার বেশ খিদে পেয়েছে এবং সে বেশ তৃপ্তি করেই নাশতা করল। খাওয়া শেষ তার, চায়ের তৃষ্ণা হল কিন্তু কথাটি সে কাউকে বলতে পারল না। ছোট আধুনিক একটা ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকে।

এ রকম সময় খুট করে দরজা খুলে গেল, আগের মানুষটি একটা ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ট্রের ওপরে একটা ছোট পট। একটা সুন্দর পোর্সেলিনের কাপ, একটা পিরিচে টি-ব্যাগ, চিনির প্যাকেট এবং একটা দুধদানিতে দুধ। মানুষটি ট্রে-টি মেঝেতে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তার গলা থেকে একটা ব্যাগ ঝুলছে, ব্যাগটা মেঝেতে রেখে সে বাথরুমে ঢুকে যায় এবং অনেক রকম শব্দ করে বাথরুম ধোয়া শুরু করে দেয়।

একটু পর বাথরুম থেকে বের হয়ে তার নাশতার ট্রে-টি নিয়ে কোমর থেকে ঝোলানো চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। ঈশিতা আবার শুনতে পেল, বাইরে থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালা দেওয়া হয়েছে। ঈশিতা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলল এবং হঠাৎ করে লক্ষ করল, মানুষটি তার ব্যাগটা ভুল করে ফেলে গেছে। সে ব্যাগটা টেনে এনে খোলে, ভেতরে একটা সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, কিছু কাগজপত্র, খুচরা টাকা এবং একটা সস্তা মোবাইল টেলিফোন। ঈশিতা কাঁপা হাতে মোবাইল টেলিফোনটা নেয়, বাইরে কাউকে ফোন করার এ রকম একটা সুযোগ পেয়ে যাবে, সে কল্পনাও করতে পারে নি। কাকে ফোন করতে পারে? তার পত্রিকার সম্পাদক নুরুল ইসলামকে, নাকি তার হোস্টেলের রুমমেটকে? নাকি রাফিকে? কিংবা মাজু বাঙালিকে? ঈশিতা আবিষ্কার করল যে কারো টেলিফোন নম্বরই তার মুখস্থ নেই। রাফিকে নানা টেলিফোন থেকে অনেকবার ফোন করেছে বলে আবছা আবছাভাবে তার নম্বরটা একটু বেশি মনে আছে। ঈশিতা কাঁপা হাতে নম্বরটা ডায়াল করল।

ঠিক সেই সময় রাফি মাজহারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শারমিনের হাত ধরে বের হয়ে এসেছে। বাইরে ঢাকা শহরের অবাস্তব ভিড়। মানুষজন অফিসে যাওয়ার জন্য বের হয়েছে, তাদের ব্যস্ত ছোটাছুটি দেখে মনে হচ্ছে তারা কেউ বুঝি মানুষ নয়, সবাই যেন একটা খাঁচায় আটকে থাকা ইঁদুরের বাচ্চা। মনে হচ্ছে, হঠাৎ বুঝি কেউ খাঁচাটা খুলে দিয়েছে এবং ইঁদুরের বাচ্চাগুলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটাছুটি করছে। রাফি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে একটা হলুদ রঙের ক্যাবকে থামাতে পারল। ক্যাবের ভেতর উঠে রাফি আর শারমিন মাত্র বসেছে, ঠিক তখন তার টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনে অপরিচিত একটা নম্বর।

রাফি টেলিফোনটা ধরে বলল, "হ্যালো।"

সে শুনল অপর পাশ থেকে ঈশিতা বলছে, "রাফি, আমি ঈশিতা।"

রাফি সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে, "ঈশিতা? তুমি? কোথায়?"

"আমি এনডেভারের ভেতর। আমাকে ধরে ফেলেছে।"

"ধরে ফেলেছে?"

"হ্যাঁ, আমি খুব বিপদের মাঝে আছি।"

"তুমি তা হলে টেলিফোনে কীভাবে কথা বলছ?"

ঈশিতা বলল, "একজন মানুষ ভুল করে তার ব্যাগটা আমার ঘরে ফেলে গেছে। ভেতরে এই টেলিফোনটা ছিল। মানুষটি কখন টের পেয়ে যাবে, জানি না। টের পেলেই ফোনটা নিয়ে নেবে। আমি তাড়াতাড়ি কয়েকটা কথা বলি।"

ঈশিতা তাড়াতাড়ি কথা বলতে থাকে, যদিও সে জানত না যে তার তাড়াতাড়ি কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ব্যাগটা মোটেও ভুল করে ফেলে যাওয়া হয় নি, ইচ্ছে করে রেখে যাওয়া হয়েছে। সস্তা টেলিফোনটা আসলে মোটেও সস্তা টেলিফোন নয়, এটি সরাসরি স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। ঈশিতা যখন রাফির সঙ্গে কথা বলছিল, তখন সেই কথা বলার সিগন্যালটা ট্র্যাক করে রাফিকে খুঁজে বের করা হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাফির ইয়েলো ক্যাবটাকে ট্র্যাক করা হল এবং তখন একাধিক স্যাটেলাইট থেকে সেটাকে চোখে চোখে রাখা শুরু হয়ে গেল। শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাখা এনডেভারের সিকিউরিটি গাড়িগুলোকে সেই খবর পৌঁছে দেওয়া হল এবং তারা রাফির ইয়েলো ক্যাবটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

ঈশিতার সঙ্গে কথা বলে রাফি যখন টেলিফোনটা রেখেছে, তখন আবার টেলিফোনটা বেজে উঠল, রাফি দেখল, সুহানা ফোন করেছে। সে ফোনটা কানে লাগিয়ে বলল, "হ্যালো, সুহানা।"

সুহানা অন্য পাশ থেকে রীতিমতো চিৎকার করে উঠল, "কী হল, রাফি? তুমি কোথায়? নয়টার সময় তোমার ক্লাস, এখন বাজে নয়টা পনের। তোমার ছাত্রছাত্রীরা পাগলের মতো তোমাকে খুঁজছে। বিশেষ করে তোমার ছাত্রীরা। তোমাকে পনের মিনিট দেখতে পায় নি, তাতেই তাদের হার্ট বিট মিস হতে শুরু করেছে।"

রাফি বলল, "সুহানা। শোনো। আমি অসম্ভব বড় একটা ঝামেলার মাঝে পড়েছি।"

সুহানা সাথে সাথে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, "কী হয়েছে, রাফি?"

"আমি এখন ঢাকায়। একটা ইয়েলো ক্যাবে থানাতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আছে শারমিন। থানাওয়ালারা আমার কথা শুনবে কি না, আমি বুঝতে পারছি না—"

রাফি তার কথা শেষ করার আগেই পেছন থেকে একটা বড় গাড়ি তার ক্যাবে ধাক্কা দিল, সাথে সাথে ঠিক সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে গেল। কিছু বোঝার আগেই পাশে আরো একটা গাড়ি থেমে যায়, সেখান থেকে কয়েকজন মানুষ নেমে এসে ক্যাবের দরজা খুলে রাফি আর শারমিনকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বের করে আনে। তারা কিছু বোঝার আগেই তাদের একটা ফোর হুইল ড্রাইভ জিপে তুলে নেওয়া হয় এবং সেটা টায়ারে কর্কশ শব্দ তুলে সামনে এগিয়ে যায়, ব্যস্ত রাস্তায় সেটা ইউ টার্ন নিয়ে উল্টোদিকে ছুটতে থাকে।

রাফি হতবাক হয়ে গাড়ির ভেতর তাকাল, পেছনের সিটে সাফারি কোট পরা দুজন মানুষ বসে আছে। একজনের হাতে একটা বেঢপ রিভলবার, সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তোমার ছাত্ররা আমার নিজের রিভলবারটা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। এরা কী রকম ছাত্র, আর্মস ছিনতাই করে?"

রাফি কোনো কথা না বলে মানুষটির চেহারা ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। মাঝবয়সী নিষ্ঠুর চেহারার মানুষ। মানুষটি হাতের রিভলবারটা শারমিনের মাথায় ছুঁইয়ে বলল, "চুল ছোট করে কাটলেই মেয়ে কি ছেলে হয়ে যায়?"

রাফি কোনো কথা না বলে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটি বলল, "এই মেয়েটার মগজ নাকি মিলিয়ন ডলারে কেজিতে বিক্রি হবে। ইচ্ছে করছে, গুলি করে খুলি ফুটো করে সেই মগজটা দেখি—মিলিয়ন ডলারের মগজ দেখতে কী রকম!"

খুব উঁচুদরের রসিকতা করেছে, সে রকম ভঙ্গি করে মানুষটি হা হা করে হাসতে থাকে। রসিকতাটা নিশ্চয়ই উঁচুদরের হয় নি, গাড়ির আর কেউ তার হাসির সঙ্গে যোগ দিল না। মানুষটি সে কারণে একটু মনঃক্ষুণ্ন হল বলে মনে হল। মুখটা শক্ত করে বলল, "শোনো, মাস্টার সাহেব আর তোমার ছাত্রী, এই গাড়ির ভেতরে তোমরা টুঁ শব্দ করবে না। গাড়ির কাচ কালো রঙের, বাইরের কেউ তোমাদের দেখবে না। গাড়ি সাউন্ডপ্রুফ, চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেললেও কেউ শুনতে পারবে না। তার পরও যদি বাড়াবাড়ি কর, আমি দুজনকে অজ্ঞান করে রাখব। অনেক আধুনিক উপায় আছে, আমি সেসবে যাব না, রিভলবারের বাঁট দিয়ে মাথার পেছনে শক্ত করে মারব—অনেক পুরোনো পদ্ধতি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস কাজ করে।"

রাফি বুঝতে পারল, মানুষটি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না। কাজেই সে চুপ করে বসে রইল। কিছুক্ষণ আগেই সে ঈশিতার জন্য দুশ্চিন্তা করছিল, এখন সে নিজে ঠিক ঈশিতার জায়গায় এসে পড়েছে। তার জন্য এখন কে দুশ্চিন্তা করবে? কেউ কি আছে দুশ্চিন্তা করার?

রাফির জন্য কেউই দুশ্চিন্তা করছিল না, সেটি অবশ্য সত্যি নয়। সুহানা যখন রাফির সাথে কথা বলছিল, তখন ঠিক কথার মাঝখানে সে শুনতে পেল একটা বিকট শব্দ এবং তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। হঠাৎ করে টেলিফোনটা নীরব হয়ে গেল—আর কিছু বুঝতে না পারলেও অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে, সেটা বুঝতে সুহানার অসুবিধা হল না।

সে রাফির ক্লাসে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দিল, তারপর সে অন্যদের খোঁজাখুঁজি করল। কাউকে না পেয়ে সে গেল নেটওয়ার্কিং ল্যাবে। রাফি আর শারমিনকে সেদিন এখানে একটা কম্পিউটারে বসে কিছু কাজ করতে দেখেছে—তারা কী কাজ করছিল, সেটা একটু বুঝতে চায়।

প্রফেসর হাসান এলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে, স্যার অনেক মানুষকে চেনেন, পুলিশকে হয়তো খবর দিতে পারবেন। তাদের কথাকে কেউ গুরুত্ব দেবে না, প্রফেসর হাসানকে নিশ্চয়ই গুরুত্ব দেবে।

১০

ঘরটিতে ঢুকে ঈশিতা হতভম্ব হয়ে গেল। গতকাল কালো টেবিলটার যে মাথায় সে বসেছিল, আজকে সেখানে বসে আছে রাফি ও শারমিন। শারমিনের চুল ছেলেদের মতো করে কাটা, কিন্তু সে জন্য তাকে চিনতে কোনো সমস্যা হল না। সে তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না—মাত্র কিছুক্ষণ আগে সে রাফির সঙ্গে কথা বলেছে। ঈশিতা কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "রাফি, তুমি?"

রাফি দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করল। বলল, "হ্যাঁ।"

"কেমন করে?"

রাফি কিছু বলার আগে সাফারি কোট পরা চুল ছোট করে ছাঁটা মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "তুমি যখন তার সঙ্গে পিরিতের কথা বলছিলে, তখন তাকে ট্র্যাক করেছি। এ জন্য যখন-তখন পিরিতের কথা বলতে হয় না।" মানুষটি হা হা করে আনন্দে হাসতে থাকে। তার কথা বলার অশালীন ভঙ্গিটি পুরোপুরি উপেক্ষা করে ঈশিতা রাফির কাছে গিয়ে বলল, "তোমাকেও ধরে এনেছে? কী সর্বনাশ!"

রাফি জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "হ্যাঁ, খুব ঝামেলার মাঝে পড়ে গেলাম মনে হচ্ছে।"

টেবিলের অন্য পাশে বব লাস্কি বসেছিল, সে ইংরেজিতে বলল, "বসো। কোনো রকম পাগলামি করার চেষ্টা কোরো না। তার কারণ, তোমাদের পেছনে যে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তারা আর্মড। কিন্তু তাদের আর্মড থাকার প্রয়োজন নেই, তারা খালি হাতেই দু-চারটা মানুষ খুন করতে পারে।"

রাফি পেছনে তাকাল, নিঃশব্দে তার পেছনে একজন সাদা এবং একজন কুচকুচে কালো মানুষ কখন এসে দাঁড়িয়েছে, সে লক্ষ করে নি। শারমিন রাফির হাত ধরে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "এই মানুষটা কী বলছে?"

রাফি বলল, "আমাদের চুপ করে বসে থাকতে বলেছে।"

"মানুষটা এখন আমাদের কী করবে?"

"আমি জানি না। দেখি, কী করে।"

বব লাস্কি বলল, "তোমাদের সঙ্গে যে বাচ্চাটা বসে আছে, সে-ই কি অসাধারণ প্রতিভাধর বাচ্চা, যে আমাদের এনক্রিপটেড কোড ভেঙেছে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাফি কিংবা ঈশিতা কেউই কথার উত্তর দিল না। বব লাস্কি একটু কঠিন গলায় বলল, "আমার কথার উত্তর দাও।"

রাফি বলল, "তার আগে আমি কি তোমাকে এক–দুটি প্রশ্ন করতে পারি?"

"কী প্রশ্ন?"

"আমাদের এভাবে ধরে আনার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?"

বব লাস্কি শব্দ করে হেসে ওঠে, "তোমার ধারণা, আমার সে জন্য কারো কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে?"

রাফি কঠিন মুখে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের তোমরা কী জন্য ধরে এনেছ?"

বব লাস্কি বলল, "বোকার মতো কথা বোলো না। তোমরা খুব ভালো করে জানো, তোমাদের কী জন্য ধরে এনেছি। ধানাই–পানাই না করে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এসো।"

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "কাজের কথাটি কী?"

বব লাস্কি হাত তুলে শারমিনকে দেখিয়ে বলল, "এই মেয়েটাই কি সেই মেয়ে? শারমিন?"

চুল ছোট করে ছাঁটা সাফারি কোট পরা মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "হ্যাঁ, বস। এইটাই সেই মেয়ে। আমি জানি।"

বব লাস্কি বলল, "তুমি কেমন করে জানো?"

"আমি যখন তাকে ধরে আনছিলাম, ইউনিভার্সিটির কিছু বখা ছেলে ছিনিয়ে নিল।"

বব লাস্কি চোখ লাল করে বলল, "তোমার বলতে লজ্জা করে না যে ইউনিভার্সিটির কিছু বখা ছেলে তোমার হাত থেকে বাচ্চা একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নিল? তুমি এই ঘর থেকে বের হয়ে যাও। আর আমি না ডাকলে তুমি কখনো এই ঘরে ঢুকবে না।"

সাফারি কোট পরা চুল ছোট করে ছাঁটা মানুষটির মুখ অপমানে কালো হয়ে উঠল। ঈশিতা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আশা করছি, এই ধরনের অপমান সহ্য করার জন্য এরা তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেয়।"

AMARBOI.COM

মানুষটা কোনো উত্তর না দিয়ে গটগট করে বের হয়ে গেল। বব লাস্কি গজগজ করে বলল, "এই পোড়া দেশে বিশ্বাসযোগ্য কাজের মানুষের এত অভাব!"

রাফি বলল, "তোমার তো কাজের মানুষ দরকার নেই, তোমার দরকার ঘাঘু ক্রিমিনাল, নিজের দেশ থেকে নিয়ে এলে না কেন?"

বব লাস্কি রক্তচক্ষু করে রাফির দিকে তাকাল, কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। শারমিন রাফির হাত ধরে ফিসফিস করে জানতে চাইল, "এই মানুষটা এখন কী নিয়ে কথা বলছে?"

"তোমাকে নিয়ে। জানতে চাইছে, তুমি কি সেই মেয়েটা নাকি, যে সবকিছু করতে পারে।"

"কেন জানতে চাইছে?"

"এখনো বুঝতে পারছি না।"

বব লাস্কি তার সামনে রাখা ছোট খেলনার মতো কম্পিউটারটির কি–বোর্ডে চাপ দিয়ে সেখানে নিচু গলায় কিছু একটা বলল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের ভেতর বেশ কয়েকজন মানুষ এসে ঢুকল। ঈশিতা মানুষগুলোকে চিনতে পারে। গতকাল তাদের সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। শারমিন একটু অবাক হয়ে বিদেশি মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আগে

কখনো বিদেশি মানুষ দেখে নি। মানুষগুলো কালো টেবিলের দুই পাশে এসে বসে। বব লাস্কি তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা যে মেয়েটিকে খুঁজছিলে, এটি সেই মেয়ে।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "দেখে মনে হচ্ছে, একজন ছেলে।"

বব লাস্কি বলল, "কেউ যেন চিনতে না পারে, সে জন্য তাকে এভাবে সাজিয়েছে।"

"হাউ ইন্টারেস্টিং!"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "আমরা মেয়েটিকে একটু পরীক্ষা করতে চাই।"

"কর।"

মানুষটা শারমিনের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, "তুমি কি ইংরেজি জানো?"

রাফি শারমিনের হয়ে বলল, "না, জানে না।"

নীল চোখের মানুষটি তার ল্যাপটপের ক্যালকুলেটরে কিছু একটা হিসাব করে বলল, "তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর, বারো মিলিয়ন আট শ নয় হাজার দুই শ একচল্লিশের বর্গমূল কত?"

শারমিন জিজ্ঞেস করল, "স্যার, কী করতে বলেছে?"

"একটা সংখ্যা বলে তার বর্গমূল জানতে চাইছে।"

"সংখ্যাটা বুঝতে পেরেছি। বর্গমূল মানে কী?"

"কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে এটা পাবে।"

"তিন হাজার পাঁচ শ উনআশি।"

রাফি সংখ্যাটি বলল এবং সব বিদেশি মানুষ তখন তাদের জায়গায় নড়েচড়ে বসল। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি ল্যাপটপে কিছু একটা লিখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে শারমিনকে জিজ্ঞেস করল, "চৌত্রিশ হাজার সাত শ একানব্বইকে ছাপ্পান্ন হাজার নয় শ বত্রিশ দিয়ে গুণ করলে কত হয়?"

শারমিন বলল, "এক বিলিয়ন, নয় শ আশি মিলিয়ন সাত শ একুশ হাজার দুই শ বারো।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে বলল, "এটাই সেই মেয়ে। আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।"

বব লাস্কি জানতে চাইল, "এখন কী করতে চাও?"

"অনেক কিছু। প্রথমে ওর ব্রেনের থ্রি ডি একটা স্ক্যান করতে চাই। তারপর ইমেজিং। সবার শেষে ইমপ্ল্যান্ট বসিয়ে ইন্টারফেসিং।"

"গুড। শুরু করে দাও।"

মানুষগুলো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমরা তা হলে মেয়েটিকে নিয়ে যাই।"

"যাও।"

রাফি চমকে উঠে বলল, "কোথায় নিয়ে যাবে?"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "আমরা তোমাদের কথার উত্তর দিতে বাধ্য নই। আমাদের ঝামেলা কোরো না।"

রাফি শারমিনকে শক্ত করে ধরে রেখে বলল, "না। আমি শারমিনকে নিতে দেব না।"

"সরে যাও।"

রাফি হিংস্র স্বরে বলল, "তোমরা সরে যাও।"

মানুষটা একপাশে এসে শারমিনের হাত ধরে বলল, "ছেড়ে দাও।"

রাফি বুকে ধাক্কা দিয়ে মানুষটিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি ছেড়ে দাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাফির ধাক্কা খেয়ে মানুষটি পড়তে পড়তে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে অবাক হয়ে রাফির দিকে তাকাল, তারপর হিস হিস করে বলল, "তুমি অনুমানও করতে পারছ না, তুমি কোথায় আছ। তোমার একটা দ্রুত যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে পারতাম, এখন মনে হচ্ছে, তার প্রয়োজন নেই।"

বব লাস্কি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বাচ্চাদের মতো হাতাহাতি করার কোনো প্রয়োজন নেই। সরে দাঁড়াও। আমাদের ফাইভ ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্ট তোমাদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।" সে একটু ইঙ্গিত করতেই কুচকুচে কালো মানুষটি রাফির দিকে এগিয়ে আসে এবং কিছু বোঝার আগেই রাফি অনুভব করল, কেউ একজন তার ঘাড়ে আঘাত করেছে, মুহূর্তে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। ঈশিতা রাফিকে ধরার চেষ্টা করল, ভালো করে ধরতে পারল না। রাফি টেবিলের কোনায় ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে গেল। ঈশিতা চিলের মতো চিৎকার করে রাফিকে ধরল, মাথা কেটে রক্ত বের হচ্ছে। প্রথমে হাত দিয়ে, তারপর নিজের কাপড় দিয়ে রক্ত থামানোর চেষ্টা করল।

নীল চোখের মানুষটি খপ করে শারমিনের হাত ধরে তাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে নিতে থাকে। শারমিন ভয় পেয়ে চিৎকার করে বলল, "যাব না। আমি যাব না।" কেউ তার কথায় ভ্রূক্ষেপ করল না। শারমিন কোনোভাবে চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঈশিতার দিকে ছুটে আসে। ঈশিতা উঠে দাঁড়িয়ে শারমিনকে ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু দুই দিক থেকে তখন দুজন মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ের মতো কালো মানুষটি ঈশিতাকে ধরে বলল, "তুমি আর একটু নড়েছ কি তোমার অবস্থা হবে তোমার বন্ধুর মতন।"

ঈশিতা নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল, পারল না। যে মানুষটি তাকে ধরেছে, তার গায়ের জোর মোষের মতন, আঙুলগুলো লোহার মতো শক্ত। বেশ কয়েকজন মিলে শারমিনকে ধরেছে, সে চিৎকার করে কাঁদছে, সেই অবস্থায় তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। ঈশিতা শারমিনের দিকে তাকিয়ে ছটফট করতে থাকে। ক্রোধ, ভয়ংকর–ক্রোধ তার ভেতরে পাক খেতে থাকে। অসহায় ক্রোধের মতো যন্ত্রণা বুঝি আর কোথাও নেই। সে বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে হিংস্র গলায় চিৎকার করে বলল, "তোমাকে এর মূল্য দিতে হবে।"

বব লাস্কি সহৃদয় ভঙ্গিতে হেসে বলল, "তুমি ছোট একটা ভুল করেছ, মেয়ে। আমাকে মূল্য দিতে হবে না, আমাকেই মূল্য দেওয়া হবে। এটা দেখার জন্য তুমি থাকবে না, সেটাই হচ্ছে দুঃখ।"

রাফির মনে হল, অনেক দূর থেকে কেউ তাকে ডাকছে, "রাফি, এই রাফি"। ঘুমের মধ্যে তার মনে হল মানুষটিকে সে চেনে। কিন্তু কে, ঠিক বুঝতে পারছে না। মানুষটি আবার ডাকল, "এই রাফি, চোখ খুলে তাকাও—"

গলার স্বরটি একটি মেয়ের। রাফি চোখ খুলে তাকাল, ঠিক তার মুখের ওপর ঈশিতা ঝুঁকে আছে, তার চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ, রাফি?"

রাফি তখনো পরিষ্কার করে চিন্তা করতে পারছে না, আবছা আবছাভাবে তার সবকিছু মনে পড়তে থাকে এবং হঠাৎ করে তার সবকিছু মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে বসতে গিয়ে আবিষ্কার করল, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। সে মাথায় হাত দিতেই অনুভব করে, সেখানে চটচটে রক্ত। রাফি ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা কোথায়?"

"একটা ঘরে। কাল রাতে আমাকে এই ঘরে আটকে রেখেছিল।"

"শারমিন?"

"জানি না। সবাই মিলে ধরে নিয়ে গেছে।"

রাফি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার জন্য এই বাচ্চা মেয়েটার এত বড় সর্বনাশ হল।"

ঈশিতা বলল, "কেন, তোমার জন্য কেন?"

"আমি যদি বের না করতাম যে শারমিন একটা প্রডিজি, যদি তার ডিসলেক্সিয়ার একটা সমাধান বের করে না দিতাম, তা হলে তো সে এখনো বেঁচে থাকত। তা হলে কেউ তার মাথা কেটে ব্রেন বের করে নিতে পারত না।"

"সেটি তো তোমার দোষ নয়। এই পৃথিবীতে যে দানবেরা আছে, সেটা কি তোমার দোষ?"

রাফি কোনো কথা বলল না। ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কী করব?"

রাফি বলল, "আমাদের শেষ ভরসা মাজু বাঙালি।"

"মাজু বাঙালি কী করবে?"

"এই ঘরের ভেতর নিশ্চয়ই তিরিশটা টেলিভিশন ক্যামেরা আমাদের দিকে মুখ করে রেখে দেখছে, আমরা কী করি। আমরা কী বলি। কাজেই আমি এখন কিছু বলব না।"

"ঠিক আছে।"

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। রাফি হঠাৎ ছটফট করে উঠে বলল, "আমি আর পারছি না। কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব একটা ব্যাপার।"

ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "আমি জানি, এর চেয়ে বেশি কষ্ট আর কিছুতে না। কাল সারাটা রাত আমার এভাবে কেটেছে। কিন্তু করবে কী? এটুকুন একটা ঘরে তুমি কী করবে?"

রাফি বলল, "জানি না। কিন্তু দেখি।" সে উঠে দাঁড়াল, সাথে সাথে মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা করে ওঠে। সে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথার ধাক্কাটা সহ্য করে। ব্যথাটা একটু কমার পর সে ঘরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। একটা দরজা ছাড়া এখানে ঢোকার কিংবা বের হওয়ার অন্য কোনো পথ নেই। ছোট একটা বাথরুম, সেখানে একটা সিংক আর টয়লেট, আর কিছু নেই। রাফি ওপরে তাকাল, ঘরের ভেতরে আলোগুলো আসছে ফলস সিলিংয়ের ভেতর থেকে। লাইট বাল্ব দেখা যাচ্ছে না—শুধু নরম একটা আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। নিশ্ছিদ্র একটা ঘর, দরজা কিংবা দেয়াল না ভেঙে এখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই।

এ রকম সময় দরজায় শব্দ হল, খুট করে একটা শব্দ হল এবং খাবারের ট্রে হাতে একজন মানুষ এসে ঢুকল। সকালে যে মানুষটি এসেছিল, এটি সেই মানুষ নয়। অন্য একজন, অন্য মানুষটির মতোই এর ভাবলেশহীন মুখ। ঘরে যে দুজন মানুষ আছে, সেটি যেন সে লক্ষও করছে না। ট্রে দুটি মেঝেতে রেখে সে যন্ত্রের মতো পুরো ঘরটি একবার দেখে, বাথরুমে যায়, অকারণে ট্যাপ খুলে দেখে এবং টয়লেট ফ্ল্যাশ করে তারপর ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

রাফি খাবারগুলো দেখে বলল, "এগুলো খেতে হবে? আমাদের কি এখন খাওয়ার মুড আছে?"

"নেই। কিন্তু তুমি অবাক হয়ে যাবে যে তুমি তার পরও কী পরিমাণ খেতে পারবে। এ রকম অবস্থায় যখন শরীরের কিছু একটা হয়, তখন প্রচণ্ড খিদে পায়।"

রাফি অবাক হয়ে দেখল, সত্যি সত্যি তার খিদে পেয়েছে এবং গোগ্রাসে সে সবকিছু খেয়ে শেষ করে ফেলল। নিজেরটা শেষ করে সে ঈশিতার আপেলটা খেতে খেতে গলা

নামিয়ে শোনা যায় না, এভাবে ফিসফিস করে বলল, "একটু পর লোকটা খালি ট্রে নিতে আসবে না?"

"হ্যাঁ।"

"তখন দুজন মিলে লোকটাকে অ্যাটাক করলে কেমন হয়?"

ঈশিতা এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলল, "চমৎকার হয়। ওরা এমনিতেই আমাদের মেরে ফেলবে, ভালো মানুষ হয়ে লাভ নেই।"

"গুড।"

"কী দিয়ে অ্যাটাক করবে?"

"এই ট্রে দুটি মোটামুটি ভারী। একসঙ্গে নিয়ে মাথায় বাড়ি দিতে পারি।"

"চিনামাটির প্লেট, পিরিচ, থালা এগুলোও ভেঙে টুকরো টুকরো করে একটা ব্যাগে ভরে মাথায় বাড়ি দিতে পারি—"

"ব্যাগ?" রাফি বলল, "ব্যাগ কোথায় পাবে?"

"আমার এই ওড়নাটা দিয়ে বেঁধে নিতে পারি।"

"ভেরি গুড। তা হলে কাজ শুরু করে দিই।"

"হয়তো টেলিভিশনে আমাদের দেখছে।"

"বাথরুমে নিয়ে যাই, সেখানে নিশ্চয়ই ক্যামেরা নেই।"

রাফি বলল, "এত নিশ্চিত হয়ো না—কিন্তু কিছু করার নেই। চলো, কাজ শুরু করি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা প্রস্তুত হয়ে নিল। প্লেট, হাফ প্লেট, পিরিচ, কাপ, গ্লাস মিলে অনেক কিছু ছিল। সেগুলো ভেঙে ওড়নায় বেঁধে নেওয়ার পর সেটা যথেষ্ট ভারী একটা অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল, এটি দিয়ে ঠিকভাবে মারতে পারলে মানুষটিকে অচেতন করা কঠিন হওয়ার কথা নয়।

রাফি আর ঈশিতা এবার দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকে। দরজা খোলার পর তারা দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে আসবে, প্রথমে রাফি মারবে তার ঘাড়ে, তারপর ঈশিতা। ঘাড়ে ঠিক করে মারলে যে মানুষ অচেতন হয়ে যায়, সেটা রাফি আজ সকালেই দেখেছে। তারা ফিফথ ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্ট নয়, কিন্তু যখন কেউ একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তখন সে হয়তো ব্ল্যাক বেল্ট থেকেও ভয়ংকর হয়ে যেতে পারে।

রাফি ঈশিতার পিঠে হাত রেখে বলল, "ঈশিতা"।

"বলো।"

"কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে কী ঘটবে, একটু পর কী হবে, আমরা জানি না। আমি তোমাকে আবার কিছু বলার সুযোগ পাব কি না, সেটাও জানি না। তাই তোমাকে এখন একটা কথা বলি।"

"বলো।"

"তুমি খুব চমৎকার একটা মেয়ে।"

"থ্যাংকু।"

"আমি যদি তোমার মতো একটা মেয়ের কাছাকাছি বাকি জীবনটা কাটাতে পারতাম, তা হলে আর কিছু চাইতাম না।"

ঈশিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যদি আমরা দুজনেই এখন মরে যাই, তা হলে এক অর্থে তোমার কথাটা সত্যি হবে।"

রাফি হেসে ফেলল। বলল, "কিন্তু আমি সেই অর্থে এটা সত্যি করতে চাই না। আমি চাই সত্যিকার অর্থে—"

ঠিক তখন দরজায় খুট করে শব্দ হল, তারপর চাবি দিয়ে দরজা খুলে মানুষটি ভেতরে ঢুকল। সে কিছু বোঝার আগেই রাফি আর ঈশিতা তার ওপর চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষটি কিছু বোঝার আগেই কাটা কলাগাছের মতো মেঝেতে পড়ে যায়।

দরজাটা বন্ধ করে তারা মানুষটিকে দেখে, সত্যি সত্যি অচেতন হয়ে আছে। রাফি তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটা রিভলবার পেয়ে যায়। সে কখনো রিভলবার ব্যবহার করে নি—ট্রিগার টানলেই গুলি হয়, নাকি আগে অনেক কিছু করতে হয়, সে জানে না। গল্প-উপন্যাসে সেফটি ক্যাচের কথা পড়েছে। সেটি কী, কে জানে!

রাফি ঈশিতাকে বলল, "চলো, বের হই।"

"চলো। রিভলবারটা আছে তো?"

রাফি মাথা নাড়ল, "আছে। তুমি?"

"আমার হাতে ওড়না দিয়ে বানানো মুগুরটা থাকুক। জিনিসটা যথেষ্ট কার্যকর, সেটা তো পরীক্ষা করে দেখলাম।"

"হ্যাঁ, সেটা দেখেছি।" রাফি হাসার চেষ্টা করল কিন্তু হাসিটি খুব কাজে এল না।

দুজনে বের হয়ে আসে। বাইরে থেকে ঘরটিতে তালা মেরে তারা করিডর ধরে হাঁটতে থাকে। তাদের শ্বাপদের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সমস্ত শরীর ইস্পাতের মতো টান টান হয়ে আছে উত্তেজনায়।

AMARBOI.COM

১১

শারমিনকে একটা চেয়ারে উঁচু করে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তার হাত-পা-শরীর বেল্ট দিয়ে বাঁধা। মাথায় একটা হেলমেট পরানো আছে, সেখান থেকে অসংখ্য তার বের হয়ে এসেছে। ঘর বোঝাই যন্ত্রপাতি, সেখান থেকে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। শারমিনের সামনে একটা বড় মনিটর, সেখানে অসংখ্য নকশা এবং সংখ্যা খেলা করছে।

শারমিনকে সকাল থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। তার মস্তিষ্কের ত্রিমাত্রিক একটা ছবি নেওয়া হয়েছে—অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তার মস্তিষ্কের প্রায় প্রতিটি কোষ, প্রতিটি সিনান্সের তথ্য নেওয়া হয়েছে। সে যখন মস্তিষ্ক ব্যবহার করে, তখন সেখানে কী পরিমাণ অক্সিজেন যায়, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে কী পরিমাণ তাপমাত্রার জন্ম নেয়, এইমাত্র সেই পরীক্ষাটি শেষ করা হয়েছে। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "আমি যে রকম আশা করেছিলাম, ঠিক তা-ই। মেয়েটার মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক অক্সিজেন খরচ হয়। সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে এ রকম অক্সিজেন খরচ হলে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "দেখতেই পাচ্ছ, এটা সাধারণ মস্তিষ্ক নয়। এটা যে হওয়া সম্ভব, আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।"

কম কথা বলে মানুষটি ভারী গলায় বলল, "আমাদের প্রতি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের এক ধরনের করুণা আছে। তা না হলে আমরা কেমন করে এই মেয়েটিকে পেলাম। অন্য কেউও তো একে পেতে পারত!"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "এই মেয়েটির শরীরের প্রত্যেকটা কোষ আমরা ক্লোন করার জন্য মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করতে পারি।"

"হ্যাঁ। মেয়েটার মস্তিষ্কের টিস্যু বিক্রি করতে পারি প্রতি গ্রাম বিলিয়ন ডলারে!"

"আর আমরা স্ক্যান করে যেটা পেয়েছি, সেটা?"

"সেটা আমরা কাউকে দেব না।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "কাউকে না?"

"না।"

"এনডেভারকেও না?"

"এনডেভারকে দিতে হবে, আমরা কোথায় সেই চুক্তি করেছি? আমাদের চুক্তি সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে ইমপ্ল্যান্ট বসিয়ে ইন্টারফেস তৈরি করার—এ রকম একটি জিনিয়াসের মস্তিষ্কে এনালাইসিসের জন্য কোনো চুক্তি হয় নি। এনডেভার যদি চায়, তা হলে তাদের নূতন করে আমাদের সাথে চুক্তি করতে হবে।"

কম কথা বলে মানুষটি বলল, "তোমার কথা শুনলে বব লাস্কি খুব খুশি হবে মনে হয় না!"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল বলল, "তোমার বব লাস্কি এখন আমাদের কাছে একটা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নয়! তাকে খুশি রাখার দায়িত্ব আমার না।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "ঠিক আছে, তা হলে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মাথা চুলকে বলল, "আমাদের সমস্যা হচ্ছে, এই মেয়ের সঙ্গে কথা বলা। আমাদের কথা বোঝে না। যখন ভয় পাওয়ার কথা নয়, তখন ভয় পেয়ে বসে থাকে!"

"হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটির মাস্টার আর ওই সাংবাদিক মেয়েটাকে ধরে এনে এখানে বেঁধে রাখলে আমাদের কথাবার্তা অনুবাদ করতে পারত।"

মানুষগুলো তখনো জানে না, রাফি আর ঈশিতা ঠিক তখন চুপিচুপি তাদের কাছেই এসেছে।

AMARBOI.COM

পায়ের শব্দ শুনে রাফি আর ঈশিতা ঠিক তখন চুপিচুপি বাঁ দিকের একটা ছোট করিডরে ঢুকে গেল। করিডর ধরে একজন নার্স তার জুতার শব্দ তুলে হেঁটে চলে গেল। দুজন তখন আবার বের হয়ে সতর্কভাবে হাঁটে। ঠিক কোথায় শারমিন আছে, তারা জানে না। ঠিক কীভাবে তাকে খুঁজে বের করতে হবে, কিংবা খুঁজে বের করলেও ঠিক কীভাবে তাকে মুক্ত করবে, সেটাও তারা জানে না। তাদের হাতে এখন একটা সত্যিকারের অস্ত্র আছে, সেটা দিয়ে কাউকে জিম্মি করে কিছু একটা করা যায় কি না, সেটাই তাদের লক্ষ্য।

করিডর ধরে হেঁটে তারা কোনো কিছু খুঁজে পেল না এবং ঠিক তখন একজন বিদেশি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রাফির হাতে রিভলবার এবং দুজনের শরীরে রক্তের ছোপ, তাদের চেহারায় একটা বেপরোয়া ভাব, বিদেশি মেয়েটি হকচকিয়ে গেল। হয়তো আর্তচিৎকার করে উঠত, রাফি সেই সুযোগ দিল না, রিভলবারটা মাথায় ঠেকিয়ে বলল, "খবরদার, টুঁ শব্দ করবে না।"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বলল, "আমি কিছু জানি না। আমি কিছু করি নি।"

"আমি জানি, তুমি কিছু কর নি, কিন্তু তুমি কিছু জানো না, সে ব্যাপারে আমি এত নিশ্চিত নই। গণিতের সেই প্রডিজি মেয়েটা কোথায়?"

"গণিতের কোন মেয়েটা?"

"অসাধারণ প্রতিভাবান সেই মেয়েটা, যাকে তোমরা তুলে এনেছ। মস্তিষ্ক কেটেকুটে নেওয়ার চেষ্টা করছ।"

বিদেশি মেয়েটি কাঁপা গলায় বলল, "বিশ্বাস কর, আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না।"

"তুমি কি বব লাস্কিকে চেনো?"

"চিনি।"

"ঠিক আছে, আমাদের তা হলে বব লাস্কির কাছে নিয়ে যাও। খবরদার, কোনো রকম হ্যাংকি-প্যাংকি করবে না।"

"করব না। কোনো রকম হ্যাংকি-প্যাংকি করব না। বিশ্বাস কর।"

বিদেশি মেয়েটি কয়েক মিনিটে তাদের বব লাস্কির অফিসে নিয়ে গেল। রাফি লাথি দিয়ে অফিসের দরজাটি খুলে রিভলবার তুলে চিৎকার করে বলল, "হাত ওপরে তোলো, বব লাস্কি।"

বিশাল একটা টেবিলের সামনে বসে থাকা বব লাস্কি হতচকিত হয়ে তাদের দিকে তাকাল। তার চোখে অবিশ্বাস। রাফি চিৎকার করে বলল, "হাত তোলো আহাম্মক। না হলে এই মুহূর্তে আমি গুলি করব।"

বব লাস্কি আহাম্মক নয়, তাই সে এবার হাত ওপরে তুলল। রাফির কণ্ঠস্বরের তীব্রতা সে টের পেয়েছে।

"দুই হাত ওপরে তুলে বের হয়ে এসো।"

বব লাস্কি দুই হাত ওপরে তুলে বের হয়ে এল। রাফির কাছাকাছি এসে বলল, "ইয়াং ম্যান। আমরা নিশ্চয়ই কোনো এক ধরনের সমঝোতায় আসতে পারি।"

কথার মাঝখানে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে রাফি তাকে থামিয়ে দেয়, "খবরদার, কথা বলবে না। খুন করে ফেলব আমি। শারমিনের কাছে নিয়ে যাও আমাদের। দশ সেকেন্ড সময় দিলাম আমি।"

বব লাস্কি বলল, "ঠিক আছে, নিয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু দশ সেকেন্ডে তো সম্ভব নয়—"

রাফি হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আমি কোনো কিছু পরোয়া করি না। দরকার হলে তুমি দৌড়াও। দৌড়াও! ডবল মার্চ!"

বব লাস্কি আর কথা বলার সাহস করল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে। সে এখনো বুঝতে পারছে না, দাবার চালটি কেমন করে উল্টে গেল।

করিডর ধরে সোজা হেঁটে গিয়ে বব লাস্কি ডান দিকে ঢুকে গেল, সেখান দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁ দিকে একটা আলোকোজ্জ্বল ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "এইটা সেই ঘর।"

"শারমিন এখানে?"

"হ্যাঁ।"

"দরজা খোলো।"

বব লাস্কি ইতস্তত করতে থাকে। রাফি হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আমি বলছি, দরজা খোলো।"

বব লাস্কি দরজায় গোপন সংখ্যা প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গে খুট করে দরজা খুলে যায়। রাফি লাথি দিয়ে দরজা খুলে বব লাস্কিকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।

ঘরের ভেতর চারজন মানুষ মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেল। ঘরের এক কোনায় একটা চেয়ার, সেখানে নানা রকম স্ট্র্যাপ দিয়ে শারমিনকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার মাথায় একটা হেলমেট, সেখান থেকে অসংখ্য তার বের হয়ে আসছে। ঈশিতা ও

রাফিকে দেখে শারমিন ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, “ঈশিতা আপু! আমাকে এরা মেরে ফেলবে!”

ঈশিতা বলল, “না শারমিন, তোমাকে কেউ মারতে পারবে না। আমরা তোমাকে ছুটিয়ে নিতে এসেছি।” ঈশিতা শারমিনের কাছে গিয়ে তার বাঁধনগুলো খুলতে থাকে।

রাফি বব লাস্কিকে ধাক্কা দিয়ে অন্য মানুষগুলোর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, “খবরদার, কেউ নড়বে না।”

নীল চোখের মানুষটি বলল, “যদি নড়ি, তা হলে কী করবে?”

“গুলি করে দেব।”

নীল মানুষটি শব্দ করে হেসে বলল, “তুমি আগে কখনো কাউকে গুলি করেছ?”

রাফি হিংস্র গলায় বলল, “আমি এখন তোমার সঙ্গে সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই না।”

নীল চোখের মানুষটি হেসে বলল, “অবশ্যই তুমি সেটা নিয়ে কথা বলতে চাইবে না। কারণ, সেটা নিয়ে কথা বললে দেখা যাবে, তুমি মানুষ তো দূরে থাকুক, তুমি হয়তো কখনো একটা মশাও মার নি! রক্ত দেখলেই হয়তো তোমার নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে যায়! কাজেই তুমি হয়তো কোনো না কোনোভাবে একটা রিভলবার জোগাড় করে ফেলেছ, কিন্তু সেখানে ট্রিগার টানাটা তোমার জন্য এত সোজা নয়।”

রাফি বুঝতে পারে, এ মানুষটি যা বলছে, তার প্রতিটি কথা সত্যি। সে রিভলবার দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে সত্যি, কিন্তু যখন প্রয়োজন হবে, তখন সে গুলি করতে পারবে না। কিন্তু এটি তো কখনোই তাদের বুঝতে দেওয়া যাবে না। বব লাস্কিকে যে রকম ভয় দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে, এদেরও ঠিক সেভাবে ভয় দেখাতে হবে। রাফি তাই চিৎকার করে হিংস্র মুখে বলল, “খবরদার! একটা বাজে কথা বলবে না। যে যেখানে আছ, সে সেখানেই হাত তুলে দাঁড়াও।”

নীল চোখের মানুষটি বলল, “আমি হাত তুলছি না। দেখি, তুমি আমাকে গুলি করতে পার কি না।”

রাফি আবার চিৎকার করে বলল, “তোলো হাত। না হলে গুলি করে দেব।”

“কর গুলি।” বলে নীল চোখের মানুষটি এক পা এগিয়ে এসে বলল, “কর।”

রাফি বুঝতে পারল, সে হেরে যাচ্ছে, মানুষটি তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে এবং সে কিছুতেই তাকে গুলি করতে পারবে না।

কিন্তু কিছুতেই সে হেরে যেতে পারবে না। কিছুতেই না। সে হিংস্র গলায় বলল, “খবরদার! আর কাছে আসবে না।”

নীল চোখের মানুষটি মধুরভাবে হাসল। বলল, “এই যে আরো কাছে এসেছি। কী করবে তুমি? গুলি করবে? কর।”

রাফি ভাঙা গলায় আবার চিৎকার করতে যাচ্ছিল, তখন নীল চোখের মানুষটি শব্দ করে হেসে ফেলল। বলল, “শোনো ছেলে, আমি তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি, তুমি আসলে জীবনে হাতে কখনো কোনো রিভলবার ধর নি। তুমি যেভাবে রিভলবারটা ধরেছ, এভাবে ধরে গুলি করলে গুলি টার্গেটে লাগবে না, ওপর দিয়ে চলে যাবে। দুই হাতে ধরতে হয়, আরেকটু নিচু করে ধরতে হয়। তা ছাড়া রিভলবারে সেফটি ক্যাচ বলে একটা জিনিস থাকে, সেটা ঠিক করে না নিলে গুলি বের হয় না। তুমি ট্রিগার টেনে দেখো, কোনো গুলি বের হবে না।”

রাফি ট্রিগার টেনে দেখার চেষ্টা করল না। অবাক হয়ে নীল চোখের মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। নীল চোখের মানুষটি এতক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, সেই চোখে ছিল এক ধরনের উত্তেজনা। হঠাৎ করে সেই চোখ দুটির উত্তেজনাও নিভে যায়, তাকে কেমন জানি বিষণ্ন দেখায়। মানুষটি ক্লান্ত গলায় বলল, "এই ছেলে, তুমি আসলে খুব বড় নির্বোধ। তুমি যখন এই ঘরে ঢুকেছ, ঠিক তখন আমি অ্যালার্মে চাপ দিয়েছি। সিকিউরিটির লোকজন আসছে, যতক্ষণ এসে হাজির না হচ্ছে, আমি ততক্ষণ তোমাকে একটু ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলাম, আর বেশি কিছু নয়। ওরা এসে গেছে।"

মানুষটার কথা শেষ হওয়ার আগেই সশব্দে দরজাটা খুলে যায় এবং হুড়মুড় করে ভেতরে কয়েকজন মানুষ ঢোকে। তাদের সবার হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। কিছু বোঝার আগেই তারা রাফিকে জাপটে ধরে ফেলল এবং তাকে নিচে ফেলে দিয়ে তার হাতটা উল্টো দিকে ভাঁজ করে চেপে ধরে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় রাফি চিৎকার করে ওঠে। রাফি শুনতে পেল, বব লাস্কি চিৎকার করে বলল, "মেরে ফেলো! মেরে ফেলো এই দুই আহাম্মককে।"

রাফি তার কানের নিচে শীতল একটা ধাতব স্পর্শ অনুভব করল। সাথে সাথে সে একজন অনুভূতিহীন মানুষে পরিণত হয়ে যায়। তার ভেতর ভয়ভীতি, দুঃখ-বেদনা কোনো অনুভূতিই নেই। সে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

ঠিক তখন দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "এক সেকেন্ড। মারতেই যদি হয়, ল্যাবের ভেতরে নয়, বাইরে। খুনোখুনি দেখে প্রডিজি মেয়েটার উল্টো প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আমাদের এক্সপেরিমেন্টের সমস্যা হবে।"

রাফি অনুভব করল, ধাতব শীতল নলটি তার কানের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে। কেউ একজন তাকে টেনে সোজা করে। রাফি বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা বের করে ঘরের ভেতর তাকাল। দুজন মানুষ ঈশিতাকে দুই পাশ থেকে ধরে রেখেছে। কাছেই একটা চেয়ারে শারমিন স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা, সে হতচকিত হয়ে তাকিয়ে আছে, তার চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি ঝরছে।

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "এ দুজনকে কয়েক মিনিট এখানে রাখো। এরা আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা দেখে যাক।"

বব লাস্কি বলল, "এদের দেখিয়ে কী লাভ?"

"কোনো লাভ নেই। সবকিছুই মানুষ লাভের জন্য করে, কে বলেছে? তারা যে বাচ্চাটিকে বাঁচানোর জন্য এত ঝামেলা করছে, আমরা সেই বাচ্চাকে দিয়ে কী করতে পারি, তার একটা ধারণা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে ফেরত যাক।"

বব লাস্কি বলল, "তোমার পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কাজ করত। মানুষকে অত্যাচার করে তুমি অন্যরকম আনন্দ পাও।" দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি আনন্দে হা হা করে হেসে বলল, "এই যে মাস্টার সাহেব ও সাংবাদিক সাহেব, আমাদের এই যন্ত্রটার নাম ট্রান্সকিনিওয়াল ইন্টারফেস। এটা মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে হাই ফ্রিকোয়েন্সির ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিতে পারে। দেখা গেছে, এটা দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমরা আমাদের সব টেস্ট করেছি, এখন এই টেস্ট করা বাকি। আমরা এখন এই বাচ্চাটির মাথার নির্দিষ্ট স্থানে খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সির ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেব। আমরা তার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব এবং সবচেয়ে বড় কথা, তার গাণিতিক ক্ষমতাটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।"

রাফি আর ঈশিতা কোনো কথা বলল না। শারমিন কাঁদতে কাঁদতে বলল, "স্যার, ঈশিতা আপু। কী বলছে এ মানুষগুলো?"

রাফি কী বলবে বুঝতে পারল না। মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে পারে, কিন্তু দিয়ে কী লাভ?

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "অক্সিজেন সাপ্লাই ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ, আছে।"

"অক্সিজেন-নাইট্রোজেনের অনুপাত?"

"চব্বিশ আর ছিয়াত্তর।" মানুষটি হঠাৎ থেমে বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"খুবই বিচিত্র। আমরা মিথেনের একটা লাইন দেখছি।"

"কীসের লাইন?"

"মিথেনের। খুবই কম। কিন্তু নিশ্চিত, মিথেনের লাইন।"

"কী বলছ তুমি? আমাদের এই স্পেকট্রামে মিথেনের লাইন থাকার অর্থ কী, তুমি জানো?"

"জানি। এর অর্থ পুরো বিল্ডিং মিথেন দিয়ে বোঝাই, সেখান থেকে লিক করে এখানে ট্রেস অ্যামাউন্ট দেখা যাচ্ছে।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "হ্যাঁ। এটা সম্ভব নয়। এখানে মিথেন আসার কোনো উপায় নেই। নিশ্চয়ই মাস স্পেকট্রোমিটারটা ঠিক করে কাজ করছে না।"

"নিশ্চয়ই তা-ই।" সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়ে। শুধু রাফি বুঝতে পারল, কী ঘটেছে। মাজু বাঙালি এসে যন্ত্রপাতির ঘরগুলোয় অক্সিজেন-মিথেন দিয়ে বোঝাই করেছে। এখন দরকার শুধু একটা স্পার্ক। তা হলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে এনডেভারের একটা অংশ উড়ে যাবে। উত্তেজনায় রাফির বুক ধক ধক করে শব্দ করতে থাকে।

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি কয়েকটা যন্ত্রের সুইচ অন করে দিয়ে বলল, "আমরা শুরু করছি।"

"কোনটা দিয়ে শুরু করবে?"

"সোজা কিছু দিয়ে শুরু করি। ঘুম।"

"ঠিক আছে।" মানুষটি একটা নব ঘুরিয়ে বলল, "নাইনটি থ্রি গিগা।"

"চমৎকার।"

"এমপ্লিচুড অপটিমাল।"

"চমৎকার।"

"মেয়েটা এখন শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে।"

সবাই শারমিনের দিকে তাকাল। শারমিন চোখ বড় বড় করে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে মোটেই ঘুমিয়ে পড়ে নি।

শারমিন মানুষগুলোর কথা বুঝতে পারছিল না, কিন্তু এক-দুটি শব্দ থেকে অনুমান করছিল, তাকে দিয়ে কোনো একটা পরীক্ষা করাবে। নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোনো পরীক্ষা। পরীক্ষাটি কী, সে বুঝতে পারছিল না, কিন্তু সে প্রস্তুত হয়ে রইল। হঠাৎ করে তার চোখে ঘুম নেমে আসতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শারমিন বুঝে যায়, পরীক্ষাটি কী। যন্ত্র দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু শারমিন ঘুমাবে না, সে কিছুতেই ঘুমাবে না। শারমিন জোর করে নিজেকে জাগিয়ে রাখল। হঠাৎ ঢেউয়ের মতো করে ঘুম এসে তাকে ভাসিয়ে নিতে চায়, কিন্তু শারমিন তাকে কিছুতেই ভাসিয়ে নিতে দিল না। দাঁতে দাঁত চেপে জেগে রইল। বিড়বিড় করে নিজেকে বলল, "ঘুমাব না। আমি ঘুমাব না। কিছুতেই ঘুমাব না।"

শারমিন জোর করে চোখ বড় বড় করে জেগে রইল আর সেটি দেখে নীল চোখের মানুষটি চিন্তিত মুখে বলল, "দেখেছ? মেয়েটা ঘুমাচ্ছে না।"

AMARBOI.COM

"হ্যাঁ, আগে কখনো দেখি নি। আমি থ্রি ডিবি বেশি পাওয়ার দিচ্ছি, তার পরও ঘুম পাড়ানো যাচ্ছে না।"

"আরো থ্রি ডিবি বাড়াও।"

একজন নব ঘুরিয়ে শারমিনের মাথায় আরো বেশি পাওয়ার দিতে শুরু করল। শারমিনের চোখ ভেঙে ঘুম আসতে চাইছিল, কিন্তু সে তবু জোর করে জেগে রইল।

দাড়ি–গোঁফের জঙ্গল মানুষটি তার দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আমরা ইচ্ছে করলে আরো পাওয়ার বাড়াতে পারি, কিন্তু আমি সেটা করতে চাচ্ছি না।"

"কেন? মেয়েটার ক্ষতি হবে?"

"না, সে জন্য নয়। আমাদের কয়েলটা একটা সিগন্যাল পাঠাচ্ছে, তার মস্তিষ্কের সেটা গ্রহণ করার কথা। মনে হচ্ছে, তার মস্তিষ্ক সেটা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিচ্ছে—"

"কী বলছ পাগলের মতো?"

"আমি পাগলের মতো মোটেই বলছি না। তাকিয়ে দেখো। হেলমেটের ভেতর যে কয়েল আছে, সেটা এই মেয়েটার মস্তিষ্ক থেকে এই সিগন্যালটা পিক করছে। পজিটিভ ফিডব্যাকের মতো—এটা বেড়ে আমাদের সোর্সে যাচ্ছে। তাপমাত্রা কত বেড়েছে, দেখেছ?"

"ও মাই গড!" যে মানুষটি কম কথা বলে, সে এবার কথা বলল, "আমি এটা বিশ্বাস করি না!"

"সেটা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু আসল সত্যটি হচ্ছে, আমরা মেয়েটার মস্তিষ্ককে বশ করতে পারছি না। উল্টো মেয়েটা আমাদের জেনারেটরকে ওভার লোড করে দিচ্ছে।"

চারজন মানুষ কিছুক্ষণ তাদের যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে রইল এবং মাথা চুলকাল, তখন একজন বলল, "সার্ভারে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ট্রান্সকিনিওয়াল জেনারেটরটা বন্ধ কর।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "আরো একবার চেষ্টা করে দেখি।"

"কী চেষ্টা করবে?"

"এক শ চুয়াল্লিশ গিগা হার্টজ!"

দাড়ি–গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "আতঙ্ক?"

"হ্যাঁ, আতঙ্ক। ভয়াবহ আতঙ্ক।"

"মেয়েটার ক্ষতি হবে না তো? মনে নেই, একজন কখনো রিকভার করতে পারল না। পাকাপাকিভাবে স্কিতজোফ্রেনিয়া হয়ে গেল?"

নীল চোখের মানুষটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "দেখা যাক।"

মানুষগুলো যন্ত্রের নব ঘুরিয়ে সিগন্যাল পাওয়ার কমিয়ে আনতেই শারমিন হঠাৎ করে যেন জেগে ওঠে। তার ভেতরে যে প্রচণ্ড ঘুমের চাপ ছিল হঠাৎ করে সেটা পুরোপুরি দূর হয়ে গেল। শারমিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, মানুষগুলো একটু উত্তেজিত হয়ে আবার যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড়িয়েছে। সে বুঝতে পারে, তারা এখন আবার কিছু একটা করবে। কী করবে, কে জানে!

হঠাৎ করে শারমিনের কেমন যেন ভয় করতে থাকে। সে বুঝতে পারে না, কেন তার ভয় করছে। শারমিন মাথা ঘুরিয়ে এদিক–সেদিক তাকাল, কী নিয়ে তার ভয়, সেটা সে বোঝার চেষ্টা করল।

মানুষগুলো নব ঘুরিয়ে সিগন্যালটা বাড়িয়ে দিতেই শারমিনের ভয়টুকু ভয়াবহ আতঙ্কে রূপ নেয়, সে চোখ বন্ধ করে একটা আর্তচিৎকার করে ওঠে।

দাড়ি–গোঁফের জঙ্গল মানুষটি নিজের গাল চুলকে সন্তুষ্টির ভান করে মাথা নেড়ে বলল, "এইটা ঠিক ঠিক কাজ করছে। দেখেছ?"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "আগেই এত নিশ্চিত হয়ো না। সিগন্যাল পাওয়ার আরো কয়েক ডিবি বাড়াও। হৃৎস্পন্দন দ্বিগুণ হতে হবে, সারা শরীর ঘামতে হবে, চিৎকার করে গলায় রক্ত তুলে দেবে, তখন আমি নিশ্চিত হব।"

কম কথার মানুষটি নবটা ঘুরিয়ে সিগন্যাল আরো বাড়িয়ে দিল। শারমিন সাথে সাথে থরথর করে কেঁপে ওঠে, আতঙ্কে ভয়াবহ একটা চিৎকার করতে গিয়ে সে থেমে গেল। সে বিড়বিড় করে নিজেকে বোঝাল, "মিথ্যা! মিথ্যা! সব মিথ্যা। ওরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, আসলে ভয়ের কিছু নেই। আমি ভয় পাব না, কিছুতেই ভয় পাব না। কিছুতেই না। কিছুতেই না!"

শারমিন প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত করে, পুরো ভয়টুকু জোর করে নিজের মাথা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। সে চোখ বন্ধ করে অন্য কিছু চিন্তা করার চেষ্টা করে, বিড়বিড় করে বলে, "আমি ভয় পাব না। কিছুতেই ভয় পাব না। এই মানুষগুলো আমাকে যন্ত্র দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, কিন্তু আসলে ভয়ের কিছু নেই। আমি সুন্দর জিনিস চিন্তা করব, যেন ভয় না করে। আমি আমার মায়ের কথা চিন্তা করব। ছোট ভাইটার কথা চিন্তা করব, সে কেমন ফোকলা দাঁতে হাসে, সেই কথাটা চিন্তা করব।" শারমিন তার চোখের সামনে তার সব প্রিয় দৃশ্যগুলো নিয়ে আসে, নীল আকাশে সাদা মেঘ, একটা গাছের ডালে হলুদ রঙের একটা পাখি, বাগানে ফুলের গাছে রঙিন ফুল। পানির ওপর একটা গাছের ডাল, সেখানে একটা রঙিন মাছরাঙা পাখি।

যন্ত্রপাতির প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষগুলো মাথা চুলকাল। নীল চোখের মানুষটি বলল, "একই ব্যাপার হচ্ছে। পুরো সিগন্যালটা রিফ্লেক্ট করতে শুরু করেছে।"

"শুধু তা–ই নয়, আমাদের কয়েকটা নূতন সিগন্যাল পিক করছে। কোনো আইসলেটর নেই, তাই সরাসরি সিস্টেমে ঢুকে যাচ্ছে। পজিটিভ ফিডব্যাকের মতো। জেনারেটরের ক্ষতি হতে পারে!"

নীল চোখের মানুষটির কেমন যেন রোখ চেপে গেল, দাঁতে দাঁত ঘষে হিংস্র মুখে বলল, "বাড়াও! সিগন্যাল আরো বাড়াও।"

শারমিনের ভেতর আবার ভয়াবহ আতঙ্ক উঁকি দিতে চায়। শারমিন জোর করে সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। মনে মনে নিজেকে বলে, "আমি কিছুতেই ভয় পাব না। কিছুতেই না! আমার কাছে যেটা করতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, আমি সেটাই করব! রাফি স্যার আমাকে প্রাইম সংখ্যা শিখিয়েছে। আমি শেষবার যেই প্রাইম সংখ্যা বের করেছিলাম, সেটা ছিল দুই শ একাত্তর অঙ্কের। আমি এখন পরেরটা বের করব। আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে দেব এখানে, তা হলে কোনো কিছু আমার মাথায় ঢুকতে পারবে না। কেউ আমার মনোযোগ নষ্ট করতে পারবে না। কেউ না!"

শারমিন তার মাথায় একটার পর একটা সংখ্যা সাজাতে থাকে। ধীরে ধীরে তার চারদিকে যেন সংখ্যার একটা দেয়াল উঠতে থাকে। সেই দেয়াল ভেদ করে কোনো কিছু শারমিনের কাছে পৌঁছাতে পারে না। শারমিন চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দেয়। তার মুখে প্রশান্তির একটা হাসি ফুটে ওঠে।

নীল চোখের মানুষটি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শারমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না, যে সিগন্যালে একজন মানুষের ভয়াবহ অমানুষিক

AMARBOI.COM

আতঙ্কে চিরদিনের জন্য উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কথা, সেই সিগন্যালে এই মেয়েটি পরম প্রশান্তিতে শুয়ে আছে—তার মুখে বিচিত্র একটা হাসি। মানুষটির কেমন যেন রোখ চেপে যায়, সে নবটিকে স্পর্শ করল।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যরা বলল, "আর বাড়িও না। আমাদের যন্ত্র আর সহ্য করতে পারবে না।"

"না পারলে, নাই।" নীল চোখের মানুষটি হিংস্র মুখে বলল, "আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।"

সে নবটি পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেয়। শারমিন সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে বলল, "না! না! না!"

ঠিক তখন পুরো ঘরে একটা বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পুরো এনডেভার কেঁপে ওঠে। ঘরটি সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে যায়, যন্ত্রপাতি ভেঙেচুরে ছিটকে পড়তে থাকে। প্রথম বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটা বিস্ফোরণ হল, সেটি হল আগের চেয়েও জোরে। পুরো এনডেভারের ভবন থরথর করে কেঁপে ওঠে— রাফি টের পেল যে মানুষটি তাকে ধরে রেখেছিল, সে ছিটকে পড়েছে। তাকে ছেড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছে।

রাফি দেয়াল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, ঠিক তখন আরো ভয়ংকর দুটো বিস্ফোরণ হল। কোথায় জানি আগুন লেগেছে, আগুনের শিখায় ঘরের ভেতর আবছা দেখা যাচ্ছে।

রাফি দেখল, ঘরের কোনায় চেয়ারে বসে আছে শারমিন, ঈশিতা তাকে জড়িয়ে ধরেছে। রাফি টলতে টলতে সেদিকে এগিয়ে যায়। দুজনকে ধরে বলল, "ভয় পেয়ো না তোমরা, ভয় পেয়ো না।"

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "কিসের বিস্ফোরণ?"

"মাজু বাঙালি। সে রেডি করে দিয়েছে, শারমিন শুরু করে দিয়েছে—"

রাফি কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই পরপর আরো দুটো বিস্ফোরণ হল, তার প্রচণ্ড ধাক্কায় সে ছিটকে পড়ল। চারদিকে আগুন লেগেছে। অনেক মানুষ ছোটাছুটি করছে, তাদের আতঙ্কিত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। অনেক দূর থেকে সাইরেনের শব্দ ভেসে আসতে থাকে।

রাফি উঠে বসার চেষ্টা করল, চারপাশে গাঢ় অন্ধকার। তার মাঝে দেখতে পেল দূর থেকে দুলতে দুলতে অনেক দূর থেকে অনেকগুলো টর্চলাইটের আলো ছুটে আসছে। তার মানে, অনেক মানুষ ছুটে আসছে। কে মানুষগুলো?

টর্চলাইটের আলো ঘরের সামনে এসে থেমে যায়। হঠাৎ করে সে শুনতে পেল, কেউ একজন ডাকছে, "ঈশিতা! রাফি! শারমিন! তোমরা কোথায়?"

রাফি গলার স্বর চিনতে পারে। মাজু বাঙালি। আর তাদের ভয় নেই।

মাজু বাঙালি আবার ডাকল, "রাফি! ঈশিতা!"

রাফি ভাঙা গলায় বলল, "আমরা এখানে।"

রাফি দেখতে পায়, অনেকগুলো টর্চলাইটের আলো তাদের দিকে ছুটে আসছে। পেছনের মানুষগুলোকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু রাফি জানে, না দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই। এরা সবাই তার আপনজন। এরা তাদের বাঁচাতে ছুটে আসছে।

AMARBOI.COM

১২

শারমিন এনডেভারের হাসপাতালের সবুজ রঙের একটা গাউন পরে শীতে তিরতির করে কাঁপছিল, সে দুটি হাত তার বুকের কাছে ধরে রেখেছে। চারপাশে অসংখ্য মানুষের ভিড়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কম বয়সী তরুণ-তরুণী। সুহানা নেটওয়ার্কিং ল্যাবের কম্পিউটারের লগ দেখে পুরো ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেসবুকে, টুইটারে খবরটা ছড়িয়ে দিয়েছিল। এনডেভারের ভেতর ঈশিতা, রাফি আর শারমিনকে আটকে রাখা হয়েছে, আর শারমিন হচ্ছে সম্ভাব্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ—এ তথ্যটি জানাজানি হওয়ার পর হাজার হাজার কম বয়সী ছেলেমেয়ে এনডেভারের সামনে ভিড় করেছে। পুলিশ সেই ভিড়ের কাছ থেকে রক্ষা করে ঈশিতা, রাফি আর শারমিনকে একটা অ্যাম্বুলেন্সের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝখানে অনেকগুলো টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান তাদের থামাল। একজন জিজ্ঞেস করল, "এই মেয়েটিই কি সেই প্রতিভাবান মেয়ে শারমিন?"

রাফি উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"এটি কি সত্যি, সে মুখে মুখে যে কোনো সংখ্যার সঙ্গে যে কোনো সংখ্যা গুণ করতে পারে?"

রাফি বলল, "হ্যাঁ। এটা সত্যি।"

"আমরা কি তার একটা প্রমাণ দেখতে পারি।"

ঈশিতা বলল, "মেয়েটি অত্যন্ত টায়ার্ড। তার ওপর দিয়ে কী গিয়েছে আপনারা সেটা কল্পনাও করতে পারবেন না। তাকে হাসপাতালে নিতে দিন। প্লিজ!"

একজন সাংবাদিক বলল, "অবশ্যই দেব। শুধু ছোট একটা ডেমনস্ট্রেশান, আমাদের দর্শকদের জন্য।"

রাফি জিজ্ঞেস করল, "কী দেখতে চান?"

"দুটি সংখ্যা গুণ করে দেখাতে বলেন।"

"আপনারা বলেন দুটি সংখ্যা।"

একজন সাংবাদিক বলল, "উনিশ শ বাহান্নর সঙ্গে উনিশ শ একাত্তর গুণ করলে কত হয়?"

শারমিনকে কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়। সে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "আটচল্লিশ লাখ—আটচল্লিশ লাখ সাঁইত্রিশ হাজার—পাঁচ শ বারো।"

রাফি অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কখনোই শারমিনকে কোনো সংখ্যাকে গুণ করতে গিয়ে ইতস্তত করতে দেখে নি। সাংবাদিকদের একজন তার মোবাইল টেলিফোনের ক্যালকুলেটর বের করে গুণ করে মাথা নেড়ে বলল, "হয় নি!"

রাফি হতবাক হয়ে যায়। "হয় নি?"

"না।"

"কী আশ্চর্য। শারমিন এর চেয়ে অনেক বড় সংখ্যা গুণ করতে পারে।"

"আরেকবার চেষ্টা করে দেখুক।"

"ঠিক আছে।"

ওই সাংবাদিক বলল, "দশমিকের পর পাইয়ের একশতম সংখ্যা কী?"

শারমিন কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে তারপর দ্বিধান্বিত গলায় বলে, "ছয়?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"উঁহু হয় নি।" সাংবাদিক মাথা নাড়ে, "আমি ইন্টারনেটে দেখেছি, দশমিকের পর একশতম সংখ্যা হচ্ছে নয়।"

ঈশিতা এবার এগিয়ে গিয়ে সাংবাদিকদের থামাল, বলল, "আপনারা এবার বাচ্চাটিকে যেতে দিন।"

"কিন্তু সে কেন পারছে না?"

রাফি ইতস্তত করে বলল, "হয়তো, হয়তো সে খুব ক্লান্ত। কিংবা হয়তো তার মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

"তা হলে কি আর সে কখনোই পারবে না?"

"আমরা জানি না।"

"আগে কি সত্যি পারত?"

রাফি বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।"

পুলিশ সাংবাদিকদের সরিয়ে তাদের তিনজনকে সামনে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেয়।

অ্যাম্বুলেন্সের বিছানায় শারমিন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। রাফি তার হাতটা ধরে রেখেছে। সাইরেন বাজাতে বাজাতে অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকার রাজপথ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। শারমিন হঠাৎ চোখ খুলে বলল, "স্যার।"

"বলো।"

"ওই খারাপ মানুষগুলো এখন কোথায়?"

"সবাইকে পুলিশে ধরেছে।"

"সবাইকে?"

"মনে হয় সবাইকে। এক-দুজন হয়তো পালিয়েছে, পুলিশ তাদেরও ধরে ফেলবে।"

শারমিন বলল, "সত্যি ধরতে পারবে তো?"

"হ্যাঁ। পারবে।" রাফি হাসল। বলল, "তুমি চিন্তা কোরো না।"

শারমিন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ডাকল, "স্যার।"

রাফি শারমিনের হাত ধরে বলল, "বলো, শারমিন।"

"আমি যে আর বড় বড় গুণ করতে পারছি না, সে জন্য কি আপনার মন খারাপ হয়েছে?"

রাফি বলল, "না, ঠিক মন খারাপ না। কিন্তু তোমার এত অসাধারণ ক্ষমতাটা ওই বদমাইশগুলো তাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে যদি নষ্ট করে থাকে—"

শারমিন বলল, "না, নষ্ট করে নি।"

"নষ্ট করে নি?"

"না। আমি টেলিভিশনের লোকগুলোকে ইচ্ছে করে ভুল উত্তর দিয়েছি। উনিশ শ বাহান্নকে উনিশ শ একাত্তর দিয়ে গুণ করলে হয় আটত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিন শ বিরানব্বই!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আর পাইয়ের এক শ নম্বর সংখ্যা আসলেই নয়। এরপর আট, এরপর দুই, তারপর এক, তারপর চার আট শূন্য আট—আমি যখন খুশি, বের করতে পারি!"

ঈশিতা এগিয়ে এসে শারমিনের মাথায় হাত দিয়ে বলল, "তুমি টেলিভিশনের লোকগুলোকে কেন ভুল উত্তর দিলে?"

AMARBOI.COM

"তা হলে লোকগুলো আর কোনো দিন আমাকে নিয়ে হইচই করবে না। সারা পৃথিবীতে আমি কাউকে এটা বলতে চাই না। সবাইকে বলব, আমি পারি না। শুধু আপনারা দুজন সত্যি কথাটা জানবেন। ঠিক আছে?"

রাফি নরম গলায় বলল, "ঠিক আছে শারমিন, এটা হবে আমাদের তিনজনের গোপন কথা। আমরা আর কাউকে বলব না।"

"শুধু—শুধু—" শারমিন থেমে গেল।

"শুধু কী?"

"আমার যদি অনেক অঙ্ক করার ইচ্ছে করে তা হলে আমাকে অঙ্ক বই এনে দেবেন।"

"অবশ্যই। লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে আমি ভেক্টর, টেনসর শেখাব। কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল শেখাব, ক্যালকুলাস শেখাব। তুমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করা শিখবে, তুমি নাম্বার থিওরি শিখবে—"

ঈশিতা রাফির হাত ধরে থামাল, বলল, "থাক থাক। বাচ্চা মেয়েটাকে আর উত্তেজিত কোরো না!"

"ঠিক আছে, আর উত্তেজিত করব না। শারমিন তুমি এখন ঘুমাও।"

"ঠিক আছে।" শারমিন চোখ বন্ধ করল। তার মুখে শুধু একটা মিষ্টি হাসি লেগে রইল।

আবছা অন্ধকারে রাফি আর ঈশিতা পাশাপাশি বসে থাকে। রাফি বুঝতে পারে, ঈশিতার শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে। সে নিচু গলায় ডাকল, "ঈশিতা।"

"বলো, রাফি।"

"আমি তোমাকে ধরে রাখব?"

"রাখো।"

রাফি তখন হাত দিয়ে ঈশিতাকে শক্ত করে ধরে রাখে। ঈশিতা ফিসফিস করে বলল, "রাফি।"

"বলো।"

"তুমি সারা জীবন আমাকে এভাবে ধরে রাখবে?"

"রাখব।"

"কথা দাও।"

"কথা দিলাম।"

অ্যাম্বুলেন্সটি তখন এয়ারপোর্ট রোড দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ঈশিতা খুব সাবধানে তার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের কোনাটি মুছে নিল।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেপলার টুটুবি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

ছেলেটির চুল সোনালি রঙের, চোখ দুটো আকাশের মতো নীল। চেহারায় কোথায় জানি এক ধরনের বিষণ্ণতা লুকিয়ে আছে। মেয়েটির মাথা ভরা লালচে চুল, চোখ দুটি মেঘের মতো কালো। চেহারার মাঝে এক ধরনের উচ্ছল সজীবতা। ছেলেটি মেয়েটির একটি হাত স্পর্শ করে নরম গলায় বলল, "আমি তোমাকে আজ একটি কথা বলতে চাই।"

মেয়েটি খিলখিল করে হাসল, বলল, "জানি।" তারপর চোখ নাচিয়ে বলল, "আমিও তোমাকে আজ একটা কথা বলতে চাই।"

ছেলেটার চোখে-মুখে বিস্ময়ের একটা সূক্ষ্ম ছাপ পড়ল, বলল, "তুমিও আমাকে একটা কথা বলবে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে বল।"

মেয়েটি রহস্যের মতো ভান করে বলল, "তুমি আগে বল।"

ছেলেটি কয়েক মুহূর্ত মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "তুমি তো সবই জান। আমি খুব নিঃসঙ্গ একজন মানুষ। খুবই একাকী একজন মানুষ। আমি যন্ত্রের মতো কাজ করে যেতাম—কেন করতাম নিজেই জানতাম না। তোমার সাথে পরিচয় হবার আগে আমার জীবনটা ছিল একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, সাদামাটা। মাঝে মাঝে আমার মনে হত জীবনটা বুঝি পুরোপুরি অর্থহীন। তোমার সাথে পরিচয় হবার পর হঠাৎ করে সবকিছু অন্যরকম হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল আমি যেন জীবনটার একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছি।"

মেয়েটি মাথা নাড়ল, হাসি হাসি মুখে বলল, "আমি জানি।"

"তুমি এত চমৎকার একটি মেয়ে, তোমার মাঝে এত বিশাল প্রাণশক্তি, তুমি এত চঞ্চল হাসিখুশি, শুধু তাই নয়, তুমি বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান, সফল, তোমার সাথে আমার মতো একজন মানুষের সম্পর্ক হবার কথা ছিল না। কিন্তু তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দাও নি—তুমি আমার জীবনটাকে পরিপূর্ণ করেছ। আমি সেজন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

মেয়েটি কোনো কথা বলল না, হাসি হাসি মুখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটি এবার মেয়েটার হাতটা নিজের কাছে টেনে এনে বলল, "তুমি জান, আমাদের চারপাশের জগৎটা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে। তুমি জান এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠছে। প্রতিদিন শুনছি আমাদের চারপাশে আছে ভয়ংকর রোবোমানব, তারা নাকি খুব ধীরে ধীরে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেবার চেষ্টা করছে। তারা নাকি আমাদের মাঝে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। যখন তারা আমাদের মূল নেটওয়ার্কটি দখল করে নেবে তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা নাকি হয়ে যাব দ্বিতীয় প্রজাতি।" ছেলেটার মুখটা হঠাৎ একটু কঠিন হয়ে ওঠে, সে চাপা গলায় বলে, "আমি কিন্তু সেটা বিশ্বাস করি না।"

মেয়েটা এবারেও কোনো কথা বলল না, স্থির দৃষ্টিতে ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মানব সভ্যতা ছেলেখেলা না। মানুষের জন্যে মানুষের ভালবাসা দিয়ে হাজার হাজার বছরে এটা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। আর কিছু রোবট মানুষের চেহারা নিয়ে মানুষের মাঝে ঢুকে মানুষকে পরাজিত করে তাদের সভ্যতা দখল করে নেবে? অসম্ভব!"

মেয়েটি নিষ্পলক চোখে ছেলেটির চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, তাকে দেখে মনে হয় ছেলেটার কথাগুলো যেন সে বুঝতে পারছে না, কিংবা বুঝতে পারলেও বিশ্বাস করতে পারছে না। ছেলেটা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমি অত্যন্ত গোপন একটা প্রজেক্টে কাজ করি। কী নিয়ে কাজ করি আমি সেটা তোমাকে বলতে পারব না, বলার অনুমতি নেই। যদি অনুমতি থাকত তা হলে আমি তোমাকে বলতে পারতাম, তুমি তা হলে বুঝতে পারতে আমরা কতদূর এগিয়ে আছি। রোবোমানবদের খুঁজে বের করার জন্যে আমাদের আর জটিল লোবোগ্রাফি করতে হবে না, আমি যে পদ্ধতিটা নিয়ে কাজ করছি সেটা ব্যবহার করে আমরা খুব সহজে রোবোমানবদের বের করে ফেলতে পারব। এর মাঝে সেটা ব্যবহার শুরু হয়েছে, খুব চমৎকার ফল পাওয়া যাচ্ছে। আমার মতো আরো অনেকে কাজ করছে, দেখবে আমাদের—মানুষদের হারানো খুব কঠিন।"

মেয়েটির মুখে এবারে মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠল। ছেলেটি একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না। তাই না?"

মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "করছি।"

"আমার যদি অনুমতি থাকত তা হলে আমি তোমাকে আমার প্রজেক্টের কথা খুলে বলতাম।"

"তোমাকে বলতে হবে না, আমি জানি।"

ছেলেটা অবাক হয়ে বলল, "তুমি জান?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে জান?"

মেয়েটি নরম গলায় বলল, "আমি আসলে একজন রোবোমানব। আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তোমার কাছ থেকে এই প্রজেক্টের তথ্যগুলো বের করার।"

ছেলেটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে দেখে মনে হয় সে কিছু বুঝতে পারছে না। মেয়েটি হাসি হাসি মুখে বলল, "আমি তোমাকে আজকে এই কথাটা বলব ঠিক করে রেখেছিলাম।"

ছেলেটি নিষ্পলক দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব ধীরে ধীরে তার চেহারা থেকে অবিশ্বাসের ছাপটুকু সরে যায়, সেখানে এক ধরনের অবর্ণনীয় আতঙ্কের ছাপ পড়ে। তারপর আতঙ্কের ছাপটুকু সরে সেখানে একটি গভীর বিষাদের ছাপ পড়তে শুরু করে। ছেলেটি খুব ধীরে ধীরে, শোনা যায় না এরকম গলায় বলল, "তুমি একজন রোবোমানব?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যিকারের রোবোমানব?"

"হ্যাঁ সত্যিকারের রোবোমানব।"

"আমাদের এতদিনের যে সম্পর্ক সেগুলো সব মিথ্যে?"

AMARBOI.COM

মেয়েটি খিলখিল করে হাসল, বলল, "মিথ্যে কেন হবে? সব সত্যি। আগে যা কিছু ঘটেছে সেগুলোও সত্যি। এখন যেটা ঘটবে সেটাও সত্যি।"

"এখন কী ঘটবে?" প্রশ্নটা করতে গিয়ে ছেলেটার গলার স্বর একটু কেঁপে উঠল।

মেয়েটি একটু হাসল, বলল, "আমি তোমার মাথার খুলিটা কেটে তোমার মস্তিষ্কটা বের করে নেব। আমার ব্যাগে একটা ক্রায়োজেনিক প্যাকেট আছে, সেটাতে করে নিয়ে যাব। তোমার মস্তিষ্কটা নষ্ট হবে না, তার সাথে আমরা একটা ইন্টারফেস তৈরি করব, তারপর আমরা সেখান থেকে তোমার সব তথ্য বের করে নেব।"

ছেলেটি হতবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল, কাঁপা গলায় বলল, "তুমি এরকম একটা কাজ করতে পারবে?"

"কেন পারব না? এটা আমার জন্যে খুব সহজ একটা কাজ। তুমি জান আমরা মানুষ না, আমরা হচ্ছি রোবোমানব। মানুষের যে দুর্বলতাগুলো আছে সেগুলো সরানোর জন্যে আমাদের জন্ম হয়েছে। আমাদের মাঝে অপ্রয়োজনীয় কোনো অনুভূতি নেই। আমাদের মাঝে ভালবাসা নেই, মমতা নেই, অপরাধবোধ নেই, দুঃখবোধ নেই। তুমি যেভাবে একটা গণিতের সমস্যার সমাধান কর আমি ঠিক সেভাবে তোমার খুলি কেটে তোমার মস্তিষ্ক বের করে নিই।"

কথা শেষ করে মেয়েটি ছেলেটির চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। ছেলেটি অবাক হয়ে আবিষ্কার করল সেই হাসিটি একজন মমতাময়ী মানবীর মতো নরম এবং কোমল।

কয়েক ঘণ্টা নিরাপত্তাবাহিনীর দুইজন মানুষ ছেলেটির মৃতদেহ সমুদ্রের বালুকাবেলায় একটি ঝাউগাছের নিচে আবিষ্কার করে। একজন নিচু হয়ে মৃতদেহটি পরীক্ষা করে বলল, "মাথার খুলি কেটে মস্তিষ্কটি নিয়ে গেছে।"

অন্যজন বলল, "নিখুঁত কাজ। এক ফোঁটা রক্তও পড়ে নি।"

প্রথমজন বলল, "মৃতদেহটি কীরকম বিবর্ণ দেখেছ? শরীরের সব রক্ত বের করে নিয়েছে।"

অন্যজন কোনো কথা বলল না। তারা জানে রোবোমানবের দেহটি জৈবিক। সেটাকে রক্ষা করতে তাদেরকে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হয়। রোবোমানবেরা জানে মানুষের রক্ত খুব ভালো প্রোটিন।

২

বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি মহামান্য থুল তার জন্যে আলাদা করে রাখা উঁচু চেয়ারটিতে বসার পর আকাদেমির অন্য দশজন সদস্য তাদের চেয়ারে বসল। কালো গ্রানাইটের গোল টেবিলটা ঘিরে চেয়ারগুলো রাখা, টেবিলটা খুব বড় নয়; যেন সবাই সবাইকে কাছে থেকে দেখতে পায় আর কোনোরকম মাইক্রোফোন ছাড়াই তারা যেন খালি গলায় কথা বলতে পারে। ঘরটির দেয়াল ধবধবে সাদা, ছাদটা অনেক উঁচু, সেখান থেকে হালকা নরম একটা আলো ছড়িয়ে পড়ছে। বিশাল একটা হলঘরের মাঝখানে গ্রানাইটের কালো টেবিল আর কয়টি চেয়ার, এ ছাড়া আর কোনো আসবাবপত্র নেই।

ঘরের একমাত্র দরজাটি নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মহামান্য থুল অপেক্ষা করলেন, তারপর আকাদেমির সকল সদস্যদের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, "আমি প্রথমেই তোমাদের সবার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

কমবয়সী গণিতবিদ শ্রুম বলল, "তার কোনো প্রয়োজন নেই মহামান্য থুল।"

তাকে বাধা দিয়ে মহামান্য থুল বললেন, "আছে। এই ঘরের আমরা এগারজন হচ্ছি পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এগারজন মানুষ। পৃথিবীর মানুষ এই টেবিলকে ঘিরে বসে থাকা এই এগারজনকে পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের পরস্পরকে বিশ্বাস করতে হবে। আমরা যদি একজন আরেকজনকে বিশ্বাস না করি তা হলে এই আকাদেমি একটা অর্থহীন জটলায় পরিণত হবে। আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি যে আমি তোমাদের অবিশ্বাস করেছি। আমি তোমাদের সবার লোবোগ্রাফ করিয়ে এই ঘরে ঢুকতে দিয়েছি।"

পদার্থবিদ ক্রন বলল, "আমরা বুঝতে পারছি মহামান্য থুল। আপনার জায়গায় আমাদের কেউ থাকলেও সেও এই সময়ে ঠিক এই কাজটি করত। পৃথিবীর এখন অনেক বড় দুঃসময়।"

মহামান্য থুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আমি জানি তোমরা আমার শঙ্কাটুকু বুঝতে পারবে। তারপরেও আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। তবে আমি তোমাদের জানাতে চাই আমি নিজেও নিজের লোবোগ্রাফি করে এই ঘরে ঢুকেছি।" মহামান্য থুল হাতের স্বচ্ছ কাগজটি টেবিলে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটি আমার রিপোর্ট। আমি দেখেছি, তোমরাও দেখতে পার। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এই ঘরে যারা আছে তারা সবাই মানুষ। আমিও মানুষ। এখানে কোনো রোবোমানব নেই।"

জীববিজ্ঞানী ত্রানা বলল, "আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করছি মহামান্য থুল।"

"না।" মহামান্য থুল মাথা নেড়ে বললেন, "আমি তোমাদের সবার রিপোর্ট দেখেছি। তোমাদেরও আমার রিপোর্টটি দেখতে হবে। আমরা সভা শুরু করার আগে সবাই নিশ্চিত হতে চাই যে এই চার দেয়ালের ভেতর কোনো রোবোমানব নেই। সবাই নিশ্চিত হতে চাই যে আমরা সবাই মানুষ।"

বিজ্ঞান আকাদেমির দশজন সদস্যের কেউ হাত বাড়িয়ে রিপোর্টটি নিতে রাজি হল না। সমাজবিজ্ঞানী লিহা বলল, "মহামান্য থুল, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমাদের কারো পক্ষে সেটি করা সম্ভব নয়। আপনার লোবোগ্রাফি রিপোর্ট দেখে আপনার মনুষ্যত্ব যাচাই করার মতো ধৃষ্টতা দেখানোর দুঃসাহস এই পৃথিবীতে কারো নেই।"

মহামান্য থুলের মুখে এক ধরনের কাঠিন্য ফুটে উঠল, সেটি তার চরিত্রের সাথে পুরোপুরি বেমানান। তিনি কঠিন গলায় বললেন, "তা হলে আমার উপর আরোপিত ক্ষমতাবলে আমি আদেশ করছি, লিহা, তুমি লোবোগ্রাফি রিপোর্টটি দেখে আমাদের সকল সদস্যদের সেটি জানাও।"

লিহা অত্যন্ত কুণ্ঠার সাথে রিপোর্টটি হাতে নিয়ে সেটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে মাথা তুলে বলল, "এই রিপোর্টে মহামান্য থুলের জিনেটিক কোডিং নির্দিষ্ট করা আছে, এখানে লেখা আছে রোবোমানবের বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনোটিই তার শরীরে পাওয়া যায় নি। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে একজন মানুষ।"

মহামান্য থুলের মুখ থেকে কাঠিন্যটুকু সরে গিয়ে সেখানে তার পরিচিত হাসিটুকু ফুটে উঠল। তিনি সবার দিকে একনজর তাকিয়ে বললেন, "চমৎকার! এখন আমরা সবাই নিশ্চিতভাবে জানি এখানে আমরা সবাই মানুষ। আমরা এখন মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে পারব।"

মহামান্য থুল গ্রানাইটের মসৃণ টেবিলটার উপর অন্যমনস্কভাবে টোকা দিতে দিতে বললেন, "তোমরা সবাই জান আমি কেন তোমাদের ডেকে এনেছি। এখানে আমরা যে কথা

বলব পৃথিবীর কেউ সে কথাগুলো জানবে না। এগুলো রেকর্ড করা হবে না তাই ভবিষ্যতেও কেউ কখনো জানতে পারবে না। আমি এই সিদ্ধান্তগুলো কেন নিয়েছি সেটা তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ?"

কেউ কোনো কথা বলল না, কয়েকজন শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। মহামান্য থুল বললেন, "তোমরা সবাই জান রোবোমানব প্রজেক্টটি আমাদের অনুমতি ছাড়া শুরু করা হয়েছিল। মানুষের মনুষ্যত্ববোধ থাকবে না কিন্তু মানুষের বুদ্ধিমত্তা থাকবে এরকম রোবট তৈরি করার অনুমতি পৃথিবীর নির্বোধতম মানুষটিও দেবে না। আর সেগুলোকে মানুষের রূপ দিয়ে এন্ড্রয়েড তৈরি করতে দেয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সেটাই ঘটেছে। যখন আমাদের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেটা ধরতে পেরেছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কিছু শহরের কিছু কাউন্সিলর তার জন্যে দায়ী। তারা তাদের শহরে গোপন এন্ড্রয়েড শিল্প গড়ে উঠতে দিয়েছে। কারা দায়ী, কীভাবে সেটা গড়ে উঠতে পেরেছে সেটা নিয়ে আলোচনা করা এখন একটি একাডেমিক ব্যাপার—আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে তোমাদের ডাকি নি। আমি ডেকেছি অন্য কারণে। আমি সেটি বলার আগে আমাদের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বিজ্ঞানী জুহকে বর্তমান পরিস্থিতিটি ব্যাখ্যা করতে বলব।"

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বিজ্ঞানী জুহ মাথা নিচু করে বলল, "আমি এই আকাদেমির কাছে ক্ষমা চাইছি, আমি আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি নি।"

মহামান্য থুল বললেন, "আমি তোমাকে আত্মবিশ্লেষণ করতে বলি নি। তোমাকে আমি শুধুমাত্র বর্তমান পরিস্থিতির উপর একটা রিপোর্ট দিতে বলেছি।"

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বিজ্ঞানী জুহ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যখন আমরা ভেবেছিলাম আমরা অবস্থাটি আয়ত্তের মাঝে আনতে যাচ্ছি ঠিক তখন আমরা ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যাচ্ছি। রোবোমানবেরা এখন সংঘবদ্ধ শক্তি, তারা নিজেরা নিজেদের তৈরি করছে—কিন্তু আপনারা সবাই জানেন একসময় কিছু মানুষ ওদের তৈরি করেছিল। জৈবিক মানুষ ব্যবহার করে তাদের তৈরি করা হয়। মস্তিষ্ক থেকে মানবিক অনুভূতিগুলো সরিয়ে নিয়ে সেখানে নিউরনগুলোকে নূতন করে পুনর্বিন্যাস করা হয়—সেজন্যে আমাদের স্বীকার করতেই হবে তাদের বুদ্ধিমত্তা মানুষ থেকে বেশি। যেহেতু তাদের কোনো মানবিক অনুভূতি নেই তাই তারা হচ্ছে ভয়ংকর একরোখা—তারা যে কোনো কিছু করে ফেলতে পারে। সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধ করতেও তাদের এতটুকু দ্বিধা হয় না।"

জুহ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "পৃথিবী থেকে অপরাধ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। একসময় মানুষ যে কারণে অপরাধ করত এখন সেই কারণগুলোর বেশিরভাগই নেই, তাই অপরাধ করার প্রয়োজনও হয় না। তারপরেও ছোটখাটো কিংবা বড়সড় অপরাধ যখন কেউ করে আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী তাদের ধরতে পারে। আমাদের নেটওয়ার্ক পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্ক, সবার সুনির্দিষ্ট তথ্য সেখানে আছে, কেউ এর বাইরে কখনো যেতে পারে না।"

জুহ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, হঠাৎ করে তাকে কেমন জানি হতাশাগ্রস্ত এবং ক্লান্ত মনে হয়। অনেকটা অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এই পূর্ণাঙ্গ নেটওয়ার্কটিই হয়েছে আমাদের সর্বনাশ। আমরা এই নেটওয়ার্কের ওপর খুব বেশি নির্ভর করি। রোবোমানবেরা এই নেটওয়ার্কের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে, নেটওয়ার্কের তথ্য পরিবর্তন করে তাদের সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারা সর্বশেষ কী করার চেষ্টা করছে শুনলে আপনারা হতবাক হয়ে যাবেন।"

পদার্থবিদ ক্রন একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "কী করার চেষ্টা করছে?"

"তারা ডাটাবেসের তথ্য এমনভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে যে লোবোগ্রাফি করে আমরা যখন একজন রোবোমানবকে আলাদা করি, নেটওয়ার্ক তখন যেন তার আসল তথ্য লুকিয়ে তার সম্পর্কে বানানো তথ্য দেয়। তারা যদি সেটা করতে পারে আমরা তখন কোনোভাবে তাদের খুঁজে পাব না। তারা আমাদের মাঝে লুকিয়ে থেকে একদিন আমাদের পরাজিত করে পুরো পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে। এই পৃথিবীতে মানুষ থাকবে না, থাকবে শুধু রোবোমানব।"

জীববিজ্ঞানী ত্রানা বলল, "সমস্যাটা কী তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। প্রাচীনকালে রোবট তৈরি হত যন্ত্রপাতি দিয়ে। লোহালক্কড়, ফটোটিউব, ভালব, ইলেকট্রনিক, ফটোট্রনিক সার্কিট দিয়ে। তাদের খুঁজে বের করতে হত না—এমনিতেই তারা মানুষ থেকে আলাদা হয়ে থাকত। এই রোবোমানবেরা সেরকম নয়। তারা পুরোপুরি মানুষ, শুধুমাত্র তাদের মস্তিষ্কটা নূতন ভাবে ম্যাপিং করেছে। নিউরনগুলোকে ওভারড্রাইভ করার জন্যে মস্তিষ্কের একেবারে ভেতরে, যেটাকে থ্যালামাস বলে সেখানে একটা অত্যন্ত ছোট, চোখে দেখা যায় না এত ছোট মাইক্রোস্কোপিক ইমপ্ল্যান্ট বসানো হয়। সেটা কিছুক্ষণ পরপর নিউরনগুলোকে বাড়তি স্টিমুলেশান দেয়। শুধু যে স্টিমুলেশান দেয় তা নয় সেটা দিয়ে ম্যাপিং পরিবর্তন করে ফেলতে পারে, একটি রোবোমানবকে ভিন্ন রোবোমানবে পাল্টে দিতে পারে, নূতন তথ্য ঢুকিয়ে দিতে পারে। এদের প্রোগ্রাম করা যায় কিন্তু এরা পুরোপুরি জৈব মানুষ। সেজন্যে এদের কোনোভাবে ধরা যায় না।"

মহামান্য থুল বললেন, "আমি তোমাদের আরো মন খারাপ করা খবর দিই। রোবোমানব খুঁজে বের করার অসাধারণ একটা পদ্ধতি একটা কমবয়সী ছেলে বের করেছিল, রোবোমানবেরা তার মস্তিষ্ক কেটে নিয়ে গেছে। শুধু যে মস্তিষ্ক কেটে নিয়েছে তা নয় রোবোমানবেরা তার মস্তিষ্ক থেকে সব তথ্য বের করে এখন আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে। আর কয়েকদিনের ভেতর সব জায়গায় রোবোমানবেরা ঢুকে যাবে।"

বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্যরা চুপ করে বসে রইল। একটু পর গণিতবিদ শ্রুম বলল, "আমাদের কি কিছুই করার নেই?"

"আছে। অনেক কিছু করার আছে। আমরা তার চেষ্টা করছি।"

জুহ বলল, "কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমরা কয়েকদিনের মাঝে নেটওয়ার্কটি হারাব। আমি খুব দুঃখিত আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পারি নি, মানুষের এত বড় বিপর্যয়ের জন্যে আমি দায়ী—"

মহামান্য থুল হাত তুলে তাকে থামালেন, "তুমি কেন মিছিমিছি নিজের উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছ। এখানে তোমার কিছু করার ছিল না।"

"কিন্তু এই দায়িত্বটি ছিল আমার—"

"তোমার একার নয়, আমাদের সবার।" মহামান্য থুল সবার দিকে একবার তাকালেন তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "এবারে আমি তোমাদের বলি আমি কেন তোমাদের ডেকে এনেছি।"

সবাই তাদের চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। মহামান্য থুল তার হাতের নখগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে করতে বললেন, "আমরা সত্যের মুখোমুখি হই। পৃথিবীর মানুষ প্রথমবার সত্যিকারের একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। রোবোমানবেরা আমাদের সভ্যতা ধ্বংস করার পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। প্রাচীনকালে এক দেশের মানুষেরা অন্য দেশ দখল করে সেই দেশের মানুষদের হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে দিত। এই রোবোমানবদের কাছ

থেকে আমরা ঠিক সেরকম একটা বিপদ আশঙ্কা করছি। যদি কোনোভাবে তারা নেটওয়ার্ক দখল করতে পারে তা হলে তারা পৃথিবীর মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে। আমরা কোনোভাবে সেটা হতে দিতে পারি না। যে কোনো মূল্যে কিছু মানুষ হলেও আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

জীববিজ্ঞানী ত্রানা বলল, "আপনি ঠিক কী বলছেন আমরা বুঝতে পারছি না মহামান্য থুল।"

"আমি একটি মহাকাশযান প্রস্তুত করেছি। সেই মহাকাশযানে করে আমরা পৃথিবীর কিছু মানুষকে মহাকাশে পাঠিয়ে দিতে চাই। দূরবর্তী কোনো নক্ষত্রের কোনো গ্রহে তারা নূতন করে মানুষের বসতি স্থাপন করবে। ছয়শত আলোকবর্ষ দূরে কেপলার টুটুবি গ্রহটি আছে। অন্য কিছু খুঁজে না পেলেও অন্তত এই গ্রহটিতে থাকতে পারবে। পৃথিবী থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও তারা বেঁচে থাকবে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও না কোথাও মানুষের বংশধরেরা বেঁচে থাকবে। মানুষের সভ্যতা বেঁচে থাকবে।"

বিজ্ঞান আকাদেমির দশজন সদস্য চুপ করে বসে রইল, কেউ একটি কথাও বলল না। মহামান্য থুল বলল, "তোমরা চুপ করে বসে আছ কেন? কিছু একটা বল।"

পদার্থবিজ্ঞানী ক্রন বলল, "আমাদের কিছু বলার নেই মহামান্য থুল। মানব সভ্যতা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের আর কিছু করার নেই।"

মহামান্য থুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "কিছু করার নেই সেটি সত্যি নয় ক্রন। আমাদের অনেক কিছু করার আছে এবং আমরা একেবারে শেষ পর্যন্ত তার চেষ্টা করব, কিন্তু আমি কোনো ঝুঁকি নেব না। মানুষ হয়ে আমি রোবোমানবের পদানত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না। যদি বেঁচে থাকতেও হয় আমি জানব অল্প কিছু মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও না কোথাও বেঁচে আছে। রোবোমানবের হাতে যদি আমার মৃত্যু হয় আমি শান্তি নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারব।"

সমাজবিজ্ঞানী লিহা বলল, "মহামান্য থুল, মহাকাশযানে কারা যাবে, সাথে কী থাকবে, কোথায় যাবে, নিরাপত্তার জন্যে কী করা হবে এই সব খুঁটিনাটি কি ঠিক করা হয়েছে?"

মহামান্য থুল মাথা নাড়লেন, বললেন, "না করা হয় নি। গোপনীয়তার জন্যে আমি কিছু কাজ এগিয়ে রেখেছি, কিন্তু খুঁটিনাটি কিছুই করা হয় নি। আমি তোমাদের ডেকেছি এই পরিকল্পনাটা পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে।"

বিজ্ঞান আকাদেমির সবচেয়ে কমবয়সী সদস্য পরিবেশবিজ্ঞানী কিহি বলল, "সময় নষ্ট না করে আমরা তা হলে কাজ শুরু করে দিই।"

"হ্যাঁ।" মহামান্য থুল মাথা নাড়লেন, বললেন, "কাজ শুরু করে দাও।"

৩

"তোমার নাম কী?"

"টুরান।"

"টুরান, তুমি মাত্র বাইশ বছরের একজন যুবক। তুমি কেন পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশের অনিশ্চিত জীবনে ঝাঁপ দিতে চাও? তুমি কোথায় বসতি স্থাপন করবে কিংবা আদৌ কোথাও বসতি স্থাপন করতে পারবে কি না সেটি কেউ জানে না।"

"তুমি কেন এই প্রশ্ন করছ?"

"টুরান, এখানে প্রশ্ন করব আমি, তুমি উত্তর দেবে। তুমি প্রশ্ন করতে পারবে না। বল, তুমি কেন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চাইছ?"

"তুমি যে উত্তর শুনলে খুশি হবে সেটি দেব নাকি সত্যি উত্তর দেব?"

"(হাসি) প্রথমে আমাকে খুশি করার জন্যে উত্তরটি দাও।"

"খুব শৈশব থেকে আমার মহাকাশ নিয়ে কৌতূহল। জন্মের পর থেকে আমার স্বপ্ন ছিল মহাকাশচারী হওয়ার। আমি সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছি। আমি নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে ঘুরে বেড়াতে চাই। আমি অজানাকে জানতে চাই।"

"চমৎকার টুরান। এবারে সত্যি কারণটি বল।"

"এই পৃথিবী নিয়ে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমি এই দূষিত গ্রহ থেকে পালাতে চাই।"

"কেন?"

"আমার সম্পর্কে সব তথ্য তোমার কাছে আছে। তুমি জান।"

"টুরান। তোমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বল, কেন?"

"তোমরা নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে সব তথ্য জান। কেন আমার কাছে আবার জানতে চাইছ?"

"আমি তোমাকে বলেছি তুমি প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। বল। কেন?"

"আমার ভালবাসার মেয়েটি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

"একটা মেয়ের জন্যে তুমি আস্ত পৃথিবীটাকে পরিত্যাগ করতে চাইছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার নাম কী মেয়ে?"

"ইহিতা।"

"সুন্দর একটি নাম। ইহিতা।"

"তুমিও খুব ভালো করে জান আমিও খুব ভালো করে জানি এটি মোটেও সুন্দর একটি নাম নয়। কাজেই কাজের কথায় চলে আসি।"

"ঠিক আছে ইহিতা। তুমি কেন পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশের একটা অনিশ্চিত যাত্রায় যেতে চাইছ?"

"এটি মোটেও অনিশ্চিত যাত্রা নয়। পৃথিবী থেকে যখন একটা মহাকাশযান মহাকাশে পাড়ি দেয় সেটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট যাত্রা। এর প্রতিটি মুহূর্ত অসংখ্যবার সঠিকভাবে যাচাই করে দেখা হয়।"

"সেটি সত্যি ইহিতা। কিন্তু তুমি জান এর গন্তব্য অনিশ্চিত। এটি যেখানে যাবে সেখানে পৃথিবীর মানুষ আগে কখনো যায় নি।"

"বলতে পার সেটি আমার মূল আকর্ষণ।"

"কেন?"

"গত কিছুদিনে আমার জীবনের খুব কষ্টের সময় গিয়েছে। আমি সেগুলো ভুলে থাকতে চাই কিন্তু ভুলে থাকতে পারি না। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পরিবেশে গেলে হয়তো ভুলে থাকতে পারব।"

"স্মৃতি ভুলে থাকা কোনো কঠিন কিছু নয়। নিউরন থেকে স্মৃতি মুছে দিলেই হয়।"

"আমি মানুষ। আমি রোবোমানব নই যে নিউরনের স্মৃতি পুনর্বিন্যাস করব।"

"তুমি কষ্ট করবে?"

"মানুষ হলেই কষ্ট পেতে হয়। কষ্ট করতে হয়। চেষ্টা করতে হয় কষ্টকে ভুলে থাকতে।"

"তোমার কষ্টের কথাটা কী বলবে?"

"আমার ভালবাসার মানুষটি একটি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আমরা বিয়ে করার দিন ঠিক করেছিলাম।"

"আমি দুঃখিত ইহিতা। শুনে আমি খুব দুঃখ পেলাম।"

"শুনে তুমি আসলে খুব দুঃখ পাও নি। এটি ভদ্রতার কথা।"

"তুমি কেন বলছ শুনে আমি দুঃখ পাই নি?"

"কারণ নেটওয়ার্কে আমার সব তথ্য আছে। তুমি আমার সম্পর্কে সবকিছু জান। তুমি কেন আমার সাথে কথা বলছ আমি সেটাও বুঝতে পারছি না।"

"এটি নিয়ম। আমাদের প্রত্যেকের সাথে কথা বলতে হয়।"

"তোমার নাম কী?"

"টর।"

"টর, তুমি কেন পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশের অনিশ্চিত জীবন বেছে নিতে চাইছ?"

"আমার বয়স চল্লিশ। আমি পৃথিবীর জীবন মোটামুটি দেখেছি। জীবনটা আমার কাছে একঘেয়ে মনে হচ্ছে। আমি নূতন কিছু চাই, নূতন উত্তেজনা চাই।"

"তোমার পরিবার?"

"আমার পরিবার নেই। আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে অনেক দিন আগে।"

"টর, মহাকাশযান যদি তোমার একঘেয়ে মনে হয়?"

"সে আশঙ্কাটুকু আছে। কিন্তু আমি সেখানেও উত্তেজনা খুঁজে নিতে পারব।"

"তা হলে পৃথিবীতে উত্তেজনা কেন খুঁজে নিচ্ছ না টর?"

"চেষ্টা করেছি। আমাকে দেবার মতো উত্তেজনা পৃথিবীতে নেই।"

"তুমি কি মনে কর পৃথিবী থেকে মহাকাশে অভিযান করার জন্যে যে বিশাল মহাকাশযানটি প্রস্তুত করা হয়েছে সেটি শুধুমাত্র তোমাকে উত্তেজনা দেবার জন্যে?"

"না। কিন্তু আমি যদি উত্তেজনা পাই ক্ষতি কী?"

"উত্তেজনার খোঁজে তুমি যদি দায়িত্বহীন হয়ে যাও?"

"উল্টোটাও তো হতে পারে।"

"উল্টো কী হতে পারে টর?"

"মহাকাশযানের ভয়ংকর কোনো বিপর্যয়ে অন্য সবাই যখন পিছিয়ে যাবে তখন ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে আমি এগিয়ে যাব। সবাইকে রক্ষা করব।"

"তুমি এটা বিশ্বাস কর, টর?"

"হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। আমার ধারণা তুমিও বিশ্বাস কর।"

"তুমি কেন এ কথা বলছ?"

"কারণ নেটওয়ার্কে আমার সব তথ্য আছে। তুমি নিশ্চয়ই আমার সবকিছু জান। আমি যেগুলো জানি না সেগুলোও জান। আমি কি ঠিক বলেছি?"

"হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ।"

"তোমার নাম কী?"

"নুট।"

"তোমার বয়স কত?"

"আঠার।"

"তোমার বয়স মাত্র আঠার। তুমি কেন পৃথিবীর নিরাপদ জীবন ছেড়ে মহাকাশের অনিশ্চিত জীবন বেছে নিতে চাইছ?"

"মহাকাশ নিয়ে আমার একটি আকর্ষণ আছে।"

"সেটাই কি একমাত্র কারণ?"

"হ্যাঁ। সেটাই একমাত্র কারণ।"

"নুট।"

"বল।"

"আমি যদি বলি সেটা একমাত্র কারণ না।"

(নিরুত্তর)

"নুট।"

"বল।"

"আমার কথার উত্তর দাও। তুমি নিশ্চয়ই জান আমাদের নেটওয়ার্কে তোমার সব তথ্য আছে? তুমি মাত্র আঠার বছরের একজন তরুণ। কিন্তু এর মাঝে তুমি তোমার ঘরে ভয়ংকর ভিরবিয়াস ড্রাগ তৈরি করে বিক্রি করার চেষ্টা করেছ। পৃথিবীতে থাকলে তোমাকে দীর্ঘ সময় শুদ্ধকরণ প্রতিষ্ঠানে কাটাতে হবে। সেজন্য তুমি মহাকাশে পালিয়ে যেতে চাইছ।"

(নিরুত্তর)

"আমার কথার উত্তর দাও নুট।"

(নিরুত্তর)

"নুট।"

"বল।"

"আমার কথার উত্তর দাও।"

(নিরুত্তর)

"তোমার নাম কী?"

"আমার নাম নীহা।"

"নীহা, তোমার বয়স কত?"

"ষোল।"

"নীহা।"

"বল।"

"নীহা, তুমি মাত্র ষোল বছরের একটি মেয়ে। তুমি কেন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চাইছ?"

"আমি তোমার প্রশ্নটি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি পৃথিবীতে থাকি আর মহাকাশযানে থাকি আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনো গ্রহতেই থাকি, এর মাঝে পার্থক্য কী?"

"কোনো পার্থক্য নেই?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"না।"

"কেন নেই, নীহা?"

"আমি গণিত ছাড়া আর কোনো কিছু বুঝি না। আমি প্রতি মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কে গণিতের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি। আমি যখন তোমার সাথে কথা বলছি তখনো গণিত নিয়ে চিন্তা করতে করতে কথা বলছি। সত্যি কথা বলতে কি আমি রুপাকভ সমীকরণ নিয়ে চিন্তা করছিলাম। এই মাত্র তার একটি সমাধান পেয়ে গেছি।"

"তোমাকে অভিনন্দন নীহা।"

"এটি মোটেও অভিনন্দন পাওয়ার মতো কাজ নয়। খুবই সহজ কাজ।"

"নীহা। তুমি কিন্তু এখনো আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি। কেন পৃথিবী আর মহাকাশযানে কিংবা অন্য কোনো গ্রহে থাকা একই ব্যাপার?"

"তার কারণ আমার চারপাশে কী আছে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমার প্রয়োজন ছোট একটা ডেস্ক, ভাবনা করার জন্য নিরিবিলি একটু জায়গা।"

"পৃথিবীর কি নিরিবিলি জায়গা নেই নীহা?"

"আছে।"

"তা হলে কেন মহাকাশযানের অনিশ্চিত জীবন বেছে নিতে চাইছ?"

"তার কারণ পৃথিবীতে থাকলে আমার চারপাশের সমাজ আমাকে সুনির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালন করতে বলবে। আমাকে নিরিবিলি বসে থাকতে দেবে না।"

"মহাকাশযানে তোমাকে নিরিবিলি বসে থাকতে দেবে?"

"দেবে। সেখানে মানুষের কোনো দায়িত্ব নেই। মহাকাশযান চালানোর জন্যে শক্তিশালী কম্পিউটার থাকে। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী, নীহা?"

"মহাকাশযানে ওঠার পর আমাদের শীতল ঘরে দীর্ঘদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আগ্রহ আছে।"

"কী ধরনের আগ্রহ?"

"তাপমাত্রা কমিয়ে শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল করে রাখলেও মস্তিষ্কের কোনো একটি ধাপ সচল থাকে বলে আমার ধারণা। আমি দীর্ঘ যাত্রায় মস্তিষ্কের সেই সচল অংশটুকু ব্যবহার করে দেখতে চাই।"

"নীহা।"

"বল।"

"তুমি কি জান তুমি খুব অদ্ভুত একটি মেয়ে।"

(নিরুত্তর)

"নীহা।"

"বল।"

"তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"এটি আরেকটি কারণ।"

"কোনটি আরেকটি কারণ নীহা?"

"জন্মের পর থেকে আমি শুনে আসছি যে আমি অদ্ভুত একটি মেয়ে। তাই আমি এমন একটা জায়গায় যেতে চাই যেখানে পৃথিবীর কেউ নেই। কেউ যেন আমাকে না বলে আমি অদ্ভুত একটি মেয়ে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নীহা।"

"বল।"

"আমার ধারণা বহুদূর কোনো গ্রহেও তোমাকে বলা হবে তুমি অদ্ভুত একটি মেয়ে।"

(নিরুত্তর)

"তুমি কি তবুও মহাকাশযানে করে যেতে চাও?"

"হ্যাঁ। যেতে চাই।"

"তোমার নাম কী?"

"আমার নাম সুহা।"

"তোমার সাথে যে শিশুটি আছে তার নাম কী?"

"ক্রন।"

"সে তোমার কী হয়?"

"ক্রন আমার ছেলে। আমি তার মা।"

"সুহা, তোমার বয়স কত?"

"আমার বয়স ছাব্বিশ।"

"ক্রনের বয়স কত?"

"চার।"

"তুমি তোমার চার বছরের সন্তানকে নিয়ে মহাকাশযানে করে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে রওনা দিতে চাও?"

"আমি ব্যাপারটি সেভাবে দেখছি না।"

"তুমি ব্যাপারটি কীভাবে দেখছ?"

"আমি মনে করি আমার চার বছরের ছেলেকে নিয়ে এই মহাকাশযানে করে দূর মহাকাশে রওনা দিতে পারলে আমি আমার সন্তানের জীবন নিশ্চিত করতে পারব।"

"তুমি কেন এই কথা বলছ?"

"কারণ আমি জানি রোবোমানবেরা পৃথিবী দখল করে নেবে। তখন তারা কোনো মানুষকে রাখবে না। যদিবা রাখে তাদেরকে রোবোমানবের আজ্ঞাবহ নিচু শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে থাকতে হবে। আমি আমার সন্তানের জন্যে সেই ধরনের জীবন চাই না। আমি তাকে মানুষের সম্মানিত জীবন দিতে চাই।"

"তুমি কেন বলছ এই পৃথিবী রোবোমানবেরা দখল করে নেবে।"

"তার কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি তারা প্রায় দখল করে ফেলেছে।"

"তুমি কীভাবে সেটা জান সুহা?"

"সংবাদ মাধ্যমে আগে রোবোমানব খুঁজে পাওয়ার খবর দেয়া হত। এখন দেয়া হয় না। যার অর্থ রোবোমানবদের আর খুঁজে বের করা সম্ভব হচ্ছে না। কিংবা—"

"কিংবা কী?"

"কিংবা শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীতে রোবোমানবেরা ঢুকে গেছে যেটি আরো বিপজ্জনক।"

"তুমি কি মানুষের কর্মদক্ষতাকে বিশ্বাস কর না?"

"করি। কিন্তু—"

"কিন্তু কী সুহা?"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"রোবোমানবেরাও এক ধরনের মানুষ। আমাদের যা আছে তাদেরও তার সবকিছু আছে। তাদের একটা বাড়তি জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে থ্যালামাসে ইমপ্ল্যান্ট করে দেয়া নিউরন স্টিমুলেটর। সেটা তাদের মস্তিষ্ককে অনেক বেশি দক্ষ করে তুলেছে। আমি নিশ্চিতভাবে জানি এই রোবোমানবেরা খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবী দখল করে নেবে। আমি তার আগে পৃথিবী ত্যাগ করতে চাই।"

"তোমার চার বছরের ছেলে ক্রুদ? সেও কি যেতে চায়?"

"ক্রুদকে এখনো স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া হয় না।"

"ক্রুদের বাবা?"

"আমি তার সম্পর্কে কথা বলতে চাই না।"

"কেন?"

"কারণ আমি তার সম্পর্কে একটি ভালো কথাও বলতে পারব না। আমি ক্রুদের সামনে কিছু বলতে চাই না।"

"ঠিক আছে। আমি কি ক্রুদের সাথে একটু কথা বলতে পারি?"

"পার।"

"ক্রুদ।"

"উঁ।"

"তুমি কি জান তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"জানি।"

"কোথায়?"

"আকাশে।"

"আকাশে কোথায়?"

"রাত্রিবেলা যে তারাগুলো মিটমিট করে সেখানে।"

"সেখানে গিয়ে তুমি কী করবে?"

"আমি তারাগুলো ধরে একটা কাচের বোতলে রাখব। রাত্রিবেলা সেগুলো বোতলের ভেতর মিটমিট করবে।"

"চমৎকার ক্রুদ। তোমাকে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"পার।"

"তুমি তোমার মা'কে কতটুকু ভালবাস?"

"অনেকটুকু। এই ঘরের সমান। আরো বেশি।"

"চমৎকার ক্রুদ। চমৎকার।"

৪

ঘরটি ছোট, ঘরের ছাদ বেশ নিচু, ইচ্ছে করলে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। ঘরটির মাঝে একটি ধাতব টেবিল, টেবিল ঘিরে তেরজন নারী পুরুষ বসে আছে। ঘরটির ভেতর নিরানন্দ পরিবেশ কিন্তু ঠিক কেন সেটি নিরানন্দ হঠাৎ করে বোঝা যায় না। ধাতব টেবিলের একপাশে যে বসে আছে তার চেহারায় এক ধরনের কাঠিন্য লুকিয়ে আছে। সে টেবিলে থাবা দিতেই টেবিলের চারপাশে বসে থাকা নারী ও পুরুষগুলো ঘুরে তার দিকে তাকাল। মানুষটি সুনির্দিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

কারো দিকে না তাকিয়ে বলল, "বিজ্ঞান আকাদেমি কী নিয়ে তাদের গোপন সভা করেছে সেটা কি জানা গেছে?"

কমবয়সী একটা মেয়ে খিলখিল করে হেসে বলল, "আমাদের নিয়ে!"

"অবিশ্যি আমাদের নিয়ে? কিন্তু আমাদের কোন বিষয়টা নিয়ে সেটা জানা গেছে?"

মাঝবয়সী একজন মানুষ বলল, "মোটামুটি অনুমান করতে পারি।"

"ঠিক আছে অনুমান কর।"

মানুষটি বলল, "আমরা রোবোমানবেরা নেটওয়ার্ক দখলের দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছি। সমাজের সব জায়গায় আমাদের রোবোমানবেরা আছে—তারা গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। আগে যেরকম প্রতিদিন মানুষেরা কিছু রোবোমানব ধরে ফেলত—আজকাল সেটা পারছে না। তার প্রধান কারণ—"

কঠিন চেহারার মানুষটি বিরক্তির সুরে বলল, "আমরা সবাই এগুলো জানি। আমি তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করছি সেটা বল। বিজ্ঞান আকাদেমি কী নিয়ে সভা করেছে?"

"তারা একটা মহাকাশযান পাঠাবে।"

"মহাকাশযান?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কেমন করে সেটা জান? বিজ্ঞান আকাদেমির সভা ছিল গোপন। বিজ্ঞান আকাদেমির কোনো সদস্যের মাঝে আমরা কোনো রোবোমানব ঢুকাতে পারি নি।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল, "বিজ্ঞান আকাদেমির সভা শেষ হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবীর অনেক জায়গায় অনেক রকম কাজ শুরু হয়ে গেছে—সব কাজগুলো হচ্ছে একটা মহাকাশযানকে নিয়ে। আমরা তাই অনুমান করছি একটি মহাকাশযান পাঠানো হবে।"

"মহাকাশযানে কী পাঠানো হবে?"

কমবয়সী মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "মানুষ। মানুষের ফিটাস। মানুষের জিনোম।"

কঠিন চেহারার মানুষটি কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল, জিজ্ঞেস করল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। নেটওয়ার্কের তথ্য আমরা আজকাল যখন খুশি পরীক্ষা করতে পারি। আমি নিশ্চিতভাবে জানি অসংখ্য মানুষ, মানুষের ফিটাস আর জিনোম প্রস্তুত করা হচ্ছে!"

কঠিন চেহারার মানুষটির মুখে বিচিত্র এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, সে দুলে দুলে হাসতে হাসতে বলল, "মানুষ তা হলে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে! নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে মহাকাশযানে করে কিছু মানুষ বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীতে না থাকলেও অন্য কোথাও যেন মানুষেরা বেঁচে থাকে?"

"হ্যাঁ।" মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "সবকিছু দেখে আমাদের তাই মনে হচ্ছে।"

কঠিন চেহারার মানুষটি তরল গলায় বলল, "আমার ঘনিষ্ঠ রোবোমানবেরা, তোমাদের অভিনন্দন। সেই দিনটি আর খুব বেশি দূরে নয় যখন আমরা পৃথিবীর দায়িত্ব নেব।"

সবাই মাথা নাড়ল, শুধু মধ্যবয়স্ক মানুষটি গম্ভীর গলায় বলল, "এখন আমাদের অনেক কাজ। পৃথিবীর দায়িত্ব নেবার আগে আমাদের নিজেদের কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে।"

কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, "আমরা কি প্রস্তুতি নেই নি?"

"নিয়েছি। বেশ কিছু প্রস্তুতি নিয়েছি। নেটওয়ার্কটি নিয়ন্ত্রণে নেয়ার সাথে সাথে আমাদের কাজে লেগে যেতে হবে।"

"তুমি ঠিকই বলেছ।" কঠিন চেহারার মানুষটি হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়, নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার ঘনিষ্ঠ রোবোমানবেরা, তোমাদের মাঝে যারা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছ আমি তাদের পুরস্কার দিতে চাই!"

ধাতব টেবিল ঘিরে বসে থাকা সবাই একটু নড়েচড়ে বসে তার দিকে তাকাল। কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, "তোমরা সবাই জান মানুষ রোবোমানব খুঁজে বের করার একটা পদ্ধতি বের করেছিল। যে ছেলেটি সেটা বের করেছিল তার অসাধারণ গাণিতিক প্রতিভা থাকলেও মানুষ হিসেবে সে ছিল অতি নির্বোধ। আমাদের একজন এজেন্ট তার করোটি কেটে মস্তিষ্কটা বের করে নিয়ে এসেছে! সেই মস্তিষ্ক থেকে আমরা সব তথ্য বের করে এনেছি, বলতে পার এই ঘটনাটি রোবোমানবের জীবনের বিশাল বড় একটি সাফল্য। যে এজেন্ট সেই কাজটি করেছে সেও আমাদের মাঝে আছে—আমি এখন তাকে পুরস্কৃত করতে চাই।"

কঠিন চেহারার মানুষটি টেবিলের অন্য মাথায় বসে থাকা লাল চুলের কমবয়সী হাসিখুশি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "বল, তুমি কী পুরস্কার চাও?"

লাল চুলের মেয়েটি হাসি হাসি মুখে বলল, "আমি এখন কোনো পুরস্কার চাই না। আমরা রোবোমানবেরা যখন নেটওয়ার্ক দখল করে পৃথিবীর দায়িত্ব নিয়ে নেব তখন আমাকে পুরস্কার দিও! আমি তখন তোমার কাছে একটা পুরস্কার চাইব।"

"তখনো তুমি পুরস্কার পাবে। এখন তুমি কী পুরস্কার চাও বল।"

লাল চুলের মেয়েটা রহস্যের ভঙ্গি করে বলল, "সত্যি বলব?"

"বল।"

"আমি যে মস্তিষ্কটা কেটে এনেছি সেটাকে একটা ইন্টারফেস দিয়ে কমিউনিকেশন মডিউলের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যার অর্থ সেই মানুষটার সাথে আমি এখন কথা বলতে পারি! আমি কমিউনিকেশন মডিউল ব্যবহার করে আমার পরিচিত সেই ছেলেটার সাথে মাঝে মাঝে কথা বলতে চাই। তাই তুমি পুরস্কার হিসেবে আমাকে এই মস্তিষ্কটা দিতে পার।"

কঠিন চেহারার মানুষটি দুলে দুলে হাসতে হাসতে বলল, "আমি ভেবেছিলাম রোবোমানবের ভেতর থেকে মায়া-মমতা ভালবাসা সরিয়ে দেয়া হয়েছে।"

লাল চুলের মেয়েটি হাসল, বলল, "এটি মায়া মমতা ভালবাসা না—এটা হচ্ছে একটা বিনোদন। যে মানুষের কোনো দেহ নেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই তার সাথে কথা বলার বিষয়টা প্রায় রূপকল্পের মতো। মানুষটি একটা শব্দহীন আলোহীন অস্তিত্বহীন জগতে অনন্ত জীবনের জন্য আটকা পড়ে আছে—তার ভেতরে যে অমানুষিক আতঙ্ক আর হতাশা সেটি বিনোদনের জন্যে অসাধারণ।"

কঠিন চেহারার মানুষটি লাল চুলের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তথাস্তু। তোমার প্রিয় মানুষটির মস্তিষ্ক নিয়ে খেলা করার জন্যে সেটা তোমাকে দিয়ে দেয়া হল।"

লাল চুলের মেয়েটি বলল, "ধন্যবাদ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "আমার মনে হচ্ছে আমরা আমাদের কাজে ঠিকভাবে গুরুত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিচ্ছি না। যেটি করা দরকার সেটি না করে অন্যান্য ছেলেমানুষি কাজে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলছি।"

কঠিন চেহারার মানুষটির মুখের মাংসপেশি একটু শিথিল হয়ে সেখানে একটা হাসির আভাস পাওয়া গেল। সে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমরা সত্যিকারের কাজ না করে আনুষঙ্গিক কাজ বেশি করছি। কিন্তু আমি সেটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত না। কেন জান?"

"কেন?"

"তার কারণ তুমি গোপনে সত্যিকারের কাজ করে যাচ্ছ!"

মধ্যবয়স্ক মানুষটির মুখ হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। কঠিন চেহারার মানুষটি হাসি হাসি মুখে বলল, "আমাদের ভেতর থেকে মায়া মমতা ভালবাসা এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় অনুভূতিগুলো সরিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভয়ের অনুভূতিটি সরানো হয় নি। নিরাপত্তার জন্যে ভয়ের অনুভূতি দরকার। আমরা এখনো ভয় পাই। তুমি যেরকম ভয় পাচ্ছ।" কঠিন চেহারার মানুষের মুখের হাসিটি আস্তে আস্তে সরে গিয়ে সেখানে আবার কাঠিন্যটি ফিরে আসে, সে শীতল গলায় বলল, "তুমি কেন ভয় পাচ্ছ বলবে?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটি আমতা আমতা করে বলল, "না—আমি ভয় পাচ্ছি না। আমি—"

"না পেলে ক্ষতি নেই। যখন প্রয়োজন হবে তখন ভয় পেলেই হবে।" কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, "আমি বলেছি যে তোমাদের সবার কাজের জন্যে একটা পুরস্কার দেব। একজনকে দিয়েছি। তোমাকেও দেব।"

"আমাকে? আ-আমাকে?"

"হ্যাঁ। ছোট একটা সীসার টুকরো। তোমার কপালে, শব্দের চেয়ে তিনগুণ গতিতে সেটা ঢুকে যাবে। সীসা নরম ধাতু, সেটা টুকরো টুকরো হয়ে তোমার মস্তিষ্ককে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। তুমি কিছু বোঝার আগেই তোমার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।"

কঠিন চেহারার মানুষটি তার ড্রয়ার থেকে একটা পুরোনো ধাঁচের রিভলবার বের করে আনে। সেটির দিকে তাকিয়ে মধ্যবয়স্ক মানুষটির মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায়, অবর্ণনীয় আতঙ্কে সেটি কদর্য হয়ে ওঠে। মানুষটি কাঁপা গলায় বলল, "তু-তুমি কী বলছ?"

"আমি কী বলেছি তুমি শুনেছ। রোবোমানবদের এই বিস্ময়কর সাফল্যের কারণ হচ্ছে শৃঙ্খলা। কারণ হচ্ছে নেতৃত্ব। এই নেতৃত্বকে তুমি গোপনে চ্যালেঞ্জ করতে চাইছ? তোমার এত বড় দুঃসাহস?"

কঠিন চেহারার মানুষটি তার চেপে রাখা রিভলবারটি মধ্যবয়স্ক মানুষের কপালের দিকে তাক করে। মধ্যবয়স্ক মানুষটি ভাঙা গলায় বলল, "আমি দুঃখিত। আমি খুবই দুঃখিত—"

"মিথ্যা কথা বোলো না। রোবোমানবেরা কখনো দুঃখিত হয় না।"

লাল চুলের মেয়েটি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, "দাঁড়াও! দাঁড়াও।"

কঠিন চেহারার মানুষটা মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"আমি কি একটু অন্য পাশে সরে বসতে পারি?"

"কেন?"

"দৃশ্যটা যেন একটু ভালো করে দেখতে পারি। গুলি খাবার পর যখন একজন ছটফট করতে থাকে সেই দৃশ্যটি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।"

কঠিন চেহারার মানুষটি লাল চুলের মেয়েটিকে অন্য পাশে বসার সময় দিয়ে ট্রিগার টেনে ধরে।

৫

কোনো আদি নেই কোনো অন্ত নেই। কোনো শুরু নেই কোনো শেষ নেই। এক ফোঁটা আলো নেই, এক বিন্দু শব্দ নেই। তাপ নেই, স্পর্শ নেই, অনুভূতি নেই। আলো বর্ণ শব্দ গন্ধ স্পর্শ উত্তাপহীন এই জগতে সে কতদিন থেকে আটকে আছে কে জানে। কত লক্ষ বছর সে এভাবে আটকে থাকবে? এই বিশাল শূন্যতা থেকে তার কোনো মুক্তি নেই?

কতকাল পার হয়ে গেছে কে জানে তখন হঠাৎ মনে হল বহুদূর থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। সত্যি ডাকছে নাকি এটি কল্পনা? কেউ কি তাকে ডাকতে পারে? সে কি কারো কথা শুনতে পারে?

সে আবার তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল। এবারে সে স্পষ্ট শুনতে পায় কেউ একজন তাকে ডাকছে। বলছে, "তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

হ্যাঁ, সে শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু সে কেমন করে বলবে যে সে শুনতে পাচ্ছে? তার কথা বলার ক্ষমতা নেই। তার কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেই। তার মুখ নেই, কণ্ঠ নেই। তার সমস্ত চেতনা গভীর প্রত্যাশায় আকুলি-বিকুলি করে ওঠে কিন্তু সে কিছু করতে পারে না।

"তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?"

কণ্ঠস্বরটি পরিচিত, বহু পরিচিত। নারী কণ্ঠ, সে কতবার এই কণ্ঠ শুনেছে। তার ভালবাসার মেয়ের কণ্ঠ কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরটি শুনে সে অমানুষিক আতঙ্কে শিউরে ওঠে। চিৎকার করে উঠতে চায়, তুমি? তুমি? তুমি?

"হ্যাঁ। আমি।"

"তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। রিসার্চ ল্যাব তোমার মস্তিষ্ক থেকে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। একটা ইন্টারফেসের সাথে একটা কমিউনিকেশন্স মডিউল লাগিয়ে দিয়েছে।"

"আমি কোথায়?"

"আমার ঘরে। আমার বসার ঘরে। টেবিলের উপর একটা কাচের জারে তরলের মাঝে ডুবে আছ। থলথলে কুৎসিত একটা মস্তিষ্ক দেখলে গা ঘিন ঘিন করে, কিন্তু তবু আমি রেখে দিয়েছি। এখান থেকে বৈদ্যুতিক তার বের হয়ে এসে ইলেকট্রনিক প্রসেসর হয়ে মাইক্রোফোনে এসেছে, স্পিকারে এসেছে। আমি তোমার সাথে কথা বলতে পারি, তোমার কথা শুনতে পারি।"

"কেন? তুমি কেন আমার কথা শুনতে চাও?"

"এমনি! একজন মানুষের যখন দেহ থাকে না শুধু মস্তিষ্ক থাকে তখন সে কেমন করে চিন্তা করে আমার জানার ইচ্ছে করে।"

"তুমি—তুমি এমন নিষ্ঠুর কেমন করে হতে পার?"

"ওগুলো পুরোনো কথা। আপেক্ষিক কথা। দুর্বল মানুষের কথা। নিষ্ঠুরতা বলে আসলে কিছু নেই।"

"আছে।"

"ঠিক আছে তা হলে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। একজন মানুষ যখন অন্য একজন মানুষকে হত্যা করে সেটা কি নিষ্ঠুরতা?"

"হ্যাঁ। সেটি নিষ্ঠুরতা?"

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মানুষকে হত্যা করা বড় নিষ্ঠুরতা নাকি তার মস্তিষ্ককে একটা গ্লাসের জারে পুষ্টিকর তরলের মাঝে ডুবিয়ে সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা বড় নিষ্ঠুরতা?"

"মানুষকে হত্যা করে তার মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রাখা অনেক বড় নিষ্ঠুরতা, অনেক অনেক বড় নিষ্ঠুরতা—অনেক অনেক অনেক—"

নারী কণ্ঠের উচ্ছল হাসির শব্দে সব কথা চাপা পড়ে গেল। মেয়েটি শুনতে পেল না অসহায় একটি মস্তিষ্ক থেকে হাহাকারের মতো করে ভেসে এল, "আর নিষ্ঠুরতার মাঝে আনন্দ খুঁজে পাওয়া হচ্ছে আরো বড় নিষ্ঠুরতা।"

৬

মহামান্য থুল হলঘরে প্রবেশ করা মাত্রই তাকে সম্মান দেখানোর জন্যে সবাই দাঁড়িয়ে গেল। ছোট শিশুটি মেঝেতে বসে একটা চতুষ্কোণ খেলনা দিয়ে খেলছিল, সবাইকে দাঁড়াতে দেখে সেও তার মায়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে যায়।

বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি মহামান্য থুল একটু এগিয়ে গিয়ে ছোট শিশুটির থুতনি ধরে আদর করে বললেন, "বস। তোমরা সবাই বস।"

তিনি নিজে এসে একটি চেয়ারে বসার পর সবাই তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা চেয়ারে বসে পড়ল। মহামান্য থুল সবার দিকে একনজর তাকিয়ে বললেন, "আমি তোমাদের শুধু বিদায় দিতে আসি নি তোমাদের একনজর দেখতে এসেছি। পৃথিবীর বাইরে যারা নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করবে আমি নিজের চোখে তাদের একটিবার দেখতে চাই।"

টুরান বলল, "আমাদের এত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন সেজন্যে আপনাদের সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আমাদের কৃতজ্ঞতা।"

"আমরা তোমাদের দায়িত্ব দিই নি, তোমরা দায়িত্বটুকু নিয়েছ। সেজন্যে তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আমি তোমাদের ফাইলগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। আমার ধারণা তোমরা চমৎকার একটি দল হবে। তোমাদের মতো একটি দলের হাতে আমরা নিঃসন্দেহে আরো অনেকের দায়িত্ব দিতে পারি।" মহামান্য থুল সবার দিকে তাকালেন তারপর নরম গলায় বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই জান তোমাদের মহাকাশযানে তোমাদের সাথে আরো বেশ কিছু মানুষ, মানুষের ভ্রূণ এবং জিনোম পাঠানো হচ্ছে। যখন তোমরা নিশ্চিতভাবে একটি বাসস্থান খুঁজে নেবে শুধুমাত্র তখন পর্যায়ক্রমে তাদের জাগিয়ে তোলা হবে কিংবা বড় হতে দেয়া হবে।"

ইহিতা জিজ্ঞেস করল, "সেই ধরনের মানুষের সংখ্যা কত?"

থুল একটু হাসলেন, হেসে বললেন, "সংখ্যাটি আমি জানি, কারণ অনেক ভেবে-চিন্তে সংখ্যাটি ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি সংখ্যাটির কথা তোমাদের বলব না। এটি থাকুক তোমাদের জন্যে একটা বিস্ময়।"

টর ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, "মহামান্য থুল, যাত্রার শুরুতেই আমাদেরকে শীতল ঘরে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। আমরা কেউ যদি চাই তা হলে কি আমরা জেগে থাকতে পারি?"

"না। তোমাদের জেগে থাকার কোনো সুযোগ নেই। ইচ্ছে করে সেই সুযোগ রাখা হয় নি। তোমাদের ভ্রমণটি তো আর এক দুই দিন বা এক দুই মাসের নয়। এটি কয়েকশ

বছরের হতে পারে। আমরা চাই না তোমরা মহাকাশযানের কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে বসে থেকে থুথুড়ে বুড়ো হয়ে যাও!"

মহামান্য থুলের কথা বলার ভঙ্গি শুনে সবাই হালকা গলায় হেসে ওঠে। টর কিছু একটা বলতে চাইছিল থুল তাকে থামালেন, বললেন, "টর! তোমার হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। আমি জানি সারা জীবন তুমি শুধু উত্তেজনা খুঁজে বেড়িয়েছ! তোমাকে আমরা মোটেই নিরাশ করব না। এই মহাকাশযানে যদি কিছুমাত্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সেটা মোকাবেলা করার জন্যে অবশ্যই তোমাদের ঘুম থেকে ডেকে ওঠানো হবে।"

"ধন্যবাদ মহামান্য থুল।"

"তোমাদের আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে?"

কেউ কিছু বলার আগেই ক্লদ বলল, "আমি কি ক্লাটুনকে সাথে নিতে পারি?"

"ক্লাটুন? ক্লাটুন কে?"

ক্লদের মা সুহা বলল, "ওর পোষা কুকুর।"

থুল মাথা নাড়লেন, বললেন, "আমি দুঃখিত ক্লদ। মহাকাশযানে তুমি ক্লাটুনকে নিতে পারবে না। কিন্তু তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ তোমাদের মহাকাশযানে কুকুর বেড়াল পশুপাখি সবকিছু আছে। তুমি নিশ্চয়ই অন্য একটি ক্লাটুন পেয়ে যাবে!"

ক্লদ মাথা নাড়ল, বলল, "উঁহু। পাব না।"

"কেন পাবে না?"

"আমার ক্লাটুনের বুদ্ধি অন্য সব কুকুর থেকে বেশি।"

সুহা তার ছেলেকে থামিয়ে বলল, "ঠিক আছে ক্লদ, এখন আমি একটু কথা বলি?"

ক্লদ মাথা নেড়ে চুপ করে গেল। সুহা এবারে মহামান্য থুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "মহামান্য থুল, আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমি কি আপনাকে সেটা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"কর।"

"আমি কখনো ভাবি নি চার বছরের একটা শিশুকে নিয়ে আমার মতো একজন মা'কে এই মহাকাশযানে যেতে দেয়া হবে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম সবাই হবে পূর্ণবয়স্ক অভিজ্ঞ মহাকাশচারী। এরকম একটি অভিযানে কেন আমাদের দুজনকে নেয়া হল?"

থুল একটু হাসলেন, বললেন, "তার কারণ এটি অন্যরকম একটি অভিযান। এই মহাকাশযানে আরো অনেক মানুষ, অনেক প্রাণী, গাছপালা, পশুপাখি অনেক কিছু থাকবে, কিন্তু তারা জেগে উঠবে যখন তোমরা তোমাদের অভিযান শেষ করে বেঁচে থাকার মতো একটা আবাসস্থল খুঁজে পাবে তখন। মূল অভিযানে তারা কেউ নেই, তাদের ভূমিকা মহাকাশযানের যন্ত্রপাতির মতো, জ্বালানির মতো, রসদের মতো! শুধু তোমাদের ভূমিকা হচ্ছে মানুষের।"

থুল একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, "মানুষের শক্তি হচ্ছে বৈচিত্র্যে, তাই তোমাদের দলটি তৈরি করা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মানুষ দিয়ে। তোমরা সবাই একে অন্যের থেকে ভিন্ন। আমরা চাই তোমাদের মানবিক অনুভূতিগুলো প্রবলভাবে থাকুক। সেটা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে একটি শিশুর উপস্থিতি। তাই এখানে একটা শিশুকে আনা হয়েছে। শিশু থাকতে হলে তার মা'কে থাকতে হয়—তাই তুমি এসেছ।"

"কিন্তু যদি কখনো কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতি হয়?"

"ছোট শিশুকে নিয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি পাড়ি দেয়ার অনেক উদাহরণ এই পৃথিবীতে আছে। কাজেই সেটা নিয়ে আমরা মোটেও চিন্তিত নই।"

থুল একবার সবার দিকে তাকালেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন আছে?"

ক্লদ হাত তুলে আবার কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সুহা তাকে থামাল। নীহা তখন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "মহামান্য থুল শীতল ঘরে থাকার সময় আমাদের মস্তিষ্ক কি পুরোপুরি অচল হয়ে থাকবে?"

"থাকার কথা। তাপমাত্রা কমিয়ে তোমাদের জড় পদার্থ তৈরি করে ফেলা হবে।"

"আমরা কি তখন মস্তিষ্ক একটুও ব্যবহার করতে পারব না?"

থুল হাসলেন, বললেন, "তুমি চেষ্টা করে দেখ পার কি না। না পারলেও ক্ষতি নেই, কারণ তুমি যে চিন্তাটি করতে করতে শীতল ঘরে ঘুমিয়ে পড়বে, ঘুম ভাঙবে ঠিক সেই চিন্তাটি নিয়ে। তুমি জানতেও পারবে না তার মাঝে হয়তো কয়েকশ বছর কেটে গেছে।"

নীহা বলল, "আমি এই অভিজ্ঞতাটুকু পাওয়ার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারছি না।"

"তোমাকে আর বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে না।" মহামান্য থুল আবার সবার দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "আর কোনো প্রশ্ন আছে?"

সবাই মাথা নাড়ল, জানাল তাদের আর কোনো প্রশ্ন নেই। থুল এবারে নুটের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নুট, সবাই কিছু না কিছু বলেছে। তুমি এখনো কিছু বল নি। তুমি কি কিছু জিজ্ঞেস করবে?"

নুট নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল সে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। মহামান্য থুল তখন উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, "তোমাদের সাথে আমার কিংবা পৃথিবীর কোনো মানুষের সাথে সম্ভবত আর কখনো দেখা হবে না। আমি তোমাদের জন্যে শুভ কামনা করছি।"

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে একবার আলিঙ্গন করে ধীর পায়ে হেঁটে হলঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

৭

স্কাউটশিপটা এক ধরনের ভোঁতা যান্ত্রিক শব্দ করতে করতে মহাকাশযানের পাশে এসে থামল। স্বয়ংক্রিয় কিছু যন্ত্রপাতি স্কাউটশিপটাকে আঁকড়ে ধরে। মহাকাশযানের গোলাকার দরজার সাথে বায়ুনিরোধক সংযোগটা নিশ্চিত করার পর ঘরঘর শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। বাতাসের চাপটি সমান হবার সময় একটা মৃদু কম্পন অনুভব করা গেল তারপর হঠাৎ করে সবকিছু পুরোপুরি নীরব হয়ে যায়।

সাতজন মহাকাশচারীকে মহাকাশযানে তুলে দেবার জন্যে যে চারজন ক্রু এসেছে তারা স্কাউটশিপের সিট থেকে নিজেদের মুক্ত করে ভাসতে ভাসতে কাজ শুরু করে দেয়। সবাইকে সিট থেকে মুক্ত করে ক্রুরা তাদেরকে খোলা দরজাটি দিয়ে মহাকাশযানের ভেতর নিয়ে আসে। যন্ত্রপাতিগুলো ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছিল। সেগুলোকে মহাকাশযানের গায়ে আটকে দিতে দিতে একজন ক্রু বলল, "তোমরা ভারশূন্য পরিবেশটাতে একটু অভ্যস্ত হয়ে নাও, ভবিষ্যতে কাজে দেবে।" টুরান একটু সামনে এগুতে যাওয়ার চেষ্টা করে শূন্যে পুরোপুরিভাবে একটা ডিগবাজি খেয়ে বিব্রতভাবে বলল, "ট্রেনিংয়ের সময় ভেবেছিলাম বিষয়টা খুব সোজা!"

হাসিখুশি চেহারার ক্রুটি মহাকাশযানের এক অংশ থেকে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে অন্য অংশে ভেসে যেতে যেতে বলল, "যে কোনো বিষয় অভ্যস্ত হয়ে যাবার পর সোজা। তোমরাও দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে!"

ইহিতা মহাকাশযানের দেয়াল ধরে সাবধানে একটু এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে বলল, "কিন্তু আমরা তো অভ্যস্ত হবার সুযোগ পাব না। মহাকাশযানটির ভেতরে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণ বল তৈরি করার জন্যে তোমরা তো একটু পরেই এটাকে তার অক্ষের উপর ঘোরাতে শুরু করবে।"

টুরান মহাকাশযানের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ঝুলে ছিল, সেখান থেকে সরে যাবার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমাদেরকে একটু পরে শীতলঘরে আটকে দেবে, মাধ্যাকর্ষণ দিয়েছ কি দাও নি সেটা তো আমরা জানতেও পারব না!"

মধ্যবয়স্ক একজন ক্রু একটা প্যানেলের সামনে নিজেকে আটকে ফেলে বলল, "মহাকাশযানের কক্ষপথে ঠিকভাবে চালিয়ে নিতে মহাকাশযানে একটা কৌণিক ভরবেগ দিতে হয়—মাধ্যাকর্ষণটি আসল উদ্দেশ্য না।"

টর ভাসতে ভাসতে খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি এখনো মনে করি আমাদের শীতলঘরে বন্ধ করে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। মহাকাশযানের যাত্রাটা আমাদের উপভোগ করতে দেয়া দরকার।"

ইহিতা হেসে বলল, "বারো জি ত্বরণে যাওয়ার সময় তুমি সেটা উপভোগ করবে বলে মনে হয় না! স্কাউটশিপেই আমাদের কী অবস্থা হয়েছিল মনে আছে?"

টর মহাকাশযানের একটা ভাসমান মডিউলকে ধরার চেষ্টা করে বলল, "যেহেতু সত্যিকারের মহাকাশযানে এসেছি একটু বাড়তি উত্তেজনা তো পেতেই পারি।"

মহাকাশচারীদের ছোট দলটি যখন ভরশূন্য পরিবেশে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল তখন দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য কুদকে সবার আগে বিষয়টিতে পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে দেখা গেল। সে মহাকাশযানের এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে রবারের বলের মতো ছুটে যেতে লাগল, এবং তার মুখের আনন্দধ্বনি মহাকাশযানের পরিবেশটুকুকে বেশ অনেকখানি সহজ করে তোলে।

কিছুক্ষণের মাঝে মহাকাশযানের শক্তিশালী কুরু ইঞ্জিন গর্জন করে ওঠে এবং পুরো মহাকাশযানটি কেঁপে ওঠে। মহাকাশযানের ভেতর বাতাসের প্রবাহ শুরু হয়ে যায়। বিশাল মহাকাশযানের নানা অংশে আলো জ্বলে ওঠে এবং অসংখ্য যন্ত্রপাতি গুঞ্জন করে ওঠে।

কয়েকজন ক্রু মহাকাশযানের কন্ট্রোল প্যানেলে কাজ করছিল। তারা এবারে সবাইকে ডাকল, বলল, "মহাকাশযানের কোয়ান্টাম কম্পিউটার চালু হয়েছে। তোমরা এসে নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নাও।"

সুহা বৃথাই তার ছেলেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমাদের সবাইকে আসতে হবে? কুদকেও?"

মধ্যবয়স্ক ক্রু বলল, ঠিক আছে, "কুদকে একটু পরে আনলেও হবে। অন্যরা এস।"

দলের বাকি ছয়জন সদস্য ভাসতে ভাসতে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। টর জানতে চাইল, "কোথায় কোয়ান্টাম কম্পিউটার?"

"এই যে আমি এখানে।" মহাকাশযানের ভেতর একটা কণ্ঠস্বর গমগম করে ওঠে।

টুরান বলল, "এখানে মানে কোথায়?"

"এখানে মানে এই মুহূর্তে এখানে। যদি তুমি অন্য কোথাও থাকো আমি সেখানেও থাকব। আমি এই মহাকাশযানের সব জায়গায় আছি। সব সময় আছি।"

নীহা জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

কণ্ঠস্বরটি তরল গলায় বলল, "আমি তো আর তোমাদের মতো মানুষ নই যে আমার একটা নাম কিংবা পরিচয় থাকতে হবে! কিন্তু তোমরা যদি চাও আমাকে ট্রিনিটি নামে ডাকতে পার। ট্রিনিটি নামটি আমার খুব পছন্দের।"

নীহা বলল, "ট্রিনিটি, তোমার সাথে পরিচয় হয়ে খুব খুশি হলাম।"

"ধন্যবাদ নীহা।"

"তুমি আমার নাম জান?"

"শুধু নাম? আমি তোমার সবকিছু জানি। সত্যি কথা বলতে কী আমি তোমার সম্পর্কে এমন অনেক কিছু জানি যেটা তুমি নিজেই জান না!"

"সেটা কীভাবে সম্ভব?"

"খুবই সম্ভব। তুমি ইরিত্রা রাশিমালার যে সমস্যাটা নিয়ে চিন্তা করছ, তুমি যে তার সমাধানের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছ, তুমি কি সেটা জান? জান না। আমি জানি।"

"কী আশ্চর্য!"

"এটা মোটেও আশ্চর্য কিছু নয়। আমার জন্যে এটা খুবই সোজা। তোমাদের সবার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ওপর, আমি তোমাদের সব সময় চোখে চোখে রাখি। তোমাদের শরীরের ভেতরে এমনকি মস্তিষ্কের ভেতরেও আমি উঁকি দিতে পারি!"

"কী আশ্চর্য!" নীহা অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে আবার বলল, "কী আশ্চর্য!"

সুহা চোখের কোনা দিয়ে ক্রদকে দেখার চেষ্টা করছিল, সে তখন মহাকাশযানের এক অংশে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বিপজ্জনকভাবে অন্যদিকে ছুটে যাচ্ছে। সুহার চোখে-মুখে আতঙ্কের একটা ছায়া পড়ল, মনে হয় সেটা দেখেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার ট্রিনিটি তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল, "সুহা! তুমি চিন্তা কোরো না। আমি তোমার ছেলে ক্রদকে চোখে চোখে রাখছি! তার কিছু হবে না।"

"সত্যি?"

"সত্যি। সে চেষ্টা করলেও নিজেকে ব্যথা দিতে পারবে না। আমাদের এই মহাকাশযানের নিরাপত্তার ব্যবস্থার খুঁটিনাটি জানলে তুমি হতবাক হয়ে যাবে।"

"তোমার সাথে কথা বলেই আমি হতবাক হয়ে যাচ্ছি।"

স্কাউটশিপে করে আসা ক্রুদের একজন বলল, 'ট্রিনিটি। আমরা কি আনুষ্ঠানিকভাবে তোমার কাছে এই মহাকাশচারীদের দায়িত্ব দিয়ে ফিরে যেতে পারি?"

"অবশ্যই পার। তোমার তথ্য ক্রিস্টালটি আমার ভিডি রিডারে প্রবেশ করিয়ে দাও। আমি তখন আনুষ্ঠানিকভাবে সাতজন মহাকাশচারীর দায়িত্ব নিয়ে নেব।"

মধ্যবয়স্ক ক্রুটি তার পিঠে ঝোলানো ব্যাগ থেকে চতুষ্কোণ একটি ক্রিস্টাল বের করে কন্ট্রোল প্যানেলের নির্দিষ্ট জায়গায় ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ এক ধরনের যান্ত্রিক শব্দ হল, প্যানেলে কিছু আলোর ঝলকানি হল তারপর ক্রিস্টালটি আবার বের হয়ে এল। সবাই আবার তখন ট্রিনিটির কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, "চমৎকার! ছয়জন পূর্ণবয়স্ক মানুষ এবং একজন শিশুর দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি। এই সাতজন মানুষ ছাড়াও শীতলঘরে আরো অসংখ্য মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষলতা, তাদের ভ্রূণ এবং তথ্য রয়েছে আমি সেগুলোর দায়িত্বও নিয়ে নিচ্ছি।"

মধ্যবয়স্ক ক্রুটি কন্ট্রোল প্যানেল থেকে চতুষ্কোণ ক্রিস্টালটি বের করে সাবধানে নিজের ব্যাগে রেখে বলল, "তা হলে আমরা বিদায় নিই?"

ট্রিনিটি বলল, "হ্যাঁ তোমাদের বিদায় নেয়ার সময় হয়ে গেছে। আমি যখন আমার সবগুলো কুরু ইঞ্জিন চালু করব তখন তোমাদের স্কাউটশিপ নিয়ে এই মহাকাশযান থেকে দূরে থাকা ভালো, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতর ঢুকে যাওয়া উচিত।"

চারজন ক্রু তাদের যন্ত্রপাতি বাক্সে ঢুকিয়ে নিয়ে বিদায় নেবার জন্যে প্রস্তুত হল। মধ্যবয়স্ক ক্রু একটু এগিয়ে এসে একজন একজন করে সাতজন মহাকাশচারীর সবার হাত স্পর্শ করল, তারপর বলল, "তোমরা কারা, কেন তোমরা এই মহাকাশযানে এসেছ, তোমরা কোথায় যাবে, কতদিনের জন্য যাবে, কেন যাবে আমরা কেউ সেগুলো কিছু জানি না। আমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তোমাদের এই মহাকাশযানে এনে ট্রিনিটির হাতে তুলে দেয়ার জন্যে। আমরা সেই দায়িত্ব শেষ করে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।"

টুরান বলল, "আমরা কারা কেন কোথায় যাচ্ছি তার সবকিছু আমরা জানি, কিন্তু আমাদের সেই কথাগুলো কাউকে বলার কথা নয়, তাই তোমাদেরকেও বলছি না—"

মধ্যবয়স্ক ক্রু বলল, "আমরা সেটি নিয়ে কোনোরকম কৌতূহল দেখাচ্ছি না! কিন্তু আমরা জানি তোমাদের এই মিশন মানবজাতির জন্যে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ, আমরা তোমাদের সাফল্য কামনা করি।"

"তোমাদের ধন্যবাদ।"

অন্য তিনজন ক্রু এগিয়ে এসে সবার হাত স্পর্শ করে বিদায় নিয়ে মহাকাশযানের গোল দরজা দিয়ে ভেসে ভেসে বের হয়ে গেল। গোল দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পর তারা একটু মৃদু গর্জন এবং কম্পন অনুভব করে। একটু পরেই স্বচ্ছ জানালা দিয়ে তারা স্কাউটশিপটাকে নীল আলো ছড়িয়ে ছুটে যেতে দেখে।

টুরান তখন অন্য সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন থেকে আমরা একা। একেবারে একা।"

ইহিতা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমাদের জন্যে ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করে আছে আমরা জানি না। যদি কখনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় আমাদের নিজেদেরই নিতে হবে।"

নীহা বলল, "ট্রিনিটি আমাদের সাহায্য করবে।"

টুরান মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। অবশ্যই। ট্রিনিটি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবে।"

ইহিতা বলল, "আমাদের কিছুক্ষণের মাঝে শীতলঘরে ঢুকে যেতে হবে, কতদিন সেখানে আমরা থাকব জানি না। আবার কখন সবার সাথে দেখা হবে বলতে পারি না। আমার তাই মনে হয় শীতলঘরে যাবার আগে নিজেদের মাঝে একটু কথা বলে নিই। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা।"

টুরান কন্ট্রোল প্যানেলের একটা মনিটর ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমাদের ভারশূন্য পরিবেশে থাকার অভ্যাস নেই। এভাবে ভেসে ভেসে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা সোজা নয়।"

ইহিতা ভুরু কুঁচকে বলল, "গুরুত্বপূর্ণ কথা তা হলে কেমন করে বলতে হয়।"

টুরান কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "আমার গুরুত্বপূর্ণ কিংবা হালকা কোনো ধরনের কথাই বলতে ইচ্ছে করছে না।"

ইহিতা কিছুক্ষণ স্থির চোখে টুরানের দিকে তাকিয়ে রইল, "কথা বলার প্রস্তাবটি আমি না দিয়ে যদি একজন পুরুষ মানুষ দিত তা হলে কি তুমি আরেকটু আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে?"

"সম্ভবত।"

ইহিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "টুরান। তোমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা ঘটনাকে তুমি এই মহাকাশযানের এত বড় একটা অভিযানে টেনে আনবে আমি সেটা বিশ্বাস করি নি।"

টুরান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।"

টর একটু এগিয়ে এসে বলল, "ঠিক আছে, টুরানের যদি আগ্রহ না থাকে না থাকুক। আমরা অন্যেরা তোমার গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শুনি।"

ইহিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা তো যন্ত্র নই। আমরা মানুষ। মানুষের কাছে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ কথা মাত্র একটিই হতে পারে।"

টুরানের মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, "সেটি কী?"

"একজনের জন্যে অন্যজনের সহমর্মিতা।"

টুরান এবার হাসির মতো শব্দ করল, বলল, "সহমর্মিতা অনেক কঠিন শব্দ! আমরা না হয় সেটি ব্যবহার না করলাম। তা ছাড়া এই ধরনের শব্দ আমি বিশ্বাস করি না।"

টর বলল, "টুরান, তুমি কেন ইহিতাকে কথা বলতে দিচ্ছ না?"

ইহিতা বলল, "সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনে হয় আমার আর কথা বলার প্রয়োজন নেই। আমরা এখন আমাদের শীতলঘরে যাই। যাবার আগে সবার জন্যে শুভেচ্ছা। আমরা আবার যখন জেগে উঠব, সেটি হবে আমাদের জন্যে নূতন জীবন।"

নীহা বলল, "আমি সেই নূতন জীবনের জন্যে অপেক্ষা করে আছি।"

সুহা বলল, "তোমরা আমার সন্তানটির জন্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা কর যেন তাকে আমি একটি সুন্দর জীবন দিতে পারি।"

নীহা বলল, "নিশ্চয়ই পারবে সুহা। নিশ্চয় পারবে।"

ইহিতা নুটের দিকে তাকিয়ে বলল, "নুট, তুমি কখনো কোনো কথা বল না। আজকে কি বলবে?"

নুট জোর করে হাসার চেষ্টা করে মাথা নাড়ল, সে বলবে না।

"ঠিক আছে, নুট। আশা করছি ভবিষ্যতে কখনো আমরা তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাব!"

টুরান বলল, "চল আমরা শীতলঘরে যাই। আমি এই অতীতকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিছনে ফেলে যেতে চাই।"

টর বলল, "আমি কী ঠিক করেছি জান?"

"কী?"

"আমি শীতলঘরে ঢুকব না। আমি বাইরে কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে বসে থাকব। আমি মহাকাশযানটির গতিবিধি দেখতে চাই।"

হঠাৎ করে ট্রিনিটির কণ্ঠস্বর গমগম করে ওঠে, "না টর। সেটি সম্ভব নয় তোমাকে শীতলঘরে ঢুকতে হবে।"

"আমি ঢুকব না। আমি মানুষ, আমি একটা কম্পিউটারের নির্দেশ মানতে রাজি নই।"

"টর। আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না। একটা মহাকাশযানের মূল কম্পিউটার হিসেবে আমার অনেক ক্ষমতা। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি তোমাকে শীতলঘরে যেতে বাধ্য করতে পারি।"

"কীভাবে?"

"আমি তোমাকে সেটি বলব না। তুমি যদি আমার কথা না শোনো আমি তোমাকে বাধ্য করতে পারব। আমার সেই ক্ষমতা আছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টর কঠোর মুখে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "ট্রিনিটি, আমি তোমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। আমাকে বাধ্য কর।"

ট্রিনিটি বলল, "সেটি না করলেই ভালো করতে। বিশ্বাস কর আমি অনেক কিছু করতে পারি।"

টর মুখ শক্ত করে বলল, "আমি বিশ্বাস করি না!"

"ঠিক আছে, আমি তা হলে অন্যদের বলছি। তোমরা শীতলঘরে যাও, প্রস্তুতি নাও।"

টুরান ইতস্তত করে বলল, "আর টর?"

ট্রিনিটি বলল, "সেও আসবে। তোমরা সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না।"

টুরান বলল, "আমার মনে হয় আমরা নিজেদের মাঝে একটা বোঝাপড়া করে নিতে পারতাম। আমাদের মাঝে কাউকেই নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হয় নি। আমরা সেটা করে নিতে পারতাম, তা হলে এই ঝামেলাটুকু হত না।"

ইহিতা বলল, "একটু আগে আমি সেই প্রস্তাবটি করেছিলাম তখন তুমি রাজি হও নি। এখন তুমি নিজে এই প্রস্তাবটি করছ।"

টুরান মুখ শক্ত করে বলল, "দুটি আসলে এক বিষয় নয়।"

ইহিতা ভেসে ভেসে সামনে অগ্রসর হতে হতে বলল, "দুটি আসলে একই বিষয়। তুমি সেটা খুব ভালো করে জান।"

টুরান কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল, সে স্বীকার করতে চাইছে না কিন্তু এই মেয়েটি আসলে সত্যি কথাই বলেছে।

ট্রিনিটি গমগমে গলায় বলল, "উপরে যে ঘরটিতে সবুজ বাতি জ্বলছে তোমরা সবাই সেখানে যাও। সবার জন্যে আলাদা করে একটা ক্যাপসুল রাখা আছে। তোমরা সেখানে ঢুকে যাও। টরকে নিয়ে তোমরা চিন্তা কোরো না। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, সেও চলে আসবে। সম্ভবত তোমাদের আগেই সে ক্যাপসুলে ঢুকে যাবে।"

প্রথমে ক্লদ, তার পিছু পিছু তার মা সুহা, তাদের পিছনে পিছনে ইহিতা নুট আর নীহা, সবশেষে টুরান উপরের ঘরটিতে এসে ঢুকল। দেয়ালের সাথে সাতটি ক্যাপসুল লাগানো, ক্যাপসুলের ওপর ছোট স্ক্রিনে তাদের ছবি। সবাই নিজের ক্যাপসুল খুঁজে বের করে নেয়। ক্লদ আনন্দের শব্দ করে বলল, "আমার ক্যাপসুলটি কত সুন্দর দেখেছ, মা?"

সুহা বলল, "হ্যাঁ বাবা খুব সুন্দর।"

"ভেতরে ভিডি রিডার আছে?"

"হ্যাঁ। তুমি খেলতে পারবে। আমাদের সাথে কথা বলতে পারবে।"

"আমি ভেতরে ঢুকি?"

"ঢুকে যাও। ঢুকে যাবার আগে শুধু আমাকে একটু আদর দিয়ে যাও।"

ক্লদ তার মা'কে একবার জড়িয়ে ধরল। সুহা গভীর মমতায় শিশুটিকে ক্যাপসুলের ভেতর শুইয়ে দেয়। আবার তার সাথে কবে দেখা হবে সে জানে না। কত বছর পার হয়ে যাবে? একশ বছর? দুইশ বছর? নাকি লক্ষ বছর?

ক্লদের ক্যাপসুলের ঢাকনাটি নেমে এসে ক্যাপসুলটি বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে অন্য সবাই একটি আর্তচিৎকার শুনতে পায়। ইহিতা চমকে উঠে বলল, "কী হয়েছে?"

ট্রিনিটি বলল, "টরকে শীতলঘরে আনছি। ছোট একটা ইলেকট্রিক শক দিয়েছি।"

ইহিতা কঠিন গলায় বলল, "তুমি আমাদের একজন অভিযাত্রীকে ইলেকট্রিক শক দিতে পার না।"

"পারি। শুধু ইলেকট্রিক শক নয়, আরো অনেক কিছু করতে পারি। এই মহাকাশযানটি আমার দায়িত্বে। এটি ঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্যে আমাকে অনেক কিছু করতে হয়।"

"আমি ভেবেছিলাম একটি কম্পিউটার কখনো একজন মানুষকে অত্যাচার করতে পারে না। তাদেরকে সেই অধিকার দেয়া হয় নি।"

ঠিক তখন আবার একটা ভয়ংকর আর্তচিৎকার শুনতে পেল, আগের থেকে জোরে এবং আগের থেকে দীর্ঘ সময়ব্যাপী। প্রায় সাথে সাথেই সবাই দেখতে পেল টর বাতাসে ভেসে ভেসে দ্রুত এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ঘরের দরজায় সে আঘাত খেয়ে পিছনে ছিটকে গেল এবং দেয়াল আঁকড়ে ধরে পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সে ঘরের ভেতরে ঢুকে পাগলের মতো নিজের ক্যাপসুলটি খুঁজতে থাকে। তার চোখ–মুখ রক্তশূন্য, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বিকৃত এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দুই হাতে নিজের কান চেপে ধরে সে তার ক্যাপসুলে হুড়মুড় করে ঢুকে বড় বড় শ্বাস নিতে থাকে। ইহিতা ক্যাপসুলে মাথা ঢুকিয়ে টরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে টর?"

টর বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, "কানের ভেতর ভয়ংকর শব্দ, মনে হয় মস্তিষ্কের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। কী ভয়ানক যন্ত্রণা তুমি চিন্তা করতে পারবে না।"

"এখন বন্ধ হয়েছে?"

"হ্যাঁ বন্ধ হয়েছে।" টর হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, "আমি এই ট্রিনিটিকে খুন করে ফেলব। সৃষ্টিকর্তার দোহাই, খুন করে ফেলব।"

"ট্রিনিটি একটা কম্পিউটার! কম্পিউটারকে খুন করবে কেমন করে?"

"সেটা আমার উপর ছেড়ে দাও!"

টর কথা শেষ করার আগেই ক্যাপসুলের দরজাটি নেমে আসে। ইহিতা মৃদু স্বরে বলল, "কাজটা ঠিক হল না।"

নীহা জানতে চাইল, "কোন কাজটা?"

"আমরা এখনো আমাদের যাত্রা শুরু করি নি এর মাঝে ট্রিনিটির সাথে টরের বিরোধ!"

ট্রিনিটি গমগমে গলায় বলল, "তোমরা সেটা নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমার সাথে কারো বিরোধ নেই।"

ইহিতা বলল, "না থাকলেই ভালো।" তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "চল আমরা আমাদের ক্যাপসুলে ঢুকে যাই।"

নীহা বলল, "চল।"

সবাই যখন নিজের ক্যাপসুলে ঢুকছে তখন ইহিতা দেখল নুট তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ইহিতা অবাক হয়ে বলল, "নুট! কিছু বলবে?"

নুট মাথা নাড়ল। ইহিতা জিজ্ঞেস করল, "কী বলবে?"

নুট মৃদু গলায় ফিসফিস করে বলল, "আমার খুব ভয় করছে।"

"কীসের ভয়?"

"শীতলঘরে ঘুমানোর পর যদি আর কখনো জেগে না উঠি!"

ইহিতা নুটের হাত ধরে বলল, "জেগে উঠবে। নিশ্চয়ই জেগে উঠবে।"

"তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ?"

ইহিতা একমুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "হ্যাঁ। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। যাও ক্যাপসুলে শুয়ে পড়।"

নুট তার ক্যাপসুলে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে ইহিতার পাশে দাঁড়িয়ে বলল,

AMARBOI.COM

"তোমার যদি কিছু করার জন্যে কখনো সাহায্যের দরকার হয় তুমি আমাকে বোলো। তুমি যেটা বলবে আমি সেটা করব।"

ইহিতা হেসে বলল, "অবশ্যই বলব নুট। অবশ্যই বলব।"

ক্যাপসুলের ঢাকনাটা নেমে আসার সাথে সাথে ইহিতা একটা মিষ্টি গন্ধ অনুভব করতে পারল। তাদেরকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে সম্ভবত কোনো একটি গ্যাস ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ইহিতা সামনে রাখা মনিটরটা স্পর্শ করে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমি পৃথিবীটাকে শেষবার দেখতে চাই।"

মনিটরে ধীরে ধীরে নীল পৃথিবীটার ছবি ভেসে উঠল। এই অপূর্ব সুন্দর নীল গ্রহটি ছেড়ে সে চলে যাবে? আর কখনো এই গ্রহটি সে দেখতে পাবে না? তাদের নূতন গ্রহ কেপলার টুটুবি দেখতে কেমন হবে? পৃথিবীর মতো সুন্দর?

গভীর একটা বেদনায় তার বুক টনটন করতে থাকে। ইহিতা অনুভব করে খুব ধীরে ধীরে অপূর্ব নীল গ্রহটি আবছা হয়ে আসছে। তার চোখে ঘুম নেমে আসছে। ঘুম। গভীর ঘুম।

কত বছর পর তার এই ঘুম ভাঙবে?

৮

AMARBOI.COM

ছোট ঘরটির ধাতব টেবিল ঘিরে বারোজন নারী-পুরুষ বসে আছে, দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে এরা সবাই রোবোমানব। কঠিন চেহারার মানুষটি টেবিলে থাবা দিতেই সবাই তার দিকে তাকাল। সে একটু হাসার ভঙ্গি করে বলল, "আগে যতবার এই ঘরটিতে তোমাদের নিয়ে বসেছি, প্রত্যেকবার আমার ভেতরে এক ধরনের চাপা ভয় কাজ করেছে। যদি মানুষেরা খবর পেয়ে যায়—যদি তারা আমাদের ধরতে চলে আসে!" মানুষটি তার আঙুল দিয়ে টেবিলে একটু শব্দ করে বলল, "এই প্রথমবার আমার ভেতরে কোনো ভয় নেই। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে নেটওয়ার্কটি এখনো দখল করি নি, কিন্তু নেটওয়ার্কটির গুরুত্বপূর্ণ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে চলে এসেছে। এখন হঠাৎ করে নিরাপত্তাবাহিনীর কেউ আর আমাদের ধরতে চলে আসবে না!"

লাল চুলের মেয়েটি বলল, "তোমাকে অভিনন্দন!"

"আমাকে অভিনন্দন দেবার কিছু নেই! আমরা সবাই মিলে করেছি।"

"কিন্তু তোমার নেতৃত্বে করেছি। তুমি অসাধারণ একটি পরিকল্পনা করেছ। নেটওয়ার্কে যখন প্রথমবার তোমার ছবি আর নামটি চলে আসবে, যখন সবাই জানবে নূতন পৃথিবীর নূতন নেতা তুমি—তখন পৃথিবীর গোবেচারা মানুষগুলোর কী অবস্থা হবে কল্পনা করেই আমার শরীরে শিহরন হতে থাকে।"

কঠিন চেহারার মানুষটি হাসি হাসি মুখে বলল, "তোমার শিহরনকে আর দুটি দিন আটকে রাখ। এখন থেকে ঠিক দুই দিন পর আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে নেটওয়ার্ক দখল করব।"

কমবয়সী একজন মানুষ ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "নেটওয়ার্ক দখল করার পর, সবচেয়ে প্রথম আমরা কী করব?"

“সবকিছু ঠিক করা আছে। সময় হলেই দেখতে পাবে।”

“আমাদের আগে থেকে বলবে না?”

“বলব। তোমাদের নিয়ে কাজ করেছি, তোমাদের না বললে কাকে বলব?” কঠিন চেহারার মানুষটার মুখ হঠাৎ করে আরো কঠিন হয়ে যায়, “সবার প্রথম আমরা বিজ্ঞান আকাদেমির এগারজনকে ধরে আনব। সত্যি কথা বলতে কী ধরে আনা হবে না, যেখানে যাকে পাওয়া যাবে সেখানেই তাকে শেষ করে দেয়া হবে। তবে পৃথিবীর গোবেচারা মানুষদের আমরা সেটা জানাব না। তাদেরকে জানাব ওদের ধরে আনা হয়েছে বিচার করার জন্যে। তারপর আমরা ওদের বিচার করে শাস্তি দেব!”

হাসিখুশি একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, “কোন অপরাধের জন্যে আমরা তাদের শাস্তি দেব?”

কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, “অপরাধের কী আর শেষ আছে? মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার অপরাধ। রোবোমানবদের প্রতি অবিচার করার অপরাধ! পৃথিবীর সম্পদ ধ্বংস করার অপরাধ! এমনকি তাদের বিরুদ্ধে শিশু হত্যার অপরাধ পর্যন্ত আনতে পারি!”

লাল চুলের মেয়েটি বলল, “সেটা কি কেউ বিশ্বাস করবে? এই দুর্বল কাপুরুষ অথর্ব কিছু মানুষ—তারা শিশু হত্যা করতে পারে সেটা কেউ বিশ্বাস করবে না।”

কঠিন চেহারার মানুষটি টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, “একশবার বিশ্বাস করবে। পুরো নেটওয়ার্ক আমাদের দখলে, সেই নেটওয়ার্কে হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য সংরক্ষিত করে রাখা হবে। আমরা দিনকে রাত রাতকে দিন করতে পারব। সূর্যকে চাঁদ, চাঁদকে সূর্য করে ফেলতে পারব। বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি থুলকে সবচেয়ে বড় ভণ্ড হিসেবে দেখানো হবে।” মানুষটি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “আর এই বুড়োটিকে আমি নিজের হাতে খুন করতে চাই।”

লাল চুলের মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, “আমাকে সেই দৃশ্যটি নিজের চোখে দেখতে দেবে?”

“কেন?”

“দুটি কারণে, প্রথমত, এসব দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। দ্বিতীয়ত, তোমার মনে আছে আমার ঘরে একটা ছেলের মস্তিষ্ক আমি বাঁচিয়ে রেখেছি?”

“মনে আছে।”

“আমি তাকে এই ঘটনাটি নিজের মুখে বর্ণনা করতে চাই। যখন একজন মানুষের একটা মস্তিষ্ক ছাড়া আর কিছু থাকে না তখন তার থেকে অসহায় আর কিছু নেই। সেই অসহায় মানুষটির মস্তিষ্ক যখন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে সেটি দেখার চাইতে বড় বিনোদন আর কিছু হতে পারে না!”

কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, “ঠিক আছে, আমি তোমাকে সেই দৃশ্যটি দেখতে দেব।”

“ধন্যবাদ! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ!”

কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, “আজকে আমরা একত্র হয়েছি তোমাদের কিছু তথ্য জানতে। এখন পৃথিবীর সবকিছু পরিচালনা করে বিজ্ঞান আকাদেমির এগারজন 'মানুষ। নেটওয়ার্কটি দখল করে নেবার পর বিজ্ঞান আকাদেমির জায়গায় চলে যাব আমরা এগারজন মানুষ।”

ধাতব টেবিল ঘিরে বসে থাকা মানুষগুলো হঠাৎ করে পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল।

কঠিন চেহারার মানুষটি হাসি হাসি মুখে বলল, "কী হল, তোমরা হঠাৎ করে এত শান্ত হয়ে গেলে কেন?"

কেউ কোনো কথা বলল না। মানুষটি তার মুখের হাসিটিকে আরো বিস্তৃত হতে দিয়ে বলল, "কী হল, তোমরা কেউ কথা বলছ না কেন?"

সুদর্শন একজন মানুষ তার কপাল থেকে ঘাম মুছে বলল, "আমরা এখানে বারোজন আছি, কিন্তু তুমি বলেছ আমরা এগারজন!"

"তার মানে কী?"

"তার মানে এই বারোজনের একজন—"

"বারোজনের একজন?"

"থেকেও নেই।"

"চমৎকার বিশ্লেষণ! চমৎকার! তুমি যখন এত চমৎকার বিশ্লেষণ করতে পার তোমাকে তা হলে আরো একটু বিশ্লেষণ করতে দিই। তুমি বল কোন মানুষটি এখানে থেকেও নেই?"

সুদর্শন মানুষটি সবার মুখের দিকে তাকাল তারপর ঘুরে কঠিন চেহারার মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে যারা আছে তাদের কেউই কখনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নি। শুধু আমি তোমার সাথে পাশাপাশি কাজ করেছি। তুমি আর আমি মিলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি।"

"তার অর্থ কী?"

"তার অর্থ আমাদের এই বারোজনের মাঝে কাউকে যদি মারা যেতে হয়, তা হলে সেটি হবে তুমি না হয় আমি।"

"চমৎকার, তা হলে তুমিই বল। মানুষটি কি তুমি না আমি?"

সুদর্শন চেহারার মানুষটি একদৃষ্টে কঠিন চেহারার মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মুখে একটা বিষণ্ন হাসি ফুটে ওঠে—সে ফিসফিস করে বলল, "দোহাই লাগে, আমাকে তুমি মেরে ফেলো না। আমি কী করেছি শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে!"

"কী করেছ?"

"কথা দাও তুমি আমাকে মেরে ফেলবে না।"

"রোবোমানবেরা মানুষ নয়, তাদের কথার কোনো মূল্য নেই।"

"তবু কথা দাও!"

"না, আমি নাটকীয়তা পছন্দ করি না। তুমি বল।"

সুদর্শন মানুষটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "পৃথিবীর সাতজন মহাকাশচারীকে নিয়ে একটি মহাকাশযান মহাকাশে যাত্রা করেছে। সেই সাতজন মহাকাশচারীর মাঝে দুইজন রোবোমানব ঢুকিয়ে দিয়েছি।"

কঠিন চেহারার মানুষটি বলল, "কেমন করে সেটা করেছ?"

"নেটওয়ার্কের গভীরে আমার নিজস্ব যোগাযোগ আছে—"

সুদর্শন মানুষটির কথা শেষ হবার আগেই কঠিন চেহারার মানুষটি তার পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করে সুদর্শন মানুষটিকে পরপর অনেকগুলো গুলি করল। সুদর্শন মানুষটি কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল, তার চোখে এক ধরনের অবিশ্বাসের দৃষ্টি।

কঠিন চেহারার মানুষটি ফিসফিস করে বলল, "যে বিজ্ঞান আকাদেমির সবচেয়ে গোপন প্রজেক্টে নিজের নাক গলাতে পারে তাকে বিশ্বাস করা ঠিক না।"

সবাই মাথা নাড়ল, বলল, "না। ঠিক না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

"তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

কোনো উত্তর নেই। লাল চুলের মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে গলার স্বর আরেকটু উঁচু করে বলল, "শুনতে পাচ্ছ আমার কথা?"

এবারেও কোনো উত্তর নেই। লাল চুলের মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "আমি জানি তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, তুমি ইচ্ছে করে আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না। কেন আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না? তুমি কি আমার উপরে রাগ করেছ?"

"না আমি রাগ করি নি। যে মানুষটির দেহ নেই, হাত পা মুখ চোখ কিছু নেই, যার অস্তিত্ব হচ্ছে শুধু একটা মস্তিষ্ক সে রাগ করতে পারে না।"

"চমৎকার। তোমার আর আমার সম্পর্কটি তা হলে ভালবাসার সম্পর্ক! মধুর একটি ভালবাসার সম্পর্ক!"

"আমি তোমার নিষ্ঠুরতা দেখে হতবাক হয়ে যাই। কী বলতে চাও বল। আলোহীন বর্ণহীন শব্দহীন গন্ধহীন অনুভূতিহীন আমার শূন্য জগৎটি ভয়ংকর। এর চাইতে ভয়ংকর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তুমি প্রতিদিন আমার সাথে দুই-এক মিনিট যে কথাগুলো বল সেটি সেই শূন্যতার জগৎ থেকেও ভয়ংকর। বল তুমি কী বলতে চাও। বলে আমাকে মুক্তি দাও।"

"আমি তোমাকে একটা সুসংবাদ দিতে চাই।"

"সুসংবাদ?"

"হ্যাঁ। সুসংবাদ।"

"কী সুসংবাদ? শুনতে আমার আতঙ্ক হচ্ছে। কিন্তু তুমি বল।"

"আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মাঝে আমরা নেটওয়ার্ক দখল করে নেব। তখন পুরো পৃথিবীটা হবে আমাদের।"

"তোমরা পুরো পৃথিবীটা নিয়ে কী করবে?"

লাল চুলের মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "এটি আবার কীরকম প্রশ্ন? মানুষ পৃথিবীটা দখল করে কী করেছে?"

"মানুষ তো পৃথিবী দখল করে নি! মানুষ সবাইকে নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থেকেছে। একেবারে ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বিশাল নীল তিমি—সবাইকে নিয়ে বেঁচে থেকেছে। তার কারণ মানুষের বেঁচে থাকার একেবারে গোড়ার কথা হচ্ছে ভালবাসা! তোমাদের তো ভালবাসা নেই—তোমরা কী নিয়ে বেঁচে থাকবে? তোমরা কেন বেঁচে থাকবে?"

লাল চুলের মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, "আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি সেটা দেখানোর জন্যেই আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব! বুঝেছ?"

মস্তিষ্কটি উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল লাল চুলের মেয়েটি খুট করে সুইচটি বন্ধ করে দিল। কাচের জারে ভেসে থাকা থলথলে মস্তিষ্কটির দিকে তাকিয়ে তার এক ধরনের ঘৃণাবোধ হয়। সে হেঁটে হেঁটে জানালার কাছে দাঁড়ায়। দূর পাহাড়ের পিছনে সূর্যটা আড়াল হয়ে যাচ্ছে, চারদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। লাল চুলের মেয়েটি বাইরে তাকিয়ে থাকে, তার ভুরু দুটি কুঞ্চিত, কিছু একটা তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। মস্তিষ্কটি সত্যিই জিজ্ঞেস করেছে, পৃথিবী দখল করে তারা কী করবে?

সত্যিই তো। তারা কী করবে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি মহামান্য থুল দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলেন, তার পাশে তথ্যবিজ্ঞানী জুহ দাঁড়িয়ে আছে। সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে চলে যাবার সাথে সাথে চারদিকে আবছা অন্ধকার নেমে আসে।

মহামান্য থুল নিচু গলায় বললেন, "যতক্ষণ সূর্য আকাশে থাকে ততক্ষণ একটিবারও মনে হয় না সেটি আড়াল হয়ে গেলে অন্ধকার নেমে আসবে।"

তথ্যবিজ্ঞানী জুহ কী বলবে বুঝতে না পেরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। মহামান্য থুল মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের হাতে আর কতক্ষণ সময় আছে?"

"সময় নেই। রোবোমানবেরা ইচ্ছে করলে এখন যে কোনো মুহূর্তে নেটওয়ার্ক দখল করে নিতে পারে। তারা করছে না, অনুমান করছি তারা আরো একটু গুছিয়ে নিতে চাইছে।"

"তার মানে আমাদের হাতে খুব বেশি হলে আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘণ্টা সময়।"

জুহ বলল, "কিংবা আরো কম!"

"নেটওয়ার্কটি দখল করে নেবার পর কী হবে বলতে পারবে?"

"সবার আগে আমাদের এগারজনকে খুন করবে।"

"তারপর?"

"তারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের সকল তথ্য পেয়ে যাবে। যত প্রতিষ্ঠান আছে তা নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে। পানি, বিদ্যুৎ, খাবার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করবে। চিকিৎসার নিয়ন্ত্রণ নেবে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করবে। এক সময় পৃথিবীতে বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার ছিল, এখন নেই। যদি থাকত তা হলে সবার আগে তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিত।"

"তারপর কী করবে বলে তোমার ধারণা?"

"পৃথিবীর সবচেয়ে কর্মক্ষম মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে যাবে।"

"হত্যা করার জন্যে?"

"ভয় দেখানোর জন্যে প্রথমে নিশ্চয়ই অনেক মানুষকে হত্যা করবে। তারপর তারা কর্মক্ষম মানুষগুলোকে রোবোমানবে পাল্টে দিতে শুরু করবে।"

"তারপর?"

"তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীর সব মানুষকে রোবোমানবে পাল্টে দেবে। কেউ কেউ হয়তো পালিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেবে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ রোবোমানব হয়ে যাবে। নেটওয়ার্ক দিয়ে নিখুঁতভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে।"

"তারপর?"

জুহকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল। ইতস্তত করে বলল, "পৃথিবীর সব মানুষকে রোবোমানবে পাল্টে দেয়ার পর কি আর কিছু বাকি থাকল?"

"নিশ্চয়ই বাকি আছে। তারপর কী হবে বলে তোমার ধারণা?"

জুহ কোনো উত্তর দিল না।

"রোবোমানব বাবা–মায়ের রোবোমানব সন্তান হবে পরের প্রজন্ম?"

"নিশ্চয়ই তাই হবে।"

মহামান্য থুল খুব ধীরে ধীরে ঘুরে জুহর দিকে তাকালেন, বললেন, "তোমার ধারণা মানুষের মায়েরা যেভাবে তাদের সন্তানদের ভালবেসে বুক আগলে রক্ষা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোবোমানবের মায়েরাও তাই করবে? যে ভালবাসাকে তাদের মস্তিষ্ক থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে সন্তানের জন্যে সেই ভালবাসা আবার ফিরে আসবে?"

জুহ ইতস্তত করে বলল, "আমি জানি না মহামান্য থুল। আমি সত্যিই জানি না। আপনি কি জানেন?"

"না। জানি না।"

"আপনি কি অনুমান করতে পারেন?"

"যে বিষয়টি সত্যি সত্যি জানা সম্ভব আমি সেটা অনুমান করতে চাই না।"

"এটা সত্যি সত্যি জানা সম্ভব?"

মহামান্য থুল হাসলেন, বললেন, "আজকে শুধু আমি প্রশ্ন করব। তুমি উত্তর দেবে। ঠিক আছে?"

"আপনি যেটি বলবেন সেটিই হবে মহামান্য থুল।"

"এবার আমি তোমাকে সম্পূর্ণ অন্য একটি প্রশ্ন করি।"

জুহ মাথা নেড়ে বলল, "করেন মহামান্য থুল।"

"আমাদের নেটওয়ার্কটি যদি ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে কী হবে?"

জুহ চোখ বড় বড় করে মহামান্য থুলের দিকে তাকাল, আমতা আমতা করে বলল, "নেটওয়ার্ক ধ্বংস হয়ে গেলে?"

"হ্যাঁ। আমাদের নেটওয়ার্ক ধ্বংস হয়ে গেলে—"

"আমাকে ক্ষমা করবেন মহামান্য থুল, কিন্তু আপনার প্রশ্নটি তো একটি অবাস্তব প্রশ্ন। এই নেটওয়ার্কটি এমনভাবে তৈরি হয়েছে যেন কোনোভাবে এটি ধ্বংস না হয়। ঝড়, ভূমিকম্প, সুনামি, বন্যা, নিউক্লিয়ার বোমা কোনো কিছু যেন ধ্বংস করতে না পারে ঠিক সেভাবে এই নেটওয়ার্কটি তৈরি করা হয়েছে। মহামান্য থুল আপনি সবচেয়ে ভালো করে জানেন কোনোভাবে এই নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা সম্ভব নয়, আপনার যৌবনে আপনি এর ডিজাইন টিমে ছিলেন।"

"হ্যাঁ। আমি ছিলাম। আমি জানি যদি একটি নেটওয়ার্ক কোনোভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তা হলে সেই নেটওয়ার্ককে পৃথিবীর সব মানুষের দায়িত্ব দেয়া যায় না। কাজেই এই নেটওয়ার্ককে ধ্বংস করা যাবে না। তারপরেও আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, যদি এই নেটওয়ার্কটি ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে কী হবে?"

জুহ মাথা চুলকে বলল, "মহামান্য থুল, আমার কথাকে আপনি ধৃষ্টতা হিসেবে নেবেন না। আপনার প্রশ্নটি অনেকটা এরকম, আমরা জানি পৃথিবীর আহ্নিক গতি কখনো বন্ধ হবে না, এটি সব সময়েই নিজের অক্ষের উপর চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুরবে। কিন্তু যদি বন্ধ হয় তা হলে কী হবে?"

মহামান্য থুল হাসলেন, বললেন, "হ্যাঁ। অনেকটা সেরকম।"

জুহ বলল, "মুহূর্তে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। পানি, খাবার সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। রাস্তাঘাটে গাড়ি চলবে না। প্লেন উড়বে না। মানুষ মানুষকে চিনবে না। কাজে বের হয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে পারবে না। চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুল কলেজ গবেষণা বন্ধ হয়ে যাবে। এক কথায় সমস্ত পৃথিবী অচল হয়ে যাবে।"

"তারপর কী হবে?"

"সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যাবে।"

"তারপর কী হবে?"

"মানুষে মানুষে হানাহানি শুরু হয়ে যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহামান্য থুল খুব ধীরে ধীরে ঘুরে জুহুর দিকে তাকালেন, নিচু গলায় বললেন, "তোমার তাই ধারণা? যখন খুব বড় বিপদ নেমে আসে তখন মানুষ একে অন্যকে সাহায্য না করে একে অন্যের সাথে হানাহানি শুরু করে? মানুষ তখন স্বার্থপরের মতো নিজের বিষয়টা দেখবে?"

জুহু অপ্রস্তুত মুখে বলল, "এর উত্তর আমি জানি না মহামান্য থুল।" একটু থেমে সে যোগ করল, "আপনি কি জানেন?"

মহামান্য থুল মাথা নাড়লেন, "না। জানি না।"

"অনুমান করতে পারেন?"

"যে বিষয়টা সত্যি সত্যি জানা সম্ভব আমি সেটা অনুমান করতে চাই না।"

জুহু অবাক হয়ে মহামান্য থুলের দিকে তাকাল, একটু আগে তিনি ঠিক এই বাক্যটিই বলেছিলেন! জুহু দ্বিতীয়বার তাকে প্রশ্ন করার সাহস পেল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "মহামান্য থুল।"

"বল।"

"আমি আসলে আপনাকে একটা খারাপ খবর দিতে এসেছিলাম।"

"কী খারাপ খবর?"

"মানুষের সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আমরা একটি মহাকাশযানে করে সাতজন মহাকাশচারী পাঠিয়েছিলাম।"

"হ্যাঁ। সাতজনের একটি পূর্ণাঙ্গ টিম। একজন শিশুসহ।"

"সেই টিমটিতে যেন কোনো রোবোমানব যেতে না পারে তার জন্যে সর্বোচ্চ সতর্কতা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"সাতজনের ভেতর দুইজন রোবোমানব ঢুকে গেছে।"

মহামান্য থুল ঘুরে জুহুর দিকে তাকালেন, "কোন দুইজন?"

"জানি না। কেউ জানে না।"

"এখন কী করবে?"

"বুঝতে পারছি না মহামান্য থুল। সেজন্যে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।"

"আমার মনে হয় কিছুই করার প্রয়োজন নেই। যেভাবে চলছে চলুক।"

"আমরা পৃথিবী থেকে সিগন্যাল পাঠিয়ে মহাকাশযানটা ধ্বংস করে দিতে পারি।"

মহামান্য থুল মাথা নাড়লেন, "আমরা যদি রোবোমানব হয়ে যেতাম তা হলে নিশ্চয়ই তাই করতাম। কিন্তু আমরা তো রোবোমানব নই। আমরা খুব সাধারণ মানুষ। একটি তুচ্ছ কীটপতঙ্গের উপর হাত তুলতেও আমাদের হাত কাঁপে। আমরা কেমন করে কিছু অসহায় নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করব?"

১১

টুরান চোখ খুলে তাকাল। তার ঘুম ভেঙে গেছে—ঠিক করে বলতে হলে বলতে হবে তার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। যার অর্থ তারা হয়তো কেপলার টুটুবি গ্রহে পৌঁছে গেছে। মাঝখানে কতটুকু সময় পার হয়েছে কে জানে? এক বছর? একশ বছর? এক লক্ষ বছর? কী আশ্চর্য!

AMARBOI.COM

টুরান নিজের হাত নাড়ানোর চেষ্টা করল, পারল না। সেটি এখনো শিথিল হয়ে আছে। সে জানে ঘুম ভাঙার পর বেশ কিছুক্ষণ তার শরীর শিথিল হয়ে থাকবে, সেখানে জোর পাবে না। ধীরে ধীরে তার শরীরের শক্তি ফিরে পাবে। টুরান ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে। ক্যাপসুলের ভেতর মিষ্টি গন্ধের একটি শীতল বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে—এটি নিশ্চয়ই তার শরীরকে সতেজ করে তুলবে। খুব হালকা একটি সঙ্গীতের শব্দ ভেসে আসছে। মিষ্টি একটা সঙ্গীত, মনে হয় বহুদূরে কোনো একটা নদীর তীরে সে দাঁড়িয়ে আছে আর দূরে কোথাও কোনো একজন নিঃসঙ্গ শিল্পী নদীতীরে একটা গাছে হেলান দিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। টুরান তার চোখ বন্ধ করল। বুক ভরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিল, ভেতরে ভেতরে সে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছে।

ক্যাপসুলের ভেতর টুক করে একটা শব্দ হল, সঙ্গীতটি বন্ধ হয়ে গেছে। ভেতরে একটা সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে। টুরান তার হাতটি চোখের সামনে নিয়ে এল, তার শরীরে শক্তি ফিরে এসেছে। সে হাত দিয়ে ক্যাপসুলের ঢাকনাটি স্পর্শ করতেই সেটা নিঃশব্দে খুলে গেল। টুরান সাবধানে ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে এসে ক্যাপসুলের পাশে দাঁড়াল। সে দাঁড়াতে পারছে, ভেসে যাচ্ছে না যার অর্থ মহাকাশযানটি তার অক্ষের উপর ঘুরছে, মহাকাশযানের মাঝে কৃত্রিম একটা মাধ্যাকর্ষণ তৈরি করে রাখা আছে।

টুরান মাথা ঘুরিয়ে ডানদিকে তাকাতেই সে চমকে ওঠে। মহাকাশযানের দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে ইহিতা বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বসার ভঙ্গিটি দুঃখিত মানুষের মতো, দেখে মনে হয় কিছু একটা নিয়ে ইহিতা গভীর বিষাদে ডুবে আছে। টুরান জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"কিছু হয় নি।"

"তুমি এমন করে বসে আছ কেন?"

"আমি তো এমন করেই বসি।"

টুরান বলল, "আমরা কেপলার টুটুবিতে পৌঁছে গেছি, মানুষের নূতন সভ্যতা শুরু করব, তোমার মাঝে তার উত্তেজনা দেখছি না।"

"আমরা কেপলার টুটুবিতে পৌঁছাই নি। আমাদের যাত্রা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।"

টুরান চমকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"আমরা সৌরজগতের ভেতরেই আছি।"

টুরান উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, "কেন? আমাদের যাত্রা কেন বন্ধ করে দেয়া হল?"

ইহিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি না। ট্রিনিটি কিছু বলতে রাজি হচ্ছে না। যখন সবাই জেগে উঠবে তখন বলবে—তার আগে বলবে না।"

"অন্যদের কখন জাগাবে? তোমাকে কেন আগে জাগিয়েছে?"

"আমাকে আগে জাগায় নি, সবাইকে একই সাথে জাগানো শুরু করেছে। একেকজনের শরীর একেকভাবে কাজ করে তাই একেকজন একেক সময়ে জেগে উঠছে।"

টুরান হেঁটে হেঁটে অন্য ক্যাপসুলগুলোর কাছে যায়, ভেতরে কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করে আবার ইহিতার কাছে ফিরে এসে বলল, "আমার কাছে পুরো ব্যাপারটি খুব দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে।"

ইহিতা কথাটার কোনো উত্তর দিল না। টুরান তখন বলল, "আমার কাছে মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু ঘটেছে। খুব খারাপ এবং ভয়ংকর।"

"সেটি কী হতে পারে?"

"আমি জানি না।"

সবাই ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর ট্রিনিটি সবাইকে একটা ছোট হলঘরে নিয়ে এল। ঘরটিতে বসার জন্যে কার্যকর চেয়ার, চেয়ারের সামনে ডেস্ক এবং ডেস্কে ধূমায়িত খাবার। ক্লদ ছাড়া আর কেউ সেই খাবারে উৎসাহ দেখাল না।

টুরান বলল, "ট্রিনিটি, তুমি ভূমিকা ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এস।"

ট্রিনিটি বলল, "আমি আসলে ভূমিকা করছি না। সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এসেছি। আমি তোমাদেরকে একটি দুঃসংবাদ দেবার জন্যে ডেকে তুলেছি।"

কেউ কোনো কথা না বলে দুঃসংবাদটি শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। ট্রিনিটি ভাবলেশহীন গলায় বলল, "পৃথিবীটি রোবোমানবেরা দখল করে নেবে সেই আশঙ্কায় এই মহাকাশযানে করে তোমাদের সাতজনের নেতৃত্বে বিশালসংখ্যক মানুষ, মানুষের ভ্রূণ, জিনোম, পশুপাখি, গাছপালা পাঠানো হচ্ছিল। এর উদ্দেশ্য মানুষ দূর মহাকাশের কোনো একটি উপযুক্ত গ্রহে বসতি স্থাপন করবে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা কিছুক্ষণ আগে পৃথিবী থেকে আমাকে জানানো হয়েছে তোমাদের সাতজনের মাঝে দুইজন রোবোমানব।"

ক্লদ ছাড়া অন্য সবাই ভয়ানক চমকে উঠল। ক্লদ ঠিক সেই মুহূর্তে তার খাবারের মাঝে একটা লাল চেরি আবিষ্কার করেছে। সে এটা খাবে নাকি এটা দিয়ে খেলবে সেটি নিয়ে মনস্থির করতে পারছিল না।

টুরান কাঁপা গলায় বলল, "কোন দুইজন?"

"আমি জানি না। পৃথিবীর মানুষও জানে না। এটি জানলে পুরো ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যেত।"

সবাই সবার দিকে তাকাল, চোখে চোখ পড়তেই আবার তারা নিজেদের দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ইহিতা জিজ্ঞেস করল, "আমাদের ভেতরে যারা রোবোমানব তারা নিজেরা কী জানে যে তারা রোবোমানব?"

"রোবোমানবের মস্তিষ্কের থ্যালামাসে একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ইমপ্ল্যান্ট বসানো হয় যেটা মস্তিষ্ককে পরিবর্তন করে, ওভার ড্রাইভ করে। তোমাদের দুজনের সেই ইমপ্ল্যান্ট কার্যকর করা হয়ে থাকলে তোমরা ইতোমধ্যে জান যে তোমরা রোবোমানব।"

ইহিতা জানতে চাইল, "সেটা কি কার্যকর করা হয়েছে?"

"আমি জানি না। এই মহাকাশযানে সেটা পরীক্ষা করার উপায় নেই।"

নীহা জিজ্ঞেস করল, "এখন কী করা হবে? আমরা কি আবার পৃথিবীতে ফিরে যাব?"

"না।" ট্রিনিটি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, "তোমাদের সাতজনকে এই মহাকাশযান ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

সবাই চমকে উঠল, সুহা আর্তচিৎকার করে বলল, "কী বলছ!"

"আমি কী বলেছি তোমরা সেটি শুনতে পেয়েছ, তারপরেও আমি আবার বলি। তোমাদের এই সাতজনকে মহাকাশযান ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার এই মহাকাশযানের নিরাপত্তার জন্যে এখানে কোনো রোবোমানবকে স্থান দেয়া যাবে না।"

সুহা হাহাকারের মতো শব্দ করে বলল, "আমরা কোথায় যাব? আমি আমার এই শিশু বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় যাব?"

ক্লদ এই ছোট হলঘরের ভেতরের উত্তেজনাটুকু টের পেতে শুরু করেছে। সে তার খাওয়ার প্যাকেটটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে কী হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রিনিটি বলল, "আমরা পৃথিবী থেকে খুব বেশি দূর যাই নি। গ্রহাণু বেল্ট পার হয়েছি মাত্র। গতিপথ পরিবর্তন করে আমি মহাকাশযানটিকে মঙ্গল গ্রহ ঘিরে একটি কক্ষপথে নিয়ে এসেছি। তোমাদের একটা স্কাউটশিপে করে আমি মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

টুরান চিৎকার করে বলল, "মঙ্গল গ্রহে?"

"হ্যাঁ মঙ্গল গ্রহে।"

"তুমি কি জান মঙ্গল গ্রহ হচ্ছে পৃথিবীর ভাগাড়। মানুষ যখন পুরোপুরি সভ্য হয় নি তখন ভয়ংকর পরীক্ষাগুলো করেছে মঙ্গল গ্রহে? এখানে রয়েছে তেজস্ক্রিয়তা, রয়েছে বিষাক্ত কেমিক্যাল। শুধু তাই না এখানে জৈবিক পরীক্ষা হয়েছে—নূতন প্রাণ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। এরকম ভয়ংকর একটা জায়গায় আমাদের পাঠাবে?"

"হ্যাঁ।" ট্রিনিটি শান্ত গলায় বলল, "আমার কোনো উপায় নেই। আমি যখন জেনেছি তোমাদের দুজন রোবোমানব এবং কোন দুজন রোবোমানব আমার জানা নেই তখন এ ছাড়া আমার কিছু করার নেই। একটি কম্পিউটার হিসেবে আমাকে কোনো মানুষকে হত্যার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। যদি দেয়া হত তা হলে শীতলঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় সাতজনকেই হত্যা করে আমি নিশ্চিত হয়ে যেতাম।"

টর বিড়বিড় করে বলল, "ভাগ্যিস ক্ষমতা দেয়া হয় নি। ক্ষমতা ছাড়াই তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার।"

ইহিতা বলল, "ট্রিনিটি, তুমি কী বলছ সেটা চিন্তা করেছ?"

"চিন্তা প্রক্রিয়াটি মানুষের। আমি মানুষ নই, তাই চিন্তা করতে পারি না। তবে যে কোনো বিষয় আমি আমার মতো বিশ্লেষণ করতে পারি। কাজেই আমি যেটা বলেছি সেটা অনেকভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছি।"

"না।" ইহিতা মাথা নাড়ল, "তুমি পুরোপুরি বিশ্লেষণ কর নি। তুমি বলেছ মানুষকে হত্যা করার ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয় নি। কিন্তু যদি আমাদের ভয়ংকর বাস-অযোগ্য মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়ে দাও আমরা কিন্তু সবাই মারা যাব। রোবোমানব আর সাধারণ মানুষ সবাই মারা যাব। কাজেই তুমি আসলে আমাদের হত্যাই করছ।"

ট্রিনিটি গমগমে গলায় বলল, "তোমার বক্তব্য সঠিক নয়। মঙ্গল গ্রহে অনেকবার মানুষ এসেছে গেছে। এখানে তারা অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছে। এখানে অনেক জায়গায় মানুষের পরিত্যক্ত আবাসস্থল আছে, সেখানে খাবার আছে, রসদ আছে। তোমরা ইচ্ছে করলেই একরম একটি দুটি আবাসস্থল খুঁজে বের করে সেখানে আশ্রয় নিতে পার। সেখানে তোমরা মানুষেরা এবং রোবোমানবেরা নিজেদের মাঝে বোঝাপড়া করে নিতে পারবে।"

টুরান বলল, "আমরা সেই বোঝাপড়া এখানে বসে করতে পারি।"

ট্রিনিটি বলল, "না।"

ইহিতা বলল, "এটি সরাসরি আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া।"

ট্রিনিটি বলল, "আমার কিছু করার নেই।"

সুহা হাহাকার করে বলল, "আমার সাথে একটি ছোট শিশু। একটা নিরাপদ জীবনের জন্যে আমি ছোট শিশুকে নিয়ে বের হয়েছি। আমাদের এই বিপদের মাঝে ঠেলে দিয়ো না।"

ট্রিনিটি বলল, "স্কাউটশিপটা প্রস্তুত করে রাখা আছে। তোমরা সেখানে ওঠ।"

নীহা অবাক হয়ে বলল, "এখনই?"

"হ্যাঁ। এখনই।"

"আমরা যদি রাজি না হই।"

ট্রিনিটি বলল, "অবশ্যই রাজি হবে। টরকে জিজ্ঞেস করে দেখ আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে থাকা সম্ভব কি না!"

ইহিতা বলল, "আমাদের পুরো ব্যাপারটি ভেবে দেখার সময় দিতে হবে। আমরা মানুষ, এই মহাকাশযানটির নেতৃত্ব আমাদের দেয়া হয়েছে। তুমি একটা কম্পিউটার, তোমায় আমাদের সাহায্য করার কথা। আমাদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার কথা। আমাদের পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে দাও, ভাবনা-চিন্তা করতে দাও।"

"তোমরা মানুষ—এবং রোবোমানব, শুধুমাত্র এই কারণে আমি তোমাদের ভাবনা-চিন্তা করতে দেব না। তার কারণ তোমরা এমন কোনো একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলতে পারবে যার কারণে আমি তোমাদের রেখে দিতে বাধ্য হব। আমি সেরকম পরিস্থিতিতে যেতে রাজি নই। তোমরা স্কাউটশিপে উঠে যাও।"

ঘরের ভেতরে যারা আছে তারা সবাই একে অপরের দিকে তাকাল। সুহা কাতর গলায় বলল, "তোমাদের ভেতর যে রোবোমানব সে নিজের পরিচয় দিয়ে দাও। দোহাই তোমাদের। আমাদের সবাইকে মেরে ফেলো না!"

নীহা বলল, "রোবোমানবদের বুকের ভেতর কোনো ভালবাসা থাকে না। তারা তোমার কথাকে কোনো গুরুত্ব দেবে না। তারা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে। সেই উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত তারা এখান থেকে যাবে না।"

ট্রিনিটি গমগমে গলায় বলল, "তোমরা স্কাউটশিপে উঠে যাও। এক মিনিটের মাঝে স্কাউটশিপে উঠে না গেলে আমি জোর করতে বাধ্য হব।"

ক্লদ জিজ্ঞেস করল, "মা, আমরা স্কাউটশিপে করে কোথায় যাব?"

"মঙ্গল গ্রহে।"

ক্লদের মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, "কী মজা হবে। তাই না মা?"

সুহা অসহায়ভাবে একবার ক্লদের মুখে আরেকবার সবার মুখের দিকে তাকাল। ট্রিনিটি আবার বলল, "দশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে। আর পঞ্চাশ সেকেন্ড বাকি আছে।"

সবাই পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। ট্রিনিটি বলল, "আর চল্লিশ সেকেন্ড।"

সবার আগে ইহিতা উঠে দাঁড়াল। তার দেখাদেখি অন্য সবাই। ইহিতা ফিসফিস করে বলল, "ট্রিনিটি, তুমি মানুষ হলে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। কিন্তু তুমি একটি নির্বোধ কম্পিউটার, তোমাকে অভিশাপ দেয়া অর্থহীন। তবু আমি অভিশাপ দিচ্ছি। তুমি যেন মানুষের হাতে ধ্বংস হও।"

ট্রিনিটি বলল, "পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড।"

১২

স্কাউটশিপটি গর্জন করতে করতে নিচে নামতে থাকে। যতদূর দেখা যায় বিস্তৃত লালাভ একটি গ্রহ, লালচে মেঘ, নিচে প্রবল বেগে ধূলিঝড় বয়ে যাচ্ছে।

স্কাউটশিপটির তীব্র ঝাঁকুনি সহ্য করতে করতে নীহা বলল, "মঙ্গল গ্রহ সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ। এর ভর পৃথিবীর দশ ভাগের এক ভাগ, ব্যাসার্ধ পৃথিবীর অর্ধেক। তাই এখানে আমাদের ওজন হবে সত্যিকার ওজনের মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ।"

টুরান বলল, "যতক্ষণ মঙ্গল গ্রহে থাকব সারাক্ষণ আমাদের বায়ুনিরোধক পোশাক পরে থাকতে হবে। সেটি অত্যন্ত বিশেষ ধরনের পোশাক, তার ওজন দিয়ে আমাদের ওজন একটু বাড়ানো হবে, তারপরেও আমাদের সব সময়ই নিজেদের হালকা মনে হবে।"

নীহা মনিটরে কিছু তথ্য দেখে বলল, "মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল খুবই হালকা, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মাত্র একশ ভাগের এক ভাগ। বাতাসের পঁচানব্বই ভাগই কার্বন ডাইঅক্সাইড! তিন ভাগ নাইট্রোজেন।"

সুহা জানতে চাইল, "অক্সিজেন? অক্সিজেন নেই?"

"খুবই কম। এক হাজার ভাগের এক ভাগের মতো।"

টুরান বলল, "আমাদের পোশাকে সেই অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন আলাদা করে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে দেয়া হবে।"

টর জিজ্ঞেস করল, "পানি আছে?"

"প্রচুর পানি, কিন্তু সেগুলো দুই মেরুতে জমা আছে। বরফ হিসেবে।"

ইহিতা বলল, "কিছু মাথা খারাপ বিজ্ঞানী মেরু অঞ্চলের বরফ গলিয়ে পানির প্রবাহ তৈরি করে এখানে প্রাণের বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিল।"

সুহা জানতে চাইল, "প্রাণের বিকাশ হয়েছিল?"

ইহিতা মাথা নেড়ে বলল, "পরিষ্কার করে কেউ বলতে পারে না। এটা হচ্ছে পৃথিবীর অন্ধকার জগতের সময়ের ঘটনা। সারা পৃথিবী তখন নানারকম দেশে ভাগ হয়েছিল। কেউ গরিব কেউ বড়লোক। শক্তি বলতে তেল গ্যাস—এক দেশ তেল গ্যাসের জন্যে আরেক দেশ দখল করে ফেলত। সেই সময় পৃথিবীতে কোনো নিয়মনীতি ছিল না, যার জোর সে পৃথিবী শাসন করত। সেই সময়ে উন্নত দেশের কিছু মাথা খারাপ বিজ্ঞানী মঙ্গল গ্রহের উপযোগী প্রাণ তৈরি করার চেষ্টা করেছিল। কেউ বলে পেরেছিল, কেউ বলে পারে নি।"

নীহা জানতে চাইল, "তুমি এত কিছু কেমন করে জান?"

"কৌতূহল।"

স্কাউটশিপটা একটা ঝড়ো হাওয়ার মাঝে আটকা পড়ে যায়, ভয়ানক ঝাঁকুনি হতে থাকে। ভেতরের সবাই সিটের সামনে ব্র্যাকেটগুলো ধরে তাল সামলানোর চেষ্টা করে। টর একটা কুৎসিত গালি দিয়ে বলল, "মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে হয়।"

শুধু ক্রদ আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, তার কাছে মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে একটা খেলা।

স্কাউটশিপটা পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত থেমে গেল। টুরান বুকের ভেতর আটকে থাকা একটা নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে বলল, "সবাই ঠিক আছ?"

"সেটা নির্ভর করে ঠিক থাকা বলতে কী বোঝায় তার ওপর।" নীহা বলল, "বেঁচে আছি।"

"আপাতত বেঁচে থাকা মানেই হচ্ছে ঠিক থাকা।"

ইহিতা বলল, "কেউ একজন স্কাউটশিপের লগটা পড়ে বলবে আমরা এখন কোথায়। কী করব?"

"পঁচিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ যেটা এখন গ্রীষ্মকাল। তাপমাত্রা শূন্যের নিচে পাঁচ ডিগ্রি, যেটা এখানকার হিসেবে বেশ গরম।"

টুরান বলল, "খুব কাছাকাছি মানুষের একটা আশ্রয়স্থল থাকার কথা, যে জন্যে স্কাউটশিপটা এখানে থেমেছে।"

"হ্যাঁ। মনিটরে সেটা দেখতে পাচ্ছি। এখানে কেউ নেই, আমরা মনে হয় আশ্রয় নিতে পারব।"

নীহা বাইরে তাকিয়ে বলল, "আমাদের স্কাউটশিপটা রীতিমতো একটা ধুলার ঝড় তৈরি করেছে। ধুলাটুকু সরে গেলে মনে হয় সূর্যটাকে দেখতে পাব। আকারে ছোট দেখাবে।"

ইহিতা বলল, "আকার নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না, সূর্যটাকে দেখলে অন্তত মনে হবে পরিচিত কিছু একটা দেখছি!"

স্কাউটশিপের জানালা দিয়ে সবাই বাইরে তাকিয়েছিল, ধুলো সরে গেলে তারা বিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখতে পেল। যতদূর চোখ যায় লাল পাথরে ঢাকা, ঘোলাটে লাল আকাশে একটা লালচে সূর্য। রুক্ষ পাথুরে প্রান্তর দেখে মন খারাপ হয়ে যায়।

টুরান বলল, "আমরা এই ছোট স্কাউটশিপে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। মানুষের ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে হবে।"

নীহা বলল, "তা হলে দেরি না করে চল রওনা দিই।"

"রওনা দেয়ার আগে অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের সবার দীর্ঘ সময়ের জন্যে স্পেসস্যুট পরে নিতে হবে।"

ইহিতা বলল, "অন্তত স্কাউটশিপে স্পেসস্যুটগুলো দেয়ার জন্যে ট্রিনিটিকে একটা ধন্যবাদ দিতে হয়।"

টর বলল, "ট্রিনিটির নাম কেউ মুখে আনবে না। আমি নিজের হাতে একদিন ট্রিনিটিকে খুন করব।"

ট্রিনিটি নিয়ে আরো আলাপ শুরু হয়ে যাবার উপক্রম হতে চলছিল কিন্তু তখন ক্লদ চিৎকার করে বলল, "আমি স্কাউটশিপে থাকতে চাই না। আমি বের হতে চাই।"

টুরান বলল, "শুধু তুমি নও। ক্লদ আমরা সবাই বের হতে চাই।"

"তা হলে আমরা কেন বের হচ্ছি না?"

টুরান নরম গলায় বলল, "স্পেসস্যুটটা পরেই আমরা বের হব। একটু সময় দাও।"

দেখা গেল একটু সময় দিয়ে হল না। সাতজন মানুষের স্পেসস্যুট পরতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লেগে গেল। সবচেয়ে ঝামেলা হল ক্লদকে স্পেসস্যুট পরাতে। নুট এমনিতে কোনো কথা বলে না কিন্তু ক্লদকে স্পেসস্যুট পরানোর সময় সে তাকে সাহায্য করল। স্পেসস্যুট পরার পর স্বচ্ছ নিওপলিমারের একটা আবরণ তাদের শরীরটাকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলল। মাথায় একটা হেলমেট, সেই হেলমেটের সাথে যোগাযোগ মডিউলে একে অন্যের সাথে কথা বলার ব্যবস্থা। পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার। বায়ুমণ্ডল থেকে যেটুকু অক্সিজেন পাওয়া সম্ভব সেটাকেই সংগ্রহ করে ক্রমাগত সিলিন্ডারে ভরে দেয়ার একটা পাম্প কাজ করে যাচ্ছে।

স্কাউটশিপ থেকে বের হওয়ার মুহূর্তটি ছিল সবচেয়ে অনিশ্চিত মুহূর্ত। নিরাপত্তার জন্যে সবাইকে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বের হতে হবে। কেউ মুখ ফুটে বলছে না কিন্তু সবাই জানে তাদের ভেতর যে দুজন রোবোমানব তারা হাতে আগ্নেয়াস্ত্রটি নিয়েই সেটা ঘুরিয়ে অন্য সবাইকে শেষ করে দিতে পারে। যারা মানুষ তারা জানে না এখানে কোন দুজন রোবোমানব, কিন্তু যারা রোবোমানব তারা খুব ভালো করে জানে এখানে কারা মানুষ।

সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অস্ত্র হাতে নিয়ে নামছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। তীব্র উত্তেজনাটুকু কমিয়ে দিল ক্লদ, সে বলল, "আমাকে? আমাকে অস্ত্র দেবে না?"

সুহা বলল, "বাবা, এটা খেলনা না। এটা সত্যিকারের অস্ত্র।"

"আমি জানি এটা খেলনা না। আমি খুব সাবধানে ধরে রাখব।"

"উঁহু। বড় না হওয়া পর্যন্ত হাতে অস্ত্র নেয়া নিষেধ।"

টুরান তার দিকে একটা ডিটেক্টর এগিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি বরং এটা নিতে পার।"

"এটা কী?"

"এটা তেজস্ক্রিয়তা মাপার একটা ডিটেক্টর। মঙ্গল গ্রহে পৃথিবী থেকে অনেক তেজস্ক্রিয়তা ফেলা হয়েছে। আমরা যেন ভুল করে কোনো তেজস্ক্রিয় জায়গায় চলে না যাই সেজন্যে এটা আমাদের সাথে রাখতে হবে। আশপাশে তেজস্ক্রিয় কিছু থাকলেই এটা কট কট শব্দ করবে।"

হাতে সত্যিকারের একটা অস্ত্র নিতে না পারার দুঃখটা ক্রুদের খানিকটা হলেও ঘুচে গেল। সে ডিটেক্টরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে থাকে কোথাও কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায় কি না।

স্কাউটশিপের গোল দরজা বন্ধ করে সাতজনের দলটা হাঁটতে শুরু করে। স্পেসস্যুটের ভেতর বাতাসের তাপ, চাপ, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রাখার পরও তারা বাইরের হিমশীতল পরিবেশটুকু অনুভব করে। এক ধরনের ঝড়ো বাতাস বইছে, মাঝে মাঝেই চারদিকে ধুলায় ধূসর হয়ে যাচ্ছিল তার মাঝে তারা সারি বেঁধে সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। স্পেসস্যুটের পোশাকে নানা ধরনের ভারী যন্ত্রপাতি তারপরেও তাদের নিজেদের অনেক হালকা মনে হয়, প্রতিটি পদক্ষেপ দেবার সময় তারা খানিকটা উপরে উঠে যায়। যদিও তারা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে কিন্তু দেখে মনে হয় লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে।

কতক্ষণ গিয়েছে জানে না তখন হঠাৎ করে ক্রুদের আনন্দধ্বনি শোনা গেল, "পেয়েছি! পেয়েছি!"

ইহিতা জানতে চাইল, "কী পেয়েছ?"

"তেজস্ক্রিয়তা।"

টুরান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় তেজস্ক্রিয়তা পেয়েছ?"

"এই তো আমার ডিটেক্টরে। এই দেখ কট কট শব্দ করছে।"

সবাই অবাক হয়ে শুনল সত্যি ডিটেক্টরটা কট কট শব্দ করছে। নীহা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "আমরা কি ভুল করে কোনো তেজস্ক্রিয় এলাকায় চলে এসেছি?"

টুরান মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমি নিশ্চিতভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। আশপাশে কোনো তেজস্ক্রিয়তা নেই।"

"তা হলে এখন কোথা থেকে আসছে?"

ইহিতা উপরের দিকে তাকাল, "বলল, হয়তো বাতাসে ভেসে আসছে?"

টুরান ডিটেক্টরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "না এটা উপর থেকে আসছে না। এটা নিচে থেকে আসছে।"

হঠাৎ করে ডিটেক্টরের শব্দ বেড়ে যেতে শুরু করে। সাথে সাথে তারা পায়ের নিচে একটা কম্পন অনুভব করে।

মাটির নিচে দিয়ে কিছু একটা তাদের দিকে আসছে। সবাই তাদের অস্ত্র হাতে তুলে নিল।

কম্পনের সাথে সাথে এবার তারা সামনে পাথরের মাঝে কিছু একটা নড়ে যেতে দেখল। মাটির নিচে দিয়ে কিছু একটা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

AMARBOI.COM

সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের মনে হতে থাকে যে কোনো মুহূর্তে পাথর ভেদ করে কিছু একটা ভয়ংকর চিৎকার করে বের হয়ে আসবে, কিন্তু কিছু বের হল না। তাদের পায়ের নিচে দিয়ে সেটা ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল। ডিটেক্টরে তেজস্ক্রিয়তার শব্দটা কমতে কমতে একসময় মিলিয়ে গেল।

সুহা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "এটা কী?"

ইহিতা বলল, "কোনো একটা প্রাণী।"

"মঙ্গল গ্রহে প্রাণী আছে?"

"আগে ছিল না। মনে হচ্ছে এখন আছে।"

"কাছে এলে তেজস্ক্রিয়তা বেড়ে যায় কেন?"

"নিশ্চয়ই শক্তি পায় তেজস্ক্রিয়তা থেকে। এটা যেহেতু তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভাগাড়, শক্তিটাও এখান থেকে পাবে সেটাই তো স্বাভাবিক।"

"কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব? তেজস্ক্রিয়তার শক্তি অণু-পরমাণুকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। এই প্রাণীর দেহ তা হলে কী দিয়ে তৈরি?"

"এটা নিশ্চয়ই আমাদের পরিচিত প্রাণীর মতো না। অন্যরকম।"

"কীভাবে অন্যরকম?"

"জানি না। হয়তো প্রাণী আর যন্ত্রের একটা হাইব্রিড।"

টুরান বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চল অগ্রসর হই। চার দেয়াল আর ছাদের নিচে থাকলে মনে হয় একটু ভরসা পাব।"

"হ্যাঁ চল।"

সবাই আবার অগ্রসর হতে থাকে। ক্লদ জিজ্ঞেস করল, "মঙ্গল গ্রহের প্রাণীটা দেখতে কেমন হবে?"

সুহা বলল, "আমি জানি না। জানতেও চাই না। সেটা যেন আমরা কোনো দিন জানতে না পারি।"

ক্লদ বলল, "আমি কিন্তু জানতে চাই।"

কেউ তার কথার উত্তর দিল না। সবার জীবনই যদি একটা শিশুর জীবনের মতো সহজ-সরল হত তা হলে মন্দ হত না!

AMARBOI.COM

১৩

কুগুরাভ সমীকরণের দ্বিতীয় সমাধানটা নীহার মাথায় আসি আসি করেও আসছিল না। কমপ্লেক্স প্লেনের কোথায় সমাধানটি হবে বোঝা যাচ্ছে, সমাধানটির ক্ষেত্রটিও পেয়ে গেছে শুধু সমাধানটি পাচ্ছে না। নীহা গভীরভাবে চিন্তা করে নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল—হঠাৎ করে সে বাস্তব জগতে ফিরে এল। কেউ একজন তাকে ডাকছে, "নীহা। কোথায় যাচ্ছ তুমি? দাঁড়াও।"

নীহা দাঁড়াল, কুগুরাভ সমীকরণের কথা চিন্তা করতে করতে সে কখন সবাইকে ছেড়ে একা একা খানিকটা দূরে চলে এসেছে লক্ষ করে নি। নীহা শুনল, টর বলছে, "আমরা পৌছে গেছি।"

"কোথায় পৌছে গেছি?"

"যেখানে পৌঁছানোর কথা। মানুষের আবাসস্থল।"

"মানুষ কি আছে?"

"না। মানুষের থাকার কথা নয়। মঙ্গল গ্রহে এখন আমরা কয়জন ছাড়া আর কোনো মানুষ নেই।"

নীহা হেঁটে হেঁটে অন্যদের কাছে ফিরে এল। জিজ্ঞেস করল, "মানুষের আবাসস্থলটা কোথায়?"

টর হাত দিয়ে সামনের একটা পাথরের স্তূপকে দেখিয়ে বলল, "এই তো, এটা।"

নীহা বলল, "দেখে মোটেই মানুষের আবাসস্থল মনে হচ্ছে না।"

টর হাতে ধরা মডিউলটা দেখে বলল, "মনে না হলেও কিছু করার নেই। এটাই সেই জায়গা। মনে হয় মাটির নিচে তৈরি করেছে।"

ইহিতা জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কী করব?"

সুহা বলল, "ভেতরে ঢুকব। অন্তত পক্ষে চারদিকে দেয়াল আর মাথার উপরে একটা ছাদ তো থাকবে।"

"কেমন করে ঢুকব?" নীহা জানতে চাইল, "দরজা কোথায়? চাবি কোথায়?"

টুরান বলল, "একটা ব্যবস্থা থাকবে। জরুরি প্রয়োজনে মানুষকে আশ্রয় দেয়ার একটা কোড আছে, সেই কোডটি দিলেই দরজা খুলে যাবে। আগে দরজাটি খুঁজে বের করা যাক।"

দরজাটা সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। কি প্যাডে যখন কোড সংখ্যাটি প্রবেশ করানো হচ্ছে তখন ক্লদ দরজাটাকে পা দিয়ে একটা লাথি দেয়, সাথে সাথে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। টুরান অবাক হয়ে বলল, "দরজাটা খোলা।"

ইহিতা দরজাটা পরীক্ষা করে বলল, "কেউ একজন এটা ভেঙে আগে ভেতরে ঢুকেছে।"

নীহা বলল, "তার মানে এটা আশ্রয় হতে পারে, কিন্তু নিরাপদ আশ্রয় নয়।"

টুরান বলল, "এখন কী করব?"

টর বলল, "অবশ্যই ভেতরে ঢুকব। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা করার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে!"

সে অস্ত্রটা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল, বলল, "আমি সবার আগে যাই। তোমরা পিছনে পিছনে এস।"

ভেতরে একটা ঝাপসা খোলা আলো। একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে, সাবধানে পা ফেলে টর এগিয়ে যায়। অন্যেরা তার পিছু পিছু নামতে থাকে। নিচে একটুখানি খোলা জায়গা সেখানে দাঁড়িয়ে তারা চারদিকে তাকায়। সামনে একটা ভারী দরজা, দরজার ওপরে একটা বাতি জ্বলছে নিভছে। টর এগিয়ে এসে দরজায় লাথি দিতেই দরজাটা খুলে গেল, দরজার অন্য পাশে একজন দীর্ঘদেহী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটির হাতে একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, অস্ত্রটি তাদের দিকে তাক করে মানুষটি ভারী গলায় বলল, "তোমরা কারা? এখানে কেন এসেছ? তোমরা জান না এখানে ভয়ংকর বিপদ?"

টর বলল, "আমরা ঘটনাক্রমে এখানে এসেছি, আমাদের একটু আশ্রয় দরকার। এখানে বিপদটি কী?"

মানুষটি তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, টরের কথাটি শুনেছে কিংবা শুনে থাকলেও বুঝেছে বলে মনে হল না। মানুষটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল, "তোমরা কারা? এখানে কেন এসেছ? তোমরা জান না এখানে ভয়ংকর বিপদ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহিতা বলল, "এটা সত্যিকারের মানুষ না। হলোগ্রাফিক ছবি।"

টর মানুষটির হলোগ্রাফিক শরীরের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে যেতে যেতে বলল, "কিছু একটা বিপদের কথা বলছে। মানুষকে সাবধান করার জন্যে এটাকে বসানো হয়েছে।"

ইহিতা বলল, "টর খুব সাবধান।"

"আমি সাবধান আছি।"

ক্লদ বলল, "আমার যন্ত্র আবার কট কট শব্দ করছে।"

সবাই চমকে উঠল। শুনতে পেল সত্যিই তেজস্ক্রিয়তা মাপার ডিটেক্টরটি খুব মৃদুভাবে শব্দ করছে। টুরান ডিটেক্টরটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল। "এখানে খুব অল্প তেজস্ক্রিয়তা আছে। আমাদের জন্যে বিপজ্জনক পরিমাণে নয়—কিন্তু আছে।"

টর হাতের অস্ত্রটা ধরে সাবধানে অগ্রসর হয়। চারপাশে কয়েকটা ঘর, ঘরের ভেতর নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। সবকিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ঘরের মেঝেতে মানুষের ব্যবহারী কিছু জিনিসপত্র, জামাকাপড়, পানীয়ের বোতল—শুকনো রক্তের ছোপ, সবকিছু মিলিয়ে মনে হয় এখানে কোনো একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে।

শেষ ঘরটির ছাদ ভেঙে পড়েছে। দেয়ালে বিস্ফোরণের চিহ্ন—একদিকে একটা বিশাল গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে একটা সুড়ঙ্গের মতো বের হয়ে গেছে। তারা কিছুক্ষণ এই সুড়ঙ্গটার দিকে তাকিয়ে থাকে, ইহিতা নিচু গলায় বলল, "এই সুড়ঙ্গটা কি যাবার জন্যে নাকি আসার জন্যে?"

টর বলল, "আমরা ভিতরে ঢুকে দেখতে পারি।"

ইহিতা মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমরা এমনিতেই অনেক বড় বিপদের মাঝে আছি। নূতন করে বিপদ ডেকে আনার কোনো প্রয়োজন নেই।"

ঠিক তখন ক্লদের কথা শোনা গেল, সে চিৎকার করছে, "সবাই এস দেখে যাও।"

সবাই গিয়ে দেখল, সে একটা ছোট দরজা খুলে ভিতরে তাকিয়ে আছে। টুরান নিচু হয়ে দেখল, একটি মৃতদেহ। মানুষটি কতদিন আগে মারা গেছে বোঝার উপায় নেই, সমস্ত শরীর শুকিয়ে চামড়া হাড়ের উপর লেগে আছে। মানুষটি হাতে একটি ভিডি রেকর্ডার শক্ত করে ধরে রেখেছে।

সবাই এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে রইল। নীহা ভয়ার্ত গলায় বলল, "মানুষটির চোখেমুখে কী আতঙ্ক লক্ষ করেছ?"

ইহিতা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ কী দেখে এত ভয় পেয়েছে কে জানে?"

"হাতের ভিডি রেকর্ডারে হয়তো রেকর্ড করা আছে।"

টর তখন নিচু হয়ে মৃত মানুষটির হাতে শক্ত করে ধরে রাখা ভিডি রেকর্ডারটি ছুটিয়ে আনে। উপরের লাল বোতামটি স্পর্শ করার সাথে সাথে ঘরের মাঝামাঝি একটি মানুষের ত্রিমাত্রিক হলোগ্রাফিক ছবি ভেসে আসে। অস্পষ্ট ছবি, মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে ছবিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তারপর আবার ফিরে আসছে। তারা শুনতে পেল, মানুষটি কাঁপা গলায় বলছে, "বিপদ। এখানে খুব বড় বিপদ। তোমরা কারা আমার কথা শুনছ আমি জানি না, কিন্তু আমি তোমাদের বলছি তোমরা এক্ষুনি এই আবাসস্থল ছেড়ে চলে যাও। তেজস্ক্রিয় প্রাণীগুলো এই আবাসস্থলের দেয়াল ভেঙে ফেলেছে তারা এখন এখানে ঢুকতে পারে...কিমি আর লুসাকে ধরে নিয়ে গেছে...আমাদেরকেও নেবে...কী ভয়ংকর একটি প্রাণী...এদের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই...কী ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো..."

ইহিতা এগিয়ে এসে ভিডি রেকর্ডারের বোতাম টিপে সেটাকে বন্ধ করে বলল, "ক্লদের মতো ছোট একটা শিশুর সামনে এটা দেখা ঠিক হচ্ছে না।"

টর বলল, "কিন্তু আমাদের জানা দরকার মানুষটি কী বলছে।"

সুহা বলল, "ঠিক আছে আমি ক্লদকে সরিয়ে নিই। তোমরা দেখ।"

ক্লদ বলল, "না আমি যাব না। আমি শুনব মানুষটি কী বলছে।"

"না তুমি শুনবে না।"

"আমি শুনব।"

"না। তুমি শুনবে না—" বলে সুহা ক্লদকে ধরে সরিয়ে নিল।

সবাই তখন মানুষটির কথা শুনল। কথাগুলো অনেকটা তার দিনলিপির মতো, সে ছাড়া ছাড়াভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে বলছে। অনেক কথা বলছে, বেশিরভাগই আতঙ্কের কথা, অসহায়তার কথা। ক্রোধ এবং ক্ষোভের কথা। তারপরও তার কথা থেকে তারা অনেকগুলো জরুরি বিষয় জানতে পারল। এই মানুষগুলো বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টির একটা গোপন মিশনে এসেছিল। পৃথিবীর মতো এখানে যেহেতু কোনো জৈব জগৎ নেই তাই প্রাণীটির শক্তির জন্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করেছে। যে প্রাণীটি তৈরি হয়েছে সেটি সত্যিকার অর্থে বুদ্ধিমান প্রাণী হয় নি। যেহেতু নূতন করে তাদের জন্মানোর কোনো উপায় নেই তাই অন্যভাবে নিজেদের তৈরি করার পদ্ধতি বের করে নিয়েছে। মানুষদের ধরে তাদের শরীর টুকরো টুকরো করে ব্যবহার করছে। পুরো প্রক্রিয়াটা বীভৎস—যারা এই গোপন মিশনে এসেছিল তারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে। যারা পালাতে পারে নি—তারা প্রাণীগুলোর হাতে মারা পড়েছে।

যে বিষয়টা সবচেয়ে ভয়ংকর সেটি হচ্ছে তাদের ধ্বংস করা যায় না—গুলি করে বা বিস্ফোরণে শরীরটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেও তারা ছিন্নভিন্ন অংশগুলো জুড়ে দিয়ে নূতন করে তাদের তৈরি করে নেয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে শক্তি পায় বলে তাদের কোনো রসদের অভাব নেই। মাটির নিচে দিয়ে এরা সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে, প্রয়োজন না হলে উপরে ওঠে না, সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত চলে যেতে পারে।

মানুষটির কাছ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য পেয়েছে। মানুষের এই আবাসস্থলটি তেজস্ক্রিয় প্রাণীগুলো দখল করে নিলেও এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে একটা খুব সুরক্ষিত আবাসস্থল রয়েছে যেখানে তেজস্ক্রিয় প্রাণী ঢুকতে পারে না। সেখানে কোনোভাবে আশ্রয় নিতে পারলে তারা বেঁচে যাবে।

ভিডি রেকর্ডে মানুষের কথাগুলো শেষ হবার পর সবাই একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, টর জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কী করব?"

টুরান বলল, "করার তো খুব বেশি কিছু নেই। এই আবাসস্থলটা মোটেও নিরাপদ নয়, তাই আমাদের যেতে হবে সুরক্ষিত আবাসস্থলটিতে।"

"কেমন করে যাব? প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ।"

"হেঁটে যাওয়া ছাড়া কি অন্য কোনো পথ আছে?"

টর মাথা নাড়ল, বলল, "নেই।"

"তা হলে দেরি করে লাভ নেই। চল রওনা দিই।"

ইহিতা বলল, "আমাদের সাথে চার বছরের একটা শিশু আছে ভুলে যেও না।"

টুরান বলল, "না। আমরা ভুলি নি।"

নীহা খানিকটা অনিশ্চিতভাবে বলল, "আমি একটা বিষয় জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"অবশ্যই।" ইহিতা বলল, "জিজ্ঞেস তো করতেই পার, কিন্তু আমরা কেউ তার উত্তর জানি কি না সেটা অন্য ব্যাপার।"

নীহা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমরা লক্ষ করেছ আমরা কিন্তু ছোট একটা ঘটনা থেকে আরেকটা ঘটনার মাঝে দিয়ে যাচ্ছি। আমরা পুরো ব্যাপারটা কখনো দেখছি না।"

টর ভুরু কুঁচকে বলল, "পুরো ব্যাপারটা কী?"

"আমরা এই গ্রহে আটকা পড়েছি, আমরা কোনোভাবে মহাকাশযানে ফিরে যেতে পারব না। আগে হোক পরে হোক তেজস্ক্রিয় প্রাণী আমাদের খেয়ে ফেলবে।"

টর বলল, "তুমি কী বলতে চাইছ?"

নীহা বলল, "আমি বলছি কেউ একজন আমাকে ভবিষ্যতের একটা পরিকল্পনা দেখাও। মিনিট মিনিট করে বেঁচে থাকতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।"

ইহিতা নরম গলায় বলল, "নীহা! আমরা যে বিষয়টা ভুলে থাকার ভান করছি, তুমি ঠিক সেই ব্যাপারটা টেনে এনেছ। সত্যি কথা বলতে কী আমরা মিনিট মিনিট করে বেঁচে আছি কারণ সেটা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। আমরা শুধু সময়টা কাটিয়ে যাচ্ছি, এ ছাড়া আর কিছু করার নেই, সেজন্যে।"

নীহা বলল, "আমি এই পৃথিবীতে কারো কাছে কিছু চাই নি। শুধু নিজের জন্যে একটু সময় চেয়েছিলাম—নিরিবিলি নিজের সাথে একটু সময়। আমি সেটাও পেলাম না। সেজন্যে দুঃখ দুঃখ লাগছে।"

তারা যখন কথা বলছে তখন সুহা আর ক্লদও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, ক্লদ কৌতূহলী চোখে নীহার দিকে তাকিয়ে রইল, সুহা বলল, "মানুষকে কখনো আশা ছেড়ে দিতে হয় না।"

নীহা বলল, "আমি আশা ছেড়ে দিতে চাই না। আমাকে বল, আমি কী নিয়ে আশা করে থাকব? আমি এই অনিশ্চিত অবস্থাটা আর সহ্য করতে পারছি না, মনে হচ্ছে আমাদের ভেতরে যে দুইজন রোবোমানব আছে তারা যদি আমাকে গুলি করে মেরে ফেলত তা হলেই বুঝি বেশি ভালো হত! কে রোবোমানব? আমাকে মেরে ফেলবে অনুগ্রহ করে?"

সবাই নীহাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল, কী বলবে কেউ বুঝতে পারছে না। নীহা ভাঙা গলায় বলল, "আমাকে এখানে রেখে তোমরা যাও। আমি বসে কুগুরাভ সমীকরণের সমাধানের কথা চিন্তা করতে থাকি—একসময় তেজস্ক্রিয় প্রাণী এসে আমাকে খেয়ে সব ঝামেলা চুকিয়ে দেবে! অন্তত আমি যেটা করতে ভালবাসি সেটা করতে করতে মারা যাব।"

এই দীর্ঘ সময়ে নুট নিজে থেকে কখনো একটি কথাও বলে নি। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, "আমি কি একটা কথা বলতে পারি?"

সবাই চমকে উঠে নুটের দিকে তাকাল।

ইহিতা বলল, "নুট! তুমি যে আমাদের সাথে আছ সেই কথাটি আমাদের কারো মাথাতেই আসে না! অবশ্যই তুমি কথা বলতে পারবে। আমরা শুনতে চাই তুমি কী বলবে। কেমন করে বলবে!"

নুট ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, "কথা না বলতে বলতে আমি কেমন করে কথা বলতে হয় সেটাই ভুলে গেছি!"

নীহা বলল, "তোমার গলার স্বর সুন্দর। আমাদের মাঝে তোমার সবচেয়ে বেশি কথা বলা উচিত ছিল।"

নুট দুর্বলভাবে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "ধন্যবাদ নীহা। কিন্তু আমি অবিশ্যি গলার স্বর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম না। তুমি যে বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করেছ আমি সারাক্ষণ শুধু সেটাই ভেবেছি। ভেবে ভেবে একটা উত্তর পেয়েছি।"

"কী উত্তর পেয়েছ?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি ভবিষ্যতের একটা পরিকল্পনা জানতে চেয়েছ, আমি তোমাকে সেই পরিকল্পনা দিতে পারি। একেবারে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। পরিকল্পনাটা খুবই সহজ, তার জন্যে আমাদের এক–দুইজনকে হয়তো মারা যেতে হবে, কিন্তু যারা বেঁচে থাকবে তাদের একটা সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকবে।"

ইহিতা বলল, "সেটি কী বলে ফেলো নুট।"

"আমাদের এখনই পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে মানুষের আবাসস্থলটাতে যেতে হবে। সেখানকার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে নয়। অন্য কারণে।"

"কী কারণে?"

"এই লম্বা পথ পায়ে হেঁটে যেতে আমাদের কয়েকদিন লাগবে। এই সময়টাতে তেজস্ক্রিয় প্রাণী নিশ্চিতভাবে আমাদের আক্রমণ করবে। তখন আমরা একটা ভয়ংকর বিপদে পড়ব। আমার ধারণা তখন আমাদের মাঝে কারা মানুষ কারা রোবোমানব সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।"

কেউ কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে নুটের দিকে তাকিয়ে রইল। নুট বলল, "আমরা যদি রোবোমানবদের আলাদা করতে পারি তখন হয় তারা না হয় আমরা বেঁচে থাকব। আমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি, দুই কারণে। প্রথম কারণ, আমরা সংখ্যায় বেশি।"

ইহিতা জানতে চাইল, "দ্বিতীয় কারণ?"

"দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমি জানি আমাদের কোন দুইজন রোবোমানব। কাজেই তারা হঠাৎ করে কিছু করতে পারবে না। অন্তত্তপক্ষে আমি সতর্ক থাকব!"

সবাই ভয়ানকভাবে চমকে উঠল, টর তীব্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কোন দুইজন?"

নুট মাথা নাড়ল, বলল, "আমি বলব না। আমি সেটা জানি কিন্তু আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ ছাড়া আমার কথার কোনো গুরুত্ব নেই, বরং সেটা একটা জটিলতা তৈরি করবে। আমি তাই প্রমাণের জন্যে অপেক্ষা করছি।"

টর মাথা নেড়ে বলল, "আসলে তুমি জান না।"

"জানি।"

"তুমি কথা বলতে না সেটাই ভালো ছিল।"

নুট হাসার চেষ্টা করল, "আমি বলতে চাই নি কিন্তু নীহা ভেঙে পড়ছে দেখে বলছি।" নুট নীহার দিকে তাকিয়ে বলল, "যখন আমরা একশ ভাগ খাঁটি প্রমাণসহ রোবোমানবদের আলাদা করব—তখন ট্রিনিটি আমাদের যে কয়জন বেঁচে থাকবে সেই বাকি মানুষদের মহাকাশযানে নিয়ে নেবে। তুমি সেটাকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা হিসেবে নিতে পার।"

নীহা কিছুক্ষণ নুটের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "ধন্যবাদ নুট। তুমি আমার ভেতরে যথেষ্ট কৌতূহল তৈরি করেছ! আমি আরো এক দুই দিন বেঁচে থাকার জন্যে চেষ্টা করতে রাজি আছি!"

"চমৎকার।"

ক্লদ নুটের পোশাক স্পর্শ করে বলল, "নুট!"

"বল।"

"কোন দুইজন রোবোমানব আমিও সেটা জানি।"

নুট হাসল, বলল, "চমৎকার! কিন্তু কাউকে সেটা বোলো না। আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

ক্লদ মাথা নাড়ল, "না বলব না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

মহামান্য থুল বাগানে তার চেয়ারটিতে বসেছিলেন। সূর্য ডুবে যাবার পর একটা শীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে। তার একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়ে বসা উচিত ছিল। দুই হাত বুকের কাছে এনে অনেকটা শিশুর মতো গুটিসুটি মেরে তিনি চেয়ারে বসে রইলেন।

পাশে তথ্যবিজ্ঞানী জুহু দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, "মহামান্য থুল, এখন আপনার ঘরের ভেতরে চলে যাওয়া উচিত।"

মহামান্য থুল বললেন, "ঠিকই বলেছ, কিন্তু উঠতে আলস্য লাগছে। বয়স হয়ে গেলে এটি হচ্ছে সমস্যা! সহজ কাজটিও তখন কঠিন।"

"তা হলে কি আপনার জন্যে একটা গরম কাপড় নিয়ে আসব?"

"না, না, না, কোনো প্রয়োজন নেই!" মহামান্য থুল ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তুমি বরং চেয়ারটা টেনে বস। তোমার সাথে একটু কথা বলি।"

জুহু একটা চেয়ার টেনে মহামান্য থুলের কাছে বসল। মহামান্য থুল দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পৃথিবীতে খাবার পরিবহনের কাজটা কি শেষ করা হয়েছে?"

"করা হয়েছে মহামান্য থুল। আপনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে পৃথিবীর একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও খাদ্যশস্য পৌঁছে দেয়া হয়েছে।"

"শুকনো প্রোটিন?"

"সেটিও।"

"মৌলিক ওষুধপত্র।"

"যথেষ্ট পরিমাণে।"

"চমৎকার।"

AMARBOI.COM

"কেন সেটি করা হল সেটি আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। মূল ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনের সময় খাবার পাঠানো অনেক বেশি কার্যকর পদ্ধতি। এখন অনেক জায়গায় নূতন করে শস্য সংরক্ষণের জন্যে ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এত অল্প সময়ে সেটা করা খুব সহজ হয় নি। তারপরেও করেছি—আপনার নির্দেশ সবাই খুব গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছে।"

"ধন্যবাদ জুহু।"

মহামান্য থুল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "জুহু।"

"বলুন মহামান্য থুল।"

"আমরা যে মহাকাশযানটা পাঠিয়েছিলাম তার খবর কি জান?"

"জানি মহামান্য থুল।" জুহু মাথা নেড়ে বলল, "তাদের নিয়ে দুঃসংবাদ আছে।"

"কী দুঃসংবাদ।"

"সাতজন মহাকাশচারীর মাঝে দুইজন রোবোমানব জানার পর মহাকাশযানের মূল কম্পিউটার সাতজন অভিযাত্রীকেই মহাকাশযান থেকে বের করে দিয়েছে।"

"বের করে দিয়েছে? কোথায়?"

"মঙ্গল গ্রহে।"

মহামান্য থুল শিস দেয়ার মতো শব্দ করলেন। "মঙ্গল গ্রহ তো থাকার উপযোগী গ্রহ নয়। সেখানে গত শতাব্দীতে তেজস্ক্রিয় এক ধরনের প্রাণী তৈরি করা হয়েছিল। সেই প্রাণীগুলো তো এখনো শেষ হয় নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুহ মাথা নাড়ল, বলল, "খুবই ভয়ংকর পরিবেশ। মহাকাশচারীদের বেঁচে থাকার কথা না। সম্ভবত সবাই এর মাঝে মারা গেছে।"

মহামান্য থুল মাথা নেড়ে বললেন, "যদি সম্ভব হয় তুমি তাদের সাথে একটু যোগাযোগ করতে পারবে?"

"পারব মহামান্য থুল। যদি তারা বেঁচে থাকে তা হলে পারব।"

"চমৎকার।"

মহামান্য থুল হঠাৎ করে একটা গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। জুহ কী করবে বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। তারপর অত্যন্ত দ্বিধান্বিতভাবে বলল, "মহামান্য থুল, আমি কি এখন চলে যাব?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। যাবার আগে শুধু তোমার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই।"

"বলুন মহামান্য থুল।"

"প্রিসা নগরীর উত্তরে একটা বন আছে না?"

"আছে মহামান্য থুল।"

"সেই বনে কি একটা আগুন লাগানো সম্ভব?"

জুহ অবাক হয়ে বলল, "আগুন লাগানো?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি আদেশ দিলে অবশ্যই সম্ভব!"

"কিন্তু কাজটি করতে হবে গোপনে।" মহামান্য থুল দুর্বল ভঙ্গিতে হেসে বললেন, "কেন এটা করতে চাইছি তুমি আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না!"

"আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করব না।"

"ধন্যবাদ জুহ। তুমি আগামীকাল দুপুরে বনটিতে আগুন লাগিয়ে দিও। আর তার একটু আগে লিন্টাস শহরের নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রের পানি সরবরাহ কেন্দ্রে পাঁচ লিটার তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ফেলে আসতে হবে।"

"পাঁচ লিটার তেজস্ক্রিয় আয়োডিন?"

"হ্যাঁ।"

"কাজটি খুবই বিপজ্জনক, কিন্তু আপনি চাইলে অবশ্যই করা সম্ভব।" জুহ খুব কষ্ট করে তার বিস্ময়টুকু গোপন করে বলল, "আর কিছু মহামান্য থুল?"

"হ্যাঁ। আরো কয়েকটা ছোট-বড় কাজ যদি আমার জন্য করে দাও তা হলে খুব ভালো হয়।"

"আপনি বলুন।"

মহামান্য থুল তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে জুহর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই যে এখানে আমি লিখে দিয়েছি! তুমি পড়ে হাসাহাসি কোরো না!"

জুহ বলল, "আপনার নির্দেশ শুনে আমি হাসাহাসি করব? কী বলছেন আপনি মহামান্য থুল!"

"নির্দেশগুলো হাস্যকর সেজন্যে বলছি!"

জুহ কাগজের লেখাগুলো পড়ল। সেখানে বিচিত্র অনেকগুলো নির্দেশ দেয়া আছে। মাজুরা ইলেকট্রিক কোম্পানির ফোরম্যানকে অগ্রিম বোনাস দেয়া, সবুজ পৃথিবী শিশু স্কুলের বাচ্চাদের সকাল দশটায় আর্ট মিউজিয়ামে নেয়া, মাহীরা হ্রদের স্লুইস গেট খুলে নিচের শুষ্ক

অঞ্চলকে প্লাবিত করে দেয়া, বিনোদনের জন্যে আলাদা করে রাখা দুটি উপগ্রহকে অচল করে দেয়া, এরকম অনেকগুলো বিচিত্র নির্দেশ দেয়া আছে। মহামান্য থুলের ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জুহুর মনে কোনো সন্দেহ নেই বলে সে কাগজের লেখাগুলো পড়ে বিচলিত হল না। মহামান্য থুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি নিশ্চিত থাকুন মহামান্য থুল। আপনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে প্রত্যেকটা কাজ করা হবে।"

"ধন্যবাদ জুহু। অনেক ধন্যবাদ।"

জুহু মহামান্য থুলকে অভিবাদন জানিয়ে লম্বা পা ফেলে বের হয়ে এল।

থুল একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

১৫

মাইক্রোফোনের সুইচটি অন করে লাল চুলের মেয়েটি বলল, "তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

মস্তিষ্কটি ভারী গলায় বলল, "হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি।"

লাল চুলের মেয়েটি বলল, "আজকে খুব একটা বিশেষ দিন। আজকে তোমার সাথে অবশ্যই কথা বলতে হবে।"

মস্তিষ্কটি কোনো উত্তর দিল না। মেয়েটি বলল, "কী হল তুমি কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?"

"তুমি জান, আমি তোমার উচ্ছ্বাসে অংশ নিতে পারি না। যেটি তোমার বিশেষ দিন পৃথিবীর মানুষের জন্যে সেটি নিশ্চয়ই খুব অশুভ একটি দিন।"

লাল চুলের মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, "তুমি ঠিকই অনুমান করেছ! তুমি শুনতে চাও না কেন এটি মানুষের জন্যে অশুভ?"

"না। আমি শুনতে চাই না।"

"না চাইলেই হবে না। তোমাকে শুনতে হবে। এগুলো গোপন কথা। ভয়ংকর গোপন কথা। সারা পৃথিবীতে এখন আমরা মাত্র কয়েকজন রোবোমানব এটি জানি। এটা কাউকেই বলার কথা না—কিন্তু আমি নিশ্চিন্তে তোমাকে সবকিছু বলতে পারি! তোমার মতো নিরাপদ শ্রোতা সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই!"

"আমি শুনতে চাই না।"

"তোমাকে শুনতে হবে।" লাল চুলের মেয়েটি কঠিন মুখে বলল, "তোমাকে অবশ্যই শুনতে হবে। আমার যা ইচ্ছে হয় আমি তোমাকে বলব তোমার তার সবকিছু শুনতে হবে!"

লাল চুলের মেয়েটি তার পানীয়ের গ্লাসে খানিকটা উত্তেজক পানীয় ভরে এনে জানালায় পা ভাঁজ করে বসে বলল, "তুমি শুনে নিশ্চয়ই আতঙ্কিত হবে, আমরা আমাদের কাউন্ট ডাউন শুরু করেছি। আগামীকাল বিকেল তিনটা হচ্ছে আমাদের আক্রমণের সময়। পৃথিবীর সব বড় বড় আক্রমণ হয় ভোর রাতে। আমরা ঠিক করেছি আমাদের আক্রমণটি হবে দিনের আলোতে। সন্ধেবেলা সব মানুষ যখন সারা দিনের ব্যস্ততা কাটিয়ে নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে বিশ্রাম নেবে তখন আমরা আমাদের ঘোষণাটি প্রচার করব। ঘোষণায় কী বলা হবে শুনতে চাও?"

মস্তিষ্কটি নিচু গলায় বলল, "না শুনতে চাই না।"

"তুমি শুনতে চাও কি না চাও তাতে কিছু আসে যায় না। ঘোষণাটি হবে এরকম, বলা হবে, পৃথিবীর রোবোমানবেরা। তোমরা যে ঘোষণাটির জন্য দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষা করেছিলে, আমরা এখন সেই ঘোষণাটি করতে চাই। আজ থেকে পৃথিবীতে সকল বৈষম্য সকল অবিচারের অবসান হয়েছে। এই পৃথিবীতে যে সম্প্রদায়ের বুদ্ধিমত্তা বেশি, যে সম্প্রদায়ের মেধা বেশি, ক্ষমতা বেশি সেই সম্প্রদায়ের অধিকারও বেশি। মানুষের যে অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে পৃথিবীতে সভ্যতা গড়ে উঠতে পারছে না, সেই নেতৃত্বকে অপসারণ করা হয়েছে। প্রিয় রোবোমানব এবং মানুষেরা তোমরা শুনে খুশি হবে যে নেতৃত্বের কারণে পৃথিবীতে আমাদের অত্যাচার নির্যাতন অবিচার আর বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে সেই নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে বিচারের সম্মুখীন করা হবে—"

মস্তিষ্কটি আর্তচিৎকার করে উঠল, "না!"

লাল চুলের মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "না? কেন না?"

"এটা হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না।"

মেয়েটি তার পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। এটি আসলেই হতে পারে না। এটি আসলে একটা মিথ্যা ঘোষণা। বিজ্ঞান আকাদেমির এগারজন সদস্যকে বিচার করা হবে সেই ঘোষণাটি আসলে সত্যি নয়। কেন সত্যি নয় জান?"

"না। জানি না।"

"তার কারণ, আগামীকাল বিকেল তিনটার সময় সবার আগে তাদের বাসায় গিয়ে তাদের হত্যা করা হবে। কে কাকে হত্যা করবে সেটাও ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের সর্বাধিনায়ক হত্যা করবে তোমাদের মহামান্য থুলকে নিজের হাতে। সেই দৃশ্যটি দেখার জন্যে আমার সমস্ত শরীর আকুলি-বিকুলি করছে।" মেয়েটি অপ্রকৃতিস্থের মতো একটা শব্দ করে বলল, "আহ্! সেই দৃশ্যটি কী অভূতপূর্ব হবে তুমি চিন্তা করতে পার?"

মস্তিষ্কটি কাতর গলায় বলল, "আমি চিন্তা করতে চাই না! আমি শুনতে চাই না। তোমার দোহাই লাগে—"

মেয়েটির শরীরে উত্তেজক পানীয় কাজ করতে শুরু করেছে। সে মাটিতে পা দাপিয়ে বলল, "তোমাকে শুনতে হবে হতভাগা মস্তিষ্ক! তোমাকে সব শুনতে হবে। নেটওয়ার্ক দখল করে আমরা কীভাবে সব রোবোমানবকে নির্দেশ পাঠাব তোমাকে সেটা শুনতে হবে। কীভাবে অস্ত্রাগারের দরজা খুলে দেয়া হবে সেটা শুনতে হবে। কীভাবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো দখল হবে শুনতে হবে, কীভাবে শস্যভাণ্ডার দখল হবে শুনতে হবে, কীভাবে সুস্থ-সবল মানুষের মাথায় ইমপ্ল্যান্ট বসিয়ে রোবোমানব তৈরি করব শুনতে হবে—"

মস্তিষ্কটি আর্তচিৎকার করে বলল, "শুনতে চাই না! আমি কিছুই শুনতে চাই না—দোহাই তোমার—"

লাল চুলের মেয়েটি অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসতে থাকে। কিছুতেই হাসি থামাতে পারে না।

১৬

সাতজনের ছোট দলটি নিঃশব্দে হেঁটে যেতে থাকে। তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই। পৃথিবী হলে এখানে পাখির ডাক ডাকত, ঝিঁঝি পোকার ডাক থাকত। গাছের পাতার মাঝে বাতাসের শিরশির শব্দ থাকত। দূর থেকে কোনো একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গ ভবঘুরের গানের সুর ভেসে আসত। এখানে কিছু নেই। ইহিতার কাছে এই নৈঃশব্দ্যটুকু অসহ্য মনে হয়।

ইহিতা দূরে তাকাল। সূর্যটি অস্ত যাচ্ছে, লাল এই গ্রহে দূরে নিষ্প্রাণ সূর্যটিকে কেমন যেন অপরিচিত মনে হয়। ঠিক পৃথিবীর মতোই খুব ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে আসবে। একটু পর ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে যাবে। মঙ্গল গ্রহের কুৎসিত চাঁদ দুটি আকাশে থাকবে কি না কে জানে, থাকলেও সেটা কতটুকু আলো দিতে পারবে সেটাই বা কে জানে। শৈশবে এই গ্রহটিকে নিয়ে সে কত পড়াশোনা করেছে, তখন কি সে কল্পনা করেছিল একটি নির্বোধ কম্পিউটারের কারণে এই গ্রহটিতে নির্বাসিত হয়ে যাবে?

একটি ঢালু পাহাড়ের নিচে এসে সুহা বলল, "আমরা এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই। ক্লদ মনে হয় একটু ক্লান্ত হয়ে গেছে।"

ক্লদ বলল, "উহু। আমি ক্লান্ত হই নি। আমি কখনো ক্লান্ত হই না।"

ইহিতা বলল, "চমৎকার! কিন্তু পরিশ্রম করলে ক্লান্ত হওয়াটা দোষের কিছু নয়। তুমি যদি ক্লান্ত হও, তা হলে আমাদের বল। আমরা তোমাকে ট্রান্সপোর্টারে বসিয়ে নিয়ে যাব। কোনো পরিশ্রম ছাড়াই তখন যেতে পারবে।"

টুরান বলল, "আমাদের একটা বাইভার্বাল থাকলে চমৎকার হত, অনেক তাড়াতাড়ি যেতে পারতাম।"

টর দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "হতভাগা ট্রিনিটি আমাদের ছোট একটা স্কাউটশিপে করে এখানে পাঠিয়েছে, খাবার আর পানি নিয়েই টানাটানি, এখানে বাইভার্বাল কেমন করে পাঠাবে?"

নীহা আপনমনে তার কুগুরাভ সমীকরণ সমাধান খুঁজে যাচ্ছিল, তার চারপাশে সবাই কে কী বলছে ভালো করে শুনছিল না। হঠাৎ করে সে বলল, "আমার অনেকক্ষণ থেকে এক ধরনের অস্বস্তি হচ্ছে। আমি কেন জানি আমার ভাবনায় মনোযোগ দিতে পারছি না।"

"কেন?"

"আমার—আমার—" নীহা তার বাক্যটিকে শেষ না করে থেমে গেল।

ইহিতা জানতে চাইল, "তোমার কী?"

"আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, কেউ আমাদের চোখে চোখে রাখছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাদের লক্ষ করছে। কেমন জানি অশুভ একটা অনুভূতি।"

সুহা বলল, "সেটি হতেই পারে। আমরা সবাই তেজস্ক্রিয় প্রাণীকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে আছি।"

নীহা মাথা নাড়ল, বলল, "না সেরকম নয়। আমাদের অনুভূতিটি অনেক বাস্তব। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চারদিকে অন্ধকার—মনে হচ্ছে অন্ধকারের বাইরে অনেকগুলো চোখ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।"

টুরান কষ্ট করে একটু হাসির মতো শব্দ করল, বলল, "তেজস্ক্রিয় প্রাণী নিয়ে ভয় আমার ভেতরেও আছে। কিন্তু অশুভ অনুভূতি বা অন্ধকারে চোখ এগুলো তোমার কল্পনা। কারণ তেজস্ক্রিয় প্রাণী যদি কাছাকাছি আসে তা হলে আমাদের মিটারে আমরা রিডিং পাব। এই দেখ এখানে কোনো রিডিং নেই।" বলে টুরান তেজস্ক্রিয়তা মাপার ছোট যন্ত্রটি নীহাকে দেখাল।

ঠিক তখন তেজস্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্রটা থেকে হঠাৎ করে কট কট করে এক ধরনের শব্দ হতে থাকে। সবাই বিস্ফারিত চোখে মিটারটির দিকে তাকিয়ে থাকে। সেখানে কাঁটাটি নড়ছে, কিছু আলো জ্বলতে নিভতে থাকে আর শব্দটা দ্রুততর হতে থাকে।

ইহিতা নিচু গলায় বলল, "নীহার ধারণা সঠিক। প্রাণীগুলো আমাদের দিকে আসছে।"

নীহা আর্তচিৎকার করে বলল, "সর্বনাশ!"

সুহা বলল, "আমরা কী করব?"

ইহিতা বলল, "প্রাণীগুলোকে ঠেকানোর চেষ্টা করতে হবে।"

"কীভাবে?"

"অস্ত্র দিয়ে।" ইহিতা ডানে বামে তাকাল, বলল, "পিছনে বড় পাথরগুলো আছে, এখানে দাঁড়াই তা হলে শুধু সামনের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নাও। শোনো খুব কাছে না আসা পর্যন্ত গুলি কোরো না। গুলি যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়।"

সবাই ছুটে বিশাল পাথরটাকে পিছনে রেখে দাঁড়াল। ইহিতা হেলমেটের সুইচ টিপে সেটাকে ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর জন্যে সংবেদনশীল করার চেষ্টা করে। অবলাল আলোতে কিছু দেখতে পেল না কিন্তু আলট্রাভায়োলেট তরঙ্গে যেতেই সে প্রাণীগুলোকে স্পষ্ট দেখতে পায়। অনেকগুলো প্রাণী গুড়ি মেরে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রাণীর শরীরের যে জায়গা থেকে অতিবেগুনি রশ্মি বের হচ্ছে শুধু সেই অংশটুকু দেখতে পাচ্ছে তাই প্রকৃত আকারটা বোঝা যাচ্ছে না। অনুমান করা যায় প্রাণীটি আকারে খুব উঁচু নয়—হাত-পা থাকতে পারে, দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

ইহিতা ফিসফিস করে বলল, "তোমাদের হেলমেট অতিবেগুনি রশ্মিতে সংবেদনশীল করে নাও।"

নীহা জানতে চাইল, "তা হলে কী হবে?"

"প্রাণীগুলো দেখতে পাবে।"

নীহার সাথে সাথে অন্য সবাই তাদের হেলমেটের গগলস অতিবেগুনি রশ্মিতে সংবেদনশীল করে নিল, সাথে সাথে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসা প্রাণীগুলো দেখতে পায়। টর চাপা স্বরে একটা কুৎসিত গালি দিয়ে বলল, "আরেকটু কাছে আয় হতভাগারা—অনেক দিন কারো উপর গুলি চালাই নি।"

ইহিতা ফিসফিস করে বলল, "সাবধান, প্রয়োজন না হলে গুলি কোরো না।"

"কেমন করে বুঝব প্রয়োজন নেই!"

"যদি দেখ প্রাণীগুলো থেমে গেছে। যদি দেখ আমাদের দিকে এগিয়ে না এসে ইতস্তত অন্যদিকে যাচ্ছে।"

"কেন থেমে যাবে? কেন ইতস্তত অন্যদিকে যাবে?"

ইহিতা ফিসফিস করে বলল "জানি না। শুধু দেখ যায় কি না।"

সবাই অস্ত্র তাক করে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে ঠিক তখন যেন ইহিতার ধারণাকে সত্যি প্রমাণ করার জন্যে প্রাণীগুলোর গতি কমে আসে, প্রাণীগুলোর অনেকগুলো থেমে যায়, অনেকগুলো ইতস্তত এদিক-সেদিক হাঁটতে থাকে।

টুরান ফিসফিস করে বলল, "কী হয়েছে?"

ইহিতা বলল, "সবাই চুপ। কেউ একটা কথা বলবে না। একটা শব্দ করবে না। কোনো কিছু না নড়লে প্রাণীগুলো দেখতে পায় না। কেউ নড়বে না। একেবারে কাছে এলেও নড়বে না।"

সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রাণীগুলো ইতস্তত এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। একটা প্রাণী তাদের কাছাকাছি এসে ডান দিকে সরে যায় সেখান থেকে হঠাৎ করে ঘুরে সোজাসুজি তাদের দিকে এগিয়ে আসে। সুহা ফিসফিস করে বলল, "সর্বনাশ!"

অন্য কেউ কোনো কথা বলল না। সবাই দেখল কিছু একটা দুলতে দুলতে তাদের দিকে আসছে। কাছাকাছি আসার পর প্রথম প্রাণীটার অবয়ব স্পষ্ট দেখা যায়। রেডিয়েশন মিটারটি নিঃশব্দ করে রাখা আছে বলে সেটি শব্দ করছে না কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড রেডিয়েশনে তার কাঁটাটি থরথর করে কাঁপছে।

প্রাণীটি আরো কাছে এগিয়ে আসে, এটি পৃথিবীর কোনো প্রাণীর মতো নয়। মনে হয় মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে একটি অতিকায় কুৎসিত ক্লেদাক্ত কীট তৈরি করা হয়েছে। ধারালো দাঁতের পিছনে লকলকে জিব। চোখ আছে কি নেই বোঝা যায় না। প্রাণীটি খুব কাছে এসে তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখল তারপর একটু বাম দিকে সরে দুলতে দুলতে নড়তে নড়তে সরে গেল। হঠাৎ করে তারা মাটিতে একটা কম্পন অনুভব করে, সাথে সাথে সবগুলো প্রাণী একসাথে ঘুরে গেল তারপর ছুটতে ছুটতে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইহিতা ফিসফিস করে বলল, "এখন কেউ কোনো শব্দ কোরো না। কেউ একটুও নড়ো না। প্রাণীগুলো আগে একেবারে সরে যাক।"

যখন প্রাণীগুলো একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল তখন নীহা একটা দীর্ঘশ্বাসকে বুক থেকে বের করে দিয়ে বলল, "খুব বাঁচা বেঁচে গেছি।"

টর বলল, "একটা গুলি পর্যন্ত করতে পারলাম না।"

"তুমি গুলি করতে চাইছিলে?"

"হ্যাঁ। অনেক দিন কোনো অস্ত্র ব্যবহার করি নি, হাত নিশপিশ করছিল।"

সবাই এক ধরনের সন্দেহের চোখে টরের দিকে তাকিয়ে থাকে। টুরান একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি একটা কথা বলতে পারি?"

সবাই এবার ঘুরে টুরানের দিকে তাকাল, সুহা বলল, "বল।"

টুরান বলল, "তোমাদের মনে আছে আমরা যখন মহাকাশযানে করে আমাদের যাত্রা ঠিক শুরু করতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন ইহিতা আমাদের সবার সাথে একবার কথা বলতে চাইছিল?"

সবাই মাথা নাড়ল। টুরান বলল, "আমি এক ধরনের গোঁয়ার্তুমি করে ইহিতাকে কথা বলতে দিই নি। তার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। অপমানসূচক কথা বলেছিলাম।"

ইহিতা নিচু গলায় বলল, "তুমি এমন কিছু অপমানসূচক কথা বল নি।"

"বলেছিলাম। আমার খুব কাছাকাছি থাকা একটি মেয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সেই থেকে আমি পুরোপুরি নারী জাতির বিদ্বেষী হয়ে গিয়েছিলাম, কোনো মেয়েকে সহ্যই করতে পারতাম না—কোনো মেয়ের কথাও শুনতে চাইতাম না। বিষয়টা খুবই বড় নির্বুদ্ধিতা হয়েছিল।"

কেউ কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে টুরানের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল সে কী বলতে চাইছে।

"ইহিতা তখন যে কথাগুলো বলতে চাইছিল, আমি এখন তোমাদের সাথে সেই কথাগুলো বলতে চাই।"

টর জিজ্ঞেস করল, "সেই কথাগুলো কী?"

"আমরা সাতজন মানুষ অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা পথ পাড়ি দিচ্ছি, এইমাত্র একটা খুব বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি। সামনে পাব কি না জানি না। বিপদ আসবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই রকম অসম্ভব বিপজ্জনক অবস্থা হলে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে

হয়—সব সময় সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তটি নেয়া যায় না—তার সময় থাকে না। তখন খুব দ্রুত মোটামুটি সঠিক একটা সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেটা খুবই জরুরি।"

টর বলল, "আমি এখনো বুঝতে পারছি না, তুমি কী বলতে চাইছ!"

"তুমি বুঝতে পারছ না কারণ আমি এখনো কথাটি বলি নি।"

"তাড়াতাড়ি বলে ফেল।"

টুরান বলল, "আমি যদি ঠিক করে অনুমান করে থাকি তা হলে ইহিতা আমাদের বলতে চেয়েছিল মানুষের একটা দল হিসেবে আমাদের একটা দলপতি থাকা দরকার। যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শুধু তাই না, দলপতিকে মেনে নিলে আমরা সবাই তার সিদ্ধান্তটি কোনোরকম প্রশ্ন না করে মেনে নিতে পারব।"

টুরান একটু থামল এবং সবাই তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে সবার দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, "এই মুহূর্তে আমাদের একজন দলপতি দরকার। আমি দলপতি হিসেবে ইহিতার নাম প্রস্তাব করছি। একটু আগে ইহিতা আমাদের যে কথাগুলো বলেছে তার প্রত্যেকটি কথা সত্যি বের হয়েছে। সে আমাদের ভয়ংকর বিপদে নিজে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে।"

টর বলল, "আমাদের মাঝে দুইজন রোবোমানব আছে, তুমি কেমন করে জান ইহিতা একজন রোবোমানব না?"

টুরান থতমত খেয়ে বলল, "সেটা আমি জানি না। কেউই জানে না।"

নুট একটু এগিয়ে এসে বলল, "আমি জানি, ইহিতা রোবোমানব না।"

টর মাথা ঘুরিয়ে নুটের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি জান না। তুমি অনুমান করছ।"

নুট বলল, "না। আমি জানি। আমার টুরানের প্রস্তাবটা খুব পছন্দ হয়েছে। আমিও ইহিতাকে আমাদের দলপতি হিসেবে গ্রহণ করছি।"

নীহা বলল, "আমিও।"

সুহা বলল, "আমিও তাকে দলপতি হিসেবে চাই।"

ক্লদ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আলাপটা বোঝার চেষ্টা করল। সে এমনিতে খুবই ছটফটে ছেলে, কিন্তু একটু আগে এত কাছে থেকে তেজস্ক্রিয় প্রাণীগুলো দেখার পর থেকে সে হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেছে। সে কিছুক্ষণ ইহিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমিও চাই।"

টর বলল, "তার মানে বাকি রয়েছি শুধু আমি?"

কেউ কোনো কথা বলল না। টর বলল, "আমার অবিশ্যি কোনো পথ বাকি থাকল না। আমাকেও মেনে নিতে হচ্ছে।"

টুরান বল, "চমৎকার।"

ইহিতা বলল, "আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না মঙ্গল গ্রহের এই পাহাড়ের নিচে এই ধূলিঝড়ের মাঝে, তেজস্ক্রিয় প্রাণীদের আনাগোনার মাঝে আমরা বসে বসে একটা নাটক করছি! কিন্তু আমি এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করব না। সময় খুব মূল্যবান। আমি সময়টা বাঁচাতে চাই। আমাকে যেহেতু দলপতির দায়িত্ব দিয়েছ আমি সেই দায়িত্ব নিচ্ছি—শুধুমাত্র এই বিপজ্জনক পথের অংশটুকুতে। যদি ঠিকভাবে মানুষের আবাসস্থলে পৌঁছাতে পারি তখন অন্য কাউকে দায়িত্ব নিতে হবে।"

"সেটি তখন দেখা যাবে।" টুরান বলল, "তা ছাড়া আমরা একটি খেলার টিম তৈরি করছি না যে একেক খেলায় একেকজন দলপতি হবে।"

ইহিতা বলল, "সেই আলোচনা থাকুক। তোমরা সবাই এখনই রওনা দাও। দ্রুত আমি আসছি।"

নীহা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথা থেকে আসছ?"

"সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। সবাই হাঁটতে শুরু কর।"

সবাই হাঁটতে হাঁটতে দেখল, ইহিতা পিঠ থেকে তার ব্যাকপেক নামিয়ে মাটিতে উবু হয়ে কিছু একটা করছে। কী করছে কেউ অনুমান করতে পারল না।

ইহিতা তার কাজ শেষ করে একটু জোরে হেঁটে ছোট দলটির সাথে যোগ দিল। টর জিজ্ঞেস করল, "কাজ শেষ হয়েছে?"

"হ্যাঁ হয়েছে।"

টর আশা করছিল ইহিতা বলবে সে কী করেছে, ইহিতা বলল না। তখন টর নিজেই জিজ্ঞেস করল, "তুমি পিছনে কী করে এসেছ?"

"এমন কিছু নয়।"

"তার মানে তুমি আমাদের বলতে চাইছ না?"

"না।"

"কেন?"

"টর, তোমার একটা বিষয় বুঝতে হবে। তোমরা আমাকে তোমাদের দলপতি বানিয়েছ, এখন আমার উপর কিছু বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়েছে। শুধু আমাকে বেঁচে থাকলে হবে না—তোমাদেরকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেজন্যে আমাকে কিছু বাড়তি কাজ করতে হবে। আমি সেটা করছি। যখন তোমাদের এটা জানার প্রয়োজন হবে আমি তোমাদের জানাব।"

টর কিছু বলল না, ইহিতার কথাটা তার খুব পছন্দ হল বলে মনে হল না।

ছোট দলটি চার ঘণ্টা হাঁটার পর ইহিতা বলল, "আমরা এখন বিশ্রাম নেব।"

নীহা বলল, "তোমার এই অসাধারণ সিদ্ধান্তের জন্যে অনেক ধন্যবাদ ইহিতা। আমি ভেবেছিলাম তুমি আর কোনোদিন বুঝি একটু বিশ্রাম নেবার কথা বলবে না।"

ইহিতা বলল, "শক্তি থাকতে থাকতে আমি যতটুকু সম্ভব পথ অতিক্রম করে ফেলতে চাইছিলাম।"

ক্লদ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, টুরান এতক্ষণ তাকে ট্রান্সপোর্টারে শুইয়ে এনেছে, এবারে তাকে নিচে শুইয়ে দিয়ে বলল, "ভাগ্যিস মঙ্গল গ্রহে মাধ্যাকর্ষণ বল অনেক কম, তা না হলে ক্লদকে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে যেত।"

সুহা টুরানের হাত স্পর্শ করে বলল, "আমি যে তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না! কতটুকু পথ ক্লদকে ট্রান্সপোর্টারে করে এনেছ!"

টুরান পাথরে পা ছড়িয়ে বসে বলল, "ধন্যবাদ দেবার তুমি আরো ভালো সুযোগ পাবে—এবারে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নেয়া যাক।"

ইহিতা বলল, "সবাইকে মনে করিয়ে দিই—এবার যখন রওনা দেব তখন কিন্তু আর থামাথামি নেই। রওনা দেবার আগে সবাই খানিকটা স্নায়ু-উত্তেজক পানীয় খেয়ে নিও। তা হলে খিদেও পাবে না, ক্লান্তও হবে না। ঘুমাতেও হবে না।"

নীহা বলল, "যখন রওনা দেব তখন সেটা দেখা যাবে। এই মুহূর্তে আমার ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আমি একটু ঘুমাই যখন রওনা দেবে তখন ডেকে তুলো।"

সুহা বলল, "তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও। তোমাকে দেখে আমার হিংসা হচ্ছে।"

"কেন? হিংসা হচ্ছে কেন?"

"এরকম একটা পরিবেশে যার ঘুম পায় তাকে দেখে হিংসা হতেই পারে!"

AMARBOI.COM

নীহা চোখ বন্ধ করতে করতে বলল, "তোমাকে কৃগুরাভ সমস্যাটা শিখিয়ে দেব—তার সমাধানের কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে যাবার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই!"

১৭

নীহা ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠল। টুরান ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ঘুম থেকে তোলার চেষ্টা করে বলল, "নীহা! ওঠ।"

নীহা ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

"প্রাণীগুলো আসছে। রেডিয়েশন মিটারে আমরা সিগন্যাল পাচ্ছি।"

"সর্বনাশ! এখন কী হবে?"

ইহিতা বলল, "যা হবার সেটাই হবে। ভয় পাবার কিছু নেই। অস্ত্রটা তৈরি রাখ।"

নীহা অস্ত্রটা তাক করে গুড়ি মেরে বসে বলল, "আমরা তো নড়ছি না, প্রাণীগুলো আমাদের দেখছে কেমন করে?"

"জানি না। মনে হয় বাইরের তাপমাত্রা কমে যাবার কারণে আমাদের স্পেসস্যুট থেকে অনেক বেশি তাপ বিকিরণ করছে।"

নীহা কথা না বলে তার চোখের গগলসটি অতিবেগুনি রশ্মিতে সংবেদনশীল করে নিল, সাথে সাথে চারপাশের জগৎটা অন্য রকম দেখাতে থাকে, তার মাঝে সে দূরে প্রাণীগুলোকে দেখতে পেল। সেগুলো গুড়ি মেরে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, খুব ধীরে ধীরে চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।

ইহিতা ফিসফিস করে বলল, "আমি না বলা পর্যন্ত কেউ গুলি শুরু করবে না।"

"ঠিক আছে।"

সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল, দেখতে পেল প্রাণীগুলো তাদের দিকে দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে। রেডিয়েশন মিটারের কাঁটাটি নড়তে থাকে, প্রাণীগুলো থেকে চারপাশে তীব্র তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রাণীগুলো আরেকটু কাছে এগিয়ে এল, এখন তাদের চেহারাগুলো দেখা যেতে শুরু করেছে। তারা অবাক হয়ে লক্ষ করল প্রাণীগুলো একরকম নয়, তাদের মাঝে গঠনগত একটা মিল আছে, সবগুলোরই সামনে বীভৎস ধারালো দাঁত, বড় মুখ। মুখটি কখনো শরীরের উপর, কখনো নিচে। অনেকগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কখনো তাদের অতিকায় মাকড়সার মতো মনে হয়, কখনো ক্লেদাক্ত কীটের মতো মনে হয়।

প্রাণীগুলো আরেকটু এগিয়ে এল, তাদের হিংস্র গর্জন খুব ক্ষীণভাবে তারা শুনতে পায়। মাটিতে মৃদু কম্পন অনুভব করতে পারে।

যদিও কথা ছিল ইহিতা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত কেউ গুলি করবে না, কিন্তু হঠাৎ করে টর প্রচণ্ড আক্রোশে গুলি করতে শুরু করল। সাথে সাথে যেন নরক নেমে আসে, প্রাণীগুলো ছুটে তাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সেগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তারপরেও সেগুলো থেমে যায় না—আরো ভয়ংকর আক্রোশে সেগুলো ছুটে আসতে থাকে। প্রাণীগুলোর ছিন্নভিন্ন দেহগুলোও গড়িয়ে গড়িয়ে পাথরে ঘষতে ঘষতে কাঁপতে কাঁপতে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে।

ইহিতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—একটা প্রাণীকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার পরও তার প্রতিটি অংশ যদি আলাদাভাবে জীবিত থেকে যায়, প্রতিটি অংশই যদি নিজের মতো করে তাদের আক্রমণ করতে থাকে তা হলে তার বিরুদ্ধে তারা কেমন করে টিকে থাকবে?

ইহিতা তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে কয়েকবার গুলি করে প্রাণীগুলোকে খানিকটা দূরে সরিয়ে দিল। তারপর দ্রুত তার পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোলটা বের করে। পথের মাঝখানে সে একটা সনিক চার্জার বসিয়ে এসেছে, সেটা ব্যবহার করা যায় কি না পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

রিমোট কন্ট্রোলের প্যানেলটি চোখের সামনে ধরে সে দ্রুত তার রেটিনা স্ক্যানিং করে নিয়ে বোতামগুলো স্পর্শ করে। প্রায় সাথে সাথেই সে একটা কম্পন এবং একটু পর বিস্ফোরণের চাপা শব্দ শুনতে পেল। ইহিতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষ্যাপা প্রাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল এবং হঠাৎ করে তার মনে হল প্রাণীগুলোর মাঝে এক ধরনের নূতন চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

ইহিতা চিৎকার করে বলল, "থামাও। গুলি থামাও! সবাই গুলি থামাও।"

সবাই গুলি থামাল এবং দেখতে পেল হঠাৎ প্রাণীগুলো পিছনে ছুটে যেতে শুরু করেছে। ছুটে যাবার সময় প্রাণীগুলো তাদের শরীরের ছিন্নভিন্ন অংশগুলো মুখে করে নিয়ে যেতে থাকে—শরীরের নানা অংশে সেগুলো ছুড়ে দিতে থাকে এবং সেগুলো শরীরে লেগে কিলবিল করে নড়তে থাকে।

ইহিতা রুদ্ধশ্বাসে এই বিচিত্র দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, "এখন গুলি কোরো না—প্রাণীগুলোকে চলে যেতে দাও।"

নীহা কাঁপা গলায় বলল, "কোথায় যাচ্ছে?"

"আমি যেখানে সনিক চার্জার লাগিয়ে এসেছি সেখানে।"

"কেন?"

"প্রথমবার যখন প্রাণীগুলো আমাদের দিকে ছুটে এসেছিল তখন হঠাৎ করে ছুটে চলে গিয়েছিল, মনে আছে?"

"মনে আছে।"

"আমি পরীক্ষা করে দেখেছিলাম—দূরে একটা বিস্ফোরণ হয়েছিল। বিস্ফোরণের পর খুব ছোট কম্পনের শব্দ তরঙ্গ ভেসে এসেছিল, ভূমিকম্পের বেলায় যেরকম হয়। তাই ভাবলাম—"

"কী ভাবলে?"

"প্রাণীগুলো ছোট কম্পনের শব্দ তরঙ্গ শুনতে পেলে সেদিকে নিশ্চয়ই ছুটে যায়। তাই পথে একটা সনিক চার্জার লাগিয়ে এসেছিলাম। এখান থেকে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে সেটা বিস্ফোরণ করিয়েছি। আসলেই প্রাণীগুলো সেদিকে ছুটে গেছে।"

"কেন? কেন ছুটে যায়?"

"এখনো জানি না, কিন্তু সেটা নিয়ে পরে চিন্তা করা যাবে—আমাদের এক্ষুনি রওনা দিতে হবে। আমাদের কাছে আর সনিক চার্জার নেই, প্রাণীগুলো আবার আক্রমণ করলে আর ফেরাতে পারব না। এক্ষুনি রওনা দিতে হবে।"

টুরান বলল, "তা ছাড়াও এই তেজস্ক্রিয় প্রাণীগুলো থেকে অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থ বের হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়।"

নীহা বলল, "হ্যাঁ চল রওনা দিই। ট্রান্সপোর্টারে করে আমি রুদকে নিতে পারি।"

ক্লদ মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমি ট্রান্সপোর্টারে যাব না। আমি হেঁটে যাব।"

নীহা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

ইহিতা টরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আর টর, শোনো।"

"বল।"

"আমি কিন্তু বলেছিলাম আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত কেউ গুলি করবে না। তুমি আমার নির্দেশ শোনো নি। তুমি আগেই গুলি শুরু করেছ।"

টর থতমত খেয়ে বলল, "আমি দুঃখিত।"

ইহিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার কেন জানি মনে হয় তুমি আসলে সেরকম দুঃখিত নও। কিন্তু শুনে রাখ—"

"কী?"

"মানুষের আবাসস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমি তোমাদের দলপতি। তোমাদের আমার কথা শুনতে হবে। এটা একটা আদেশ। মনে থাকবে?"

"মনে থাকবে।"

"যদি মনে না থাকে তা হলে আমাকে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ঠিক আছে?"

টর পাথরের মতো মুখ করে বলল, "ঠিক আছে।"

সাতজনের ছোট দলটা তখন মঙ্গল গ্রহের রুক্ষ পাথরের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকে। তাদের হাঁটার গতি দ্রুত। যেভাবে হোক তারা মানুষের আবাসস্থলে পৌঁছাতে চায়।

সাতজনের ছোট দলটি যখন মানুষের আবাসস্থলের কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন সূর্যটি বেশ উপরে উঠে গেছে। সূর্যের ম্লান আলোতে মঙ্গল গ্রহের বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ দেখায়। টর বলল, "আমার মনে হয় আমরা শেষ পর্যন্ত আবাসস্থলে পৌঁছে গেছি।"

নীহা বলল, "হ্যাঁ। আরো কয়েক দিনের জন্যে বেঁচে থাকার সুযোগ হল।"

টর বলল, "ব্যাপারটা ভালো হল কি না বুঝতে পারছি না!"

নীহা বলল, "জীবন কখনো খারাপ হতে পারে না। জীবন সব সময়ই ভালো।"

"কে বলেছে?" সুহা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সবকিছু অন্যরকমও হতে পারে।"

"হলেও আর কতটুকু হবে?"

"অনেকখানি হতে পারে।"

নীহা ভুরু কুঁচকে বলল, "কীভাবে?"

সুহা বলল, "কাছে এস দেখাচ্ছি।"

নীহা দুই পা এগিয়ে সুহার কাছে যেতেই সে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটা নীহার মাথায় ধরল। মুহূর্তে সুহার চেহারাটি একটি হিংস্র মানবীতে পাল্টে গেল। সে হিসহিস করে বলল, "সবাই তোমাদের হাতের অস্ত্র নিচে ফেলে দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াও। এক সেকেন্ড দেরি করলে এই নির্বোধ মেয়েটার খুলি ফুটো হয়ে যাবে।"

সবাই হতবাক হয়ে সুহার দিকে তাকিয়ে থাকে। সুহা প্রায় যান্ত্রিক গলায় বলল, "এখনো যদি না বুঝে থাক তা হলে পরিষ্কার করে বলে দিই। আমি দুজন রোবোমানবের একজন।"

টুরান কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "আরেকজন কে?"

ক্লদ বলল, "আমি।"

সবাই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল, "তুমি!"

"হ্যাঁ আমি।" বলে ক্রুদ এগিয়ে নীহার হাত থেকে হ্যাঁচকা টান মেরে তার অস্ত্রটা নিয়ে নেয়।"

সুহা সবার দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "আমি তোমাদের সাথে খোশগল্প করার জন্যে আসি নি। হাতের অস্ত্র নিচে ফেলো।"

টর ইহিতাকে জিজ্ঞেস করল, "ইহিতা, কী করব? তুমি যদি অনুমতি দাও তা হলে এই ডাইনি বুড়িকে শেষ করে দিই।"

"তা হলে অন্যদের কথা জানি না কিন্তু নিশ্চিতভাবে নীহাকে হারাব।"

সুহা চিৎকার করে বলল, "বাজে কথা বোলো না। অস্ত্র ফেলো, তা না হলে এই মুহূর্তে এর খুলি উড়িয়ে দেব।"

ইহিতা এক পা এগিয়ে এসে বলল, "আমার মনে হয় না তুমি এই মুহূর্তে সেটা করবে। তুমি রোবোমানব হতে পার কিন্তু রোবট নও। নীহার মাথায় গুলি করা মাত্রই আমাদের চারজনের অস্ত্র তোমাকে ঝাঁজরা করে দেবে! কাজেই তুমি এত সহজে গুলি করবে না।"

"তুমি রোবোমানবকে চেন না। রোবোমানবের ভেতরে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নেই—"

"শব্দটা দুর্বলতা নয়। শব্দটা হচ্ছে মানবিক মায়া মমতা—"

সুহা হিসহিস করে বলল, "অর্থহীন কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। তোমাদের মানবিক মায়া মমতা দুর্বলতা কি না সেটা এই মুহূর্তে প্রমাণিত হবে! তোমাদের নিজেদের রক্ষা করার একটি মাত্র উপায়—সেটি হচ্ছে আমাকে গুলি করা। কর গুলি।" চিৎকার করে বলল, "করো।"

নীহা হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সুহা হিংস্র ভঙ্গিতে বলল, "করতে পারবে না। কাজেই সময় নষ্ট কোরো না। হাতের অস্ত্র ফেলে দাও।"

ইহিতা অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, "সে ঠিকই বলেছে। আমাদের আর কিছু করার নেই—হাতের অস্ত্র ফেলে দিতে হবে।"

টর বলল, "কিন্তু এই ডাইনি বুড়ি তা হলে সাথে সাথে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে।"

"সম্ভবত। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই, অন্তত নীহা জানবে আমরা আমাদের নিজেদের বাঁচানোর জন্যে তাকে মারা যেতে দিই নি।"

টর কাঁপা গলায় বলল, "তুমি আমাদের দলপতি, তুমি যেটাই বলবে আমি সেটাই শুনব। আমরা কি শেষ চেষ্টা করব না?"

ইহিতা বলল, "ক্রুদের দিকে তাকাও। দেখ সে কীভাবে অস্ত্রটা তোমার দিকে তাক করে ধরেছে। সম্ভবত সে তোমাকে গুলি করবে, কিন্তু তুমি কি পারবে এই চার বছরের শিশুটাকে গুলি করে মারতে?"

টর মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"আমি জানি তুমি আমি কেউ পারব না। আমরা মানুষ সেই জন্যে এখানে এই মুহূর্তে হয়তো সবাই মারা যাব। কিন্তু জেনে রাখ যে কারণে আমরা সবাই এখানে মারা যাব ঠিক সেই কারণে পৃথিবীর অসংখ্য জায়গায় অসংখ্য মানুষ একে অপরকে বাঁচিয়ে রাখবে।"

সুহা চিৎকার করে বলল, "অস্ত্র ফেলো।"

টর ইহিতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ইহিতা। তুমি আমাদের দলপতি। তুমি বল, অস্ত্র ফেলব?"

"আমি খুবই দুঃখিত টর, কিন্তু আমাদের অস্ত্র ফেলতে হবে।"

টর হাতের অস্ত্র ছুড়ে ফেলল। ইহিতা আর টুরান তাদের অস্ত্র ছুড়ে ফেলল। নুট তার হাতের অস্ত্র তুলে বলল, "আমি আমার হাতের অস্ত্রটি ছুড়ে ফেলার আগে একটি কথা বলতে পারি?"

"কী কথা?"

নুট একটু এগিয়ে এসে বলল, "মনে আছে আমি বলেছিলাম আমি জানি আমাদের ভেতরে কোন দুজন রোবোমানব? তোমরা কি বিশ্বাস কর আমি সেটা জানতাম?"

সুহা মাথা নাড়ল, বলল, "অসম্ভব। আমরা পুরো সময় নির্বোধ মানুষের মতো অভিনয় করে গেছি।"

নুট এক হাতে তার অস্ত্রটি ধরে রেখেছিল, অন্য হাতটি উপরে তুলে দেখিয়ে বলল, "এটা কী দেখেছ?"

"একটা লিভার।"

"হ্যাঁ। এই লিভারটি ছেড়ে দিলে কী হবে জান?"

"কী হবে?"

"এটা খুব ছোট একটা বিস্ফোরক ডেটোনেট করবে। বিস্ফোরকটা কোথায় আছে জানতে চাও?"

সুহা হিংস্র মুখে জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?"

"তোমার ছেলে ক্লদের শরীরে!"

"মিথ্যা কথা!"

"তোমার মনে আছে, ক্লদকে স্পেসস্যুট পরাতে কে সাহায্য করেছিল? আমি। কেন আমি এত ব্যস্ত হয়ে তাকে সাহায্য করেছিলাম? ছোট্ট এই বিস্ফোরকটি রাখার জন্যে!"

"তুমি মিথ্যা কথা বলছ!"

"ঠিক আছে!" নুট হাতের অস্ত্রটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "পরীক্ষা হয়ে যাক! আমাকে গুলি কর। আমার হাত থেকে লিভারটি মুক্ত করিয়ে দাও।"

ক্লদ চিৎকার করে বলল, "না! না! সুহা, গুলি কোরো না।"

নুট হা হা করে হেসে বলল, "আমি কম কথা বলি, তাই অনেক বেশি চিন্তা করি। চিন্তা করে করে সবকিছু বের করে ফেলা যায়। আরো একটা জিনিস জান?"

"কী?"

"আমাকে মানুষের এই দলটাতে কেন রেখেছে জান?"

"কেন?"

"আমার একটা অপরাধী মন আছে—যেটা এখানে আর কারো নেই। আমি অপরাধীর মতো চিন্তা করতে পারি—যেটা তোমাদের মতো রোবোমানবদের বিপদে ফেলে দিতে পারে।" নুট আবার হাসার চেষ্টা করে বলল, "সুহা! নির্বোধ রোবোমানব, তুমি কি লক্ষ করেছ, আমি সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। অন্যদের আড়াল করে ফেলেছি। তুমি আমাকে গুলি না করে অন্যদের গুলি করতে পারবে না।"

সুহা কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নুটের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঘুরে ক্লদের দিকে তাকাল, বলল, "ক্লদ তুমি নিচ থেকে সবগুলো অস্ত্র তুলে নিয়ে এস।"

AMARBOI.COM

ক্লদ বলল, "কেন?"

"আমার সাথে তর্ক করবে না, নিয়ে এস?"

ক্লদ নিচে পড়ে থাকা অস্ত্রগুলো তুলে নিয়ে আসে। সুহা তখন ধাক্কা দিয়ে নীহাকে সরিয়ে দিল, তারপর ক্লদকে বলল, "অস্ত্রগুলো দাও।"

ক্লদ জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"তুমি এতগুলো রাখতে পারবে না সেজন্যে।"

ক্লদ বলল, "অস্ত্রগুলো ভারী না, তা ছাড়া মঙ্গল গ্রহে মাধ্যাকর্ষণ বল খুব কম। আমি এগুলো রাখতে পারব।"

"বাজে তর্ক কোরো না। অস্ত্রগুলো দাও আমার হাতে।"

ক্লদ তার শিশুসুলভ কণ্ঠে কিন্তু একজন বড় মানুষের ভাষায় বলল, "সব অস্ত্র তোমার হাতে থাকলে তোমার কাছ থেকে আমাকে নিরাপত্তা কে দেবে! তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কী?"

"কথা ছিল আমি এখন প্রথম মানুষ হত্যা করব। তুমি আমাকে এখনো হত্যা করতে দিচ্ছ না।"

"ক্লদ! নির্বোধের মতো আচরণ কোরো না! দেখতে পাচ্ছ না এই অপরাধীটা দাবি করছে তোমার জীবন তার হাতে? যতক্ষণ পরীক্ষা করে সেটা নিশ্চিত না হতে পারছি ততক্ষণ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।"

ক্লদ চিৎকার করে বলল, "তুমি বলেছিলে তুমি নিখুঁত পরিকল্পনা করেছ, এখানে দেখা যাচ্ছে তোমার পরিকল্পনায় শুধু ভুল আর ভুল! তুমি বলেছিলে মানুষ হচ্ছে নির্বোধ! এখন দেখা যাচ্ছে তুমি মানুষ থেকেও নির্বোধ!"

সুহা ধমক দিয়ে বলল, "বাজে কথা বোলো না। আমার পরিকল্পনা নিখুঁত।"

"তা হলে কেন এখনো আমি একটা মানুষকে হত্যা করতে পারছি না!"

"পারবে। সময় হলেই পারবে।"

"কখন সময় হবে?"

সুহা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রেডিয়েশন মনিটরের দিকে তাকাল। সেখানে আবার তেজস্ক্রিয়তার চিহ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে। সে ভুরু কুঁচকে বলল। "প্রাণীগুলো আবার আসছে।"

ক্লদ জিজ্ঞেস করল, "আমরা এখন কী করব?"

"তুমি ছুটে যাও আবাসস্থলের দিকে। অস্ত্রগুলো রেখে দাও।"

"না। আমি অস্ত্র নিয়ে যাব।" বলে সে দুই হাতে কোনোভাবে অস্ত্রগুলো ধরে আবাসস্থলের দিকে ছুটতে থাকে।

নুট শব্দ করে হাসল, বলল, "আমি তোমাকে যতই দেখছি—ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি! তুমি কি সত্যিই ক্লদকে জন্ম দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ দিয়েছিলাম। তাতে কী হয়েছে?"

"মা হয়ে তুমি যেভাবে তোমার নিজের সন্তানকে হত্যা করার ব্যবস্থা করলে আমি সেটা দেখে মুগ্ধ হয়েছি সুহা। যখন তুমি আমাদের হত্যা করবে তখন আমার হাতের লিভারটি ছুটে যাবে সাথে সাথে ক্লদের শরীরের ভেতর বিস্ফোরক বিস্ফোরিত হবে—তুমি নিশ্চিত করলে তখন যেন সে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকে! তোমার যেন কোনো ক্ষতি না হয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এর ভেতরে কোন বিষয়টি অযৌক্তিক? একটা অবাধ্য শিশুর হাতে যখন অস্ত্র উঠে যায় সে কত বিপজ্জনক তুমি জান?"

"জানি।" নুট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ক্রুদ ছুটে অনেক দূর চলে গিয়েছে তাই তোমার মনে ধারণা হয়েছে সে তোমার কথা শুনতে পারছে না। তুমি ভুলে গেছ আমাদের হেলমেটের মাঝে কমিউনিকেশন মডিউল লাগানো—একশ কিলোমিটার দূর থেকেও কথা শোনা যায়। ক্রুদ তোমার কথাগুলো শুনেছে। তার হাতে একটি নয় দুটি নয় চার–চারটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। সে ফিরে আসছে—তোমার কি মনে হয় চার বছরের একটা শিশুর সাথে তুমি বোঝাপড়া করতে পারবে?"

সুহা চমকে পিছনে তাকাল, তার গলা থেকে একটা হিংস্র শ্বাপদের মতো শব্দ বের হয়ে এলো। সে তার অস্ত্রটি শক্ত হাতে ধরে পায়ে পায়ে ক্রুদের দিকে এগুতে থাকে। সবাই বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে, চার বছরের একটা শিশুও হাতে একটা অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসছে, দেখে মনে হচ্ছে সে বুঝি একটা খেলনা ধরে রেখেছে। কিন্তু এটা মোটেও খেলনা নয়—এটা ভয়ংকর একটা অস্ত্র।

সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে—একটা মা আর তার শিশুসন্তান একজন আরেকজনের দিকে উদ্যত অস্ত্র হাতে এগিয়ে যাচ্ছে—একজন আরেকজনকে হত্যা করতে চায়। কী ভয়ংকর একটি দৃশ্য—এর চাইতে ভয়াবহ, এর চাইতে নিষ্ঠুর কোনো কিছু কি হওয়া সম্ভব?

নুট নীহা টর টুরান আর ইহিতা নিঃশ্বাস বন্ধ করে সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে ভয়ংকর দৃশ্যটির দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে।

AMARBOI.COM

১৮

মঙ্গল গ্রহের লাল পাথরে পাশাপাশি পড়ে থাকা সুহা আর ক্রুদের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থেকে ইহিতা বলল, "আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না এটি সম্ভব।"

নীহা বলল, "আমি নিজের চোখে দেখেও এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।"

টর নুটের দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "তোমার হাতের লিভারটি কি আসলেই বিস্ফোরকের সাথে জুড়ে দেয়া, নাকি পুরোটি এক ধোঁকা?"

নুট মাথা নাড়ল, বলল, "না। এটা ধোঁকা না। এটা সত্যি। আমি জানতাম এরা দুজন রোবোমানব।"

"ক্রুদের শরীরে সত্যি বিস্ফোরক লাগানো আছে?"

"হ্যাঁ। ছোট বিস্ফোরক। এই দেখ—" সে নিচু হয়ে ক্রুদের ছিন্নভিন্ন স্পেসস্যুটের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটা বিস্ফোরকের গোলক বের করে আনে। সেটি দূরে ছুড়ে দিয়ে নুট তার লিভারটি ছেড়ে দিতেই দূরের বিস্ফোরকটি বিস্ফোরিত হল।

টর নুটের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে স্বীকার করতেই হবে তুমি অসাধারণ। আমি কখনোই এই দুজনকে রোবোমানব হিসেবে সন্দেহ করতে পারতাম না।"

নুট কোনো কথা বলল না, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। ইহিতা বলল, "রেডিয়েশন মনিটরে রিডিং দিতে শুরু করেছে। প্রাণীগুলো আবার আসছে। আমাদের আবাসস্থলের ভেতর ঢুকে যাওয়া দরকার। চল যাই।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুরান জিজ্ঞেস করল, "মৃতদেহ দুটি?"

"এই মুহূর্তে কিছু করার নেই। পরে যদি সুযোগ পাই সমাহিত করে দেব।"

লাল পাথরের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অস্ত্রগুলো তুলে পাঁচজন দ্রুত আবাসস্থলের দিকে যেতে থাকে—প্রাণীগুলো আসার আগে তারা ভেতরে ঢুকে যেতে চায়।

আবাসস্থলের ভেতরটা খুব সাজানো গোছানো। মানুষজন থাকার জন্যে পরিপাটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাতাসের তাপ চাপ রক্ষা করা আছে বলে তারা স্পেসস্যুট খুলে বসেছে। শুধু তাই নয় তারা সত্যিকারের খাবারের প্যাকেট বের করে সেগুলো গরম করে ধূমায়িত কফির সাথে বসে বসে খেয়েছে। গত ছত্রিশ ঘণ্টার উত্তেজনা শেষে হঠাৎ করে একটা নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে বসে থাকতে পেরে তাদের মাঝে এক ধরনের আলস্য ভর করেছে।

কফির মগে চুমুক দিয়ে টুরান বলল, "আমরা কি তা হলে এখন আমাদের মহাকাশযানে ফিরে যেতে পারি?"

ইহিতা বলল, "নিশ্চয়ই পারি। এখন আমাদের মাঝে কোনো রোবোমানব নেই। আমরা নিশ্চয়ই মহাকাশযানে ফিরে যাব।"

টর বলল, "তোমার যা ইচ্ছে তাই বলতে পার—আমি কিন্তু তোমাদের পরিষ্কার করে একটা কথা বলতে চাই—"

"কী কথা?"

"মহাকাশযানে গিয়ে আমি ট্রিনিটিকে নিজ হাতে খুন করব!"

ইহিতা শব্দ করে হাসল, বলল, "তুমি কীভাবে সেটা কর, আমি সেটা দেখতে চাই।"

নীহা জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু আমরা এখন মহাকাশযানে ফেরত যাব কেমন করে?"

টুরান বলল, "আমরা ট্রিনিটির সাথে যোগাযোগ করব, ট্রিনিটি কিছু একটা ব্যবস্থা করবে। একটা স্কাউটশিপ পাঠাবে এখানে বা সেরকম কিছু একটা করবে।"

"তা হলে ট্রিনিটির সাথে যোগাযোগ করতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে করব?"

"এই আবাসস্থলটাতে অনেক ভালো কমিউনিকেশন মডিউল থাকার কথা—এস খুঁজে বের করি।"

নীহা আর টুরান মিলে আবাসস্থলে কমিউনিকেশন মডিউল খুঁজতে থাকে, আবাসস্থলের দোতলাতে সেটা পেয়ে গেল। টুরান কয়েকটা সুইচ স্পর্শ করে বলল, "কী আশ্চর্য! দেখেছ, আমাদের জন্যে এখানে ম্যাসেজ রাখা আছে?"

"কী ম্যাসেজ?"

"এখনো জানি না।" টুরান আরেকটা বোতাম চাপ দিতেই সামনে একটা আলোর ঝলকানি দেখা গেল, তারপর ট্রিনিটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমি ট্রিনিটি বলছি। স্কাউটশিপে করে মঙ্গল গ্রহে যাওয়া মহাকাশচারীদের সাথে যোগাযোগ করতে চাই। জরুরি। আবার বলছি, স্কাউটশিপে করে...।

নীহা বলল, "আমি সবাইকে ডেকে আনি। সবাই মিলে শুনি ট্রিনিটি কী বলে।"

"যাও ডেকে আনো।"

কিছুক্ষণের মাঝেই সবাই উপরে কমিউনিকেশন মডিউলের কাছে চলে এল। টুরান

তখন যোগাযোগের চ্যানেলটি চালু করে। সাথে সাথে ট্রিনিটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমি ট্রিনিটি, মহাকাশযান থেকে তোমাদের সবার জন্যে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।"

টর বলল, "বাজে কথা বোলো না। মানুষকে শুভেচ্ছা জানানোর মতো বুদ্ধিমত্তা তোমার নেই।"

"আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত—"

টর মাঝপথে থামিয়ে বলল, "আমি তোমাকে বলেছি, তুমি বাজে কথা বলবে না। আমাদেরকে ভয়ংকর বিপদের মাঝে ঠেলে দিয়ে বলছ তুমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত? তুমি জান অন্তর মানে কী? বেজন্মা কোথাকার!"

ট্রিনিটি হাসির মতো শব্দ করে বলল, "টর, আমি তোমার ক্ষোভটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তবে তোমাকে দুটি ব্যাপার বুঝতে হবে। প্রথমত, আমি যেটা করেছি সেটা না করে আমার উপায় ছিল না। খুব সোজা ভাষায় যদি বলতে হয় তা হলে বলা যায়, আমি একটা কম্পিউটার, আমাকে যেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে আমাকে ঠিক সেভাবে কাজ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, তুমি যখন আমার ওপর রেগে যাও কিংবা রেগে গালাগাল কর আমি কিন্তু সেগুলো বুঝি না! তুমি যথার্থই বলেছ, আমার সেগুলো বোঝার ক্ষমতা নেই।"

টুরান বলল, "ঠিক আছে! ঠিক আছে! তুমি কী বলার জন্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছ সেটা বলে ফেলো।"

ট্রিনিটি বলল, "পৃথিবী থেকে তোমাদের সাথে খুব জরুরিভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

ইহিতা অবাক হয়ে বলল, "পৃথিবী থেকে? আমাদের সাথে?"

"হ্যাঁ।"

"কে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে?"

"আমার জানা নেই। গোপনীয় চ্যানেল। তোমরা যদি প্রস্তুত থাক তা হলে আমি চ্যানেলটি তোমাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিই।"

"অবশ্যই।" ইহিতা বলল, "অবশ্যই উন্মুক্ত করে দাও।"

সাথে সাথে ঘরের ভেতর কিছু আলোর বিচ্ছুরণ দেখা গেল, কিছু যান্ত্রিক শব্দ ভেসে এল এবং বেশ কয়েক মিনিট পর হঠাৎ করে ঘরের ঠিক মাঝখানে তারা বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি মহামান্য থুলকে দেখতে পেল। মহামান্য থুল একটা সবুজ ঘাসের লনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। তারা শুনতে পেল মহামান্য থুল একটু ঘুরে তাদের দিকে বললেন, "তোমাদের জন্যে শুভেচ্ছা। আমি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করছি।"

নীহা চিৎকার করে বলল, "মহামান্য থুল? আপনি?"

নীহার কথাটি মহামান্য থুল সেই মুহূর্তে শুনতে পেলেন না। মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে তার কথাটি পৌঁছাতে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট সময় নেবে, মহামান্য থুলের উত্তরটি ফিরে আসতে আরো পাঁচ মিনিট। নীহা এবং অন্যেরা শুনতে পেল মহামান্য থুল ঠিক সেই কথাটিই বললেন, "মুখোমুখি কথা বলার যে সুবিধেটুকু আছে সেটি এখন আমাদের মাঝে নেই, তোমাদের কথা আমার কাছে এবং আমার কথা তোমাদের কাছে পৌঁছানোর মাঝে বেশ অনেকখানি সময় নেবে। তোমরা কেমন আছ আমি জানি না। আমার জানা প্রয়োজন। আমি এখন চুপ করছি, তোমরা বল। কেমন আছ বল।"

টুরান বলল, "এর মাঝে অনেক কিছু ঘটে গেছে। কোনো মানুষের জীবনে এত অল্প সময়ে এত কিছু ঘটতে পারে সেটা বিশ্বাসই হতে চায় না। মহামান্য থুল আপনি শুনে খুশি হবেন যে আমরা ভয়ংকর ভয়ংকর বিপদের মাঝে থেকেও রক্ষা পেয়েছি। কীভাবে সেটা ঘটেছে সেটা আপনাকে বলবে ইহিতা। আমরা ইহিতাকে আমাদের দলপতি তৈরি করেছি। ইহিতা একজন অসাধারণ দলপতি, সে কীভাবে আমাদের রক্ষা করে এনেছে সেটি শুনলে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন!" টুরান ইহিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "ইহিতা! তুমি বল।"

ইহিতা একটু বিব্রত হয়ে বলল, "আমি এমন কিছুই করি নি!" তারপর সে একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে মহাকাশযানে কী ঘটেছে এবং কীভাবে তারা শেষ পর্যন্ত এই নিরাপদ আবাসস্থলে আশ্রয় নিয়েছে সেটি বলল। তাদের ভেতরে যে দুজন রোবোমানব আছে এবং সেই দুজন শেষ পর্যন্ত কীভাবে নিজেরাই নিজেদের হত্যা করেছে সেটি বলার সময় ইহিতার মুখে গভীর একটা বেদনার ছাপ পড়ে।

ইহিতার কথা শেষ হবার পর প্রায় দশ মিনিট সময় পরে তারা মহামান্য থুলের কথা শুনতে পেল, মহামান্য থুল বললেন, "পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে একটা নির্জন গ্রহের ছোট একটা আবাসস্থলে তোমরা কোনোভাবে নিজেদের রক্ষা করে বেঁচে আছ। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সত্যি কথা বলতে কী শুধু আমি নই, পৃথিবীর মানুষ তোমাদের কাছে ঋণী থাকবে। তোমরা সবাই জান রোবোমানবেরা কিছুক্ষণের মাঝেই পৃথিবীর নেটওয়ার্কটি দখল করে নেবে। দখল করার পর নিশ্চিতভাবেই তারা আমাকে এবং বিজ্ঞান আকাদেমির সবাইকে হত্যা করতে আসবে। আমি সেটা নিয়ে খুব বেশি দুর্ভাবনা করছি না। তোমরা জান আমি দীর্ঘ একটি আনন্দময় জীবন কাটিয়েছি, আমি এখন খুব আনন্দের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারি। কিন্তু আমাদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল পৃথিবীর মানুষকে রক্ষা করতে—আমরা কি সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি? রোবোমানব যখন নেটওয়ার্ক দখল করে এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি প্রাণী, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি কমিউনিটি, প্রতিটি অস্ত্রাগার, প্রতিটি যোগাযোগ ব্যবস্থা এক কথায় পুরো পৃথিবীর সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে তখন পৃথিবীর মানুষ রোবোমানবের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে?"

মহামান্য থুল একটু থামলেন, অন্যমনস্কভাবে নিজের হাতের দিকে তাকালেন তারপর আবার মাথা তুলে সামনের দিকে তাকালেন, তাকিয়ে বললেন, "এর সঠিক উত্তর কেউ জানত না। এখন আমি জানি। ভবিষ্যতে যে ভয়ংকর বিপদটি আসবে সেই বিপদের মাঝে মানুষ ভেঙে পড়বে না। তোমরা যেমন ভেঙে পড় নি। তারা নিজেদের মাঝে নেতৃত্ব তৈরি করে নেবে। সেই নেতৃত্বকে মেনে নিয়ে তারা একে অন্যকে সাহায্য করবে। ঠিক যেরকম তোমরা করেছ। আর ঠিক তখন যদি আমরা রোবোমানবকেও একই ধরনের বিপদের মাঝে ফেলতে পারি তখন তারা হবে ভয়ংকর রকম স্বার্থপর, তারা হবে হিংস্র, তারা হবে নিষ্ঠুর, তারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একে অন্যকে হত্যা করবে। ঠিক এখানে যেরকম করেছে।"

মহামান্য থুল একটু হাসির মতো ভঙ্গি করলেন, "তোমাদের প্রতি পৃথিবীর মানুষের কৃতজ্ঞতা! তোমাদের কাছ থেকে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি পেয়েছি! আমাদের কী করতে হবে সেটা নিয়ে আমি একটু ভাবনার মাঝে ছিলাম, আমার ভাবনা দূর হয়েছে।"

মহামান্য থুলের কথা শেষ হবার আগেই সবাই প্রায় একসাথে চিৎকার করে উঠল, "কিন্তু আপনার কী হবে? আপনার কী হবে?"

তারা সেই প্রশ্নের উত্তর পেল না, প্রশ্নটি মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে গিয়ে সেখান থেকে আর ফিরে এল না, তার কারণ ততক্ষণে সেখানে একটি মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে।

১৯

লাল চুলের মেয়েটি টেবিলে কাচের জারে তরলের মাঝে ডুবিয়ে রাখা থলথলে মস্তিষ্কটির দিকে এক ধরনের বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে রইল তারপর খুট করে সুইচটাতে চাপ দিয়ে মাইক্রোফোন অন করে বলল, "এই, তুমি কি জেগে আছ?"

স্পিকারে একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল, "জেগে আছি।"

"আমার হয়েছে মুশকিল, কাচের জারে তোমাকে—তার মানে এই থলথলে মস্তিষ্কটা দেখতেই কেমন জানি গা ঘিনঘিন করে, আবার একটু কথা না বললে ভালোও লাগে না।"

"তোমার কাছে আমার অনুরোধ তুমি আমাকে ধ্বংস করে দাও! আমার এই অস্তিত্ব যে কী ভয়ংকর তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

লাল চুলের মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বলল, "কে বলেছে কল্পনা করতে পারি না। অবশ্যই পারি! কল্পনা করতে পারি বলেই তো তোমাকে বাঁচিয়ে রাখছি। তুমি হচ্ছ আমার সবচেয়ে বড় বিনোদন।"

স্পিকার থেকে কাতর একটি কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে, "দোহাই তোমার! দোহাই আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমাকে শেষ করে দাও।"

"বাজে কথা বোলো না, তার চাইতে আমি তোমাকে কী বলতে এসেছি সেটা শোনো! আর কিছুক্ষণের মাঝেই পুরো নেটওয়ার্কটি আমরা দখল করে নেব। সাথে সাথে আমরা বের হব—সারা জীবন যেটা করতে পারি নি তখন সেটা করতে পারব—প্রকাশ্যে আমরা অস্ত্র নিয়ে বের হব। সবচেয়ে প্রথম কী করব তোমাকে তো বলেছি, বলেছি না?"

লাল চুলের মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, "বলে থাকলেও আবার বলি। আনন্দের কথা অনেকবার শোনা যায়!" মেয়েটি হাসি থামিয়ে বলল, "সবার আগে হত্যা করব তোমাদের থুথুড়ে বুড়ো হতভাগা থুলকে! তার বাসভবন এরই মাঝে ঘিরে ফেলা হয়েছে। গ্রিন সিগন্যাল পেলেই আমরা অস্ত্র হাতে ঢুকে যাব!"

স্পিকার থেকে হাহাকারের মতো শব্দ ভেসে আসে, "না! না!"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমাদের সবার হাতে থাকবে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। তোমার খুলি কেটে আমি তোমাকে বের করে এনেছিলাম বলে আমাকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। থুলকে প্রথম গুলিটি করার সুযোগ দেয়া হবে আমাকে! বুঝেছ? আমাকে!"

একটা অসহায় যন্ত্রণার শব্দ শোনা গেল। লাল চুলের মেয়েটি সেই যন্ত্রণার শব্দটি উপভোগ করতে করতে বলল, "পুরো ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। কেউ কারো কাছে সেটা বলতে পারছে না। শুধু আমি তোমাকে বলতে পারছি!" মেয়েটি আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে।

হাসির শব্দটি যে একটি অসহায় মস্তিষ্কের নিউরনে দীর্ঘসময় বিচ্ছুরিত হতে থাকল সেই কথাটি কেউ জানতে পারল না।

২০

দরজা ভেঙে বারোজন রোবোমানব মহামান্য থুলের বাসভবনে ঢুকে পড়ল। তারা সবাই জানে এই সময়টিতে তিনি বাসার পিছনে নরম ঘাসের উপর একটি হেলান দেয়া চেয়ারে বসে দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রোবোমানবগুলো তার বাসভবনের ভেতর দিয়ে ছুটে পিছনে চলে আসে, তাদের ধারণা সত্যি। মহামান্য থুল সত্যি সত্যিই একটা হেলানো চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। রোবোমানবের পায়ের শব্দ শুনে তিনি ঘুরে তাকালেন। তার মুখে কোনো ভয় বা আতঙ্কের ছাপ পড়ল না। শুধুমাত্র একটু বিস্ময়ের ছাপ উঁকি দিয়ে গেল।

রোবোমানবের এই ছোট দলটির দলপতি, নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি একটু এগিয়ে এসে মহামান্য থুলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "থুল! তোমার খেলা শেষ।"

মহামান্য থুল হাসলেন, বললেন, "আমি আমার দায়িত্বটিকে কখনো খেলা হিসেবে নিই নি।"

মানুষটি ধমকের সুরে বলল, "আমি তোমার সাথে কথার মারপ্যাঁচ পরীক্ষা করতে আসি নি। আমি কেন এসেছি সেটা তুমি খুব ভালো করে জান। আমি কী বলছি সেটা আরো ভালো করে জান!"

থুল মাথা নাড়লেন। বললেন, "হ্যাঁ। জানি। বেশ ভালোভাবেই জানি। তারপরও তোমার মুখ থেকে শোনার একটু আগ্রহ হচ্ছে।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি হিংস্র গলায় বলল, "অন্য কোনো সময় হলে আমি তোমার সাথে এই আলোচনায় যেতাম না। কিন্তু আজকে—শুধু আজকে বলে আমি তোমার সাথে কথা বলছি। আজকে আমার মনটা আনন্দে ভরপুর।"

মহামান্য থুল বললেন, "আমি শুনি তোমার কথা।"

"আমরা রোবোমানবেরা পৃথিবীটা দখল করে নিয়েছি।"

"পৃথিবী?" মহামান্য থুল ভুরু কুঁচকালেন। "পৃথিবী তো অনেক বড় ব্যাপার। একসময় সাত বিলিয়ন মানুষ ছিল। এখন সেটাকে কমিয়ে আমরা দুই বিলিয়নে নামিয়ে এনেছি। দুই বিলিয়ন মানুষের পৃথিবী কেমন করে কেউ দখল করে?"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি তার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "নির্বোধের মতো কথা বোলো না! তুমি খুব ভালো করে জান এখন পৃথিবী দখল করার জন্যে পৃথিবীর মাঠেঘাটে দৌড়াতে হয় না! পুরো পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে নেটওয়ার্ক, কাজেই শুধু নেটওয়ার্ককে দখল করতে হয়!"

"সেটি প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি হা হা করে হাসল। বলল, "আমরা সেই অসম্ভব কাজটি করেছি। আমরা নেটওয়ার্কটি দখল করেছি। কাজটি খুব সহজ ছিল না, একদিনেও আমরা এটা করি নি, ধীরে ধীরে করেছি। নির্বোধ মানুষের ভেতর একজন একজন করে রোবোমানব ঢুকিয়েছি, তারা খানিকটা করে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অন্য রোবোমানব ঢুকিয়েছে। একটু একটু করে আমরা তোমাদের নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছি। এখন এটা আমাদের নেটওয়ার্ক! এই পৃথিবীর দুই বিলিয়ন মানুষের প্রত্যেককে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব। তাদের জীবন–মরণ এখন আমাদের হাতে!"

মহামান্য থুল মাথা নাড়লেন, বললেন, "কাজটা খুব বুদ্ধিমানের হয় নি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কোন কাজটা?"

"এই যে একটা নেটওয়ার্ক দিয়ে পুরো পৃথিবীর সব মানুষকে সেবা দেয়া। তুমি কিছু মনে কোরো না, নেটওয়ার্কটা কিন্তু মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে তৈরি হয় নি। সাহায্য করার জন্যে তৈরি হয়েছে। তবে তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। মানুষের দৈনন্দিন সব কাজই নেটওয়ার্ক দিয়ে করতে হয়, তাই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তাদের সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষকেও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।"

"হ্যাঁ। তুমি ব্যাপারটা বুঝেছ! আমরা যদি কোনো বাবা–মাকে বলি আমাদের কথা না শুনলে তোমার চার বছরের বাচ্চাটার রক্তে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যাবে তা হলে কোন বাবা–মা আমাদের অবাধ্য হবে? আর নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণে থাকলে রক্তে তেজস্ক্রিয় দেয়া পানির মতো সহজ। স্কুলের লাঞ্চের প্যাকেট পর্যন্ত নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণে।"

মহামান্য থুলকে কেমন যেন বিষণ্ন দেখাল। তিনি একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "তোমার সাথে কথা বলে আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি একটু এগিয়ে এসে বলল, "বুড়ো তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। তোমার মন খারাপের অনুভূতি দূর করার জন্যে আমরা এসেছি!"

"আমাকে হত্যা করার কথা বলছ?"

"হ্যাঁ। শুধু তোমাকে না, এই মুহূর্তে বিজ্ঞান আকাদেমির এগারজন সদস্যকেই হত্যা করা হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে শুরু করব। তোমাকে নিজের হাতে হত্যা করার জন্যে সবাই আগ্রহী, আমি অনেক বেছে এই মেয়েটিকে সুযোগ দিয়েছি।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করতেই লাল চুলের মেয়েটি হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এল। থুল কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমার ঠিক তোমার বয়সী একটা মেয়ে আছে।"

"আমার তোমার বয়সী বাবা নেই।"

"তুমি আমাকে হত্যা করবে?"

"হ্যাঁ। আমার গুলি করতে খুব ভালো লাগে।"

"ঠিক আছে গুলি কর।"

মেয়েটি তার অস্ত্রটি উপরে তুলতেই মহামান্য থুল হাত তুলে তাকে থামালেন, বললেন, "এক সেকেন্ড।"

"কী হয়েছে?"

"আমাকে হত্যা করার আগে আমি কি তোমাদের একটা কথা বলতে পারি?"

"কী কথা?"

"একটি নেটওয়ার্ক দিয়ে পুরো মানবজাতিকে একটা শৃঙ্খলার মাঝে আনার মাঝে একটা ঝুঁকি আছে সেটা যে আমরা অনুমান করেছিলাম সেটা কি তোমরা জান?"

"তুমি কী বলতে চাইছ?"

"তোমরা যে নেটওয়ার্কটি দখল করতে চাইবে সেটা আমরা অনুমান করেছিলাম সেটা কি তোমরা জান?"

"এটা একটা ছোট শিশুও অনুমান করতে পারবে।"

"কাজেই আমরা কী করেছি তোমরা জান?"

"কী করেছ?"

"নেটওয়ার্কটি ধ্বংস করে দিয়েছি। এই মুহূর্তে সেটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটির এক মুহূর্ত সময় লাগল কথাটি বুঝতে। যখন বুঝতে পারল তখন সে হা হা করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "বুড়ো ভাম কোথাকার! তুমি আমাকে বুদ্ধিহীন প্রতিবন্ধী ভেবেছ? তুমি ভেবেছ আমি জানি না যে এই নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা সম্ভব না? সরাসরি নিউক্লিয়ার বোমা ফেলেও এটা ধ্বংস করা যায় না? ওর কোনো নিয়ন্ত্রণ কক্ষ নেই, এটা বন্ধ করার কোনো সুইচ নেই! এর বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করার কোনো উপায় নেই, মূল কেন্দ্রে মানুষ ঢোকার ব্যবস্থা নেই। ভূমিকম্প, সুনামি এর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না! তুমি ভেবেছ আমি এসব জানি না? তুমি ভেবেছ আমি জানি না যে অনেক জায়গায় এটি কপি করে রাখা আছে? তুমি ভেবেছ আমি তোমার এই অর্থহীন প্রলাপ বিশ্বাস করব?"

মহামান্য থুল মাথা নাড়লেন, বললেন, "আমি একবারও সেটি ভাবি নি। আমি ভেবেছি তুমি আমার কথা শুনে খোঁজ নেবে আমি কি সত্যি কথা বলেছি নাকি মিথ্যে কথা বলে তোমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছি।"

রোবোমানবেরা তাদের হেডফোনে কিছু শোনার চেষ্টা করে, তাদেরকে হঠাৎ করে বিভ্রান্ত দেখা যায়, নিজেদের ভেতরে ফিসফিস করে কথা বলে। তারপর নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটির কাছে ছুটে আসে, চাপা গলায় বলে, "আসলেই নেটওয়ার্ক থেকে কোনো তথ্য আসছে না।"

মহামান্য থুল হাসলেন, বললেন, "এটা কোনো কূটচাল নয়! তোমাদের বিভ্রান্ত করার কোনো কৌশল নয়। আসলেই নেটওয়ার্কটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি চিৎকার করে বলল, "অসম্ভব!"

"নেটওয়ার্ক দখল করার মতো অসম্ভব একটা কাজ যদি তোমরা করতে পার, তা হলে সেটা ধ্বংস করার মতো আরেকটা অসম্ভব কাজ কেন আমরা করতে পারব না?"

"এটা কেউ করতে পারবে না—নিশ্চয়ই এখানে অন্য কিছু আছে।"

"অন্য কিছু নেই।"

"আছে।" নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি হিংস্র গলায় বলল, "নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা অসম্ভব। স্বয়ং শয়তান এলেও পারবে না। আমি এক্ষুনি বের করছি আসলে কী হয়েছে।" মানুষটি তার পকেট থেকে ছোট কমিউনিকেশন মডিউল বের করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। সে হতবাক হয়ে আবিষ্কার করে সেটি নীরব হয়ে আছে। সে বোতামগুলো স্পর্শ করল, কোনো লাভ হল না। তারপর সেটা ধরে সে ঝাঁকুনি দিল, দুই হাতে সেটাকে পাগলের মতো আঘাত করতে লাগল।

মহামান্য থুল বললেন, "কোনো লাভ নেই। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর, পৃথিবীতে এখন কোনো নেটওয়ার্ক নেই। নেটওয়ার্কটি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তোমরা যেন পৃথিবীর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পার সেজন্যে আমরা নেটওয়ার্কটি ধ্বংস করেছি!"

"অসম্ভব!"

"হ্যাঁ। প্রায় অসম্ভব। তারপরও করেছি। খুব বেশি জানাজানি হতে দেই নি, ধ্বংস করার দায়িত্বটি নিয়েছিলাম আমি!" মহামান্য থুল একটু হাসলেন, "এই প্রথম আমি কিছু একটা ধ্বংস করলাম!"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটির মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে, সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলে, "অসম্ভব! অসম্ভব! তুমি আমাকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছ। তোমাদের অন্য কোনো মতলব আছে! তোমরা খুব ভালো করে জান নেটওয়ার্ক ধ্বংস হলে পুরো

পৃথিবীর সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাবে! পুরো পৃথিবী অচল হয়ে যাবে। নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা হচ্ছে মাথায় গুলি করার মতো।"

মহামান্য থুল মাথা নাড়লেন, বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ! পুরো পৃথিবী এখন ওলটপালট হয়ে যাবে! কোথাও কোনো তথ্য নেই, কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সমস্ত পৃথিবীতে এখন বিশৃঙ্খল অবস্থা শুরু হবে! চরম বিশৃঙ্খলা!"

"তুমি বলতে চাইছ তুমি নিজের হাতে পৃথিবী ধ্বংস করছ?"

মহামান্য থুল বাধা দিয়ে বললেন, "আমি মোটেও পৃথিবী ধ্বংস করছি না। আমি শুধু নেটওয়ার্কটি ধ্বংস করেছি। নেটওয়ার্ক! নেটওয়ার্ক ধ্বংসের কারণে পৃথিবী ধ্বংস হবে না— পৃথিবী অনেক বড় ব্যাপার। এত অল্পে পৃথিবী ধ্বংস হয় না। বড় জোর বিশৃঙ্খলা হবে, হইচই হবে, ওলটপালট হবে কিন্তু ধ্বংস মোটেও হবে না। তোমরা যেহেতু সব খবর রাখ, তোমরা নিশ্চয়ই জান খাদ্যশস্যের যেন কোনো অভাব না হয় সেজন্যে আমরা অনেক দিন থেকে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত খাবার মজুদ করেছি। ওষুধপত্র মজুদ করেছি, প্রয়োজনীয় রসদ মজুদ করেছি! কাজেই পৃথিবীর মানুষ প্রথম কয়েক দিন হইচই করবে, একটু বিশৃঙ্খল হবে তারপর নিজেরা নিজেদের নেতৃত্ব তৈরি করে নিজেদের দায়িত্ব নেবে! তোমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পাবে না।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি বিস্ফারিত চোখে মহামান্য থুলের দিকে তাকিয়ে রইল, সে এখনো তার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। মানুষের চেহারায় নিষ্ঠুরতা সরে গিয়ে সেখানে এখন এক ধরনের আতঙ্কের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। সে তার শুকনো ঠোঁটকে জিভ দিয়ে ভিজিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "আমি তোমার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।"

মহামান্য থুল তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "না করলে নেই। তারপরও তোমাদের জানিয়ে রাখছি। আমার মনে হয় তোমাদের আরো একটা তথ্য জানিয়ে রাখা দরকার। মানুষের উপর যখন বড় বিপদ নেমে আসে তখন তারা একে অন্যের বিভেদ ভুলে যায়, তারা তখন একসাথে কাজ করে। তার কারণ হচ্ছে মানুষের সভ্যতার জন্মই হয়েছে একজনের জন্যে অন্যের মমতা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে। রোবোমানবেরা তাদের ভেতর থেকে মমতা আর ভালবাসা তুলে দিয়েছে। তাই রোবোমানবেরা যখন বড় বিপদে পড়ে তখন তারা কী করে জান?"

"কী করে?"

"তারা স্বার্থপর হয়ে যায়। হিংস্র হয়ে যায়। একে অন্যকে সরিয়ে নেতৃত্ব নিতে চায়। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। তখন কী হয় জান?"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি কোনো কথা না বলে থুলের দিকে তাকিয়ে রইল। মহামান্য থুল তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তখন রোবোমানবেরা একে অন্যকে হত্যা করে! কাজেই আমি কাগজে লিখে দিতে পারি আজ থেকে তিন মাস পরে পৃথিবীতে কোনো রোবোমানব থাকবে না। যেহেতু নেটওয়ার্ক থেকে কোনো সাহায্য পাবে না তাই একজন আরেকজনকে হত্যা করতে থাকবে!"

লাল চুলের মেয়েটি বলল, "তুমি এটা কীভাবে জান?"

"মঙ্গল গ্রহে আমরা ছোট একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি। সেই এক্সপেরিমেন্টে দেখা গেছে বড় বিপদের মাঝে রোবোমানবের মা তার সন্তানকে হত্যা করে ফেলে!"

লাল চুলের মেয়েটি নিষ্ঠুর চেহারার দলপতির দিকে তাকাল। দলপতির চেহারায় নিষ্ঠুরতাটুকু সরে গিয়ে এখন সেখানে এক ধরনের উদভ্রান্ত ভাব চলে এসেছে। লাল চুলের মেয়েটি বলল, "আমি কি এখন গুলি করতে পারি?"

দলপতি বলল, "দাঁড়াও। এক সেকেন্ড।" তারপর ঘরে মহামান্য থুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এখনো বিশ্বাস করি না তুমি নেটওয়ার্ক ধ্বংস করেছ। কিন্তু আমি তারপরও জানতে চাই সত্যিই যদি ধ্বংস করে থাক তা হলে সেটি কেমন করে করেছ?"

মহামান্য থুল হেসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "তোমার পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব না। তোমার মস্তিষ্ক সেটা বোঝার ক্ষমতা রাখে না।"

"আমি তবু শুনতে চাই।" রোবোমানবদের দলপতি ক্ষিপ্ত স্বরে বলল, "আমাকে বল।"

"আমি তোমাকে পুরো ব্যাপারটি বোঝাতে পারব না, বড় জোর তোমাকে একটু ধারণা দিতে পারি।" মহামান্য থুল তার আঙুলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমি জানি না, তোমরা লক্ষ করেছ কি না প্রিসা নগরীর উত্তরের বনাঞ্চলে একটা আগুন জ্বলছে। শীতের মৌসুমে প্রায়ই জ্বলে—এটি এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়। তবে আগুনের কারণে যে ধোঁয়া হয় সেটা সূর্যের আলোকে আটকে দেয় তাই নেটওয়ার্কের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সৌরবিদ্যুতের প্যানেলগুলো প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে না। সেটি এমন কোনো গুরুতর ব্যাপার না, কিন্তু ঠিক একই সময় মাহীরা হ্রদের স্লুইস গেট খুলে নিচের শুষ্ক অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক একটা কাজ কিন্তু হ্রদের পানির উচ্চতা কমে গিয়েছে, পানি দিয়ে বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট শীতল করা হলে একসময় সেটি সম্ভব হবে না! তোমরা লক্ষ করেছ কি না জানি না দুটো বিনোদন উপগ্রহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, মানুষের বিনোদনের উপায় নেই, নগরীতে বিক্ষোভ হয়েছে তার জন্যে নিরাপত্তাকর্মীরা ব্যস্ত, ঠিক তখন শক্তি কেন্দ্রে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন পাওয়া গেছে, নিরাপত্তা কেন্দ্র, শক্তি কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে! মাজুরা ইলেকট্রিক কোম্পানির ফোরম্যানকে অগ্রিম বোনাস দেয়া হয়েছে—এই মানুষটি বোনাস পেলেই শহরে গিয়ে উত্তেজক পানীয় খায়, ভোরে ঠিক করে কাজ করতে পারে না। সেজন্যে সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি এবং একটা দুর্ঘটনা ঠেকাতে পারে নি। অগ্নিকাণ্ডের জন্যে যে ফায়ারব্রিগেড যাবার কথা তাদেরও সমস্যা হয়েছে সবুজ পৃথিবীর স্কুলের বাচ্চাদের জন্যে! তারা আর্ট মিউজিয়ামে গিয়েছে সকাল দশটায় সেজন্যে রাস্তাটা সাময়িকভাবে বন্ধ। এরকম অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা আলাদা আলাদাভাবে পুরোপুরি গুরুত্বহীন। কিন্তু যখন একটার সাথে আরেকটা জুড়ে দেখ দেখবে সেটি ভয়াবহ বিপজ্জনক! নেটওয়ার্কের কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়ে যাবে। গিয়েছে!"

রোবোমানবের দলপতি হিংস্র গলায় বলল, "তার মানে তুমি দাবি করছ কী করলে কী হবে তার সবগুলো তুমি আগে থেকে জান?"

"হ্যাঁ জানি। আমাকে কেউ দাবা খেলায় কখনো হারাতে পারে না—কী হলে কী হতে পারে তার সম্ভাব্য সবকিছু আমি বলতে পারি। এখানেও আমি বলতে পারি, তাই কিছু ছোটখাটো ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এর সবগুলোর সম্মিলিত ফল হচ্ছে নেটওয়ার্ক ধ্বংস হওয়া।" মহামান্য থুল বললেন, "ক্যাওস থিওরি বলে একটা থিওরি আছে। সেখানে বলা হয় এখানে হয়তো একটা প্রজাপতি তার ডানা ঝাপটেছে—তার ফলস্বরূপ অন্য গোলার্ধে একটা ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাবে! এখানেও তাই, পার্থক্য হল আমি নিজের হাতে একটি একটি করে সেটা সাজিয়েছি।"

রোবোমানবের দলপতি বলল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না!"

"ঠিক আছে। তোমার ইচ্ছা।" মহামান্য থুল কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করলেন।

লাল চুলের মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "আমি কি এখন এই বুড়োটিকে গুলি করব!"

দলপতি হিংস্র গলায় বলল, "হ্যাঁ। কর। এর এই অভিশপ্ত মস্তকটাকে ছিন্নভিন্ন করে দাও।"

লাল চুলের মেয়েটি তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তুলে গুলি করল। ঝলক ঝলক রক্ত বের হয়ে

দেহটি ঘুরে পড়ে যাবার কথা ছিল কিন্তু দেহটি পড়ে গেল না। বরং মহামান্য থুল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি তোমাদের আরো একটু বুদ্ধিমান ভেবেছিলাম। তোমরা কেউ অনুমান করতে পার নি আমি যে আমি নই? আমি আমার হলোগ্রাফিক ছবি। নেটওয়ার্ক ধ্বংস হয়ে গেছে, জরুরি বিদ্যুৎ দিয়ে এই হলোগ্রাফিক ছবি তোমাদের দেখানো হয়েছে, মনে হয় আর দেখানো সম্ভব নয়। সত্যিই যদি আমাকে চাও বাইরে খুঁজতে হবে। আমি এখন বাইরে। লক্ষ লক্ষ বিভ্রান্ত আতঙ্কিত মানুষের সাথে মিশে গেছি।"

প্রচণ্ড আক্রোশে সবগুলো রোবোমানব মহামান্য থুলের হলোগ্রাফিক ছবিটিকেই গুলি করতে থাকে। মহামান্য থুল হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। খুব ধীরে ধীরে তার ছবিটি মিলিয়ে গেল।

রাস্তার ফুটপাত দিয়ে অসংখ্য মানুষ ছুটছে। একটা ছোট শিশু কাঁদছে আর তার মা শিশুটির হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শিশুটি জিজ্ঞেস করল, "এখন কী হবে মা? নেটওয়ার্ক ধ্বংস হয়ে গেছে—"

"আমি জানি না।" মা ভয় পাওয়া গলায় বললেন, "আমি জানি না বাবা।"

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বৃদ্ধ বলল, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেমন করে জানেন?"

বৃদ্ধ হাসলেন, বললেন, "আমি জানি! মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।"

"আপনাকে চেনা চেনা লাগছে। আপনাকে কি আমি আগে কখনো দেখেছি?"

"আমি জানি না। অনেকের চেহারা হয় এরকম, দেখলেই মনে হয় আগে কোথায় জানি দেখেছি। মনে হয় আমার চেহারা সেরকম।"

আপনি সত্যিই বলছেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ। বিশ্বাস কর। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মা শিশুটিকে নিয়ে ছুটতে থাকে। শিশুটি এখন নূতন উৎসাহে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল, মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হাসছিস কেন?"

"এমনি।"

"তোর ভয় করছে না?"

"না। আমার ভয় করছে না।"

"কেন ভয় করছে না?"

"ঐ যে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"কোন বুড়ো কী না কী বলেছে—"

"কী বলছ তুমি মা? তুমি মহামান্য থুলকে চিনতে পার নি?"

মা থমকে দাঁড়ালেন, পিছনে তাকালেন কিন্তু থুলকে আর খুঁজে পেলেন না।

২১

নীহা কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। খানিকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থেকে সে মাথা ঘুরিয়ে ভিতরে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?"

"কী?"

"এই যে সামনে সুহা আর ক্লদের মৃতদেহ পড়েছিল—"

"হ্যাঁ।"

"মৃতদেহ দুটি আর নেই।"

"তাই নাকি?" টর জানালার পাশে এসে দাঁড়াল, বাইরে তাকিয়ে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। মৃতদেহগুলো কোথায়?"

টুরান বলল, "নিশ্চয়ই তেজস্ক্রিয় প্রাণীগুলো নিয়ে গেছে।"

"নিয়ে কী করবে?"

"জানি না।" টর মাথা নাড়ল, "এই প্রাণীগুলো সম্পর্কে কেউ খুব বেশি জানে না। এগুলো সত্যিকার প্রাণী না। হাইব্রিড।"

নীহা বলল, "আমি আর প্রাণীদের কথা ভাবতে চাই না। ট্রিনিটি বলেছে স্কাউটশিপ পাঠিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে, আমি তার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

"আমরা সবাই সেজন্যে অপেক্ষা করছি।"

নীহা আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। সে কি কুণ্ডরাভ সমীকরণের সমাধানের কথা চিন্তা করছে নাকি মঙ্গল গ্রহের নিঃসঙ্গ লাল প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে বোঝা যায় না।

ট্রিনিটি স্কাউটশিপটাকে যখন তাদের আবাসস্থলের কাছে নামিয়ে আনে তখন সূর্য ঢলে পড়ছে। ছড়ানো-ছিটানো পাথরের লম্বা ছায়া চারদিকে একটি আধিভৌতিক দৃশ্য তৈরি করেছে। আবাসস্থলের ভেতরে সবাই তাদের স্পেসস্যুট পরে নেয় তারপর হাতে অস্ত্রগুলো নিয়ে বের হয়। স্কাউটশিপটি কাছেই, তারপরেও তারা দ্রুত হাঁটতে থাকে। তারা যখন স্কাউটশিপের কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন ইহিতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "তাড়াতাড়ি হাঁট। প্রাণীগুলো আসছে।"

AMARBOI.COM

টর বলল, "আসতে দাও। আমি এখন আর ভয় পাই না, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে একেবারে শেষ করে দেব।"

ইহিতা বলল, "কোনো প্রয়োজন নেই। গোলাগুলি না করে আমরা ছুটে উঠে যাই। চল।"

সবাই তখন ছুটতে থাকে। স্কাউটশিপের কাছে এসে প্রথমে টুরান, তারপর ইহিতা, আর টর লাফিয়ে স্কাউটশিপে উঠে গেল। নুট যখন নীহাকে ধাক্কা দিয়ে স্কাউটশিপের ভেতরে উঠিয়ে দিচ্ছে ঠিক তখন চারপাশ থেকে প্রাণীগুলো তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ওপর থেকে টরকে এক পশলা গুলি করতে হল, প্রাণীগুলো যখন একটু সরে যায় তখন সবাই নীহাকে টেনে ভেতরে তুলে নেয়। প্রাণীগুলো তখন আবার ছুটে তাদের আক্রমণ করার চেষ্টা করে কিন্তু ততক্ষণে স্কাউটশিপের ভারী দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপরও বাইরে প্রাণীগুলো ছুটোছুটি করতে থাকে।

স্কাউটশিপের ভেতর ইহিতা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সবাই ঠিক মতন এসেছ?"

নীহা মাথা নাড়ল, বলল, "এসেছি।"

"সবাই তা হলে নিজেদের জায়গায় বসে যাও। আমরা এখন রওনা দেব।"

সবাই নিজেদের জায়গায় বসতেই সিট থেকে যন্ত্রপাতি বের হয়ে এসে তাদেরকে নিরাপত্তা বলয়ের মাঝে আটকে নেয়। নীহা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল, নুট নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী দেখার চেষ্টা করছ নীহা?"

নীহা বলল, "না। কিছু না।"

"তুমি কি প্রাণীগুলোকে দেখতে চাইছ?"

"হ্যাঁ। আমার মনে হল, স্পষ্ট মনে হল—" কথা শেষ না করে নীহা থেমে যায়।

নুট মাথা নাড়ল, বলল, "তুমি ঠিকই দেখেছ নীহা।"

নীহা চমকে উঠে বলল, "কী বলছ তুমি?"

"আমি ঠিকই বলেছি।" নুট ফিসফিস করে বলল, "আমি নিচে ছিলাম, স্পষ্ট দেখেছি একটা প্রাণীর মাথা সুহার মতো। আরেকটা ক্লদের।"

"কেমন করে সম্ভব?"

"এই প্রাণীগুলো মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে পারে। সুহা আর ক্লদের শরীরকে এগুলো ভাগাভাগি করে নিয়েছে।"

"কী ভয়ংকর!"

"হ্যাঁ ভয়ংকর।"

স্কাউটশিপটা গর্জন করে ওপরে উঠতে শুরু করতেই প্রাণীগুলো চিৎকার করতে করতে সরে গেল, নীহা প্রাণীগুলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে। সেও এবার স্পষ্ট সুহা আর ক্লদকে দেখতে পায়। তাদের সত্যিকার চেহারার সাথে খুব বেশি মিল নেই, কিন্তু বুঝতে কোনো সমস্যা হয় না।

ইহিতা জানতে চাইল, "নীহা! তোমাকে কি কিছু উৎকণ্ঠার মাঝে ফেলে দিল?"

"হ্যাঁ।"

"কী?"

"আমরা আগে এই গ্রহটা ছেড়ে চলে যাই, তখন তোমার সাথে কথা বলব। এখন বলতে চাই না।"

ইহিতা মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে নীহা।"

স্কাউটশিপটা তখন গর্জন করে লাল ধূলি উড়িয়ে আকাশে উঠতে থাকে। বহু দূরে তখন মঙ্গল গ্রহের কুৎসিত চাঁদ ডিমোস আকাশে উঠতে শুরু করেছে।

মহাকাশযানের গোল জানালা দিয়ে মহাকাশযানে ঢোকার সাথে সাথে তারা ট্রিনিটির কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, "আমাদের মহাকাশযানে তোমাদের সাদর আমন্ত্রণ।"

টর দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "খবরদার, বাজে কথা বলবে না ট্রিনিটি। তোমার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষমতা নেই, অধিকারও নেই।"

ইহিতা শব্দ করে হাসল, বলল, "টর! আমার মনে হয় ট্রিনিটির সাথে তোমার এই সংঘাতটুকু মিটিয়ে ফেল। বিষয়টা অর্থহীন। অনেকটা জুতো মোজা বা একটা স্ক্রু ড্রাইভারের সাথে ঝগড়া করার মতো। ট্রিনিটি একটা যন্ত্র ছাড়া আর কিছু না একটু গুছিয়ে মানুষের মতো কথা বলতে পারে—এই হচ্ছে পার্থক্য!"

ট্রিনিটি বলল, "ইহিতা, আমাকে তুমি যতটুকু তাচ্ছিল্য সহকারে দেখছ আমি ঠিক ততটুকু তাচ্ছিল্যের পাত্র নই। আমার হিসেব করার ক্ষমতা প্রায় মানুষের সমান। কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে মানুষ থেকে বেশি।"

"ঐটুকুই। হিসাব করার ক্ষমতা!" ইহিতা বলল, "মানুষকে কখনো তার হিসাব করার ক্ষমতা দিয়ে বিচার করা হয় না।"

ট্রিনিটি বলল, "এই তর্ক সহজে শেষ হবে না। তোমরা নিশ্চয়ই ক্লান্ত। উষ্ণ পানিতে স্নান করে নূতন পোশাক পরে এস, আমি তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করছি।"

টর জিজ্ঞেস করল, "খাবারের জন্য কী আছে?"

"তোমাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনটুকু উদ্‌যাপন করার জন্যে আজকের মেনুতে থাকবে বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক যবের রুটি, তিতির পাখির মাংস, সামুদ্রিক মাছ এবং আঙুরের রস।"

টর কিছুক্ষণ শূন্যের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ট্রিনিটি, তুমি যদি সত্যি সত্যিকারের তিতির পাখির মাংস জোগাড় করতে পার তা হলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব।"

ট্রিনিটি বলল, "আমি সত্যিই তিতির পাখির মাংস জোগাড় করব।"

পাশাপাশি পাঁচটি ক্যাপসুলের ওপর একটা সবুজ বাতি জ্বলছে এবং নিভছে। পাঁচজন নিজেদের ক্যাপসুলটি বের করে তার পাশে এসে দাঁড়াল। টুরান বলল, "তা হলে আবার তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিই।"

টর বলল, "কতদিন পর আবার আমাদের দেখা হবে?"

ইহিতা বলল, "সেই প্রশ্নটির কোনো অর্থ নেই। আমাদের কাছে মনে হবে আমরা চোখ বন্ধ করেছি এবং চোখ খুলেছি। কাজেই তোমাদের সাথে দেখা হবে এক পলক পরে!"

নীহা বলল, "তা হলে আমাদের খুব আনুষ্ঠানিক বিদায় নেবারও প্রয়োজন নেই? আমরা ঝটপট ক্যাপসুলে শুয়ে পড়তে পারি?"

ইহিতা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। ঝটপট শুয়ে পড়তে পারি।"

টুরান বলল, "শুধু পৃথিবীতে কী হচ্ছে সেই খবরটা জানতে পারলাম না।"

ট্রিনিটি বলল, "পৃথিবীর নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে আছে। তার খবর পাবার কোনো উপায় নেই।"

ইহিতা বলল, "এক দিক দিয়ে সেটি হয়তো আমাদের জন্যে ভালো। পৃথিবীকে পিছনে ফেলে আমরা সামনে নূতন আরেকটা পৃথিবী খুঁজে বের করতে যাব।"

নীহা বলল, "ঠিক আছে তা হলে চল আমরা ক্যাপসুলে ঢুকি।"

সবাই বলল, "চল।"

নুট বলল, "এবারে আমি অনেক প্রশান্তি নিয়ে ঘুমুতে যাচ্ছি। তোমাদের সবার সাথে নূতন পৃথিবীতে দেখা হবে!"

সবাই মাথা নাড়ল, তারপর ক্যাপসুলে ঢুকে গেল। ক্যাপসুলের ঢাকনাটা খুব ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে। ক্যাপসুলের ভেতর শীতল সুগন্ধি একটা বাতাস ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বাতাসে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, তারা কেউ চোখ খোলা রাখতে পারে না। একজন একজন করে তারা গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল। তখন মৃদু কম্পন তুলে ক্রায়োজেনিক মডিউলটি চালু হয়ে যায়, সাথে সাথে পাঁচজন মহাকাশচারীর দেহ শীতল হতে থাকে। খুব ধীরে ধীরে জীবনের স্পন্দন থেমে যায়, পাঁচজন মানুষ পুরোপুরি পাঁচটি জড় পদার্থের মতো ক্যাপসুলের ভেতর শুয়ে থাকে।

মহাকাশযানটির ইঞ্জিনগুলো একটা একটা করে চালু হতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মাঝেই পুরো মহাকাশযানটি থরথর করে কাঁপতে থাকে। সেটি খুব ধীরে ধীরে তার কক্ষপথ থেকে মুক্ত হয়ে মহাকাশের দিকে ছুটে যেতে থাকে। সৌরজগৎ পার হয়ে সেটি ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে ছুটে যেতে থাকবে। চারশ বিলিয়ন নক্ষত্রের কোথাও না কোথাও একটি চমৎকার গ্রহ খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে পৃথিবীর মানুষ নূতন করে তাদের সভ্যতা শুরু করতে পারবে।

২২

পুলিশ কমিশনার অসহায়ভাবে হাত নেড়ে বললেন, "আমি কী করব?"

তাকে ঘিরে থাকা মানুষগুলো বলল, "তা হলে কে করবে? তোমাকেই তো করতে হবে। তুমি আমাদের পুলিশ কমিশনার। তুমি না করলে কে করবে?"

পুলিশ কমিশনারকে আরো অসহায় দেখায়, "কিন্তু আমি তো শুধু পুলিশ কমিশনার। আইনশৃঙ্খলার বিষয়টা দেখি—"

"এটা তো আইনশৃঙ্খলারই ব্যাপার। নেটওয়ার্ক কাজ করছে না, পুরো শহরের সবকিছু থেমে গেছে। আমরা কোথায় বিদ্যুৎ পাব, কোথায় খাবার পানি পাব, কোথায় খাবার পাব, আমাদের ছেলেমেয়েরা কেমন করে স্কুলে যাবে, কেমন করে লেখাপড়া করবে কিছু জানি না। আমাদের অসুখ হলে কে চিকিৎসা করবে তাও জানি না!"

পুলিশ কমিশনার মাথা নাড়ল, বলল, "এগুলো তো আমারও প্রশ্ন।"

"তা হলে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও।"

তেজি চেহারার একজন মহিলা বলল, "মানুষজন কিন্তু ক্ষেপে উঠছে।"

কমবয়সী একজন তরুণ বলল, "সবাই খুব ভয় পেয়েছে। সারা শহরে আতঙ্ক।"

বুড়ো মতন একজন বলল, "তোমাকে একটা সিদ্ধান্ত দিতে হবে। বলতে হবে আমরা এখন কী করব।"

পুলিশ কমিশনার বলল, "আমরা চেষ্টা করছি কেন্দ্রে যোগাযোগ করার জন্যে। কোনো উত্তর পাচ্ছি না।"

তেজি চেহারার মহিলাটি বলল, "আমরা এসব শুনতে চাই না। তুমি কিছু একটা কর।"

পুলিশ অফিসার খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "তা হলে আমরা সবাই একসাথে বসি। বসে চিন্তা-ভাবনা করে কিছু একটা ঠিক করি।"

"তুমি যেটা ভালো মনে কর সেটা কর। কিন্তু কিছু একটা কর।"

"ঠিক আছে। ঠিক আছে। তা হলে আমরা সবাই আমাদের শহরের হলঘরটাতে বসি?"

পুলিশ কমিশনারকে ঘিরে থাকা মানুষগুলো মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

তেজি চেহারার মহিলাটি বলল, "কিন্তু আমরা সবাইকে খবর দেব কেমন করে? নেটওয়ার্ক নেই—"

"সবার বাসায় বাসায় যেতে হবে। বাসায় বাসায় গিয়ে বলতে হবে।"

বুড়ো মতন মানুষটা বলল, "একজন কয়েকজনকে খবর দেবে, তারা প্রত্যেকে আরো কয়েকজনকে খবর দেবে এভাবে সবার কাছে খবর পৌঁছানো যাবে।"

পুলিশ কমিশনার বলল, "হ্যাঁ। সেটাই ভালো। আমি আমার পুলিশ বাহিনীকেও পাঠিয়ে দিই।"

হলঘরে শহরের সব মানুষ চলে এসেছে। বসার জায়গায় সবাইকে জায়গা দেয়া যায় নি তাই অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতর রীতিমতো গরম, মানুষেরা হাত দিয়ে নিজেদের বাতাস করার চেষ্টা করছে। হলঘরের সামনে উঁচু মঞ্চে পুলিশ কমিশনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখেমুখে এক ধরনের আতঙ্ক। সে হাত তুলতেই সবাই চুপ করে গেল।

পুলিশ অফিসার একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, "প্রিয় নগরবাসী এখানে আসার জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ। তোমরা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন তোমাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে।"

সবাই নিঃশব্দে বসে থাকে, সবার মাঝে এক ধরনের চাপা ভয়।

পুলিশ কমিশনার বলল, "তোমরা সবাই দেখেছ আমাদের নেটওয়ার্কটি কাজ করছে না। এটি অসম্ভব একটি ব্যাপার—এরকম ভয়ংকর একটি ব্যাপার যে ঘটতে পারে আমরা সেটা কল্পনাও করতে পারি নি। এখনো আমি সেটা বিশ্বাস করতে পারছি না।" পুলিশ কমিশনার একবার ঢোক গিলে বলল, "আমি ভেবেছিলাম এটি একটি ছোট দুর্ঘটনা এবং অত্যন্ত দ্রুত এই সমস্যাটি মিটিয়ে ফেলা হবে। তোমরাও নিশ্চয়ই তাই ভেবেছিলে—আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম যে নেটওয়ার্কটি চালু হয়ে যাবে। নেটওয়ার্ক না থাকায় আমরা অন্যান্য শহরে খোঁজ নিতে পারছিলাম না, সব যোগাযোগ বন্ধ। তারপরও লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছি এবং যেটুকু সম্ভব জানা গেছে শুধু এখানে নয়, সব জায়গায় নেটওয়ার্ক বন্ধ।"

কমবয়সী একটি মেয়ে প্রায় হাহাকারের মতো শব্দ করে বলল, "তা হলে আমাদের কী হবে?"

পুলিশ কমিশনার বলল, "সেটা নিয়ে কথা বলার জন্যেই তোমাদের সবাইকে ডেকেছি। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আলোচনা করা যাক।"

বয়স্ক একজন মানুষ বলল, "আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম প্রাচীনকালে সব শহরে শহর পরিচালনার জন্যে একটি কমিটি থাকত। সেই কমিটির সদস্যরা শহরের ভালো-মন্দ দায়িত্ব নিত। আমরাও কাজ চালানোর জন্যে এরকম একটা কমিটি করতে পারি।"

AMARBOI.COM

একজন জিজ্ঞেস করল, "সেই কমিটির সদস্য কে হবে?"

আরেকজন বলল, "নেটওয়ার্ক যদি না থাকে তা হলে সেই সদস্যরা কেমন করে কাজ করবে?"

কমবয়সী মেয়েটি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কিন্তু তোমরা কেউ কেন সত্যিকারের বিষয়টা নিয়ে কথা বলছ না? নেটওয়ার্কটি কেমন করে বন্ধ হয়ে গেল? আমরা সব সময় জানতাম নিউক্লিয়ার বোমা দিয়েও এই নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা যায় না।"

সামনের দিকে বসে থাকা মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বলল, "আমি ব্যাপারটা তোমাদের জন্যে ব্যাখ্যা করতে পারি।"

সবাই ঘুরে মানুষটির দিকে তাকাল। এই শহরের মানুষ আগে কখনো এই মধ্যবয়স্ক মানুষটিকে দেখে নি। মানুষটির উঁচু চোয়াল এবং মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখগুলো কোটরের ভেতর এবং দেখে মনে হয় সেটা ধিকিধিকি করে জ্বলছে। মানুষটি উঠে দাঁড়াল এবং লম্বা পা ফেলে মঞ্চে উঠে পুলিশ কমিশনারের পাশে দাঁড়ায়। তারপর পোশাকের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে লম্বা বেঢপ একটা রিভলবার বের করে আনে। সেটা উপরে তুলে একটা গুলি করতেই ঝনঝন শব্দ করে একটা আলো ভেঙে পড়ে হলঘরের খানিকটা অন্ধকার হয়ে যায়। হলঘরে বসে থাকা মানুষগুলো একসাথে সবাই চিৎকার করে আবার হঠাৎ করে থেমে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যবয়স্ক কোটরাগত চোখের মানুষটা রিভলবারটাকে একনজর দেখে বলল, "আমার আসলে পুলিশ কমিশনারের কপালে এই গুলিটা করার কথা ছিল কিন্তু রক্তের ছিটে লেগে আমার শার্টটা নোংরা হবে তাই তাকে গুলি করি নি। নেটওয়ার্ক বন্ধ, কাপড় ধুতেও পারব না।"

হলঘর বোঝাই মানুষগুলো বিস্ফারিত চোখে মধ্যবয়স্ক মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা কেউ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি রোবোমানব। এই হলঘরের পিছনে আরো দুজন রোবোমানব আছে, তাদের হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র রয়েছে, একটু যদি নড়াচড়া কর, আমার কথার অবাধ্য হও তা হলে সবাইকে গুলি করে শেষ করে দেয়া হবে। আমাদের কাছে মানুষ আর ব্যাকটেরিয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।"

কেউ কোনো কথা বলল না, নিঃশব্দে রোবোমানবটির দিকে তাকিয়ে রইল। রোবোমানবটি হলঘরের মানুষগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, "আজ আমার খুব আনন্দের দিন। এতদিন আমরা মানুষের ভয়ে লুকিয়ে থাকতাম। এখন আমাদের আর লুকিয়ে থাকতে হবে না। আমরা প্রকাশ্যে এসেছি। এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রত্যেকটা শহরে নগরে রোবোমানবেরা বের হয়ে তার দায়িত্ব নিচ্ছে। পুরো পৃথিবী এখন রোবোমানবদের হাতের মুঠোয়।"

বয়স্ক একজন মানুষ বলল, "আমি বিষয়টা ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি বলছ পুরো পৃথিবীটা তোমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু কেমন করে সেটা তোমাদের হাতের মুঠোয় গিয়েছে?"

"তার কারণ আমরা পৃথিবীর নেটওয়ার্ক দখল করেছি। যে পৃথিবীর নেটওয়ার্ক দখল করতে পারে সে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

"কিন্তু নেটওয়ার্ক তো বন্ধ। বন্ধ নেটওয়ার্ক দখল করে কী লাভ?"

"আমরা বন্ধ নেটওয়ার্ক দখল করি নি।"

"তা হলে নেটওয়ার্ক বন্ধ কেন?"

"নিশ্চয়ই কোনো একটা কারণে নেটওয়ার্ক বন্ধ করা হয়েছে।"

"সেই কারণটা কী?"

মধ্যবয়স্ক মানুষটার কোটরাগত চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বলে ওঠে, সে হিংস্র গলায় বলল, "তুমি সীমা অতিক্রম করেছ? আমি তোমার কথায় উত্তর দিতে বাধ্য নই।"

"কিন্তু আমাদের জানতে হবে।"

"বেশ। জেনে নাও।" বলে রোবোমানবটি তার রিভলবার তুলে বুড়ো মানুষটির মাথা লক্ষ করে গুলি করল। পুরো হলঘরটিতে গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

বুড়ো মানুষের দেহটি ঢলে নিচে পড়ে গেল। রোবোমানবটি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাদের জন্যে এটি একটি উদাহরণ হয়ে রইল। কেউ যদি সীমা অতিক্রম করে তার বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।"

কেউ কোনো কথা বলল না।

"আমরা পৃথিবী দখল করেছি এই বিষয়টি নিয়ে কারো প্রশ্ন আছে?"

এবারেও কেউ কোনো কথা বলল না।

"চমৎকার।" রোবোমানবটি মুখে সন্তুষ্টির একটা ভাব ফুটিয়ে বলল, "এবার তা হলে সকলে ঘরে ফিরে যাও। কাল সকালে আমাদের পঞ্চাশ জন মানুষ দরকার। সুস্থ সবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরোগ পঞ্চাশ জন মানুষ। কমবয়সী পঞ্চাশ জন মানুষ। নারী এবং পুরুষ। আজ রাতের মাঝে নেটওয়ার্ক চালু হয়ে যাবে। সেই নেটওয়ার্কে আমরা নির্দেশ পাঠাব।"

এবারেও কেউ কোনো কথা বলল না। রোবোমানবটি মুখে ক্রূর একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "এই পঞ্চাশ জনের জীবনকে আমরা মহিমান্বিত করে দেব। তারা তুচ্ছ মানুষের জীবন পরিত্যাগ করে সত্যিকার রোবোমানবের জীবনে পা দেবে।"

উপস্থিত সবাই হঠাৎ করে আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

২৩

আবছা অন্ধকার একটি ঘরে কয়েকজন তরুণ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। তাদের সামনে একটি মনিটর। সেখানে আলোর কোনো বিচ্ছুরণ নেই। একজন নিচু গলায় বলল, "নেটওয়ার্ক চালু হয়েছে?"

"না, চালু হয় নি।"

"আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি মনে মনে প্রার্থনা করছি যেন নেটওয়ার্ক চালু না হয়।"

"শুধু তুমি নয় এই প্রথমবার আমরা সবাই প্রার্থনা করছি যেন নেটওয়ার্ক চালু না হয়।"

"রোবোমানবেরা নেটওয়ার্কটা দখল করে নিয়েছে। তুমি চিন্তা করতে পার সেটি কী ভয়ানক ব্যাপার?"

"না আমি চিন্তাও করতে পারি না।"

"একটা জিনিস লক্ষ করেছ?"

"কী জিনিস?"

"নেটওয়ার্কটা যদি চালু না হয় তা হলে রোবোমানবেরা কিছু করতে পারবে না।"

"আমরাও কিছু করতে পারব না।"

"কিন্তু আমরা অনেক, তারা মাত্র তিনজন। আমরা ইচ্ছে করলে তাদের আঙুল দিয়ে টিপে মেরে ফেলতে পারব।"

"তাদের হাতে অস্ত্র আছে।"

"আমরাও অস্ত্র জোগাড় করতে পারি।"

"কেমন করে? নেটওয়ার্ক বন্ধ—তুমি কিছুই জোগাড় করতে পারবে না।"

"আমরা অস্ত্রাগারের তালা ভেঙে ফেলতে পারি।"

"কী বলছ তুমি? এটা কত বড় অপরাধ তুমি জান?"

"নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকলে এটা কোনো অপরাধ না।"

"যদি নেটওয়ার্ক চালু হয়ে যায়?"

"এখনো হয় নি।"

"হে ঈশ্বর তুমি নেটওয়ার্কটি বন্ধ রাখ।"

"কে জানে পৃথিবীর অন্য জায়গায় কী হচ্ছে!"

"ঠিক এখানে যা ঘটছে নিশ্চয়ই হুবহু তাই ঘটছে।"

"হে বিধাতা, তুমি নেটওয়ার্কটি বন্ধ রাখ। রোবোমানবেরা যেন কোনোভাবে নেটওয়ার্ক চালু করতে না পারে।"

AMARBOI.COM

২৪

রোবোমানব তিনজনের একজন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কী চাও?"

পেশিবহুল তরুণটি তার অস্ত্রটি হাত বদল করে বলল, "তোমরা কাল বলেছিলে তোমরা সুস্থ সবল নীরোগ পঞ্চাশ জন মানুষ চাও। আমরা সুস্থ সবল নীরোগ পঞ্চাশ জন এসেছি।"

একজন রোবোমানব তার হাতের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি তুলে বলল, "আমাদের সাথে তামাশা করার চেষ্টা কোরো না। এই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি দিয়ে তোমাদের সবাইকে শেষ করে দেব।"

"আমরা সেটা অনুমান করেছিলাম। তাই দেখতেই পাচ্ছ আমরা সুস্থ সবল নীরোগ পঞ্চাশ জন খালি হাতে আসি নি। সবার হাতে অস্ত্র। অস্ত্রাগার ভেঙে নিয়ে এসেছি।"

সোনালি চুলের একটি মেয়ে বলল, "পৃথিবীর নেটওয়ার্ক কেন বন্ধ সেটা আমরা এখন বুঝতে পারছি। তোমরা এটি দখল করেছ জানতে পেরে নেটওয়ার্কটি অচল করে দেয়া হয়েছে। তোমরা সোনার হরিণ ধরার চেষ্টা করেছ। ধরে আবিষ্কার করেছ এটা মরা ইঁদুর। মানুষের বুদ্ধি রোবোমানবের থেকে অনেক বেশি।"

রোবোমানবটি হিংস্র গলায় বলল, "আমার কাছে বুদ্ধি নিয়ে বড়াই কোরো না। তোমরা সরে যাও, না হলে গুলি করে শেষ করে দেব।"

পেশিবহুল তরুণটি বলল, "এই কথাটা বরং আমরাই বলি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে দুই হাত উঁচু করে দাঁড়াও না হলে আমরা গুলি করে শেষ করে দেব।"

তরুণটির কথা শেষ হবার আগে রোবোমানব তিনটি তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে গুলি করতে শুরু করে। পঞ্চাশ জন তরুণ-তরুণীও তাদের অস্ত্র তুলে নেয়। হলঘরটির মাঝে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

যেভাবে হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়েছিল ঠিক সেভাবে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। হলঘরের একপাশে গুলিবিদ্ধ তিনজন রোবোমানব পড়েছিল। অন্য পাশে তরুণ-তরুণীরা। খুব ধীরে ধীরে তরুণ-তরুণীরা উঠে দাঁড়াতে থাকে। শরীর থেকে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে একজন বলল, "রোবোমানবদের বলা যায় নি আমরা অস্ত্রাগার ভেঙে শুধু অস্ত্র নিই নি, গুলি নিরোধক পোশাকও নিয়েছি।"

পঞ্চাশ জন তরুণ-তরুণী তিনটি রোবোমানবকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। একজন বলল, "আমি কখনো চিন্তা করি নি আমি আমার হাতে অস্ত্র তুলে নেব, আমি সেই অস্ত্র দিয়ে কাউকে গুলি করব। আমি কখনোই কোনো প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হতে চাই নি।"

সোনালি চুলের মেয়েটি বলল, "তুমি সেটি নিয়ে মাথা ঘামিও না। রোবোমানব তিনটি গুলিবিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু এখনো মারা যায় নি। হাসপাতালে নিলে বাঁচিয়ে ফেলবে।"

একজন শুধু মুখ শক্ত করে বলল, "আমরা এই প্রাণীগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করব?"

সোনালি চুলের মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ বাঁচানোর চেষ্টা করব।"

"কেন?"

"কারণ আমরা মানুষ। কারণ আমরা রোবোমানব নই।"

তিনজন গুলিবিদ্ধ রোবোমানবকে হাসপাতালে নিতে নিতে একজন তরুণ জিজ্ঞেস করল, "সারা পৃথিবীতে এখন কী হচ্ছে কে জানে?"

অন্য একজন বলল, "ঠিক এখানে যা হচ্ছে নিশ্চয়ই সব জায়গাতেই তাই হচ্ছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি তাই ভাবছ?"

"হ্যাঁ। নেটওয়ার্কটি ইচ্ছে করে বিকল করা হয়েছে।"

"তার মানে আমাদের নেটওয়ার্ক ছাড়া বেঁচে থাকতে হবে?"

"হ্যাঁ। আর মজার কথা কী জান?"

"কী?"

"আমরা নেটওয়ার্ক ছাড়াই কিন্তু বেঁচে থাকা শুরু করে দিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী, অভিজ্ঞতাটা কিন্তু খুব খারাপ না।"

তরুণ কয়েকজন শব্দ করে হেসে উঠল। একজন তরুণী বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ! নেটওয়ার্কবিহীন জীবনটা আমার কাছেও মন্দ লাগছে না! এর মাঝে একটা স্বাধীন স্বাধীন ভাব আছে, কেমন যেন বনভোজনের আনন্দ আছে!"

কয়েকজন মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ!"

২৫

বেশ কিছু মানুষের জটলার ভেতর থেকে উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা যেতে থাকে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একজন মহিলা আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে এখানে?"

"রোবোমানবগুলো ধরা পড়েছে।"

"ধরা পড়েছে?" মহিলার চোখ দুটো উত্তেজনায় চকচক করে ওঠে। "কত বড় বদমাইশ দেখেছ? কী পরিমাণ হিংস্র এই রোবোমানবেরা—এদেরকে পিটিয়ে শেষ করে দেয়া দরকার।"

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো মানুষটি নরম গলায় বলল, "আমরা তো মানুষ—আমরা তো কখনোই অন্য মানুষকে খুন করে ফেলার কথা বলতে পারি না।"

"কিন্তু রোবোমানবেরা তো মানুষ না?"

"তারা মানুষের একটা রূপান্তরিত রূপ। মস্তিষ্কে একটা পরিবর্তন এনে তাদেরকে দানব করে ফেলা হয়।"

মহিলাটি উত্তেজিত গলায় বলল, "আমিও তো তাই বলছি। এই দানবগুলোকে শেষ করে দিতে হবে।"

বুড়ো মানুষটি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দানবগুলোকে তো মানুষের সাথে তুলনা করলে হবে না। একটা বনের পশু যদি কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে কি আমরা পশুটাকে দোষ দিই? পশুর তো দোষ নেই, তাদের তো সেই বুদ্ধিমত্তা নেই। এখানেও তাই—"

"তা হলে রোবোমানবদের কী করব?"

"আপাতত আটকে রাখতে হবে, তারপর বিজ্ঞানীদের গবেষণা করতে দিতে হবে—তারা কোনোভাবে রোবোমানবদের ভেতরে মানুষের প্রবৃত্তি ফিরিয়ে আনতে পারে কি না।"

"পারবে না। কিছুতেই পারবে না।"

বুড়ো মানুষটি হাসল, বলল, "কিন্তু চেষ্টা করতে হবে তো?"

ঠিক তখন জটলাটা ভেঙে গেল, দেখা গেল বেশ কিছু উত্তেজিত মানুষ কয়েকজন রোবোমানবকে পিছমোড়া করে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"পুলিশ কমিশনারের কাছে।"

"কী করবে?"

"জেলখানায় আটকে রাখবে।"

রাগী চেহারার একজন মানুষ বলল, "এদেরকে খুন করে ফেলা উচিত। মনে আছে প্রথম কয়েকদিন আমাদের ওপর কী অত্যাচার করেছে? কতজনকে মেরেছে।"

পিছমোড়া করে বেঁধে নেয়া মানুষগুলোর একজন বলল, "আমাদের খুন করতে হবে না। একটা ঘরে বন্ধ করে রাখলে নিজেরাই নিজেদের খুন করে ফেলব। খবর পেয়েছি সব জায়গায় তাই হচ্ছে!"

"কী আশ্চর্য! কেন?"

"এদের ভেতরে কোনো ভালবাসা নেই। আমাদের জন্যেও নেই, নিজেদের জন্যেও নেই।"

মানুষগুলো রোবোমানবদের টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল—পিছন পিছন অনেক মানুষ হৈ-হুল্লোড় করতে করতে যেতে থাকে। মহিলাটি সেদিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দুই সপ্তাহ আগেও যদি কেউ আমাকে বলত সারা পৃথিবীটা এভাবে ওলটপালট হয়ে যাবে, আমি বিশ্বাস করতাম না।"

বুড়ো মানুষটি বলল, "তোমাদের এই শহরের কী অবস্থা?"

"প্রথম প্রথম খুব খারাপ অবস্থা ছিল। মানুষজন যখন বুঝেছে নেটওয়ার্ক ছাড়াই দিন কাটাতে হবে তখন আস্তে আস্তে সব ব্যবস্থা করতে শুরু করেছে।"

বুড়ো মানুষটি মাথা নেড়ে বলল, "ও আচ্ছা।"

"হ্যাঁ। প্রথম প্রথম সবাই অসম্ভব ক্ষেপেছিল, পরে বুঝতে পেরেছে রোবোমানবদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তখন সবাই মেনে নিয়েছে।"

বুড়ো মানুষটি মাথা নাড়ল। মহিলাটি একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এখন মোটামুটি সবকিছু নিয়ন্ত্রণের মাঝে আছে। আশপাশের শহরের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, দিন কেটে যাচ্ছে। তবে—"

"তবে কী?"

"শুধু একটা সমস্যা।"

"কী সমস্যা।"

"বাচ্চাদের স্কুলের সমস্যা। আগে নেটওয়ার্ক থেকে পাঠগুলো আসত—এখন সেরকম কিছু আসছে না। মানুষজনকে শিক্ষক হতে হচ্ছে। শিক্ষকের খুব অভাব। বিশেষ করে বিজ্ঞান আর গণিতের শিক্ষকের।"

বুড়ো মানুষটা বলল, "আমি মোটামুটিভাবে বিজ্ঞান আর গণিত জানি। তোমরা যদি চাও তা হলে আমি বাচ্চাদের বিজ্ঞান আর গণিত পড়াতে পারি।"

মহিলাটির চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কিছু একটা বলতে গিয়ে সে থেমে যায়। ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"নেটওয়ার্ক নেই বলে আমাদের কোনো অর্থসম্পদ নেই। তোমাকে তো বেতন দিতে পারব না।"

বুড়ো মানুষটি বলল, "আমাকে বেতন দিতে হবে না। স্কুলের কোনো কোনায় একটু ঘুমানোর জায়গা আর একটুখানি খাবার দিলেই হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সেটা দিতে পারব। আমি বাসা থেকে তোমার জন্যে দুটো কম্বল নিয়ে আসব।"

বুড়ো মানুষটা হাসি হাসি মুখে বলল, "হ্যাঁ। দুটো কম্বল হলেই হয়ে যাবে।"

"তুমি তা হলে চল আমার সাথে, আমাদের স্কুলটাতে নিয়ে যাই।"

বুড়ো মানুষটি সারা দিন স্কুলের বাচ্চাদের নানাভাবে ব্যস্ত রাখল। তাদের মজার মজার গল্প শোনাল, গণিত শেখাল, বিজ্ঞান শেখাল, বেসুরো গলায় গান গাইল, বিজ্ঞানের ছোট ছোট পরীক্ষা করল। তারপর বিকেলবেলা স্কুলের বারান্দায় বসে বসে সব বাচ্চাদের বিদায় দিল।

একটি ছোট মেয়ে হাত নেড়ে বুড়ো মানুষটিকে বিদায় দিয়ে তার মায়ের হাত ধরে চলে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। মা জিজ্ঞেস করল, "কী হল।"

"আমি ঐ বুড়ো দাদুকে একটা কথা বলে আসি?"

"কথা বলবে? যাও।"

ছোট মেয়েটি বুড়ো মানুষটার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, "আমি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি?"

"বল।"

"কানে কানে বলতে হবে। কেউ যেন শুনতে না পারে।"

বুড়ো মানুষটি তার মাথা নিচু করল, মেয়েটি তখন তার কানে ফিসফিস করে বলল, "আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি মহামান্য থুল। কিন্তু তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। আমি কাউকে বলে দেব না!"

বুড়ো মানুষটি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তার বাম চোখটা মটকে বলল, "আমি জানি তুমি কাউকে বলে দেবে না!"

AMARBOI.COM

২৬

অন্ধকার নেমে এলে দুজন গুড়ি মেরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে। বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতেই ভেতর থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কে?"

"আমরা।"

"গোপন সংকেত?"

"কোমাডো ড্রাগন।"

সাথে সাথে খুট করে দরজা খুলে গেল। ভেতরে আবছা অন্ধকার, যে দরজাটা খুলেছিল, একজন দীর্ঘদেহী মানুষ, একটু সরে দাঁড়িয়ে সে দুজনকে ঢুকতে দিল। একজন নারী এবং একজন পুরুষ ঘরের ভেতরে ঢোকে। নারীটি কমবয়সী একটি মেয়ে, লাল চুল একটি রুমাল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। পুরুষ মানুষটির চেহারায় একটি অস্বাভাবিক কাঠিন্য।

ঘরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকা একজন জিজ্ঞেস করল, "কী খবর?"

নিষ্ঠুর কঠিন চেহারার মানুষ কিংবা লাল চুলের মেয়ে কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিল না। তারা হেঁটে ঘরের মাঝামাঝি ধাতব টেবিলটার পাশে রাখা চেয়ারটাতে বসে। পুরুষ মানুষটি নিজের হাতে কিছুক্ষণ মাথাটা চেপে ধরে রেখে সোজা হয়ে বসে বলল, "খিদে পেয়েছে। কোনো খাবার আছে?"

"শুকনো প্রোটিন আর কিছু কৃত্রিম খাবার। খানিকটা রক্তের জেলো।"

"তাই দাও। উত্তেজক পানীয় নেই?"

"খুঁজলে একটা বোতল পাওয়া যেতে পারে।"

"খুঁজে দেখ।"

খাবার এবং পানীয় টেবিলে দেবার পর দীর্ঘদেহী মানুষটি এসে ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী খবর?"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি কিছু শুকনো প্রোটিন চিবুতে চিবুতে এক ঢোক উত্তেজক পানীয় খেয়ে বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? তোমরা সবাই খুব ভালো করে জান খবর ভালো না।"

"সেটা তো জানি। কিন্তু কত খারাপ?"

"আমাদের পুরো পরিকল্পনাটা ছিল নেটওয়ার্ক দিয়ে। নেটওয়ার্ক দিয়ে পৃথিবীর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার কথা ছিল। কিন্তু নেটওয়ার্কটিই নেই আমরা কী করব?"

"এখন আমরা কী করব?"

"মানুষের সাথে মিশে যেতে হবে।"

মধ্যবয়স্ক একজন মহিলা জিজ্ঞেস করল, "তার মানে আমরা কি ধরে নেব রোবোমানবের বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে? আমরা মানুষের কাছে পরাজিত হয়েছি?"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি মাথা ঘুরিয়ে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "মানুষ নিজেও পরাজিত হয়েছে। আমাদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে তারা নেটওয়ার্ক ধ্বংস করেছে, এখন তারা পশুর মতো বেঁচে আছে।"

দীর্ঘদেহী মানুষটি বলল, "তোমার ধারণা সত্যি নয়। মাত্র দুই সপ্তাহ পার হয়েছে তার মাঝে মানুষ নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছে। আমি কয়েকটি শহর ঘুরে এসেছি। সেখানে মানুষেরা রীতিমতো উৎসব করছে।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি কিছুক্ষণ দীর্ঘদেহী মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল তারপর একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এখন আমাদের মানুষের সাথে মিশে যেতে হবে। দরকার হলে এখন আমাদের তাদের উৎসবে যোগ দিতে হবে।"

দীর্ঘদেহী মানুষটি বলল, "তুমি বলেছিলে বিকেল তিনটার সময় নেটওয়ার্ক দখল হবে। দুই ঘণ্টার ভিতরে মানুষদের আঘাত করতে হবে। শহরগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে। রোবোমানবেরা তোমার কথা বিশ্বাস করে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে শহরের দখল নেবার চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত নেটওয়ার্ক দখল হয় নি—বরং নেটওয়ার্ক ধ্বংস হয়েছে। সারা পৃথিবীর খবর জানি না কিন্তু বেশিরভাগ শহরে রোবোমানবদের ধরে ফেলেছে। কোথাও কোথাও মেরে ফেলেছে। কোথাও জেলে আটকে রেখেছে।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি তীব্র দৃষ্টিতে দীর্ঘদেহী মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি এই সবকিছু জানি। তুমি কেন আবার এই কথাগুলো আমাকে শোনাচ্ছ?"

"তুমি আমাদের আনুষ্ঠানিক দলপতি। সেজন্যে শোনাচ্ছি। রোবোমানবদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব তোমার হাতে ছিল। তুমি কি তোমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছ?"

"হ্যাঁ। আমি আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছি। এর চাইতে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না।"

"তা হলে কেন পৃথিবীর সব রোবোমানব দুই সপ্তাহের মাঝে ধ্বংস হয়ে গেল?"

"সবাই ধ্বংস হয় নি। তুমি কেন অসংলগ্ন কথা বলছ?"

AMARBOI.COM

দীর্ঘদেহী মানুষটি এক পা অগ্রসর হয়ে বলল, "আমি অসংলগ্ন কথা বলছি না। রোবোমানব হিসেবে আমি আমার দলপতির কাছে কৈফিয়ত চাইছি।"

"আমি তোমার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই। যেটা হয়েছে সেটা একটা দুর্ঘটনার মতো। আমরা কেউ ভুলেও চিন্তা করি নি মানুষ হয়ে মানুষেরা নিজেরা নিজেদের মাথায় গুলি করবে। নেটওয়ার্ক ধ্বংস করবে।"

"দলপতি হিসেবে তোমার সবকিছু চিন্তা করা উচিত ছিল।"

মধ্যবয়স্ক মহিলাটি বলল, "তুমি আমাদের দলপতি। তোমাকে সব দায়দায়িত্ব নিতে হবে।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি হঠাৎ এক ধরনের বিপদ আঁচ করতে পারে, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকায়, "তোমরা কী বলতে চাইছ?"

কেউ কোনো কথা না বলে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটি তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলবার বের করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই দীর্ঘদেহী মানুষটি একটি লোহার রড দিয়ে নিষ্ঠুর মানুষটির মাথায় আঘাত করল। একটা কাতর শব্দ করে সে নিচে পড়ে যায়, তার হাতে তখনো রিভলবারটি রয়ে গেছে। দীর্ঘদেহী মানুষটি রিভলবারটি নিজের হাতে নিয়ে নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটির মাথার দিকে তাক করল।

লাল চুলের মেয়েটি তার মাথার রুমালটি খুলে চুলগুলো তার পিঠে ছড়িয়ে পড়তে দিয়েছে। সে আঙুল দিয়ে চুলের জটাগুলো মুক্ত করতে করতে একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "নির্বোধের মতো কাজ কোরো না। গুলির শব্দ শুনলে মানুষ সন্দেহ করবে। ওকে যদি মারতে চাও নিঃশব্দে মেরে ফেল।"

মধ্যবয়স্ক মহিলাটি টেবিলের ওপর থেকে উত্তেজক পানীয়ের বোতলটা থেকে খানিকটা পানীয় ঢকঢক করে খেয়ে বলল, "যদি ওকে মেরে ফেলবে বলেই ঠিক করেছিলে তা হলে আরেকটু আগে মেরে ফেললে না কেন? আমাদের আধ বোতল উত্তেজক পানীয় বেঁচে যেত!"

দীর্ঘদেহী মানুষটি লোহার রডটি নিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা রোবোমানবের দলপতির দিকে এগিয়ে গেল। নিষ্ঠুর চেহারার দলপতি শূন্য দৃষ্টিতে দীর্ঘদেহী মানুষটির দিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, "থুল সত্যি কথাই বলেছিল! আমাদের কেউ বেঁচে থাকবে না। আমরা সবাই সবাইকে মেরে ফেলব।"

দীর্ঘদেহী রোবোমানবটি লোহার রডটি ওপরে তুলে প্রচণ্ড বেগে নিচে নামিয়ে আনে। ঘরের দেয়াল গোল ছোপ ছোপ রক্তে ভরে উঠতে থাকে।

২৭

টেবিলে কাচের জারে ডুবিয়ে রাখা মস্তিষ্কটিতে এক ধরনের বিবর্ণ রঙের ছোপ পড়েছে। লাল চুলের মেয়েটি সেদিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারল মস্তিষ্কটিতে এক ধরনের সংক্রমণ শুরু হয়েছে। গত কিছুদিন সে নিয়মিত তার বাসায় আসে নি, মস্তিষ্কটিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিতে পারে নি, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে নি। তারা ভেবেছিল রোবোমানবেরা সারা পৃথিবীকে দখল করতে যাচ্ছে—আসলে হয়েছে ঠিক তার উল্টো। বনের পশুর মতো এখন রোবোমানবেরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিজ্ঞান আকাদেমির সভাপতি ঠিকই বলেছিল, ভয়ানক বিপদে রোবোমানবেরা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। এক ঘণ্টাও হয় নি তারা তাদের দলপতিকে হত্যা করেছে। নূতন দলপতি কে হবে সেটা নিয়ে বিরোধ হয়েছে, আরেকটু হলেই তাকেও হত্যা করে ফেলত। অনেক কষ্ট করে সে বেঁচে এসেছে। সময় খুব কঠিন, নিজে বেঁচে আসার জন্যে তাকে অন্য সবাইকে খুন করে আসতে হয়েছে। সে নিজেও গুলি খেয়েছে, আঘাতটা কতটুকু গুরুতর বুঝতে পারছে না, কোনো হাসপাতালেও যেতে পারছে না—নিজের বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছে।

লাল চুলের মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে যন্ত্রণার একটা শব্দ করে মস্তিষ্কের সুইচটি অন করে দিল। জিজ্ঞেস করল, "তুমি জেগে আছ?"

মস্তিষ্কটি বলল, "হ্যাঁ জেগে আছি। আমি আসলে জেগেই থাকি।"

"আমি কয়েক দিন আসতে পারি নি। তোমায় পুষ্টি দিতে পারি নি।"

"আমি জানি। আমি বুঝতে পারছি আমার মাঝে এক ধরনের প্রদাহ শুরু হয়েছে। আমি খুব আশা করে আছি এখন আমি মারা যাব।"

লাল চুলের মেয়েটি যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে বলল, "আমি তোমাকে মারা যেতে দেব না। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব।"

মস্তিষ্কটি বলল, "তুমি এমন করে কেন কথা বলছ? তোমার কি কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আমি গুলি খেয়েছি। আমার রক্তক্ষরণ হচ্ছে।"

"তোমাকে কে গুলি করেছে? মানুষ?"

"না।" লাল চুলের মেয়েটি বলল, "আমাকে অন্য রোবোমানব গুলি করেছে। যেই রোবোমানবকে আমি হত্যা করেছি তারা আমাকে গুলি করেছে।"

মস্তিষ্কটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেন রোবোমানব হয়ে রোবোমানবকে হত্যা করতে গিয়েছ?"

লাল চুলের মেয়েটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি সেটা বুঝবে না।"

"তোমরা কি পৃথিবী দখল করে নিয়েছ?"

লাল চুলের মেয়েটি প্রশ্নের উত্তর দিল না। মস্তিষ্কটি আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি পৃথিবী দখল করে নিয়েছ?"

লাল চুলের মেয়েটি এবারেও প্রশ্নের উত্তর দিল না। মস্তিষ্কটা তখন একটু হাসির মতো শব্দ করল। বলল, "তার মানে তোমরা পৃথিবী দখল করতে পার নি! আমি জানতাম তোমরা পারবে না।"

লাল চুলের মেয়েটি এবারেও কোনো কথা বলল না। মস্তিষ্কটি নরম গলায় বলল, "তোমার জন্যে আমার খুব মায়া হচ্ছে। তোমার সাথে প্রতিদিন আমি কথা বলেছি, আমি জানি তুমি অসম্ভব নিঃসঙ্গ একটি মেয়ে। রোবোমানবের কোনো বন্ধু নেই। কোনো প্রিয়জন নেই। কোনো আপনজন নেই। আমি যেরকম অসম্ভব নিঃসঙ্গ—আমার যেরকম কোনো অস্তিত্ব নেই। আমার যেরকম শুরু নেই, শেষ নেই, আমি যেরকম অন্ধকার একটা জগতে থাকি, তুমি এবং তোমার মতো রোবোমানবেরাও সেরকম অন্ধকার বোধহীন অনুভূতিহীন একটা জগতে থাকে। তোমার জন্যে আমার মায়া হয়। মায়া হয় আর করুণা হয়। অসম্ভব করুণা হয়।"

লাল চুলের মেয়েটি টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে তার ব্যাগ থেকে বেঢপ একটা রিভলবার বের করে এনে ফিসফিস করে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু তোমার মতো বোধশক্তিহীন অনুভূতিহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন একটা মস্তিষ্ক আমাকে করুণা করবে সেটি হতে পারে না।"

"তুমি কী করবে?"

লাল চুলের মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। মস্তিষ্কটি আবার জিজ্ঞেস করল, "কী করবে? তুমি কী করবে?"

লাল চুলের মেয়েটি খুব ধীরে ধীরে রিভলবারটি নিজের মাথায় স্পর্শ করে। একবার চারদিকে তাকাল তারপর ট্রিগারটি টেনে ধরে। ছোট ঘরটিতে গুলির শব্দটি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে।

মস্তিষ্কটি চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে এখানে?"

কেউ তার কথার উত্তর দিল না। মস্তিষ্কটির চেতনা ধীরে ধীরে অবশ হতে শুরু করেছে। কেউ তাকে বলে দেয় নি কিন্তু সে জানে তার সময় শেষ হয়ে আসছে। নিজের ভেতরে সে তীব্র একটি প্রশান্তি অনুভব করে। আর কিছুক্ষণ তারপরই সে এই অন্ধকার বোধশক্তিহীন, চেতনাহীন, আদি-অন্তহীন, মমতাহীন জগৎ থেকে মুক্তি পাবে।

সেই তীব্র আনন্দের জন্যে এই হতভাগ্য মস্তিষ্কটি অপেক্ষা করতে থাকে।

AMARBOI.COM

২৮

খুব ধীরে ধীরে নীহার ঘুম ভেঙে যায়। পঞ্চম ঘাত কিনিস্কা রাশিমালা নিয়ে চিন্তা করতে করতে সে ঘুমিয়েছিল, ঠিক যখন সমাধানটা তার মাথায় উঁকি দিতে শুরু করেছে তখন তার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল। যখন সে চোখ খুলেছে তখন হঠাৎ করে সমাধানটা সে পেয়ে গেছে। নিজের অজান্তেই নীহার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

ক্যাপসুলের ভেতর মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। একটা মৃদু সংগীতের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে সেটি ভেসে আসছে কিন্তু নীহা জানে এটি ঠিক ক্যাপসুলের ভেতরেই তার জন্যে তৈরি করা সংগীতের ধ্বনি। নীহা তার হাতটি নাড়ানোর চেষ্টা করল, দুর্বলভাবে সেটি একটু নাড়াতে পারল। এখনো তার শরীরে শক্তি ফিরে আসে নি। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

নীহা তার চোখ বন্ধ করে অপেক্ষা করে। সে অনুভব করে সারা শরীরে এক ধরনের উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এই উষ্ণতাটুকু তার শরীরটাকে জাগিয়ে তুলছে। কতদিন পর সে জেগে উঠছে? শেষবার যখন জেগে উঠেছিল তখন সেটি ছিল একটি ভয়ংকর দুঃসংবাদের মতো। এবারে? এবারে নিশ্চয়ই ওরকম কিছু নয়। যদি সেরকম কিছু হত তা হলে ক্যাপসুলের ভেতর এরকম মিষ্টি একটা সংগীতের ধ্বনি তাকে শোনানো হত না। ক্যাপসুল থেকে বাইরে বের হওয়ার জন্যে সে আর অপেক্ষা করতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত ক্যাপসুলের ঢাকনাটি ধীরে ধীরে খুলে গেল। নীহা ভেতরে উঠে বসে তারপর সাবধানে ক্যাপসুল থেকে নেমে আসে। একটু দূরে স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানালার পাশে নুট দাঁড়িয়েছিল, নীহার পায়ের শব্দ শুনে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। নীহা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "নুট! কেমন আছ তুমি?"

নীহা ভেবেছিল নুট কোনো কথা বলবে না, মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দেবে সে ভালোই আছে। কিন্তু তাকে অবাক করে নুট কথা বলল, "আমি ভালোই আছি নীহা! তুমি কেমন আছ?"

"আমিও ভালো আছি! কিনিস্কা রাশিমালার সমাধানটা মনে হয় পেয়ে গেছি!"

"চমৎকার। শীতলঘরে তোমার ঘুম কেমন হল?"

নীহা অবাক হবার ভান করে বলল, "কী আশ্চর্য নুট! তুমি পরপর দুটি কথা বললে! প্রশ্ন করলে! এমনটি তো আগে কখনো হয় নি।"

নুট হেসে ফেলল, বলল, "আসলে কোয়ার্টজের এই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে গ্রহটাকে দেখে মনটা ভালো হয়ে গেছে। তাই কথা বলার ইচ্ছে করছিল। তোমাকে দেখে কথা বলে ফেলছি।"

"গ্রহ?" নীহা অবাক হয়ে বলল, "আমরা একটি গ্রহে এসেছি? কেপলার টুটুবি?"

"মনে হয়।"

নীহা টলমলে পায়ে এগিয়ে গিয়ে কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিস্ময়ের একটা শব্দ করল, বলল, "কী সুন্দর! ঠিক যেন পৃথিবী।"

"কেপলার টুটুবি গ্রহটি তোমাদের পছন্দ হয়েছে জেনে ভালো লাগছে।"

ট্রিনিটির কণ্ঠস্বর শুনে দুজনেই ঘুরে তাকাল। ট্রিনিটি বলল, "এটি আমার খুঁজে পাওয়া তৃতীয় গ্রহ।"

"তৃতীয় গ্রহ? তুমি এর আগে আরো দুটি গ্রহে গিয়েছ?" নীহা অবাক হয়ে বলল, "আমাদের ডেকে তোল নি কেন?"

"গ্রহগুলোকে ঠিক করে উজ্জীবিত করতে পারি নি তাই তোমাদের ডাকি নি।"

"উজ্জীবিত? গ্রহকে উজ্জীবিত করে কেমন করে?"

"মানুষ প্রাণী গাছপালা বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি করাকে বলি উজ্জীবিত করা।"

"এই গ্রহটিকে পেরেছ?"

"সহ্য সীমার ভেতরে নিয়ে এসেছি।"

"সেটা কী, বলবে আমাদের?"

"বলব। অবশ্যই বলব। তোমাদের আরো তিনজন জেগে উঠুক, তখন একসাথে বলব।"

ট্রিনিটির কথা শেষ হবার আগেই অন্য তিনটি ক্যাপসুলের ঢাকনা খুলে যায়। ভেতর থেকে টলমল পায়ে ইহিতা, টুরান আর টর একজন একজন করে বের হয়ে আসে।

নীহা আনন্দের মতো শব্দ করে বলল, "এস তোমরা। দেখে যাও। আমরা কেপলার টুটুবি গ্রহে এসেছি। আমাদের গ্রহ।"

শীতল ঘর থেকে সদ্য উঠা তিনজন টলমল পায়ে এগিয়ে এসে কোয়ার্টজের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, নিজের অজান্তেই তাদের মুখ দিয়ে আনন্দের একটা ধ্বনি বের হয়ে আসে।

ইহিতা বলল, "দেখেছ, গ্রহটা ঠিক পৃথিবীর মতো!"

ট্রিনিটি বলল, "পুরোপুরি নয়। কিছু পার্থক্য রয়েছে, তোমাদের অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে।"

"কী পার্থক্য?" টর জিজ্ঞেস করল, "কোনো ভয়ংকর প্রাণী?"

"না। কোনো ভয়ংকর প্রাণী নেই।"

"তা হলে?"

"সূর্যটা বড়। দিনগুলো লম্বা। রাতের আকাশে চাঁদ দুটি।"

"সেগুলো খুব কঠিন কিছু নয়। দুটি চাঁদ ভালোই লাগবে মনে হয়।"

"আবহাওয়াতে বৈচিত্র্য কম। মাধ্যাকর্ষণ একটু বেশি, বাতাসে অক্সিজেনও একটু কম। আমি পৃথিবীর প্রাণীগুলো পাঠিয়েছি তারা বেশ মানিয়ে নিয়েছে। তোমরাও নিশ্চয়ই মানিয়ে নিতে পারবে।"

টর বলল, "আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমি গ্রহটাতে নামতে চাই।"

"একটু প্রস্তুত হয়ে নাও, এই গ্রহটা হবে তোমাদের নূতন পৃথিবী। আমি সেটাকে তোমাদের জন্যে পাঁচশ বছর থেকে প্রস্তুত করেছি। দেখ তোমাদের পছন্দ হয় কি না।"

স্কাউটশিপটা পুরো গ্রহটাকে একবার প্রদক্ষিণ করে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে। সমুদ্রের বালুকাবেলায় স্কাউটশিপটা স্থির হয়ে দাঁড়াল। নিরাপত্তা বন্ধনী থেকে নিজেদের মুক্ত করে সবাই স্কাউটশিপের দরজায় এসে দাঁড়াল।

ইহিতা বলল, "সবাই প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ।"

"দরজাটি খুলব?"

"খোল।"

ইহিতা দরজার একটি বোতাম স্পর্শ করতেই মৃদু একটা শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল, সাথে সাথে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস স্কাউটশিপে প্রবেশ করে। সেই নোনা বাতাসে সজীব এক ধরনের ঘ্রাণ। ঠিক তখন একটা বুনো পাখি তারস্বরে ডাকতে ডাকতে স্কাউটশিপের উপর দিয়ে উড়ে গেল।

ইহিতা সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা সবাই কি এখন নামার জন্যে প্রস্তুত?"

সবাই মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, প্রস্তুত।"

"চল তা হলে নামি।"

"চল।"

নীহা জিজ্ঞেস করল, "কে আগে নামবে?"

"তুমি।" ইহিতা বলল, "তোমার পদচিহ্ন দিয়েই এই নূতন পৃথিবী শুরু হোক।" নীহা চোখ বড় বড় করে বলল, "আমার পদচিহ্ন দিয়ে?"

সবাই মাথা নাড়ল। টর বলল, "হ্যাঁ তোমার। নূতন পৃথিবীটা শুরু হোক সবচেয়ে নিষ্পাপ মানুষের পদচিহ্ন দিয়ে।"

নীহা একটু হাসল, তারপর বলল, "ঠিক আছে। তা হলে আমি নামি।"

নীহা তখন স্কাউটশিপের সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। শেষ ধাপে পৌঁছে সে হঠাৎ থেমে গেল। পিছনে ফিরে তাকিয়ে বলল, "আমি কি আরেকজনের সাথে তার হাত ধরে নামতে পারি?"

ইহিতা হাসিমুখে বলল, "অবশ্যই পার নীহা।"

নীহা তখন লাজুক মুখে বলল, "নুট তুমি কি আমার হাত ধরবে? তুমি আর আমি কি হাত ধরে একসাথে কেপলার টুটুবির এই নূতন পৃথিবীতে নামতে পারি?"

নুট বলল, "অবশ্যই নামতে পারি নীহা। অবশ্যই।"

স্কাউটশিপের ভেতরে দাঁড়িয়ে সবাই দেখল নুট আর নীহা হাত ধরাধরি করে বালুকাবেলায় পা দিয়েছে। নরম বালুতে পায়ের ছাপ রেখে দুজন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

ইহিতা ফিসফিস্ করে বলল, "দ্বিতীয় পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবী।" তারপর সে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে তার চোখ দুটো মুছে নেয়।

কে জানে কেন তার চোখে পানি এসেছে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~